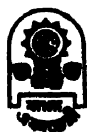
গল্প
নিরবধি

গদ্য নিরবধি





বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ১৯৭১

উৎসর্গ

সাতপাঁচ ভেবে
বেবীকেই

আকাশে তো আমি রাখি নাই, মোর
উড়িবার ইতিহাস।
তবু, উড়েছিনু এই মোর উল্লাস।

—রবীন্দ্রনাথ
লেখন (১৯২৭)

সংশোধন

শেখ আবদুর রহিমের *হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্ম্মনীতি* গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৮৮৭, অনবধানতাবশত তা ১৮৮৮ মুদ্রিত হয়েছে। গিয়াসউদ্দিন আহমদের চিঠির রচনাকালের পরিচয়ে ১৯৬০-এর বদলে ১৯৬৫ হবে। ৮৮ পৃষ্ঠায় ১৬ আগস্ট একবার ২৬ আগস্ট হয়ে গেছে। ২০ পৃষ্ঠায় ফুফুদাদির জায়গায় ফুফুনানি এবং ১০০ পৃষ্ঠার শুরুতে দৌহিত্রের বদলে পৌত্র পড়তে হবে।



যাহারা লিখিতে জানে না, অর্থাৎ যাহাদের লেখার পরখ হয় নাই, তা তাহারা যত বড় লোকই হোক, না জানিয়া তাহাদের দীর্ঘ লেখা ছাপিবার অনেক দুঃখ। ইহারা মনে করে সব কথাই বুঝি বলা চাইই। যা দেখে, যা শোনে, যা হয়, মনে করে সমস্তই লোককে দেখান শোনান দরকার। যারা ছবি আঁকিতে জানে না, তারা যেমন তুলি হাতে করিয়া মনে করে, যা চোখের সামনে দেখি সবই আঁকিয়া ফেলি। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সে-ই শেষে টের পায়—না, তা নয়। অনেক বড় জিনিস বাদ দিতে হয়, অনেক বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে হয়—তবে ছবি হয়। বলা বা আঁকার চেয়ে না-বলা না-আঁকা ঢের শক্ত। অনেক আত্মসংযম অনেক লোভ দমন করিতে হয়, তবেই সত্যিকারের বলা এবং আঁকা হয়।

—শরৎচন্দ্র

হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র, ১৫.১১.১৯১৫



জন্মের আগে

ইতিহাসে কম নম্বর পাওয়ায় বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রের মা নাকি ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে, পোড়ারমুখো মাস্টাররা ওর জন্মের আগের কথা জিজ্ঞেস করেছে, বেচারা বলবে কী করে!

আমিও এই আখ্যান শুরু করতে যাচ্ছি নিজের জন্মের অনেক আগের কথা দিয়ে। পাশ নম্বর পাবো কিনা বলতে পারিনে। কেননা এর সামান্য অংশ বইপত্র থেকে জানা, বেশির ভাগই শোনা কথা।

আমার পূর্বপুরুষদের বাস ছিল চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত মোহাম্মদপুর গ্রামে। চব্বিশ পরগনা অতি প্রাচীন জনপদ। মোহাম্মদপুরের অদূরে, কলকাতার মাইল পঁচিশেক পূর্বে, চন্দ্রকেতুগড়ের অবস্থান। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে সেখানে যেসব উপাদান পাওয়া গেছে, তাতে মনে করা হয় যে, খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর দিকে এখানে সমৃদ্ধ নগর ছিল। সমগ্র দক্ষিণ বাংলায় এত প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান আর নেই। এলাকাটি পরে পাল ও সেন রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে এবং চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ায় তা তুর্ক-আফগান শাসনের অধীন হয়। বসিরহাট শহরে সালিক মসজিদ নামে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। একে শাহী মসজিদও বলা হয়। মসজিদের গায়ে যে প্রস্তরফলক আছে, তা থেকে জানা যায় যে, ১৪৬৬-৬৭ খ্রিষ্টাব্দে উলুম মজলিসে আজম এটি প্রতিষ্ঠা করেন। একই ব্যক্তি পরে হুগলি জেলার পাণ্ডুয়ায় আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করেন ১৪৭৭ সালে। ষোল শতকে শ্রীচৈতন্য এই এলাকায় এসেছিলেন পুরী আসা-যাওয়ার পথে। ওই শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে পোর্তুগিজেরা এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে এবং প্রায় একশ বছর ধরে দাস-ব্যবসার জন্যে মানুষকে বন্দি করে ও নানারকম অত্যাচার চালায়। রাজা প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করে মুঘলরা এলাকাটি দখল করে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায়, তখন চব্বিশ পরগনা অন্তর্ভুক্ত হয় যশোর ফৌজদারির। ইতোমধ্যে এখানে ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকরাও আস্তানা গাড়ে। সতেরো শতকের শেষে পীর মোবারক গাজি এই এলাকায় বহু হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করেন। ধর্মান্তরিত না হয়েও অনেকে তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করতো, এখনো করে। ১৭৫৬ সালে কলকাতায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সময়ে নবাব সিরাজউদ্‌দৌলা এই এলাকা দিয়েই গিয়েছিলেন।

মীর জাফর নবাব হওয়ার পরে ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে চব্বিশ পরগনার জমিদারি-স্বত্ব দান করেছিলেন। তখন এর পরিচিত ছিল কলকাতার জমিদারি বলে। পরবর্তীকালে ইংরেজরা এখানে নীলের চাষ প্রবর্তন করে এবং দেশি-বিদেশি মালিকানায় বারাসাত, বসিরহাট ও বনগাঁয় বেশ কটি কোম্পানি গড়ে ওঠে। নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের নীলচাষিরা ১৮৫৯ থেকে ১৮৬১র মধ্যে বড়োরকম বিদ্রোহ করে। তবে তার আগে ১৮২৪ সালে বারাকপুরের সিপাহিরা বিদ্রোহ করেছিল—কোম্পানি-শাসনে সেটাই বোধহয় সিপাহিদের আদি অভ্যুত্থান। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহেও প্রথম গুলিটা ছোঁড়া হয় এই বারাকপুরেই। আর ১৮৩০ সালে ঘটে তিতুমীরের ধর্মসংস্কারের আন্দোলন, জমিদার ও নীলকরদের সঙ্গে তাঁর সংঘাত, কোম্পানির বিরুদ্ধে নারকেলবাড়িয়ার যুদ্ধ এবং পরিণামে বাঁশের কেল্লার পতন ও তিতুর জীবননাশ।

আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ (দাদার দাদা) শেখ নাসিরুদ্দীন খাসপুরের কাছে জহরপুর গ্রাম থেকে উঠে এসে মোহাম্মদপুরে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র-পৌত্রেরা সবাই শেখ উপাধি ব্যবহার করতেন, তবে বানান করতেন বোধহয় সেখ। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত আমার পিতামহের প্রথম গ্রন্থে তাঁর নাম মুদ্রিত হয়েছিল 'শ্রীসেখ আব্‌দর রহিম'। ওই বইয়ের পরবর্তী সংস্করণে এবং তাঁর অন্যান্য বইতে লেখকের নাম লেখা হয় 'শেখ আবদুর রহিম'। এই উপাধির ব্যবহার সত্ত্বেও তাঁর পূর্বপুরুষেরা যে বিদেশাগত ছিলেন, এমন কোনো কিংবদন্তি বা দাবি আমাদের পরিবারে প্রচলিত নেই। বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের *টোয়েনটি-ফোর পরগনাস* (কলকাতা, ১৯১৪) খণ্ডে এল এস এস ও'ম্যালি লিখেছেন যে, ওই এলাকার তিন-চতুর্থাংশ মুসলমানের উপাধি শেখ, তবে তার মানে এই নয় যে, এরা বহিরাগত। *যশোহর-খুলনার ইতিহাসে* (তৃতীয় সংস্করণ; কলকাতা, ১৯৬৩) সতীশচন্দ্র মিত্র বলেছেন যে, নিম্নশ্রেণীর হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত যশোর-খুলনার মুসলমানের বেশির ভাগই সেখ উপাধি ধারণ করেন।

শেখ নাসিরুদ্দীন কোনো নীলকুঠিতে সামান্য কর্ম করতেন। তাঁর ছিলেন দুই ছেলে। কনিষ্ঠজন পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নীলকুঠির কর্মে প্রবেশ করেন এবং কালক্রমে দারোগা পদে উন্নীত হন। তাঁকে নিয়ে আমাদের পরিবারে একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী প্রচলিত আছে। কুঠিয়ালদের আদেশে তিনি নাকি এক ব্রাহ্মণ তরুণীকে অপহরণ করেছিলেন, তবে অপহৃতার কাকুতি-মিনতিতে তাঁকে প্রভুদের হাতে তুলে না দিয়ে নিজের বাড়িতে এনে রেখেছিলেন সসম্মানে (এ কাহিনীর কথকেরা সসম্মানে কথাটার ওপর খুব জোর দিয়ে থাকেন)। কুঠির কর্মচারী হয়ে নীলকরদের আদেশ অমান্য করার এই অবিশ্বাস্য সাহস ও শক্তি তিনি কীভাবে পেলেন, তার কোনো যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। দারোগা সাহেব আর কুঠিমুখো হন নি, সেকথা বলা বাহুল্য। তাঁর বাড়িতে নাকি ব্রাহ্মণকন্যা নিজের আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারতেন, তবে মুসলিম-সংসর্গে তাঁর জাত চলে গিয়েছিল। মৃত্যুর পরে তাঁকে দাহ না করে তাই দারোগা সাহেবের বাড়ির প্রাঙ্গণেই সমাধিস্থ করা হয়।

শেখ নাসিরুদ্দীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার প্রপিতামহ শেখ গোলাম এহিয়া পাঠশালায় শিক্ষকতা করতেন। তাঁর জ্যেষ্ঠসন্তান কন্যা। ১৮৫৯ সালে তাঁর পুত্র—আমার

পিতামহ—শেখ আবদুর রহিমের জন্ম হয়। আবদুর রহিমের শৈশবেই তাঁর মায়ের মৃত্যু ঘটে। স্ত্রীবিয়োগের শোক সামলে নিয়ে গোলাম এহিয়া পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন। আবদুর রহিমের বৈমাত্রেয় দুই ভ্রাতা—শেখ আবদুল জব্বার ও শেখ আবদুস সাত্তার—এবং চার ভগ্নী ছিলেন। ভগ্নীদের একজন—রোয়েদা খাতুনের—বিয়ে হয়েছিল হায়দারপুরে, তিতুমীরের পিতৃব্যপুত্র সৈয়দ আলী হোসেনের সঙ্গে। আমরা ভাইবোনেরা তাঁদের উল্লেখ করতাম হায়দারপুরের দাদা ও দাদি বলে।

বিমাতার সংসারে আবদুর রহিমের কষ্ট হবে মনে করে শৈশবেই তাঁকে মামা শেখ গোলাম কিবরিয়া (১৮৪৩-?) নিজের কাছে নিয়ে আসেন। গোলাম কিবরিয়া বসিরহাটের অন্তর্গত টাকিতে এক পাঠশালায় একাদিক্রমে ৪০ বছর শিক্ষকতা করেছিলেন। *উচিত কথা* (কলকাতা, ১৮৯০) নামে তাঁর একটি বই ছিল, মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহ্‌সান-রচিত *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা, ১৯৫৬; ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৮২) গ্রন্থে বইটির আলোচনা আছে। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুসরণ করে আলী আহমদ (*বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী*, ঢাকা, ১৯৮৫) জানাচ্ছেন যে, বইটি তাঁর একক রচনা নয়—কাজী কেরামতউল্লা ও মুনশী গোলাম কিবরিয়া-প্রণীত।

মামার আশ্রয়ে থেকে আবদুর রহিম প্রথমে তাঁর পাঠশালায় ও পরে টাকির মধ্য-বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে মাসিক চার টাকা বৃত্তিলাভ করেন। টাকিতে বোধহয় আর পড়বার সুযোগ ছিল না, তাই আবদুর রহিমকে কলকাতায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু কলকাতায় ভাগ্নের শিক্ষার ব্যয়নির্বাহ করার সামর্থ্য গোলাম কিবরিয়ার ছিল না। তিনি তখন তাঁর প্রাক্তন ছাত্র রাধামাধব বসুর শরণাপন্ন হন। টাকিতে বসুদের জমিদারি ছিল, তাঁরা ব্রাহ্ম ছিলেন এবং রাধামাধব বসু ডেপুটি ম্যাটিস্ট্রেটের কর্ম করতেন। গোলাম কিবরিয়া সম্ভবত তখনো তাঁদের গৃহে শিক্ষকতা করতেন। তাঁর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে রাধামাধব বসু নির্দ্বিধায় বালক আবদুর রহিমকে নিজের আশ্রয়ে গ্রহণ করেন এবং কলকাতার সিটি স্কুলে তাঁকে ভর্তি করে দেন। সিটি স্কুলে আবদুর রহিম এনট্রান্স পর্যন্ত পড়েন, তবে বসন্তরোগে আক্রান্ত হওয়ায় চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। এখানেই তাঁর আনুষ্ঠানিক পড়াশোনার ইতি হয়।

রাধামাধব বসু ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে আবদুর রহিমের যে-আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, সে-বিষয়ে দু-একটি কথা বলা দরকার। তাঁর প্রথম গ্রন্থ *হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্ম্মনীতির* (১৮৮৮) ভূমিকায় আবদুর রহিম লিখেছিলেন :

> আর আমার চিরশুভাকাঙ্ক্ষী বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত রাধামাধব বসু ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় এই পুস্তক প্রণয়নকালে আমাকে নানা উৎসাহ দিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই ঐকান্তিক যত্নে আমি নির্ব্বিঘ্নে এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছি।

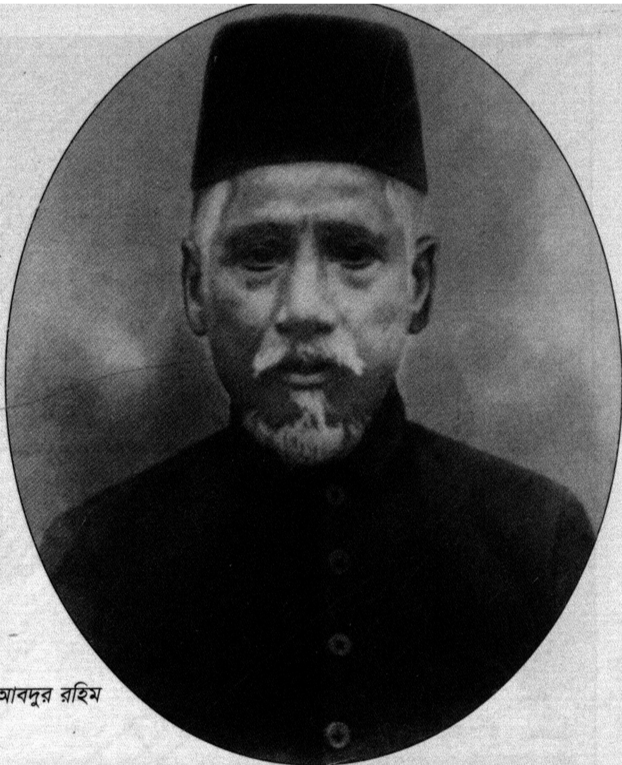
বইটি সম্পর্কে ইংরেজিতে লেখা রাধামাধব বসুর একটি অভিমত বা প্রশংসাপত্র প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত হয়। তাতে তিনি এই গ্রন্থপ্রকাশে দরিদ্র লেখককে সাহায্য করার জন্য

এবারে একটি শোনা কথা বলি। আবদুর রহিমের গ্রন্থাদি যেমন ইসলাম-বিষয়ক, তেমনি তাঁর সম্পাদিত পত্র-পত্রিকায় মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতি প্রবল ঝোঁক লক্ষ করা যায়। কোনো এক সময়ে আবদুর রহিমের এই প্রবণতার প্রতি বৃদ্ধ রাধামাধব বসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি নাকি বলেছিলেন যে, তাঁর আশ্রয়ে থেকে আবদুর রহিম যে নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলেন নি এবং নিজের বিবেচনা-অনুযায়ী চলবার শিক্ষা লাভ করেছেন, এতে তিনি বরঞ্চ সন্তুষ্ট।

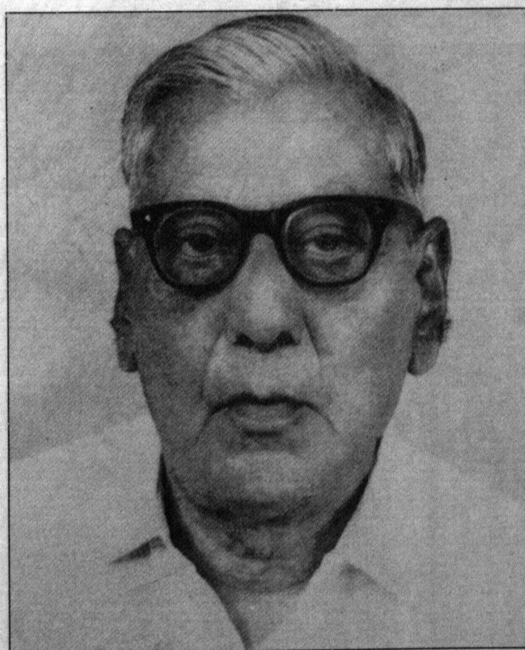
প্রায় অনুরূপ একটি ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছিল—এখানে তা বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন আব্বার কোনো সাংবাদিক-লেখক বন্ধু আমার সম্পর্কে তাঁর কাছে এই বলে অনুযোগ করেছিলেন যে, অমন ব্যক্তির পৌত্র হয়েও আমি বিপরীত পথে অগ্রসর হচ্ছি। আব্বা তাঁকে বলেছিলেন, 'দেখেন, আমার বাপ ব্রাহ্ম পরিবারে মানুষ হয়ে ইসলাম-বিষয়ে লিখতে পেরেছিলেন এবং নিজের বিবেক-অনুযায়ী চলেছিলেন। তাঁর পোতা [পৌত্র] হয়ে আমার ছেলে যদি নিজের বিচারবুদ্ধি-অনুসারে চলতে চায়, তাহলে আমি তাকে বারণ করতে পারি না।'

রাধামাধব বসুর পুত্র মুনীন্দ্রমোহন বসুকে আবদুর রহিম অনুজতুল্য জ্ঞান করতেন। মুনীন্দ্রমোহন কলকাতায় সীতারাম ঘোষের স্ট্রিটে মিলন প্রেস ডিপোজিটরী বা মিলন যন্ত্র নামে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছাপাখানার সঙ্গে আবদুর রহিমের সংস্রব ছিল এবং সেখানে তাঁর ও তাঁর অনেক বন্ধুর বইপত্র মুদ্রিত হয়েছিল। এই কারণে কেউ কেউ এটা আবদুর রহিমের প্রেস বলে ভুল করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যাচ্ছে, পরবর্তীকালে মুনীন্দ্রমোহন টাকি থেকে কলকাতায় এলে আবদুর রহিমের বাসায়ই থাকতেন।

মুনীন্দ্রমোহন বসু সম্পর্কে আব্বার কাছে শোনা একটি গল্প দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করবো। প্রথম যৌবনে আব্বা বসিরহাট শহরে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় নিয়োজিত ছিলেন এবং তাঁর বাহন ছিল সাইকেল। একদিন দুপুরে তিনি সাইকেলে করে বসু-পরিবারের বাড়ি পেরিয়ে রোগী দেখতে যাচ্ছিলেন। ওই বাড়ির সামনে 'কাকাবাবু'কে দেখতে পেয়ে তিনি সাইকেল থেকে নেমে পড়েন এবং মুনীন্দ্রবাবুর প্রশ্নের উত্তরে কোথায় যাচ্ছেন, তা জানান। মুনীন্দ্রবাবু বলেন, 'ফেরার সময়ে এখানে খেয়ে যেও।' রোগী দেখার পরে আব্বা জানতে পারেন যে, তাঁর দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থা সেখানে হয়েছে। অনেক বলেও ছাড়া পেলেন না। অগত্যা সেখানে খেয়ে ফেরার পথে দেখেন, বাড়ির সামনে কাকাবাবু পায়চারি করছেন। আব্বাকে দেখে তিনি এত বিলম্বের হেতু জানতে চাইলেন। আব্বা যখন জানালেন যে, রোগীর বাড়িতে তাঁদের পীড়াপীড়িতে সেখানে খেয়ে এসেছেন, তখন মুনীন্দ্রবাবু তিরস্কার করে বললেন, 'তুমি জোলার বাড়িতে খেয়ে এলে!' সেই গৃহস্বামী জোলা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বটে, তবে তিনি একজন সুপরিচিত আলেম ও গ্রন্থকারও ছিলেন। অবশ্য মুসলমান সমাজে জোলা বা তাঁতিরা তখনো সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হন নি। পরে জোলাদের সুভাষিত করে বলা হতো মমিন। বিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশব্যাপী মমিনদের একটা বড় সমিতি গড়ে তুলেছিলেন খান বাহাদুর আবদুল মমিন।



দাদা শেখ আবদুর রহিম



আব্বা ডা. এ টি এম মোয়াজ্জম

মা সৈয়দা খাতুন

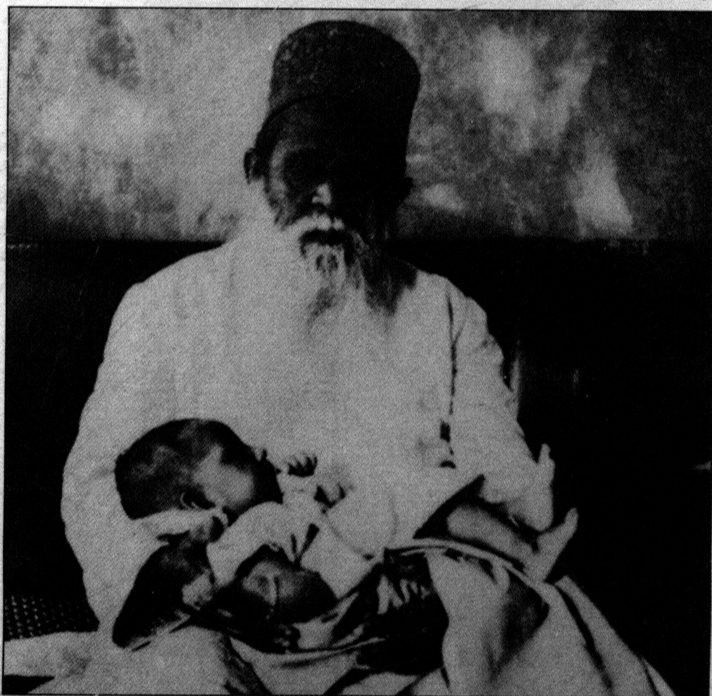


ঠাটারিবাজারের বাড়িতে মা



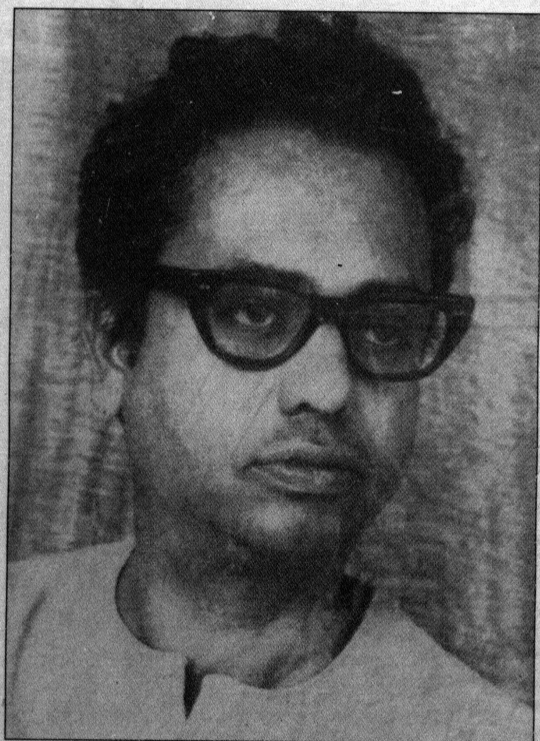
বড়ো বোন তৈয়বুন্নেসা আহসান

রুচিকে কোলে নিয়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৯৬৪)



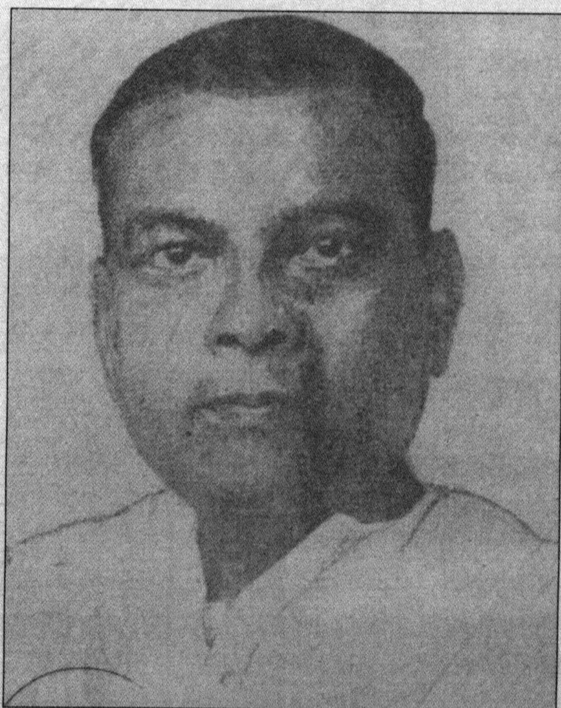


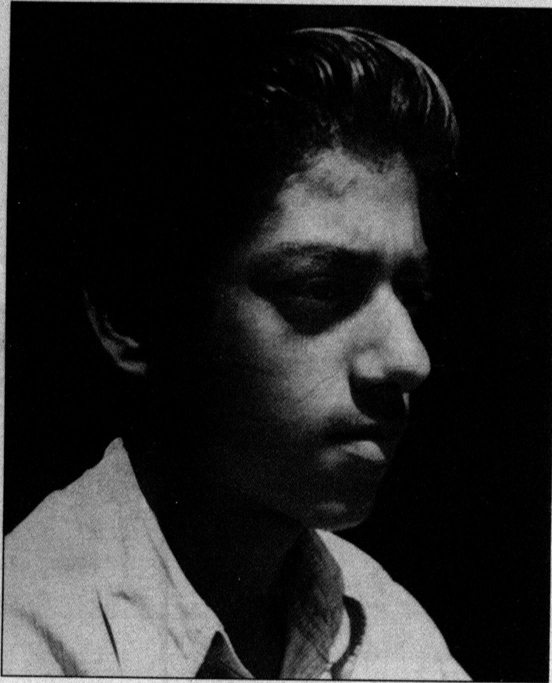
মুহম্মদ আবদুল হাই



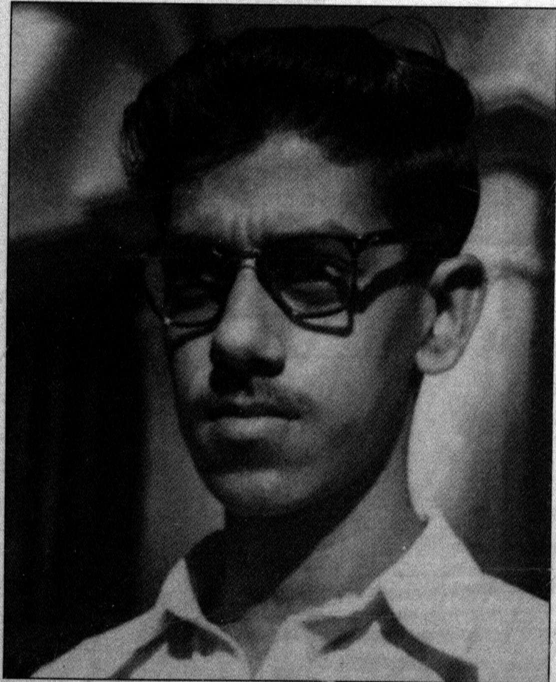
মুনীর চৌধুরী


মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

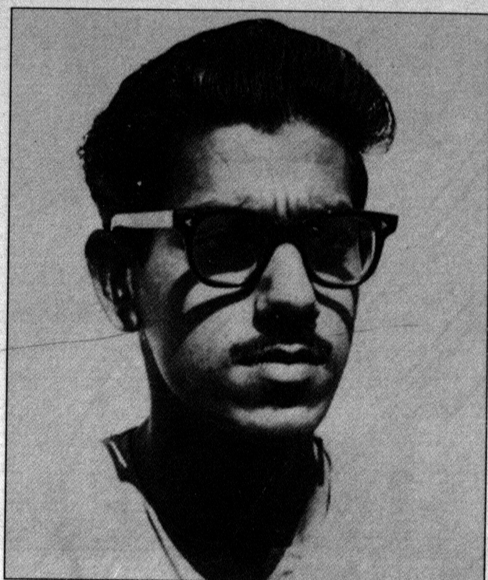

অজিতকুমার গুহ



১৯৫১/১৯৫২ সালে



আনুমানিক ১৯৫৩ সালে



আনুমানিক ১৯৬০ সালে

১৯৭০ সালে চট্টগ্রাম বেতারে কথিকা-পাঠরত



বিয়ের পর বেবী ও আমি (১৯৬১)

বাংলা বিভাগের বনভোজনে বেবী ও আমি (১৯৬১)



নয়াদিল্লিতে এশীয় লেখক সম্মেলনে (১৯৫৬) : ফয়েজ আহমদ, সরদার জয়েনউদ্দিন, সৈয়দ নূরুদ্দীন, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আমি, আবদুর রাজ্জাক ও কাজী দীন মুহম্মদ

এশীয় লেখক সম্মেলনের বিরতিতে বিশিষ্ট চীনা সাহিত্যিক লাও চাঅর সঙ্গে (১৯৫৬)



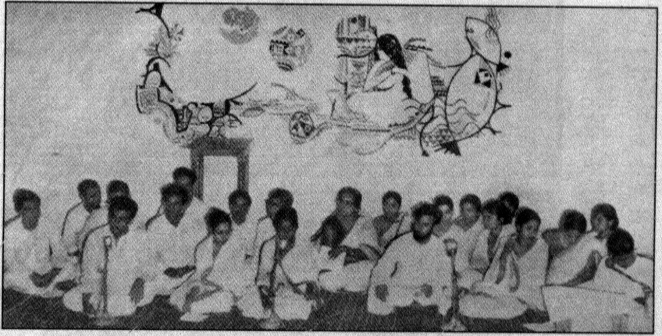
বিভাগের বনভোজনে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে (১৯৫৯)

বিভাগের বনভোজনে : নয়ারহাটে ফেরিতে
মুহম্মদ আবদুল হাই, আমি ও মধু (১৯৬০)





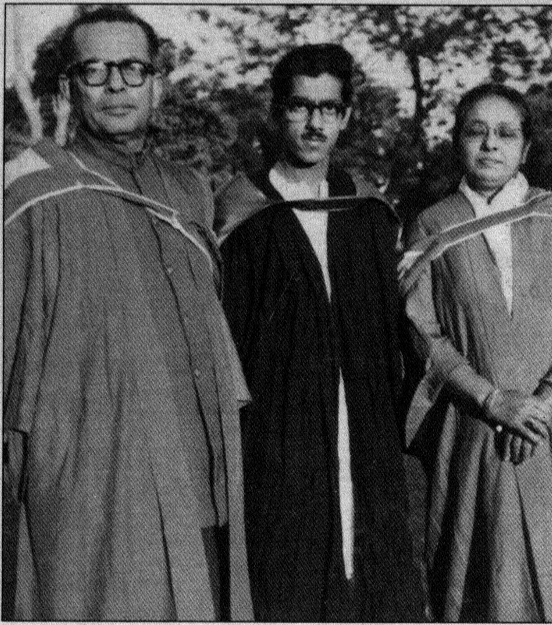
বিভাগের বনভোজনে : আহমদ শরীফ ও জাহানারা ইমামকে পরিবেশনরত (১৯৬০)



বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহের অনুষ্ঠান (১৯৬৩)



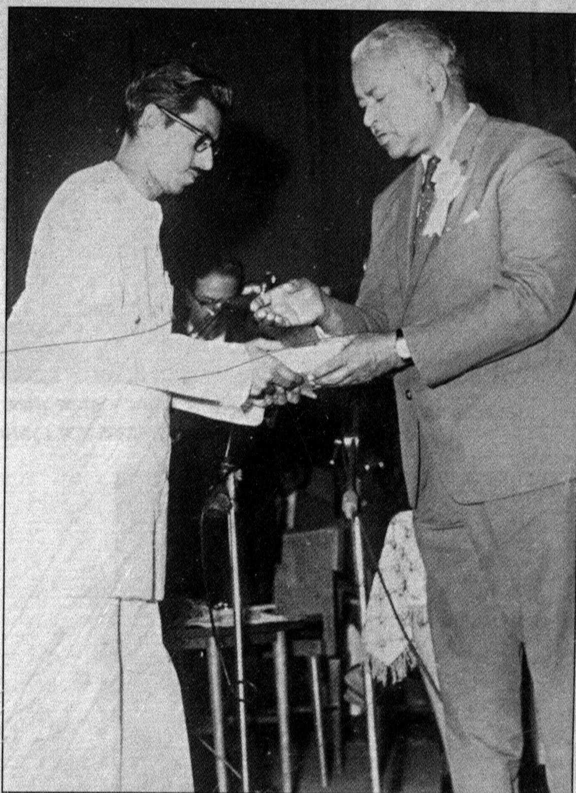
বাংলা বিভাগের বারান্দায় : মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী, আমি, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ওয়াকিল আহমদ ও বিভাগের সহকারী আবু তালেব (১৯৬৮)



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে :
আশুতোষ ভট্টাচার্য ও নীলিমা ইব্রাহিমের সঙ্গে (১৯৬০)

জন্মবার্ষিক অনুষ্ঠানে আবুল ফজলকে ছবি উপহার দিচ্ছেন জয়নুল আবেদিন :
মাঝখানে আমাকে দেখা যাচ্ছে (১৯৬৩)

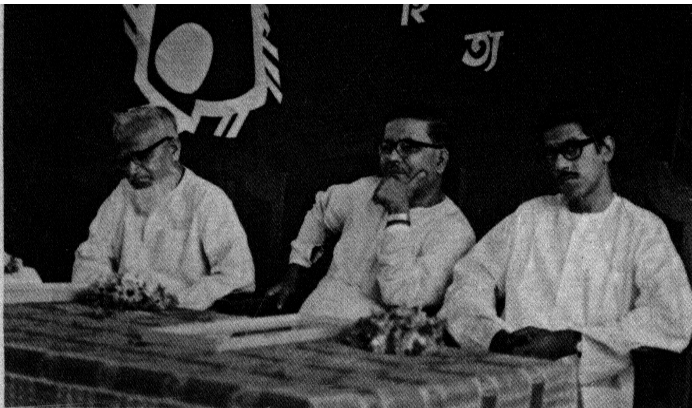




বিচারপতি
এ আর
কর্নেলিয়াসের হাত
থেকে দাউদ
পুরস্কারগ্রহণ
(১৯৬৭)

অজিত গুহের মৃত্যুতে অনুষ্ঠিত শোকসভায় বক্তৃতারত :
শ্রোতাদের আসনে আবদুল্লাহ্ আল-মুতী, আনোয়ারা বাহার চৌধুরী ও সেলিনা বাহার জামান (১৯৬৯)





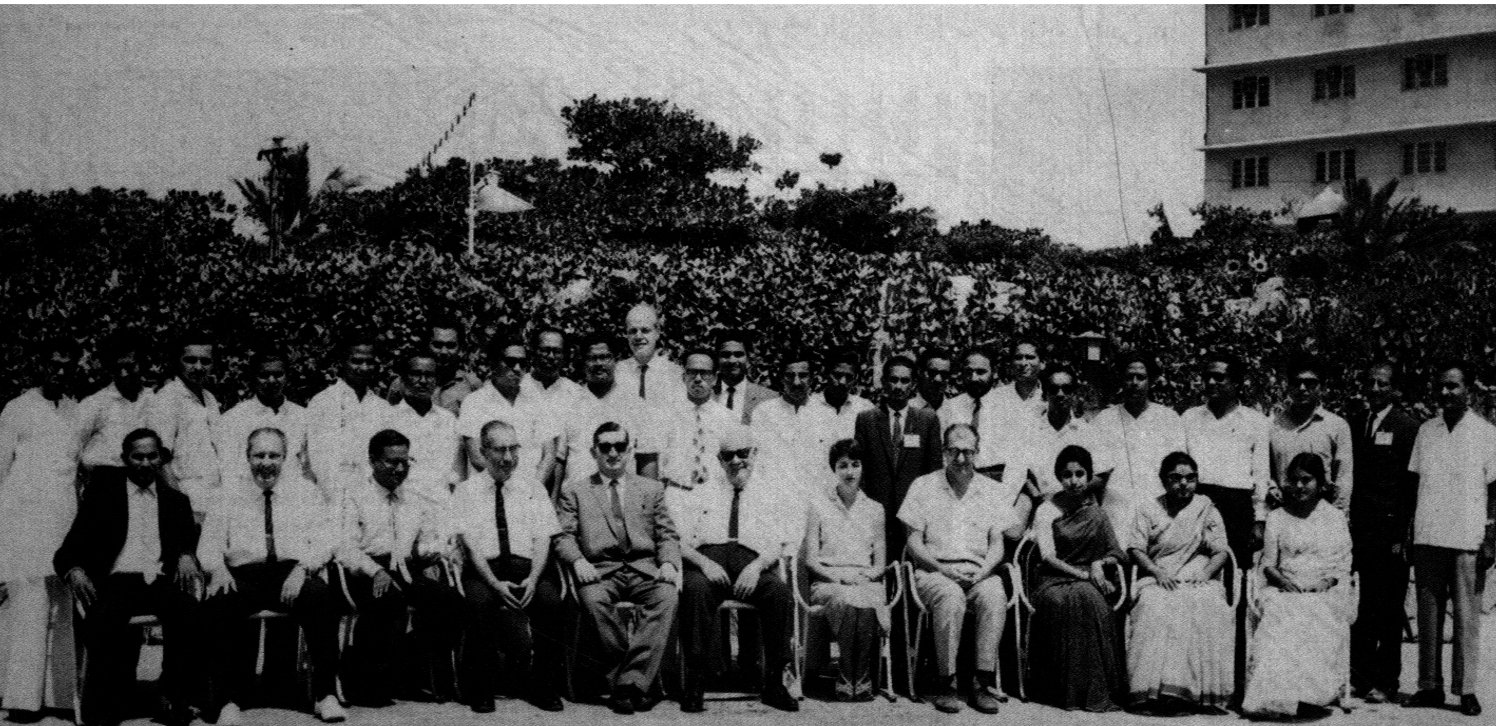
কানুনগোপাড়া কলেজে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে : আবুল ফজল ও অধ্যক্ষ শহীদ শান্তিময় দস্তিদারের সঙ্গে (১৯৭০)



ওকলাহোমায় পাকিস্তান অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনে রাষ্ট্রদূত জি আহমদের কাছ থেকে পুরস্কারগ্রহণ (১৯৬৫)



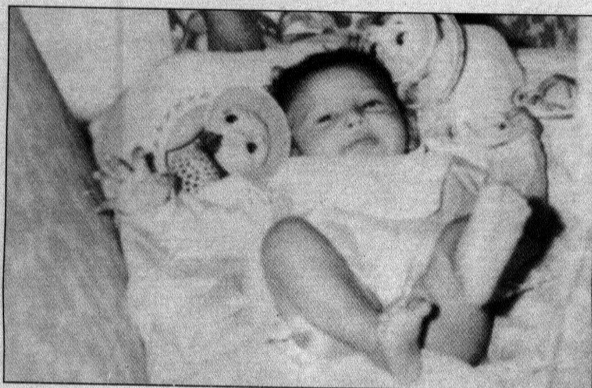
শিকাগোতে মোজাফফর আহমদ, রওশন জাহান ও টম প্র্যাপাসের সঙ্গে (১৯৬৫)



করাচির মালিরে অনুষ্ঠিত কালচার্স অফ টু ওয়ার্ল্ডস-সম্পর্কিত সেমিনারে : সামনের সারিতে সাদ আহমদ, আহমদ হাসান দানী, ওয়েন উইলকক্স; পেছনে দাঁড়িয়ে আমি, ওসমান জামাল, নূরুল ইসলাম, আলী আনোয়ার, ওবায়দুল্লাহ্ মজুমদার, আলাউদ্দিন আল আজাদ ও জিল্লুর রহমান খান (১৯৬৩)



ঢাকায় মার্কিন সংগীতশিল্পীর (কেন্দ্রে) সঙ্গে জাহানারা ইমাম, সেলিনা বাহার জামান, গেইল মিনো, বেবী ও আনোয়ারা বাহার চৌধুরী (১৯৬৩/১৯৬৪)



শুচি (১৯৬৯)



শহীদ মিনারে দু-বছর বয়সী রুচি ফুল দিচ্ছে : আজাদে প্রকাশিত ছবি (১৯৬৬)

এনট্রান্স পরীক্ষা দিতে না পেরে আবদুর রহিম লেখালিখির জগতে প্রবেশের জন্যে নিজেকে তৈরি করতে থাকেন। কলকাতায় তিনি যাঁদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন তাঁর আত্মীয়, ডভ্টন ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের আরবি ও ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক মেয়ারাজউদ্দীন আহমদ। তাঁর সাহায্য নিয়ে তিনি হজরত মুহম্মদের জীবনচরিত রচনার উদ্‌যোগ নেন। একই সময়ে—হয়তো তাঁরই দৌত্যে—কলকাতা মাদ্‌রাসার সংস্কৃত ও বাংলাভাষার অধ্যাপক পণ্ডিত রেয়াজ-অল-দীন আহমদ মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১৯) এবং কয়েকটি স্বল্পায়ু পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিক (পরবর্তীকালে *ইসলাম-প্রচারক*-সম্পাদক) মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের (১৮৬২-১৯৩৩) সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। সে-সময়ে কোনো কোনো মুসলমান দীক্ষা নিচ্ছিলেন খ্রিষ্টান ও ব্রাহ্মধর্মে। এই সংবাদে উদ্‌বিগ্ন হয়ে তাঁরা ইসলামের মর্মবাণী সংকলন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সংকল্প করেন। এর ফল দু খণ্ড *এসলাম-তত্ত্ব* (১৮৮৮ ও ১৮৮৯)। বইতে লেখক হিসেবে কারো নাম ছিল না, তবে বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় প্রথম খণ্ডের রচয়িতারূপে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের এবং দ্বিতীয় খণ্ডের রচয়িতারূপে রেয়াজউদ্দীন [রেয়াজ-অল-দীন] আহমদ ও শেখ আবদুর রহিমের নাম আছে। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৮৮৯) লেখক ও স্বত্বাধিকারী হিসেবেও সেখানে মোহাম্মদ রেয়াজুদীন আহমদ ও শেখ আবদুর রহিমের নাম পাওয়া যায়। বইটি মৌলিক রচনা নয়। প্রথম খণ্ড হলো জামালউদ্‌দীন আফগানির *নেচার ও নেচারিয়ার* এবং দ্বিতীয় খণ্ড আবদুল হক হাক্কানীর *তফসিরে হাক্কানীর* উপক্রমণিকাভাগের অনুবাদ।

১৮৮৮ সালে আবদুর রহিমের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ *হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্ম্মনীতি* প্রকাশিত হয়। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম নবীজীবনী রচনা করেন। চার শতাধিক পৃষ্ঠার এই বইতে তাঁর ব্যাপক পাঠ এবং যথেষ্ট কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় আছে। বইটির বেশ কয়েকটি সংস্করণ হয়েছিল। প্রতি সংস্করণেই তিনি পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছেন। তাঁর যুক্তিবাদী মনের বিশেষ প্রকাশ দেখা যায় তৃতীয় সংস্করণে। প্রথম দু সংস্করণে 'বিবাহ রাত্রেই আমেনা খাতুনের গর্ভসঞ্চারের' কথা বলা হয়েছিল; তিন মাস বয়সে হজরত সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতেন, সাত মাস বয়সে দৌড়োদৌড়ি করতেন, আট মাসে কথা বলতে পারতেন, নয় মাসে পরিষ্কার সারগর্ভ বাক্য বলতেন—এসব কথা তৃতীয় সংস্করণে পরিত্যক্ত হয়। হজরতের আগমনে বিবি হালিমার গৃহে যেসব বৈষয়িক উন্নতি হয়েছিল বলে কিংবদন্তি আছে, তিনি বলেছেন, তার অনুকূলে কোনো বিশ্বাসযোগ্য হাদিস নেই। জন্মমাত্র হজরতের স্কন্ধে যে 'মোহর-নবুয়ত' বা প্রেরিত পুরুষের অভিজ্ঞান দেখা গিয়েছিল, তাঁর মতে, এটি ছিল বর্ধিত মাংসপিণ্ড। হজরতের বক্ষ-বিদারণকে তিনি বলেছেন রূপক বর্ণনা, কেননা 'ইহা প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।' মেরাজকে তিনি বাস্তবিক বলে গ্রহণ না করে 'ঘুম ও জাগ্রতের মধ্য অবস্থায় অর্থাৎ 'যোগাবেশ' অবস্থায়' ভ্রমণ বলে অভিহিত করেছেন। যিশুকে তিনি মানবপুত্র বলেছেন এবং সুফি সাধনপ্রণালির আদর্শ ব্যাখ্যা করেও তাকে ইসলাম-অনুমোদিত নয় বলে মতপ্রকাশ করেছেন। এসব অনেক কথা আজকের দিনেও বলা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

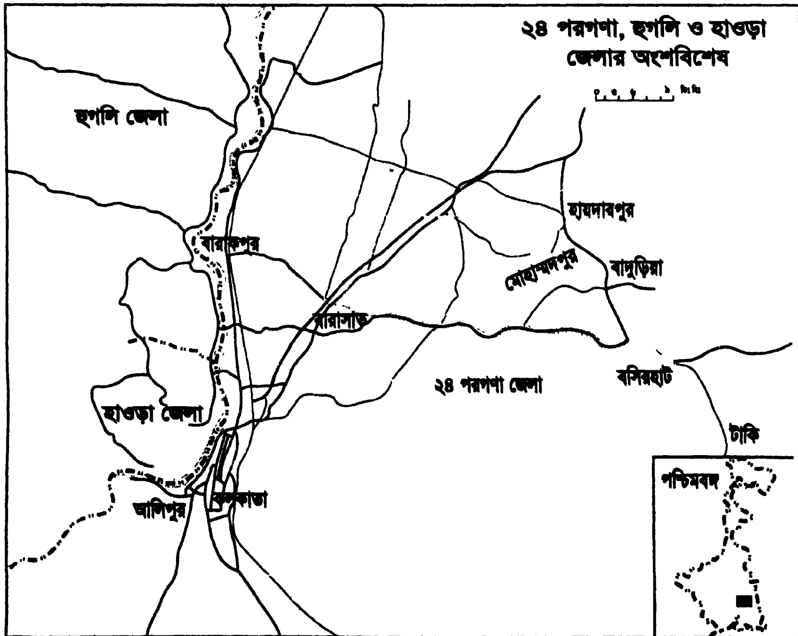
বঙ্গদেশ ১৯৪৭

০ ২৫ ৫০ ১০০কিঃমিঃ

উঃ

সূচক
বঙ্গ সীমানা
পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গ সীমানা
জেলা সদর

নেপাল
জলপাইগুড়ি
আসাম
দিনাজপুর
মেঘালয়
বিহার
রাজশাহী
পূর্ব বঙ্গ
মুর্শিদাবাদ
কুষ্টিয়া
পশ্চিম বঙ্গ
ঢাকা
নদীয়া
যশোহর
হুগলি
হাওড়া
কলকাতা
সাতক্ষীরা
২৪ পরগনা
উড়িষ্যা
ব্রহ্মদেশ
বঙ্গোপসাগর



প্রথম সংস্করণেই তিনি বইটি সম্পর্কে কলকাতা মাদ্‌রাসার কয়েকজন আলেমের উর্দুতে লেখা মতামত সন্নিবেশ করেছিলেন। তৃতীয় সংস্করণে নবাব খাজা সলিমুল্লাহ্, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ও খান বাহাদুর মুহম্মদ ইবরাহীমের ইংরেজিতে লেখা অভিমত এবং ফুরফুরার পীর আবুবকরের বাংলায় লেখা প্রশংসাপত্র যুক্ত হয়।

১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে হাইকোর্টের উকিল খান বাহাদুর (পরে নবাব) সিরাজুল ইসলামের অর্থানুকূল্যে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ ও আবদুর রহিম মিলে সাপ্তাহিক *সুধাকর* প্রকাশ করেন। প্রথমে এর সম্পাদক ছিলেন রেয়াজউদ্দীন, পরে সে-দায়িত্ব লাভ করেন আবদুর রহিম। শেষদিকে আইনজীবী (পরে নবাব সার্) সৈয়দ শামসুল হুদা অর্থসাহায্য করেছিলেন। ১৮৯১ সালে *সুধাকর* বন্ধ হয়ে যায় বলে মনে হয়।

খুব সম্ভব ১৮৮৯ সালে আবদুর রহিম বসিরহাটের শেখ আবদুল্লাহ্‌র কন্যা জারিয়া খাতুনকে বিয়ে করেন। বিয়ের সময়ে পাত্রের বয়স ছিল তিরিশ, পাত্রীর দশ। আমার দাদির পিতামহ শেখ বজলুর রহমান টালিগঞ্জে মহীশূর-পরিবারে (টিপু সুলতানের বংশধরদের) গৃহশিক্ষক ছিলেন।

আমার দাদির মাতৃকুল এবং আমার মায়ের পিতৃকুল ছিল এক।

২.

আমাদের পরিবার যেমন দেশজ, আমার মায়ের পরিবার তেমনি বহিরাগত। তাঁদের একটি প্রাচীন কুরসিনামা আছে বলে শুনেছি, যদিও আমি কখনো তা দেখি নি। তবে তার থেকে ইংরেজি ও বাংলায় তৈরি করা বংশলতিকার একাধিক খণ্ডাংশ আমার গোচরে এসেছে। এর থেকে জানা যায় যে, তাঁদের পূর্বপুরুষ সৈয়দ মোহাম্মদ মিন্‌হা বাগদাদ থেকে বাংলায় আসেন সুলতান হোসেন শাহ্‌র রাজত্বকালে (১৪৯৩-১৫১৯) এবং বসিরহাটে বসতি স্থাপন করেন। বসিরহাটে যে তার আগেই বহিরাগত মুসলমানেরা পৌঁছে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৪৬৬ খ্রিষ্টাব্দে শাহী মসজিদের প্রতিষ্ঠায়—এ সম্পর্কে আগেই বলেছি। সৈয়দ মোহাম্মদ মিন্‌হার পরিবার বংশপরম্পরায় এই মসজিদটি দেখাশোনা করতেন বলে জানা যায়। প্রতিষ্ঠাতার নাম সামান্য পরিবর্তিত হয়ে এই পরিবারটি মীনা পরিবার নামে খ্যাত ছিল, আবার মীর-পরিবার নামেও পরিচিত ছিল। মনে হয়, প্রথমদিকে পারিবারিক উপাধি হিসেবে তাঁরা মীর ব্যবহার করতেন, পরে কখনো সৈয়দ লেখার প্রচলন হয়। এমনটি অস্বাভাবিক ছিল না। ষোড়শ শতাব্দীর চট্টগ্রামের বিখ্যাত কবি সৈয়দ সুলতান একই সঙ্গে মীর ও সৈয়দ উপাধি ধারণ করতেন। উনিশ শতকে চব্বিশ পরগনার সন্তান তিতুমীরের পরিবারেও একই সঙ্গে মীর ও সৈয়দ উপাধির ব্যবহার ছিল।

সৈয়দ মোহাম্মদ মিন্‌হার অধস্তন পুরুষ সৈয়দ খুররম আলীর ছিল সাত ছেলে ও এক মেয়ে। এই সাত ভাই চম্পার একজন ছিলেন আমার মায়ের দাদা এবং আরেকজন আমার মায়ের নানা।

সৈয়দ খুররম আলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ ফতেহ্ আলীর ছিল এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলে সৈয়দ ওসমান আলী এফ এ পর্যন্ত পড়েছিলেন এবং কিছুকাল *মিহির* ও *সুধাকর* পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর একমাত্র বোনের বিয়ে হয়েছিল বসিরহাটের শেখ আবদুল্লাহ্‌র সঙ্গে। এঁরাই আমার দাদার শ্বশুর-শাশুড়ি। সৈয়দ ওসমান আলী ও আমার নানা সৈয়দ আশরাফ আলী ছিলেন আপন চাচাতো ভাই। সেই হিসেবে আমার দাদি ছিলেন আমার মায়ের ফুফাতো বোন। সৈয়দ ওসমান আলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ মোকাররম আলীকে তাই আমার আব্বা এবং আমরা সব ভাইবোন মামু বলে সম্বোধন করতাম।

সৈয়দ মোকাররম আলীর কথা একটু বলে নিই। বি এ ও বি টি পাশ করে তিনি ইংরেজ আমলে বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করেন এবং পাকিস্তান আমলের গোড়ায় স্কুল ইনস্পেক্টর হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। *নারীর ধর্ম* (১৯৪২) নামে তাঁর একটি উপন্যাস সেকালে সুপরিচিত হয়েছিল। আমার দাদাই বইটি ছাপার ব্যবস্থা করে দেন। সুধাকর লাইব্রেরির পক্ষে এর প্রকাশক ছিলেন আমার মেজো চাচা এবং প্রকাশকের ঠিকানা ছিল দাদার তৎকালীন বাসস্থান কলকাতার এন্টনীবাগান লেন। তারও আগে একটি ফরাসি গল্প-অবলম্বনে লেখা সৈয়দ মোকাররম আলীর ছোটগল্প 'প্রতীক্ষা' প্রকাশিত হয় *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* (কার্তিক ১৩২৫)। ১৯২৬ সালে বসিরহাটে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনীর তিনি ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। দাদার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তিনি *সওগাতে* (ভাদ্র ১৩৩৮) তাঁর জীবনী লেখেন এবং পরে মাসিক *মিনার* পত্রিকায় তা পুনর্মুদ্রিত হয়। নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর মৃত্যুতেও তিনি *মাসিক মোহাম্মদীতে* (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬) তাঁর জীবনী লিখেছিলেন। তাঁর অনুজ সৈয়দ মোয়াজ্জম আলীর কথা পরে বলবো।

সৈয়দ খুররম আলীর চতুর্থ পুত্র সৈয়দ সাদেক আলীর পাঁচ ছেলে ও এক মেয়ে। জ্যেষ্ঠ সৈয়দ আশরাফ আলী আমার নানা। তিনি চাকরি করতেন আলিপুর আদালতে। ঠিক কী চাকরি, জানা নেই, হয়তো শেরেস্তাদার ছিলেন। তাঁর অনুজেরা ছিলেন : সৈয়দ বশারত আলী, সৈয়দ জাকের আলী, সৈয়দ শরাফত আলী ও সৈয়দ আবেদ আলী। এঁদের একমাত্র বোনের নাম কী ছিল, জানিনে; তাঁকে আমরা ফুফুনানি বলে (মায়ের ফুফু হিসেবে) উল্লেখ করতাম।

সৈয়দ খুররম আলীর পঞ্চম পুত্র সৈয়দ মোবারক আলী পাটনায় পুলিশ ইনস্পেক্টর ছিলেন। তাঁর চার ছেলে ও এক মেয়ে : সৈয়দ হায়দার আলী (ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার), সৈয়দ মেহদী আলী, সৈয়দ মনজুর আলী, সৈয়দ আবু ইবরাহীম এবং আমার নানি উম্মাতুল বতুল। নানির নামটি বোধহয় ছিল আমাতুল বতুল, মুখে মুখে রূপান্তরিত হয়ে তা উম্মাতুল বতুলে পরিণত হয়েছিল। তবে তিনি বতুল বিবি বলেই তাঁদের বৃহৎ পরিবারে পরিচিত ছিলেন।

আমার নানা-নানির পাঁচ ছেলেমেয়ে। সবার বড় মরিয়ম শৈশবে মারা যান। তারপর আমার একমাত্র মামা সৈয়দ তাহের আলী (জন্ম আনুমানিক ১৯০০)। তারপর তিন বোন : আসমা খাতুন (জ. ১৯০২), রাবেয়া খাতুন (জ. ১৯০৬) ও সৈয়দা খাতুন (জ. ১৯১২)। আমার মায়ের নাম আসলে সাইদা খাতুন; তা উচ্চারিত হতো সঈদা

খাতুন, তার আগে আবার সৈয়দা থাকায় এক ধরনের জটিলতা দেখা দেয়। হয়তো এসব কারণে সে নাম লিখতো সৈয়দা খাতুন।

৩.

আদালতে জেরার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের বর্ণপরিচয় জানতে চাইলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন : ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ। হলফ করে বললে আমার দাদা শেখ আবদুর রহিমকে বলতে হতো : ঘোরতম কৃষ্ণবর্ণ। আগে তাঁর বিয়ের খবর দিয়েছি, তবে সেটাই সবটুকু সংবাদ নয়। বিয়ের দিনে জামাই (কন্যার স্বামী) দেখে তাঁর শাশুড়ির মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায়। আমার দাদি একে ফরসা ছিলেন—প্রায় গোলাপি ছিল তাঁর রঙ, আর দাদার সঙ্গে তাঁর বয়সের ব্যবধান ছিল কুড়ি বছরের। যথারীতি বিয়ে হয়ে গেলেও শাশুড়ির আপত্তির কারণে দাদা নবপরিণীতাকে নিয়ে ঘরে ফিরতে পারেন নি। মেয়ে এখনো ছোটো এবং জামাইয়ের আয়ের স্থিরতা নেই, এ দুই অজুহাত দেখিয়ে দাদিকে পিত্রালয়ে রেখে দেওয়া হয়। প্রথাগত পরিবারেও যে কখনো কখনো নারীর কথার খুব মূল্য দেওয়া হতো, এ থেকে তা বোঝা যায়। বিয়ের প্রায় ছ বছর পরে দাদিকে সংসারে আনতে দাদা সমর্থ হয়েছিলেন। মনে হয়, এই ব্যবস্থাকে তিনি মেনে নিয়েছিলেন—তা প্রসন্নচিত্তে হোক বা না হোক।

এ কয় বছরে পত্রিকা-সম্পাদনা ও গ্রন্থ-রচনা নিয়ে আবদুর রহিম যথেষ্ট ব্যস্ত ছিলেন। তিনি মূলত বাস করতেন কলকাতায়—প্রথমে ৪ সীতারাম ঘোষের স্ট্রিটে (যেখানে মুনীন্দ্রমোহন বসুর মিলন-যন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল), পরে করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর সৌজন্যে তাঁর আপার সার্কুলার রোডের (এখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) বাড়িতে। ১৮৯২ সালের জানুয়ারিতে আবদুর রহিম প্রকাশ করেন 'বিবিধ বিষয়িনী মাসিক পত্রিকা' *মিহির*। বাঙালি মুসলমান-পরিচালিত সাহিত্যপত্রিকার মধ্যে *মিহিরই* প্রথম একটি বিশিষ্ট চরিত্রের অধিকারী হয়েছিল। তাই *হিতবাদী* লক্ষ্য করেছিলেন, 'ভাষার লালিত্য ও প্রাঞ্জলতা এই পত্রিকার নূতনত্ব' আর *সময়* লিখেছিলেন, 'মিহিরের লেখা অতি সরল এবং সুমিষ্ট ও সতেজ'। আবদুল কাদিরের মতে, এই পত্রিকায় প্রকাশিত ডাক্তার হবিবর রহমানের 'চন্দ্রশেখরে দলনী বেগম' বাঙালি মুসলমানের লেখা সাহিত্যবিচারমূলক প্রথম প্রবন্ধ। আবদুর রহিম নিজে এতে লিখেছিলেন ওয়াশিংটন আরভিংয়ের *The Alhamra*-অবলম্বনে 'প্রণয়-যাত্রী' (পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) ও 'আলহামরা', আর 'পুরাতত্ত্ব' নাম দিয়ে ধারাবাহিকভাবে কিছু স্থানের ইতিহাস। আড়াই বছর চলার পরে *মিহির* বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৯২ সালের শেষেই আবদুর রহিম *হাফেজ* নামে একটি ক্ষীণকলেবর স্বল্পায়ু পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন।

১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে আবদুর রহিমের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক *মিহির* ও *সুধাকর* প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদকীয় দপ্তর ছিল ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর পূর্বোক্ত বাড়িতে। তা থেকে মনে হয়, এই পত্রিকা তাঁর অর্থানুকূল্য লাভ করেছিল। বাঙালি মুসলমানের

স্বতন্ত্র স্বার্থরক্ষায় *মিহির* ও *সুধাকরের* সক্রিয় ভূমিকা ছিল। মনে করা হয় যে, সেই কারণেই কিছুকাল পর ভারত-মিহির যন্ত্র এটি মুদ্রণ করতে অস্বীকার করে। পত্রিকাটি টিকিয়ে রাখার জন্য আবদুর রহিম তখন বিত্তশালী মুসলিম সমাজনেতাদের শরণাপন্ন হন। ঢাকার নবাব খাজা সলিমুল্লাহ্ এককালীন পঁচিশ হাজার টাকা দান করেন—তা দিয়ে একটি ছাপাখানার সামগ্রী ক্রয় করা হয়। বগুড়ার নবাব আবদুস সোবহান চৌধুরী তাঁর মেটকাফ স্ট্রিটের বাড়িতে প্রেসটি স্থাপন করার অনুমতি দেন এবং তখন *মিহির* ও *সুধাকরের* কার্যালয়ও সেখানে স্থানান্তরিত হয়। পত্রিকা-তত্ত্বাবধানের অনেকখানি দায়িত্ব গ্রহণ করেন ধনবাড়ির নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী।

মিহির ও *সুধাকরের* সম্পাদকরূপে আবদুর রহিম খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করার পরেই, মনে হয়, স্ত্রীকে স্বগৃহে নিয়ে আসতে পারেন। আমার দাদি প্রথমদিকে কলকাতায় থেকেছেন বেশি, মোহাম্মদপুরে কাটিয়েছেন কিছু সময়। পরের দিকে এই ব্যবস্থা বদলে গিয়েছিল। তবে তাঁদের প্রথম সন্তানের—আমার আব্বার—জন্ম হয় দাদির মাতুলালয়ে অর্থাৎ বসিরহাটে—১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ২১ জুলাই, ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ৫ শ্রাবণে।

দাদা প্রথম সন্তানের নাম রেখেছিলেন আব্‌জদ প্রণালিতে। এখন অনেকেই হয়তো এই রীতির সঙ্গে পরিচিত নন, তাই এর একটু ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। আরবি বর্ণমালার প্রত্যেক বর্ণের একটা সংখ্যাগত মূল্য নিরূপণ করা আছে (রোমান বর্ণে যেমন আই এক, ভি পাঁচ, এক্স দশ, এল ৫০, সি ১০০, ডি ৫০০, এম ১০০০)। আরবির প্রথম নয় বর্ণ একক (১-৯), দশম থেকে অষ্টাদশ বর্ণ দশক (১০-৯০), উনবিংশ থেকে সপ্তবিংশ বর্ণ শতক (১০০-৯০০) এবং অষ্টাবিংশ বর্ণ সহস্র (বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও অষ্টম বর্ণের মূল্যে পার্থক্য ঘটে) গণ্য হয়। 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম'-এ শুরুর বে-র জন্যে দুই এবং শেষ মিমের জন্যে ৪০ গণনা করে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৮৬। এজন্যে চিঠিপত্রে কী পরীক্ষার খাতার সূচনায়, 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' পুরোটা না লিখে ৭৮৬ লেখার রেওয়াজ আছে। জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদির সন-তারিখ জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এই রীতির ব্যবহার অতি প্রাচীন।

আব্বার নাম রাখা হয় আবু তাহের মোহাম্মদ মোয়াজ্জম। বর্ণের সংখ্যা হিসাব করলে এ থেকে তাঁর জন্মের তারিখ পাওয়া যায়। দু বছর পর আমার মেজো চাচার জন্ম হলে আব্বার নামের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে তাঁর নামকরণ হয় আবু জাবের মোহাম্মদ আজম। আমার সকল চাচা-ফুফুরা দু বছরের ব্যবধানে জন্মেছেন। মেজো চাচার পর আমার দুই ফুফু খায়রুননেসা ও ফখরুননেসা। তারপর সেজো চাচা আবুল কাসেম মোহাম্মদ নাজম। তারপর আবার দুই ফুফু শামসুননেসা ও বদরুননেসা। সবশেষে ছোটো চাচা। তাঁর নাম আবদুল কাদের পর্যন্ত রাখা হয়েছিল। অল্প বয়সে রোগাক্রান্ত হলে তাঁর মানসিক জড়তা দেখা দেয়, কথায়ও অস্পষ্টতা আসে। পরিবারে আমার আব্বাকে আবু তাহের বলে (কখনোই তাহের বা মোয়াজ্জম বলে নয়) এবং চাচাদের যথাক্রমে আবু জাবের, আবুল কাসেম ও আবদুল কাদের বলে ডাকা হতো। আব্বার নাম রাখার সময়েই বংশগত শেখ পরিচয় বাদ পড়েছিল, চাচাদের কারো নামেই দাদা

আর তা যোগ করেন নি। তবে আমার সেজো চাচা, কেন জানি না, সম্পূর্ণ নাম ব্যবহার না করে লিখতেন সেখ আবুল কাসেম।

৪.

শেখ আবদুর রহিমের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক *মিহির* ও *সুধাকর* চলছে খুব ভালো। বস্তুত তা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাঙালি মুসলমান সমাজের একমাত্র মুখপত্র। ভাষা-সমস্যার কথা লিখছেন সম্পাদক; বলছেন, পাঁচটি ভাষা শিক্ষা না করলে বাঙালি মুসলমানের চলে না : আরবি, ফারসি, উর্দু, ইংরেজি ও বাংলা। এ কী সহজসাধ্য ব্যাপার! সরকারি কাজকর্মে মুসলমানের ন্যায্য ভাগ চায় *মিহির* ও *সুধাকর*। কর্তৃপক্ষ বোধহয় বলেছিলেন, যোগ্য প্রার্থীর অভাব। *মিহির* ও *সুধাকর* অনুরোধ করলো, কৃতবিদ্য মুসলমানেরা যেন নামধাম ও শিক্ষার বিবরণ দিয়ে পাঠান পত্রিকা-অফিসে; পত্রিকা তা সংকলন করে পাঠাবে সরকারের কাছে। তারপর দেখা যাবে, সরকারের কী বলার আছে। পাশাপাশি ইংরেজ-শাসনের স্তুতিও করা হয় প্রকারান্তরে। সরকারকে তুষ্ট করে যদি স্বসম্প্রদায়ের মানুষের স্বার্থোদ্ধার করা যায়—সেটাই, মনে হয়, লক্ষ্য।

কিন্তু শুধু সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে আরাম পাচ্ছেন না আবদুর রহিম। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারিতে তাই বের করলেন *হাফেজ* নামে একটা মাসিকপত্র। উদ্দেশ্য, 'ভোগবিলাসসুখাভিলাষী নিদ্রিত বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অতীত গৌরব ও ধর্ম্মভক্তি কাহিনী এবং পবিত্র ধর্ম্মের রীতিনীতি শুনাইয়া জাগরিত' করা। তাই মুসলমান ভ্রাতাদের কাছে অনুরোধ, 'সকলে মিলিয়া সামাজিক কার্য্য মনে করিয়া হাফেজের উন্নতিসাধনে যত্নবান হইবেন।' কিন্তু সে-অনুরোধ রক্ষিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। দু মাস চলার পর *হাফেজ* বন্ধ হয়ে যায়।

হাফেজ পত্রিকায় 'বাঙ্গালার মুসলমান' নাম দিয়ে ফজলে রব্বি খান বাহাদুরের *হকিকতে মুসলমানানে বাঙ্গালা* বইটির আংশিক অনুবাদ করেছিলেন আবদুর রহিম, আর লিখেছিলেন, 'ইসলামে পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য কর্ম্ম' (পরবর্তীকালে এরই পরিবর্ধিত রূপ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় *কোরআন ও হাদিসের* উপদেশাবলী নামে)। মোজাম্মেল হক ধারাবাহিকভাবে লিখতে শুরু করেন *শাহনামা* এবং 'অপূর্ব্ব ধর্ম্মজীবন লাভ' (পরে প্রথমটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং অপরটির ধরনে লেখেন *তাপস-জীবনী*)। তবে আমার কাছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত সেখ ওসমান আলি বি এল-রচিত 'কংগ্রেস ও মুসলমান জাতি' প্রবন্ধ। ওসমান আলি ছিলেন মুনসেফ, এ-প্রবন্ধে বাঙালি মুসলমানকে তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন কংগ্রেসে যোগ দিতে।

এমন প্রবন্ধ যিনি নিজের পত্রিকায় ছাপলেন, কিছুকালের মধ্যেই তিনি প্রবলভাবে কংগ্রেসবিরোধী এবং মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতির প্রবক্তারূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। তার একটা বড় অভিব্যক্তি দেখা যায় বঙ্গভঙ্গের সময়ে *মিহির* ও *সুধাকরের* ভূমিকায়। এই পত্রিকার সেই সময়কার দু-একটার বেশি সংখ্যা দেখার সুযোগ আমার

হয় নি, কিন্তু পরোক্ষ সূত্রে এ-সম্পর্কে খানিকটা জানা গেছে। 'রিপোর্ট অন দি নেটিভ পেপার্স ইন বেঙ্গল' নাম দিয়ে বঙ্গীয় সরকার বাংলা পত্রিকার প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয় মন্তব্যের ইংরেজি সারাংশ প্রস্তুত করতেন। এর ভিত্তিতে প্রথমে হরিদাস মুখার্জি ও উমা মুখার্জি *ইন্ডিয়া'জ ফাইট ফর ফ্রিডম অর দি স্বদেশী মুভমেন্ট, ১৯০৫-১৯০৬* (কলকাতা, ১৯৫৮) এবং পরে সুমিত সরকার *দি স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, ১৯০৩-১৯০৮* (নয়াদিল্লি, ১৯৭৩) গ্রন্থে ওই পত্রিকার নানা বক্তব্যের উল্লেখ করেছেন। তা থেকে জানা যায় যে, ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লর্ড কার্জন যখন প্রথমে স্বতন্ত্র পূর্ববঙ্গ প্রদেশের ধারণা ব্যক্ত করেন (তার মাত্র কয়েকদিন আগে ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহ্‌র উদ্‌যোগে শতখানেকের কম ব্যক্তির একটি সভায় নতুন প্রদেশ দাবি করা হয়েছিল), তখন সঙ্গে সঙ্গেই *মিহির* ও *সুধাকর* তাকে স্বাগত জানায় (সম্ভবত এটিই প্রথম পত্রিকা যা এমন করেছিল)। হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের হাত থেকে প্রজা ও খাতকদের রক্ষা করার লক্ষ্যে পত্রিকাটি যেমন সুদসংক্রান্ত আইনের সংস্কার এবং ঋণদান সমিতি গঠনের প্রস্তাব করে, তেমনি আবার স্থানীয় পরিষদে আনুপাতিক হারে মুসলিম প্রতিনিধিত্বও দাবি করে। বঙ্গভঙ্গের বিরোধী মুসলমান নেতাদের এক পর্যায়ে এ পত্রিকা বেতনভোগী, ভাড়াটে ও ভণ্ড বলে অভিহিত করে। তবে সে-পর্যায়ে আবদুর রহিম আর এর সম্পাদক ছিলেন কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।

মিহির ও *সুধাকরের* সহায়তাকারী নবাব আবদুস সোবহান চৌধুরী বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে ছিলেন বলে জানা যায়, কিন্তু এর পৃষ্ঠপোষক নবাব সলিমুল্লাহ্‌ এবং তত্ত্বাবধায়ক নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন বঙ্গভঙ্গের সমর্থকদের নেতা। এঁদের দুজনের ভূমিকা আর পত্রিকার ভূমিকায় কোনো পার্থক্য ছিল না। তবু কোনো অজ্ঞাত কারণে নওয়াব আলী চৌধুরীর সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় আবদুর রহিম *মিহির* ও *সুধাকরের* সম্পাদকের দায়িত্ব ত্যাগ করেন। এ-বিষয়ে সৈয়দ মোকাররম আলী যা লিখেছেন (*সওগাত*, ভাদ্র ১৩৩৮), তা থেকে মনে হয়, *মিহির* ও *সুধাকর* থেকে আবদুর রহিম পদচ্যুত হন ১৯০৫ সালে এবং তারপর পত্রিকাটি আর বেশিদিন দিনের আলোর মুখ দেখে নি। আমার আব্বাও লিখেছেন (*মাহে নও*, অক্টোবর ১৯৫৫) যে, ১৯০৫ সালে শেখ আবদুর রহিম *মিহির ও সুধাকর* ছেড়ে দেন এবং তারপর তাঁর আত্মীয় [মামাশ্বশুর] সৈয়দ ওসমান আলীর সম্পাদনায় তা বছরখানেক চলে। অথচ সরকারি সূত্র উদ্‌ধৃত করে সুমিত সরকার দেখিয়েছেন যে, ১৯০৮ সালে *মিহির* ও *সুধাকরের* প্রচারসংখ্যা ছিল চার হাজার (আর মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী-সম্পাদিত সাপ্তাহিক *সোলতানের* প্রচারসংখ্যা ছিল দেড় হাজার এবং মৌলভি মুজিবর রহমান-সম্পাদিত *দি মুসলমানের* ছিল পাঁচ শ)। মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদের *পাক পাঞ্জতন* (কলকাতা, ১৩৩৬) বইয়ের ভূমিকায় সংকলিত 'গ্রন্থকারের আত্ম-পরিচয় ও আত্ম-নিবেদনে' বলা হয়েছে যে, ১৩১৫ সালে তিনি *মিহির* ও *সুধাকরের* সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং তার কিছুকাল পরে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং হয় ১৯০৫ সালে আবদুর রহিমের *মিহির* ও *সুধাকরের* সম্পাদকপদ ত্যাগ বা পদচ্যুতির পর পত্রিকাটি অনেকদিন চলেছিল, নয়তো

তিনি ১৯০৭ সালের আগে এর সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হন নি এবং পত্রিকাটি ১৯০৮-৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েছিল। তাহলেই 'ইহার অল্পকাল পরে' *মোসলেম-হিতৈষী* প্রকাশের প্রসঙ্গটি যথাযথ হয়, কেননা তা ১৯১১ সালে আত্মপ্রকাশ করে।

মোসলেম-হিতৈষীর সূচনা সম্পর্কে *মাওলানা-পরিচয়* (কলকাতা, ১৩২১) বইতে মোজাম্মেল হক লিখেছেন :

> 'মিহির ও সুধাকর' বন্ধ হওয়ার পর বঙ্গীয় মোসলেম-সমাজে জাতীয় সংবাদপত্রের অভাব হইয়া পড়ে, এবং তদ্ধেতু জাতীয় অভাব-অভিযোগ বা অপর কোনও সামাজিক কথা সদাশয় গভর্ণমেন্টের গোচর করিয়া প্রতীকার-প্রার্থনা এবং সমাজের সহানুভূতি লাভ করিবার উপায় ছিল না।... অবশেষে সেই দারুণ অভাবের কথা জনাব মাওলানা [ফুরফুরার পীর আবুবকর] সাহেবের কর্ণগোচর করা হয় এবং তাঁহারই পরামর্শে সমাজহিতৈষী মাননীয় মৌলভী ওয়াহেদ হোসেন বি, এল, উকিল সাহেব, সৎসাহিত্যিক মুন্‌শী শেখ আবদুর রহিম ও অপরাপর কতিপয় সমাজসেবকদের প্রযত্নে ১৩১৭ সালের ৮ই মাঘ তারিখে কলিকাতার গ্রীয়ার পার্কে আঞ্জমনে ওয়ায়েজিনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। সেই সভায়... একখানি জাতীয় সংবাদপত্র প্রচার করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য স্থির করেন...। তিনি সহর্ষে সেই সঙ্কল্প অনুমোদন করেন ও তাহার পৃষ্ঠপোষকরূপে দণ্ডায়মান হইতে স্বীকৃত হয়েন। তাঁহার সেই সম্মতির ফল আমাদের জাতীয় সংবাদপত্র এই মোসলেম হিতৈষী।... তাঁহার পবিত্র নাম ললাটে স্থাপন করিয়া মোসলেম-হিতৈষী আজ সমাজের কুশল-সাধনে ব্যাপৃত আছেন।

এই সভায় সংগৃহীত অর্থ এবং অন্যত্র চাঁদা সংগ্রহ করে *মোসলেম-হিতৈষীর* মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয় ১৮ হ্যারিসন রোডে (এখন মহাত্মা গান্ধী রোড)। ১৯১১ সালে আবদুর রহিমের সম্পাদনায় এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশলাভ করে। *মিহির* ও *সুধাকরের* মতো *মোসলেম-হিতৈষী*ও বাঙালি মুসলমান সমাজের মুখপত্র হওয়ার গৌরব দাবি করতে পারতো। ১৯১৪ সালে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে *মোসলেম-হিতৈষীর* ছাপাখানা ও কার্যালয় সম্পূর্ণ দগ্ধীভূত হয়। অনেকের ধারণা, কোনো সুপরিকল্পিত চক্রান্তের ফলেই এ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল। এর ফলে, পত্রিকাটির প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। কিছুকাল পর মোল্লা আতাউল হক ও মোল্লা এনামুল হক নামে দুই ব্যবসায়ী ভ্রাতার অর্থানুকূল্যে খর্বকলেবরে *মোসলেম-হিতৈষী* পুনরায় প্রকাশিত হয়। তখন এর কার্যালয় হয় ৭ মহারানী স্বর্ণময়ী রোডে। খুব সম্ভব, ১৯২০ সাল পর্যন্ত এর প্রকাশ অব্যাহত থাকে।

সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকরূপে খ্যাত হওয়া সত্ত্বেও শেখ আবদুর রহিমের ঝোঁক ছিল মাসিক পত্রিকা প্রকাশের এবং কিছুকাল পরপরই তিনি তা করতেন। আফতাবউদ্দীন আহমদ নামে এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের টাকায় ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে ৩০ মুসলমানপাড়া লেন থেকে বের করেন *মোসলেম প্রতিভা*। আর কোথাও না হলেও *বেঙ্গল লাইব্রেরির* তালিকায় সম্পাদক হিসেবে তাঁর সঙ্গে নাম পাওয়া যাচ্ছে মোজাম্মেল হকের। যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায়-সংকলিত *সাহিত্যপঞ্জিকায়* (কলকাতা, ১৩২২) এ পত্রিকার বিষয়ে বলা হয়েছে যে, 'সূতিকাঘর

হইতে বাহির হইবার পর একমাসও জীবিত ছিল না।' আবার ১৯১৬ সালের জানুয়ারিতে আবদুর রহিমের সম্পাদনায় তাঁরই বাসস্থান ২১ এন্টনীবাগান লেন থেকে বের হয় *ইসলাম-দর্শন*। চার সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকাটি প্রায় এক বছর বন্ধ থাকে। তারপর আর দুটিমাত্র সংখ্যা প্রকাশের সংবাদ পাওয়া যায়।

৫.

দাদা ছিলেন কলকাতার সিটি স্কুলের ছাত্র। ব্রাহ্মদের পরিচালিত এবং ভালো স্কুল বলে এর খ্যাতি ছিল। আমার আব্বাকে—এবং পরে আমার মেজো চাচাকেও—ভর্তি করা হয় এই স্কুলেই। দাদার অবস্থা যখন ভালো থাকতো, তখন তাঁর পত্রিকার একজন পিয়ন বইখাতা বয়ে আব্বাকে—এবং পড়া শুরু করলে তাঁর ভাইকেও—স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এবং ফিরিয়ে নিয়ে আসতো। আব্বা বলেন, এই বিলাসিতা তাঁদের লেখাপড়ার পক্ষে মঙ্গলজনক হয় নি। কিন্তু দাদার অবস্থা তো সবসময়ে ভালো থাকতো না। সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হলে তাঁর সংসারে টানাটানি পড়ে যেতো। তবে সকল অবস্থায়ই তাঁর বাসস্থানে নানারকম মানুষের অবিরাম আসা-যাওয়া ছিল, তাছাড়া আত্মীয়স্বজনদের কেউ কেউ সেখানে থেকেই লেখাপড়া করতেন। এঁদের মধ্যে দুজন—সৈয়দ মোকাররম আলী ও কাজী মোহাম্মদ ফিরোজ—১৯১০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা প্রবর্তন করলে সেবারই তাতে উত্তীর্ণ হন।

অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করতে দাদি হিমশিম খেয়ে যেতেন। এত ভিড় তাঁর পছন্দ হতো না। কলকাতার পাকা বাড়ি, বৈদ্যুতিক বাতি ও কলের পানির সুবিধের চেয়ে মোহাম্মদপুরে পৈতৃক ভিটেয় দাদার তৈরি করা গোলপাতার ছাউনি-দেওয়া মাটির ঘর, হারিকেন ও মাটির প্রদীপ, পুকুরের পানি এবং গরুছাগল-হাঁসমুরগির সাহচর্য তাঁকে টানতো বেশি। অধিকাংশ সময়ে তিনি সেখানে কাটাতেন মেয়েদের এবং ছোটো ছেলেদের নিয়ে।-দাদা থাকতেন নিজের কাজে ব্যস্ত। সুতরাং আব্বাদের পড়াশোনা তদারক করার কেউ ছিল না এবং তাঁরা সে-স্বাধীনতা পুরোপুরি উপভোগ করতেন। ফলে আশ্চর্য নয় যে, আমার আব্বা ও চাচারা কেউ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন নি। মেজো চাচা গুরু ট্রেনিংয়ে উত্তীর্ণ হয়ে আমৃত্যু বসিরহাটে স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। সেজো চাচা একাধিকবার চেষ্টা করেও ম্যাট্রিকুলেশনের দোরগোড়া পার হতে না পেরে মোহাম্মদপুরে পাঠশালায় শিক্ষকতা করেছেন আজীবন। আর রোগাক্রান্ত ছোটো চাচার পড়াশোনার প্রশ্ন ওঠে নি।

আব্বা স্কুলে সংস্কৃত পড়েছিলেন, দাদার কাছে শিখেছিলেন কিছু ফারসি বয়েত। স্কুলের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে তিনি সুযোগ পেয়ে গেলেন ক্যালকাটা কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস নামে একটি বেসরকারি মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হওয়ার। দ্বিতীয় বছরে শব-ব্যবচ্ছেদের পালা শুরু হয়েছিল। একজন ডোম এসে প্রাথমিক আয়োজন করে দিয়ে চলে যেতো, তারপর ছাত্ররা কাটাছেঁড়া শুরু করতো। শবের দুর্গন্ধে আব্বা অত্যন্ত পীড়িত বোধ করতেন, আর হাতের নখাগ্রে প্রবিষ্ট গলিত নরমাংস

বার করতে তাঁকে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে হতো। এই গন্ধ দূর করতেই নাকি তিনি সিগারেট খাওয়া ধরেছিলেন। প্রথম প্রথম ডোমই তাঁকে সিগারেট ধরিয়ে দিতো। তাঁর মামা সৈয়দ মোকাররম আলী মৃত ব্যক্তির মাংস দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করায় আব্বা একদিন লুকিয়ে-চুরিয়ে গলিত নরমাংসের খানিকটা বাড়ি নিয়ে এসে তাঁর সামনে তুলে ধরেন। ওতেই মামার কৌতূহল সম্পূর্ণ দূর হয়, বরঞ্চ এ ধরনের জ্ঞানের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা জন্মায়।

দ্বিতীয় বছরের ক্লাস শেষ করার পরে খবর আসে যে, ওই মেডিক্যাল স্কুলটি কর্তৃপক্ষের যথাযথ স্বীকৃতি লাভ করে নি। ফলে সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। আব্বা স্থির করেন, তিনি হোমিওপ্যাথি পড়বেন। *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* (কলিকাতা, ১৯০৩) বইতে শিবনাথ শাস্ত্রী বঙ্গদেশে হোমিওপ্যাথি প্রচলনের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। উনিশ শতকের মধ্যভাগেই কয়েকজন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক এদেশে আসেন, তার মধ্যে কলকাতার প্রথম হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা ডা. টনিয়ার কলকাতা শহরের প্রথম হেল্‌থ অফিসার নিযুক্ত হন। ডা. বেরিনি এবং ডা. ইউনানও কলকাতায় প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ডা. ইউনান জার্মান হোমিওপ্যাথ হেরিংয়ের নামানুসারে হেরিং হোমিওপ্যাথিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। আব্বা সেখানে ভর্তি হন। দু বছর মেডিক্যাল স্কুলে পড়ার কারণে কিছু সুবিধে তিনি পেয়েছিলেন। ফলে, ১৯১৭ সালে তিনি ওই কলেজের চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

হোমিওপ্যাথ হয়ে আব্বা আমাদের মহকুমা শহর বসিরহাটে গিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করেন। হোমিওপ্যাথি পাশ করার পরে দাদার কাছ থেকে তিনি আর টাকাপয়সা নেন নি। বাকিতে আসবাবপত্র কিনে তিনি ভাড়াবাড়িতে ডাক্তারখানা খুলে বসলেন। তখন তাঁর পোশাক শার্ট ও ধুতি, বাহন সাইকেল। আব্বার প্রথম রোগী ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র জ্যেষ্ঠপুত্র আ ফ ম সফিয়্যুল্লাহ্‌। সদ্যোজাত পুত্রকে তোয়ালেতে জড়িয়ে আব্বার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন শহীদুল্লাহ্‌ এবং আব্বার চিকিৎসায় পুত্র নিরাময় হওয়ায় আব্বার প্রতি তাঁর বিশেষ আস্থা দেখা দিয়েছিল। মায়ের চাচাতো-খালাতো বোনদের একজন ছিলেন শহীদুল্লাহ্‌র ভ্রাতৃবধূ। আমার দাদার সঙ্গে শহীদুল্লাহ্‌র বিলক্ষণ পরিচয় ছিল এবং দাদাই নাকি তাঁকে প্রুফ দেখা শিখিয়েছিলেন।

আব্বার বয়স ততদিনে কুড়ি বছর পেরিয়ে গেছে। সংসার করার এটাই উপযুক্ত সময়। ১৯১৭ সালেই তিনি বিয়ে করলেন। তবে আমার মাকে নয়।

৬.

আব্বা প্রথমে বিয়ে করেন আমার বড়ো খালাকে। আব্বার বয়স তখন কুড়ি, খালার পনেরো। তাঁদের বিয়ের সাত বছরের মাথায় এক কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়ে খালা মারা যান ১৯২৪ সালে। খালা বোধহয় বেশ কিছুকাল অসুস্থ ছিলেন। কবি মোজাম্মেল হককে ২.৩.২২ তারিখে লেখা এক পত্রে দাদা লিখেছেন : 'আমার বাড়িতে সকলে

এখন একরূপ ভাল আছেন। তবে বৌমার শরীর ভাল নয়। তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হইয়াছিল, [বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ] প্রতাপ মজুমদারকে দেখাইয়া বাড়ী পাঠান হইয়াছে। আমি নিজে সুস্থ হইতে পারিতেছি না।'

যে-শিশুকন্যাটিকে রেখে খালা মারা গেলেন, তার নাম জেবুননেসা। তার একজন মায়ের প্রয়োজন, সে-বিষয়ে কারো সন্দেহ ছিল না। আমার নানিই উদ্‌যোগী হয়ে আমার আব্বার সঙ্গে মায়ের বিয়ে দিতে চাইলেন। নাতনির যাতে বিমাতার ঘরে অযত্ন না হয়, সেটিই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু একেই বোধহয় লোকে অদৃষ্ট বলে। মায়ের বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে যাওয়ার পরে, পাঁচ মাস বয়সে, জেবুননেসার মৃত্যু হলো। তার এক মাস পরে, ১৯২৫এর জানুয়ারিতে বিয়েটা হয়ে গেল। আব্বার বয়স তখন সাতাশ, মায়ের তেরো।

১৯১৭ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত, আব্বার প্রথম বিয়ে থেকে দ্বিতীয় বিয়ে অবধি, মায়েদের সংসারে অনেক কিছু ঘটে গেল। যেমন, আমার মেজো খালার বিয়ে। দাদার এক বন্ধুর ছেলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়, তবে এ-বিয়েতে দাদার কোনো ভূমিকা বোধহয় ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে যাঁর সঙ্গে খালার বিয়ে হয়, তিনি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। অনেক ক্ষেত্রে যেমন হয়, পাত্রের পরিবারে এমন ধারণা জন্মে যে, বিয়ে দিলে ছেলে ভালো হয়ে যাবে। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরেই সবাই টের পেলেন আমার সেই খালু সুস্থ নন। তাঁর ভালো হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা দিল না। তখন নানাই মেয়ের তালাক পাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। পরে খালার আবার বিয়ে হয় খুলনায়—কাজী জহুরুল হকের সঙ্গে। তাঁর প্রথম স্ত্রী আবার এক কন্যাসন্তান রেখে মারা যান, সুতরাং তিনিও পাত্রী খুঁজছিলেন। খালার বয়স তুলনায় কম হলেও তিনি তালাকপ্রাপ্তা বলে একটু বেশি বয়সের দোজবরে লোকের সঙ্গে বিয়ে দিতে নানা দ্বিধা করেন নি। খালুর বাড়ি ছিল যশোরে, তবে তিনি ছিলেন খুলনা আদালতে টাইপিস্ট।

দ্বিতীয় ঘটনা নানার মৃত্যু—আমার বড় খালার মৃত্যুর মাত্র ছ মাস আগে। নানার বয়স তখন চল্লিশের কিছু বেশি। আগে বলা হয় নি যে, তিনি এফ এ পাশ করেছিলেন। শুনেছি বি এ ক্লাসে ভর্তি হওয়ার পরে তিনি চাকরি নিয়েছিলেন।

তাঁর একমাত্র পুত্র, আমার মামা (আমরা বলি মামু) অল্পবয়স থেকে রুগ্‌ণ ছিলেন। সেইজন্যে তাঁর পড়াশোনা বেশিদূর এগোয় নি। তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন নি। বসিরহাটে তিনি স্ট্যাম্প ভেন্ডরের কাজ করতেন। তাঁরও বিয়ে হয় ১৯২৫ সালে—বছর চব্বিশ-পঁচিশ বয়সে—আমার মায়ের বিয়ের এক সপ্তাহ পরে। আমার মামি (আমাদের পারিবারিক পরিভাষায় মামানি) সৈয়দা মনোয়াবা খাতুনের বয়স তখন বোধহয় পনেরো। তিনি ছিলেন যশোর জেলার মির্জানগরের এক রক্ষণশীল জমিদার পরিবারের মেয়ে। তাঁর অগ্রজ সৈয়দ মজিদ বখ্‌শ সুপরিচিত আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে অনার্সসহ বি এ পাশ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির সম্পাদক। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি কারাবরণ করেন। তিনি একসময়ে ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং মতিলাল নেহরু স্বরাজ্য দলের নেতা নির্বাচিত হলে তিনি

উপনেতার পদ লাভ করেন। সৈয়দ মজিদ বখ্‌শ ছ বছর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য এবং সাত বছর কলকাতা কর্পোরেশনের কাউনসিলর ছিলেন। তাঁর কথা এত বিশদভাবে বললাম এই কারণে যে, তাঁর প্রভাব খুব গভীর ছিল তাঁদের পরিবারে। আমার মামি ও তাঁর বড়ো বোনেরা অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে বিলিতি পণ্য বর্জন করেন, চরকায় সুতো কাটেন, দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হন এবং সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেন। বিবাহপূর্ব জীবন সম্পর্কে মামির লেখা *স্মৃতির পাতা* (ঢাকা, ১৯৯২) ছোটো কিন্তু উপভোগ্য রচনা।

৭.

১৯২০ সালে দাদার সাংবাদিক-জীবনের একরকম ইতি হয়। তবে যেমন তার আগে তেমনি তার পরেও তিনি বইপত্র লিখতে থাকেন। তাঁর প্রণীত গ্রন্থের মধ্যে কেবল *হজরত মহম্মদের জীবনচরিত* ও *ধর্ম্মনীতির কথা* বলেছি। এছাড়া তিনি লেখেন *ধর্ম্মযুদ্ধ বা জেহাদ* (মোহাম্মদ মেয়ারাজউদ্দীনের সঙ্গে মিলে, ১৮৯০), *ইসলাম* (১৮৯৬), *নামাজ-তত্ত্ব বা নামাজ—বিষয়ক যুক্তিমালা* (১৮৯৮), *হজবিধি* (১৯০৩), *ইসলাম ইতিবৃত্ত* (১৯১০), *নামাজ শিক্ষা* (১৯১৭), *ইসলাম-নীতি*, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (১৯২৫), *রোজা-তত্ত্ব* (১৯২৬), *কোরআন ও হাদিসের উপদেশাবলী* (১৯২৬) ও *খোৎবা* (১৯৩২)। ওয়াশিংটন আরভিংয়ের *The Alhamra*-অবলম্বনে লিখেছিলেন দুটি উপন্যাসোপম রচনা : *আলহামরা* (১৮৯১) ও *প্রণয়-যাত্রী* (১৮৯২)। শেষ দুটি বই তাঁর সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সাহিত্যসৃষ্টির প্রচেষ্টা; এর মধ্যে প্রথমটি দুষ্প্রাপ্য, দ্বিতীয়টি মূলের সঙ্গে মিলিয়ে আমার মনে হয়েছে সার্থক রূপান্তর। তবে তাঁর লেখার মূল বিষয় ছিল ধর্ম ও ইতিহাস। পাশ্চাত্ত্য লেখকেরা ইসলামের রীতিনীতি ও শাসনপ্রণালির যে-বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন, তিনি তার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন; অন্যপক্ষে বৈজ্ঞানিক নিয়ম ও আবিষ্কারের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করেছিলেন ঐশীবাণী এবং ধর্মের অন্যান্য রীতিনীতিকে। এসব বই জনপ্রিয় হয়েছিল, কোনো কোনো বই স্কুল, মাদ্‌রাসা বা মক্তবের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছিল। সবগুলিরই একাধিক সংস্করণ হয়েছিল, অন্তত একটির অষ্টাবিংশতম সংস্করণ আমি দেখেছি। ধর্মবিশ্বাসের প্রাবল্য ও মুসলমানের কৃতিত্বে গৌরববোধ বিশেষভাবে এসব বইতে প্রকাশ পেয়েছে। তবে তাঁর প্রথম জীবনের যুক্তিনিষ্ঠা ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছিল। 'জাতীয় ইতিহাসে অভিজ্ঞতা না থাকিলে কোন জাতি স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিতে সক্ষম হয় না'—এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি লিখতে শুরু করেন *ইসলাম ইতিবৃত্ত*'—তার দু খণ্ডের বেশি অবশ্য প্রকাশিত হয় নি। মমতাজুর রহমান তরফদার দেখিয়েছেন (*শেখ আবদুর রহিম-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা ১৯৬৭তে সন্নিবেশিত *ইসলাম ইতিবৃত্তের* ভূমিকায়) যে, এ বইটি লেখা হয়েছিল ওয়াকিদীর *ফতহুশশাম*-অবলম্বনে। *ফতহুশশামে* ইতিহাসের ঘটনার বিবরণ আছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে কল্পকাহিনীর পরিমাণও কম নেই। সত্য ও কল্পনার এই পার্থক্য সম্পর্কে আবদুর রহিম

চিন্তিত হন নি। উপরে উল্লিখিত বইগুলির আরো কোনো কোনোটি পড়ে মনে হয়, অনেকক্ষেত্রে তিনি বাস্তব থেকে মুখ ফিরিয়েছেন এবং বিশ্বাস জয়ী হয়েছে যুক্তির ওপরে।

এটা অস্বাভাবিক নাও মনে হতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে বাঙালি মুসলমান সমাজে যে-মুক্তবুদ্ধির চর্চা শুরু হয়, তার প্রতি যে তিনি সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারেন নি, তা দুঃখের বিষয় বই কী! যে-বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির তিনি প্রথমে কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য এবং পরে সহ-সভাপতি ছিলেন, তারই *পত্রিকায়* (মাঘ, ১৩২৬) লেখা হয় :

> ১৯১৯ সালের ২৯শে নভেম্বর তারিখে [বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-] সমিতির সাধারণ সভার এক অধিবেশন হইয়াছিল।... আমাদের মনে পড়ে সভার সংবাদ প্রকাশ করিতে যাইয়া 'মোসলেম হিতৈষী' পত্রিকায় ভুল বিবরণ দেওয়া হইয়াছিল। আবুল হোসায়েন সাহেব তাঁহার প্রবন্ধের কোনও জায়গায় এমন কোন কথা বলেন নাই যে, 'কোরআন'-এর যে যে 'আয়াতে' সুদ নিষিদ্ধ সেই 'আয়েৎ'গুলির পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত। এমন কথা কোন মুসলমান বলিতে পারেন না। তিনি বলিয়াছিলেন উক্ত আয়েৎ অবতীর্ণ হওয়ার সময় যে রকম সুদের প্রথা প্রচলিত ছিল তাহাতে অধমর্ণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইত। অধমর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া উপকৃত হয় এইরূপ সুদ গ্রহণে আপত্তি করা উচিত নহে। 'মোসলেম হিতৈষী' পত্রিকার সম্পাদক মুনশী আবদুর রহিম সাহেব সভায় উপস্থিত থাকিয়াও যে কিরূপে এমন ভুল বিবরণ ছাপিলেন তাহা আমাদের ধারণার অতীত।

মিহির ও *সুধাকরে* থিয়েটারের সমালোচনা ছেপে যিনি একদিন রক্ষণশীলদের নিন্দাভাজন হয়েছিলেন, পরিণত বয়সে তিনিই পালন করলেন রক্ষণশীল ভূমিকা।

তবু নিজের সম্পর্কে যে-কথা তিনি জীবন-সায়াহ্নে লিখেছিলেন ('বঙ্গভাষা ও মোসলমান সমাজ', *মোহাম্মদী*, আশ্বিন ১৩৩৬), তার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই :

> ...যখন আমি নিজের ক্ষীণ শক্তিটুকু লইয়া সম্পূর্ণ নিরবলম্বন ও নিঃসহায় অবস্থায় বাঙ্গালার সাহিত্য-আসরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলাম, তখন একটি মাত্র প্রবল চিন্তা আমার সমস্ত দেহ-মন অধিকাব করিয়া লইয়াছিল। সে চিন্তাটি এই যে—কেমন করিয়া আমার প্রিয়তম স্বজাতি বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার অবাধ প্রচার করিব,—কেমন করিয়া তাহাদের ভ্রান্ত কুহেলিকা ও জড়তা মোচন করিয়া তাহাদিগকে মাতৃভাষার পুণ্য-মন্দিরে লইয়া আসিব—এবং কেমন করিয়া তাহাদের মনের মধ্যে মাতৃভাষার সাহায্যে জাতীয় সাহিত্য গঠনের প্রেরণা জাগাইয়া দিব।

এ উদ্দেশ্যসাধন সহজ ছিল না। কারণ :

> সমাজেরই বা তখন কি ঘোর অন্ধবিশ্বাস! কি শোচনীয় দুরবস্থা! ইংরাজী ও সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালাও তখন কাফের ভাষা হইয়া গিয়াছে—সুতরাং উক্ত উভয় ভাষাই অস্পৃশ্য ও অব্যবহার্য্য। বাঙ্গালা ভাষায় কোরআন হাদিস বা ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিলে সে স্পষ্ট ধর্ম্মদ্রোহী হইবে।... বাঙ্গালা ভাষায় হজরতের জীবনী বাহির

করিতেও তখন আমার মাদ্রাসার মৌলবী সাহেবদিগের সার্টিফিকেট লইতে হইয়াছিল।...

এই প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থার ক্ষেত্রে তাঁর কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। এই প্রবন্ধে তিনি লিখছেন :

> এদেশে বিদেশী ও দুর্ব্বোধ্য ইংরেজী ভাষাতেই যাবতীয় উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা যে কোন দেশ বা জাতির পক্ষে কখনও কল্যাণকর ব্যবস্থা হইতে পারে না, তাহা দেশের সুধীবৃন্দ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিয়াছেন। তাই আজ দেশের প্রত্যেক কেন্দ্র হইতেই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের সুর শোনা যাইতেছে। যে ভাষাটি মোটামুটিভাবে শিখিতে অন্ততঃ পূর্ণ একটি যুগ অতীত হইয়া যায়, সেই ভাষায় একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতিকে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় অদ্ভুত ব্যবস্থা জগতে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। আমরা ইংরাজী শিক্ষা বিরোধী নহি। উচ্চ ইংরাজী সাহিত্য, ইংরাজী ব্যাকরণ ইংরাজী ব্যাখ্যার সাহায্যেই শিক্ষা করা উচিত, তাহাও স্বীকার করি; কিন্তু বাঙ্গালী ছাত্রকে ইংরাজী ভাষায় অঙ্ক কষিতে, ইতিহাস পড়িতে বা জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে কেন? অধিক কি, এদেশে আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃত পর্য্যন্ত ইংরাজীর সাহায্যে পড়িবার ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। সমুদ্রের সাহায্যে নদী পার হইবার এমন বিস্ময়কর ব্যবস্থা আর কোথাও নাই।

শিক্ষা-বিষয়ে তাঁর কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতাও ছিল। তিনি চব্বিশ পরগনার ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন কমিটি এবং পরে কলকাতার সেন্ট্রাল টেক্সট বুক কমিটির সদস্যপদ লাভ করেন। সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে তিনি দীর্ঘকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার বাংলার পরীক্ষক ছিলেন।

অবশ্য এর বাইরেও তিনি নানা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৩ সালে মীর্জা শুজাত আলী বেগের সভাপতিত্বে গঠিত কলিকাতা মহাম্মাদান ইউনিয়নের তিনি সদস্য ছিলেন। আঞ্জুমনে ওয়ায়েজীনে ইসলাম বাঙ্গালার তিনি ছিলেন প্রথম সম্পাদক। বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা বলেছি। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য ছিলেন, সৈয়দ এমদাদ আলী-সম্পাদিত *নবনূর* পত্রিকার উৎসাহদাতাদের একজন ছিলেন।

*মোহাম্মদী*তে প্রকাশিত তাঁর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে বিদায়ী সুর ধ্বনিত হয় বলে পাঠকের ধারণা জন্মায়। বস্তুত তখন তিনি প্রায় অসুস্থ। অর্শরোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনের শেষ দু বছর কাটান মোহাম্মদপুরে। তাঁর জীবনীকার বলছেন, রোগকষ্টের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অর্থকষ্ট। ১৯৩১ সালের ১৪ জুলাই, ১৩৩৮ সালের ২৯ আষাঢ়, রাত্রিতে সজ্ঞান অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে।

তাঁর সম্পর্কে সৈয়দ মোকাররম আলী লিখেছেন :

> পরলোকগত মুনশী সাহেব জীবনে কখনও বাল্যস্মৃতি ভুলেন নাই। জীবনের অতি অসহায় অবস্থায় তিনি যে অপ্রত্যাশিত করুণালাভ করিয়াছিলেন, তাহা চিরদিনই তাঁহার চিত্তকে করুণার্দ্র করিয়া রাখিয়াছিল।

আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব তাঁহার নিকট সাহায্য-প্রার্থী হইয়া কখনও বিমুখ হন নাই। এমন কি তাঁহার অতি দুর্দ্দিনে এই প্রবন্ধ লেখক তাঁহার সাহায্যলাভে বঞ্চিত হয় নাই। অন্ন পৃথক হইলেও তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয় চিরদিনই তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছেন। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি ঋণ করিয়া তিনি অনেক আত্মীয় স্বজনের অভাব মোচন করিয়াছেন। অর্থকৃচ্ছ্রতার হস্ত হইতে মুনশী সাহেব জীবনে কখনও মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই।... কিন্তু কোনদিন এই দারুণ অভাবের মর্ম্মপীড়া মুনশী সাহেবের মুখে পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। শিশুর মত সরল হাসি, অনাবিল আনন্দ প্রকাশ, অবিচলিত চিত্ত, সামাজিকতা, সুখে-দুঃখে সহানুভূতি মুনশী সাহেবের সমস্ত জীবনকে প্রতিকূল ঘটনাবলীর মধ্যেও মধুময় করিয়া রাখিয়াছিল।

৮.

দাদার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত প্রবন্ধে সৈয়দ মোকাররম আলী লিখেছিলেন : 'শুনিয়াছি তাঁহার স্বরচিত জীবন চরিতের পাণ্ডুলিপিখানি মুদ্রিত করিবার জন্য তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান আবু তাহের মোহাম্মদ মোয়াজ্জমকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছেন।' আব্বা বলেন, এরকম কোনো পাণ্ডুলিপি তিনি পান নি। তিনি যা পেয়েছিলেন, তার মধ্যে ছিল দাদার নিত্যপাঠ্য বিরাট আকারের একটা কুরআন শরিফ—তার প্রথম পাতার মার্জিনে আব্বার ও চাচাদের জন্মতারিখ তিনি লিখে রেখেছিলেন। আব্বা আর যা পেয়েছিলেন, তা রাখা ছিল স্টিলের একটা পুরোনো ভারি তোরঙ্গে। ছেলেবেলায় দেখেছি, তাতে ছিল দাদার প্রত্যেক বইয়ের এক বা একাধিক কপি; তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার দু-চারটে সংখ্যা; দাদার কাছে লেখা অনেকের চিঠিপত্র; এবং আমার বড় ফুফু খায়রুননেসার লেখা একটি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। দাদার সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখবেন বলে অনেকেই এসব বইপত্রের কিছু কিছু নিয়ে যান এবং যথারীতি ফেরত দিতে ভুলে যান। বাকি যা ছিল, তা কয়েকবারের স্থান-পরিবর্তনে এবং আমাদের অমনোযোগ নষ্ট হয়ে যায়। তার মধ্যে ফুফুর লেখা উপন্যাস একটি।

আমার ফুফুরা সকলেই ঘরে বসে সামান্য লেখাপড়া শিখেছিলেন। বড় ফুফু কী করে উপন্যাস লেখার প্রেরণা ও সাহস পেলেন, তা বলা দুষ্কর। একটা মোটা খাতায় রুল-টানা কাগজে দোয়াতের কালো কালি ও নিবের কলমে স্পষ্টাক্ষরে তিনি উপন্যাসটা লেখেন, তারপর দাদাকে দেন সংশোধন করতে। খাতার প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে দু লাইনের ফাঁকে ফাঁকে দাদা শব্দ বা বাক্যাংশ বদলে দিয়েছিলেন। পাণ্ডুলিপিটি আমি পড়ার চেষ্টা করি নি, তবে সেটা কী, তা জানতে চাইলে, আব্বা বলেছিলেন, 'পারিবারিক উপন্যাস'। উপন্যাসের এই বিশেষ শ্রেণীকরণ তখন বেশ প্রচলিত ছিল। পাণ্ডুলিপিটি যে সম্পূর্ণ সংশোধিত হয় নি কিংবা তা প্রকাশের কোনো উদ্‌যোগ নেওয়া হয় নি, তার কারণ বোধহয় ফুফুর অকালমৃত্যু।

দাদা আমার তিন ফুফুর বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। বড় ফুফু খায়রুননেসার বিয়ে হয় বসিরহাটের অন্তর্গত মথুরাপুরে। চার সন্তান রেখে অল্পবয়সে তিনি মারা যান। দাদা-দাদির পক্ষে সেই ছিল সন্তানবিয়োগের প্রথম শোক। মেজো ফুফু ফখরুননেসার বিয়ে হয়েছিল মেদিনীপুরে—ফুফা সৈয়দ মজহার হোসেন ছিলেন রেলের কর্মচারি। ১৯৯৪ সালে মেজো ফুফু তাঁর শ্বশুরবাড়িতেই মারা যান। সেজো ফুফু শামসুননেসার বিয়ে হয় দাদার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলের সঙ্গে—তাঁরা মোহাম্মদপুরেই থাকতেন। ছোটো ফুফু বদরুননেসারও বিয়ে হয় একটু দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে। নব্বই বছরের অধিক বয়সে ২০০১ সালে সাতক্ষীরায় তাঁর মৃত্যু হয়।

বসিরহাটে আব্বার পেশাগত জীবনে উন্নতি এবং পারিবারিক জীবনে তৃপ্তি ঘটে দ্রুতগতিতে। তাঁর পসার বেড়ে যাওয়ায় সাইকেল ছেড়ে চার বেহারার পালকিতে সওয়ার হন তিনি। মাঝেরপাড়ায় এক সময়ে চার বিঘে জমি কেনেন। মেজো চাচা ও সেজো চাচাকে তার থেকে এক বিঘে দিয়ে দেন। এক বিঘেতে বাড়ি তৈরি করেন নিজের ভাটি বসিয়ে তাতে ইট বানিয়ে। বাড়ি করার সময়েই বোধহয় বাকি দু বিঘে বিক্রি করে দেন। তারপরও ধার দেনা হয়ে যায়। তবু এই বাড়ি নিয়ে আব্বার বিশেষ গর্ববোধ ছিল। হিসেব করে দেখছি, সৈয়দ মোকাররম আলী যে-সময়ে দাদার অর্থকষ্টের কথা লিখেছেন, তখন আব্বা বাড়ি বানাচ্ছেন। তিনি কি পিতাকে সাহায্য করেন নি? নাকি তিনি যেমন ছাত্রজীবন শেষ করে পিতার কাছ থেকে অর্থ নেন নি, দাদাও তেমনি অর্থকষ্ট সত্ত্বেও পুত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন নি? তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে যে কোনো মালিন্য প্রবেশ করে নি, সেকথা জোর দিয়ে বলা যায়। আব্বার নতুন বাড়িতে দাদা দু মাস কাটিয়ে গিয়েছিলেন মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে।

আব্বার জ্যেষ্ঠ সন্তান, আমাদের বড়োবু তৈয়বুন্নেসা, জন্মলাভ করে ১৯২৬ সালের ২৩ সেপ্টেম্বরে। সন্তানদের মধ্যে পক্ষপাত করলেও বাপ-মা সাধারণত তা স্বীকার করেন না। আব্বা কিন্তু স্পষ্টতই বলতেন যে, তাঁর ছেলেমেয়েদের মধ্যে বড়ো মেয়ে—ডাক নাম তারা—তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। এমন অকুণ্ঠিত ও আন্তরিকভাবে তিনি একথা বলতেন যে, আমাদের অন্যান্য ভাইবোনের মধ্যে তাতে ক্ষোভ বা ঈর্ষা কখনো হয় নি। আব্বার প্রতি বড়োবুর ভালোবাসাও ছিল অনুরূপ। আমাদের পরিবারের জন্যে বড়োবু (এবং দুলাভাই) যা করেছে, খুব কম পুত্রসন্তানও তেমন করতে পারে। আব্বার মৃত্যুর আগে, তিনি যখন যন্ত্রণাকাতর, তখন আমার মেজো বোন কাঁদতে কাঁদতে বড়োবুকে বলেছিল, 'তুমি মন থেকে ছাড়তে পারছো না বলে আব্বা যেতে পারছেন না। তুমি অন্তর থেকে ছেড়ে দাও, তবে তাঁর কষ্ট শেষ হবে।'

মেজোবু তৈয়মুন্নেনা ওরফে আরুর জন্ম ১৯২৮ সালের ২৮ জুলাইয়ে। ছোটোবু মেহেরুন্নেসা ওরফে মেরুর জন্ম—দাদার মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে—১৯৩১ সালের ২১ জুলাইতে আব্বার নতুন বাড়িতে। তারপর এক ভাই—আসাদ—১৯৩৩ সালে জন্মে ঠিক তার প্রথম জন্মদিনে মারা যায়।

১৯৩১ সালের গোড়ায় বেশ ঘটা করে আব্বার নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশের উৎসব আয়োজিত হয়। তাতে যোগ দিতে এসে আমার মেজো ফুফা আকস্মিকভাবে সেখানে

মারা যান। ওই বাড়িতে নয়, তবে গ্রামের বাড়িতে দাদা ইন্তেকাল করেন তারপরে। অন্য বাড়িতে থাকলেও আমার মামার মৃত্যু ঘটে ১৯৩৪ সালে। তখন তাঁর একমাত্র পুত্র সৈয়দ কামরুজ্জামানের বয়স পাঁচ বছর, আর মামির গর্ভে তাঁদের একমাত্র কন্যা সৈয়দা হালিমা খাতুন (পরে রহমান)। নতুন বাড়িতে আমার অগ্রজ আসাদের দেহান্ত হয় একই সালে। পরের বছরে বাড়ির সকলেই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। এর মধ্যে আব্বাই সবচেয়ে বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাড়ি করতেই তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, অসুস্থতার কারণে তাঁর আয় গেল বন্ধ হয়ে। সুতরাং বেশ আর্থিক সংকট দেখা দিলো পরিবারে। সকলেই বলতে লাগলো, বাড়িটি অপয়া। চিকিৎসার জন্যে আব্বাকে কলকাতায় নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন মা জোর করেন বসিরহাট ছেড়ে কলকাতায় চলে যেতে।

এই সময়ের মধ্যে শুভ ঘটনা যে কিছু ঘটে নি, তা নয়। তার প্রথমটি আমার মেজো চাচার বিয়ে, অপরটি ছোটো ফুফুর বিয়ে। মেজো চাচি আশরাফুননেসা মায়েদের পরিবারেরই মেয়ে। এখানেও সম্পর্কটা একটু গোলমেলে হয়ে যায়। চাচির ভাই সৈয়দ আবদুল বদী ও তাঁর স্ত্রীকে (এঁদের মধ্যম পুত্র ড. সৈয়দ রশীদুন্‌নবী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক) আমরা চিরকাল ভাই ও ভাবি বলে এসেছি। আব্বার নতুন বাড়ির পাশে চাচাও বাড়ি করেন। সে-বাড়ি কতদূর পয়মন্ত বিবেচিত হয়েছিল, তা বলা মুশকিল। কেননা দুই মেয়ে ও এক ছেলে রেখে তিনি লোকান্তরিত হন ১৯৩৮ সালে।

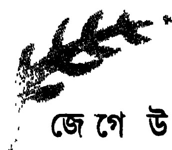
ততদিনে মায়ের সংকল্পের কারণে আমরা কলকাতাবাসী। ১৯৩৬এ আব্বা বসিরহাট ছাড়লেন। প্রথমে বাড়ি বিক্রি করতে তাঁর মন সরে নি। যখন সিদ্ধান্ত করলেন বাড়ি বিক্রি করার, তখন ক্রেতা দেখা দেয় তো বাড়ি অপয়া শুনে পিছিয়ে যায়। আব্বা একরকম খালি হাতে পরিবার নিয়ে কলকাতায় এসে আমার মামার—মায়ের মামাতো ভাইয়ের—বাড়িতে ওঠেন। কিছুদিন পর এন্টালির কাছে ৩১ ক্যান্টোফার লেনে বাড়িভাড়া করেন। সেই বাসায় আমার জন্ম।

আমার জন্মের ঠিক আগে আগে বসিরহাট থেকে আমার নানি এলেন কলকাতায়—সন্তানসম্ভবা মেয়ের কাছে মা যেমন আসে, তেমনি। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে তাঁর মৃত্যু হলো। নানি খুব ধার্মিক ছিলেন। তিনি মেয়েদের মজলিসে মিলাদ পড়াতেন। বাংলা ছাড়া উর্দু ও ফারসি শিখেছিলেন। তখনকার আর-দশ জনের মতো কুরআন পড়তেন নিয়মিত। ইংরেজি বর্ণমালাও চিনতেন, যদিও সে-ভাষা আয়ত্ত করেন নি। আমার ভাবতে অবাক লাগে যে, সেকালে এতগুলো ভাষাশিক্ষার আগ্রহ তাঁর মধ্যে জন্মেছিল এবং সে-আগ্রহের বাস্তব রূপ দিতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন।

নানির মৃত্যুর দু দিন পরে আমি ভূমিষ্ঠ হই, ১৯৩৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারিতে।

আব্বা আমাদের—চাচাতো-মামাতো ভাইদের—নাম রেখেছিলেন নিজের নামের মতো দীর্ঘ করে। সবার বড়ো আমার মামাতো ভাই সৈয়দ আবুল ফজল মোহাম্মদ কামরুজ্জামান। তারপর আমার অগ্রজ আবুল কালাম মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান। ততদিনে আব্বার নামও ইংরেজিমতে সংক্ষিপ্ত হয়ে ডা. এ টি এম মোয়াজ্জমে পরিণত হয়েছে। তখন থেকে আমাদের সবার নামে যেন এ টি এম থাকে, এটাই হয় তাঁর

লক্ষ্য। অতএব, আমার নাম রাখা হয় আবু তৈয়ব মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান। আমার ছোটো ভাইয়ের আবু তালেব মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান। মেজো চাচার ছেলের নাম আবু তওহিদ মোহাম্মদ আমিনুজ্জামান। সেজো চাচার ছেলে আবু তারেক মোহাম্মদ আকরামুজ্জামান। আমার প্রথম গল্প বেরিয়েছিল এ টি এম আনিসুজ্জামান স্বাক্ষরে। তারপর এ টি এম বর্জন করি। পত্রিকার পাতায় তা দেখে আব্বা জিজ্ঞেস করলেন, 'এ টি এম লেখে নি কেন?' বললাম, 'ওটা বাদ দিয়েছি।' আব্বা একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আমার ছেলে বলে চেনা যাবে না।'



জেগে উঠিলাম

বসিরহাটে বাড়ি, জমি, স্বজন ও দীর্ঘকালের স্মৃতি ফেলে রেখে স্ত্রী, তিন কন্যা, ভগ্নস্বাস্থ্য ও আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আব্বা কলকাতায় এলেন ১৯৩৬ সালে। প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে এই বৃহৎ নগরে ফিরে এসে একজন মুসলমান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের পক্ষে আত্মপ্রতিষ্ঠালাভ করা সহজ ছিল না। একদিকে, রোগী সারাবার আগে নিজেকে সারিয়ে তোলার সমস্যা ছিল। পার্ক সার্কাসে, ২২ নাসিরুদ্দীন রোডে, তিনি চেম্বার খুললেন। বাসা ও ডাক্তারখানার ভাড়া এবং সংসারের ভরণপোষণ নিতান্ত সামান্য ব্যাপার নয়। এরই মধ্যে আমার আবির্ভাবে আরো একটি নতুন মুখ যুক্ত হলো। তখন একেবারেই তাঁর দিন আনি দিন খাই অবস্থা। এমনও সময় গেছে যে, আব্বা উপার্জন করে বাড়ি ফেরার পথে বাজার করে এনেছেন, তারপর রান্না-খাওয়া চলেছে, কিংবা বাজার বা রান্না করার সময় না থাকলে তৈরি খাবার কিনে আনা হয়েছে। এসব কথা আমি মায়ের মুখে শুনেছি।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, জীবনের কষ্টকর দিনের কথা বলতে মা কখনো দ্বিধাবোধ করে নি। তার ছিল কঠোর সত্যবাদিতা—সেকথা অন্য প্রসঙ্গেও বোঝা যাবে—এবং কথায় ও কাজে ছিল লক্ষণীয় সংযম। আব্বার সারল্য ছিল মজ্জাগত, কিন্তু অতীত দুর্ভোগের স্মৃতি আলোড়ন করার কোনো কারণ তিনি দেখতে পেতেন না। তিনি ছিলেন উচ্ছ্বাসপ্রিয়, সেইসঙ্গে অতিরঞ্জনের একটা প্রবণতা ছিল তাঁর মধ্যে—তাকে আমি মিথ্যাভাষণ বলবো না, কেননা সে-অতিরঞ্জন যদি দশবারের মধ্যে একবার করতেন নিজের সম্বন্ধে, তাহলে নবারই করতেন অন্যের ক্ষেত্রে। মা-আব্বা উভয়েই সরল জীবন যাপন করতেন; বাধ্য হয়ে নয়, স্বাভাবিকভাবেই তা বেছে নিয়েছিলেন। আব্বা খেতে পছন্দ করতেন—পরিমাণে অল্প হলেও নানা ধরনের খাবার একটু একটু করে খেতেন। যতদিন পেরেছিলেন, বাজারটা নিজেই করতেন, তাতেই বৈচিত্র্যটা নিশ্চিত হতো। সিনেমা-থিয়েটারে বাধ্য না হলে তিনি যেতেন না। তবে সবাইকে নিয়ে সোৎসাহে যেতেন সার্কাসে আর চিড়িয়াখানায়। আত্মীয়স্বজন বাড়িতে এলে খুশি হতেন, কিন্তু তিনি নিজে তেমন যেতে চাইতেন না। তিনি আনন্দের উপকরণ খুঁজতেন নিজের সংসারেই। পরিণত বয়সে তাঁকে বহুবার বলতে শুনেছি, ছেলেমেয়ে নাতিনাতনি নিয়ে আমি ঘরে বসে যে-আনন্দ পাই, সিনেমা-থিয়েটার দেখার আনন্দের চেয়ে তা বেশি। মা ভালোবাসতো পড়তে, খবরের কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তো—শিরোনাম বা তার দু পাশের বিজ্ঞাপন থেকে প্রায় শেষ পাতার প্রকাশক ও

মুদ্রাকরের নাম পর্যন্ত। আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে সে খুব যেতে চাইতো এবং সিনেমা-থিয়েটার দেখতে পারলে খুশি হতো। কিন্তু আমি তো এসব লক্ষ্য করেছি অনেক পরে, এখন ফিরে যাওয়া দরকার আগের দিনগুলোয়।

সংসারের যে-দুর্গতির কথা বলেছি, তা কাটিয়ে উঠতে আব্বার বেশিদিন লাগে নি। দাদার সূত্রে কলকাতায় অনেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল—তাঁরা হলেন আব্বার প্রথম পর্যায়ের মক্কেল। এঁদের মধ্যে এ কে ফজলুল হকের কথা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ফজলুল হক প্রথমবার বাংলার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক হিসেবে আব্বার নাম ছড়িয়ে পড়লো। যাঁরা একবার তাঁর চিকিৎসায় ফল পেলেন, তাঁরা অন্যের কাছে তাঁকে সুপারিশ করতে ভুললেন না।

সংগতি ফিরে পাওয়ার পরে আব্বা প্রথমে যা করেছিলেন, তা হলো আমার বোনদের পড়াবার জন্য মাসিক পাঁচ টাকা বেতন দিয়ে এক বাঙালি খ্রিষ্টান স্কুল-শিক্ষিকাকে নিযুক্ত করা। ১৯৩৭ সালে পাঁচ টাকা খুব সামান্য ছিল না। বসিরহাট ছাড়ার সময়ে আমাদের এক মামার (মায়ের চাচাতো/মামাতো ভাই) বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত ঘিপুকুর মাইনর গার্লস স্কুলে বড়োবু পড়তো পঞ্চম শ্রেণীতে, মেজোবু তৃতীয় শ্রেণীতে। কলকাতায় এসে ভাঙা বছরে আর কেউ স্কুলে যায় নি। পরে মেজোবু ও ছোটোবুকে ভর্তি করা হলো কর্পোরেশন স্কুলে। সেখান থেকে মেজোবু গেল পার্ক সার্কাস গার্লস স্কুলে, ছোটোবু আবার বাড়িতে। বড়োবুকে আর স্কুলেই পাঠানো হলো না—স্কুলের পাঠ্যসূচি ধরে ঘরেই পড়ানো হলো শ্রেণীক্রমে। গৃহশিক্ষিকা এক সময়ে চলে গেলেন, বড়োবুকে বিনা পয়সায় পড়াবার ভার নিলেন বেনজীর আহ্‌মদ।

বেনজীর আহ্‌মদ ছিলেন—সেযুগের পরিভাষায় যাকে বলা হতো—স্বদেশী ডাকাত। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ইংরেজ শাসকদের বিতাড়ন করা যাবে, এই বিশ্বাস থেকে এক সময়ে তিনি গুপ্ত বিপ্লবী দলের সংস্রবে গিয়েছিলেন, তবে তেমন কোনো দলের সদস্যপদ লাভ করতে সমর্থ হন নি—তার একটা কারণ বোধহয় এই ছিল যে, এ-ধরনের বিপ্লবীরা মুসলমানদের আনুগত্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি। তখন বেনজীর আহ্‌মদ কিছু মুসলমান তরুণ নিয়ে নিজেই একটি দল গড়ে তোলেন। ইংরেজদের তাড়াতে হলে অস্ত্র চাই, অস্ত্র সংগ্রহ করতে টাকার দরকার। সুতরাং সম্পন্ন ব্যক্তিদের বাড়িতে ডাকাতি করে তাঁরা অর্থসংগ্রহ করতেন, টাকা জাল করার একটা ব্যর্থ চেষ্টাও করেছিলেন। একবার ডাকাতি করতে যেয়ে তাঁর দলের কয়েকজন ধরা পড়ে, ধৃত ব্যক্তিদের পুলিশ পীড়ন করলে দলনেতা হিসেবে বেনজীর আহ্‌মদের নাম বেরিয়ে পড়ে এবং এই সূত্র ধরে ঢাকায় তাঁর গ্রামের বাড়িতে—নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার থানার ইলমদি গ্রামে—তিনি গ্রেপ্তার হন। বিচারের জন্যে পুলিশ-প্রহরায় নারায়ণগঞ্জ থেকে নোয়াখালি নেওয়ার পথে হাতকড়া-পরা অবস্থায় পদ্মায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি সাঁতার কেটে পালিয়ে যান। পরে আবার ধরে পড়েন। বিচারাধীন বন্দি হিসেবে দীর্ঘকাল কাটাবার পরে আদালতের নির্দেশে তিনি মুক্তি পান, কিন্তু সরকারি আদেশে কলকাতার মিউনিসিপাল এলাকায় তাঁকে অন্তরীণ করা হয়। এই অন্তরীণ অবস্থায় তাঁর অর্থানুকূল্যে কলকাতায় মোহাম্মদ আফজাল্-উল হক-সম্পাদিত মাসিক *নওরোজ* (১৯২৭) আত্মপ্রকাশ করে এবং তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *বন্দীর বাঁশী*

(কলকাতা, ১৯৩২) প্রকাশিত হয়—এর 'মুখ-বন্ধ' লেখেন নজরুল ইসলাম। ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রী হলে বেনজীর আহ্‌মদের অন্তরীণ-আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়, তারপর তিনি সুফিয়া কামালের প্রথম গল্পগ্রন্থ *কেয়ার কাঁটা* (কলকাতা, ১৯৩৭) ও প্রথম কাব্যগ্রন্থ *সাঁঝের মায়া* (কলকাতা, ১৯৩৮) প্রকাশ করেন।

বেনজীর আহ্‌মদ, মনে হয়, দাদাকে জানতেন। *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায় (ভাদ্র ১৩৪৭) 'মুনশী শেখ আবদুর রহীম স্মরণে' নামে তাঁর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়, যার প্রারম্ভিক চরণগুলি ছিল এই :

> নিশীথ তখনো হয় নাই শেষ, চারিদিকে আঁধিয়ারা—
> ছুবে ছাদেকের নব জ্যোতি লয়ে এলে তুমি শুকতারা!
> প্রভাতের পাখী! তোমার কূজনে সারাদেশ উঠে জাগি,
> মরণ-নিদালী টুটে যায় তার হিয়া কাঁদে আলো লাগি'।

কবিতাটির পাদটীকায় লেখা হয়েছিল : 'বিখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক মরহুম মুনশী শেখ আবদুর রহীমের স্মৃতিসভায় পঠিত।' এ-সভাটি যদি দাদার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাহলে প্রশ্ন রয়ে যায়, ওটি এতদিন পরে প্রকাশিত হবে কেন? পরবর্তীকালে দাদার স্মৃতিতে কোনো সভা আয়োজিত হয়ে থাকলে তার খবর আমার জানা নেই। তবে এই কবিতা প্রকাশের সময়ে আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল।

বন্দি অবস্থায় বেনজীর আহ্‌মদ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অন্তরীণ থাকাকালেও তার জের চলে। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, কারাগারে তাঁকে অল্প অল্প বিষপ্রয়োগ (স্লো-পয়জনিং) করা হয়। অন্যত্র চিকিৎসা করে ফল না পেয়ে তিনি আব্বার শরণাপন্ন হন এবং তাঁর চিকিৎসায় সম্পূর্ণ নিরাময় হন। আব্বা তাঁর কাছ থেকে কোনো টাকাপয়সা নেন নি, এমনকি, ওষুধের দাম নিতেও অস্বীকার করেন। কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের পথ খুঁজতে গিয়ে বেনজীর আহ্‌মদ প্রথমে বড়োবুকে পড়াতে শুরু করেন। তিনি নিয়মিতভাবে আসতে পারতেন না, তবে যথাসাধ্য করতেন, তাতে কাজ চলে যেতো। তবু তিনি ভাবলেন, এতে যথেষ্ট ঋণপরিশোধ হলো না। তখন তিনি হাতেম তাইয়ের উপাখ্যান গদ্যে লিখে আব্বাকে সমর্পণ করেন আমার মায়ের নামে তা প্রকাশ করার জন্যে। সৈয়দা খাতুনের *হাতেম-তাই* ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হলো, প্রকাশক—এ টী এম আনিসুজ্জামান, ২২ নাসিরুদ্দীন রোড, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা; পরিবেশক—মখদুমী লাইব্রেরী ও আহসানউল্লাহ্ বুক হাউস লিমিটেড, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা; ১৭০ পৃষ্ঠার ডিমাই আকারের বই, দাম এক টাকা। একই প্রচ্ছদ রং পালটে দুরকমভাবে ছাপা হয়েছিল। বেনজীর আহ্‌মদ যে-আশা করে কাজটি করেছিলেন, তা অবশ্য পূর্ণ হয় নি, অর্থাৎ বইটি থেকে তেমন অর্থাগম হয় নি। তবে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, শাহাদাৎ হোসেন ও কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ বিদ্বজ্জন এবং দৈনিক *আজাদ* ও মাসিক *সওগাত* প্রভৃতি পত্রিকা বইটির প্রশংসা করেছিলেন কিংবা নবাগতা লেখিকাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

আমাদের পরিবারে এই ধারণা প্রচলিত আছে যে, মা অংশত বা সম্পূর্ণ *হাতেম-তাই* রচনা করেছিল এবং বেনজীর আহ্‌মদকে তা সংশোধন করতে দেওয়ায় তিনি সবটাই নিজের মতো করে পুনর্লিখন করেছিলেন। এ-ধারণা শুধু পরিবারেই সীমাবদ্ধ

ছিল না, কেননা বহুকাল পরে ফররুখ আহ্‌মদ আমাকে একদিন বলেছিলেন, 'তোমার মায়ের সরল গদ্যের খোল-নলচে একেবারে বদলে দিয়েছিলেন বেনজীর সাহেব।' এসব কথার ভিত্তি কী ছিল, তা আমার জানা নেই। তবে ১৯৪৯ সালে ঢাকায় যখন *হাতেম-তাই* দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হচ্ছে, তখন মা আমাকে বলেছিল যে, বইটি বেনজীর আহ্‌মদ লিখে দিয়েছিলেন। অবশ্য মা লিখতে পারতো এবং সরল গদ্যই লিখতো, পরে তার দু-একটা লেখা *আজাদে* ছাপা হয়েছিল। ফররুখ আহ্‌মদের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে *হাতেম-তাইয়ের* তৎসম ও আরবি-ফারসি শব্দের মিশ্রণে গঠিত সমাসবদ্ধ পদের দীর্ঘ বাক্য-সংবলিত গদ্যরীতি সম্পর্কে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। বইটির দ্বিতীয় মুদ্রণে অন্যদের মন্তব্যের সঙ্গে বেনজীর আহ্‌মদের যে-মতামত মুদ্রিত হয়েছিল, তার একটি বাক্যে এই গদ্যরীতির তাৎপর্য ব্যাখ্যার প্রয়াস আছে : 'পূর্ব্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষার নব-সংগঠনের যে প্রশ্ন জাগিয়াছে, তাহার সমাধানের ইঙ্গিত এই পুস্তকটিতে রহিয়াছে—এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।' বইটির রচনাকালে তাঁর কাব্যে কিন্তু আরবি-ফারসি শব্দের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রয়োগ দেখা যায় না।

বেনজীর আহ্‌মদ আরো একটি কাজ করেছিলেন—বড়োবুর কবিতা লেখার স্পৃহাকে উসকে দিয়েছিলেন। হয়তো গোড়ার দিকে তার কবিতার সামান্য সংস্কার তিনি করেন, কিন্তু খোল-নলচে বদলে দেন নি। বড়োবুর প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'গুল-বাগিচা' প্রকাশিত হয়েছিল আবদুল ওহাব সিদ্দিকী-সম্পাদিত শিশুতোষ পত্রিকা *গুল-বাগিচায়*, ১৯৩৮ সালে। পত্রিকাটি অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে ছিল বলে, বারবার পড়ে, কবিতাটি আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, এখনো প্রথম চরণ দুটি মনে পড়ে :

গুল-বাগিচা! গুল-বাগিচা! কেমন মধুর নাম,
সর্বক্ষণে হিয়ার মাঝে তোল মধুর তান।

গুল-বাগিচা পত্রিকাটি প্রথমে বেরিয়ে কিছুকাল পরে বন্ধ হয়ে যায়, পরে আবার প্রকাশিত হয়ে অনেকদিন পর্যন্ত টিকে থাকে। আবদুল ওহাব সিদ্দিকীর *স্মৃতির সাগর তীরে* (খুলনা, ১৯৬৯) বইতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবুল কাদির তাঁকে বলেছিলেন, 'আপনার প্রকৃত পরিচয় হলো গুল-বাগিচা।'

এই স্মৃতিকথায় আবদুল ওহাব সিদ্দিকী যদিও আব্বাকে 'বন্ধুবর ডাঃ এ টি এম মোয়াজ্জম' বলে উল্লেখ করেছেন, তবে তাঁর সম্পর্কে ভালো কথা বলেন নি। নিজের বর্ণনামতে, তালতলার পীরের কাছে তাঁকে নিয়ে যেতে আব্বাকে অনুরোধ করেন তিনি, তবে আব্বা তা না করে পীরের একজন 'অতিভক্ত'র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ করিয়ে দেন, কিন্তু 'তাঁর দ্বারা আমার পীর দর্শনের কোনো কিনারা হলো না।' অনুরূপভাবে, 'হক সাহেবের দর্শন লাভের জন্য দু মাস ডাঃ মোয়াজ্জমের পিছু পিছু ঘুরেছি। তাঁকে একদিনের জন্য সেখানে নিয়ে যেতে পারি নি। শুনতাম সেখানে তাঁর অবারিত দ্বার।' এরপর তাঁর ক্ষুব্ধ মন্তব্য : 'বাকচাতুর্য্যে ওস্তাদী আর কা'কে বলে?' আবদুল ওহাব সিদ্দিকীর রচনায় কালক্রম লঙ্ঘিত হয়েছে কিনা জানি না, তবে তিনি ওই বইতে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর প্রথম গ্রন্থ *গাওসল আজম হজরত বড় পীর* (কলকাতা, ১৯৪০) তিনি ফজলুল হককে উপহার দিয়েছিলেন এবং খুশি হয়ে প্রধানমন্ত্রী সরকারি তহবিল থেকে তাঁকে এক শ টাকা দান করার লিখিত আদেশ দেন। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে অনেক

ঘোরাঘুরি করে (প্রথম দিনেই মাহবুবউদ্দীন আহমদ অবশ্য তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, এ-টাকা দেওয়া যাবে না) এবং ফজলুল হকের কাছে একাধিকবার নালিশ করেও সে-অর্থ তিনি লাভ করেন নি—তখন ফজলুল হক নিজের পকেট থেকে তাঁকে পঁচিশ টাকা দেন। পরে আবদুল ওহাব সিদ্দিকী শিশু সিরিজ নামে তাঁর পরিকল্পিত গ্রন্থমালার প্রথম বই *ধূলায় যাঁরা গড়েছেন তাজ* (কলকাতা, ১৯৪২) লিখেছিলেন ফজলুল হকের জীবনকথা নিয়ে। ওই সিরিজে আর কোনো বই বেরিয়েছিল বলে আমার জানা নেই। স্মৃতিকথায় লেখক কবুল করেছেন যে, ওই বই প্রকাশে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রধানমন্ত্রীকে তুষ্ট করে কিছু অর্থাগম করা। বাড়িতে বইটি থাকায় আমি খুব মনোযোগের সঙ্গে তা পড়েছিলাম। বইয়ের সূচনায় সিপিয়া রঙে ছাপা ডোরাকাটা গলাবন্ধ শার্ট-পরা ফজলুল হকের একটি প্রতিকৃতি ছিল। সেটা যথেষ্ট রঙিন হয় নি বিবেচনা করে আমি তার ওপর যথেচ্ছ লাল-নীল পেন্সিল চালিয়েছিলাম। সৌভাগ্যবশত তাতে তাঁর জামার যতো ক্ষতি হয়েছিল, মুখশ্রীর ততো হয় নি।

আবদুল ওহাব সিদ্দিকী কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে বড়োবুর কবিতা ছেপেছিলেন কিনা জানি না, তবে আব্বার বন্ধুরূপেই তিনি আমাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতেন। ছাপার অক্ষরে নিজের কবিতা দেখে বড়োবু নিশ্চয় উৎসাহিত হয়েছিল। তাঁর পত্রিকায় বড়োবুর আরো কয়েকটি কবিতা বেরিয়েছিল। পত্রিকার পাতায় ছাপা তৈয়বুন্নেসা নামটি আমারই বড় বোনের, এতে আমিও পরে গর্ববোধ করেছি। 'গুলবাগিচা'র পরে 'জমজম' নামে তার একটি কবিতা প্রকাশ পায় *সওগাতে* (আমার মনে হয়েছিল *শিশু-সওগাতে*, তবে বড়োবু বলেছে. *সওগাতেই*)। *সওগাত*-সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন আব্বার বন্ধু ছিলেন। নিজের পত্রিকায় তিনি শুধু বড়োবুর কবিতা ছেপে ক্ষান্ত হন নি, তাকে মা বলে সম্বোধন করেছিলেন এবং *সওগাতে* ছাপবেন বলে তার একটি ছবিও চেয়েছিলেন। মেয়ের ছবি তোলার ব্যাপারে আব্বার উৎসাহের অভাব লক্ষ করে তিনি নিজেই একদিন আমাদের বাড়ি এসে আব্বাকে বললেন ছবি তুলতে বড়োবুকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে যেতে। আব্বা ও বড়োবুর সঙ্গে ছোটোবু ও আমিও তাঁর কালো গাড়িতে চেপে নিউ মার্কেটে এক সাহেবের ফটো-স্টুডিওতে গেলাম। বড়োবুর ছবি তোলা হলো। আমিও চাইলাম নিজের ছবি ওঠাতে। তখন ছোটোবু ও আমার একটা ছবি তোলা হলো একসঙ্গে। পরে যখন দেখলাম, বড়োবুর একার ছবি উঠেছে, আর আমারটা আরেকজনের সঙ্গে, তখন নিজেদের ছবিটা ছিঁড়ে ফেললাম। ক্ষতিপূরণস্বরূপ আব্বা আরেকদিন আমাকে নিয়ে গেলেন সেই স্টুডিওতে—জরির টুপি মাথায় পাঞ্জাবি-পরা আমার আবক্ষ ছবি উঠলো। আমার আনন্দের সীমা রইলো না। তবে ঘটনাটি তখনই ঘটেছিল, না আরো কিছুদিন পরে, তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না।

২.

ক্যান্টোফার লেনের বাসা ছেড়ে দিয়ে, পার্ক সার্কাসের মেহের লস্কর লেনে দু মাস কাটিয়ে, ১৯৩৮ সালে আমরা উঠে এলাম ১০ কংগ্রেস একজিবিশন রোডে। এই বছরে

আমার মেজো খালা মারা যান দুই মেয়ে—হোসনে আরা (টুনি) ও মমতাজ আরা (মমতাজ)-কে রেখে। তার কিছুদিন পরে আমার মেজো চাচারও মৃত্যু হয়; দুই মেয়ে—রাজিয়া (নীরু) ও রোকেয়া (ধীরু) এবং এক ছেলে (আমিনুজ্জামান) মানুষ করার ভার এসে পড়ে অল্পবয়সী বিধবা চাচির ওপরে। এই দুই ঘটনার মধ্যে সেজো চাচার বিয়ে হয় (ছোটো ফুফুর বিয়ে হয়েছিল ১৯৩১ সালে, দাদার মৃত্যুর পরে—সেকথা বোধহয় বলা হয় নি)। ১৯৩৮-এর দিকে আমার বিধবা মামিও কলকাতায় চলে আসেন। মামার মৃত্যুর পর, সম্পূর্ণ অভিভাবকহীন অবস্থায়, একদিকে প্রখর আত্মসম্মানবোধ এবং অন্যদিকে ছেলেমেয়েদের (সৈয়দ কামরুজ্জামান ও সৈয়দা হালিমা খাতুন) মানুষ করার ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে তিনি জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ঘরে-পড়া সামান্য শিক্ষার পুঁজি নিয়ে তিনি বসিরহাটের কাছাকাছি এক গ্রাম্য স্কুলে আরবি ও বাংলা পড়াতে শুরু করেন বোরখা পরে। কিন্তু কিছুকাল পর কলকাতায় চলে এসে অগ্রজ সৈয়দ মজিদ বখ্‌শের বেনেপুকুর লেনের বাড়িতে আশ্রয় নেন এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন। পরে আমাদের খালু (মায়ের মামাতো বোন সারা খালার স্বামী) ডা. এ কে এম আবদুল ওয়াহেদের (তিনি ঢাকা ও পেশোয়ার মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও পূর্ব পাকিস্তান সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের ডাইরেক্টর হয়েছিলেন) আনুকূল্যে কলকাতার সোহ্‌রাওয়ার্দী হাসপাতালে মামি মেট্রনের কাজ নেন আত্মীয়স্বজনের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে।

১০ কংগ্রেস একজিবিশন রোডের বাড়ির মালিক ছিলেন আবদুল হাকিম। তাঁর আরেক ভাড়াটে বন্ধু মিয়া নামে সুপরিচিত ছিলেন। পরে তিনি নারায়ণগঞ্জে এসে ব্যবসায়ী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হন; তাঁর কন্যা জাহানারা হক চৌধুরী এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ছিলেন ৮ নম্বরের আবদুল হামিদ। তিনি অকালে লোকান্তরিত হন—সেই বোধহয় মৃত্যুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আতাউল হক নিতান্ত অল্প বয়সে পরিবারের দায়িত্ব নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করেন। বাড়িতেই তিনি সাবানের একটা কারখানা খুলেছিলেন এবং আরো নানা জিনিসের কেনাবেচায় জড়িত হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যম ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আশরাফুল হক পরে সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা-পরিচালক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক নিযুক্ত হয়েছিলেন; আর তাঁর অনুজ আমিনুল হক ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নাজ জুয়েলার্স নামে স্বর্ণালংকারের সুপরিচিত একটি বিপণি। তাঁদের পাশের বাড়িতে থাকতেন হুমায়ন কবিরের আত্মীয় রহিম সাহেব—ইন্তু মিয়া নামে তিনি অধিকতর পরিচিত ছিলেন। আবু রুশ্‌দের স্মৃতিকথায় এঁর উল্লেখ আছে। আমাদের বাড়ির অন্যপাশে ছিল এক টুকরো ফাঁকা জমি—১২ নম্বর বাড়ি তৈরির অপেক্ষায়। তার পাশে ১৪ নম্বরে থাকতেন যে-পরিবার, তাঁদের পদবি ছিল নন্দী।

আমাদের বাড়ির পাশে ফাঁকা জায়গায় একটা ব্যাডমিন্টন কোর্ট কাটা হয়েছিল। পাড়ার কিশোরেরা কিংবা সদ্য কৈশোর-উত্তীর্ণ তরুণেরা সেখানে ব্যাডমিন্টন খেলতো। সন্ধে হয়ে যাবার পর আলো জ্বালিয়ে খেলা চলতো। ছেলেরা খেলা শুরু করার আগে সাধারণত—কখনো কখনো তাদের খেলার কোনো ফাঁকে—পাড়ার কয়েকজন মেয়েও ব্যাডমিন্টন খেলতো, তার মধ্যে আমার ছোটোবুও ছিল। তবে সন্ধে নামার আগেই তাদের সকলকে ঘরে ফিরতে হতো। আমি এই খেলায় একনিষ্ঠ দর্শক ছিলাম—যতদূর

মনে পড়ে, সিঁড়িতে বসে খেলা দেখতাম। কোনোদিন খেলা শুরু হতে দেরি হলে অস্থির হয়ে যেতাম। সন্ধের মধ্যে আমাকেও ঘরের মধ্যে চলে আসতে হতো; তবে আমার বিশেষ কোনো কর্তব্য না থাকায় ঘরের ভেতর থেকেও মাঝে মাঝে খেলা উপভোগ করা সম্ভবপর হতো। বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়ে খেলা চালিয়ে যাবার ব্যাপারটা আমার কাছে মনে হতো খুবই বীরত্বপূর্ণ ও বিস্ময়কর।

আমার বিশেষ কোনো কাজ না থাকলেও মেজোবু লক্ষ্য রাখতো পড়াশোনায় যেন আমার মতি হয়। নিরক্ষর ভাইকে ছড়া মুখস্থ করানোর দায়িত্ব সম্পন্ন করার পর তাকে সাক্ষর করার ভার সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিয়েছিল। ইংরেজি ও বাংলা বর্ণপরিচয়ের বই এবং স্লেটে হাতের লেখা মক্‌শ করা তাই আমার করণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তবে তার জন্যে সময় বাঁধা ছিল বলে মনে পড়ে না। স্লেটের পেনসিল আমার বেশি পছন্দ ছিল না—তার দাগটা ক্ষীণ হয় বলে, তবে ভিজে ন্যাতা দিয়ে সেই ক্ষীণ লেখা মুছে ফেলতে মজা পেতাম। আমার বেশি পছন্দ ছিল খড়িমাটি—চক কথাটাও বোধহয় তখন চালু হয়ে গিয়েছিল। এর প্রধান সুবিধে ছিল এই যে, এর ব্যবহার স্লেটে সীমাবদ্ধ থাকতো না, বাড়ির দরজা-জানলায় স্বাক্ষর রাখার জন্যে এটি ছিল উপযুক্ত মাধ্যম। আর আমার লোভ ছিল পেনসিলে। তবে পেনসিল একটু ব্যয়সাপেক্ষ বিবেচিত হতো—কেননা পেনসিলের সঙ্গে নিকটতম সম্পর্ক ছিল খাতা বা কাগজের। আমার কাছে ব্যাপারটা খুব যুক্তিপূর্ণ মনে হতো না, কেননা, শাদা দেয়ালগুলো যেখানে এতো বড়ো পাতা মেলে ধরেছে সামনে, তুলনায় সেখানে কাগজ ছিল তুচ্ছ।

১০ নম্বর বাড়িতে মা খুব সুস্থ থাকতো না। এক সকালে অ্যামবুলেন্‌স ডেকে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ডা. ওয়াহেদ খালুর আনুকূল্যে মা ভর্তি হতে পারলো ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডে। এখন অনেকেই জানেন না এবং অনেকে হয়তো ভুলেও গেছেন যে, সে-সময়ে হাসপাতালে একটা বর্ণবিভেদ চালু ছিল—দেশি রোগীদের এবং সাহেব-সুবোদের জন্যে ছিল পৃথক ওয়ার্ড। ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডের রোগীরা বেশি যত্ন ও ভালো পথ্য পেতো—ডাক্তারদের অধিক মনোযোগ লাভ করতো বলেও মনে করা হতো। তাছাড়া এইসব ওয়ার্ড অন্যগুলির তুলনায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতো বেশি, রোগী কম থাকায় দুই বিছানার মধ্যে বেশ জায়গা থাকতো। বিত্তশালী কিংবা প্রভাবশালী কিছু সৌভাগ্যবান প্রজাদের ইউরোপীয়দের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া হতো। মা তাদের একজন হওয়ায় তার অসুস্থতা সম্পর্কে উদ্‌বেগের সঙ্গে সঙ্গে মর্যাদা সম্পর্কে একটা শ্লাঘার ব্যাপার ছিল—সেটা ভালো করে না বুঝতে পারলেও আভাসে-ইঙ্গিতে টের পেতাম। মার চিকিৎসকদের মধ্যে ছিলেন ডা. মণি দে—খুবই নামকরা ডাক্তার, আর তাঁর সহকারী—তখন তরুণ—ডা. মুহম্মদ ইবরাহিম (পরে ঢাকার ডায়াবেটিক হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা)। বাসায় মার অনুপস্থিতি বেশ তীব্রভাবে অনুভব করতাম। তবে রোজ বিকেলে আব্বার সঙ্গে ট্রামে করে গিয়ে হাসপাতালের শয্যায় মাকে দেখে আসার মধ্যে যে একটু তৃপ্তি ছিল না, তা বলতে পারি না। আমি গেলে বিছানার পাশে রাখা মিটসেফ থেকে মা সঞ্চিত খাবার কিছু আমাকে দিতো—সেটা আমাদেরই নিয়ে-যাওয়া কমলার একটা হতে পারতো—তবে এটা আমার অতিরিক্ত পাওনার মতো মনে হতো।

এই বাড়ির আরেকটা স্পষ্ট স্মৃতি ১৯৪১ সালের ২৮ ডিসেম্বরে বড়োবুর বিয়েকে ঘিরে। দুলাভাই কাজী আবু আবদুল্লাহ্ আহ্সান—সংক্ষেপে কে এ এ আহ্সান—অর্থনীতিতে এম এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু পড়া ছেড়ে ডি আল আর অফিসে চাকরি নেন। তাঁদের বাড়ি তখনকার ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার হবিগঞ্জ গ্রামে। তাঁর বয়স তখন ২১ পার হয়েছে। ১৯৪০ সালে আব্বা বসিরহাটের বাড়ি ও জমি বিক্রি করে দেন, তাঁর পসারও তখন ভালো ছিল। সেযুগের হিসেবে বেশ ভালোভাবেই বিয়ে সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে আমার অকারণ ছোটাছুটি এবং সকারণ আনন্দ—কোনোটারই সীমা ছিল না। এই আনন্দ স্থায়ী হয় আরো একটি কারণে—বিয়ের পরেও বড়োবু-দুলাভাই আমাদের সঙ্গেই রয়ে যান।

আমাদের বাসার সামনের ঘরটায় ছিল আব্বার চেম্বার—আমরা বলতাম ডাক্তারখানা। ওর একটা নামও ছিল : হেরিং হোমিও ক্লিনিক। আগে বলেছি, হেরিং ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ জার্মান হোমিওপ্যাথ এবং আব্বা যেখানে হোমিওপ্যাথি পড়েছিলেন, তার নাম ছিল হেরিং হোমিওপ্যাথিক কলেজ। বাড়ির বাইরে বড়ো একটা সাইনবোর্ডে ডাক্তারখানার নামের সঙ্গে আব্বার নাম শোভা পেতো। আশে-পাশে আর কারো নাম যে অত বড়ো অক্ষরে লেখা ছিল না, তা আমার কাছে যেমন বিস্ময়ের তেমনি গর্বের ব্যাপার ছিল। আব্বার কাছে বহুজন আসতেন—তাঁদের মধ্যে জ্ঞানীগুণী অনেকে ছিলেন, তবে তখনো তাঁদেরকে চেনার মতো বয়স আমার হয় নি। সেখানে যেসব আলাপ-আলোচনা হতো, তার কিছু ঢেউ অন্দরমহলে এসে লাগতো। এর মধ্যে যেটা আমি ঠিকমতো ধরতে পেরেছিলাম, তা হলো বোমাতঙ্ক।

কোথাও যে একটা যুদ্ধ লেগেছে, সেটা অস্পষ্টভাবে বোঝা গিয়েছিল। তবে যুদ্ধটা যে বাড়ির কাছে চলে এসেছে, তা বোঝা গেল, সকলে যখন কলকাতায় জাপানি বোমা পড়ার ভয় করতে শুরু করলেন, তখন। খাকি পোশাক-পরা এ আর পি-দের কর্মচাঞ্চল্য সেটা বাড়িয়ে দিল। পরীক্ষামূলকভাবে সাইরেন বাজানো এবং নিস্প্রদীপ মহড়া ব্যাপারটাকে নিয়ে এলো ঘরের মধ্যে। বাস্তবিকই জাপানি বোমা পড়লো ১৯৪২এর এপ্রিলে। এই বোমাবর্ষণ নিয়ে লোকের মনোভাব যে মিশ্র ছিল, সেটা পরে বুঝেছিলাম। জাপানি বোমা যেমন মনে এনে দিয়েছিল হরিষ ও বিষাদ, তেমনি মুখে এনে দিয়েছিল অজ্ঞাতনামার ছড়া :

> সা রে গা মা পা ধা নি
> বোম ফেলেছে জাপানি।
> বোমের মধ্যে কেউটে সাপ
> ব্রিটিশ বলে, বাপ রে বাপ।

ব্রিটিশের প্রতি আমার আনুগত্যের কিছু অভাব ছিল না—টাকাপয়সার একদিকে ভিক্টোরিয়া থেকে ষষ্ঠ জর্জ পর্যন্ত রানী ও রাজাদের ছবি আমার সম্ভ্রম উদ্রেক করতো, বংশানুক্রমে সে-ছবি সাজানো ছিল আমার একটা প্রিয় খেলা। একই সঙ্গে ওই ছড়ার ধ্বনিতে এবং বোমার মধ্যে থেকে কেউটে সাপ বেরিয়ে আসার কাল্পনিক চিত্রে যে আমোদ পেতাম, একথা কবুল না করে পারছি নে।

১৯৪২এর শেষদিকে আবার নতুন করে বোমাতঙ্ক দেখা দিলো। বড়োবু তখন

সন্তানসম্ভবা। ডিসেম্বর মাসে আমরা সকলে বসিরহাটে চলে গেলাম। তখন নাগরিকদের কলকাতা ছাড়ার হিড়িক পড়ে গেছে, সুতরাং আমাদের চলে-যাওয়ার মধ্যে কিছু অভিনবত্ব ছিল না। কিন্তু আমার পক্ষে এই ছিল প্রথম কলকাতা-ত্যাগ এবং প্রথম মাতুলালয়-দর্শন। শিয়ালদা থেকে মার্টিন কোম্পানির লাইট রেলওয়ে করে আমরা বসিরহাটে গিয়েছিলাম। সে-ট্রেন এতো ধীরগতিতে চলতো যে অনেকে রেল লাইনের ধারে হাঁটতে হাঁটতে যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলতো অনায়াসে। নামে সাহেবি হলেও, মার্টিন কোম্পানির মালিক ছিলেন বসিরহাটের কৃতী সন্তান সার্ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—যিনি প্রায় নিঃস্ব অবস্থা থেকে নিজের উদ্‌যোগে প্রকৌশলী, ঠিকাদার ও শিল্পপতিরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন, আব্বা বাড়ি করেছিলেন এঁরই নামাঙ্কিত রাস্তার ধারে।

বসিরহাটে সেবার আমরা তিন সপ্তাহ ছিলাম। প্রকৃতপক্ষে এই একবারই মামাবাড়ি যাওয়া হয়েছিল। অনেক পরে একবার সকালে গিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে এসেছিলাম কলকাতায়। বসিরহাটের স্মৃতি আমার খুব অস্পষ্ট। ঘরবাড়ি ও পুষ্করিণী, হারিকেন ও প্রদীপ, নারকেল গাছ ও খেজুরের রস—এসব আবছা মনে পড়ে। আত্মীয়স্বজন অনেকের সঙ্গে সেই প্রথম দেখা হয়েছিল, তবে পরে আর যাঁদের দেখি নি, তাঁদের কারো কথা মনে নেই। তখন মনে হয়েছিল, পুরো জায়গাটা আমার মামু-খালা-নানা-নানিতে ভর্তি।

বসিরহাটে থাকতে একদিন শোনা গেল, কলকাতায় বোমা পড়েছে। আব্বা একাই তখন কলকাতায়। সুতরাং তাঁর জন্যে সবাই খুব উদ্‌বিগ্ন হলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই জানা গেল, পার্ক সার্কাস এলাকায় বোমা পড়ে নি। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

আমার বড়ো ভাগ্নে আবদুল্লাহ্ আল মামুন ফেরদৌসী (বহুকাল প্রবাসে থাকার পরে এখন ঢাকায় মুখমণ্ডলের শল্য চিকিৎসা করে) জন্মালো ১৯৪৩ সালের ৭ জানুয়ারি। দুলাভাইয়ের আব্বা—মাদারীপুরে ম্যারেজ রেজিস্ট্রার—পৌত্রের মুখদর্শন করতে বোমাতঙ্কের মধ্যেও বহু পথ পেরিয়ে বসিরহাটে এসে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁর শ্মশ্রুমণ্ডিত চেহারা আমার সম্ভ্রমের উদ্রেক করেছিল। বেশ ঘটা করে মামুনের আকিকা হলো—সেই প্রথম বোধহয় আমি খাসি জবাই করতে দেখলাম। কোরবানি নিশ্চয় তার আগে পার করেছি, তবে, মনে হয়, তা আমার দৃষ্টির আড়ালে ঘটেছিল। আকিকার উৎসর্গীকৃত খাসি দুটির জন্যে মায়া লেগেছিল। সেই উপলক্ষে প্রথম জানলাম, মেয়ে হলে আকিকায় একটি খাসি এবং ছেলে হলে দুটি খাসি জবাই করতে হয়।

জানুয়ারির মাঝামাঝি কলকাতায় ফিরে এলাম সকলে। এসেই বাড়ি বদলাবার তোড়জোড়। রাস্তার ওপারে একটা নতুন দোতলা বাড়ি উঠেছে—তার একতলায় আমরা উঠে এলাম। বাড়ির নম্বর ৭এ, মালিক ফজলুর রহমান ছিলেন ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসের কর্মকর্তা হাফিজউদ্দীনের (পাকিস্তান আমলে আই জি, রাষ্ট্রদূত ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) সম্বন্ধী। আগের বাসার চেয়ে এটা সুপরিসর, আমিও একটু বড় হয়েছি। পেছন ফিরে মনে হয়, এখানে এসে আমার নতুন যাত্রা শুরু হলো।

৩.

৭এ কংগ্রেস একজিবিশন রোডে আসার পরে, পাশের ৫ নম্বর বাড়িতে, আমার জীবনের প্রথম বন্ধু পেলাম। তার নাম বনি, ভালো নাম মাহমুদ আরিফ।

বনিদের পরিবারের কথা একটু বিস্তৃত করে বলতে চাই। তার বাবা ডা. কাজী মোহাম্মদ আরিফ ছিলেন বক্ষব্যাধি-বিশেষজ্ঞ এবং খুব সম্ভব, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অবৈতনিক চিকিৎসক (অনারারি অ্যাটেনডিং ফিজিশিয়ান)। মায়ের দিক থেকে তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন নদিয়ার মির্জা ইতিসামউদ্‌দীন—বাঙালিদের মধ্যে এবং যতদূর জানা যায়, ভারতীয়দের মধ্যেই, তিনি প্রথম ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। অনেকে রামমোহন রায়কে প্রথম ইংল্যান্ডগামী বাঙালি বলে গণ্য করেন, তবে তিনি বিলেত যান ১৮৩০এ, আর মুঘল সম্রাট শাহ্ আলমের হয়ে ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের কাছে ব্যর্থ দৌত্যে মির্জা ইতিসামউদ্‌দীন যান ১৭৬৫তে। ফ্রান্স হয়ে ইংল্যান্ডে পৌঁছে সেখানে বেশ কিছুকাল থেকে মির্জা দেশে ফেরেন ১৭৬৭তে এবং তাঁর ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন *শিগার্ফনামা-এ-বিলায়েত* নামে ফারসি পাণ্ডুলিপিতে (১৭৭৯)। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক সামরিক কর্মকর্তা—জেমস এডওয়ার্ড আলেকজান্ডার—লন্ডন থেকে তার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৮২৭ সালে। পরে আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্ এর বঙ্গানুবাদ করেন *বিলায়েতনামা* (ঢাকা, ১৯৮১) নামে। এখন কায়সার হক এর নতুন ইংরেজি-অনুবাদ করেছেন *দি ওয়ানডার্স অফ বিলায়েত* নামে (লন্ডন, ২০০২)। মির্জা ইতিসামউদ্‌দীন যে ইরানি বংশোদ্ভূত প্রসিদ্ধ ভারতীয় ইতিহাসবেত্তা শিহাবুদ্‌দীন তালিশের পৌত্র, একথা জানিয়ে অনুবাদের ভূমিকায় হবিবুল্লাহ্ লিখেছেন : 'অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর [তালিশের] পৌত্রের বাঙালি বনে যাওয়া এবং তাঁর লেখায় বাংলাদেশের প্রতি মমতাবোধ আশ্চর্যজনক।' মির্জার বংশধর খান সাহেব কাজী মোহামেদ সদরুল ওলা (কর্নেল নূরুজ্জামান ও অধ্যাপক নূরননাহার ফয়জননেসার পিতা) *History of the family of Mirza I'tesamuddin of Qusba, Panchnoor* (কলকাতা, ১৯৪৬) লেখেন, তাতে ডা. আরিফের লেখা পরিশিষ্ট সংযোজিত হয়। গ্রন্থকারের উত্তরপুরুষেরা বইটির একটি বর্ধিতকলেবর সংস্করণ অনেক পরে প্রকাশ করেন (ঢাকা, ১৯৮৪)।

বনির নানা ছিলেন মেজবাহউদ্‌দীন আহমদ চৌধুরী—ফরিদপুরের অন্তর্গত কার্তিকপুরের জমিদার। ৫ নম্বর বাড়ির একতলায় তিনি থাকতেন স্ত্রী, ভগ্নী, বড়ো মেয়ে-জামাই-নাতি এবং অবিবাহিত এক কন্যা (পরে প্রসিদ্ধ চিকিৎসক জিন্নুর আহমদ চৌধুরীর স্ত্রী) ও এক পুত্র নিয়ে। তাঁদের চালচলনটা ছিল অনেক পরিমাণে সাহেবি। বাবুর্চি-খানসামা-বয়-আয়া থাকতো তাঁদের সকলের সেবায়। টেবিলে খাবার সাজিয়ে খানসামা ঘণ্টা বাজাতো এবং সেই ঘণ্টাধ্বনি শুনে উপস্থিত সকলকে খেতে আসতে হতো। ও-বাড়িতে যদিও আমার গতিবিধি ছিল অবাধ, কিন্তু আমাদের বাড়ি থেকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে, ঘণ্টাধ্বনি শুনলে যেন আর এক মুহূর্তও সেখানে না থাকি। বনির নানা ছিলেন ক্যালকাটা ক্লাবের মেম্বর। পড়ন্ত বিকেলে রোজই বাঁধা সময়ে কালো অস্টিনে করে তিনি ক্লাবে যেতেন। বনি ও আমিও মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে গাড়িতে ওঠার সুযোগ পেতাম—তিনি ক্লাবে নেমে গেলে আমরা দুজন গাড়ি করে ফিরে আসতাম, পরে

নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ি আবার তাঁকে ক্লাব থেকে নিয়ে আসতো। কখনো কখনো তিনি গাড়ি ছাড়তেন না—একেবারেই ফিরতেন। ফেরার সময়টাও ছিল তাঁর বাঁধা।

বিকেলের আলো পড়ে এলে—নানার ক্লাবে যাওয়ার সময়ে—বাড়ির কোনো ভৃত্য ফুটপাথের ওপরে বেতের একটা টেবিল ও চেয়ার পেতে দিতো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে এসে বসতেন নানার বোন—ফুটকি বেগম বলে তিনি পরিচিত ছিলেন। ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে আসতেন হাতে পঞ্চাশটা সিগারেটের একটা টিন এবং তার ওপরে দেশলাইয়ের একটা বাক্স ধরে। সাধারণত তিনি নাইন-নাইন-নাইন সিগারেট খেতেন। বনি ও আমাকে তিনি প্রায়ই সুযোগ দিতেন আনকোরা সিগারেটের টিন খুলে দেওয়ার। টিনের ঢাকনিতে দাঁতমতো কী একটা বসানো থাকতো—নখ দিয়ে সেটা সরিয়ে সিগারেটের ওপরের আবরণটায় গেঁথে ঢাকনিটা চক্রাকারে ঘোরালেই সেটা কেটে যেতো। কাজটা করতে খুব মজা পেতাম, শুধু ভয় লাগতো, পাছে সিগারেট নষ্ট করে ফেলি। সন্ধে নেমে এলে নানি তাঁর আসন ত্যাগ করে ঘরের ভেতরে চলে যেতেন—কাজের লোক চেয়ার-টেবিল সরিয়ে নিতো। ফুটপাথে চেয়ারে বসে কেন যে কেবল সিগারেট খেতেন নানি, তাও কিছু সময়ের জন্যে, সেটা ঠিক বুঝতে পারতাম না। তবে এটা বুঝতে পারতাম যে, কৌতূহলী পথিকের দৃষ্টি তাঁর প্রতি ধাবিত হলেও তিনি সেটা একেবারেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনছেন না।

বনি ও আমার খেলার উপকরণ ছিল খুব সীমাবদ্ধ। যদিও বনির একটু বেশি এবং আমার একটু কম সংখ্যায় স্প্রিংয়ের খেলনা ছিল, তবু দম দিয়ে তা চালিয়ে আর কতোক্ষণে কাটানো যায়! ট্রাম লাইনের পশ্চিমে যাওয়া আমার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল—পাছে ট্রাম বা গাড়ি-চাপা পড়ি, এই ভয়ে। বনিকেও কখনো সেই গণ্ডি পার হতে দেখি নি। আমাদের খেলা ছিল ট্রামের টিকিট, সিগারেটের খালি প্যাকেট ও দেশলাইয়ের বাক্স কুড়িয়ে জমা করা এবং সময় শেষ হলে তা গুণে জয়-পরাজয় স্থির করা। আরেকটা খেলা ছিল, আমাদের সামনে চলে যাওয়া গাড়ির নম্বর লিখে রাখা—যে বেশি নম্বর লিখতে পারতো, তাকেই জয়ী মানা হতো। ফুটপাথে অবশ্য লাট্টু খেলা চলতো, পরে ঘুড়িও খেলেছি এবং কখনো কখনো বোনদের ভীতি উপেক্ষা করে ঘুড়ির সুতোর মাঞ্জা নিজে বানিয়েছি। তবে ঘরের মধ্যে—সাধারণত বনিদের বাড়িতে—লুডু ও ক্যারাম খেলাই ছিল সবচেয়ে উপভোগ্য।

এই উপভোগকে বহু গুণে বাড়িয়ে তুলেছিলেন বনির ছোটো মামা। তিনি কেবল আমাদের খেলতে উৎসাহিত করতেন না, ক্যারমের কোন ঘুঁটি কোথায় লক্ষ্য করে মারতে হবে, সেসব কৌশলও শিখিয়ে দিতেন। বনির বড়ো মামা থাকতেন আলাদা বাড়িতে। তাঁর ছেলে গাজিউল হক (শিপিং ও ব্যাংকিংয়ের সঙ্গে যুক্ত বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী)—বয়সে আমাদের কিছু বড়ো—প্রায়ই বনিদের বাসায় আসতেন। আর কাউকে না জোটাতে পারলে এই তিনজনকে নিয়েই ছোট মামা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন। যদি তাঁকে চতুর্থ জনের জায়গা নিতে হতো, তাহলে ঘুরে ঘুরে তিনি সবারই অংশীদার হতেন এবং খেলার পয়েন্ট সেভাবে ভাগ করা হতো। খেলার সময়ে লজেন্স, চকলেট ও চুয়িংগাম বরাদ্দ থাকতো, তারপর কোনো এক ছুটির দিনে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হতো—মামা সাধারণত

বই দিতেন পুরস্কারস্বরূপ। বনি ও আমি মাঝে মাঝে বড়ো মামার বাড়িতে গিয়ে মামি সালিহা আহমেদের আপ্যায়নে তুষ্ট হয়ে ফিরতাম (সদ্যপ্রয়াত মামিকে ঢাকার প্রায় সব সেমিনারে উপস্থিত থাকতে এবং সুযোগ পেলে মন্তব্য করতে দেখা যেতো, দেখা যেতো কূটনৈতিক পার্টিতেও)।

বনিদের বাড়ির চারতলায় থাকতেন ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ হোসেন—তাঁর জামাতা মোহাম্মদ আলী অচিরে সোহ্‌রাওয়ার্দী-মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং পরে মোহাম্মদ আলী বগুড়া নামে সুপরিচিত হন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে। ক্যাপ্টেন হোসেনের যুবক পুত্র বেশ রাত করে বাড়ি ফিরতেন। চারদিকে নিস্তব্ধতার মধ্যে তাঁর নিয়মিত সশব্দ প্রত্যাবর্তন প্রতিবেশীদের কৌতূহল আর উদ্রেক না করলেও বিরক্তি উৎপাদন করতো।

৪.

পার্ক সার্কাসে তখনো গ্যাসের বাতি জ্বলতো। সন্ধ্যাবেলায় সিঁড়ি কাঁধে নিয়ে একজন বাতির পর বাতি জ্বালিয়ে যেতো—দেখতে ভারি ভালো লাগতো। ভোরবেলায় পাইপ দিয়ে পানি ঢেলে রাস্তা পরিষ্কার করা হতো। তখনো আমাদের এলাকায় ফুটপাতে তেমন লোক ঘুমোতো না—এক-আধজন ঘুমোলেও রাস্তা ধোওয়ার আগেই উঠে পড়তো। ডিপো থেকে ট্রাম বেরোলে মনে হতো, দিনের কাজকর্ম শুরু হলো। তার আগেই কিন্তু ট্রামডিপোর সামনের রেস্টুরেন্ট দুটি খুলে যেতো। কাজে বেরোবার আগে ট্রামের কর্মীরা অনেকে এখানে খেয়ে নিতেন। আমার মর্নিং স্কুলের সময়ে বাড়িতে প্রায়ই নাশতা হতো না। নগদ পয়সায় একটি রেস্টুরেন্টে বসে নানরুটি আর নেহারি খেয়ে নিয়ে স্কুলে যেতাম।

আমাদের পাড়া-প্রতিবেশীদের কথা এখানে বলে নিলে হয়তো আমার বাল্যকালের পরিবেশটা বোঝানো সহজ হবে। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশীদের মধ্যে ছিলেন মেজবাহউদ্‌দীন আহমদ চৌধুরী ও ক্যাপ্টেন মুহম্মদ হোসেন—সে কথা বলেছি। তাঁদের পাশে থাকতেন ডাক বিভাগে কর্মরত কিংবা সদ্য অবসরপ্রাপ্ত আবদুল গফুর। আমাদের অন্যদিকে ছিলেন কফিলউদ্দীন নামে এক ব্যবসায়ী, তাঁদের নিচের তলায় বাস করতো এক বর্মি পরিবার। তাঁদের পড়শি ছিলেন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য—অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ—মুজিবুর রহমান। তাঁর বিদুষী কন্যা রোকেয়া রহমান (পরে কবির) আধুনিকা হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন (তাঁর ছোটো বোন রুবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহপাঠী ছিল)। আধুনিকা হিসেবে খ্যাতি ছিল লায়লা হকেরও (পরে সামাদ)—খান সাহেব আমিনুল হক ওরফে ডোডো মিয়ার কন্যা। তাঁরা যে ঠিক কোন বাড়িতে থাকতেন, এখন তা মনে পড়ে না। লায়লার ভাই গোরাই ওঁদের মধ্যে এখনো বহালতবিয়তে এবং খোশমেজাজে আছেন—সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে মাঝে মাঝে দেখা হলে খুব আদর করেন।

উলটোদিকের ফুটপাথে ছিল দাস ভবন নামে বড়ো একটা ফ্ল্যাট-বাড়ি। কতো

পরিবার যে তাতে বাস করতো, তা বলা শক্ত। একটায় থাকতেন ফজলুল হক সেলবর্সী—বয়সে তিনি ছিলেন আব্বার কয়েক বছর বড়ো। সুনামগঞ্জের যে-গ্রামে তাঁর জন্ম হয়, সে-গ্রামের নামানুসারে ওই পদবি তিনি নিজের নামের সঙ্গে জুড়ে নিয়েছিলেন। নজরুল ইসলাম ও মুজফ্ফর আহ্মদের উদ্‌যোগে যখন *নবযুগ* পত্রিকা বের হয়, তখন তিনিও তার মধ্যে ছিলেন। তিনি এক সময়ে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন এবং সেই কারণে কয়েক বছরের জন্যে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। *কাজী নজরুল ইসলাম—স্মৃতিকথা* (পুনর্মুদ্রণ; ঢাকা, ১৯৭৩) বইতে মুজফ্ফর আহ্মদ অবশ্য অভিযোগ করেছেন যে, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় সেলবর্সী তাঁদের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হয়েছিলেন। 'সেন্ট হেলেনা' নামে তাঁর একটি কবিতা সেকালে খুব বিখ্যাত হয়েছিল, আমি সেটা পড়েছিলাম আবদুল কাদির ও রেজাউল করীম-সম্পাদিত *কাব্য-মালঞ্চে* (কলকাতা, ১৯৪৫)। সেলবর্সী আমাকে বলেছিলেন যে, কবিতাটির ফরাসি অনুবাদ নেপোলিয়ন-সম্পর্কিত একটি ফরাসি সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ফ্রান্সে প্রকাশিত হয়। আমি যখন তাঁকে দেখি, তখন তিনি দীর্ঘকাল ধরে সাপ্তাহিক *মোহাম্মদীর* সহকারী সম্পাদক। এই চিরকুমারের শখ ছিল সিনেমা—বিশেষ করে, ইংরেজি সিনেমা—দেখা। তিনি আমাকেও মাঝে মাঝে সিনেমা দেখতে নিয়ে যেতেন এবং তারপর আমজাদিয়া বা ওই ধরনের কোনো রেস্টুরেন্টে কিছু খাইয়ে বাড়ি পৌঁছে দিতেন।

দাস ভবনের আরেক ফ্ল্যাটে থাকতেন মোহাম্মদ মোদাব্বের—দৈনিক *আজাদের* বার্তা-সম্পাদক এবং তার ছোটোদের পাতা মুকুলের মহফিলের পরিচালক বাগবান। তিনি ছিলেন *দি মুসলমান*-সম্পাদক মৌলভি মুজিবুর রহমানের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁর স্ত্রী হোসনে আরা ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ভ্রাতুষ্পুত্রী—আমাদের দূর সম্পর্কের খালাতো বোন। এক সময়ে তাঁরা উভয়েই ঘোর কংগ্রেসি ছিলেন এবং সেই সূত্রে কারাবরণের অভিজ্ঞতা ও কেবল খদ্দর পরার অভ্যাস তাঁরা অর্জন করেছিলেন। আমি যে-সময়ে তাঁদের দেখেছি, তখন তাঁরা মুসলিম লীগের রাজনীতিতে আস্থাবান। মোহাম্মদ মোদাব্বের আমাকে মুকুলের মহফিলের সদস্য করে নিয়েছিলেন। ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখে তখন এতোই রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম যে, বারবার করে তা পড়তে গিয়ে কাগজটার দফা রফা হয়েছিল।

একই বাড়ির অন্য ফ্ল্যাটে ছিলেন বদিউজ্জামান—তিনি চাকরি করতেন কলকাতা কর্পোরেশনে। তাঁর কন্যা হোসনে আরা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র-সচিব এনায়েত করিমের সহধর্মিণী হয়েছিলেন, স্বামীর মৃত্যুর পরে নিজেও কাজ করেছিলেন পররাষ্ট্র-মন্ত্রণালয়ে।

দাস ভবনের অপর একটি ফ্ল্যাটে বাস করতেন তিন ভাই—নাসিরউদ্দীন, আনিস চৌধুরী ও জামিল চৌধুরী, তিন বোন—শামীমা চৌধুরী, নাজমা চৌধুরী (এখন সিদ্দিকী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক) ও সালমা চৌধুরী (এখন খান ও জাতিসংঘের সিডো কমিটির নির্বাচিত চেয়ারপার্সন) এবং তাঁদের মা। জামিল চৌধুরী (আমাদের সাংস্কৃতিক জগতে সুপরিচিত) আমার দুই ক্লাস ওপরে পড়তেন; তিনি আস্ত রেডিও-সেট খুলে আবার জোড়া দিতে পারতেন শুনে তাঁদের ফ্ল্যাটে গিয়ে

একবার খোলস-ছাড়া বেতার বাজতে শুনে এসেছিলাম। তাঁদের সবচেয়ে বড়ো ভাই কুদরতে গনিকে তখন দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

আনিস চৌধুরীর লেখক-জীবনের সূচনা তখনই হয়েছে। তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে ফজলে লোহানী (পরে *অগত্যা*-সম্পাদক), সৈয়দ নাসিরউদ্দীন হায়দার (*অগত্যার* প্রকাশক) ও সৈযদ আনোয়ারুল হাফিজ (বিখ্যাত চিকিৎসক) তখন লিখতেন। ফজলে লোহানী ও তাঁর অগ্রজ ফতেহ্ লোহানী (অভিনেতা) থাকতেন তাঁদের ভগ্নী হুসনা বানু খানম ও ভগ্নীপতি ডা. ফজলুল করিমের বাসায়—আমাদের বাড়ির পেছন দিকে। সংগীতশিল্পী হিসেবে হুসনা বানু খানম তখনই নাম করেছিলেন এবং অচিরে প্রকাশিত তাঁর গ্রামোফোন-রেকর্ড আমরা সংগ্রহ করেছিলাম। আমাদের বাড়ির পেছনে আরো থাকতেন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য (এম এল সি) আবুল কাসেম—আমাদের মাতুল সৈয়দ মোকাররম আলীর ভায়রা এবং সেইসূত্রে আমাদের খালু। তাঁর তিন ছেলে : আবুল আসেম (বৈমানিক, ছিনতাইকারীর হাতে ঢাকায় নিহত), আবুল হাশেম (যতদূর জানি, পাকিস্তানবাসী) এবং আমার বন্ধু আবু সালেম (মৃত বৈমানিক)।

দাস ভবনের পাশ দিয়ে যে-রাস্তা আমাদের স্কুলের দিকে চলে গিয়েছিল, যতদূর মনে পড়ে, সে-রাস্তার ওপরেই বাস করতেন এস ওয়াজেদ আলি, বি এ (ক্যান্টাব), বার-অ্যাট-ল। তাঁর আশেপাশে থাকতেন সোহ্‌রাওয়ার্দী-মন্ত্রিসভার আমলে পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি এবং পূর্ব বাংলার প্রথম মন্ত্রিসভার সদস্য মফিজউদ্দীন আহ্‌মদ। তাঁর বড় ছেলে এ বি এম গোলাম মোস্তফা (পরে বাংলাদেশ সরকারের সচিব ও মন্ত্রী) আমার এক ক্লাস ওপরে পড়তেন; মেজো ছেলে গোলাম ফরহাদ স্কুলে আমার সহপাঠী; এবং তার ছোটো গোলাম মোরশেদ (পরে পুলিশের বড়োকর্তা) পড়তো আমাদের নিচে। তাদের বাড়ি ছাড়িয়ে গেলে পড়তো এম এল সি আবুল কাসেমের ভ্রাতা পশু-চিকিৎসক ডা. আবদুল আহাদের বাড়ি ও ক্লিনিক—তাতে অসুস্থ পশুদের থাকবার ব্যবস্থা আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করতো।

কংগ্রেস একজিবিশন রোডের ১৬ নম্বর বাড়িতে থাকতেন খান বাহাদুর আতাউর রহমান। সে-বাড়ির পাশ ঘেঁষে যে-পথ চলে গেছে দিলখুশা স্ট্রিটের দিকে, তার ওপরেই ছিল খ্যাতনামা অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের বাসভবন। ওঁর স্ত্রীপুত্র আমাদের বাড়িতে আসতেন। কীভাবে চলচ্চিত্র বানায়, তা দেখার অদম্য আগ্রহ বাড়িতে আমাদের অনেকেরই ছিল। আমাদের তাগাদায় অতিষ্ঠ আব্বা একদিন ছবি বিশ্বাসকে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে আমাকে বললেন, তাঁকে ডেকে আনতে। আমি সোৎসাহে ও সভয়ে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁকে ধরে নিয়ে এলাম। আব্বার প্রস্তাব শুনে তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'তা হবে 'খন।' কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠে নি।

ওদিকেই বোধহয় আহমেদ শামসুল ইসলাম (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক—তাঁকে সবাই বড়ো ভাই বলে ডাকতো) এবং তাঁর ভাইয়েরা থাকতেন। এঁদের মধ্যে হামেদ শফিউল ইসলাম (খোকা ভাই—এককালে সাংবাদিক, পরে বাংলাদেশ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব) আমাদের দু-এক

ক্লাস ওপরে পড়তেন, পরে তাঁর সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল।

ওই পথ দিয়ে এগোলে পৌঁছে যাওয়া যেতো কামালউদ্দিন খান ও সুফিয়া কামালের বাড়িতে। সুফিয়া কামাল আব্বাকে ভাই বলে ডাকতেন, সেই সূত্রে তিনি আমাদের ফুফু। তাঁর বড় মেয়ে দুলুকে চিনতাম। ওঁদের শয়নকক্ষ থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত—এ দু জায়গায়ই সুফিয়া কামাল কবিতা লিখতেন—আমার ছিল অবাধ গতি। আশৈশব তাঁর যে-স্নেহ পেয়েছি, তার তুলনা হয় না। ফুফাও এক্ষেত্রে কম যেতেন না।

৫.

১৯৪২এর শেষে জাপানিরা পুরো বর্মাই দখল করে নেয়। চট্টগ্রাম ও মণিপুর দিয়ে বর্মাপ্রবাসী ভারতীয়রা দেশে ফিরে আসে এবং বর্মি উদ্বাস্তুরা আশ্রয় নেয় ভারতে। ১৯৪৩ সালে একদিন দেখতে পেলাম,—ফুটপাত দিয়ে নয়,—প্রায় পুরো রাস্তা জুড়ে বর্মি শরণার্থীর দল পায়ে হেঁটে আসছে। দেহ তাদের অবসন্ন, পরনে শতচ্ছিন্ন কাপড়, জুতোরও সেই দশা। কারো কারো পায়ে জুতোর বদলে বিচালি বাঁধা। দল থেকে বেরিয়ে পড়ে বেশ কয়েকজন উদ্বাস্তু আমাদের পাশের বাড়িতে বর্মি পরিবারের ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়লো। কিছুক্ষণ কান্নাকাটির আওয়াজ, পুনর্মিলনের আনন্দ। দলের বাকিরা তখন আরো এগিয়ে গেছে। তারপর বেশ কয়েকদিন বর্মি গৃহকমর্ত্রীকে দেখলাম সামনের বারান্দায় বসে থাকতে। পরে আরো দু-তিনদিন দল বেঁধে বর্মিরা ও-পথ দিয়ে গেল। ভদ্রমহিলা দৌড়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলে ফিরে আসতেন। হয়তো আরো কারো আগমনের প্রত্যাশায় ছিলেন তিনি, কিন্তু আর কেউ আসে নি তাঁদের বাড়িতে। শরণার্থীদের আসা এক সময়ে বন্ধ হয়ে গেল। ভদ্রমহিলা আরো কয়েকদিন সামনের বারান্দায় বসে থেকে ঘরের মধ্যে ফিরে গেলেন।

প্রতিরক্ষামূলক প্রস্তুতি হিসেবে পরিখা খোঁড়া হয়েছিল আমাদের বিচরণক্ষেত্র পার্ক সার্কাসের বড়ো ময়দান ও ছোটো পার্কে। তাছাড়া, জায়গায় জায়গায় তোলা হয়েছিল ব্যাফ্‌ল-ওয়াল—অভিধানে তার বাংলা দেখছি নিয়মন-দেয়াল। বোমা পড়লে তার টুকরো ইত্যাদির ধাক্কাটা সামলাবার জন্যে এই দেয়াল তোলা। ফুটপাতের ওপরেই তা তোলা হতো—তাতে ফুটপাত কিছুটা সংকীর্ণ হয়ে যেতো বটে, তবু সেখান দিয়ে চলাফেরা করা যেতো। এই ব্যাফ্‌ল-ওয়াল আমাদের লুকোচুরি খেলার একটা উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্যাফ্‌ল-ওয়াল ছাড়াও স্থানে স্থানে তৈরি করা হয়েছিল এয়ার-রেড শেলটার—পথিকেরা যেন বিপদের সময়ে দরকারমতো আশ্রয় নিতে পারে।

১৯৪৩ ও ১৯৪৪এ কয়েকবারই জাপানি উড়োজাহাজ বোমা ফেলে যায়। শহর নিষ্প্রদীপ থাকতো। শত্রুপক্ষের আগমন টের পেলেই সাইরেন বাজতো। সাইরেনের আওয়াজ পেলে ঘরের সব বাতি নিভিয়ে দিতে হতো অথবা, দরজা-জানলা বন্ধ করে আলো যাতে বাইরে না যায়, তার ব্যবস্থা করতে হতো। তারপর অল-ক্লিয়ারের সাইরেন না বাজা পর্যন্ত সকলকে ঘর ছেড়ে সিঁড়ির নিচে আশ্রয় নিতে হতো। আমরা সকলে তাই করতাম, কিন্তু সিঁড়ির নিচে ছোটোবুকে প্রায়ই পাওয়া যেতো না।

সাধারণত মেজোবু—কখনো কখনো মা—তখন আবার বাড়ির মধ্যে ঢুকতেন তাকে খুঁজতে। বেশি খুঁজতে হতো না, তাকে পাওয়া যেতো রান্নাঘরে। বোমার আঘাতে যদি মরে যায়, এই আশঙ্কায় মৃত্যুর আগে সে ভরপেট খেয়ে নেওয়ার আয়োজন করতো। খাওয়াটা অর্ধেকের বেশি কখনো এগোতো না। মা এসে ডেকে নিয়ে যেতেন, মেজোবু এলে ভাতের বদলে তাকে বকুনি খেতে হতো।

একবার আব্বা গিয়েছিলেন খিদিরপুরে—তখন সাইরেন পড়লো। অল-ক্লিয়ারের সংকেত পাওয়ার পরে শোনা গেল, জাপানিরা খিদিরপুরেই বোমা ফেলেছে ডক-এলাকায়। আমরা খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে থাকলাম। আমি সামনের ফুটপাতে গিয়ে ট্রামে ফিরে আসা যাত্রীদের মধ্যে আব্বার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলাম—তিনি ফিরে না আসা অবধি।

নিষ্প্রদীপ মহড়া হতো প্রায়ই। তখনো সাইরেন বাজতো, আলো নিভিয়ে সিঁড়ির তলায় ঠাঁই করে নিতে হতো। এ আর পি-রা হুইস্‌ল বাজাতো আর দৌড়াদৌড়ি করতো। একবার যেন কার বাড়ির জানলার খড়খড়ি দিয়ে একটু আলো দেখা দিয়েছিল। ফলে ভদ্রলোকের জরিমানা হয়েছিল।

সাইরেন বাজলে আমার যেমন ভয় লাগতো, তেমনি সিঁড়ির নিচে জড়োসড়ো হয়ে সময় কাটাতে মজাও পেতাম। সিঁড়ির সামনে স্তূপ করে রাখা থাকতো বালির বস্তা—আঘাতের ঝাপটা নেওয়ার জন্যে। সেগুলো কেমন বেমানান মনে হতো।

মিত্রশক্তি যে ভালো আর অক্ষশক্তি যে খারাপ, এ-বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। বিশেষ অপছন্দ করতাম হিটলারকে। ওরকম হাস্যকর গোঁফওয়ালা একটি লোক নাকি সব অশান্তির মূল। একবার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে এক অনুষ্ঠানে ওরকম ঝুটো গোঁফ লাগিয়ে, সামরিক পোশাক পরে, বাহুতে স্বস্তিকাচিহ্ন ধারণ করে, সৈয়দ আনোয়ারুল হাফিজ হিটলারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বক্তৃতা করেছিলেন। তিনি যে-ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা ছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব ধ্বনিপুঞ্জ—তবে সেটা জার্মান ভাষা বলে ধরে নিতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর গলার ওঠানামা এবং সর্বদেহের উত্তেজনা শ্রোতাদের রোমাঞ্চিত করতে সমর্থ হয়েছিল।

বিবদমান পক্ষ সম্পর্কে আমাদের ভালোমন্দের ধারণা একটু চিড় খেলো সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ গঠনের সংবাদে। বড়োরা তর্ক করতেন, আমরা শুনতাম; অনেক সময়ে মা-আব্বার কাছে বুঝতেও চাইতাম, ব্যাপারটা কী। এক দলের মতে, সুভাষ যা করেছেন, তা ঠিক করেছেন; জাপানিরা এলো বলে, সেই সঙ্গে আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ এসে দেশটাকে স্বাধীন করে দেবে। আরেক পক্ষের মতে, সুভাষের বিবেচনা ভুল; জার্মানি বা জাপান কেউ আমাদের স্বাধীনতা দেবে না, আমাদের প্রভুর বদল হবে মাত্র। মনে পড়ে, রেডিওর কাঁটা ঘুরিয়ে সুভাষের বক্তৃতা শোনার একটা ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছিল দু-এক রাতে।

সব কল্পনা-জল্পনার অবসান ঘটিয়ে জার্মানির হার হলো—হিটলার আত্মহত্যা করলেন (নতুন জল্পনা শুরু হলো আত্মহত্যাকারী আদৌ হিটলার কিনা তা নিয়ে)। তার কিছুদিনের মধ্যে জাপানে অ্যাটম বোমা পড়লো, আত্মসমর্পণ করলো জাপানিরা। কী ভয়াবহ ব্যাপার যে ঘটে গেল, তা বুঝতে আমাদের অনেক সময় লেগেছিল।

মিত্রশক্তির বিজয়ে স্কুলের ছুটি হলো একদিন; সেই সঙ্গে পার্ক শো হাউজে বিনি পয়সায় সিনেমা দেখার জন্য একটা টিকিটও পাওয়া গেল। যেহেতু স্কুল থেকে টিকিট দিয়েছে, সেহেতু অভিভাবক ছাড়াই আমাকে সিনেমা দেখার অনুমতি দেওয়া হলো।

অভিভাবকদের কাছে আবদার করে পয়সা নিয়ে মিত্রশক্তির চার পতাকা আর মোমবাতি কিনে এনেছিলাম। বিজয়-দিবসের সন্ধ্যায় ডাক্তারখানার দরজার একপাশের জানলায় ব্রিটেন ও আমেরিকার এবং অন্য জানলায় রাশিয়া ও চীনের পতাকা কোনাকুনি করে টাঙিয়ে, তার নিচে অর্ধচন্দ্রের আকারে মোমবাতির সারি জ্বালিয়ে আমার উৎসব শেষ হয়েছিল। তবে সারা পাড়ায় আনন্দের যে-ঢেউ জেগেছিল, তা সামান্য ছিল না।

৬.

আসলে যুদ্ধের ভয়ালতা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার হয় নি, উপলব্ধি করার বয়সও হয় নি। কিন্তু যুদ্ধের একটা মারাত্মক ফল দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা বেশ কাছে থেকে দেখতে পেয়েছিলাম।

জানা যায়, সে-বছর ফসল কম হয়েছিল; জাপানিরা বর্মা দখল করায় সেখান থেকে কিংবা থাইল্যান্ড ও ইন্দোচীন থেকে নিত্যকার চাল আমদানি করা যায় নি; জাপানিদের বিরুদ্ধে সরকার পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করায় চট্টগ্রাম অঞ্চলে নৌকো ইত্যাদি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল—তাতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চাল নেওয়াও সম্ভবপর হয় নি। অন্যদিকে সেনাবাহিনীর জন্যে চাল সংগ্রহ করা হয়েছিল; যেসব প্রদেশে উদ্‌বৃত্ত চাল ছিল, বাংলার জন্যে তারা তা ছাড়তে চায় নি। আশঙ্কায় ও লোভে চাল মজুত করার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। ১৯৪২এই চালের দাম বাড়তে শুরু করে। অন্ন ও আশ্রয়ের আশায় ১৯৪৩এ দলে দলে মানুষ গ্রাম ছেড়ে ছুটে আসতে থাকে কলকাতায়।

এতো লোককে অন্ন ও আশ্রয় দেওয়ার সংগতি কলকাতার ছিল না। লোকে এসে ফুটপাত জুড়ে রইলো। ভাত চাইবার সাহস হারিয়ে 'ফ্যান দাও' বলে আবেদন জানাতে থাকলো।

১৯৪৩এ, বেশ স্পষ্টই মনে পড়ে, অনাহারক্লিষ্ট নরনারী শিশুবৃদ্ধ আমাদের পাড়ায় এসে আছড়ে পড়লো। প্রথমদিকে সকলেই কিছু কিছু সাহায্য করতে চেষ্টা করেন। চাল ঝেড়ে যে খুদ বেরোতো তা ফেলে না দিয়ে ফ্যানের সঙ্গে মিলিয়ে মেজোবু একরকম জাউয়ের মতো তৈরি করতো। তারপর রান্নাঘরের পেছন দিকের দরজা দিয়ে তা ক্ষুধার্তদের দেওয়া হতো। খুদ দূরে থাক, শুধু ফ্যান দিয়েও কুলোনো যেতো না। অন্নহীন লোকের সংখ্যা যতো বাড়তে থাকলো, শুভার্থীদের বিপদের আশঙ্কা ততো ঘনিয়ে আসতে লাগলো। যেখানেই কেউ ভাত বা ফ্যান দিতো, সেখানেই মানুষ ভিড় করতো, বন্ধ দরজায় করাঘাত করতো ক্রমাগত। পাছে দরজা ভেঙে লোকে ঘরে ঢুকে পড়ে, সেই ভয়ে ঘরে অন্নসত্র বন্ধ করতে বললেন আব্বা। শুধু দরজা নয়, সব জানলা বন্ধ করে রাখতে বললেন—যাতে মানুষের এই দুর্দশা চোখে না দেখতে হয়। উদ্‌গত

অশ্রু বন্ধ করে মেজোবু আদেশ পালন করলো।

দরজা-জানলা তো কখনো না কখনো খুলতে হয়। সুতরাং জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালসার মানুষেরা চোখে না পড়ে পারে নি। দু পায়ে ভর দিয়ে চলতে পারছে না—দু হাত-দু পা ফুটপাতে দিয়ে চতুষ্পদের মতো চলছে; ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে খাচ্ছে; মরে পড়ে থাকছে—সবই কিছু না কিছু দেখতে পেয়েছি। সরকারি গাড়ি নিয়মিত এসে মৃতদেহ সরিয়ে নিতো—তাও আমার অগোচর ছিল না।

কিছু তো প্রত্যক্ষ করেছি, কিছু দেখেছি খবরের কাগজে ছাপা আলোকচিত্রে এবং জয়নুল আবেদিনের মতো শিল্পীর আঁকা ছবিতে। ছবি ছিল অনেকেরই, তবে তাঁর ছবি দেখা ও বাড়িতে তাঁর নাম বারবার উচ্চারিত হওয়ার ফলে ওই নামটাই মনে গেঁথে গিয়েছিল। পঞ্চাশের মন্বন্তরের কতো ছবি যে জয়নুল এঁকেছিলেন, তার হিসেব পাওয়া মুশকিল। মনে পড়ে, এ-সময়ে তিনি একদিন আব্বার কাছে এসেছিলেন। আমি একটু সাহস করে পরদা সরিয়ে ডাক্তারখানায় গিয়ে আব্বার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখছি। আব্বা বোধহয় বললেন, তাঁর আঁকা ছবি আমি দেখেছি পত্রপত্রিকায়, এখন কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে তাঁকে দেখতে এসেছি। জয়নুল আবেদিন আমাকে ডেকে নিলেন তাঁর পাশে। পকেট থেকে বের করলেন ট্রামের কয়েকটি টিকিট। তারপর দেখালেন, টিকিটের উল্টো পিঠে কালি-কলমে আঁকা ছবি—প্রায় সবই দুর্ভিক্ষের চিত্র। অত অল্প পরিসরে আঁকা ছবির মর্ম বোঝার ক্ষমতা আমার ছিল না, তবু দুচোখ মেলে প্রত্যেকটা ছবি দেখেছিলাম।

কলকাতার শ্রীবিনষ্টকারী অনাহারীদের ধরে গাড়িতে করে সরকারি লোকজন নিয়ে যেতো রাজধানীর বাইরে দুর্গতদের জন্যে নির্দিষ্ট শিবিরে। সেখানে তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল, তবে তা ছিল অপ্রতুল। কলকাতায় লঙ্গরখানা খোলা হয়েছিল পাড়ায় পাড়ায়—প্রধানত সরকারি উদ্যোগে, কিছু বেসরকারি ব্যবস্থাপনায়। এই বেসরকারি ব্যবস্থাপকেরা আবার বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল-খুদ, টাকা-কাপড় সংগ্রহ করতো। সকলেই কিছু না কিছু দিতেন। লঙ্গরখানায় খাবার খেয়ে দীর্ঘকাল ধরে অভুক্তদের অনেকের দেখা দিতো পেটের অসুখ। এক সময়ে কলেরা দেখা দিলো মহামারির আকারে। কেউ বললো, অনেকদিন না খাওয়ার পরে খুব বেশি করে খেতে গিয়ে তারা এই দুর্গতি ঘটিয়েছে—মরণেও নিজেদের দোষের দায় থেকে তারা রেহাই পেলো না। কেউ বললো, কী সব আজেবাজে জিনিস দিয়ে রান্না হয় লঙ্গরখানায়—সেখানেও চুরিচামারির অন্ত নেই—ওসব খেলে যে-কোনো মানুষেরই পীড়িত হওয়া স্বাভাবিক।

দুর্ভিক্ষের মধ্যে কলকাতায় চালু হলো রেশনিং-প্রথা। সেও এক বিশাল আয়োজন। বয়স্কদের একরকম রেশন-কার্ড, আবার নাবালকদের আরেকরকম রেশন-কার্ড; বাড়ির কাজের লোকের কার্ড সে চলে গেলেও ব্যবহার করা চলতো যদি তার স্থলাভিষিক্ত হতো আর কেউ। সেসব কার্ডের যাথার্থ্য যাচাই করতে আসতো খাদ্য বিভাগের লোকজন। অনেকের বাড়িতেই দু-একটা বাড়তি রেশন-কার্ড থাকতো, তবে আমাদের ক্ষেত্রে আব্বা তা হতে দেন নি। কার্ডের পেছনে, যতোদূর মনে পড়ে, ২৬ সপ্তাহের নম্বর দেওয়া কাগজ সাঁটা থাকতো। প্রতি সপ্তাহে রেশন তুললে একটা করে

নম্বর কেটে দেওয়া হতো। সবকটা নম্বর কাটা হয়ে গেলে আবার নতুন কাগজ সেঁটে দিতো রেশনের দোকানদার।

বাড়ির কাজের ছেলেকে নিয়ে রেশনের দোকানে আমিও লাইন দিয়েছি। চাল, আটা অথবা ময়দা, চিনি ও তেল আনতাম। দুর্ভিক্ষের পুরো সময়টা তো বটেই, যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত আমরা একবেলা ভাত খেয়েছি। ময়দার বেলা-রুটির মধ্যে দই নিয়ে তার ওপরে সুরুয়াসমেত গোশত প্রায়ই খাওয়া হতো—ওটা আমার খুব পছন্দের খাবার হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সেই সময়ে কত হতভাগ্যের যে একবেলা অন্ন জোটে নি, তার হিসেব কে রাখে! সরকারি হিসেবে, পঞ্চাশের মন্বন্তরে অনাহার ও পীড়ায় মারা গিয়েছিল দশ লাখ লোক। বেসরকারি হিসেবে মৃতের সংখ্যা ছিল এর তিনগুণ। দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারি তদন্ত কমিটি বসেছিল—তার রিপোর্টও পাওয়া যায়। কিন্তু সেসব তো বড়ো হয়ে ওঠার আগে আমার জানা হয় নি। নিজের দেখা দুর্ভিক্ষের যে-ছবি আজও আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে, তা ওই জীবিত, মৃত বা জীবন্মৃত মানুষগুলোর—মনুষ্যত্ব হারিয়ে যারা অচিরেই কেবল সংখ্যায় পরিণত হয়েছিল।

৭.

আমাদের বাড়িটায় ছিল তিনটে ঘর। সামনের ঘরে ছিল আব্বার চেম্বার। তার পেছনে একটা ঘোরানো করিডোর বাকি দুই ঘর এবং বাথরুম ও রান্নাঘর ছুঁয়ে যেতো। ঘরে ঢোকার পথ ছিল তিনটে। ফুটপাথ থেকে সোজা চেম্বারে উঠে যাওয়া যেতো। বাইরে দোতলার সিঁড়ি যেখানে উঠে গেছে, সেদিক দিয়ে একটা দরজা ছিল—ফেরিওয়ালারা সাধারণত সেদিকে হানা দিতো। রান্নাঘর-বাথরুমের দিকে একটা দরজা ছিল—তা দিয়ে অন্যের অলক্ষ্যে আসা চলতো—জমাদার আসতো এদিক দিয়ে। পেছনে লোহার বাঁকানো সিঁড়ি উঠে গিয়েছিল সেদিক দিয়ে দোতলায় যাওয়ার জন্যে।

চেম্বার ছাড়া আর যে-দুটি ঘর, তার একটায় শিশুপুত্র নিয়ে বড়োবু-দুলাভাইয়ের বাস। মধ্যের ঘরটা সকলের, তবে দিনে বেশির ভাগ সময় মা রান্নাঘরে থাকতো, আব্বা ডাক্তারখানায় কাটাতেন, রাতে ওই ঘরে চৌকিতে থাকতো মেজোবু ও ছোটোবু। আব্বা, মা ও আমি সামনের ঘরটায় মেঝেতে বিছানা করে রাতে থাকতাম। আমাদের খাওয়া-দাওয়া হতো মধ্যের ঘরে কিংবা করিডোরে, পাটি বিছিয়ে। বাড়িতে সাধারণত অল্পবয়সী একটা কাজের ছেলে থাকতো। আব্বা নিজেই বাজার করতেন, তবে সে সঙ্গে যেতো। দু-তিন দিন পর পর ধোপা আসতো—সে কাপড় ধুতো শ হিসেবে, তবে তার মধ্যে আবার ছোটো ছোটো কিছু থাকলে তা অর্ধেক বলে বিবেচিত হতো। সকালের কাপড় নিয়ে যে-ধোপা সন্ধ্যায় তা ফেরত দিতো, তাকে বলা হতো সেঁঝো; কাপড়ের আকার ও প্রকারের ভিত্তিতে তার নগদ পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হতো। হৃষ্টপুষ্ট গৌরবর্ণ এক অবাঙালি গোয়ালা বালতিতে করে গরুর দুধ আমাদের বাড়ি বাড়ি দিয়ে যেতো। ১০ নম্বরে থাকতেই শ্মশ্রুমণ্ডিত এক বৃদ্ধ মুসলমান দুটি ছাগল

এনে সকলের সামনে আমার জন্যে দুধ দুয়ে দিতো। বাড়ি বদলাবার পরও বহুদিন সেই কবোষ্ণ দুধের সরবরাহ অব্যাহত ছিল। ঘরে বসেই কিছু তরি-তরকারি কেনা যেতো, তাছাড়া আসতো হরেকরকম ফেরিওয়ালা নানা ধরনের পণ্য নিয়ে। পুরোনো কাপড় দিয়ে থালা-বাসন বা হাঁড়ি-কুড়ি নেওয়ার কথা মনে পড়ে। কাপড়-চোপড় অথবা একটু বেশি কিছু কিনতে হলে ট্রামে করে যাওয়া হতো ধর্মতলা স্ট্রিটে (এখন লেনিন সরণি)—বাড়ির সবাই গেলে ভাড়া করা হতো ঘোড়ার গাড়ি—সেখানে প্রথমে যেতাম ওয়াছেল মোল্লার দোকানে, তারপর কমলালয়ে। পরে একই রাস্তার উপরে আমরা আরো দুটি দোকানে যেতাম : সুবিদ আলী অ্যান্ড ব্রাদার্স ও একিন মোল্লা অ্যান্ড সন্স। কোনো উপলক্ষে গয়না কিনতে হলে যাওয়া হতো এল মল্লিকের দোকানে। মুসলমান নহিলে মুসলমানের ব্যবসায় কে দেখিবে!

করিডোরে পাটি বিছিয়ে চলতো আমার পড়াশোনা। এক্ষেত্রে মেজোবুর তত্ত্বাবধানই ছিল প্রধান। আব্বার সমান বয়সী পুস্তক—যোগীন্দ্রনাথ সরকারের *হাসিখুসি*—ছিল আমার প্রথম পাঠ্যবই। সেটা সম্পূর্ণ মুখস্থ করতে হয়েছিল বা হয়ে গিয়েছিল। বর্ণমালার ছড়া মুখস্থ করার সময়ে, বোধহয় ছন্দের অনুরোধে কেবল প্রথম স্বরবর্ণটা আলাদা করে উচ্চারণ করতাম :

অ-য় অজগর আসছে তেড়ে
আমটি আমি খাব পেড়ে।
ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে
ঈগল পাখি পাছে ধরে।

হাসিখুসি শেষ করতে অনেক অশ্রুপাত করতে হয়েছিল—তা কতোটা লেখাপড়ায় বাধ্যতার কারণে আর কতোটা হারাধনের দশটি ছেলের শোকে, সে কথা এখন আর বলার উপায় নেই। তবে এটি যে আমার অত্যন্ত প্রিয় বই হয়ে উঠেছিল, তা সন্দেহাতীত।

আব্বার একজন কম্পাউন্ডার থাকতেন। প্রথম যাঁর কথা মনে পড়ে, তিনি শেখ শাহাদত আলি। আমাদের গ্রামের বাড়ির কাছেই তাঁর বাড়ি, পরিবারের একজন হয়েই তিনি থাকতেন। কোনো কারণে একদিন আব্বা তাঁকে তিরস্কার করায় তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। তখনো সেটা বোঝার বয়স আমার হয় নি। অনেকদিন পর একটা ছবি এলো ডাকে—রয়াল ইন্ডিয়ান নেভির ইউনিফর্মে শাহাদত ভাই বসে, পাশে তাঁর এক সহকর্মী দাঁড়িয়ে। যুদ্ধশেষে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সদস্যদের মুক্তির দাবিতে যে নৌ-বিদ্রোহ হয়, তিনি তাতে যোগ দিয়ে বন্দি ও বিচারাধীন হন। পরে অবশ্য রাজনৈতিক কারণে তাঁরা সকলে মুক্তি পান। মুক্তিলাভ করে তিনি এই বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা লেখেন *নৌ-বিদ্রোহ* (কলকাতা, ১৯৪৬?) নামে ছোটো একটি বইতে। অনেক পরে তিনি খুলনার গোয়ালপাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রকৌশল বিভাগে চাকরি নিয়েছিলেন এবং আমার খালাতো বোনকে (মমতাজবু) বিয়ে করেছিলেন। সম্প্রতি তিনি গত হয়েছেন।

শাহাদত বাই নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেলে তাঁর স্থানটা নেন আবদুল মাবুদ ওরফে লালু ভাই। তিনি আমার অনেক দুঃখের কারণ।

এক সকালে রান্নাঘরে ঢুকে মাকে বিরক্ত করছিলাম—সেটাই যে প্রথমবার, তা নয়, তবে সেদিন হয়তো মাত্রাটা বেশি হয়ে গিয়েছিল। আব্বা গেছেন 'কল'-এ। লালু

ভাইকে ডেকে মা বললো, 'যাও তো, ওকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে এসো।' লালু ভাই নানা ওজর-আপত্তি করতে পারতেন। তা না করে, আমাকে ধরে সটান নিয়ে গেলেন বাড়ির অদূরে পার্ক সার্কাস হাই স্কুলে। তখন মার্চ মাস, ১৯৪৩ সালের। যে-সালেরই হোক না কেন, মার্চে কেউ স্কুলে ভর্তি হয়? ওই স্কুলেও ভর্তির পালা কবে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, তবু আমার ইংরেজি-বাংলা-অঙ্ক পরীক্ষা নেওয়া হলো এবং বলা হলো, ক্লাস টু-তে আমাকে নেওয়া যেতে পারে, আর আমাকে যদি বাড়িতে একটু খাটিয়ে নেওয়া যায়, তবে ক্লাস থ্রি-তেও ভর্তি করা যেতে পারে। লালু ভাই ভাবলেন, একটা বছর বাঁচানোই কর্তব্য, সুতরাং ক্লাস থ্রি-তে ঢুকিয়ে দিলেন আমাকে। এই অতিরিক্ত ভার বহন করার ক্ষমতা আমার ছিল না। তাছাড়া লালু ভাই আমার বয়স এক বছর (পুরো এক বছর নয়, দিন কয়েক কম তার থেকে) কমিয়ে লিখে আরো একটা বছর বাঁচিয়ে দিলেন। সেটা সংশোধন করতে পরে আব্বাকে অ্যাফিডেভিট করতে হয়েছিল।

আমাদের হেডমাস্টার ছিলেন আবদুস সাত্তার। শেরওয়ানি-পাজামা পরতেন, মাথায় তুর্কি বা রুমি টুপি, পায়ে শু। তবু তাঁর মধ্যে এমন কিছু ছিল যাতে তাঁকে ভয় পেতাম না। শ্যামাপদ ভট্টাচার্য ছিলেন আমাদের অঙ্কের শিক্ষক। অঙ্ক শেখানো ছাড়া তিনি ভালোবাসতেন ছাত্রদের মাথায় গাঁট্টা মারতে, আর ক্লাসে বসে নস্যি নিতে। তিনি আসতেন শার্ট ও ধুতি পরে। নস্যি নিয়েই শার্টের পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে নাক ঝাড়তেন—নস্যিলাঞ্ছিত রুমাল দেখে অভক্তি হতো, হাসিও পেতো, তবে তাঁর ভয়ে হাসতাম না। সবচেয়ে যাঁকে ভয় পেতাম, তিনি অশোক রায়—ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা ফরসা মানুষ—কাউকে যে বকতেন, তা নয়, কিন্তু এমনই রাশভারি চেহারা তাঁর যে, দেখে আমি ভয় পেয়ে যেতাম। তিনি বোধহয় থার্ড পিরিয়ডে ক্লাস নিতেন এবং তিনি ক্লাসে ঢোকামাত্র আমার কান্না শুরু হয়ে যেতো। স্কুল থেকে বলে পাঠানো হলো, বাড়ি থেকে আমার সঙ্গে যেন কেউ আসে—কয়েক পিরিয়ড এক সঙ্গে বসে সে চলে যাবে, তারপর আমি ধাতস্থ হয়ে গেলে তার আর আসার দরকার হবে না। আব্বার অনুপস্থিতিতে আমাকে স্কুলে ভর্তি করায় তিনি খুশি হন নি, আর আমার অদম্য কান্না তাঁকে আরো বিচলিত করেছিল। বিরক্ত হয়ে সমস্যা-সমাধানের ভার তিনি মায়ের ওপরেই ন্যস্ত করলেন। মা ছাড়বার পাত্রী নয়। আমার সঙ্গে স্কুলে গিয়ে বসে থাকার মতো কেউ বাড়িতে ছিল না, তাই ছোটোবুকেই মা আদেশ দিলো আমার স্কুলে গিয়ে প্রথম তিন পিরিয়ড আমার পাশে বসে থাকতে। এতে ছোটোবুর মহা আপত্তি। একে এতে তার স্কুলের ক্ষতি, অন্যদিকে ছেলেদের স্কুলে এসে ভাইয়ের সঙ্গে ক্লাসে বসে থাকাটাও বিব্রতকর। তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেচারিকে দায়িত্ব পালন করতে হতো এবং রোজই আমাকে গঞ্জনা দিয়ে বাড়ি থেকে যাত্রা শুরু করতো।

পার্ক সার্কাস হাই স্কুলে ভর্তি হয়ে সঙ্গী হিসেবে যাদের পেয়েছিলাম, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হয় মেজর জেনারেল আনিস ওয়ায়েজ—চিকিৎসক ও হৃদ্‌রোগ-বিশেষজ্ঞ এবং বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ। সে অবশ্য ওই স্কুলে শুধু ও-বছরটাই পড়েছিল, আমি পড়েছিলাম ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত। তার এবং আমার উভয়েরই ধারণা ছিল, আমরা সহপাঠী। শুধু তার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত জীবনবৃত্তান্ত পড়ে জানলাম, সে আমার ওপরে পড়তো। অথচ আমরা সবসময়েই

পরস্পরকে তুমি বলে এসেছি। অন্যদের মধ্যে কেউ পুরো সময়টায় সহপাঠী ছিল, কেউ আগে ও পরে এসেছে এবং চলে গেছে। এদের মধ্যে *দুর্জন উবাচ*-খ্যাত খোন্দকার আলী আশরাফ উল্লেখযোগ্য। অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পররাষ্ট্র-সচিব (আইন-উপদেষ্টা) শামসুল মোরশেদ এবং আয়কর বিভাগের বিভাগের কর্মকর্তা ও অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব গোলাম মোস্তফা ছিল আমার সঙ্গে, ছিল বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের এককালীন যুগ্ম সচিব রফিক-উর রহমান। গোলাম ফরহাদ পরে হয়েছিল তেল কোম্পানির নির্বাহী। হাসান দাউদ পরে হয় মস্ত বড়ো ব্যবসায়ী—স্যানিটারি ফিটিংসের ব্যবসা থেকে বলাকা-বিনাকা সিনেমা হল প্রভৃতি তাদেরই। নাসির ও নাজির দুই ভাই ছিল : প্রথম জন এখন ঢাকার নিউ মার্কেটে নভেল্ল ওয়াচ কোম্পানি নামে ঘড়ির দোকানের মালিক, দ্বিতীয় জন পৈতৃক ব্যবসার অংশস্বরূপ বায়তুল মোকাররমের অলিম্পিয়া কনফেকশনারি চালাতো আমৃত্যু। সালাহউদ্দীন মামুন নামে এক ডানপিটে ছেলে ছিল—সে বিলেতে গিয়ে স্থায়ীভাবে সেখানে রয়ে যায়। শামসুজ্জোহাকে মনে পড়ে—তার ডাক নাম ছিল নীল। খুব শখ ছিল তার চশমা পরার। স্কুলের নিয়মিত স্বাস্থ্য-পরীক্ষায় বর্ণমালার বোর্ডটা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল পড়ায় স্কুল থেকে তার অভিভাবককে চিঠি দেওয়া হয় তাকে চক্ষু-বিশেষজ্ঞের কাছে নিতে। নীল বলেছিল, ডাক্তারের কাছে যাওয়ার আগে সে নিজের চোখে বালি ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এ কথা সত্যি কি না জানি না, তবে সে চশমা পরার সুযোগ পেয়েছিল। আবদুল কাদের সরকারের সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে সাক্ষাৎ হওয়ায় জানতে পারি যে, সৈয়দপুরে রেলওয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টস অফিসার হিসেবে সে অবসর নিয়েছে।

স্কুলে আমি ভালো ছাত্র ছিলাম না। পরীক্ষায় কখনো প্রথম হই নি। আমার ওপরে সব সময়ে চার-পাঁচজন থাকতো। একবারই দ্বিতীয় স্থান দখল করি পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ওঠার সময়ে। তার পুরস্কারস্বরূপ সেবারে আমার জন্মদিনে এক পাউন্ডের কেক কাটা হয় এবং ফুলের মালা গলায় আমার ছবি তোলা হয় পাড়ার ল্যান্সডাউন আর্ট স্টুডিওতে (স্টুডিওটি এখনো টিকে আছে, তবে মালিকানা বদলেছে নিশ্চয়)। তবে তখন আমার সারা জীবনের মতো একটা শিক্ষাও হয়েছিল। আমার পরীক্ষার ফল বের হওয়ার পরে মায়ের মামাতো ভাই সৈয়দ মাজহার আলী (তিনি বহুকাল ঢাকা বেতার থেকে অত্যন্ত সুললিত ভাষায় ও সুমধুর কণ্ঠে কুরআন শরিফের তেলাওয়াত ও তরজমা করতেন) আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি প্রথম হই নি কেন? আমার জবাব ছিল, 'যে ফার্স্ট হয়েছে, সে শ্যামাপদ স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ে' (এ ধরনের কথা ছেলেরাই বলাবলি করতো)। মাজহার মামু বললেন, 'যে থার্ড হয়েছে, সে যদি বলে তুমি অন্যায়ভাবে সেকেন্ড হয়েছ, তাহলে তোমার কেমন লাগবে?' আমি চুপ করে রইলাম। তিনি বললেন, 'তোমার বলা উচিত, সে আমার চেয়ে ভালো করে পড়াশোনা করেছে, তাই।' এরপর থেকে জীবনে কখনো নিজের বিফলতার জন্যে আমি অন্যকে দোষ দিই নি।

প্রতি বছর বুক-লিস্ট পাওয়ার পরে আব্বা আমাকে নিয়ে যেতেন কলেজ স্ট্রিটে। মখদুমী লাইব্রেরি যেহেতু দাদার বই ছাপতো, তাদের কাছে রয়ালটি বাবদ কিছু প্রাপ্য হতো এবং তার বিনিময়ে আমার কিছু পাঠ্যবই কেনা যেতো। আমাদের ইংরেজি পাঠ্যবই

থাকতো *ক্লারেনডন রিডার* বা *হিমালয়ান রিডার*। বই নিয়ে এসে তার ঘ্রাণ নিতে খুব ভালো লাগতো। তবে মেজোবু বলতো, এই বিলাসিতা না করে আগের ক্লাসের ছাত্রদের থেকে পুরনো বই কিনতে। ফিরোজ নামে একজন বইপত্র বেশ পরিষ্কার রাখতো—তার কাছ থেকে কম দামে তার ব্যবহৃত বই কিনতাম। পুরোনো বইতে যে নতুন বইয়ের ঘ্রাণ পেতাম না, তাতে একটু খারাপই লাগতো। তবু বুঝে নিয়েছিলাম, কিছু খরচ বাঁচানো ভালো। মেজোবু যত্ন করে বাঁশপাতার কাগজ দিয়ে নতুন-পুরোনো সব বইয়ের মলাট করে দিতো, তখন নতুন-পুরোনোর তফাৎটা আর বেশি মনে হতো না। বইতে জলছবি লাগানোর খুব স্পৃহা ছিল আমার—মেজোবুর শাসনে ওই বাঁশপাতার কাগজের মলাট ছাড়া আর কোথাও তা সাঁটতে পারতাম না।

আমার পেনসিলের শখের কথা বলেছি। যেসব পেনসিলের সঙ্গে ইরেজার লাগানো থাকতো, সেগুলোই ছিল আমার বেশি পছন্দের। আর খুব লোভ ছিল শার্পনারের প্রতি। মেজোবু ব্যবস্থা করেছিল আলাদা পেনসিল ও ইরেজারের এবং সে রোজ ব্লেড দিয়ে পেনসিল কেটে আমাকে হতাশ করে দিতো। ব্লেড দিয়েও আমাকে পেনসিল কাটতে দিতো না—পাছে আঙুল কেটে ফেলি। পেনসিল ও ইরেজার আমি প্রায় হারাতাম আর বাড়ি এসে মেজোবুর বকুনি খেতাম। পরে যখন 'রবারওয়ালা পেনসিল' এবং 'পেনসিল-কাটার কল' হাতে পেলাম, তখন আমার আনন্দ দেখে কে!

আমাদের সময়ে 'বাহাদুর এক্‌সার্‌সাইজ বুক' নামের খাতা খুব জনপ্রিয় ছিল। এক অশ্বারোহী শিখ সৈন্য ছুটছে বল্লম নিয়ে—তারই দু-রঙা ছবি থাকতো প্রচ্ছদে। সাধারণত এসব খাতা হতো রুলটানা কাগজের। ফুল্‌সক্যাপ সাইজের শাদা কাগজ কিনে তা কেটে সুতো দিয়ে বেঁধে খাতা বানিয়ে দিতো মেজোবু। কালি দিয়ে লেখার দরকার হলে আমরা ব্যবহার করতাম নিবওয়ালা কলম। এসব নিব আলাদা কিনতে পাওয়া যেতো এবং তা হতো দুরকমের। যেটা শাদা, সেটা হতো লম্বাটে ও সরু (এখনকার পরিভাষায় বলা যেতে পারে ফাইন), আর যেটা সোনালি, সেটা হতো একটু খাটো ও চওড়া (বোধহয় মিডিয়ম)। তখন জে বি ডি কালির বড়ি বিখ্যাত ছিল। দোয়াতে পানি ভর্তি করে তাতে বড়ি ছেড়ে দিয়ে তার দ্রবণ দেখায় সমূহ আনন্দ পেতাম। মনে পড়ে, বড়ি পাওয়া যেতো তিন রঙের—লাল, নীল ও বেগুনি। নীল বেশি ব্যবহার করতে হতো বলে এবং লালও বাড়িতে ব্যবহৃত হতো বলে বেগুনির ওপরে একটু টান ছিল। তবে তা সহজলভ্য ছিল না। আমার কোনো আবদার বা অভিমানের প্রতিষেধক হিসেবে মেজোবু একটা কথাই বলতো : এমন করলে আব্বার মান চলে যাবে। মান যে কী জিনিস, তা আমার জানা ছিল না; কিন্তু তা হারানো যে অত্যন্ত ক্ষতিকর, সে কথা মনে গেঁথে গিয়েছিল। আব্বার মানরক্ষার জন্যে আমি যে-কোনো ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত ছিলাম।

৮.

স্কুলে ভর্তি হয়ে সেই যে কাঁদতাম এবং আমার কান্না থামাতে কিংবা আমাকে সাহস জোগাতে সঙ্গে পাঠাতে হতো ছোটোবুকে, সে-কথা লিখেছি। আমি যখন একটু ধাতস্থ

হয়েছি এবং ছোটোবু যখন আর ছেলেদের স্কুলে যেতে চাইছে না, তখন শুরু হলো আমার নিজে থেকে স্কুলে যাওয়া। আব্বার মনে হলো, তবু স্কুলে আমাকে দেখাশোনার জন্যে কাউকে বলে দেওয়া দরকার। আমার এক ক্লাস ওপরে পড়তেন আবিদ হুসেন—বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনখ্যাত অধ্যাপক আবুল হুসেনের পুত্র। আবুল হুসেন গত হয়েছেন তখন অনেকদিন হলো। তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর সঙ্গে আব্বার বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। সেই সূত্র ধরে আবিদ হুসেনকে ডেকে আব্বা বললেন, 'আবিদ, আনিস একটু ভয় পায় স্কুলে, তুমি ওকে একটু দেখে রেখো।' আবিদ তন্মুহূর্তেই রাজি। আমাকে বললেন, আব্বার সামনেই, 'আমি তো নিশ্চয়ই দেখবো, তবে তোমার কোনো অসুবিধা হলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবে।' আব্বা নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন।

পরদিন থেকে শুরু হলো আবিদ হুসেনের খবরদারি। কথায় কথায় বলতেন, 'তোমার আব্বা আমাকে তোমার গার্জিয়ান নিযুক্ত করেছেন, আমার কথা শুনে চলতে হবে।' এটা আমার পক্ষে একটা বোঝাস্বরূপ হয়েছিল। পরবর্তীকালে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমরা দুজনে, কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে গেছি, আবিদ তখনো আমার ওপরে অভিভাবকত্বের দাবি ছেড়ে দেন নি।

দুষ্ট প্রকৃতির ছেলেদের মাঝে মাঝে হাঁকডাক দিলেও তাদের অত্যাচার থেকে তিনি আমাকে রক্ষা করতে পারতেন না। ওরকম পরিস্থিতিতে কেউই পেরে ওঠেন না। একবার স্কুলের ছুটির পর বাড়ি ফেরার পথে সঙ্গী কয়েকজনের মধ্যে কে যেন সিগারেট বের করলো এবং আরেকজন তাতে অগ্নিসংযোগের ব্যবস্থা করে দিলো। তারপর হাত বদলে সকলেই এক টান দিচ্ছে। আমাকেও আহ্বান জানানো হলো অংশ নিতে। আমি অস্বীকার করায় প্রথমে মারের ভয় দেখালো, পরে সত্যিই প্রহার। আমাকে সিগারেট খাওয়ানো সমবেত আনন্দলাভের একটা অংশ ছিল বটে, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কারণ ছিল এই যে, আমি ওই দোষে দোষী হলে কারো বিরুদ্ধে নালিশ করার সুযোগ পাবো না। কিল-চড় খাওয়ার এক ফাঁকে দৌড় দিয়ে পালিয়ে বাড়ি চলে আসি। ইচ্ছে করলে সঙ্গীরা দৌড়ে আমাকে ধরে ফেলতে পারতো। তা না করে তারা কেবল চিৎকার করে ঘোষণা করেছিল যে, কাউকে বলে দিলে পরিণাম ভালো হবে না। তাদের বাণীকে আমি শূন্যগর্ভ মনে করি নি।

আরেকবার বৃষ্টির দিনে দোকান থেকে কী একটা কিনে ঘরে ফেরার সময়ে পা পিছলে ফুটপাতের কোনায় পড়ে, সামনের দুটো দাঁতের মাঝখানটা এমনভাবে ভাঙলাম যে, ভাঙা অংশটা হলো ত্রিভুজাকৃতির আর তার দুপাশে দাঁতের দুটো কোণ রয়ে গেলো। পরদিন স্কুলে যাওয়ার পরে সেটা একটা দ্রষ্টব্যে পরিণত হলো। একটু পর পরই দাবি করা মাত্র দাঁতের পাটি দেখাতে হয়। একজন আশ্বাস দিলো, ল্যাং মেরে আমাকে ফেলে দিয়ে সে দাঁতের ওই কোণ দুটো সোজা করে দেবে। একদিন যখন ক্লাস থেকে বের হচ্ছি, সে সত্যিই তার কথা রাখলো। চৌকাঠের সঙ্গে ধাক্কা লেগে দাঁতের একটা কোণ উড়ে গেলো, রয়ে গেলো আরেকটা। বন্ধু নিবিষ্টচিত্তে পর্যবেক্ষণ করে বললো, 'কিছু ভাবিস না, আরেকবার ফেলে দিয়ে পাশের দাঁতটাও সমান করে দেবো।' এই পরোপকারপ্রবৃত্তি থেকে তাকে নিবৃত্ত করার মৌখিক চেষ্টায় সফল হই নি, কেবল সময় ও সুযোগের অভাবে সংকল্পটা সে কাজে পরিণত করতে

পারে নি। আমার প্রতিরোধশক্তি একটু কম থাকায় সহপাঠীদের ত্যক্ত করতে যারা ভালোবাসতো, তাদের কাছে আমার একটু বিশেষ কদর ছিল।

আমি ক্লাস ফাইভে ওঠার পরে আমার জন্যে একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হলেন। ভদ্রলোক হিন্দু ছিলেন, তবে পেশাদার শিক্ষক ছিলেন কিনা সন্দেহ। সপ্তাহে চার-পাঁচ দিন তিনি সন্ধেবেলায় পড়াতে আসতেন। এরই মধ্যে আব্বার এক পরিচিত ভদ্রলোক রোগা-পাতলা শ্যামবর্ণ সদ্যোদ্ভিন্নগুম্ফ এক তরুণকে নিয়ে এলেন আমাদের বাড়িতে। শোনা গেলো, তাঁর নাম সিরাজুদ্দীন হোসেন, যশোর থেকে আই এ পাশ করে কলকাতায় এসেছেন উচ্চশিক্ষালাভের সংকল্প নিয়ে। কিন্তু তাঁর কোনো সহায়-সম্বল ছিল না। সঙ্গী ভদ্রলোক আব্বাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছেন, আমাদের বাসায় ইনি জায়গির থাকতে পারবেন কিনা। আমার গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন ছিল না, আবার আমাদের ঘরে জায়গারও অভাব ছিল। স্থির হলো, সিরাজুদ্দীন হোসেন থাকবেন অন্যত্র, খাওয়াদাওয়া করবেন আমাদের বাড়িতে; বি এ পড়বেন ইসলামিয়া কলেজে, যেদিন গৃহশিক্ষক আসেন না, সেদিন অথবা সময়-সুযোগমতো আমাকে পড়াবেন। যেহেতু আমার একজন শিক্ষক ছিলেন বাড়িতে, তাই আমাদের কাছে সিরাজ ভাইয়ের পরিচিতি হলো ছোটোমাস্টার বলে। খুব সম্ভব, বছরখানেক পরে, তিনি *আজাদের* বার্তা বিভাগে চাকরি পেয়েছিলেন মোহাম্মদ মোদাব্বেরের আনুকূল্যে। ক্রমে তিনি স্বনির্ভর হয়ে উঠলেন, কিন্তু আমাদের সঙ্গে হার্দ্যিক সম্পর্ক অটুট রয়ে গেলো। সিরাজ ভাইয়ের ছবি আঁকার হাত ছিল। আমাদের বাসার কাজের ছেলের একটা প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন তিনি পেনসিলে, পেনসিলেই টুকটাক আরো ছবি আঁকতেন। পরে তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক হয়েছিলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার অব্যবহিত পূর্বে শহীদ হয়েছিলেন আল বদরের হাতে। আব্বার সেই সামান্য সাহায্যের কথা সিরাজ ভাই আজীবন ভোলেন নি, আব্বাও তাঁকে চিরকাল পুত্রবৎ দেখে এসেছেন। সিরাজ ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিখাদ ছিল, তাঁর অবর্তমানেও তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমাদের—অন্তত আমার—যোগাযোগ ছিন্ন হয় নি।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাব কারণে কিনা মনে নেই, আমার সেই হিন্দু শিক্ষক এক সময়ে আসা বন্ধ করলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন দীর্ঘশ্মশ্রুমণ্ডিত চশমা-চোখে রাশভারি এক ভদ্রলোক, তাঁর বাড়ি ছিল নারায়ণগঞ্জে। তিনি আমাকে আনিস বলে ডাকতে অস্বীকার করলেন, কেননা, আনিস মানে বন্ধু। ছাত্রকে তিনি বন্ধু বলে সম্বোধন করবেন কেমন করে? তাই তিনি আমাকে জামান বলে সম্বোধন করতেন। তাঁর সামনে একদিন আমাদের কাজের ছেলেকে রহমান বলে ডেকেছিলাম। মাস্টার সাহেব আমাকে বোঝালেন, রহমান হলো আল্লাহর ৯৯টি নামের একটি—ওই নামে কোনো বান্দাকে ডাকা যায় না, তাকে ডাকতে হবে আবদুর রহমান বলে। পরে, ঢাকায়, এই শিক্ষকের সঙ্গে অনেকবার দেখা হয়েছে। শেষ দেখা হয়, আমার বিয়ের পরে। তখন তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে, আমার দাদাশ্বশুর যখন নারায়ণগঞ্জে সাবজজ ছিলেন, তখন তাঁকে তিনি চিনতেন।

৯.

স্কুলে ভর্তি হওয়ার অল্পকাল পর আমার নতুন বন্ধু জুটে গেল—কমল। তার ভালো নাম খায়রুল বাশার—অল্পকাল আগেও মালয়েশিয়ার সেলাঙ্গরে এশিয়ান ইনসটিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের একজিকিউটিভ ডাইরেক্টর ছিল। সে অবশ্য পড়তো অন্য স্কুলে, কিন্তু থাকতো আমাদের বাসার অদূরে। আমরা বিকেলবেলায় একে অন্যের বাসার সামনে গিয়ে নাম ধরে ডেকে ফুটপাথে মিলিত হয়ে হাঁটতে বেরোতাম। কদাচিৎ বাড়ির মধ্যেও গেছি, কিন্তু বসে থাকি নি। ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা পৌঁছে যেতাম পার্ক সার্কাসের ছোটো পার্কে, সন্ধে হতে দেরি থাকলে বড় ময়দানটাও এক চক্কর ঘুরে আসতাম। কী যে এতো গল্প করতাম, তা বলা শক্ত। তবে গল্পের বইয়ের কথা থাকতো তার মধ্যে। বই-বিনিময়ও করতাম আমরা। তারপর বইয়ের বিশেষ ভালো লাগা অংশ একে অপরকে বলতাম।

সহপাঠীদের মধ্যে আমার বেশি বন্ধু হয় নি। যারা বাড়ির কাছাকাছি থাকতো, কিংবা যাদের সঙ্গে এক রাস্তা ধরে স্কুলে যাতায়াত করতাম, বন্ধুত্বটা ছিল তাদেরই সঙ্গে। আনিস ওয়ায়েজ ছিল তাদের একজন। কিন্তু তার পিতা অধ্যাপক আবু হেনা প্রাদেশিক সরকারের প্রচার বিভাগের পরিচালকের পদ থেকে চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষের পদে বদলি হওয়ায় সে কলকাতা ছেড়ে চলে গেল। সালাহউদ্দীন মামুনের দুরন্তপনায় ভয় পেতাম বলে তার সঙ্গে মিশতাম একটু শঙ্কিতভাবে। ফরহাদ ছিল তেমনি নিরীহ, তার সঙ্গে বেশ ভাব ছিল। আর ছিল মণীশ, তার পদবি মনে নেই। আমাদের বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার পথে ছিল ওদের বাড়ি। স্কুলে যাওয়ার সময়ে কিংবা বিকেলে ফুটপাথে দাঁড়িয়েই ওকে ডাকতাম। তারপর একসঙ্গে চলা। আমি কখনো ওদের ঘরের মধ্যে যাই নি—সেও কখনো আমাকে ভেতরে ডাকে নি। পেছন ফিরে মনে হয়, হয়তো ধর্মবর্ণগত একটা সংস্কার ক্রিয়াশীল ছিল ওদের পরিবারে। তবে তখন আমাদের বয়সীরা খুব কমই একে অন্যের বাড়ির ভেতরে গিয়ে কথাবার্তা বলতো। মণীশ যে এক-আধবার আমাদের ঘরের মধ্যে আসে নি, তা নয়, হয়তো কিছু মুখেও দিয়েছে, কিন্তু আমি ওদের বাড়ির মধ্যে যাই নি কখনো।

স্কুলে আমার এক ক্লাস নিচের ছাত্র হাসান শফির সঙ্গে কমল ও আমার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। তার আব্বা আবদুস সালাম সরকারি চাকরি করতেন—পরবর্তীকালে *পাকিস্তান অবজার্ভার* পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। হাসান শফির বড়ো মামা মুহম্মদ শামসউল হক তখন বোধহয় কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে অধ্যাপনা করতেন, পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলর, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র-মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। হাসান শফিদের বাসায় কমল ও আমার যাতায়াত ছিল, তার মা আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন এবং সে-স্নেহ এখনো অটুট আছে।

আমাদের স্কুলের আরো দুজন শিক্ষকের কথা মনে পড়ে। একজন আবুল কাসেম—আমাকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি পরবর্তীকালে দৈনিক *ইত্তেফাকে* যোগ দিয়েছিলেন এবং অবসর নিয়ে ইতিহাসবিষয়ে একাধিক বই লিখেছিলেন। আরেকজন ছিলেন কামাল আহ্‌মদ—পরে সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। বাইরে থেকে তাঁকে যতোটা কড়া মনে হতো, আসলে ততোটা কড়া ছিলেন না। ঢাকায় এক সময়ে

তাঁর সঙ্গে দেখা হতো—তিনি প্রায় পল্টন ময়দানে বেড়াতে আসতেন বলে। তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল আমার অনার্স পরীক্ষার ফলপ্রকাশের পরদিন। আমি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বলেছিলাম, 'সার্, আমার অনার্সের রেজাল্ট বেরিয়েছে—আমি ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছি।' তিনি খুব খুশি হয়ে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে দোওয়া করলেন, তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'বাবা, আমার ছেলেটা মানুষ হলো না।' আমি এতো অপ্রতিভ হয়েছিলাম যে, তাঁর কাছে আর কিছু জানতে চাই নি, একরকম পালিয়ে বেঁচেছিলাম।

স্কুলে এসেছিলেন এক নতুন শিক্ষক—তাঁর নাম জানারই সুযোগ পাই নি। একদিন তাঁর ক্লাসে আসতে সামান্য বিলম্ব হয়েছিল। সেই সুযোগে কয়েকজন ছাত্র খুব হইচই শুরু করে দিলো। ব্যাপারটা কী, তা দেখতে আমি ফার্স্ট বেঞ্চেই নিজের জায়গায় ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম। সেই মুহূর্তেই শিক্ষক ক্লাসে ঢুকলেন। গোলযোগের আওয়াজ তাঁর কানে গিয়েছিল আগেই। তাই আর মুহূর্তকাল নষ্ট না করে তিনি বেত মারতে আরম্ভ করে দিলেন। উলটো দিকে তাকিয়ে ছিলাম বলে তাঁর প্রবেশের ব্যাপারটা আমি টেরই পাই নি। সেটাই আমার অপরাধের প্রমাণ হয়ে গেল। মাথায় প্রথম বেতের আঘাত পড়তে আমি আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু হাত তুলে আত্মরক্ষা করতে চাইলাম। তাতে লাভ এই হলো যে, আমার দু হাতের তালুই ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলো। বাড়িতে ফিরে জ্বর এসে গেল। বেশ জ্বর—কদিন স্কুলে যেতে পারি নি। আব্বা নালিশ করায় হেডমাস্টার আমাকে দেখতে এলেন বাড়িতে। ফিরে গিয়ে বোধহয় তিনি ওইদিনের ঘটনা সম্পর্কে ছাত্রদের কাছে এবং আমার সম্পর্কে শিক্ষকদের কাছে খোঁজ নিয়েছিলেন। ততোদিনে শান্ত ছেলে হিসেবে আমি পরিচিত হয়ে গিয়েছিলাম। জ্বর থেকে উঠে যখন স্কুলে এলাম, ততদিনে হেডমাস্টার ওই শিক্ষককে ছাড়িয়ে দিয়েছেন স্কুল থেকে।

আমাদের স্কুলে সরস্বতী পুজো হতো এবং বার্ষিক মিলাদ হতো। পুজো দেখতে যাওয়ায় আমাদের কোনো নিষেধ ছিল না—কেবল বাড়ি থেকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে, পুজোর ফুল নিয়ে যেন আমি বইয়ের মধ্যে না রাখি। হিন্দু ছাত্রেরা সকলেই এমন করতো, মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে দু-একজন যে তা করতো না, তা নয়। সেজন্যেই সাবধানবাণী। তখন পর্যন্ত মিলাদের প্রধান আকর্ষণ ছিল বাতাসা ও বকুলদানা। খুব ঘটা করে হতো বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী। তাতে আমি একবার পুরস্কার পেয়েছিলাম—সেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার জোরে, আরেকবার সুযোগ পেয়েছিলাম কবিতা-আবৃত্তি করার।

আরেকটা অনুষ্ঠান করতো ছাত্রেরা সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্‌যোগেই। গ্রীষ্মাবকাশের আগের দিন প্রত্যেক ক্লাসেই ঘর-সাজানো এবং কিছু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হতো। এর জন্যে সকল ছাত্রই চাঁদা দিতো—কেউ অপারগ হলে তার ওপর জোর খাটানো হতো না, সেও অন্যদের মতো ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারতো। আমরা বাড়ি থেকেই লাল-নীল-সবুজ-হলুদ কাগজ কেটে শিকল বানিয়ে এবং অন্যরকম নক্‌শা করে শ্রেণীকক্ষ সাজাতাম—তার মধ্যে আমোদ ও উত্তেজনা, দুই অনুভব করতাম। সব কাজটা করা হতো মনিটর বা ক্লাস-ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে। এই উৎসব একবার আমাদের জন্যে পরম শোকাবহ ঘটনায় পরিণত হয়েছিল।

তখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। নিজেদের শ্রেণীকক্ষ সাজিয়ে আমরা যখন ফিরে আসছি, হাসান শফি তখনো স্কুলে রয়ে গেছে। সে ছিল পঞ্চম শ্রেণীর ক্যাপ্টেন। সেবারে তার ক্লাসে চাঁদা কম ওঠায় মনের মতো করে ঘর সাজাতে না পারায় সে একটু বিষণ্ন ছিল। আমরা বাড়ি ফিরে আসার খানিক পরে শুনতে পেলাম, স্কুলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়ে স্কুলে গেলাম। শুনলাম, আমরা চলে আসার পরে পঞ্চম শ্রেণীর কক্ষের ব্যালকনি থেকে লাফ দিয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীর কক্ষের ব্যালকনিতে পৌঁছোনোর চেষ্টা করতে গিয়ে হাসান শফি তেতলা থেকে নিচে পড়ে গেছে। আমরা গিয়ে তাকে পেলাম না—তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে—যে-জায়গায় সে পড়ে গিয়েছিল, সেখানে তার মগজের খানিকটা তখনো পড়ে ছিল। কমলকে নিয়ে বিকেলে যখন হাসান শফিদের বাড়িতে গেলাম, তখন চাচির ক্রন্দনধ্বনি সমস্ত জায়গাটা ভরে তুলেছিল। কমল ও আমি অশ্রুভরা চোখ নিয়ে ফিরে এলাম। দুই বন্ধুতে স্থির করলাম, হাসান শফির স্মৃতিতে আমরা একটা গ্রন্থাগার গড়ে তুলবো। সে-সংকল্প আমরা বাস্তবে পরিণত করেছিলাম।

১০.

হাসান শফি মেমোরিয়াল লাইব্রেরি গড়ার ধারণাটা আমরা পেয়েছিলাম পাড়ার সুপ্রতিষ্ঠিত শফিক মেমোরিয়াল লাইব্রেরি থেকে। কংগ্রেস একজিবিশন রোড যেখানে নিউ পার্ক স্ট্রিটের সঙ্গে মিলেছে, সেই মোড়টায় ছিল খান বাহাদুর আরশাদ আলীর বাড়ি (প্রথিতযশা অভিনেতা আলী যাকের তাঁর দৌহিত্র)। তাঁর ছেলেদের একজন ছিলেন মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের কৃতী ফুটবল খেলোয়াড় ছোটো রশীদ (পূর্ববর্ণিত বন্ধু মিয়ার ভগ্নীপতি), আরেকজন রফিক (বিদেশি কোম্পানির দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে অবসরপ্রাপ্ত), কনিষ্ঠ শফিক। অকালমৃত শফিকের স্মৃতিতে তাঁদের বাড়ির একতলায় লাইব্রেরিটা গড়ে তোলা হয়েছিল। পাড়ার বেশির ভাগ বাড়ির কেউ না কেউ তার সদস্য ছিলেন। আমাদের বাড়িতে ছোটোবু ছিল ওই লাইব্রেরির সদস্য, কিন্তু কিছুকাল পরে যুবক-অধিকৃত গ্রন্থাগারে তার যাতায়াতে বাধানিষেধ আরোপিত হওয়ায় (তখন বোধহয় তার বয়স ১৪ পূর্ণ হয়েছে), তার হয়ে বই আনা-নেওয়ার দায়িত্বভার আমার দুর্বল স্কন্ধে আরোপিত হলো। কাজটা বলা যত সহজ, করা অত সহজ ছিল না। আমি হয়তো বেছে তার জন্যে দুটো বই নিয়ে এলাম, সে দেখে বললো, 'আরে, এটা তো আমার পড়া—যাও, এটা ফেরত দিয়ে অন্য বই নিয়ে এসো।' ভাগ্যদোষে কখনো কখনো দেখা যেতো, নতুন আনা বইটাও তার পড়া। আমাকে তখন আবার লাইব্রেরি যেতে হতো। ভাইয়ের এই দুর্গতিতে হয়তো তারও মাঝে মাঝে করুণা হতো। তখন সে সাদা কাগজ কেটে সুতো দিয়ে বেঁধে আমার শার্টের পকেটের মাপে একটা নোটবই তৈরি করে দিলো। তাতে তার অধীত বইয়ের নাম লেখা থাকতো। শ্রেণীকরণ হতো লেখকের নাম দিয়ে কিংবা জনপ্রিয় সিরিজের নাম দিয়ে, যেমন, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, দীনেন্দ্রকুমার রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রহেলিকা সিরিজ,

কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ, মোহন সিরিজ। আমাকে সেই তালিকা মিলিয়ে তার না-পড়া বই খুঁজে বের করে আনতে হতো। পড়া হয়ে গেলে তালিকায় বইয়ের নাম যুক্ত হতো। তালিকাভুক্ত বই অধিকাংশ আমারও পড়া হয়ে যেতো।

বয়সে আমার চেয়ে পাঁচ বছরের কিছু বড়ো হওয়া সত্ত্বেও ছোটোবুর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছিল বন্ধুত্বের। বস্তুত, তার বিয়ে পর্যন্ত ডাকনাম মেরু বলে তাকে ডাকতাম—গুরুজনেরা বকাঝকা করেও আমাকে নিরস্ত করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত অমোঘ অস্ত্রটি প্রয়োগ করলো মেজোবু : 'মেরুর বিয়ে হতে যাচ্ছে, ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যদি শোনে যে, ছোটোভাই হয়ে তুমি ওর নাম ধরে ডাকছো, তাহলে আব্বার মান চলে যাবে।'

ছোটোবুর সঙ্গে ভোরবেলায় আমি হাঁটতে বেরোতাম—বোধহয় ছুটির দিনগুলোতেই, যদিও মনে হচ্ছে রোজই। আমাদের একটা কাজ ছিল শিউলিফুল কুড়ানো। শফিক মেমোরিয়াল লাইব্রেরির প্রায় উলটো দিকেই কংগ্রেস একজিবিশন রোডে এ কে ফজলুল হকের একটা বাড়ি ছিল (তাঁর অপর বাড়ি ছিল ঝাউতলা স্ট্রিটে—সেটাই বা তার পাশের কোনো রাস্তা এখন তাঁর নাম ধারণ করেছে)। তার পাশে ছিল ট্রাফিক পুলিশদের একটা ব্যারাক। ওই ব্যারাকের মধ্যে দুটি শিউলি গাছ ছিল। আমরা দুই ভাইবোনে সেখানে ফুল তুলতে যেতাম। পরে ছোটোবু ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিতো। পুলিশরা সস্নেহ প্রশ্রয় দিলেও মাঝে মাঝে কেউ কেউ কৃত্রিম ভয় দেখাতো, তাতে আমি যথার্থই ভীত হয়ে পড়তাম। এই ফুল কুড়োতে গিয়ে আমার ভাব হয়ে গেল মোহাম্মদ দীন নামে এক বিহারি কনস্টেবলের সঙ্গে। তিনি আমাকে পুলিশের গাড়িতে ড্রাইভারের পাশে বসার সুযোগ করে দিতেন। একটা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে লরিটা ঘুরতো—লরি থেকে একজন ট্রাফিক কনস্টেবল নেমে ডিউটি শুরু করতো, আর যার পালা সাঙ্গ হতো সে উঠে পড়তো লরিতে। আমার কাছে দুটো জিনিস খুব উপাদেয় মনে হতো : এক, এতোটা জায়গা ঘোরা, আর দুই, গাড়িভর্তি কনস্টেবলদের নামিয়ে দিয়েও আবার গাড়িভর্তি কনস্টেবল নিয়ে ফেরা। এ সেই পাটীগণিতের চৌবাচ্চার অঙ্কের মতো।

বিকেলবেলায় ছোটোবুর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চার নম্বর পুলের ওপরে চলে যেতাম। পুলের নিচে ট্রেন লাইন—ভাগ্যে থাকলে আমরা থাকতে থাকতেই তার ওপর দিয়ে ট্রেন চলে যেতো পুলটা কাঁপিয়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা যেতো, ততক্ষণ পর্যন্ত ট্রেনের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, আর ভাবতাম, ওর যাত্রীরা কেমন মজা করছে। তবে মাঝে মাঝে একটা বিপদে পড়তে হতো আমাকে। কোনোদিন ছোটোবুকে অসন্তুষ্ট করে ফেললে পুলের ওপরে সে শাসাতো, 'দেবো নিচে ফেলে?' কিংবা 'আমার কথা না শুনলে একদম নিচে ফেলে দেবো।' সশঙ্কচিত্তে আমি আজীবন তার কথা শোনার প্রতিশ্রুতি দিতাম এবং কাঁদতে কাঁদতে অনুনয় করতাম, এরকম কঠোর দণ্ড না দিয়ে আমাকে অন্য যে-কোনো শাস্তি দিতে। ছোটোবু তখন শর্ত দিতো, 'খবরদার, বাড়িতে কাউকে বলতে পারবে না যে, তোমাকে ফেলে দিতে গিয়েছিলাম।' আমি সে-শাসন কখনো অমান্য করি নি। এমন কি, আমার চোখেমুখে স্পষ্ট ভীতির চিহ্ন দেখে কেউ প্রশ্ন করলেও বলতাম, 'কিছু হয় নি।' পরে ছোটোবুই তার শাসনপ্রণালি ফাঁস করে দিতো আমার অগোচরে।

১১.

'তুমি আমার একমাত্র পুত্র। এই অতুল বিভব, সুবিস্তৃত রাজ্য এবং অসংখ্য সৈন্য-সামন্ত—সকলই তোমার।' আমাকে লক্ষ্য করে *বিষাদ-সিন্ধুর* এই লাইন দুটি প্রায় উচ্চরবে নাটকীয়ভাবে মুখস্থ বলতেন আব্বা। আমি যে তাঁর একমাত্র পুত্র ছিলাম—অন্তত সাড়ে দশ বছর বয়স পর্যন্ত—তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু অতুল বিভব বলতে আমি দেখতে পেতাম হোমিওপ্যাথিক ওষুধ ও বই-ভর্তি গোটা তিনেক আলমারি, একটা দেরাজওয়ালা টেবিল, কিছু চেয়ার, একটা বেঞ্চি, খাট একটা, ড্রেসিং টেবিল একটা, গোটা দুই চৌকি। সুবিস্তৃত রাজ্য বলতে ছিল ভাড়া-করা একতলাটা। অসংখ্য সৈন্য-সামন্ত অর্থ একজন কাজের ছেলে—তার সংখ্যা না বাড়লেও নামধামচেহারা পালটাতো। তাদের মধ্যে একজনকে আমার মনে পড়ে—রশীদ নামে বিহারি একটি ছেলে। সর্বসম্মতিক্রমে আমি তাকে পড়াবার ভার নিয়েছিলাম। এখানে রবীন্দ্রনাথের ওপর আমার জিত—রেলিংগুলোকে ছাত্র কল্পনা করতে হতো না।

আব্বা যে সাহিত্যের খুব অনুরক্ত ছিলেন, তা বলা যায় না। তবে তিনি সুর করে কিছু কবিতা পড়তেন ও গান গাইতেন—তার একমাত্র শ্রোতা ছিলাম আমি। তিনি কখনো ফারসি শেখেন নি, কিন্তু সুর দিয়ে আবৃত্তি করতেন,

> চে তাদবির আয় মুসলমানান্
> কে মন্ খুদ্‌রা নমি দানম্।

জিজ্ঞেস করলে এর অর্থ বলতেন, 'হে মুসলমানেরা, আমি কী করবো, নিজেকেই যে আমি জানিনে!' এমন দুর্জ্ঞেয় বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবার বয়স আমার তখন হয় নি—বোধকরি, কোনো কালেই হয় নি—কিন্তু এর সুর ও ধ্বনিমাধুর্য মনকে ভরিয়ে দিতো।

আব্বার গলায় যে সুর ছিল, এমন দাবি করা অসংগত হবে। তবু তিনি যখন আমাকে তাঁর পাশে শুইয়ে গাইতেন, 'ধনধান্যপুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' তখন সত্যি আমি মোহিত হতাম। গভীর আবেগের সঙ্গে পুরো গানটি আব্বা গাইতেন, এর অনেক অংশ আমারও মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। কিছু কিছু স্বদেশী গানও আব্বা শোনাতেন: 'ভাই হয়ে ভাই মিলবি সবাই, গাইবো কী আর এমন গান' কিংবা 'একবার বিদায় দে, মা, ঘুরে আসি।' শেষ গানের পটভূমিকা সাবিস্তারে শুনেছিলাম তাঁর কাছে। তার থেকেই বোধহয় দেশপ্রেমের অঙ্কুর মনে জন্মেছিল আর ক্ষুদিরাম ও তাঁর সতীর্থ বিপ্লববাদীদের প্রতি শ্রদ্ধা জেগেছিল চিত্তে। *গীতাঞ্জলির* দুটি গানও আব্বা গাইতেন: 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার/চরণধূলার তলে' এবং 'সীমার মাঝে, অসীম, তুমি/বাজাও আপন সুর'—এর মধ্যে প্রথমটিই ছিল তাঁর প্রিয়, সেটি তিনি গাইতেন খুব আপ্লুত হয়ে।

লোকে যাকে ধার্মিক বলে, আব্বা তা ছিলেন না। নামাজ-রোজার বিষয়ে তিনি ছিলেন উদাসীন, কেবল ঈদেই নামাজ পড়তে যেতেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে। তবে তাঁর ধর্মবিশ্বাস ছিল প্রবল। সে বিশ্বাস আল্লাহ্-রসুল ছাড়িয়ে বড়পীর হজরত আবদুল কাদের জিলানী ও আজমীর শরীফে শায়িত হজরত মঈনউদ্দীন চিশতি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এন্টালির কাছে মট লেনে এক পীর সাহেব থাকতেন—আব্বা মাঝে মাঝে তাঁর

কাছে যেতেন। তাঁর সঙ্গে গেলে আমি দেখতে পেতাম, পীর সাহেবের চৌকিতে তামার এক পয়সা স্তূপ হয়ে অনেকটা পিরামিডের আকৃতি ধারণ করেছে। তালতলার পীর সাহেবের প্রতিও আব্বার ভক্তি ছিল, তবে তিনি কখনো কোনো পীরের মুরিদ হন নি বা হওয়ার কথা ভাবেন নি।

সেই তুলনায় মা ছিল অনেক ধর্মপরায়ণ। যে-সময়ের কথা বলছি, তখন মা পাঞ্জেগানা নামাজ পড়তো, তিরিশটা রোজা রাখতো—কদাচিৎ তার ব্যত্যয় হতো। নামাজ পড়ে মা কুরআন শরিফ পড়তো—নীরবে বা গুনগুনিয়ে, কখনো উচ্চকণ্ঠে নয়। তার ধর্মাচরণে লোক-দেখানো কোনো ব্যাপার ছিল না। আমার বোনদের মা অনুপ্রাণিত করেছিল নামাজ-রোজা রাখতে এবং কুরআন তেলাওয়াত করতে। তবে তারা কেউ নিয়মিত নামাজ পড়তো না—বয়স যার যত কম, তার ধর্মপরায়ণতা তত ক্ষীণ হওয়ার লক্ষণ দেখতাম।

আমি মিলাদ শরিফে প্রায়ই যেতাম, দাঁড়িয়ে তারস্বরে 'ইয়া নবি সালাম আলায়কা' প্রভৃতি বলতাম এবং 'বালাগালউলা বে কামালিহি'র ধ্বনিমাধুর্যে মুগ্ধ হতাম। তবু মিলাদের বড়ো আকর্ষণ ছিল তবাররুক—কখনো জিলিপি, তবে সাধারণত নকুলদানা ও বাতাসা। বাতাসা তখন হতো দুরকম—গুড়ের ও চিনির। পরেরটিই বেশি প্রিয় ছিল আমার। মিলাদে যে সর্বক্ষণ ধর্মভাবে ভাবিত হতাম, তা নয়। ধারে কাছে কোনো বন্ধু থাকলে উঠতে বসতে তাকে কনুইয়ের গুঁতো দিতাম অথবা তার কনুইয়ের গুঁতো খেতাম।

ধর্মীয় আচার-পালনের চাপ থেকে আমি একেবারেই মুক্ত ছিলাম। এটা কী করে সম্ভবপর হয়েছিল, তা জানিনে। আমার হাতে দাদার *নামাজ-শিক্ষা* বইটা তুলে দিয়ে চার কলেমা, সুরা ফাতেহা, সুরা এখলাস প্রভৃতি মুখস্থ করতে বলা হয়েছিল এবং আমি তা করেও ছিলাম। এসব কলেমা ও সুরা শিখেছিলাম বঙ্গাক্ষরে দেওয়া পাঠ থেকে—বোনেরা যেমন আরবি বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিত হয়ে কুরআন পড়তে শিখেছিল, আমার ক্ষেত্রে তা হয় নি। আমাকে অবশ্য আরবি বর্ণমালা শেখানো হয়েছিল, আমপারাও একটা কিনে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আরবি পাঠ অক্ষরজ্ঞানের বেশি এগোয় নি। নামাজ পড়তে হয় কীভাবে, তা আমাকে শেখানো হয়েছিল, কিন্তু নামাজ পড়ার জন্যে চাপ দেওয়া হয় নি, রোজা রাখার জন্যেও নয়। বরঞ্চ ছেলেবেলায় রোজা রাখতে চাইলে আমাকে নানাভাবে নিরুৎসাহ করা হতো, সেহরি খেয়ে নিয়ত করে রোজা রাখলে দিনের মধ্যভাগে তা ভেঙে ফেলতে উৎসাহিত করা হতো। তবু, মনে হয়, ন-দশ বছর বয়সে দু-চারটে রোজা রাখতাম—বিশেষ করে, প্রথম, সাতাশে এবং শেষটা। সেহরি খাওয়ার মধ্যে একটা আমোদের উত্তেজনা ছিল। ইফতারের জন্যেও প্রলুব্ধ থাকতাম, তবে মাঝে মাঝে মনে হতো, রোজা রেখে ইফতার খাওয়ার মজা বেশি। আর আনন্দ পেতাম সাতাশে রোজার দিনে আশেপাশের বাড়িতে ইফতার নিয়ে যাওয়ায় এবং অন্যান্য বাড়ি থেকে আসা ইফতার পরখ করে দেখায়।

অবশ্য রোজার আগে ছিল শবেবরাত। সেই রাতে চালের আটার রুটি এবং সুজি, ময়দা ও ডিমের হালুয়া বাড়িতে বানানো হতোই। অধিকন্তু পরটা ও গরুর গোশ্‌তেরও ব্যবস্থা থাকতো। সাতাশে রোজার মতোই এদিনে হালুয়া-রুটি এক বাড়ি থেকে অন্য

বাড়িতে যেতো। এভাবে আহার্য পৌঁছোতে নিজেকে বেশ কর্তাব্যক্তি মনে হতো। তবে তার চেয়ে বেশি আনন্দ ছিল জানলায় শাদা কিংবা রঙিন মোমবাতি জ্বালানোয়, ফুলঝুরি বা তারাবাজি ধরানোয় এবং ফুটপাথে রেখে তুবড়িতে আগুন দিয়ে রঙ-বেরঙের অগ্নিশিখার উচ্চাভিমুখী যাত্রায়। মুরুব্বিস্থানীয় আত্মীয়দের অনেকেই বাজি পোড়ানো অনুমোদন করতেন না। বলতেন, আগুন নিয়ে খেলা মানে শয়তানের পথে চলা; তবে আমি এর মধ্যে শয়তানের নৈকট্য অনুভব করতাম না, ফুর্তিটাই অনুভব করতাম। মেজোবু অবশ্য আকারে-ইঙ্গিতে বোঝাতো যে, বেশি বাজি কেনার সামর্থ্য আমাদের নেই, কিন্তু এই বেশির মাত্রা সম্পর্কে তার সঙ্গে আমার অপ্রকাশ্য মতভেদ ছিল। আব্বা-মা আমার আবদার প্রায়ই রাখতেন এবং সে-কারণেই মাঝে মাঝে মনে হতো মেজোবুর কথাই বোধহয় ঠিক। তবু কেবল অন্যের আতসবাজিতে যোগ দেবো এবং তাদের সংগৃহীত ফুলঝুরি জ্বালাবো আর তুবড়ি ফোটাবো, এটাও সমীচীন মনে হতো না।

ঈদটা সত্যি ছিল আনন্দের। প্রথমেই মনে পড়ে ঈদের চাঁদ দেখার প্রতিযোগিতা। সূর্য অস্ত যেতে না যেতেই তৃষিত দৃষ্টি নিয়ে সকলে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতাম। মনে হতো ছাদে উঠে দেখতে পারলে আকাশের একটু কাছে পৌঁছানো যেতো এবং তাতে দৃষ্টিসীমার মধ্যে চাঁদের এসে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। অভিভাবকেরা সহজে সেখানে উঠতে দিতে চাইতেন না—পাছে আকাশের দিকে চোখ মেলে নড়াচড়া করতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে যাই। বাড়ির সামনের ফুটপাথ থেকে চাঁদ দেখা না গেলে ভাবতাম, বাড়ির পেছন দিকে রান্নাঘর বা তার কাছ থেকে তাকালে হয়তো চাঁদ দেখা যাবে।

রমজানের চাঁদ দেখারও একটা প্রতিযোগিতা চলতো, তবে ঈদের চাঁদ দেখার উৎসাহ ছিল বহুগুণে বেশি। চাঁদ দেখতে না পেলে একটু বিষণ্ন হতাম। বন্ধুরা এই উৎসাহের সুযোগ নিয়ে ঠকাতে চাইতো। বলতো, 'ওই তো চাঁদ।' 'কোথায় কোথায়?' 'ঠিক আমার আঙুলের সোজাসুজি দেখ্, দেখতে পাবি।' প্রায়ই কোনো বন্ধুর নির্দেশমতো এদিক-ওদিক তাকিয়েও হয়তো দেখতে পেতাম না। যখন দেখতে পেতাম, তখন কী আনন্দ!

প্রত্যাশিত দিনে চাঁদ দেখতে না পেলে পরদিন চাঁদ উঠবে বলে ধরে নেওয়া হতো। সেইমতো বাড়িতে শুরু হতো নানা আয়োজন। পরের সন্ধ্যায় চাঁদ উঠলে মা কী বোনেরা খালি চোখে চাঁদ দেখে দোয়া-দরুদ পড়তো। তারপর চোখের সামনে শাড়ির আঁচল ধরে সেদিকে আবার দেখতো। কাপড়ের ভিতর দিয়ে দেখা গেলে বুঝতে হতো সেটা দ্বিতীয়ার চাঁদ—ঈদের চাঁদটা আসলে উঠেছিল আগের সন্ধ্যায়, আমাদের কাছে ধরা দেয় নি।

ঈদে নতুন জামাকাপড় কেনার পালাটা আগেই শেষ হয়ে যেতো। কেনা হতো না শুধু টুপিটা। আমার একটা লাল মখমলের টুপি ছিল—তার ওপর সোনালি জরির কাজ করা। ঈদের চাঁদ দেখে টুপিটা বারবার মাথায় দিতাম এবং আশা করতাম, সেটা ছোট হবে, তাহলে একটা নতুন টুপির বায়না ধরা যাবে। প্রায়ই হতাশ হতে হতো। তারপর যখন সত্যি সত্যি টুপিটা আর মাথায় লাগতো না, তখন চাইতাম সাদা ফিনফিনে কাপড়ের কিস্তি টুপি। কিস্তি টুপি থাকলে চাঁদরাতে তা ইস্ত্রি করতাম—দরকার হোক

আর না হোক। ইস্ত্রি যাতে করা যায়, সেজন্যে একটু যে দুমড়ে ফেলতাম না টুপিটা, তা বলা যায় না। বাড়িতে ইস্ত্রি না থাকলে ধোপাবাড়ি গিয়ে পয়সা খরচ করে ইস্ত্রি করিয়ে আনতাম। এসব ক্ষেত্রে বোনেরা বলতো, 'বালিশের নিচে সোজা করে রেখে ঘুমোও; দেখবে, কাল সকালে ঠিক হয়ে গেছে।' তাদের কথায় খুব হতাশ হতাম। মানুষ এমন নির্দয় হতে পারে! শেষ পর্যন্ত মায়ের কাছ থেকে ইস্ত্রি করার পয়সাটা অবশ্য পাওয়া যেতো।

অন্যদিন যখনই উঠি না কেন, ঈদের দিন খুব সকালেই উঠতাম। যত সকালেই উঠি, রান্নাঘর থেকে সুবাস পাওয়া যেতো। হাতমুখ ধুয়ে, অতএব, রান্নাঘরের দিকেই যাত্রা করতাম। বোনেরা আমার মতলব বুঝে বলতো, 'যাও, আগে গোসল করে এসো।' এখানেও মা প্রায়ই রক্ষা করতো। বলতো, 'দেখো তো, জরদায় মিষ্টি ঠিক হয়েছে কিনা' কিংবা 'সেমাইটা এক চামচ খেয়ে দেখো তো, ঠিকমতো গলেছে কি না।'

তারপরই নামাজ পড়ার জন্য বড়োদের প্রাণ ওষ্ঠাগত করে ছাড়তাম। কোনো কারণে দেরি হয়ে গেলে মসজিদে নামাজ পড়তে হতো। সেটা বেশি মনঃপূত হতো না। ময়দানে নামাজ পড়তে ভালো লাগতো বেশি। আরো ভালো লাগতো, ট্রামে করে গিয়ে যদি গড়ের মাঠে নামাজ পড়ার সুযোগ হতো। কতো লোক সেখানে—তার সঙ্গে অন্য কোথারও তুলনা হয় না।

নামাজ শেষে ঈদের কোলাকুলি। বাড়ি ফিরে এসে সবাইকে সালাম। তারপর বন্ধুদের বাড়ি যাওয়া। কিংবা ততক্ষণে হয়তো আমাদেরই বাড়িতে এসে গেছে কোনো বন্ধু। বন্ধুদের সঙ্গে কোলাকুলি করতে একটু জোর খাটানোই ছিল রেওয়াজ। হয় বুকে একটু জোরসে ধাক্কা দেওয়া, নয়তো পিঠে হাত দিয়ে একটু জোরে চেপে ধরা। তারপর তাদের বাড়িতে যাওয়া এবং খাওয়া। বড়োদের নির্দেশ থাকতো, অন্য বাড়িতে গিয়ে নামমাত্র খাবে, কেননা দুপুরে পোলাও-কোরমা খেতে হবে নিজের বাড়িতে। এ উপদেশে বেশি কাজ হতো বলে মনে পড়ে না। যেখানে যেতাম, সেখানে সব তৈরি খাবার। তার তুলনায় ফিরে এসে পোলাও খাওয়া অনেক সুদূরের ব্যাপার মনে হতো। আবার দুপুরে খেতে বসে যদি চোখের খিদে না মেটাতে পারতাম—মানে যা যা যতটা খেতে ইচ্ছে করতো, ততটা না খেতে পারতাম—তাহলে মনে মনে দুঃখ হতো, আগে কেন অতটা খেয়ে এলাম! আর সেই দুঃখ জাগলে দায়ী করতাম বন্ধুদের—ওরা কেন অমন করে লোভ দেখালো!

পাড়া বেড়িয়ে, বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজনের বাসা ঘুরে, পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরতাম। রাতে একেবারে খেতে ইচ্ছে হতো না। নতুন জামাকাপড় খুলে সব সযত্নে ভাঁজ করে রেখে বিছানায় শুয়ে পড়তাম। ঘুম না আসা পর্যন্ত ভাবতে চেষ্টা করতাম, দিনের সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার কোনটা ঘটেছিল। আর ভাবতাম, এবারের ঈদে কী করা হলো না—তা সামনের ঈদে করতে হবে!

ঈদে আমরা ভাইবোনেরা নতুন কাপড় পেতাম, মা কদাচিৎ নিজের জন্যে কিনতো, আব্বা কখনোই না—ঈদের নামাজও তিনি পড়তেন শার্ট-প্যান্ট পরে।

এখানে আব্বার পোশাকের কথা তোলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি যখন বসিরহাটে প্র্যাকটিস করতেন, তখন পরতেন শাদা শার্ট ও ধুতি। কলকাতায় আসার

পরে পরতে শুরু করেন শাদা শার্ট ও শাদা মাখন জিনের ট্রাউজার—সেটাকে প্যান্টই বলা হতো সাধারণত। আমৃত্যু এটাই ছিল তাঁর বাইরের পোশাক। ঘরে তাঁকে ধুতি পরতে দেখি নি কখনো—লুঙ্গিই পরতেন। সে-লুঙ্গি বেশির ভাগ সময়ে একরঙা হলেও তাঁকে চেক লুঙ্গি পরতেও দেখেছি। কথাটা উল্লেখ করলাম এই জন্যে যে, পরে কোনো মনস্বী ব্যক্তি আমাকে বুঝিয়েছিলেন যে, বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই লুঙ্গি পরতো, কিন্তু পার্থক্য এই যে, মুসলমানেরা পরতো একরঙা লুঙ্গি আর হিন্দুরা চেক-কাটা। এ পার্থক্য যে রক্ষিত হতো সর্বত্র, আমার অভিজ্ঞতা তা বলে না। আব্বা ছিলেন একটি রুমি টুপি বা ফেজের অধিকারী—ইংরেজি কায়দায় যাকে বলা হতো টার্কিশ ক্যাপ। সেটা ঈদেই পরা হতো। লাল ফেল্টের মতো কাপড়ের টুপি, পিছনে থাকতো কালো ঝুঁটি। এই টুপি অনেকেই পরতেন। ফজলুল হক সেলবর্সীর নিত্য পোশাক ছিল শাদা, ঘিয়ে বা ছাই রঙের শেরওয়ানি (তখন শেরওয়ানি না বলে আচকান বলা হতো, হয়তো দুয়ের মধ্যে কিছু সূক্ষ্ম প্রভেদ থাকতেও পারে) এবং রুমি টুপি।

বকরিদে আমরা প্রতিবছর কুরবানি দিতাম না—মাঝে মাঝে তা বাদ পড়তো—ভক্তির অভাবে অতোটা নয়, যতোটা সামর্থ্যের অভাবে। বড়োরা চেষ্টা করতেন পশু-জবাই থেকে আমাদের আড়াল করতে। আমরা ছোটোরা ততোধিক উৎসাহ ফাঁক-ফোকর দিয়ে বেরিয়ে জবাই দেখে ফেলতাম। দেখার পরে কিন্তু অনেকক্ষণ বিষাদে মন ছেয়ে যেতো। তবে শেষ পর্যন্ত এই বিষণ্নতা পেছনে ফেলে দেখা দিতো কুরবানির গোশ্‌ত খাওয়ার উৎসাহ।

আব্বার হাতে ধরে প্রায়-নিয়মিত আরেকটি অনুষ্ঠানে যেতাম, তা হালখাতার। যেসব দোকান থেকে আব্বা ওষুধপত্র কিনতেন, সেগুলি ছিল সি রিঙ্গার অ্যান্ড কোম্পানি (ডালহাউসি স্কোয়ারে), এম ভট্টাচার্য অ্যান্ড কোম্পানি (বউবাজারে) ও কিং অ্যান্ড কোম্পানি (এলিয়ট রোডে)। প্রথমটি ছিল বিদেশি মালিকানাধীন, তবু প্রতি নববর্ষেই তিন জায়গাতেই হালখাতার অনুষ্ঠান হতো। আব্বা পারলে তিনটিতেই যেতেন, অন্তত দুটিতে। এই একটি অনুষ্ঠানেই তিনি অনামন্ত্রিত আমাকে নিয়ে যেতে দ্বিধা করতেন না, আমিও খেয়েদেয়ে বেশ আনন্দিত হতাম এবং প্রায়শই হাতে বাড়তি প্যাকেট নিয়ে ফিরতাম—তা থেকে পরিবারের অন্য সদস্যেরা ভাগ নিয়ে খুশিই হতাম।

মুহররমের মিছিল দেখতে আমার খুব ভালো লাগতো। এটা যে শোকোচ্ছ্বাস-প্রকাশের বিষয়, তা অজানা ছিল না। চোখের সামনেই তো দেখতাম, মিছিলের অংশগ্রহণকারীরা 'হায় হাসান, হায় হোসেন' বলে অনবরত বুক চাপড়ে এবং কেউ কেউ ছোটো চাকু বা অনুরূপ ধারালো কিছু দিয়ে বুকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে ফেলছে। বেদনা ও বিস্ময়, সহানুভূতি ও সম্ভ্রমের সঙ্গে তাদের অবলোকন করতাম, কিন্তু আমার মনোহরণ করতো তাজিয়া। কতো রঙের, কতো আকারের বিচিত্র সব তাজিয়া থাকতো আর থাকতো নানা উপকরণ দিয়ে বানানো কিংবা সত্যিকার ঘোড়া—সুসজ্জিত দুলদুল—আর রঙিন পোশাকপরা তার সওয়ার। এসবের অনুগামী হওয়ার লোভ আমি সামলাতে পারতাম না। অভিভাবকেরা শুধু বেশি দূরে যেতে নিষেধ করতেন, তবে আমার ধর্মপ্রাণ মামারা বলতেন, মুহররমের মিছিলে শরিক হওয়া

মুসলমানের পক্ষে অকর্তব্য। শিয়ারা এমন করে বটে, কিন্তু আমাদের উচিত এসব থেকে দূরে থাকা। শিয়ারা কি তাহলে মুসলমান নয়? হ্যাঁ, মুসলমানই একরকমের, তবে তাদের বিশ্বাসে ও আচারে ত্রুটি আছে। তাহলে ওরা ওরা এবং আমরা আমরা? এ-প্রশ্নের জবাব পেতে অনেক সময় লেগেছে। তখন আবার জেগেছে আরেক জিজ্ঞাসা : এই সুন্নিপ্রধান বঙ্গদেশে মুহররমের অনুষ্ঠান এতো জনপ্রিয় হলো কেন ও কীভাবে? সে কি তার বর্ণবহুলতার জন্যে!

১২.

কমল আর আমি মিলে পার্ক সার্কাসের ছোটো মাঠে হাসান শফি মেমোরিয়াল লাইব্রেরির পত্তন করলাম। নিজেদের যত বইপত্র ছিল, সবই দিলাম। তারপর পাড়ার এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে বেশ কিছু বই সংগৃহীত হলো। এবারে সদস্য-সংগ্রহের পালা। তাতেও সাড়া মন্দ পেলাম না। কিন্তু তারপরই ঘটলো মুশকিল। সদস্যরা নিজেরাই অনেক বই দিয়েছেন, অন্যদের দেওয়া বইয়ের মধ্যেও কিছু তাঁদের পড়া। সুতরাং তাঁদের দাবি, নতুন বই চাই। তাঁদের চাঁদার টাকায় যে বই কেনা হলো, সে আর কটা! চাই, চাই, আরো চাই, তোমারে কেবলি। সে-তুমি বই অথবা টাকা।

আমার মাথায় এলো, পাড়ায় একটা শব্দগঠন-প্রতিযোগিতা করলে কেমন হয়? প্রবেশমূল্য আট আনা, পুরস্কার দুটাকা। ১০-১২টা নাম এলোমেলো করে দেওয়া আছে, সেগুলো ঠিকমতো সাজাতে হবে। বাড়ি-বাড়ি গিয়ে জবরদস্তি করে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রবেশমূল্য আদায় করতে শুরু করলাম। ফজলে লোহানী ডেকে বললেন, 'শোনো, এগুলো এভাবে করা যায় না। তোমাদের সমাধান আগে থেকে তৈরি করে সিল-গালা করে অন্তত গণ্যমান্য কারো কাছে জমা রাখতে হবে। নইলে এনট্রি পাওয়ার পরে তোমাদের ইচ্ছেমতো সমাধান দেবে, তা চলবে না। তাছাড়া এই সমস্যা সকলেই পূরণ করতে পারবে। কেবল একটা সমাধান 'আলী হোসেন' অথবা 'হোসেন আলী', দুই হতে পারে, এখানেই যা একটু প্যাঁচ। কিন্তু তোমাদের সমাধান আগে থেকেই তৈরি রাখতে হবে।'

আমরা পড়ে গেলাম অথৈ জলে। মন্টু ভাই (ফজলে লোহানী) দয়াপরবশ হয়ে বললেন, 'এই প্রতিযোগিতা বাতিল করে দাও, পয়সা ফেরত দাও। তারপর অন্য কিছু ভাবো।' এই উপদেশ শিরোধার্য করে আবার বাড়ি বাড়ি চললাম। নইলে আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয়ের আশঙ্কা।

এবারে ঠিক করলাম, হাতের লেখা পত্রিকা বের করতে হবে—তার লেখা পাওয়া যাবে বিনামূল্যে, কিন্তু পাঠকদের কাছ থেকে কিছু আদায় করা হবে। প্রথমেই লেখা চাইতে গেলাম রোকনুজ্জামান খানের কাছে—তিনি তখন দৈনিক *ইত্তেহাদে* কাজ করেন, যতদূর মনে পড়ে, অভ্যর্থনা বিভাগে।

ইত্তেহাদ বেরিয়েছিল আমাদেরই বাড়ির কাছে নিউ পার্ক স্ট্রিটের একটা বাড়ি থেকে। নবাবজাদা হাসান আলী ছিলেন এর মালিক। তিনি যদিও মুসলিম লীগের সমর্থক ছিলেন, তবু *ইত্তেহাদকে* দেখা হলো *আজাদের* প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। *আজাদ* যদি হয়

নাজিমউদ্দীন-আকরম খাঁ উপদলের কাগজ, তাহলে *ইত্তেহাদ* সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিম উপদলের। জমকালো করে এর উদ্‌বোধন হয়েছিল। আব্বার দাওয়াত ছিল, সেই সুযোগে আমিও চলে গিয়েছিলাম সেখানে। প্রধানমন্ত্রী সোহ্‌রাওয়ার্দীকে সেই প্রথম দেখেছিলাম। আমার মনে হচ্ছে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার স্পিকার নূরুল আমিনকেও সেখানে প্রথম দেখি (কথাটা একদিন ওঠায় রোকনুজ্জামান খান ও কে জি মুস্তাফা দুজনেই বললেন, নূরুল আমিন সেখানে ছিলেন না—তাঁদের কথাই মান্য)। সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদকে আগেই দেখেছিলাম, তারপরও রোজ দেখতাম, আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে *ইত্তেহাদ* অফিসে যেতে। প্রায়ই তাঁর পরনে থাকতো কালো শেরওয়ানি এবং চোস্ত ধরনের পাজামা। সময় থাকলে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে আব্বার সঙ্গে কথা বলে যেতেন। *ইত্তেহাদে* অনেক প্রতিভাবান মানুষের সমাবেশ হয়েছিল। আহসান হাবীব সাহিত্য-সম্পাদক, কে জি মুস্তাফা ছিলেন বার্তা বিভাগে।

কমল ও আমার পরিকল্পনা ছিল, আগে রোকনুজ্জামান খানের কাছে লেখা চেয়ে তারপর ওপরে উঠে আহসান হাবীবের কাছে যাবো। জামান ভাই জানতে চাইলেন, হাতে-লেখা কাগজের সম্পাদক কে হবে? বললাম, আমরা দুজন। উনি হাসলেন। বললেন, পত্রিকা বের করার আইডিয়াটা ভালো, কিন্তু আমাদের মতো ইস্কুলের ছাত্রের সম্পাদনায় কি বড়োরা লেখা দেবেন? তার চেয়ে অন্তত কিছু বড়োদের সংশ্লিষ্ট করা যাক, তারপর অগ্রসর হওয়া যাবে।

সবকিছুর ভার তাঁর হাতে দিয়ে কমল ও আমি লেখা সংগ্রহে লেগে গেলাম। বেনজীর আহমদ ও সুফিয়া কামালের লেখা সহজেই পাওয়া গেলো। জসীমউদ্‌দীন দু-একদিন ঘুরিয়ে কবিতা দিলেন; বললেন, 'আমার হাতের লেখা কেউ সহজে পড়তে পারে না, বেধে গেলে আমার কাছে জিজ্ঞেস করে নিও।' জামান ভাই পাঠালেন সেলিনা মাহমুদের কাছে, উনি তখন সদ্য লিখছেন। আমার দাবি শুনে জানতে চাইলেন, 'তুমি কী লিখবে?' কথাটা আমাকেও ভাবাচ্ছিল। বললাম, 'আমি লিখবো 'হাতেম তাই'।' মায়ের বইটার প্রথম অধ্যায় নিজের ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলাম, আর তা পত্রস্থ হয়েছিল। দেখা হলে সেলিনা মাহমুদ এখনো সে কথা মনে করিয়ে দেন। ওঁর ভাই মাহমুদ নূরুল হুদার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বহু পরে, ঢাকায়।

কমল ও আমার পরিকল্পনার চেয়ে পত্রিকা বের হতে দেরি হয়ে গেলো। কিন্তু যখন বের হলো, তখন মানলাম, অমন পত্রিকা বের করা আমাদের সাধ্য ছিল না। আমরা দুজনে যে লেখা জোগাড় করেছিলাম, তাঁর চেয়ে অনেক বেশি করেছিলেন জামান ভাইরা। ওঁরা তিনজনে হয়েছিলেন সম্পাদক : রোকনুজ্জামান খান, ফজলে লোহানী ও সৈয়দ আনোয়ারুল হাফিজ। বিশিষ্ট, প্রতিষ্ঠিত, তরুণ, নবীন লেখকদের লেখা ছাড়াও ছবি ছিল—জয়নুল আবেদিনের, কামরুল হাসানের, সফিউদ্‌দীন আহমদের। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন বজলে মাওলা। নাম *নোতুন দিন*। নতুন না লিখে নোতুন কেন লেখা হলো, এ-প্রশ্ন করে সদুত্তর পাই নি। শুধু জানলাম, দুরকম বানানই সিদ্ধ। অনেক পরে পড়েছিলাম, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, নৌতুন থেকে নোতুন হওয়াই সংগত। *নোতুন দিন* কার হাতের লেখায় বেরিয়েছিল, তা এখন ভুলে গেছি। তবে অত্যন্ত সুন্দর

ছিল তাঁর হস্তাক্ষর।

নোতুন দিন বের হলো বটে, কিন্তু আমাদের লাইব্রেরির সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে। সেটাই যা একটু খারাপ লেগেছিল। এ পত্রিকায় কমল লেখে নি। আমি কখনো ভাবি নি যে, আমি লিখবো। ঘটনাক্রমে লেখা হয়ে গেলো পত্রিকার সঙ্গে সংস্রবের ফলে। *হাতেম তাই* সামনে রেখে লিখেছিলাম বটে, তবে চুরি করি নি—যতটা সম্ভব নিজের ভাষায়, নিজের মতো করে লিখেছিলাম। সাহিত্যযশোপ্রার্থী না হয়েও লেখার আত্মপ্রকাশে খুশি হয়েছিলাম বই কি!

১৩.

বাড়ির আবহাওয়া থেকে মনে গেঁথে গিয়েছিল এ-কথাটা যে, হিন্দু ও মুসলমান স্বতন্ত্র। হিন্দুর প্রতি কোনো বিদ্বিষ্ট ভাব জাগে নি, কিন্তু তারা যে আমাদের মতো নয়, এটা আরো বুঝতাম স্কুলে সরস্বতী পুজো ও মিলাদের অনুষ্ঠানে কিংবা মাঝে মাঝে একই কল থেকে পানি খেতে গিয়ে। তবে বড়োরা এই ধারণাটাও জাগিয়ে দিয়েছিলেন যে, মুসলমানের প্রতি হিন্দুরা সাধারণত অবিচার করে থাকে। অন্যদিকে হিন্দু শিক্ষক, আইনজীবী ও চিকিৎসকের পেশাদারি দক্ষতাও আবার এমন সর্বজনস্বীকৃত ছিল যে, মুসলমানের কাছেও তাঁরা অত্যাবশ্যক বলে গণ্য হতেন।

হিন্দু-মুসলমানের এই স্বাতন্ত্র্যবোধ যে মুসলিম লীগের রাজনীতির আবহাওয়ায় অনেকখানি পুষ্ট হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। আমার জ্ঞান হতে হতে দেখি, বাড়ির সকলে পাকিস্তান চান, মুসলিম লীগকে সমর্থন করেন এবং জিন্নাহ্‌কে নেতা মানেন। আশপাশেও এই ভাবটাই প্রবল ছিল। ইন্তু মিয়াদের বাড়িতে যখন হুমায়ুন কবির আসতেন, তখন দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেলে কেউ না কেউ সখেদে বলতেন, এতো বড়ো প্রতিভা বাঙালি মুসলমানের মধ্যে নেই, কিন্তু আফসোস এই যে, তিনি কংগ্রেসি। মওলানা আবুল কালাম আজাদের ছবি দেখতাম কাগজে। তাঁর সম্পর্কেও বলা হতো যে, ইসলাম-বিষয়ে জবরদস্ত পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে কংগ্রেসের বড়ো নেতা, এটা খুবই শোচনীয় ব্যাপার। আব্বা একটু বিষণ্নচিত্তেই জানিয়েছিলেন যে, কংগ্রেসি হওয়ার ফলে কলকাতার মুসলমানেরা গড়ের মাঠে ঈদের জামাতে মওলানা আজাদকে ইমামতি করতে বাধা দিয়েছিল এবং তার ফলে ঈদের সময়ে তিনি আর কলকাতায় আসতেন না। আমার মনে হতো, কংগ্রেসি রাজনীতির প্রতি বিরাগ সত্ত্বেও মওলানা আজাদের ইমামতিতে ঈদের নামাজ পড়তে পারলে আব্বা খুশি হতেন।

এই আবহাওয়ায় আমিও পাকিস্তানের খুদে সমর্থক হয়ে উঠেছিলাম। স্কুলে টিফিনের জন্যে যে-পয়সা পেতাম, হঠাৎ করে একটা সিগারেটের টিনে তা জমাতে আরম্ভ করলাম। উদ্দেশ্য : জিন্নাহ্‌ ফান্ডে দান করা। কিন্তু টিফিনের পয়সা জমে এক টাকা হতেই বেশ সময় লেগে যেতো। আমি যাতে হতাশ না হয়ে পড়ি, তার জন্য বড়োরা মাঝে মাঝে সিকি, আধুলি, এমনকি রুপোর একটা টাকাও দান করতেন আমাকে। আমর লক্ষ্য ছিল ৫০ টাকা সংগ্রহ করা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৩৭ টাকা যখন জমলো, তখন আমার এই স্বাদেশিক প্রয়াসে ক্লান্ত বাড়ির সকলে বললেন, এবারে

টাকাটা যেন পাঠিয়ে দিই। জিন্নাহ্‌র ঠিকানা সবারই জানা ছিল, অতএব একদিন বড়োদের সাহায্য নিয়ে নিজ হাতে মনি অর্ডার ফরম পূরণ করে মি. এম এ জিন্নাহ্‌, মালাবার হিলস, বম্বে, এই ঠিকানায় টাকা পাঠিয়ে দেওয়া গেলো। নিচের কুপনে গুরুজনদের কেউ লিখে দিয়েছিলেন : জিন্নাহ্‌ ফান্ডের জন্যে টিফিনের পয়সা জমিয়ে সংগৃহীত এক স্কুল-বালকের চাঁদা। আমার পাঠানো টাকা পেয়ে জিন্নাহ্‌ কতোটা খুশি হবেন, এটা ছিল আমার ভাববার ও কল্পনা করবার বিষয়। শেষ পর্যন্ত একদিন মনি অর্ডারের রসিদ ফিরে এলো ফাতেমা জিন্নাহ্‌র স্বাক্ষর বহন করে। আশা ছিল, জিন্নাহ্‌ স্বহস্তে আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করবেন, সুতরাং একটু হতাশ হলাম বই কি! তবে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিলাম যে, মনি অর্ডার পিয়ন যখন তাঁর বাড়িতে গেছে, তখন হয়তো তিনি বাইরে ছিলেন। আর যাই হোক, তাঁর নিকটতম জনের হাতেই টাকাটা পড়েছে এবং তিনি নিশ্চয় জিন্নাহ্‌র কাছে আমার আত্মত্যাগের কথা সোৎসাহে জানিয়েছেন।

মোহাম্মদ মোদাব্বের আমাদের বাসায় এলে ফাতেমা জিন্নাহ্‌র স্বাক্ষরিত রসিদটা তাঁকে দেখানো হলো। তিনি *আজাদে*, বোধহয় মুকুলের মহফিলের পাতায়, কয়েক ছত্রে আমার কীর্তির কথা ছাপিয়ে দিলেন।

কিন্তু সাঁইত্রিশ টাকা আর পাকিস্তানের আবির্ভাব কতো ত্বরান্বিত করবে! স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হলো, সকলে ভিন্ন ভিন্নভাবে গান্ধির কাছে পাকিস্তান দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে একটা রাজনৈতিক অভিযান চালাবো। গান্ধির ঠিকানা আমাদের জানা ছিল না, তবে ভরসা ছিল পোস্ট অফিসের লোকেরা তা জানবে। চিঠি পাঠাবার পয়সা ছিল না, কিন্তু মনি অর্ডার কুপন বিনা টিকিটে চলে আসতে দেখেছি। অতএব, স্কুলের টিফিন পিরিয়ডে বালিগঞ্জ পোস্ট অফিসে গিয়ে মনি অর্ডার ফরম চেয়ে নিয়ে, তার কুপনে বার্তা পাঠানো হলো : 'টু মহাত্মা গান্ধি, প্লিজ অ্যাক্‌সেপ্ট পাকিস্তান'। কেউ হয়তো লিখলো : 'গান্ধি মিট্‌ জিন্নাহ্‌'। তারপরে কুপনটা ডাকবাক্সে ফেলে স্কুলে ফিরে আসা। এই অভিযান কয়েকদিন চলেছিল। পোস্ট অফিসের লোকেরা যদিও বুঝতো যে, আমরা ফরমগুলো নষ্ট করছি, তবে নিয়মের অনুগত হয়ে তারা বিনি পয়সায় ফরম্‌ আমাদের দিতো—কেবল মাথাপ্রতি একটার বেশি দেওয়া বন্ধ করেছিল।

আমার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বের শেষ পালাটা আসে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেমে যাওয়ার পরে, ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে, দিল্লিতে লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের তিনজন বড়ো অফিসারের বিচার শুরু হয় রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে। এঁরা ছিলেন শাহনেওয়াজ খান, জি এস ধীলন ও পি কে সেহ্‌গল—একজন মুসলমান, একজন শিখ ও একজন হিন্দু। এঁদের মুক্তির দাবিতে বেশ আন্দোলন দেখা দেয়, প্রধানত কংগ্রেসের নেতৃত্বে। বিচারে বোধহয় তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাঁদেরকে ক্ষমা করে মুক্তি দেন। এই ঘটনার জের শেষ হতে না হতে শুরু হয় ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজেরই ক্যাপ্টেন রশীদ আলীর বিচার। এবারে মুসলিম লীগ এসে যোগ দিলো তাঁর মুক্তির আন্দোলনে। ১৯৪৬এর ফেব্রুয়ারিতে ব্রিটিশ সরকারকে সচকিত করে হিন্দু-মুসলমান ও অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ মিলিতভাবে আন্দোলন গড়ে তোলে।

রশীদ আলীর মুক্তির দাবিতে আমাদের স্কুলে ধর্মঘট হলো—ধর্মঘট কী, তা আগে জানতাম না। স্কুলের বাইরে থেকে কিছু রাজনৈতিক কর্মী এসে জড়ো হলেন গেটে, আমাদের সিনিয়র ছাত্রেরা বললেন, ক্লাস ছেড়ে রাস্তায় নেমে দাঁড়াতে। হেড মাস্টার আবদুস সাত্তার দোতলায় সিঁড়ির ওপরে বেত হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন—আমাদের ক্লাস ছেড়ে চলে যাওয়ায় তিনি বাধা দিলেন না, কিন্তু কোনো বিশৃঙ্খলা বা হইচই তিনি সহ্য করবেন না। আমরা রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম মিছিল করে, তারপর রওনা হলাম ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দিকে। মিছিলে এই প্রথম আমার যোগদান। যেতে যেতে আরো ছোটোবড়ো মিছিল এসে সবটাকে বিশাল করে তুললো।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ইতস্তত ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা শুনছি, এমন সময়ে ঘোষণা করা হলো, মিছিলকারীদের সঙ্গে পুলিশের অল্পস্বল্প সংঘাত ঘটেছে এখানে-সেখানে, কিন্তু ডালহাউসি স্কোয়ারে পুলিশের গুলিচালনায় কেউ কেউ নিহত হয়েছে। এর প্রতিবাদে যারা ধর্মঘটে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে, তাদের মধ্যে ছিল কলকাতা ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়ন। এখন শেষ ট্রামগুলো চলছে, এরপর তাদের চলা বন্ধ হয়ে যাবে।

কী করে বাড়ি ফিরবো, এই দুশ্চিন্তা এলো মনে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই সভা ছেড়ে নিকটতম ট্রাম স্টপে গিয়ে দাঁড়ালাম। পকেটে ছিল টিফিনের পয়সা, ওতেই ভাড়াটা কুলিয়ে যাবে। ট্রাম এলো, উঠলাম। কন্‌ডাক্টর এলো, ভাড়া বের করলাম। আমার হাতে বইখাতা দেখে কন্‌ডাক্টর জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি সভা থেকে আসছো? 'হ্যাঁ'—বলতেই সে জানালো, 'ভাড়া লাগবে না।'

এই সম্মান মাথায় নিয়ে ট্রাম থেকে নেমে বাড়ির দিকে চললাম। দূর থেকে দেখলাম, আব্বা বাড়ির সামনে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। কাছে যেতেই গণ্ডদেশে চপেটাঘাত। পরে শুনলাম, স্কুল থেকে আমি কোথায় গেছি খোঁজ করায় আমার বন্ধু সালেম জানিয়েছিল যে, ধর্মঘট তাদের স্কুলেও হয়েছিল, কিন্তু মিছিলে না গিয়ে সে বাড়ি ফিরে এসেছে; আমি যখন ঘরে ফিরি নি, তখন নিশ্চয় মিছিলে গেছি। হাতের কাছে লক্ষ্মীছেলের এই দৃষ্টান্ত পেয়ে আব্বার চপেটাঘাত একটু জোরেই হয়েছিল।

১৪.

কলকাতায় আমাদের সামাজিক জীবন ছিল অনেক পরিমাণে সীমাবদ্ধ। তার একটা কারণ আব্বার স্বভাব। যদিও তিনি ব্যস্ত থাকতেন তাঁর প্র্যাকটিস নিয়ে, তবু যাওয়া-আসা না করার সেটাই একমাত্র কারণ ছিল না। কোথাও যেতে হলে, মনে হয়, তাঁকে শিকড়সুদ্ধ টেনে নিতে হতো। আমাদের গ্রাম ছিল কলকাতা থেকে মাইল চল্লিশেক দূরে। সেখানে দাদি থাকতেন, সংসারী সেজো চাচা এবং চিরকুমার ছোটো চাচা তাঁর সঙ্গে। কিন্তু আব্বাকে কখনোই মোহাম্মদপুরে যেতে কিংবা যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করতে দেখি নি। ষাটোর্ধ্ব বয়সে দাদিই প্রতি বছর আসতেন আমাদের বাড়িতে, একবার তো বটেই, কখনো কখনো দুবার। চাচাদের কাউকে নিয়ে আসতেন, অথবা দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয়কে। একা চলার মতো স্বাবলম্বী তিনি ছিলেন,

তবে একা আসতেন বলে মনে পড়ে না। দাদি প্রতিবারই হরলিক্‌সের বয়েমে করে ঘি আনতেন আমার জন্যে। নিজের হাতে গরু দুইয়ে, সে গরুর দুধ জ্বাল দিয়ে মাখন করে, ঘি বানাতেন। গাড়ি থেকে নেমে ঘরে ঢুকে আমার হাতে দিতেন। কোনো কারণে আমি বাসায় না থাকলে রেখে দিতেন, আমি ফিরে এলে তুলে দিতেন আমার হাতে। তিনি খুব বেশিদিন থাকতেন না। যাওয়ার সময়ে আমাকে কাছে ডেকে বেশ জোরে জোরেই বলতেন, 'আমি মরে গেলে কবর দিতে যেয়ো, ভাই।'

সেজো চাচা প্রায়ই আসতেন। কোনো উপলক্ষ থাকলে তো অবশ্যই, মাঝে মাঝে বেড়াতেও; তবে টাকার প্রয়োজন হলে দাদার বইয়ের প্রকাশকের কাছ থেকে কিছু আদায় করা যায় কিনা, তার সন্ধানেই আসতেন বেশি। আব্বাকে তিনি অত্যন্ত সমীহ করতেন; শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করার যে-ছবি পাওয়া যায়, সেটা চাক্ষুষ করেছিলাম তাঁর আচরণে। আব্বার সঙ্গে সামান্যই কথাবার্তা হতো তাঁর—প্রধানত কুশল-বিনিময়ই—তখনো তিনি মাথা নিচু করে কথা বলতেন। তিনি স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন আমার মায়ের সঙ্গে কথা বলতে। অপ্রয়োজনের কথা ফুরোলে প্রয়োজনের কথা তাকে বলতে দ্বিধা করতেন না একটুকুও। চাচার হয়ে মা আরজি পেশ করতো আব্বার কাছে। আব্বা, মনে হয়, একটু বিরক্ত হতেন। তবে বিরক্তিভাব চেপে রেখে তাঁর নামাঙ্কিত কাগজে খসখস করে চিঠি লিখে দিতেন মায়ের হাতে, বলতেন, 'মখদুমী লাইব্রেরিতে যেতে বলো।' কখনো বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে এলেও চাচা কথাটা জানাতেন মাকেই, মা-ই বিকল্প ব্যবস্থা করতো। বড়োবুর বিয়ের সময়ে চাচা কী করেছিলেন, মনে পড়ে না। তবে মেজোবু ও ছোটোবুর বিয়েতে না-বলতেই তিনি দেখাশোনা করেছিলেন রান্নাবান্নার। বাড়ির সবাই যখন নিদ্রায় আচ্ছন্ন, তখন চেয়ারে বসে বাবুর্চিদের তত্ত্বাবধান করে রাত কাটাতেন সেজো চাচা।

মেজো ফুফু আসতেন মেদিনীপুর থেকে। দাদি যদিও বোরখা পরতেন না কখনো, ফুফু পরতেন সর্বদা—এটা তাঁর শ্বশুরবাড়ির শিক্ষা বলে মনে হয়। আমি যখন তাঁকে দেখেছি, তখন দুই ছেলে নিয়ে তিনি বিধবা। মেজো ফুফু নেমেই আব্বার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করতেন। তার কথায় মেদিনীপুরের টান এবং ভাষায় উর্দু শব্দের বহুল মিশ্রণে আমরা খুব মজা পেতাম। আমাদের সকলের সঙ্গেই গল্প করতে তিনি ভালোবাসতেন, তবে অগ্রজের প্রতি তাঁর পক্ষপাত বেশ ধরা পড়তো। যেখানে আমরা মোহাম্মদপুরেই যাই না, সেখানে মেদিনীপুরে যাবো, এমন দুরাশা তিনি করতেন না; তবে আমরা গেলে যে তিনি খুশি হবেন, একথা জানিয়ে যেতেন। আমার দুই ফুফাতো ভাই আসতেন, তাঁদের মধ্যে যিনি বড়ো—সৈয়দ আবুল হোসেন—তাঁর প্রতি আব্বার বেশ স্নেহ প্রকাশ পেতো। আমাদের প্রতি মেজো ফুফুর আকর্ষণের একটা পরিচয় এভাবে পাওয়া যেতো যে, তাঁর ননদের কলকাতাবাসী মেয়ে-জামাই প্রায় আমাদের বাড়ি আসতেন এবং আব্বাকে সত্যিই মাতুলতুল্য জ্ঞান করতেন। ছোটো ফুফুও আসতেন মাঝে মাঝে, তবে অনেকটা কুণ্ঠিত হয়ে। ভাইবোনদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ, সে কারণে খানিকটা; তাঁর বৈষয়িক অবস্থা ভালো ছিল না, খানিকটা সে-কারণেও। গ্রামের দরিদ্র আত্মীয় শহুরে সম্পন্ন লোকের বাড়িতে বেড়াতে এলে যেমন করে, তাঁর আচরণে তেমন একটা ভাব প্রকাশ পেতো, যদিও আমরা বড়োলোক ছিলাম

না এবং আমাদের চালচলনেও নাগরিকতার কোনো উগ্র প্রকাশ ছিল না।

মায়ের প্রকৃতিটা ছিল একেবারে উলটো। সে চাইতো আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখতে। বসিরহাটে যে যাওয়া তার পক্ষে দুরূহ এ কথা বুঝতে তার বেগ পেতে হতো না। তার মামাতো-চাচাতো ভাইরা কেউ সেখান থেকে এলে সে খুব খুশি হতো। সেইসঙ্গে কলকাতায় আত্মীয়স্বজনের কাছে যেতে চাইতো নিয়মিত। তারই নির্বন্ধাতিশয্যে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি আমরা যেতাম মাঝে মাঝে—ঘোড়াগাড়িতে চেপে। তখন দুরকমের ঘোড়াগাড়ি চালু ছিল। একটা ছিল বাক্সের মতো, তার খড়খড়ি-দেওয়া জানলা উঠিয়ে দিলে বাইরে থেকে আর কিছুই দেখা যেতো না, যদিও খড়খড়ির মধ্যে দিয়ে বাতাস আসতে পারতো। আর নতুন ধরনের ঘোড়াগাড়িতে জানলার জায়গাটা থাকতো সম্পূর্ণ খোলা। তবে কোচোয়ানকে বললে চামড়ার পরদা ফেলে খোলা জায়গাটা ঢেকে দিতো। ইচ্ছে করলে বোধ হয় গাড়ির ছাদও খুলে দেওয়া যেতো—ভ্রমণবিলাসীরা কেউ কেউ অমনভাবেই যেতেন। এই গাড়িকেই বলা হতো ফিটন। বাক্সমার্কা ঘোড়াগাড়িকেই কি হ্যাকনি ক্যারেজ বলা হতো ইংরেজিতে? উত্তরকালে যখন লন্ডনের পূর্বাঞ্চলে হ্যাকনি নামে জায়গাটার সঙ্গে পরিচিত হই, তখন এই নামের সঙ্গে ওই ঘোড়াগাড়ির কোনো সম্পর্ক আছে কি না, সেই প্রশ্ন মনে জাগে।

মায়ের মেজো মামা সৈয়দ মেহদী আলী থাকতেন মুসলমানপাড়া লেনে—সেখানে বেশ যাওয়া হতো। আমার মনে পড়ে, ওঁদের বাড়ির কাছাকাছি এলে ঘোড়াগাড়ির খড়খড়ি তুলে দেওয়া হতো কিংবা জানলার পরদা ফেলে দেওয়া হতো। তার কারণ ছিল। মায়ের আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে পরদার চল ছিল—মহিলারা বোরখা পরতেন। আমাদের বাড়িতে কখনো বোরখা ঢোকে নি, মেয়েরা পরদানশিন ছিল না। জানলা-খোলা ঘোড়াগাড়িতে সপরিবার চলাচলে মুরুব্বিরা যদি আহত হন, সেই কুণ্ঠাবোধ থেকে তাঁদের বাড়ির কাছে এলে ঘোড়াগাড়ির জানলা বন্ধ করে দেওয়া হতো।

মায়ের বিধবা বড়ো মামির কাছেও আমরা যেতাম। মায়ের বড়ো ও মেজো মামিকে আমরা ডাকতাম বড়ো ও মেজো নানি বলে। এই দুই জা-ই ছিলেন গৌরবর্ণ। বড়োজনের রং ছিল ঈষৎ রক্তিমাভ, মোটাসোটা মানুষ, তেমন লম্বা নন। মেজো নানি ছিলেন লম্বা, হালকা-পাতলা ও পীতাভ। তাঁর মুখে সর্বদা একটা স্মিতহাসি লেগে থাকতো, বড়ো নানিকে তুলনায় গম্ভীর মনে হতো। বড়ো নানির ঘরে আমার মামা-খালা ছিলেন অনেক, মেজো নানির ছিলেন তিন সন্তান। বড়ো নানির বিপত্নীক জামাতা ডা. এ. কে. এম আবদুল ওয়াহেদ থাকতেন কালিঘাটের দিকে। যদিও তাঁর আব্বা-আম্মা খুব ধর্মপরায়ণ ছিলেন, তবু ও-বাড়ির আবহাওয়া ছিল খুব উদার। খালুর আব্বা মোহাম্মদ ওয়াসেক দিনরাত্রি লেখাপড়া নিয়ে থাকতেন বলে মনে হতো। খালুর আম্মা প্রয়োজনে আত্মীয়স্বজনদের সন্তানজন্মকালে বিনে পয়সার ধাত্রী হিসেবে সেবা করতেন এবং মরণকালে মুর্দাকে গোসল করিয়ে দিতেন।

আমরা যতটা যেতাম, তার তুলনায় আমাদের বাড়িতে আত্মীয়েরা আসতেন বেশি। মায়ের এক দূর সম্পর্কের ভাই আজিজুর রহমানের ছিল ঘড়ির দোকান। সেই সূত্রে তাঁকে অন্যেরা ঘড়িবাবু এবং আমরা ঘড়িমামু বলে ডাকতাম, তাঁর স্ত্রীও পরিচিত ছিলেন

ঘড়িমামানি বলে। ইনিও আনন্দে-বেদনায় সেবা দিতেন, তবে সবটা বিনা পারিশ্রমিকে কিনা বলতে পারি না। তিনি বোরখা পরতেন, তবে কঠোর পরদার মধ্যে থাকতেন না।

আমার জীবনসংগ্রামী মামানিও বোরখা পরতেন অনেককাল পর্যন্ত। আমাদের বাসায় নেমে তাঁর প্রথম কাজই হতো সযত্নে বোরখা খুলে রাখা, আর যাওয়ার সময়ে আবার সেটা পরে নেওয়া। মামানি যে চাকরি করতেন, সেটা বোধহয় মায়ের অতটা পছন্দ ছিল না। তবে এ-বিষয়ে আব্বা উৎসাহিত করতেন মামানিকে। মনে হতো, ভাবির প্রতি মায়ের মায়ার থেকে শালাজের প্রতি আব্বার প্রসন্নতা অধিক ছিল।

১৫.

মা যেমন বাড়ি বেড়াতে চাইতো, তেমনি সিনেমা-থিয়েটারেও তার আসক্তি ছিল। সে যেহেতু খবরের কাগজ পড়তো খুব খুঁটিয়ে, তাই কোথায় কোন ফিল্ম বা নাটক হচ্ছে এবং সেসব সিনেমা-নাটক সম্পর্কে সমালোচকদের রায়ই-বা কী, তা তার গোচরীভূত ছিল। তার ইচ্ছার সঙ্গে আমার বোনদের ইচ্ছা যখন যুক্ত হতো, তখন আব্বা মুশকিলে পড়তেন।

এই মুশকিল প্রায়শই যিনি আসান করতেন, তাঁর নাম সিরাজুল হক—এঁর পুত্র জাহেদুল হক দীর্ঘকাল ধরে বেইজিং বেতারে বাংলা অনুষ্ঠানের সংগঠক। সিরাজুল হক ছিলেন ইনকাম ট্যাক্স অফিসার। সিনেমা-থিয়েটারের পাশ তিনি প্রচুর পেতেন এবং পেলেই আমাদের সকলকে নিয়ে যেতে চাইতেন। সবসময়ে যে তাঁর ইচ্ছাপূরণ হতো, তা নয়, তবে তাঁর উপরোধ আব্বা প্রায়ই রক্ষা করতেন। কখনো কখনো টিকিট করেও আমাদের সিনেমা-থিয়েটারে নিতে বাধ্য হতেন আব্বা।

নাটকের মধ্যে *আলীবাবা, ধাত্রীপান্না, দুই পুরুষ, চন্দ্রগুপ্ত* ও *সিরাজউদ্দৌলা* দেখার কথা মনে পড়ে। *ধাত্রীপান্না* ও *দুই পুরুষে* ছবি বিশ্বাস ছিলেন কেন্দ্রীয় ভূমিকায়। এক রাতে আমরা নির্মলেন্দু লাহিড়ীর *সিরাজউদ্দৌলা* দেখতে গিয়েছিলাম। হলে পৌঁছে জানা গেল, সেই রজনীতে নির্মলেন্দু লাহিড়ী অভিনয় করতে পারছেন না, তাঁর বদলে নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন ছবি বিশ্বাস। আমরা ইচ্ছা করলে নাটক দেখতে পারি, নয়তো টিকিটের দাম ফেরত নিতে পারি। আমাদের অধিকাংশই একটু হতাশ হলো বটে, তবে তারা এই অকাট্য যুক্তি উপস্থিত করলো যে, নাটক না দেখলে টিকিটের পয়সা ফেরত পাওয়া যাবে বটে, কিন্তু গাড়িভাড়া তো ফেরত পাওয়া যাবে না। আমার মনে হয়, *চন্দ্রগুপ্ত* নিয়েও এমন একটি ব্যাপার ঘটেছিল। শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় দেখার সুযোগ যে কখনো পাই নি, তা আমার একান্ত দুর্ভাগ্য। ছবি বিশ্বাস ছাড়া মঞ্চে যাঁদের অভিনয় দেখেছি, তাঁদের মধ্যে অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, চন্দ্রাবতী, প্রভা দেবী ও সুনন্দা দেবীর নাম মনে পড়ে।

বাংলা সিনেমায় তখন নিউ থিয়েটার্সের জয়জয়কার, হিন্দি ছায়াছবির জগতে বম্বে টকিজের। এঁদের তৈরি সিনেমা সবাই দেখতে চাইতো। নিউ থিয়েটার্সের *মুক্তি* দেখেছিলাম। প্রমথেশ বড়ুয়া-কানন দেবী-যমুনা, এই ত্রয়ী অভিনীত ছায়াছবি

দর্শকদের খুব টানতো। তেমন ছবির মধ্যে দেখেছিলাম *শেষ উত্তর*। *দুই পুরুষের* চলচ্চিত্র-ভাষ্য দেখেছিলাম তার নাট্যরূপ দেখার আগে এবং পরবর্তীকালে আমাদের কোনো পাঠ্য বইতে এ রচনা থেকে গৃহীত 'নুটু মোক্তারের বক্তৃতা' পড়ে সিনেমা-নাটকে ছবি বিশ্বাসের মুখে উচ্চারিত বাক্যগুলির কথা স্মরণ করে বক্তৃতাটি অধিকতর উপভোগ করেছিলাম। সেযুগের বিখ্যাত চলচ্চিত্র *উদয়ের পথে* আমরা দেখেছিলাম ছবি মুক্তি পাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। হিন্দি ছবিও বেশ দেখা হয়েছিল। তার মধ্যে অশোককুমার-অভিনীত *কিসমত* এবং অসিতবরণ-সুমিত্রা দেবী-অভিনীত *ওয়াসিয়তনামা* (বঙ্কিমচন্দ্রের *কৃষ্ণকান্তের উইলের* হিন্দি ভাষ্য) উল্লেখযোগ্য। অশোককুমারের ছবির আকর্ষণ ছিল দুর্বার। তাঁর আগে তেমনি আকর্ষণীয় ছিল কুন্দনলাল সায়গলের ছবি। সায়গলের কী ছবি তখন দেখেছিলাম, তা এখন বলতে পারবো না, তবে তাঁর *জীবনমরণ* দেখেছিলাম পরবর্তীকালে।

সিরাজুল হক নিয়ে গেলেই কেবল ইংরেজি ফিল্ম দেখা হতো। *বাফেলো বিল* দেখতে গিয়ে আমি প্রায় সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলাম ভয়ে। গুরুজনেরা যখন আমার অবস্থা টের পেলেন, তখন বক্স থেকে বেরিয়ে মুখে পানির ঝাপটা দিয়ে আমাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনা হলো এবং ছবি অসমাপ্ত রেখে বাড়ি ফিরে আসা হলো। আমার ওইদিনকার কাণ্ড সিনেমা-থিয়েটারে যেতে আব্বার নিরুৎসাহ আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। তবে *টারজান* দেখেছি একাধিক এবং উপভোগ করেছি। পরে *কিং কং* দেখেও ভয় পাই নি, একথা লিপিবদ্ধ থাকা উচিত।

কিন্তু আমাদের উত্তেজনা চলে আসতো একেবারে দোরগোড়ায়। ফুটপাতে বাঁদরখেলা ছিল তার মধ্যে একটি, মাদারির খেল আরেকটি। ডুগডুগির বাদ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রশিক্ষিত বাঁদরের নাচ এবং দর্শকবৃন্দের উপহৃত কলা প্রভৃতি তাৎক্ষণিক খেয়ে ফেলার দৃশ্য হয়তো অনেকেই দেখেছেন। মাদারির খেলটা ছিল শারীরিক ভারসাম্য এবং হাতসাফাইয়ের যুগপৎ প্রদর্শনী। প্রথমে ফুটপাতেই দুপ্রান্তে দুটি করে বাঁশ কোনাকুনি করে বসিয়ে দড়ি দিয়ে প্রান্তদুটি যুক্ত করা হতো। তারপর কোনো বালক বা বালিকা তার ওপর দিয়ে হেঁটে যেতো—সার্কাসে যেমন ট্র্যাপিজ হয়, তারই অনুরূপ। খেলোয়াড়টি যে মাঝে মাঝে পড়ো-পড়ো হয়ে যেতো, সেটা আমাদের কাছে উদ্‌বেগের বিষয় হলেও অনেকে বলতেন যে তা অভিনয়মাত্র। এ গেলো কসরত। অন্যদিকে দলের সর্দার মুখে একটা মার্বেল ঢুকিয়ে বের করে আনতেন লোহার এক বড়ো গোলা। সেটা মুখে দেবার পরে বেরিয়ে আসতো আরো বড়ো গোলা। এভাবে ক্রমান্বয়ে চলতো। কখনো সে নিজের কাছে কোনো জিনিস রেখে কোনো দর্শকের কাছ থেকে তা আবার বের করে আনতো।

জিপসিরা আসতো দল বেঁধে—রঙে ঝলমল আকর্ষণীয় পোশাক এবং নানারকম কাচ, পুঁতি ও পাথরের অলঙ্কার পরে। ফুটপাতের মাঝখানে বাদ্যের সঙ্গে নাচ পরিবেশন করতো তারা। তাদেরকে ঘিরে দর্শকের একটা বৃত্ত রচনা হতো এবং অনুষ্ঠানশেষে তাঁরা কিছু কিছু দান করতেন শিল্পীদের। এরা কোত্থেকে আসতো এবং কোথায় চলে যেতো, তা কেউ জানতো না। তবে তারা কেউ বাংলাভাষী ছিল না। জিপসি মেয়েদের সহজ সৌন্দর্য অনেককেই অভিভূত করতো।

আর ছিল বায়োস্কোপ। একটা বেতের স্ট্যান্ডের ওপরে টিনের গোলাকৃতি একটি বস্তু বসানো হতো। তাতে চোখ রাখার অনেকগুলো ব্যবস্থা থাকতো। পয়সা দিয়ে তবে চোখ রাখার অধিকার পাওয়া যেতো। তারপর স্বত্বাধিকারী বিচিত্র সুরে অত্যন্ত হালকা হিন্দিতে আবৃত্তি করে আমরা যা দেখছি, তার বর্ণনা দিয়ে চলতো। দিল্লির দুর্গ, আগ্রার তাজমহল, বোম্বাইয়ের বিমানবন্দর, কোথাকার জলপ্রপাত—এসব ছবি একটার পর একটা চোখের সামনে ফুটে উঠে আবার সরে যেতো। ছবিগুলো দেখা যেতো উজ্জ্বল আলোকে। তাই দেখা শেষ হবার পরেও আলোর দ্যুতিটা লেগে থাকতো চোখে, মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগতো, কখনো কি এসব জিনিস প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হবে?

মাঝে মাঝে পার্ক সার্কাস ময়দানে তাঁবু গাড়তো সার্কাসের দল। আয়োজন সম্পূর্ণ করতে তাদের লাগতো কয়েকদিন। তারপর আরো কয়েকদিন সার্কাস দেখিয়ে তাঁবু ভাঙার পালা। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাঘ-ভালুকের খেলা, ট্র্যাপিজ, মাংসপেশীর ওপর দিয়ে মোটরগাড়ি চালানো—এসবই হতো। কখনো কখনো ময়দানে বসতো চরকি ও নাগরদোলা। তার দুলুনিতে এবং ক্রমাগত ওপর-নিচ ঘোরায় মাথা ঘুরতো, ভয়-ভয় করতো, তবু অদম্য ছিল এসবের আকর্ষণ। এসব শেষ হয়ে গেলে মাঠটাকে মনে হতো শ্রীহীন—তখন লোহার সড়সড়ি প্রভৃতি ময়দানের স্থায়ী উপকরণ আর আনন্দদায়ক মনে হতো না।

মাঝে মাঝে যাওয়া হতো চিড়িয়াখানা কিংবা বোটানিক্যাল গার্ডেনে। চিড়িয়াখানা বেশ প্রিয় ছিল আব্বার। খুব ধৈর্য ধরে আমাদের তিনি নিয়ে যেতেন একটার পর একটা খাঁচার সামনে কিংবা ময়ূর-ময়ূরী যেখানে নৃত্য করছে গাছের শাখায় কিংবা ছায়ায়। উটপাখি ও তার ডিম, জেব্রা ও তার বাচ্চা, বাঘ ও সিংহ, বাঁদর ও হনুমান দেখে একটা দিন কাটানো নিতান্তই সহজ ছিল। বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়ে গাছ চেনার চেষ্টা করতাম। সে-চেষ্টা তেমন ফলপ্রসূ হয় নি। এটুকু মনে পড়ে, পশুপক্ষী হোক কিংবা গাছপালা হোক, এমনকি ওই টিনের বাক্সের বায়োস্কোপ হোক—যাই দেখতাম, তাতেই বিস্ময়ের অবধি থাকতো না। বড়ো হবার একটা বড়ো শাস্তি এই বিস্ময়বোধ হারিয়ে ফেলা।

১৬.

এই-ভালো এই-মন্দ আর্থিক অবস্থায় উদ্‌বিগ্ন আব্বা শরণাপন্ন হয়েছিলেন জ্যোতিষীদের। হাত দেখে একেকজন একেকরকম বলেন—কেউ নিরাশ করেন না—উন্নতি অবধারিত, তবে সেটা যে কোনসব নক্ষত্রের যোগে কখন ঘটবে সে-বিষয়ে মতান্তর ঘটে। কোত্থেকে এক শিখ জ্যোতিষীর আবির্ভাব ঘটে বাড়িতে—সাহেবি পোশাকে কেতাদুরস্ত ভদ্রলোক, ইংরেজির খই ফুটছে মুখে। তিনি জানান, অমন তাৎক্ষণিক ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর নির্ভর করতে নেই, সময় নিয়ে কোষ্ঠী গণনা করে তবেই দিতে হবে লিখিত মতামত। এ শুনে আব্বার বিশ্বাস বাড়ে। ইংরেজিতে নামপরিচয়-অঙ্কিত লেখার কাগজের অনেক পৃষ্ঠা জুড়ে জ্যোতিষী আমাদের পিতাপুত্রের ভবিষ্যৎ গণনা করেন। কী লিখেছিলেন, তার প্রায় কিছুই মনে নেই, তবে আমার সমুদ্রযাত্রা যে অবধারিত,

তাতে কোনো সন্দেহ রাখেন নি। আব্বা নিশ্চিত হন, পুত্র নির্ঘাৎ ব্যারিস্টার হবে।

আমাদের নিকটজনের মধ্যে মাত্র দু'জন তখন সমুদ্র পেরিয়েছিলেন। সৈয়দ মোকাররম আলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ আলী—আমাদের মাদু ভাই—ইংল্যান্ড থেকে এম আর সি ভি এস হয়ে দেশে ফিরে কলকাতায় ভেটেরিনারি কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন। আর দাদার মামা গোলাম কিবরিয়া ওস্তাদজির পৌত্র এ এফ এম মহসিনুল হক—আমাদের চাঁদু চাচা—অস্ট্রেলিয়া থেকে পিএইচ ডি করে ভারত সরকারের ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগে কর্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁরা দেশে ফেরা-মাত্রই আমরা তাঁদের দেখতে যাই। ব্যারিস্টার হয়ে আমিও কি তেমন দ্রষ্টব্য হবো?

কিন্তু সে তো পরের ব্যাপার, এখন কী করণীয়? জ্যোতিষী ব্যবস্থাপত্র দেন, প্রবাল দিয়ে সোনার আংটি বানিয়ে মাঝগঙ্গায় গিয়ে আব্বাকে তা ধারণ করতে। আব্বা সাঁতার জানতেন না, খুব ভয় পেতেন নদীকে, কিন্তু ধন্য আশা কুহকিনী, সত্যিই একদিন নৌকোয় করে গঙ্গার মধ্যিখানে গিয়ে গড়ানো আংটি পরে এলেন। নির্দেশমতো, রাতে সে-আংটি রেখে দেয়া হতো আধ কাপ দুধের মধ্যে—সকালে দেখা যেতো, প্রবাল সব দুধ শুষে নিয়ে গেছে। আমাদের তাক লেগে যেতো।

আরো তাৎক্ষণিক লাভের আশায় বাড়ি বসে ঘোড়দৌড়ের টিকিট কেনেন আব্বা। হয়তো কলকাতার ঘোড়দৌড়েরও, কিন্তু ডার্বির টিকিট যে পরপর কিনেছিলেন কিছুকাল, তা সন্দেহাতীত। লাভের মধ্যে টিকিটের দাম খোয়ানো। জ্যোতিষী, পাথর ও ঘোড়দৌড়ের টিকিটে মায়ের বোধহয় তেমন আস্থা ছিল না। সে নির্লিপ্ত হয়ে খবরের কাগজ পড়তে থাকে খুঁটিয়ে। তাতে যে আমরা কেবল সিনেমা-থিয়েটারে যাবার সুযোগ পেয়েছিলাম, তা নয়। তার পড়া সংবাদের কিছু সারসংক্ষেপ আমার কাছেও এসে পৌঁছোতো। একদিন পত্রিকায় সরকারি কর্মখালির এক বিজ্ঞাপন পড়ে তার মনে হলো, বড়োদুলাভাই অনায়াসে ওই কাজের একজন প্রার্থী হতে পারেন। বিকেলে দুলাভাই অফিস থেকে ফিরলে মা তাঁকে বিজ্ঞাপনটা দেখালো। প্রার্থিত যোগ্যতা যে তাঁর আছে, দুলাভাই সে-বিষয়ে একমত হলেন, তবে তখনকার বাজারে কাজের জন্যে যে-প্রতিযোগিতা, তাতে টিকে থাকবেন কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল তাঁর। মা-ই মনে করিয়ে দিলো যে, সরকারের ওই বিভাগের একজন কর্তাব্যক্তি খান বাহাদুর মাহবুবউদ্দীন আহমদ আব্বার খুব বন্ধু মানুষ। দুলাভাইয়ের কাছ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পেয়ে মা এবারে আব্বাকে বিজ্ঞাপনটা দেখালো এবং মাহবুবউদ্দীন আহমদকে এ-বিষয়ে বলতে অনুরোধ করলো। আরো অনেক বিষয়ের মতো এক্ষেত্রেও আব্বা নিস্পৃহ ছিলেন. কিন্তু মায়ের চাপাচাপি উপেক্ষা করতে পারেন নি। পরিণামে বড়োদুলাভাই এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের হেড ক্লার্ক নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং অবসরগ্রহণের আগে ওই বিভাগের শীর্ষপদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন।

১৭.

মেজোবুর বিয়ে হয়ে গেল ১৯৪৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারিতে। পাত্র সৈয়দ আলী হোসেন কাজ করেন খুলনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে, তবে সেই শহরের অদূরে পৈতৃক আবাসস্থল বয়রা গ্রামে তাঁদের প্রচুর বিষয়সম্পত্তি আছে। আমার এক দূর সম্পর্কিত ফুফুর সঙ্গে তাঁর অনতিদূর সম্পর্কিত ভ্রাতুষ্পুত্রের বিয়ে হয়েছিল—তাঁদের সূত্রে মেজোবুর বিয়েটা স্থির হয়। বেগম ফুফু সেকালের গ্রাজুয়েট, মোকাম্মেল ফুফা পরে বি সি এস ক্যাডারে যোগ দিয়েছিলেন; তাঁদের বিয়েটা হয়েছিল নিজেদের পছন্দ-অনুযায়ী। তাতে আমাদের আত্মীয়স্বজনের অনেকের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়েছিল—এ বিয়েকে কেউ কেউ বিবেচনা করেছিলেন নারীর উচ্চশিক্ষার কুফলের সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত হিসেবে। বেগম ফুফু ও মোকাম্মেল ফুফার পুত্র তানভীর মোকাম্মেল এখন স্বল্পদৈর্ঘ্যের সুযোগ্য চলচ্চিত্র-নির্মাতা এবং চলচ্চিত্র-আন্দোলনের একজন প্রধান হিসেবে সুপরিচিত।

বিয়ের কথাবার্তা স্থির হয়ে যাওয়ার পরে মেজোবু অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লো এবং অচিরেই ধরা পড়লো, রোগটা ডিফথেরিয়া। তাকে ভর্তি করা হলো বেশ খানিকটা দূরে সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে। একে ব্যাধিমাত্রই বিষাদের ব্যাপার, তার ওপর আসন্ন বিয়ের আনন্দ ম্লান হবার মতো অবস্থা। অন্যদের সঙ্গে আমিও প্রায় তাকে দেখতে যেতাম হাসপাতালে। তার পাশের শয্যায় ছিল একই রোগে আক্রান্ত এক নাবালিকা। বাপ-মা তাকে যখন হাসপাতালে ছেড়ে আসছেন (রোগীর কাছে কারো থাকার নিয়ম ছিল না), তখন স্বাভাবিকভাবেই সে খুব কান্না জুড়ে দিলো। মেজোবু দেখিয়ে তার বাপ-মা বললেন, 'তুমি এই মাসির কাছে থাকবে।' মেয়েটি কান্না থামিয়ে নতুন মাসিকে গ্রহণ করে নিলো সানন্দে। যেদিন হাসপাতাল থেকে মেজোবুকে ছাড়া পায়, সেদিন ওই মেয়েটির সে কী কান্না! 'ও মাসি, যাস নে, ও মাসি, যাস নে', বলে সে এমন চিৎকার জুড়ে দিলো যে, আমরা সকলেই খুব বিব্রত ও বিপন্ন বোধ করলাম। ফেরার পথে ঘোড়াগাড়িতে মেজোবু সর্বক্ষণ কাঁদতে থাকলো, বাড়ি এসেও তার কান্না থামে না। মুরুব্বিরা একবার বললেন, মেয়েটিকে দেখতে নিয়ে যাবেন মেজোবুকে, কিন্তু তাকে দেখে মেয়েটির উদ্‌বেগ ও ব্যাকুলতা আবার বেড়ে যেতে পারে বলে সে-সংকল্প ত্যাগ করা হলো।

মেজোবুর বিয়ের কার্ডটা ছিল একাধিক কারণে মনে রাখার মতো। সাদা কার্ডের চারপাশটা একটু ঢেউ খেলানো, তার ওপর নিচের দিক থেকে হালকা রং ওপরের সীমায় এসে গাঢ় হয়ে গেছে। কিছু কার্ড ছিল গোলাপি রঙের, কিছু সবুজ। কার্ডের ভাষা ছিল ইংরেজি। যথারীতি নিবেদনের পরে ছোট হরফে একটা লাইনে যা লেখা হয়েছিল, তার বঙ্গানুবাদ হলো : 'অনুগ্রহ করে অগ্রিম আপনার রেশন পাঠিয়ে দিন।' ওরকম একটা সরল ইংরেজি বাক্যের মর্মগ্রহণ করার মতো বিদ্যা তখন আমার হয়েছে। সুতরাং এমন অভদ্ররকম অনুরোধের কারণ জিজ্ঞাসা করলাম এবং উত্তরে জানলাম যে, যুদ্ধাবস্থায় অতিথি-নিয়ন্ত্রণ-বিধি ফাঁকি দেওয়ার জন্যে এমন লেখা; ভাবটা এই যে, যার যার একবেলার খোরাক সে সে পাঠিয়ে দিয়েছে, রান্নাটাই শুধু একসঙ্গে হচ্ছে। সরকারকে এতো সহজে ফাঁকি দেওয়া যায় জেনে, বলা বাহুল্য, বিস্ময় বোধ করলাম এবং সকলে যে, নির্দ্বিধায় এমন ফাঁকি দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছে,

তাতে কোনো গ্লানিবোধ করছে না, এও ছিল আরেক বিস্ময়! অথচ মিথ্যাচার যে কত খারাপ, সে-শিক্ষা ঘরে-বাইরে সর্বত্র আমাদের দেওয়া হয়েছিল।

বিয়ের আসরে জাদুবিদ্যায় মেজোদুলাভাইয়ের নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়ে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। তিনি যে আংটিটা পরে এসেছিলেন, সেটারই খেলা দেখালেন। আমি দিব্যি দেখলাম, আংটির উপরিভাগে তাঁর নাম লেখা আছে। তিনি হাতটা পিঠের দিকে নিয়ে কী করেন, তখন দেখা যায় তাঁর নামের জায়গায় সূর্যোদয়ের ছবি। আমি মোহিত হয়ে গেলাম। পরে জানা গেল, আংটির ওই উপরিভাগের একদিকে তাঁর নাম এবং অন্যদিকে সূর্যোদয় অঙ্কিত আছে এবং আংটির এই অংশ ঘোরানো যায়। তার আগে আমি এমন মনোহর আংটি দেখি নি।

শ্বশুরবাড়ি থেকে মেজোবুকে এবং মেজোদুলাভাইকে ফিরিয়ে আনতে আমরা কজন কলকাতা থেকে খুলনায় গেলাম ট্রেনে চড়ে, তারপর 'প্রেম-কানন'—অতি সুদৃশ্য বাগান—পর্যন্ত রিকশায়, তারপর অপ্রশস্ত জঙ্গলাকীর্ণ পথ ধরে খানিকটা হেঁটে। তাঁদের পাকা বাড়ি, কিন্তু বৈদ্যুতিক বাতি নেই, কলের পানি নেই এবং স্যানিটারি টয়লেট নেই। এসবের অভাবে মেজোবু যে বেশ পীড়িত বোধ করছে, তা স্পষ্ট বোঝা গেল। পাউরুটি-মাখনের জন্যে তার ব্যগ্রতাও গোপন রইলো না। মেজোবুর এই 'শহুরেপনা' যে তার শ্বশুরবাড়িতে কিছুটা রঙ্গব্যঙ্গের খোরাক জুগিয়েছিল, তাও অগোচর রইলো না।

মেজোদুলাভায়ের যমজ বোন আত্মীয়তার সুবাদে আমাকে নিয়ে নানারকম রহস্য করতে থাকলেন। এ-ধরনের অভিজ্ঞতা আমার আগে কখনো হয় নি। এক-আধবার কেঁদেও ফেলেছি তাঁর আচরণে এবং অন্যদের ঠাট্টায়। তবে দুলাভাইয়ের ছোটো ভাই আকরাম—আমার চেয়ে অনেক বড়ো—কখনো আমাকে এমন বিপদে ফেলেন নি।

মেজোদুলাভাই আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন হাতে লাঠি নিয়ে। অল্প পরে আবিষ্কার করি, ওটা লাঠি নয়, গুপ্তি, অর্থাৎ লাঠির মধ্যে লুকোনো তরবারি। আগে মনে প্রশ্ন জেগেছিল, এই তরুণ বয়সে ওঁর হাতে লাঠি কেন; এখন প্রশ্ন জাগলো, গুপ্তির প্রয়োজন কেন? জানা গেল, ওঁর আব্বা খুন হয়ে গিয়েছিলেন। মেজোদুলাভাই যখন বি এ পরীক্ষার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন একটা থালায় তাঁর পিতার ছিন্নমস্তক বাড়িতে পৌঁছে দেয় কেউ। সে-দৃশ্য দেখে দুলাভাই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর আর পরীক্ষা দেওয়া হয় নি। তখনো তাঁদের বাড়িতে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, তাঁর পিতৃহন্তারা পরিবারের বড়ো ছেলে হিসেবে তাঁরও ক্ষতিসাধন করতে পারে, তাই সঙ্গে গুপ্তি রাখা ছিল তাঁর পক্ষে অত্যাবশ্যক। এমন বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কেউ চলতে পারে এবং আক্রান্ত হলে দ্রুত গুপ্তি বের করে প্রত্যাঘাত করতে পারে, এমন ভাবনা আমার ঘুম নষ্ট করেছিল।

১৮.

মেজোবুর বিয়ে হয়ে যাওয়ায় আমার প্রধানতম অভিভাবক আমার কাছ থেকে দূরে চলে গেল। সংসারে ছোটোবুর গুরুত্ব ও কর্তৃত্ব কিছুটা বৃদ্ধি পেলো বটে, তবে

কিছুটাই। পড়াশোনার চেয়ে তার নিজেরই মনোযোগ ছিল পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয়ে, সুতরাং আমার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করা তার হয়ে ওঠে নি।

পাড়ার মেয়েরা নাটক করবে, তাতে অংশ নেওয়ার অনুমতি কী করে যেন সে আব্বা-মায়ের কাছ থেকে আদায় করলো। এই নাট্যাভিনয়ের উদ্‌যোগ এসেছিল খান সাহেব সদরুল ওলার বাড়ির মেয়েদের কাছ থেকে। তাঁর মেয়েদের মধ্যে নাহার আপার (পরবর্তীকালে রোকেয়া হলের প্রোভোস্ট নুরুননাহার ফয়জননেসা) সঙ্গে ছোটোবুর বেশ সৌহার্দ্য ছিল। তিনিই নাটকে অভিনয়ের জন্যে ছোটোবুকে টেনে নিয়েছিলেন। দেখা গেল, একটি নয়, তাঁরা দুটি নাটিকা মঞ্চস্থ করতে চলেছেন। এক, রবীন্দ্রনাথের *মুকুট*; দুই, তুরস্কের হালিদা এদিব হানুমের জীবনী-অবলম্বনে মোহাম্মদ মোদাব্বেরের লেখা *স্মার্ণা-নন্দিনী*। *মুকুটে* ছোটোবু পেয়েছিল ইন্দ্রকুমারের ভূমিকা; বাকি দুই রাজকুমার সেজেছিলেন নাহার আপারা দুই বোন। *স্মার্ণা-নন্দিনী*তে ছোটোবুর ছিল বার্তাবহ-সৈনিকের ভূমিকা; মনে হয়, সেখানে তার কোনো সংলাপ ছিল না। নাটকের মহড়া হতো সদরুল ওলা সাহেবের বাড়ির ছাদে। আমার কাজ ছিল মহড়ার সময়ে ছোটোবুকে নিয়ে যাওয়া এবং তার সঙ্গে ফিরে আসা। নাহার আপার কাছে পরে শুনেছি, এই পরিস্থিতির সুযোগে আমি নাকি কোনো এক দীর্ঘ কবিতা—সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের—আবৃত্তি করে তাঁদের শুনিয়েছিলাম। আমার সেকথা মনে নেই।

নাটক মঞ্চস্থ হলো মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে। ছেলেরা চিরকাল মেয়েদের ভূমিকায় মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে। এবার যেন তার প্রতিশোধ নেওয়া হলো ছেলেদের ভূমিকায় মেয়েদের অংশ নেওয়ায়। কে যে তাঁদের অভিনয়ের জন্যে *মুকুট* বেছে দিয়েছিলেন, জানি না। তবে মেয়েরা নারীচরিত্রহীন একটা নাটকের অভিনয় করবেন, এও ছিল দুঃসাহসিক। *স্মার্ণা-নন্দিনী*র কেন্দ্রীয় চরিত্র অবশ্য মহিলাই, তবু সে-নাটকেও পুরুষের পোশাকে, বিশেষত সৈনিকের ইউনিফরমে, অনেককে দেখা দিতে হয়েছিল। সহ-অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল না বলেই, মনে হয়, এই নাট্যাভিনয় পাড়ার মুরুব্বিদের আনুকূল্য লাভ করেছিল। অভিনয়ের দিনে বেশির ভাগ বাড়ির নারীপুরুষেরা গিয়েছিলেন, তবে তাঁদের বসার ব্যবস্থা ছিল ভিন্ন—হলের একদিকে পুরুষ, অন্যদিকে মহিলা। সকলেই খুব উপভোগ করেছিলেন।

ফতেহ্ লোহানীর পরিচালনায় পাড়ার তরুণেরাও একই জায়গায় একটি নাটক মঞ্চস্থ করেন, সেখানেও সহ-অভিনয় ছিল না। ফজলে লোহানী নিয়েছিলেন টাকপড়া এক ভদ্রলোকের ভূমিকা। তাঁর এত সুন্দর কেশদাম কী কৌশলে তিনি লুকিয়ে ফেললেন, তা বুঝতে না পেরে আমি চমৎকৃত হয়ে গেলাম। পরে যখন জানলাম, অভিনয়ের জন্যে রবারের তৈরি টাক পাওয়া যায়, তখন মানুষের এই উদ্ভাবননৈপুণ্যে আমি দ্বিতীয়বাব চমৎকৃত হলাম।

১৯.

মনে হয়, ১৯৪৫ সালেরই এক সন্ধ্যায় মোহাম্মদপুর থেকে একজন এসে খবর দিলো, দাদির শরীর খুব খরাপ, সেজো চাচা আমাদের যেতে বলেছেন। আমাদের বাড়ির কাছে সৈয়দ আহমদ নামে এক ভদ্রলোক থাকতেন, তাঁর ছিল একটা ছোটো অস্টিন গাড়ি। আব্বা তাঁর কাছে গাড়িটি চাইলে তিনি দিতে সম্মত হলেন। পরদিন বেশ সকালে তাতে করে আব্বা, মা ও আমি যাত্রা করলাম।

গাড়ির রাস্তা ছিল বেড়াচাঁপা পর্যন্ত। এর অদূরেই চন্দ্রকেতুগড়—তার ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা আগেই বলেছি। কিংবদন্তি এই যে, এক মুসলিম ধর্মপ্রচারক চন্দ্রকেতুগড়ে এলে সেখানকার রাজা তাঁকে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করতে আহ্বান জানান। ফকির তখন নিকটবর্তী কোনো বেড়ায় চাঁপাফুল ফুটিয়ে কেরামতি দেখান। তখন রাজা ভক্তিভরে তাঁকে গ্রহণ করেন। বেড়াচাঁপা যেতে যেতে আব্বার কাছে এরকমই শুনেছিলাম। যাহোক, গাড়ির রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে দেখা গেল, গরুর গাড়ি নিয়ে আমাদের জন্যে কেউ অপেক্ষা করছে। তার মুখে জানা গেল, দাদি আর নেই। এমন একটা আশঙ্কা আমাদের ছিল। গাড়ি সেখানে আমাদের নামিয়ে কলকাতা ফিরে গেল, আমরা গরুর গাড়িতে সওয়ার হলাম।

গরুগাড়িতে সেই আমার প্রথম চড়া। খানিকটা মজাই পেয়েছিলাম, যদিও দাদি নেই শুনে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। গ্রামের বাড়িতে পৌঁছোতে পৌঁছোতে প্রায় বিকেল। দাদিকে কাফন পরানো হয়ে গিয়েছিল, আমাদের বাড়ির সংলগ্ন স্থানে, দাদার কবরের পাশে তাঁর কবর খোঁড়াও সম্পূর্ণ হয়েছিল, শুধু আমাদের পৌঁছোবার অপেক্ষা। জানাজা শেষ করে দাদিকে কবরে নামানো হলো। সেই যে তিনি আমাকে বলতেন, 'আমাকে কবর দিতে যেয়ো, ভাই', তাঁর সে-কথা স্মরণ করে কবরে প্রথম মাটি দিতে বলা হলো আমাকে। তারপর আব্বা, সেজো চাচা ও ছোটো চাচা পরপর মাটি দিলেন, তারপর অন্যেরা।

দাদির মৃত্যুর চতুর্থ দিনে কুলখানি পর্যন্ত আমরা মোহাম্মদপুরে ছিলাম। সেই আমার প্রথম ও শেষ যাওয়া সেখানে। আশেপাশে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো—আমবাগান থেকে জঙ্গলে, গোয়ালঘর থেকে পুকুরপাড় পর্যন্ত—তাছাড়া কিছু করার ছিল না। গরুগাড়িতে করে একদিন হায়দারপুরে গিয়েছিলাম হায়দারপুরের দাদার সঙ্গে দেখা হলো—তখন তাঁর বেশ বয়স হয়েছে। শুনলাম, তিতুমীরের অল্প কয়েকজন অনুসারী নিয়ে তিনি পৃথক মসজিদে নামাজ পড়েন।

মাটির ঘরে থাকার অভিজ্ঞতাও আমার সেই প্রথম। আরো একটি অভিজ্ঞতা হয়েছিল। দাদির মৃত্যু-উপলক্ষে বসিরহাট থেকে আমার মেজো চাচি এসেছিলেন মেয়ে নীরু ও ছেলে আমিনকে নিয়ে। বয়সে আমার চেয়ে ছোটো হলেও আমিন অনায়াসে গাছে চড়তে পারতো, উৎপাত করার ক্ষেত্রেও বেশ অগ্রণী ছিল। কী একটা কারণে আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে সে নিজের স্যান্ডেল খুলে নিয়ে আমার মুখে আঘাত করেছিল। স্যান্ডেলটা একটু পুরোনো হওয়ায় তার নিচে টিনের পাত খানিকটা বেরিয়ে গিয়েছিল। তার আঘাতে আমার গাল কেটে গেল। আমি কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরলাম। মার খাওয়ার অভ্যাস আমার ছিল না, সুতরাং আঘাতের তুলনায় কান্নাটা বেশি হয়েছিল। চাচি অপরাধীকে

খুঁজতে লাগলেন শাস্তি দেবেন বলে। সে তখন একটা গাছের উঁচু ডালে নিজের আসন পাকাপাকি করে নিয়েছে। সন্ধে হয়-হয়, তখনো তার নামার লক্ষণ নেই। কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না, এমন প্রতিশ্রুতি না দেওয়া পর্যন্ত সে গাছ থেকে নামবে না। তার দাবিই পূরণ করা হলো, তবে শর্তটা খানিক লঙ্ঘনও করা হয়েছিল।

মোহাম্মদপুর থেকে আমরা কলকাতায় যথাসময়ে ফিরে এলাম। গ্রাম আমার ভালো লাগে নি, তার সঙ্গে কোনো আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করি নি, তার প্রতি কোনো আকর্ষণ আমার জাগে নি। তার জন্য গ্রামের হতশ্রী যতটা দায়ি, তার চেয়ে বেশি দায়ি যেভাবে আমি মানুষ হয়েছিলাম, তার ধরনটা।

২০.

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টে মুসলিম লীগ সারা দেশে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস আহ্বান করলো।

মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্তটা নিয়েছিল সপ্তাহ চারেক আগে। ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা সম্পর্কে কংগ্রেসের মনোভাবের যে-অভিব্যক্তি ঘটেছিল এবং কংগ্রেসের আরোপিত শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে সে-পরিকল্পনা ব্রিটিশ সরকার যেভাবে বাতিল করে দেয়, তার ফলে—লীগ নেতাদের বক্তব্য-অনুযায়ী—পাকিস্তান দাবি করা ছাড়া তাঁদের অন্য উপায় ছিল না। এই দাবি জানাতে, অন্য কথায়, পাকিস্তানের জন্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করতে ওই দিনটি পালন করার কথা। এসব কথা অবশ্য পরে জেনেছিলাম। আরো শুনেছিলাম, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কার বিরুদ্ধে, এ-প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলিম লীগের উপনেতা খাজা নাজিমউদ্দীন বলেছিলেন, কংগ্রেস ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে, আর বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম বলেছিলেন, ব্রিটিশ সরকার ও তাদের শাসনের বিরুদ্ধে। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস সফল করতে বঙ্গ প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ১৬ আগস্ট সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। পরে অনেকেই বলেছিলেন, এটা ছিল তাঁর বড়ো ভুল।

দুপুর তিনটের দিকে কলকাতার গড়ের মাঠে বা ময়দানে মুসলিম লীগের সভা ছিল। আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়াগাড়িতে চেপে আব্বা সভাস্থলে গিয়েছিলেন বক্তৃতা শুনতে। যাবার পথে ছোটো-বড়ো অনেক মিছিল পার হলাম। মিছিলের শরিকদের হাতে মুসলিম লীগের পতাকা, মুখে 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' ধ্বনি এবং হাবভাব খুব জঙ্গি। সভায় জনসমাগম হয়েছিল যথেষ্ট। আমরা ঘোড়াগাড়িতে বসেই বক্তৃতা শুনছিলাম। কেউ উর্দুতে, কেউ বাংলায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। কী বলছিলেন, তা অবশ্য আমার বোধগম্য ছিল না।

আমরা বক্তৃতা শুনছিলাম, এমন সময়ে দু-একজন অপরিচিত ব্যক্তি ঘোড়াগাড়ির কাছে এসে জানালো, শহরে গোলমাল শুরু হয়েছে। তদ্দণ্ডেই আমরা গাড়ি ঘুরিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। পথে কিছু দেখেছি বলে মনে পড়ে না, তবে পাড়ায় ছোটো

ছোটো জটলা দেখা গেল। সন্ধে হতে না হতে খবর পাওয়া গেল, সারা কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছে। এটা যে গুজব নয়, যেন তা প্রমাণ করতেই পাড়ায় হিন্দুদের দোকানপাট লুঠ হতে শুরু হয়ে গেল।

আমাদের বাড়ির পেছন দিকটায় থাকতেন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য সাতক্ষীরার আবুল কাসেম—তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আবুল হাশিমের কাছে পরাজিত হন। তাঁর তিন ছেলে—আসেম, হাশেম ও সালেম। কনিষ্ঠজন আমার বন্ধু। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্যহীনভাবে হাঁটাহাঁটি করতে বেরোলাম ১৭ তারিখ সকালে। ওদের এবং আমাদের বাড়ির মাঝামাঝি জায়গায় একটা নতুন বাড়ি উঠছিল। সেই নির্মীয়মাণ ভবনের দোতলায় উঠে দেখি আমাদের গোয়ালা এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। আমাদের দেখে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে সে হাত জোড় করে রইলো। বোঝা গেল, আগের বিকেলে দুধ দিতে এসে সে আটকে পড়ে গেছে। একটু পরে সালেম ও আমি যে-যার বাড়ি ফিরে এলাম। আমি কাউকেই ওই গোয়ালা সম্পর্কে কিছু বলি নি।

যারা আগের দিন লুঠপাট করে ক্ষান্ত ছিল, তারা পরের দিন কিছু কিছু বাড়িঘর আক্রমণ করতে শুরু করলো এবং লাঠি, লোহার রড ও ছোরা হাতে নিয়ে উন্মত্তের মতো ছুটোছুটি করতে লাগলো। একটু পর দেখি, আসেম ভাই গোয়ালাটিকে ধরে এনে গুন্ডাদের হাতে সোপর্দ করে দিলেন। ব্যাপারটা বুঝতে যতোক্ষণ সময় নিয়েছিল, তার পরপরই আব্বা এবং আমাদের বাড়ির দু পাশ থেকে কফিলউদ্দিন ও গফুর সাহেব বেরিয়ে এসে গুন্ডাদের মধ্যে গিয়ে গোয়ালাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেন। সেই ফাঁকে গোয়ালাটি সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় ভিড়ের মধ্যে থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু যাবে কোথায়, অতগুলো লোক তাকে মারবে বলে বদ্ধপরিকর। গুন্ডারা আব্বাদের ফিরিয়ে দিল। আর পলায়নপর গোয়ালার পেছন পেছন ছুটে কে যেন লোহার রড দিয়ে তার মাথায় মারলো। তারপর যার হাতে যা ছিল, তা দিয়ে মারতে মারতে এক সময়ে ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে তার মধ্যে তার সেই বিশাল রক্তাক্ত দেহ ঢুকিয়ে দিলো।

এখানে বলে রাখি, আমার আব্বা কোনো অর্থেই সাহসী পুরুষ ছিলেন না। বরঞ্চ ছিলেন ভীরু স্বভাবের। কিন্তু আমাদের গোয়ালার প্রাণরক্ষা করতে তিনি যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে গুন্ডাদের ভিড়ের মধ্যে চলে গিয়েছিলেন, সেকথা মনে হলে তাঁর প্রতি আমার সবসময়ে শ্রদ্ধা জাগে।

ওইদিন বিকেলবেলায় আমাদের মামা সৈয়দ মোকাররম আলী—আবুল কাসেম সাহেবের বিপত্নীক ভায়রা—এবং তাঁর অনুজ সৈয়দ মোয়াজ্জম আলী দাঙ্গা-উপদ্রুত এলাকা থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিলেন আমাদের বাড়িতে। প্রায় সবকিছুই তাঁরা ফেলে এসেছিলেন। পাড়ার হিন্দুরা যাঁরা নিজেদের বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন, ততক্ষণে তাদের বাড়ি লুঠ হতে শুরু করেছে। গুন্ডাদের আগ্রহ ছিল না কেবল বইপত্রে। তারা সেসব রাস্তার ওপরে ফেলে দিচ্ছিল। মোয়াজ্জম মামার আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া তখন ইন্টারমিডিয়েটের বেশি এগোয় নি, কিন্তু তিনি ছিলেন গ্রন্থকীট। বইপত্র ওইভাবে ফেলে দিচ্ছে দেখে তিনি চুপিচুপি সেদিকে অগ্রসর হলেন

এবং বাছাই-করা কিছু বই বগলদাবা করে আমাদের বাড়ির পেছনের দিক দিয়ে—রান্নাঘর হয়ে—ঢুকলেন। পড়বি তো পড় মালির ঘাড়ে! মোকা মামু খুবই গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ওগুলো কী?' অপ্রস্তুত মোয়াজ্জম মামু বললেন, 'বই। গুন্ডারা রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল কিনা—' তারপর দু ভাইয়ের সংলাপ এভাবে অগ্রসর হলো :

'ও, গুন্ডারা নেয় নি বলে তুমি লুঠ করে নিলে?'

'আহা, লুঠ করবো কেন, পথ থেকে কুড়িয়ে নিলাম।'

'অন্যের জিনিস আত্মসাৎ কবাকে কী বলে?'

'বইগুলো তো আমি বাড়ির মধ্যে থেকে আনি নি—ওগুলো তো রাস্তায় পড়ে ছিল।'

'যাও, যেখান থেকে এনেছো, সেখানে রেখে এসো।'

'বইগুলো যে নষ্ট হয়ে যাবে!'

'হোক, তুমি রেখে এসো।'

'আচ্ছা, আমি একবার পড়ে নিই, তারপর রেখে আসবো 'খন।'

'না, এক্ষুণি গিয়ে রেখে এসো।'

অশ্রুভারাক্রান্ত অনুজ বই বগলে অগ্রজের আদেশ পালন করতে গেলেন।

১৭ বা ১৮ তারিখে পুলিশের গাড়ি এসে ছবি বিশ্বাস ও তাঁর পরিবারের সকলকে নিয়ে গেল। আরো পরে দাস-ভবন থেকে হিন্দু-পরিবার সব উদ্‌ধার করলো পুলিশ। ততদিন পর্যন্ত পড়শিরা তাঁদের লুকিয়ে রেখেছিলেন। পুলিশ তাদের নিয়ে যাওয়ার পরে গুন্ডাদের ক্ষোভ ফেটে পড়লো মোহাম্মদ মোদাব্বেরের ওপর। তারা অভিযোগ করলো, টাকা খেয়ে তিনি হিন্দুদের রক্ষা করেছেন, এর প্রতিফল তাঁকে পেতে হবে। দাস-ভবনের অধিবাসীদের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে গুন্ডারা স্থানত্যাগ করতে বাধ্য হলো।

কয়েকদিনের মধ্যে কালিঘাট-অঞ্চল থেকে আমাদের খালু ডা. এ কে এম আবদুল ওয়াহেদ সপরিবারে চলে এলেন পার্স সার্কাসে। আমাদের আরেক আত্মীয় লুৎফর রহমানও অনুরূপভাবে নিজের বাড়ি ছেড়ে এসে উঠলেন নন্দীদের বাড়িতে। শোনা গেল, তাঁদের পরিত্যক্ত বাড়িতে পাকাপাকিভাবে গিয়ে উঠেছেন নন্দীরা।

১৯৪৬ সালের সেই মধ্য-আগস্টে পার্ক সার্কাসের তরুণদের অধিকাংশ গঠন করলেন দুটো দল : একটি, প্রতিরক্ষা-দল (ডিফেন্স পার্টি), তাঁদের হাতে অস্ত্র, আরেকটি চিকিৎসা-সেবা দল (মেডিক্যাল টিম), তাঁদের হাতে ফার্স্ট এইড ব্যাগ এবং বাহুতে রেডক্রসের চিহ্ন দেওয়া আর্ম-ব্যান্ড।

পরের দলে ছিলেন হাশেম ভাই। কোথাও কেউ আহত হলে—বিশেষ করে আমাদের পাড়ায় আগত উদ্‌বাস্তুদের অনেকেই এসেছিলেন জখম নিয়ে—তার প্রাথমিক চিকিৎসা করতেন তাঁরা। প্রতিরক্ষা-দলে যাঁরা ছিলেন—যেমন আসেম ভাই—তাঁরা চার নম্বর পুল-ব্রাইট স্ট্রিট-রাইফেল রোড অঞ্চলে সারারাত পাহারা দিতেন শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে। এক সময়ে জোর গুজব রটে গেল যে, রাইফেল রোড-ব্রাইট স্ট্রিট দিয়ে শিখরা আসছে পার্ক সার্কাস আক্রমণ করতে। তখন সকলেরই কর্তব্য হয়ে দাঁড়ালো আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা। আমাদের বাড়িতেও তার ব্যত্যয় হলো না। আব্বার একটা একনলা বন্দুক ছিল—সেই

বসিরহাটে থাকতে কেনা—সেটা পরিষ্কার করা হলো; নিরাপদ দূরত্বে রাখা কার্তুজগুলো আনা হলো হাতের কাছে; বাড়ির ছাদে জড়ো করা হলো আস্ত ও ভাঙা ইট এবং সোডা ওয়াটারের বোতল। সন্ধ্যার পরে রোজই পালাক্রমে কেউ না কেউ দেখে আসতেন আগুনের শিখা জ্বলছে কত দূরে এবং অপর পক্ষের আক্রমণের কোনো আভাস পাওয়া যাচ্ছে কিনা। সৌভাগ্যক্রমে, তার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় নি এবং স্তূপীকৃত সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হয় নি।

মধ্য-কলকাতার মন্নুজান হোস্টেল ছিল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রীদের আবাস—আমার মামানি সেখানে ছোটোখাটো চাকরি করতেন। হোস্টেলটি আক্রান্ত হয়েছিল, কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার আগেই পুলিশের সাহায্যে তাঁদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় পার্ক সার্কাসে; বড়ো পার্কের পুবদিকে একটা বাড়িতে তাঁদের অস্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা হয়। লেডি ব্রাবোর্ন কলেজে খোলা হয় একটি আশ্রয়কেন্দ্র ও চিকিৎসাকেন্দ্র। ডা. ওয়াহেদ চিকিৎসাকেন্দ্রের তত্ত্বাবধান করতেন এবং নিজের দু মেয়েকেই সেবিকার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। শরণার্থীদের মধ্যে এমনকিছু শিশু-কিশোরও ছিল, যারা পিতা বা পিতামাতা দুই হারিয়েছে। কলেজের দক্ষিণ দিকেই বড়ো পার্ক। মোহাম্মদ মোদাব্বের ও কামরুল হাসানের সাহায্যে সুফিয়া কামাল সেখানে এইসব ছেলেমেয়ের জন্যে কিছুদিন একটা স্কুল চালিয়েছিলেন 'রোকেয়া মেমোরিয়াল স্কুল' নামে। সেখানে ছিল খেলতে খেলতে পড়াশোনার ব্যবস্থা। তাছাড়া, রোজ বিকেলে রাস্তা পেরিয়ে তাদের নিয়ে আসা হতো বড়ো পার্কে। তাদের সার করে বসিয়ে দিয়ে একটা ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে ছবি এঁকে তাদের ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন কামরুল হাসান। দুটো বিন্দু থেকে হয়তো হয়ে গেল একটা বিড়াল কিংবা একটা অর্ধবৃত্ত থেকে একটা পাখি। তিনি ছবি আঁকতেন আর সর্বক্ষণ কথা বলতেন খুদে দর্শকদের সঙ্গে। ওই হতভাগ্য ছেলেমেয়েরা, মনে হয়, কিছুক্ষণের জন্যে হলেও তাদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ও দুর্দশা ভুলে একটা আনন্দের জগতে প্রবেশ করতো। শিল্পের শক্তি যে কতো প্রবল, সে-সম্পর্কে আমি প্রথমে সচেতন হই এ-ঘটনায়।

দিন কয়েক পরে যখন দাঙ্গা থেমে এসেছে এবং পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে কিছুটা স্বাভাবিক, বাড়ির সামনের ঘরের যে-সিঁড়ি ফুটপাথে নেমে গেছে, আমি সেই সিঁড়িতে বসে আছি। হঠাৎ দেখি, পুবদিকে একটু দূরে দুজন লোক ফুটপাতের ওপর ধস্তাধস্তি করছে। তারপর একজন গেল পড়ে, অন্যজন 'হিন্দুকো মারা, হিন্দুকো মারা' বলে চিৎকার করতে করতে আমার সামনে গিয়ে রক্তমাখা ছোরা নিয়ে দৌড়ে চলে গেল পশ্চিমদিকে। আমাকে বাড়ির কেউ ঝটকা টান দিয়ে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে দরজা-জানলা বন্ধ করে দিল। তবে তার আগেই দেখতে পেলাম, দু-চারজন যারা আততায়ীর পশ্চাদ্ধাবন করেছিল, তারা তার উচ্চরবের ঘোষণা শুনে থেমে গেল এবং বোধহয় সেই বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করতে আক্রান্ত লোকটির দিকে অগ্রসর হলো। বাড়িতে অন্যদের কথাবার্তা থেকে বুঝলাম, আহত ব্যক্তিকে কেউ তুলে আনে নি—হয়তো তাতে আর লাভও হতো না। তবে কেউ না কেউ পুলিশকে খবর দিয়েছিল, ফলে খানিক পরে পুলিশের অ্যাম্‌বুলেন্স এসে সেই অজ্ঞাতপরিচয় মানুষটিকে কিংবা তার প্রাণহীন দেহ সরিয়ে নিয়েছিল। বেশ কিছুকাল পরে পুলিশ সরেজমিনে এই ঘটনার

তদন্ত করেছিল এবং আমাদের বাড়ির উলটোদিকের ফুটপাতে হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হওয়ার তার সংলগ্ন সব বাড়ির বাসিন্দাদের পাইকারি জরিমানা হয়েছিল।

সরকারি হিসেবে কলকাতার দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলমান বালবৃদ্ধ নরনারী মিলে নিহত হয়েছিল পাঁচ হাজার, আহত পঁচিশ হাজার, আর সম্পত্তির বিনাশ হয়েছিল যথেষ্ট। তবে তার মধ্যে মুসলমানেরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিহতদের মধ্যে একটা বড় অংশ ছিল খিদিরপুর এলাকার ডক-শ্রমিক—তাদের অধিকাংশের বাড়ি ছিল নোয়াখালি ও ত্রিপুরায়। এরই প্রতিক্রিয়ায় কলকাতায় দাঙ্গা শুরু হওয়ার দুমাস পরে নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় দাঙ্গার সূচনা হয়। তবে এ প্রতিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না। সে-সময়েই শোনা গিয়েছিল যে, নোয়াখালিতে দাঙ্গা বাধে গোলাম সারোয়ার নামে এক স্থানীয় লীগ-নেতার উদ্‌যোগে এবং সে-দাঙ্গা থামাতে যথাসাধ্য করেন সেখানকার পুলিশ সুপারিন্‌টেনডেন্‌ট—ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের সদস্য—আবদুল্লাহ্। আবুল হাশিমের স্মৃতিকথায় (*আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, ঢাকা ১৯৭৮; কলকাতা সংস্করণ, ১৯৮৮) উল্লেখ করা হয়েছে যে, গোলাম সারোয়ারের নেতৃত্বে মৌলভিদের এক সভায় ঘোষণা করা হয় যে, কলকাতার ঘটনার বদলা নিতে মুসলমানদের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গোলাম সারোয়ার যে এ-কারণে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তা জানা যায় *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত শংকর ঘোষের ধারাবাহিক রচনা 'হস্তান্তর' (৭ মার্চ ১৯৯৮) থেকে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে শংকর ঘোষ হিসেব করেছেন যে, ওই দুই জেলায় নিহতের সংখ্যা শ দুই—তারা সবাই হিন্দু। তবে নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় মেয়েদের ওপর অত্যাচার হয়েছিল খুব বেশি। সেখানকার সংবাদ পেয়ে গান্ধি কলকাতা হয়ে উপদ্রুত অঞ্চলে চলে যান শান্তিপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। তাঁর সফরের ফলে নোয়াখালির ঘটনা দেশবিদেশে সকলের গোচরে আসে।

কলকাতার দাঙ্গায় অনেক বিহারিও নিহত হয় এবং তাদের হত্যাকাণ্ডের সংবাদে বিহারে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। নোয়াখালির ঘটনার বিবরণ সেখানে পৌঁছোলে—যাকে বলে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি—তাই ঘটে। প্রাদেশিক সরকারের আনুকূল্যে সেখানে অক্টোবরের শেষে পালিত হয় নোয়াখালি-দিবস; পরিণামে সর্বত্র দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। বিহারে সাত হাজার লোক নিহত এবং তাদের সবাই মুসলমান বলে অনুমিত হয়। বড়োলাট লর্ড ওয়াভেল তাঁর ডায়েরিতে (পেনডেরেল মুন-সম্পাদিত *ওয়াভেল/ দি ভাইসরয়জ জার্নাল*, লন্ডন, ১৯৭৩) লিখেছেন যে, বর্বরতা ও পাশবিকতার যে-প্রকাশ বিহারে ঘটে, তা কলকাতার হত্যাকাণ্ডের চেয়েও নিকৃষ্ট এবং নোয়াখালির দাঙ্গার চেয়েও ভয়ানক।

বিহারে উৎপীড়িতদের জন্যে মুসলিম লীগ বেসরকারি ত্রাণকার্য চালিয়েছিল এবং বিহার রিলিফ ফান্ডে দান করার জন্যে সকলের কাছে আবেদন জানিয়েছিল। মুকুলের মহফিল মারফত সে-আবেদন সব মুকুলের কাছে পৌঁছোয়। ওই তহবিলের জন্যে চাঁদা-সংগ্রহে আমি লেগে গেলাম। রবিনসনস বার্লির টিনের গায়ে শাদা কাগজ এঁটে তার ওপরে 'বিহার রিলিফ ফান্ডে দান করুন' লিখে প্রথমে পাড়ায়, তারপর পার্ক সার্কাস ট্রাম ডিপো থেকে লোয়ার সার্কুলার রোডের মোড় পর্যন্ত অবিরাম ট্রামে যাওয়া-আসা করে টিনের পর টিন ভরে তুললাম। কখনো কখনো দক্ষিণে বালিগঞ্জ পোস্ট

অফিস ট্রাম স্টপ পর্যন্ত গিয়েছি। এর আগে এসব এলাকায় একা-একা যাওয়ার ব্যাপারে আমার ওপরে বাড়ির কড়া নিষেধাজ্ঞা ছিল।

আব্বা মনে করতেন, কলকাতার সব গাড়িঘোড়া আমাকে চাপা দেওয়ার জন্যেই ছুটোছুটি করছে। সুতরাং আমির আলি অ্যাভিনিউ পার হওয়ার অনুমতি আমার ছিল না। আমার খেলাধুলোর সুযোগও ছিল খুব কম। কেননা, আব্বা ভাবতেন, ফুটবল খেললে আমার পা নির্ঘাৎ ভাঙবে এবং ক্রিকেট বলের লক্ষ্যই হবে আমার দাঁত ভাঙা বা চোখ জখম করা। একমাত্র ব্যাডমিন্টন খেলায় বাধা ছিল না। এই অবস্থায় বিহার রিলিফ ফান্ডের জন্যে সারাদিন ঘোরাফেরা করা—তাও অধিকাংশ সময়ে ট্রামে—সম্ভব হয়েছিল শুধু উপদ্রুতদের প্রতি আমাদের পরিবারে গভীর সহানুভূতিবশত।

বিহার রিলিফ ফান্ডের জন্যে আমি কতো টাকা তুলেছিলাম, তা আর এখন মনে নেই। তবে মনে পড়ে যে, আব্বার বন্ধু, তখন এ ডি পি আই, খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁর স্ত্রী—আমার বন্ধু জিল্লুর রহমান খানের আম্মা—কুটি বিবি দশ টাকা দিয়েছিলেন। দশ টাকা তখন অনেক টাকা। বিহার ত্রাণকার্যের জন্যে চাঁদা তোলার ক্ষেত্রে মুকুল ফৌজের সদস্যদের মধ্যে আমার স্থান নির্ণীত হয়েছিল পয়লা নম্বরে। পুরস্কারস্বরূপ আমাকে যতোদূরসম্ভব-হালকা একটা রুপোর মেডেল দেওয়া হয়েছিল এবং মুকুলের মহফিলের পাতায় আবক্ষ প্রতিকৃতিসমেত আমার কৃতিত্বের সংবাদ ছাপা হয়েছিল। আমার ছবির ওপরেই মুদ্রিত হয়েছিল মুকুল ফৌজের এক সদস্যার ছবি। সে আমার চেয়েও বেশি অর্থ সংগ্রহ করেছিল, তবে একটি উৎস থেকেই সে অনেক টাকা পেয়েছিল বলে আমার প্রচেষ্টার অধিক মূল্য দেওয়া হয়েছিল।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমি যে এতোটা চাঁদা তুলতে সমর্থ হয়েছিলাম, তা স্কুল বন্ধ ছিল বলে। দাঙ্গার সময়ে আমাদের স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—সেটা পরিণত হয় একটা আশ্রয়কেন্দ্রে। স্কুল খুললো বার্ষিক পরীক্ষার ঠিক আগে আগে। প্রায় চার মাস স্কুলে না যাওয়ায় আমাদের—অন্তত আমার—পড়াশোনার ক্ষতি হয়েছিল বিস্তর। দাঙ্গাসংক্রান্ত উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পরে বাড়িতে পড়েছিলাম বটে, কিন্তু তাতে ক্ষতি পূরণ হয় নি। স্কুল যখন খুললো, তখন দেখলাম, মণীশ এবং অপরাপর হিন্দু ছাত্র কেউ আর স্কুলে আসছে না—তারা যে কোথায় চলে গেল, কে জানে!

পরিবার এবং পরিবেশ থেকে যেটুকু সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞান আমার জন্মেছিল, ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার অভিজ্ঞতার ফলে মন থেকে তা সম্পূর্ণ মুছে যায়। যা দেখলাম এবং যা শুনলাম, তাতে মানুষের প্রতি জ্ঞানকৃত অপরাধের জন্যে যাদের প্রতি মনে ধিক্কার জন্মালো, তাদের জাত আলাদা হলেও কাজ অভিন্ন।

২১.

চাঁদা তোলার জন্যে যে-সংগঠন থেকে পুরস্কারলাভ করেছিলাম, এখানে তার কথা কিছু বলা দরকার।

'মোছলেম বঙ্গ ও আসামের একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র'—এই ভূষণ শিরোধার্য

করে দৈনিক *আজাদ* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৬ সালে। ১৯৪০ সালে তাতে ছোটোদের পাতা—মুকুলের মহফিল—প্রবর্তিত হয়। বাগবান নামে এটি পরিচালনা করতেন *আজাদের* বার্তা-সম্পাদক মোহাম্মদ মোদাব্বের। কংগ্রেস-সমর্থক *আনন্দবাজার পত্রিকা* এবং কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র *স্বাধীনতার* ছোটোদের পাতার সদস্যদের নিয়ে যথাক্রমে মণি-মেলা ও কিশোর-বাহিনী নামে দুটি আলাদা সংগঠন গড়ে উঠেছিল। মুসলিম লীগের মুখপত্র *আজাদও* এক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকতে চাইলো না। ১৯৪৫ সালে মুকুলের মহফিলের সদস্যদের নিয়ে মুকুল ফৌজ গড়ে উঠলো কামরুল হাসানের সর্বাধিনায়কত্বে। কামরুল হাসান আগে মণি-মেলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তারও আগে গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী-আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। মুকুল ফৌজ গঠনের সময়ে তিনি আর্ট স্কুলের পড়া স্থগিত রেখে কী একটা করছিলেন। শিল্পী হিসেবে সে-সময়ে তাঁর যতটা পরিচিত ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল ব্যায়ামবিদ ও মুষ্টিযোদ্ধা বলে। মুষ্টিযুদ্ধ করতে যেয়েই তাঁর নাকের হাড় ভেঙে যায়। ১৯৪৫ সালেই বোধহয় শরীরচর্চার জন্যে তিনি মিস্টার বেঙ্গল উপাধি জয় করেছিলেন।

পার্ক সার্কাসই ছিল মুকুল ফৌজের কেন্দ্র। সুতরাং গোড়া থেকেই কমল ও আমি তাতে যোগ দিয়েছিলাম। বড়ো পার্কে রোজ বিকেলে আমাদের নানা কিছু শেখাতেন কামরুল হাসান। এ কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন বেলায়েত হোসেন ও অনুজ হাসান জান। ১৯৪৭ সালের পরে বেলায়েত হোসেন ঢাকায় মুকুল ফৌজ গড়ে তোলার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন, ষাটের দশকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরীরচর্চা বিভাগের প্রশিক্ষক নিযুক্ত হন। হাসান জানেরও ছিল মণি-মেলার অভিজ্ঞতা; তিনি ভালো ছড়া লিখতেন। ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরে তিনি কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় আসেন এবং বাংলা একাডেমীতে যোগ দেন। ১৯৭৪ সালে ব্যাখ্যার অতীত এক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে যাঁরা পার্ক সার্কাসে মুকুল ফৌজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে মনে পড়ে, তাঁরা হলেন গোলাম মওলা (চিত্রশিল্পী), সাবের রেজা করিম (বাংলাদেশ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সচিব), মোস্তফা কামাল (বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি), আনিসুর রহমান (অর্থনীতিবিদ), হামেদ শফিউল ইসলাম (বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিবের পদ থেকে অবসর নেওয়ার পর লোকান্তরিত হন), জামিল চৌধুরী (বাংলাদেশ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব), সিরাজ হোসেন খান (বিশিষ্ট প্রকৌশলী, বহুকাল ধরে প্রবাসী) ও মনযূর-উল করিম (বাংলাদেশ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সচিব)। তখন মুকুল ফৌজে ছিলেন, এমন দুজনের সঙ্গে আমার অনেক পরে পরিচয় হয়েছিল : একজন সুলতান আহমদ (বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রধান ও রিয়ার অ্যাডমিরাল); অপরজন মীজানুর রহমান (*মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদক*)। আমাদের হাতে লেখা পত্রিকা *নোতুন দিনে* মীজানুর রহমানের আঁকা ছবি পত্রস্থ হয়েছিল—বস্তুত তিনি ছিলেন ওই পত্রিকার কনিষ্ঠতম শিল্পী। তাঁর সঙ্গে যে তখন আলাপ হয় নি, এটা আশ্চর্যের ব্যাপার। পরবর্তীকালের খ্যাতনামা গিটার-বাদক ও বৈমানিক ওয়ারেস আলিও বোধহয় ছিলেন আমাদের সঙ্গে।

মুকুল ফৌজে আমরা পি টি করতাম, প্যারেড করতাম; তাছাড়া ব্যান্ড-বাদনের একটি ভালো দল গড়ে তোলা হয়েছিল; এবং ব্রতচারীর নৃত্যগীত শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। অনেকে কাঠিনৃত্যে বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। ব্রতচারীর গান সবাইকে গাইতে হতো বলে আমিও বাধ্য হয়ে গলা মেলাতাম :

চল কোদাল চালাই
ভুলে মানের বালাই
ঝেড়ে অলস মেজাজ
হবে শরীর ঝালাই।

যে-গানটা দিয়ে আমাদের প্রাত্যহিক কর্তব্য শেষ হতো, তার সুরটা বোধহয় বিদেশি ছিল আর প্রারম্ভিক চরণগুলো ছিল এই :

দিন যে চললো
রাত ওই নামলো
ঘরে চলো হে!
সকলেই নিঝঝুম
তারাদের নাই ঘুম
ঘরে চলো হে!

স্মৃতি থেকে লেখা বলে উদ্‌ধৃতিতে ভুল থাকতে পারে। তবে যেখানে ভুল নেই, তা হলো, মুকুল ফৌজে যোগ দিয়ে আমরা খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। শৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা ও পরিশীলনের একটা ভাব আমাদের মনে জেগেছিল। তাছাড়া, মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে পরোক্ষ সংযোগ সত্ত্বেও মুকুল ফৌজে আমাদের কখনো সাম্প্রদায়িক কিছু শেখানো হয় নি। সেদিক দিয়ে এর পরিবেশ ছিল উদার।

কামরুল হাসানের বাসায় বেশ কয়েকবার গেছি। মাংসপেশীর প্রদর্শন-সংবলিত ও সংক্ষিপ্ত পোশাক-পরিহিত তাঁর অনেকগুলো ছবিতে এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীতে জয়-করা নানান মেডেল, কাপ ও শিল্ডে সামনের ঘরটা সজ্জিত ছিল। সেখানে হাসান জানকেও পেয়েছি। তবে তাঁদের যে-অনুজের সঙ্গে পরবর্তীকালে আমার সবচেয়ে বেশি বন্ধুত্ব হয়, সেই বদরুল হাসানকে তখনো দেখি নি।

২২.

সওগাতে বড়োবুর প্রথম কবিতা—'জমজম'—বেরিয়েছিল ১৯৩৯ সালে (অগ্রহায়ণ ১৩৪৬), আর বোধহয় শেষ কবিতা—'অজানা আশার প্রথম প্রভাতে'—ছাপা হয় ১৯৪৫ সালে (মহিলা সংখ্যা ১৩৫২)। ততোদিনে দুলাভাইয়ের নামের শেষাংশ জুড়ে দিয়ে সে নিজের নাম লিখছে তৈয়বুন্নেসা আহসান। কবিতাটি লিখে আমাকেই নকল করতে দেওয়া হয়েছিল। সেটি সম্পূর্ণ তুলে দিলাম, কেননা এর পরে বড়োবু যদিও আরো বছর দুই কবিতা লিখেছিল এবং তার কিছু কিছু ছাপাও হয়েছিল, তবে সেসব কবিতার কথা আমার মনে নেই, আর এতে তার লেখার ধরনটারও একটা পরিচয়

পাওয়া যায় :

অজানা আশার প্রথম প্রভাতে অরুণ আলোর রথে
তুমি এসেছিলে মধু-মলয়ার সনে
আমার চলার পথে
মোর মনোবনে।

স্বপ্ন-রঙীন প্রভাতের রঙে রাঙালে আমার মন
পাখীর কূজনে মেলিলাম আঁখি
ফুটিল কুঞ্জবন।
শুধু চেয়ে থাকি।

আশার স্বপনে ছেয়ে দিলে মোর অলীক স্বপনগুলি
তব সনে মোর তাই হল পরিচয়
মধুর স্বপনে ভুলি
হৃদি হল জয়।

বিয়ের পরও বড়োবু নিয়মিত কবিতা লিখতো। মনে হয়, তাতে দুলাভাইয়েরও সায় ছিল। দুলাভাইয়ের বন্ধু লুৎফর রহমান—পরে নামের শেষে নিজের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম *জুলফিকার* যোগ করেছিলেন—*পলাশী* নামে একটি স্বল্পায়ু সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরই আগ্রহাতিশয্যে বড়োবু তাতে কবিতা লিখেছিল। দুলাভাই মাঝে মাঝেই কিনে আনতেন গল্প ও কবিতার বই। মনে পড়ে, তার মধ্যে ছিল রবীন্দ্রনাথের *বলাকা*—আমি তাতে ঠিক দন্তস্ফুট করতে পারি নি। রবীন্দ্রোত্তর কবিদেরও বই আসতো, তবে বেশি নয়। সরোজকুমার রায়চৌধুরীর বেশ কয়েকটি উপন্যাস এনেছিলেন পর্যায়ক্রমে—*আকাশ ও মাটি, ময়ূরাক্ষী, শৃঙ্খল*—তার কোনোটাই আমাকে টানে নি। তবে বইগুলো তো আর আমার জন্যে আনা হয় নি, যার জন্যে আনা হয়েছিল, তার কেমন লেগেছিল, কে জানে! সংসারের চাপ বাড়তে থাকলে—১৯৪৫-৪৬এ দেড় বছরের মধ্যে তাঁদের দুই কন্যা জন্মালো—বড়োবুর লেখা কমে আসতে আসতে একেবারে বন্ধ হয়ে গেলো।

দুলাভাই একদিন কিনে নিয়ে এলেন পুরোনো কিন্তু ঢাউস একটা রেডিওগ্রাম। আমাদের বাড়িতে একটা গ্রামোফোনও—তখনকার চলতি কথায় কলের গান—ছিল না। জিনিসটার প্রতি আমার প্রবল আকর্ষণ ছিল। আত্মীয়স্বজন যাঁদের কলের গান ছিল, তাঁদের বাড়িতে গেলে আকারে-ইঙ্গিতে তাতে গান শুনতে চেয়েছি। গান শোনাটা ছিল উপলক্ষ, লক্ষ্য ছিল কলের গানে চাবি দেওয়া। কখনো কখনো গান শুনতে পেলেও যন্ত্রটার গায়ে হাত দেওয়ার অনুমতি পাওয়া যেতো না। দৈবাৎ যদি-বা পাওয়া যেতো, তাহলে রেকর্ডের সঙ্গে পিনের সংযোগ ঘটাতে গিয়ে যাতে রেকর্ড নষ্ট করে না ফেলি কিংবা দম দিতে গিয়ে স্প্রিং না ভেঙে ফেলি, সে-বিষয়ে বিশেষ করে সাবধান করে দেওয়া হতো। ফলে পুরো দম দিতে সাহস না করায় শেষ দিকে রেকর্ডের গতি কমে গিয়ে অদ্ভুতরকম আওয়াজ হতো—সেটাও অবশ্য শ্রোতব্যে পরিণত হয়েছিল।

বাড়িতে রেডিওগ্রাম এলো বটে, কিন্তু কলের গানে দম দেওয়ার সুখ আর পাওয়া গেলো না। তবে হিজ মাস্টার্স ভয়েসের কুকুর-মার্কা ছোটো বাক্স থেকে পিন বের করে যন্ত্রে লাগিয়ে রেকর্ডের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটাবার স্বাধীনতা পাওয়া গিয়েছিল। অনেক সময়ে পিনের কার্যকরতা সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার আগেই পিন বদলে দিতাম কেবল ওই কাজটার মধ্যে একটা অভিনবত্ব ছিল বলে। দুলাভাই যাঁদের রেকর্ড নিয়ে আসতেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কানন দেবী, যূথিকা রায়, কুন্দনলাল সায়গল, পঙ্কজ মল্লিক, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও জগন্ময় মিত্র। শেষোক্ত দুজনের গানের তেমন ভক্ত আমি হতে পারি নি, যদিও তাঁরা ক্রমেই জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠছিলেন।

রেকর্ডের ব্যাপারটা একরকম বুঝতে পারতাম, কিন্তু রেডিওটা তখনো রহস্যময় মনে হতো। রেডিওগ্রামের পেছনে কেউ না কেউ বসে কথাবার্তা বলছে বা গান গাইছে, এসব কথায় আস্থা স্থাপন করে ঠকার সময় তখন পার হয়ে গেছে। আমরা আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রের অনুষ্ঠানই শুনতাম—তার বাইরে যে অন্য বেতারকেন্দ্র আছে, সে সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। পঙ্কজ মল্লিকের সঙ্গীত-শিক্ষাদান ও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের গল্পদাদুর আসর খুব পছন্দ হতো। মা-বোনেরা মেয়েদের অনুষ্ঠান এবং নাটক ইত্যাদি শুনতেন, তাতে আমার আগ্রহ ছিল না।

দাঙ্গার পরে একদিন এই রেডিওগ্রামসহ বড়োবুবু উঠে গেলো অন্য বাড়িতে। পার্ক স্ট্রিটের ওপরেই মেরিনা গার্ডেন কোর্ট বলে বহু ফ্ল্যাট-বিশিষ্ট একটা বাড়ি—তারই নিচের তলায় এক কামরার একটা ফ্ল্যাটে। আমি বিষণ্ন হলাম, তবে খুব নয়, কেননা, ওটা এতো কাছে যে, ইচ্ছে করলেই তাদের বাড়ি যাওয়া যেতো। তাদের ছেড়ে-যাওয়া ঘরে আব্বা-মা ও আমার থাকার ব্যবস্থা হলো। আমি আর আব্বা-মার সঙ্গে এক খাটে থাকতে রাজি হলাম না, পৃথক পালঙ্ক দাবি করে বসলাম। পুরোনো কিন্তু সুশ্রী—আমার পছন্দসই—একটা খাট কিনে ওই ঘরে পাতা হলো।

এই ঘরে থাকতেই কোনো উপলক্ষে ঋতুস্রাবের বিষয়টা আব্বা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। চিকিৎসক ছিলেন বলেই বোধহয় তাতে কোনো সংকোচ বোধ করেন নি। এই ঘরে বসেই মা দুটো প্রবন্ধ লিখেছিল এবং আমি তা নকল করে দিয়েছিলাম। তার একটা—'নারীর অধিকার'—ছাপা হয়েছিল *আজাদের* মহিলা-মহফিলে।

২৩.

মেজোদুলাভাই কলকাতায় এলে বেশ মজা পাওয়া যেতো। তিনি ছিলেন সৌখিন মানুষ। আমরা যখন ট্রামে-বাসে-ঘোড়াগাড়িতে চড়ি, তখন তিনি ট্যাকসিতে চড়তেন এবং আমাকে নিয়ে এদিক-ওদিক বেড়াতে যেতেন। যুদ্ধ তখনো শেষ হয় নি। এক রাতে ট্যাকসি থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে কোথায় যেন গেছি, হঠাৎ অন্ধকারের মধ্য থেকে বিকট এক গর্জন শোনা গেলো। মেজোদুলাভাই আমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং জোরে বললেন, 'ফ্রেন্ড'। তারপর আরো কী বলে ফিরতি পথ ধরলেন। আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে জানালেন, আমরা যে-জায়গায় ঢুকে পড়েছিলাম, সেটা

সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন—বেসামরিক ব্যক্তিদের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। প্রহরী তাই চিৎকার করে বলেছিল 'হুকুমদার'—কথাটা 'হু কামস দেয়ার?' বাক্যের সংক্ষিপ্ত ভারতীয়-সেনা-সংস্করণ। এই প্রশ্ন উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুককে জানাতে হয় যে, সে মিত্রপক্ষ—শত্রুর অনুচর নয়। জবাব দিতে দেরি হলে প্রহরী গুলি চালিয়ে দিতে পারে। তারপর ভুল করে যে এদিকে এসে পড়া গেছে, সেই ব্যাখ্যা দিয়ে পশ্চাদপসারণ।

মেজোদুলাভাই নানা ধরনের বিলিতি বিস্কুট এবং পলসনের মাখন ও ক্র্যাফটের পনির নিয়ে আসতেন। যদিও এসবের সঙ্গে আমাদের অপরিচয় ছিল না, তবু আমি খুব খুশি হতাম। অভিজাত হোটেল-রেস্টুরেন্টে খেতে পছন্দ করতেন তিনি। আমাকে একদিন ফারপোয় খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঘরে বসে আমরা ফারপোর রুটি-মাখন খেতাম বটে, কিন্তু ওরকম নামকরা হোটেলের দোতলার রেস্টুরেন্টে বসে উর্দিপরা খানসামার সেবা পাওয়া এবং অমন পশ্চিমি খাওয়ার সুযোগ আমার হয় নি। মেজোদুলাভাইয়ের সঙ্গে ইংরেজি সিনেমা দেখতেও গেছি। তাছাড়া তিনি আমাকে সঙ্গে করে ইডেন গার্ডেনে নিয়ে গিয়েছিলেন ক্রিকেট খেলা দেখতে। যতদূর মনে পড়ে, সেটা ছিল ১৯৪৬ সাল, টেস্ট খেলা হয়েছিল লাল অমরনাথের ভারতীয় দলের সঙ্গে ডন ব্র্যাডমানের অস্ট্রেলীয় দলের। ক্রিকেটের কিছু না জেনেও মাঠের ও গ্যালারির পরিবেশে মুগ্ধ না হয়ে পারি নি।

অনেকটা মেজোদুলাভাইয়ের প্রভাবেই আমার জীবনযাপনপ্রণালিতে কিছু পরিবর্তন এসে যায়। আমাদের বাড়িতে কেবল গামছার চল ছিল, আমার আগ্রহাতিশয্যে আমাকে তোয়ালে কিনে দেওয়া হলো। সকলে দাঁত মাজতেন নিমের দাঁতন, কয়লার গুঁড়ো কিংবা গুল দিয়ে। আমার দাবি পূরণ করে আমার জন্যে টুথ ব্রাশ ও পেস্টের ব্যবস্থা করা হলো। পরে আমাকে একটা ইস্ত্রি এবং আইসক্রিম বানাবার কাঠের কলও কিনে দেওয়া হয়েছিল।

তখনকার আরেকটা ঘটনা এই প্রসঙ্গে মনে এলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে সৈন্যদের জন্যে তৈরি করা প্যাকেট লাঞ্চ ও সাপার যুদ্ধ থেমে গেলে বাজারে বিক্রি হতো। বনি ও আমি যার যার অভিভাবকের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে একাধিক দিন এসব কিনেছি। তারপর ছুটির দিনে দুপুরবেলায় ছোটো পার্কে গিয়ে দুই বন্ধু মিলে লাঞ্চ করেছি। বনির ছোটোমামা লাঞ্চের সময় নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। সেই সময়ের জন্যে অস্থির হয়ে থাকলেও কখনো আগেভাগে প্যাকেট খুলি নি। সাপারটা একসঙ্গে খাওয়ার সুযোগ ছিল না বলে ঘরে বসে একা একাই খেতাম। বাড়ির সকলে এতে মজা পেতেন না, তবে আব্বা বিলক্ষণ কৌতুক বোধ করতেন।

২৪.

আব্বার কাছে যাঁরা আসতেন কিংবা তাঁর সুবাদে কাছ থেকে যাঁদের দেখার সুযোগ পাই, তাঁদের নাম অন্তত উল্লেখ করার সময় এসেছে। শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে মনে পড়ে

খান বাহাদুর আহছানউল্লা, খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ ও খান বাহাদুর আবদুল খালেকের কথা। এঁরা সবাই প্রাদেশিক সরকারের জনশিক্ষা বিভাগে কাজ করতেন। ভারতীয় শিক্ষা সার্ভিসের সদস্য খান বাহাদুর আহছানউল্লা তখনই দীর্ঘদিন অবসরপ্রাপ্ত। খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁর বাসায় আমার যাতায়াত ছিল, মূলত তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র জিল্লুর রহমান খানের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অশকশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে। তবে তার বড়ো ভাই মাহবুবুর রহমান খান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রকের পদে কর্মরত অবস্থায় মারা যান) ওরফে খোকাভাই আমাদের বাড়িতেও খুব আসতেন। তখন সাহিত্যচর্চার দিকে তিনি কিছুটা ঝুঁকেছিলেন। তাঁর অনুজ এফ আর খানকে (পরে বিশ্বখ্যাত স্থপতি) দেখতাম ওঁদের বাড়িতে গেলে। ওঁদের বোন মাসুদা তখন নিতান্তই শিশু। ঢাকা থেকে কলকাতায় এলে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ একবার আসতেন আমাদের বাড়িতে। এই ছোটোখাটো মানুষের অগাধ পাণ্ডিত্য ও ভাষাজ্ঞানের কিংবদন্তি আমাদের বিস্ময়মিশ্রিত কৌতূহল জাগাতো।

সাংবাদিকদের মধ্যে মোহাম্মদ মোদাব্বের তো ছিলেন আত্মীয়দের দলে, তবে আব্বার সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল কে আই এ কাদরীর—তিনি ছিলেন ইংরেজি দৈনিক *স্টার অফ ইন্ডিয়ার* বার্তা-সম্পাদক। *মর্নিং নিউজ* প্রকাশের বহু আগে এ পত্রিকা বের হয়েছিল, তা পরিচিত ছিল মুসলমান সমাজের মুখপত্ররূপে এবং কাদরী সাহেব খ্যাতিলাভ করেছিলেন দক্ষ সাংবাদিক হিসেবে। তিনি অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন, তার ওপর নিখুঁত সাহেবি পোশাকে সজ্জিত হয়ে ও রোল্ড গোল্ডের চশমা পরে যখন রাস্তা দিয়ে যেতেন, তখন তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হতো। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহেদ কাদরী আমার কিছু বড়ো ছিলেন; কনিষ্ঠ শহীদ কাদরী—খ্যাতনামা কবি—আমার ছোটো হলেও আমরা পরস্পর বন্ধু ছিলাম। ফজলুল হক সেলবর্সীর কথা আগে বলেছি। আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মুজিবুর রহমান খাঁ, আবুল মনসুর আহমদ, চৌধুরী শামসুর রহমান, আবু জাফর শামসুদ্দীন ও মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহকে—ইনি লালকোর্তা নামে অধিকতর পরিচিত ছিলেন—মনে পড়ে। সাময়িকপত্রের সম্পাদক হিসেবে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ছাড়া *মোসলেম ভারতের* প্রকৃত সম্পাদক আফজাল-উল হকের কথা বলতে হয়। লেখক হিসেবে অতোটা পরিচিত না হলেও সংগঠক হিসেবে পরিচিত, এমন দুজন ছিলেন আয়নুল হক খাঁ—বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির কর্মকর্তা এবং ময়ীনউদ্দীন হোসায়ন বি এ—প্রকাশক ও নজরুল ইসলামের সুহৃদ। মোহাম্মদ আকরম খাঁকে দেখেছি—তবে আমাদের বাসায় নয়, আমাদের পাড়াতেই তাঁর বাড়িতে গিয়েছি আব্বার সঙ্গে।

সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে খান বাহাদুর মাহবুবউদ্দীন আহমদ (এঁর পুত্র মকসুদ-উস-সালেহীন ব্যাংকার হিসেবে জীবদ্দশায় সুপরিচিত ছিলেন), খান বাহাদুর মাহতাবউদ্দীন সরকার (তাঁর পুত্র ফসিহউদ্দীন মাহতাব নানাক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত), খান সাহেব খলিল আহমেদ (খুব সংস্কৃতিমনা মানুষ ছিলেন—তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হামেদ আহমেদ তখনই তরুণ গল্পকার হিসেবে পরিচিত হতে শুরু করেছেন এবং তাঁর কনিষ্ঠপুত্র বুলবুল আহমেদ পরে অভিনেতা হিসেবে খ্যাতিলাভ করে)। মুজিবুল হক (তাঁর পুত্র মনজুর মোরশেদ ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের সচিব ও রাষ্ট্রদূত এবং

দৌহিত্র নিয়াজ মোরশেদ খ্যাতনামা দাবাড়ু), এস বি রহমান (এঁর কন্যা কবি রুবী রহমান ও কণ্ঠশিল্পী পাপিয়া সারোয়ার) ও সিরাজুল হক—তাঁর কথা আগে বলেছি—ছিলেন আব্বার ঘনিষ্ঠ। আবদুস সালাম তখন সরকারি চাকরি করতেন, পরে সাংবাদিক হিসেবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েছিলেন। তবে তাঁকে আমি যত না আব্বার সূত্রে জানতাম, তার চেয়ে বেশি জানতাম আমার বন্ধু হাসান শফির বাবা হিসেবে। হাসান শফির মামা শামসউল হক—পরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী—এবং জহুরুল হক—তখন চাকরি করতেন, পরে আল হেলাল প্রেসের কর্মকর্তা হয়েছিলেন—সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য।

কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে আমাদের বাড়িতে সবচেয়ে বেশি আসতেন কাল্লু কাওয়াল, তারপর আব্বাসউদ্দীন আহমদ। কাওয়ালি গানের শিল্পী হিসেবে প্রথমজনের নাম খুব ছড়িয়েছে তখন, আর আব্বাসউদ্দীনও তাঁর খ্যাতির শীর্ষে। আমি দুজনেরই গান শুনতে গেছি, তবে কাওয়ালি আমাকে টানে নি। পার্ক সার্কাসে কোনো একটি অনুষ্ঠানে আব্বাসউদ্দীন তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন মোস্তফা কামাল (বিচারপতি), ফেরদৌসী বেগম (এখন রহমান) এবং মোস্তফা জামান (তখনো নামের সঙ্গে আব্বাসী ব্যবহার করতে শুরু করে নি)। আমার ভুল না হলে বলবো, ওই অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করে প্রশংসালাভ করেছিলেন সালমা চৌধুরী (এখন খান) ও আখতার জাহান ফরিদা বানু (সরকারি কলেজে বাংলার অধ্যাপনা থেকে এখন অবসর নিয়েছেন)। চিত্রশিল্পীদের মধ্যে জয়নুল আবেদিনের প্রসঙ্গে আগেই বলেছি। আর আসতেন কাজী আবুল কাসেম—দোপেঁয়াজা নামে *আজাদে* কার্টুন এঁকে খুব নাম করেছিলেন। আর কদাচিৎ দেখেছি সফিউদ্দীন আহমদকে।

সাহিত্যিক যাঁরা আব্বার কাছে আসতেন, তাঁদের মধ্যে আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শাহাদাৎ হোসেন, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (এঁর পুত্র, বাংলাদেশ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সচিব, মোকাম্মেল হক পরে আমার সহপাঠী ও বন্ধু হয়), ইব্রাহীম খাঁ, গোলাম মোস্তফা, জসীমউদ্‌দীন, আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী, আকবরউদ্দীন, কাজী আবদুল ওদুদ, আবদুল কাদির, খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন, বন্দে আলী মিয়া, মহীউদ্দীন, জুলফিকার হায়দার (পরে সুফী অভিধায় পরিচিত) ও তাঁর স্ত্রী রাবেয়া হায়দার, কাজী দীন মোহাম্মদ (*গোলোকচন্দ্রের আত্মকথার* লেখক), তালিম হোসেন এবং ফররুখ আহমদ উল্লেখযোগ্য। বাহুল্য বলে সুফিয়া কামাল, বেনজীর আহমদ, হোসনে আরা ও আহসান হাবীবের নাম করলাম না। ওবায়েদ-উল-হককেও মনে পড়ে, তিনি যখন *দুঃখে যাদের জীবন গড়া* ছায়াছবি তৈরি করলেন, তখন প্রথম মুসলিম চলচ্চিত্র-পরিচালক হিসেবেই তিনি অধিকতর খ্যাতি অর্জন করলেন। তবে চলচ্চিত্রটি তিনি পরিচালনা করেছিলেন হিমাদ্রি চৌধুরী নামে। এর নায়ক ছিলেন জহর গাঙ্গুলি, নায়িকা রেণুকা রায় এবং কিরণকুমার ছদ্মনামে প্রতিনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ফতেহ লোহানী।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের ডেপুটি স্পিকার জালালউদ্দীন হাশমীর সঙ্গে আব্বার যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর বাড়িতে থাকতেন তিন যুবক : তাঁর পুত্র লালু, ভ্রাতুষ্পুত্র মতি (সাইয়িদ আবদুল হাই—সরকারি কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের শিক্ষকতা

করেছেন) এবং অপর ভ্রাতুষ্পুত্র সিকানদার আবু জাফর। শেষোক্ত জন তাঁর বাবরি চুলের রাশি নিয়ে একবার বাঁয়ে একবার ডাইনে তাকাতে তাকাতে যেতেন আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে। মতি ভাইয়ের সঙ্গেই আমার ভাব ছিল বেশি। লালু ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ে ঢাকায় এসে—তাঁর পুত্র ড. সৈয়দ হাশমী অর্থনীতিবিদ হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে।

রাজনীতিবিদদের মধ্যে এ কে ফজলুল হক ও জালালউদ্দীন হাশমী ছাড়া আব্বার সঙ্গে ভালো পরিচয় ছিল কৃষক-প্রজা পার্টির শামসুদ্দীন আহমদ, মুসলিম লীগের তমিজউদ্দীন খান (তাঁর কন্যা কুলসুম ও মীর্জা নূরুল হুদার বিয়ে খেয়েছি আব্বার সঙ্গে গিয়ে), মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের জহিরউদ্দীন (পরে আওয়ামী লীগ-নেতা ও পাকিস্তানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত), মুসলিম ছাত্রলীগ-নেতা আবদুল ওয়াসেক ও আনওয়ার হোসেনের। এঁদের সবাইকে আমাদের বাড়িতে দেখেছি। ফজলুল হকের আত্মীয় সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া), খান সাহেব সৈয়দ ইউসুফ আলী ও খান সাহেব উজির আলীকেও কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল।

চিকিৎসকদের মধ্যে কারো কারো কথা বলেছি। যাঁর কথা বলা হয় নি, তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্যাথলজি বিভাগের ডা. আনোয়ার আলী (তাঁর পুত্র ডা. ফারুক আনোয়ার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন)।

সব মিলিয়ে সময়টা ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য। এতো লোকের সান্নিধ্য লাভ করাও কম সৌভাগ্যের বিষয় নয়।

২৫.

আত্মীয়স্বজনের বাইরে মায়ের কাছে যাঁরা আসতেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ছবি বিশ্বাসের স্ত্রী। কী করে ছায়াছবি বানায়, তা দেখার ব্যাপারে আমাদের পরিবারের সকলের অপরিসীম আগ্রহ ছিল। কথাটা তাঁর কাছে সরাসরি না পেড়ে মা নাকি জানতে চেয়েছিল, তিনি চলচ্চিত্র-নির্মাণ দেখতে স্টুডিওতে যান কি না। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'না।' মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন?' তিনি একটু থেমে জবাব দিয়েছিলেন, 'ইচ্ছে হয় না।'

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকাকে মা চিনতেন, কিন্তু তিনি কখনো আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন বলে মনে পড়ে না। যাঁর আসার কথা মনে পড়ে, তিনি সৈয়দা মোতাহেরা বানু—এ কে ফজলুল হকের ভাগ্নে সৈয়দ ইউসুফ আলির স্ত্রী। মোতাহেরা বানু সুলেখক ছিলেন—*সওগাতে* নিয়মিত এবং মাঝেমাঝে *মোসলেম ভারত* ও *মোহাম্মদী*তে কবিতা লিখতেন। তাঁর কন্যা তাহমিনা বানুর সঙ্গে বিয়ে হয় বিখ্যাত নাট্যাভিনেতা মোহাম্মদ জাকারিয়ার।

আমাদের পাড়ায়ই বলা চলে, সৈয়দুর রহমান নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ ছিলেন। তাঁর স্ত্রী মরজিনা খাতুন ছিলেন নজরুল ইসলামের মাতৃসমা মিসেস এম রহমানের বোন। জজ সাহেব ও তাঁর স্ত্রীর রুচি ছিল ভিন্নধর্মী। স্বামী ছিলেন ইসলামের গৌরবগাথায় উৎসাহী এবং উর্দু ও ফারসি সাহিত্যের অনুরাগী; স্ত্রী ছিলেন বাঙালি

সংস্কৃতির প্রেমী এবং কীর্তনের বিশেষ ভক্ত। জজ সাহেবের স্ত্রী (আমাদের বাড়িতে এভাবেই তাঁকে উল্লেখ করা হতো) প্রায়ই তাঁদের গাড়ি এবং চালক সিদ্দিককে নিয়ে আমাদের বাড়ি চলে আসতেন, আর মাকে ও আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন—কখনো গঙ্গার ধারে, কখনো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে, কখনো অন্য জায়গায়। কলুটোলা স্ট্রিটে গিয়ে লাসসি, শরবত বা ফালুদা খাইয়ে তিনি তাতে আমার আসক্তি জাগিয়েছিলেন। কী খাবো, জানতে চাইলেই আমার এক জবাব ছিল, কলুলোটার শরবত—বয়সের স্বল্পতার কারণে বর্ণবিপর্যয় ঘটিয়ে আমি কলুটোলাকে কলুলোটা বলতাম—তাতে আমার ইচ্ছাপূরণে কোনো বাধা হতো না।

অনেককাল পরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পৌত্রীকে আমি যখন বিয়ে করি, তখন তাঁরা স্বামী-স্ত্রী কেউ আর বেঁচে ছিলেন না।

২৬.

আহসান হাবীবের সঙ্গে কীভাবে পরিচয় হয়েছিল, তা বলতে পারি না, তবে সময়টা ছিল বোধহয় ১৯৪৬ সাল। তিনি থাকতেন আমাদের বাসার পেছনেই একতলা একটা বাড়ির এক কামরায়। তাঁর সঙ্গে থাকতেন সাংবাদিক খোন্দকার নূরুল ইসলাম—তিনি ছিলেন খঞ্জ। আহসান হাবীব তখন ছিলেন বোধহয় কলকাতা বেতার কেন্দ্রের স্টাফ আর্টিস্ট—বিদ্যার্থীমণ্ডলীর আসর পরিচালনা করতেন কিংবা ওই আসরে নিয়মিত অনুষ্ঠান করতেন। খোন্দকার নূরুল ইসলাম কাজ করতেন মোহাম্মদ আকরম খাঁ-সম্পাদিত সাপ্তাহিক *মোহাম্মদী* এবং তাঁর পুত্র খায়রুল আনম খাঁ-সম্পাদিত *পয়গামে*। এর কোনো একটিতে তিনি ছোটোদের পাতা সম্পাদনা করতেন। শুনেছি, আহসান হাবীব ও নূরুল ইসলামের পাশের ঘরে থাকতেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন—যিনি পরে নিজের নামের শেষাংশ প্রথমে নিয়ে গিয়েছিলেন। তবে তাঁর সঙ্গে তখন কোনোদিন দেখা হয়েছিল বলে মনে পড়ে না।

কমল ও আমি ঘুরঘুর করতে করতে আহসান হাবীবের কাছে চলে গিয়েছিলাম, তিনিও আমাদের সাদরে টেনে নিয়েছিলেন। দৈনিক *ইত্তেহাদ* বের হলে আহসান হাবীব হলেন এর সাহিত্য-সম্পাদক। তবে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ছিল ওই পত্রিকার ছোটোদের আসর মিতালী মজলিসের পরিচালক মিতাজী বলে। ছোটোদের ওই পাতার সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন মোহাম্মদ নাসির আলী। তিনি সরকারি চাকরি করতেন বলে পত্রিকার সঙ্গে সংস্রব গোপন রাখতেন। তাছাড়া *ইত্তেহাদে* তিনি কাজ করতেন খণ্ডকাল, হাবীব ভাইকে তাই মিতালী মজলিসও খানিকটা দেখতে হতো। সবটা মিলিয়ে আহসান হাবীব একই সঙ্গে সাহিত্য-পাতার সম্পাদক ও ছোটোদের পাতার পরিচালক হিসেবে পরিচয় লাভ করেছিলেন। আমরা তাঁকেই মিতাজী বলে জানতাম। মোহাম্মদ নাসির আলীকে আমি কলকাতায় দেখেছি কিনা নিশ্চিত বলতে পারি না।

আহসান হাবীবের বাসায় ও অফিসে কমল ও আমার অবাধ গতিবিধি ছিল। তাঁর কবিতা তিনি আমাদের পড়ে শোনাতেন অথবা পড়তে দিতেন। তাঁর মুখেই 'হকনামভরসা' ও 'একরারনামা'র মতো কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম, শিশুতোষ 'ভেংচি'

শুনে খুব মজা পেয়েছিলাম। শুধু যে তিনি নিজের কবিতাই আমাদের পড়াতেন, তা নয়, অন্যদের লেখাও পড়তে দিতেন এবং পত্রিকায় প্রকাশের আশায় যাঁরা তাঁর কাছে লেখা পাঠাতেন, তার মধ্যে থেকেও এক-আধটা—সাধারণত কবিতাই—আমাদের হাতে ধরিয়ে লেখাটা কেমন, তা জানতে চাইতেন। একবার স্থির হয়েছিল, বিদ্যার্থীমণ্ডলীর আসরে অংশগ্রহণ করতে কমল ও আমাকে তিনি বেতার-কেন্দ্রে নিয়ে যাবেন। কী এক বিঘ্ন ঘটায় আমাদের সেদিন যাওয়া হয় নি—পরেও আর কখনো হয় নি।

জুলফিকার হায়দার ও রাবেয়া হায়দারের উদ্‌যোগে, ১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি আহসান হাবীবের বিয়ে হয় খাতুন সুফিয়ার সঙ্গে। ভাবির এক আত্মীয়ের বাড়ির ছাদে বিয়ের আসর বসেছিল। কমল আর আমি ছিলাম বরযাত্রীদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। বাসর-শয্যা পাতা হয়েছিল জুলফিকার হায়দারের বাড়িতে।

এরই পাশাপাশি আহসান হাবীব উদ্‌যোগ নিয়েছিলেন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রাত্রিশেষ* প্রকাশের। নিজের লেখার ব্যাপারেও হাবীব ভাই ছিলেন খুঁতখুঁতে। বইয়ের জন্যে একবার যেটা নেন, পরের বারে সেটা বাদ দেন। মনোনীত কবিতার মধ্যে আমার প্রিয় 'হকনামভরসা' ও 'একরারনামা' নেই দেখে তার হেতু জানতে চাইলাম। কবি বললেন, বাকি কবিতার সঙ্গে মেজাজে মিলবে না। কবিতারও যে মেজাজ থাকতে পারে, সেকথা সেই প্রথম জানলাম।

হাবীব ভাই আগেই জানিয়েছিলেন, কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদপট আঁকতে সম্মত হয়েছেন জয়নুল আবেদিন। প্রচ্ছদ হাতে পেয়েই আমাকে দেখাতে এলেন আমাদের বাড়িতে। প্রচ্ছদটা ছিল ছাই আর কালো রঙের। অতোটা কালো আমার ভালো লাগে নি, তা বললাম তাঁকে অকপটে। তিনি মৃদু হাসলেন।

রাত্রিশেষ প্রকাশিত হয়েছিল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উদ্‌যোগে, তাঁর ভাই সৈয়দ নসরুল্লাহ ছিলেন এর প্রকাশক। একটু হলদেটে দামি কাগজে পরিপাটি করে মুদ্রিত হয়েছিল। বইয়ে যদিও প্রকাশকাল 'বৈশাখ ১৩৫৪' লেখা আছে, তবে দেশভাগজনিত অস্থিরতার কারণে এটা বের হতে দেরি হয়েছিল অন্তত আরো মাস ছয়েক। ততোদিনে আমরা কলকাতা ছেড়ে এসেছি।

তার আগে পাড়ার ল্যানসডাউন আর্ট স্টুডিওতে গিয়ে স্মারকচিহ্ন হিসেবে আহসান হাবীবের সঙ্গে কমল ও আমি একটা ছবি তুলেছিলাম। সম্পূর্ণ খরচ হাবীব ভাইয়ের। আশ্চর্যের বিষয়, সেই ছবি বহুকাল সযত্নে রেখে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন তিনি। অনেক বছর আগে সাপ্তাহিক *বিচিত্রা* যখন তাঁকে নিয়ে একটা প্রচ্ছদ-কাহিনী রচনা করে, তখন তাতে ওই ছবিটা তিনি মুদ্রণযোগ্য বিবেচনা করেছিলেন।

ইত্তেহাদে আমার কোনো লেখা ছাপা হয় নি, সে-চেষ্টাই করি নি। কমল বলে, ওর একটা গল্প হাবীব ভাই ছেপে দিয়েছিলেন মিতালী মজলিসে আর পত্রিকার জন্য সেটা হাতে নকল করে দিয়েছিলাম আমি। সেকথা আমি বেমালুম ভুলে গেছি। যা ভুলি নি, তা এই যে আমাদের দুজনের কাছেই আহসান হাবীব নায়কের মর্যাদায় প্রথম অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

২৭.

১৯৪৭ সালটা আমাদের পরিবারের জন্যেও ছিল খুব ঘটনাবহুল। মেজোবুর বিয়ের দুবছর পরে ঠিক একই তারিখে—২৮ ফেব্রুয়ারি—ছোটোবুর বিয়ে হয়ে গেল। নবম শ্রেণীর ছাত্রী থাকা অবস্থায় বড়োবুর বিয়ে হয়েছিল; বিয়ের সময়ে মেজোবু পড়তো অষ্টম শ্রেণীতে। আর ছোটোবু মাইনর পরীক্ষা পাশ করে ঘরে শুয়ে-বসে বই পড়ে দিন কাটাচ্ছিল। তার ষোলো বছর বয়স আসন্ন। বিয়ে দেওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। আব্বা-মা পাত্র খুঁজতে লাগলেন ভেতরে ভেতরে। বেশি খুঁজতে হলো না। আব্বার নিয়মিত মক্কেলদের একজন ছিলেন এ কে ফজলুল হকের জুনিয়র এ এম সায়েম (পরে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ও রাষ্ট্রপতি)। তিনি জানালেন, বিবাহযোগ্য এক দূরসম্পর্কীয় ভাগ্নে আছে তাঁর—নাম সৈয়দ দেলওয়ার হোসেন, বাড়ি যশোর শহরের সংলগ্ন ঘোপ গ্রামে, দৌলতপুরের বি এল কলেজ থেকে বি এ পাশ করে কলকাতায় চাকরি করছেন সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেন্টে, ঊর্ধ্বতন সহকারী পদে। যথাসময়ে শুভকর্ম হয়ে গেল। বিয়ের পর জানা গেল, তিনি ভোজনরসিক, ইংরেজি ভাষার ভুল সম্পর্কে অসহিষ্ণু, বংশগৌরবপ্রবণ এবং সে-কারণে বাংলার সৈয়দদের বংশানুক্রম তাঁর মুখস্থ। কে খাঁটি বা কে নকল সৈয়দ, তা তাঁর নখদর্পণে। তাছাড়া, তিনি কিঞ্চিৎ বর্ণবিদ্বেষীও। তাঁর পিতা সৈয়দ আবুল হোসেন ছিলেন অতিশয় গৌরবর্ণ, কিন্তু মা কালো ছিলেন বলে দুলাভাইয়ের রং হয়েছিল শ্যামলা। এটা তিনি তাঁর প্রতি মায়ের অবিচার বলে গণ্য করেছিলেন। ভাগ্যিস ছোটোবু ছিল ফরসা, নইলে বিয়েই হতো না।

বিয়ের পরে ছোটোবু-দুলাভাই আমাদের সঙ্গেই থাকতে লাগলেন। ওদিকে কিছুকাল আলাদা সংসার করার পরে বড়োদুলাভাই এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে ইনসপেক্টর পদে উন্নীত হয়ে বু এবং তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে গেলেন নতুন কর্মস্থল দিনাজপুরে। সেখানেও বিজলি বাতি, কলের পানি এবং মাখন-রুটি থেকে তাঁরা বঞ্চিত হলেন। একই সময়ে জানা গেল, অচিরেই আমার ভাই বা বোন জন্মাতে যাচ্ছে। দশ বৎসর কালের ব্যবধানে মায়ের সন্তানসম্ভবা হওয়ার ঘটনা নিকটজনদের মধ্যে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

২৮.

দেশের অবস্থারও দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল এ-সময়ে। প্রথমে শোনা গেল, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়ে ইংরেজরা বিদায় নেবে। পাকিস্তান হবে, না ভারত অবিভক্ত রয়ে যাবে, সেটা তখনো স্পষ্ট ছিল না। মার্চের শেষে বড়োলাট লর্ড ওয়াভেল দেশে ফিরে গেলেন একেবারে, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। তারপর জানা গেল, আমাদের স্বাধীনতালাভের ক্ষণ এগিয়ে আসছে—১৯৪৮ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না—যদিও এর ভালোমন্দ ঠিক বোঝা গেল না। জুনের ৩ তারিখে বেতারে ভাষণ দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন মাউন্টব্যাটেন। তাঁর ভাষণের পরে একে একে বক্তৃতা দিলেন নেহরু, জিন্নাহ্ ও সর্দার বলদেব সিং। তখন বড়োদুলাভাইয়ের রেডিওগ্রামটা আবার ফিরে এসেছে

আমাদের কাছে। তার তিনপাশে জড়ো হয়ে বসে আমরা সবাই বক্তৃতা শুনলাম। নেহরুর 'জয় হিন্দ্ এবং জিন্নাহ্‌র 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ছাড়া আমি তো আর কিছুই বুঝলাম না। বক্তৃতাপর্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আব্বা বললেন, পাকিস্তান হবে, তবে সেই সঙ্গে পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ হয়ে যাবে। ভাগ হয়ে যাওয়ার মর্মও উপলব্ধি করতে পারলাম না, তবে পাকিস্তান যে হবে, তাতেই খুশি।

তারপর থেকে আব্বার ডাক্তারখানায় অবিরাম আলোচনা চলতে লাগলো। কেউ খবর আনেন, কেউ বয়ে আনেন গুজব, আমি তার ছিটেফোঁটা পাই মাত্র। একবার শোনা গেল, বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের সিদ্ধান্ত পাকাপাকি হয়ে গেছে; আরেকবার শোনা গেল প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম আর কংগ্রেস-নেতা শরৎচন্দ্র বসু ও কিরণশঙ্কর রায় মিলে চেষ্টা করছেন বঙ্গদেশকে অখণ্ড রাখার। এই প্রস্তাব গৃহীত হলে বাংলা আলাদা থাকবে—পাকিস্তান বা ভারত কোনোটারই অন্তর্ভুক্ত হবে না। এতে কেউ তুষ্ট হলেন—বাংলা অন্তত ভাগ হবে না; কেউ রুষ্ট হলেন—তাহলে আমরা পাকিস্তানে থাকতে পারবো না। এক সময়ে শোনা গেল, জিন্নাহ্-গান্ধি ওই প্রস্তাবে নিমরাজি—তাঁরা চেষ্টা করে দেখতে বলেছেন নেতাদের। আবার শোনা গেল, হিন্দুরা—হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং কিছু কংগ্রেস-নেতাও—চাইছেন না বাংলা অখণ্ড থাকুক। কেউ বঙ্গভঙ্গের দায় হিন্দুকে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, কেউবা দুঃখের শ্বাস ফেললেন বাংলা বিভক্ত হচ্ছে বলে। শেষ পর্যন্ত, আকরম খাঁ-নাজিমউদ্দীন উপদলের মুসলিম লীগ নেতারা যুক্তবঙ্গের বিপক্ষে গেলেন, গান্ধি-জিন্নাহ্‌ও একে অবাস্তব বলে মনে করলেন।

বাংলা ও পাঞ্জাব কীভাবে বিভক্ত হবে, তার জন্যে সার্ সিরিল র‍্যাডক্লিফকে চেয়ারম্যান করে বাউন্ডারি কমিশন গঠিত হলো। চেয়ারম্যান একজন থাকলেও প্রকৃতপক্ষে দুটি কমিশন হলো—একটি পাঞ্জাবের জন্যে, একটি বাংলার জন্যে। উভয় ক্ষেত্রেই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ-মনোনীত দুজন করে বিচারপতি কমিশনের সদস্য হলেন। তখন সংবাদপত্রে তাঁদের নাম পড়লেও মনে রাখতে পারি নি, পরে জেনেছিলাম, বাংলার বাউন্ডারি কমিশনের সদস্য ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের তিন বিচারপতি—চারুচন্দ্র বিশ্বাস, বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় ও এ এস এম আকরম এবং পাঞ্জাব হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত বিচারপতি এস এ রেহমান। পাকিস্তান বা ভারতে সংযুক্ত হওয়ার জন্যে বিভিন্ন এলাকার দাবি সম্পর্কে এঁরা সওয়াল-জবাব শুনলেন। মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে যুক্তি প্রদর্শন করতে নিযুক্ত করা হয় মোহাম্মদ ওয়াসিম নামের একজন বিহারি আইনজীবীকে। তাঁর নাম তখনই মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। কেননা আব্বা এবং তাঁর অনেক বন্ধুরা এই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন যে, বাংলার ভূগোল সম্পর্কেই তাঁর ধারণা অস্পষ্ট, তিনি কী করে আমাদের হয়ে লড়বেন? মুসলিম লীগ যদি এই কাজে ফজলুল হককে নিয়োগ করতো, তাহলে আমরা অনেক লাভবান হতাম।

মুসলিমপ্রধান জেলা পাকিস্তানে এবং হিন্দুপ্রধান জেলা ভারতে যাবে বলে ব্রিটিশ সরকার স্থির করেই রেখেছিলেন। কোনো কোনো জেলার কিছু অংশ নিয়ে সমস্যা ছিল, ভৌগোলিকভাবে কোনটা সংগত হয় তা নিয়ে প্রশ্ন ছিল এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা

সম্পর্কে কংগ্রেস-মুসলিম লীগের মধ্যে প্রবল মতপার্থক্য ছিল। আব্বা খুবই চাইছিলেন যে, চব্বিশ পরগণা পাকিস্তানের ভাগে যাক, কিন্তু তিনি মনে মনে বুঝছিলেন যে, সেটা সম্ভবপর হবে না। তবে তিনি সত্যিই আশা করেছিলেন যে, তাঁর আবাল্যের শহর কলকাতা পাকিস্তানে পড়বে অথবা সেখানে পাকিস্তানের কিছু কর্তৃত্ব থাকবে। তিনি প্রায়ই দুঃখপ্রকাশ করছিলেন যে, কলকাতাকে পাকিস্তানে রাখার চেষ্টা না করে মুসলিম লীগ নেতারা প্রধানমন্ত্রিত্বের জন্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছেন। আব্বার বন্ধু খান বাহাদুর মাহবুবউদ্দীন আহমদ সরকারি বিষয়সম্পত্তির বিভক্তি সংক্রান্ত কোনো কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে শুনে আব্বার ধারণা হয়েছিল যে, মুসলিম লীগ নেতারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যথাযথ মনোযোগ দিচ্ছেন না।

বড়োবুর শ্বশুরবাড়ি ফরিদপুর ও ছোটোবুর শ্বশুরবাড়ি যশোর পাকিস্তানভুক্ত হবে, এ বিষয়ে যেমন কারো সন্দেহ ছিল না, তেমনি মেজোবুর শ্বশুরবাড়ি খুলনা ভারতভুক্ত হবে বলে সবাই ধরে নিয়েছিল। তাতে আমাদের দুঃখের মাত্রা বেড়েছিল।

অতঃপর জানা গেল, ১৪ আগস্ট দিবাগত রাত্রির মধ্যভাগে সেই মূল্যবান স্বাধীনতা আমরা লাভ করবো। সঙ্গে সঙ্গেই রটে গেল, পাকিস্তান-হিন্দুস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যাবে। ওই সময়টাই মায়ের সন্তানপ্রসবের কাল। সবাই পরামর্শ দিলেন কলকাতার বাইরে চলে যেতে। কোথায় যাওয়া যায়, কোন মুসলমানপ্রধান এলাকায়? শেষ পর্যন্ত স্থির হলো, ছোটোবুর শ্বশুরবাড়ি যশোরে যাওয়া হবে। দুলাভাই ছোটোবুকে কদিন আগেই যশোরে রেখে এলেন। পরে আব্বা, মা ও আমি গেলাম। মেয়েরা মায়ের বাড়িতে আসে সন্তানপ্রসব করতে। মেয়ের বাড়িতে—তাও তার শ্বশুরবাড়িতে—ওই উদ্দেশ্যে মায়ের যাওয়া হয়তো একেবারেই দৃষ্টান্তহীন ঘটনা।

২৯.

যশোর তখন ছিমছাম একটা ছোটো শহর। কোর্ট-কাছারি, কলেজ-পাবলিক লাইব্রেরির বাইরে দ্রষ্টব্য একটাই—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ব্যবহৃত একটা বিমান-অবতরণ ক্ষেত্র। পরিত্যক্ত বিমানক্ষেত্রে একটা পরিত্যক্ত বিমানও পড়ে ছিল। তাতে অবাধে উঠে প্রথমবারের জন্যে উড়োজাহাজের ভেতরটা দেখা গেল। ছোটোদুলাভাইদের বাড়ির পাশেই হাসপাতাল—তার সন্নিহিত লাশকাটা ঘর দেখিয়ে দিতে কেউ ভুল করতো না। দড়াটানায় ভালো মিষ্টির দুটি দোকান ছিল—সেখান থেকে দই-মিষ্টি কেনা ছিল অপরিহার্য।

এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আমার কিছু করার ছিল না। ছোটোবুর শ্বশুর একদিন পুকুরপাড়ে ছিপ নিয়ে বসেছেন, মাছধরা কখনো দেখি নি বলে আমিও একরাশ কৌতূহল নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। তিনি জানতে চাইলেন, আমি কোন ক্লাসে পড়ি। ক্লাস সেভেন শুনে তিনি আমাকে প্রথমে ছিপ ও তারপরে বড়শির ইংরেজি জিজ্ঞাসা করলেন। আমি কোনোটাই বলতে না পারায় বিরক্তমুখে আমার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন : 'তোমার কিসসু হবে না।' তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয় নি।

ওঁদের বাড়ির সামনে দুলাভাইয়ের চাচাতো ভাই আলী ইমাম থাকতেন। তাঁদের

ভাড়াটে ছিল যে-পরিবার, সেখানে যেতে আমার খুব ভালো লাগতো। ওই পরিবারের সন্তান নূরুল আলম পরে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক হয়েছিলেন, তবে বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছিলেন প্রবাসে অধ্যাপনা করে। তাঁর ছোটো ভাইয়ের—পরবর্তী জীবনে চিকিৎসক ডা. আলমের—সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। আমরা দুজনে মিলে আরেক প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়েছিলাম। গৃহকর্ত্রী একই মাটির থালায় আমাদের দুজনকে খেতে দিয়েছিলেন মেখে খাওয়ার মতো খাবার—আমি খেতে পারি নি, এ-ধরনের অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। ছোটোদুলাভাইয়ের ভাগ্নে রাজু তখন নিতান্তই শিশু—পরে অবশ্য সে যশোর পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং আওয়ামী লীগ-দলীয়—সংসদ সদস্য হয়েছিল।

এক বৃষ্টির দিনের কথা মনে পড়ে। আমরা ঘরের মধ্যে, জানলা সব বন্ধ, দরজাও বন্ধ করা উচিত। এমন সময়ে দেখা গেল, এক যুবক কাছা দিয়ে লুঙ্গি পরে, খালি গায়ে, মাথায় গামছা বেঁধে রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দৌড়ে যাচ্ছে, আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে : 'আজকে—খিচুড়ি খাওয়ার—দিন।' জানা গেল, তার মাথায় একটু গোলমাল আছে, তবে বৃষ্টি হলে ঘর থেকে বেরিয়ে সে পাড়া-প্রতিবেশীকে যথাকর্তব্য মনে করিয়ে দিতে ভোলে না।

আমরা ৭ আগস্ট কলকাতা থেকে যশোরে গিয়েছিলাম। ১৩ আগস্টে আমার ছোটোভাই আখতারের জন্ম হলো। ১৪ ও ১৫ তারিখ নির্বিঘ্নে কেটে গেল। কলকাতায় কোনো গোলমাল হলো না, অনেক জায়গায় নাকি হিন্দু-মুসলমান একযোগে আনন্দোৎসব করলো। ১৫ তারিখে খুলনায় ভারতীয় পতাকা এবং মুর্শিদাবাদে পাকিস্তানের পতাকা তোলা হলো। দিন দুই পরে বাউন্ডারি কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে খুলনা পাকিস্তানভুক্ত এবং মুর্শিদাবাদ ভারতভুক্ত হলো। আমলারা নতুন করে আনুগত্যের শপথ নিলেন।

১৪ আগস্টে যশোরে কীভাবে স্বাধীনতার উৎসব পালিত হলো, তার কোনো স্মৃতি আমার নেই। আমরা ২১ আগস্ট কলকাতায় ফিরে এলাম। অল্পদিনের মধ্যে টের পেলাম, যশোর থেকে শুধু ভাই নিয়ে ফিরি নি, ম্যালেরিয়াও সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

৩০.

যশোর থেকে ফিরে আসার পরেই, মনে হয়, আমার মামাতো বোন হালিমা—সেও বোধহয় তখন আমারই মতো সপ্তম শ্রেণীতে পড়তো—একদিন এক পত্রিকা হাতে নিয়ে এলো আমাদের বাড়িতে। বললো, 'সুকান্ত মারা গেছে, জানো?'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে সুকান্ত?'

'সুকান্ত ভট্টাচার্য—কবি। তুমি পড়ো নি তার কবিতা?'

আমার অজ্ঞতা কবুল করলাম।

হালিমা বললো, 'এই পত্রিকায় তার দুটো কবিতা আছে। বেচারা মোটে কুড়ি বছর বয়সে মারা গেলো।'

সুকান্তের কবিতা সেই প্রথম পড়লাম। ভালো লাগলো। আর বড়ো মায়া হলো অকালপ্রয়াত মানুষটির জন্যে।

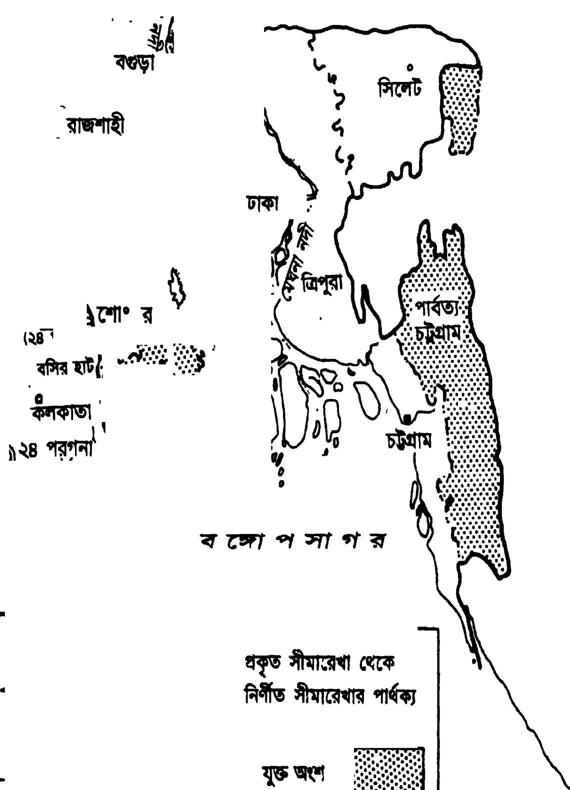
আসাম ও বঙ্গের বিভাজন সীমারেখা

(ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭ অনুসারে নির্ণীত প্রথম আন্তর্জাতিক সীমারেখা
এবং সীমানা কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত প্রকৃত সীমারেখা)

৫০ ১০০ মাইল

স্কেল

আসাম



সূচক

প্রকৃত আন্তর্জাতিক সীমারেখা
(সীমানা কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত)

নির্ণীত আন্তর্জাতিক সীমারেখা
(ভারতীয় স্বাধীনতা আইন
১৯৪৭ অনুযায়ী ১৪ই আগস্টের পূর্বে)

প্রাদেশিক সীমারেখা

জেলা সীমারেখা

নদী

কলকাতা থেকে আমরা যশোরে গিয়েছিলাম ব্রিটিশ ভারতের এক মহানগর থেকে অন্য শহরে, ফিরে এলাম সার্বভৌম পাকিস্তান থেকে স্বাধীন ভারতে। সেই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে অনেক কথা শুনতে পেলাম। ভারতের গভর্নর-জেনারেল হলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন, পাকিস্তানের জিন্নাহ্। কারো মতে, এতেই স্পষ্ট হয়েছে যে, পাকিস্তান যথার্থ স্বাধীন দেশ, ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে গাঁটছড়া খুলতে পারে নি ভারত। কেউ বললেন, এসবই কংগ্রেসের কারসাজি; মাউন্টব্যাটেনকে গভর্নর-জেনারেল রেখে তারা ব্রিটিশের কাছ থেকে সুবিধে আদায় করে নেবে। একবার কথা হয়েছিল, কিছুকাল মাউন্টব্যাটেন দুই দেশেরই গভর্নর-জেনারেল থাকবেন—জিন্নাহ্ এ-প্রস্তাবে সায় দেন নি। কারো বক্তব্য, এতে ভারত বাড়তি সুবিধে নিতে পারতো না—কিন্তু জিন্নাহ্ নিজে গভর্নর-জেনারেল হতে চান বলে এই ব্যবস্থা মানলেন না; অথচ দেখো গান্ধিকে, দেশ স্বাধীন করেও তিনি কোনো পদে অধিষ্ঠিত হলেন না। অপরপক্ষের প্রশ্ন, দুই স্বাধীন দেশের একই রাষ্ট্রপ্রধান থাকবে কেন—জিন্নাহ্ যা করেছেন, ঠিকই করেছেন।

কলকাতায় ফেরা অবধি আমাদের বাড়িতে মুখ্য আলোচ্য বিষয়—আমরা কলকাতায় থেকে যাবো, না পাকিস্তানে চলে যাবো। বড়োদুলাভাই ও ছোটোদুলাভাই সরকারি চাকরিতে অপশন দিলেন পাকিস্তানে থাকবেন বলে। প্রথমজন দিনাজপুরেই রয়ে গেলেন, আগস্টের শেষে ঢাকায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন অপরজন। এখন আমরা কী করি?

মায়ের ইচ্ছের জোরে আব্বা একবার বসিরহাট থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে এসেছিলেন কলকাতায়, কিন্তু সেটা দেশান্তরী হওয়ার ব্যাপার ছিল না, বয়সও তখন তাঁর কম ছিল। এখন যখন পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করেছেন, তখন নতুন করে জীবন আরম্ভ করার প্রয়াস হবে ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু এবারেও মায়ের ইচ্ছে—শুধু ইচ্ছে নয়, চাপও—পাকিস্তানে যেতে হবে। আব্বার চেনাজানা সরকারি চাকুরেরা বেশির ভাগ পাকিস্তানে চলে গেছেন, যাচ্ছেন অথবা যাবেন। আমরা আর থাকি কেন? আব্বা গুড়গুড়ি টানেন, মায়ের কথা শোনেন, আর ভাবেন।

তাঁর পরিচিত সাংবাদিকেরা সকলেই রয়ে গেছেন কলকাতায়—মুসলমান-সম্পাদিত মাসিকপত্র, সাপ্তাহিক কাগজ কী দৈনিক পত্রিকা কোনোটাই স্থানান্তরিত হয় নি। আগস্টে যে-রকম দাঙ্গা হবে বলে গুজব রটেছিল, তার কিছুই হয় নি। কলকাতায় যে মুসলমানেরা থাকছে না, তা তো নয়। বস্তুত ভিটেমাটির প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু কলকাতা? এখানে তিনি আবাল্য গড়ে উঠেছেন, এর সঙ্গে তাঁর নাড়ির যোগ, এতো স্বাচ্ছন্দ্য আর কোথাও তিনি বোধ করেন না। এর মায়া কাটিয়ে যাবেন কোথায়?

মা বলে, ছেলেদুটির ভবিষ্যৎ পাকিস্তানেই। পাকিস্তান তো হয়েছেই আমাদের ছেলেরা যাতে বেশি সুযোগ-সুবিধা পায়, সেজন্যে। কলকাতায় রয়ে গেলে তারা কি তা পাবে? তাছাড়া, আব্বার চেনাজানা অনেকেই চলে গেছেন ঢাকায়, আরো অনেকে যাবেন। ঢাকায় গিয়ে প্র্যাকটিস করতে মোটেই অসুবিধে হবে না তাঁর। বরঞ্চ কলকাতায় থেকে গেলেই পুরোনো পসার হারিয়ে নতুন করে তা জমাতে হবে।

কিন্তু ঢাকায় যাওয়া মানে তো পদ্মা পেরিয়ে যাওয়া—সে কি আর চাট্টিখানা কথা! 'বাঙাল'দের সম্পর্কে মনের মধ্যে একটা অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধার ভাব ছিল আব্বার, সেটা

মাঝে মাঝেই প্রকাশ পেতো। আমরা যখন মনে করিয়ে দিতাম যে, দুলাভাইরা সব বাঙাল, তিনি আপত্তি করে বলতেন, ওরা তো সবাই প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের। যদি বলা হতো, বড়োদুলাভাই তো ফরিদপুরের লোক—খাস বাঙাল, আব্বা বলতেন, বড়োদুলামিয়ার কথা আলাদা। বস্তুত বড়োদুলাভাইয়ের প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ ভালোবাসা ও নির্ভরতা—তিনি তাঁকে জ্ঞান করতেন জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে—আমরাও তাঁকে সেভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পরামর্শের জন্যে বড়োদুলাভাইকেই আগে ডেকেছেন, আর তা নিয়ে আমাদের পরিবারে কেউ কখনো মন খারাপ করেনি। বড়োদুলাভাইও সে-সময়ে চিঠি লিখে জানালেন, ঢাকায় চলে যাওয়াই শ্রেয়।

আব্বা একবার গেলেন এ কে ফজলুল হকের সঙ্গে কথা বলতে। বছরখানেক আগে তিনি ফিরে এসেছেন মুসলিম লীগে (সেদিন তাঁর বাড়ির সামনে যে-আনন্দোৎসব দেখেছিলাম, তা মনে রাখার মতো; তবে তার কিছুকাল আগে মুসলিম ছাত্রলীগের কর্মীরা তাঁকে গালমন্দ করে পচা ডিম আর ঢিল ছুঁড়েছিল তাঁর বাড়িতে, সে কথাও মনে পড়ছিল)—কিন্তু ঠিক কলকে পাচ্ছেন না। ফজলুল হকের কাছ থেকে আব্বা ফিরে এসেছিলেন এই ধারণা নিয়ে যে, তিনি পাকিস্তানে যাবেন বটে, তবে কবে যাবেন, তা স্থির করেন নি। ওদিকে সোহ্‌রাওয়ার্দী হয়েছেন গান্ধির সার্বক্ষণিক সহচর। ১৫ আগস্ট অর্থাৎ স্বাধীনতা-দিবস থেকে গান্ধি কলকাতায় আছেন—সাম্প্রদায়িক শান্তিরক্ষা করার লক্ষ্যে। সোহ্‌রাওয়ার্দী যোগ দিয়েছেন তাঁর সঙ্গে। এ নিয়েও প্রতিক্রিয়া মিশ্র। কেউ বলেছেন, ক্ষমতাসীন হতে না পেরে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এখন গান্ধির কৃপাভিখারি। অন্যেরা বলছেন, কলকাতার—শুধু কলকাতার নয়, পশ্চিমবঙ্গের—মুসলমানদের বাঁচানো, তাঁদের স্বার্থরক্ষাই তাঁর উদ্দেশ্য, নিজের জন্যে তিনি কিছুই চাইছেন না। একবার শোনা গেল, সোহ্‌রাওয়ার্দীকে হিন্দু তরুণদের কয়েকজন আঘাত করার চেষ্টা করেছে—অবশ্য তেমন কিছু হয় নি। তারপর জানা গেলো, বেলেঘাটায় গান্ধি যেখানে থাকছিলেন, সেখানে হিন্দু মহাসভার যুবকেরা আক্রমণ চালিয়েছে—তাদের লক্ষ্য ছিল গান্ধিকে হত্যা করা—কিন্তু সে-আক্রমণ বিফল হয়েছে।

প্রায় এর সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। তিন-চারদিন একটানা চললো দাঙ্গা, তা রোধ করা গেল না। শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত গান্ধি অনশন করলেন; সোহ্‌রাওয়ার্দী ছুটে বেড়ালেন দাঙ্গা-উপদ্রুত এলাকায়; সরকারের ভেতরের ও বাইরের রাজনৈতিক নেতাদেরও কেউ কেউ চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। এক জায়গায় দাঙ্গা থামাতে গিয়ে এবং আরেক জায়গায় কয়েকজন মুসলমান মেয়েকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিলেন দুই হিন্দু ভদ্রলোক।

দাঙ্গা থামতে না থামতে আমি জ্বরে আক্রান্ত হলাম। অচিরেই জানা গেল, ম্যালেরিয়ায় ধরেছে—যশোরের বনেদি ম্যালেরিয়া। জ্বর বেশি হলে ঘোরের মধ্যে আমি দেখতাম, ব্রাইট স্ট্রিট দিয়ে গাড়ি করে শিখরা আসছে আমাদের মারতে। আমি চিৎকার করে উঠতাম, 'শিখ আসছে, শিখ আসছে।' ঘোর কাটাবার চেষ্টায় আমার শরীর ঝাঁকিয়ে মা বলে, 'না, শিখরা আসছে না; কোনো গোলযোগ হচ্ছে না; আমরা নিরাপদে আছি।' আমি ঘুমিয়ে পড়ি। তারপর আবার এক সময়ে চিৎকার করি, 'শিখ আসছে, শিখ আসছে।'

সেপ্টেম্বরের গোড়ায় কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং তারপর জ্বরাক্রান্ত আমার প্রলাপ—এ দুইই আব্বার মন স্থির করে দিলো পাকিস্তানে আসতে। অসুখ থেকে উঠে আমি আব্বার ডাক্তারখানায় বেশির ভাগ সময় কাটাই। কেন জানি না স্কুলে যেতে হচ্ছিল না। বোধহয় স্বাধীনতার পরে শিক্ষকদের জায়গা-বদলের পালা চলছিল বলে। আব্বার কাছে একেক জন আসেন একেক রকম খবর অথবা গুজব নিয়ে। দিল্লি শহরে এবং বিভক্ত পাঞ্জাবের উভয় অংশে ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয়েছে। হিন্দু ও শিখরা মুসলমান নারীদের উলঙ্গ করে দলেবলে হাঁটিয়ে নিয়ে গেছে সদর রাস্তা দিয়ে; শিশুদের ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে অগ্নিকুণ্ডে; স্তন কেটে নেওয়া হয়েছে মেয়েদের; আর পুরুষ হলে তাৎক্ষণিক মৃত্যু (পরে কৃষণ চন্দর, খাজা আহমদ আব্বাস ও সাদাত হাসান মান্টোর গল্পে এ ধরনের ঘটনারই বিবরণ পড়েছিলাম)।

এসব কথা বলার সময়ে কথকেরা আমার উপস্থিতি গ্রাহ্য করেন না। আব্বা সাধারণত আমাকে ভেতরে চলে যেতে বলেন; কখনো কখনো আমাকে কিছু বলতে গিয়ে মাথা নিচু করে থাকেন। তিনি অহর্নিশি ভাবেন। বেনজীর আহমদকে ডেকে জানতে চান, ঢাকা শহরটা কী রকম? সেখানে রুটি-মাখন পাওয়া যায়? বিজলি বাতি-কলের পানি কতোদূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত? ট্রাম-বাস ছাড়া লোকে চলাচল করে কী করে?

শেষ পর্যন্ত একদিন সিদ্ধান্ত নেন আব্বা : আমরা পাকিস্তানেই যাবো, তবে বিশাল পদ্মা পেরিয়ে সুদূর ঢাকায় নয়, আমরা যাবো নিকটবর্তী খুলনা শহরে। খুলনায় যাওয়া স্থির করলেন তিনটি কারণে : শহরটা কলকাতার কাছে; সেখানে আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজন আছেন; আর—আল্লাহ্ না করুন—যদি কোনো কারণে পাকিস্তান না টেকে, তবে ফিরে আসা সহজ হবে।

ওই সেপ্টেম্বরেই এক সকালে আব্বা খুলনায় গিয়ে ফিরে এলেন রাতে। কথা বলে এলেন মেজোদুলাভাই আর মেজোখালুর সঙ্গে। আমাদের খুলনায় যাওয়ার প্রস্তাব তাঁর সমর্থন করলেন সোৎসাহে। কিন্তু মেজোদুলাভাই তখনো নিজেদের গ্রাম বয়রায় থাকেন—এখন সেটা শহরেরই অংশ, কিন্তু তখন মনে হতো শহর থেকে বেশ দূরে—তাই সেখানে আমাদের ওঠার প্রশ্ন উঠলো না । স্থির হলো, খুলনা শহরের মুনশিপাড়ায় খালুর বাড়িতে এসে উঠবো আমরা। তারপর আব্বা ফিরে যাবেন কলকাতায়, সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে চলে আসবেন। তখন আমরা খুঁজে নেবো নিজস্ব বাসস্থান।

সে-সময়ে গুজব রটেছিল যে, পাকিস্তান-যাত্রী অনেক পরিবার লাঞ্ছিত হচ্ছে কিংবা তাদের জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আব্বা এ-খবরে বড়োই ভয় পেয়ে গেলেন। রেলে আমাদের জন্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর আসন রিজার্ভ করা হলো বটে, কিন্তু এ টি এম মোয়াজ্জমের জায়গায় তিনি নিজের নাম দিলেন এ এম এম মজুমদার। ওই উপাধিধারী হিন্দু হতে পারেন, মুসলমানও হতে পারেন—অতএব, সরাসরি আক্রান্ত হওয়ার ভয় কম। আমাকে কদিন ধরে তালিম দেওয়া হলো—ট্রেনে যাতে আব্বা বলে সম্বোধন না করি, যেন পানি খেতে না চাই। মাকে তো মা-ই বলি, তাতে সমস্যা নেই।

১৯৪৭ সালের ১৫ অক্টোবর সকালে ৭এ কংগ্রেস একজিবিশন রোড ছেড়ে ট্যাকসি করে আব্বা, আমি এবং আখতারকে কোলে নিয়ে মা—এই চার প্রাণী ভয়ে ভয়ে এলাম

শিয়ালদা স্টেশনে। রেলের কামরায় উঠে মা আবার অর্থপূর্ণ ইশারা দিলেন আমাকে। সহযাত্রীরা আব্বাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় আমরা যাচ্ছি, কলকাতায় কোন অঞ্চলে থাকি, কেন যাচ্ছি, কতোদিনের জন্যে। আব্বা অবলীলাক্রমে মিথ্যে বলে গেলেন। সত্যটা কী, তা জানতাম বলেই যে আমার কানে সেগুলো মিথ্যে ঠেকলো, তা নয়। মিথ্যে বলায় আব্বার পটুত্বের অভাব ছিল অথবা সেদিন তিনি এতোই সন্ত্রস্ত ছিলেন যে, তাঁর বলাটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছিল না। আমার যতোদূর মনে পড়ে, তিনি বলেছিলেন, আমরা কলকাতায় এনটালি অঞ্চলে (হিন্দু-মুসলমান এলাকার সন্ধিস্থলে) থাকি; মা যাচ্ছে তার দিদির বাড়িতে খুলনায় (অর্ধসত্য); যদিও এটা কলকাতা ছাড়ার উপযুক্ত সময় নয়, তবু এমনই পারিবারিক একটা ব্যাপার যে, তার না গিয়ে উপায় নেই (মিথ্যে); অবশ্য তিনি আমাদের পৌঁছে দিয়ে পরদিনই ফিরে আসবেন কলকাতায় (এ কথাটা সত্য)।

কিন্তু সবকিছু ভণ্ডুল করে দিলাম আমি। আব্বাকে আব্বা বলে ডাকলাম না বটে, তবে পিপাসা পেতেই পানি খেতে চাইলাম। যে-তীর ছোঁড়া হয়ে গেছে, সে কি আর ফিরে আসে? সহযাত্রীরা পরস্পর তাকাতাকি করতে থাকলেন, রেলগাড়ির জানলা দিয়ে আব্বা তাকিয়ে রইলেন বাইরে, মা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আখতারকে নিয়ে।

বলা বাহুল্য, আব্বার ভয়টা ছিল অহেতুক। তবে অন্য একটা ব্যাপার ঘটেছিল। আব্বা এবং মায়ের দুটো বড়ো প্রতিকৃতি—আলোকচিত্র—বাঁধাই করে নিয়ে আমরা চলেছিলাম। যাত্রীরা কোনো কারণে একটু চাপাচাপি করলেই আব্বা বলছিলেন, কাচ—কাচ—কাচ ভেঙে যাবে। হয়তো কেউ ভেবেছিলেন, বেলজিয়াম গ্লাসের দামি আয়না নিয়ে যাচ্ছি আমরা। খুলনা স্টেশনে ট্রেন থামামাত্রই ও-দুটোর একটা—মায়েরটা—কে যেন ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। 'ধর ধর' বলেও কোনো লাভ হলো না। এ ছাড়া আমাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় নি।

সন্ধ্যার পর, রাতই বলা যেতে পারে, আমরা খালুর হোগলা দিয়ে ছাওয়া দু-কামরার মাটির ঘরে গিয়ে পৌঁছোলাম। হারিকেনের আলোয় আমাদের অভ্যর্থনা হলো। তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে যে-ঘরটা আমাদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে তক্তপোশে শুয়ে পড়লাম।

আমরা পাকিস্তানে এলাম।



অন্য কোনোখানে

খুলনা শহর তখন ছবির মতো—ঝকঝকে তকতকে। তিন-চারটি প্রধান রাস্তা—তেমন চওড়া নয়, তবে মসৃণ, পিচ দিয়ে ঢাকা আর খুব পরিচ্ছন্ন। তার ওপর দিয়ে অত্যন্ত শস্তা ভাড়ায় সাইকেল-রিকশা (যার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় আগের বছর যশোরে) চলে, তবে শহরের সীমা ছাড়িয়ে না যেতে চাইলে তাতে চড়ার খুব বেশি দরকার হয় না। রাস্তায় বিদ্যুতের বাতি আছে—গ্যাসের আলো নয়; কিন্তু বিদ্যুতের সরবরাহ তেমন সম্প্রসারিত নয়। নানা জায়গায় পানির কল বসানো আছে—তবে পানির স্বাদ আগন্তুকদের কাছে একটু লবণাক্ত মনে হয়। সুপরিসর পার্ক আছে একটা—তখন তার নাম ছিল গান্ধি পার্ক, এখন বার দুই নাম পাল্‌টে সেটা হয়েছে হাদিস পার্ক। পার্কের মাঝখানে বসবার একটা পাকা ও আচ্ছাদিত জায়গা ছিল। সেই চত্বরের মাথায় মাইক্রোফোন ও লাউড স্পিকারের সাহায্যে রেডিও পাকিস্তানের সংবাদ-বুলেটিন শোনানো হতো এবং তা শুনতে বেশ ভিড় জমতো। আমিও তা শুনতে যেতাম প্রায় এবং এক-আধজন সংবাদ-পাঠক আমার বেশ প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন—যেমন বাংলায় নাজীর আহমদ এবং ইংরেজিতে আহমদ রফিক। গান্ধি পার্কের পাশেই ছিল অত্যন্ত সুশোভন ও পুষ্পময় লেডিজ পার্ক—পাথরের একটা স্তূপের মাঝখান দিয়ে উঠে গেছে সিঁড়ি, ওপরে আছে বসবার আবৃত জায়গা। সেখান থেকে লেডিজ পার্কের ঝরনার জলস্রোত এবং শহরের খানিকটা দেখা যেতো। লেডিজ পার্ক এখন জায়গা করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংককে। গান্ধি পার্কের দুদিকে ছিল দুটি সিনেমা হল—নীলা আর বাণী। নীলার এখনকার নাম পিকচার প্যালেস—সেখানে আমি অশোককুমার-অভিনীত প্রথম বাংলা ছবি *চন্দ্রশেখর* দুবার দেখেছিলাম, নায়িকা ছিলেন কানন দেবী। খুলনায় এসে কী করে যেন একা একা সিনেমা দেখার স্বাধীনতা পেয়ে গিয়েছিলাম এবং তার পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার করেছিলাম।'

খুলনায় এসে আমরা উঠলাম আমার মেজো খালু কাজী জহুরুল হকের বাড়িতে, মুনশিপাড়ায়। এক মেয়ে রেখে তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হলে, তিনি আমার তালাকপ্রাপ্ত মেজো খালাকে বিয়ে করেন। দুই মেয়ে—টুনি (তাঁর বিয়ের পরপরই আমরা কলকাতা থেকে গাড়ি করে ফরাসি উপনিবেশ চন্দননগর পেরিয়ে তাঁর শ্বশুরবাড়ি হুগলির প্রতাপপুরে গিয়েছিলাম) এবং মমতাজকে—রেখে মেজো খালা গতায়ু হন। খালু তৃতীয়বার বিয়ে করেন এবং এ-পক্ষে তাঁর আরো একটি মেয়ে হয়—তার নাম মীনা।

এই নামের সূত্রে খালার কনিষ্ঠ সতিনকে আমরা মীনার-মা খালা বলে উল্লেখ করতাম। হোগলার পাতায় ছাওয়া খালুর দু-কামরার মাটির ঘর—অদূরে আলাদা রান্নাঘর ও তার অদূরে হাঁস-মুরগির ঘর। খালা-খালু থাকতেন দুই মেয়ে নিয়ে, তার মধ্যে দুই ছেলে নিয়ে আব্বা-মা উঠলেন। ও-বাড়িতে হারিকেনের আলো এবং কুয়োর পানি—তার অভিনবত্বের চেয়ে অসুবিধের দিকটাই বেশি চোখে পড়েছিল। তবে সব কিছু পুষিয়ে গিয়েছিল খালার আন্তরিক ভালোবাসায়। খালা আমাদের জন্যে—বিশেষ করে, আমার জন্যে—তখন এবং পরেও যা করেছিলেন, আমার আপন খালা বেঁচে থাকলেও ততটা করতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

মেজোবুর শ্বশুরবাড়ি বয়রায়—শহর থেকে দূরে। তাই আসা-যাওয়া হতো, তবে অত ঘন ঘন নয়। মেজোদুলাভাইই আমাদের জন্যে বাড়ি ঠিক করে দিলেন—লেডিজ পার্কের উল্‌টো দিকের রাস্তা সারদাবাবু রোডে, এখন সে রাস্তার নাম আহসান আহমদ রোড। একতলা পাকাবাড়ি, তিন-চারটে ঘর, ভেতরে একটু খোলা জায়গা। তবু বিদ্যুৎ, কলের পানি এবং স্যানিটারি টয়লেট নেই। আমরা সকালে মাখন-রুটি-ডিম খেতে অভ্যস্ত ছিলাম, খুলনায় মাখন-রুটির অভাব। মাঝে মাঝে পরোটা-ডিম খেলেও আমাদের নিত্য নাশতা হয়ে উঠলো মুড়ি এবং অত্যন্ত সুস্বাদু কাঁচাগোল্লা।

সারদাবাবু রোডে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ছিলেন এ কে এম মুসা—পরে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের সদস্য। তাঁর মা এবং তাঁরা চার ভাই ও এক বোন ও-বাড়িতে থাকতেন। মুসা সাহেবের মেজো ভাই শামসুল হুদা ওরফে কানু (এঁর কন্যা প্রজ্ঞালাবণী এখন বিখ্যাত আবৃত্তিকার); সেজো গোলাম মোস্তফা ওরফে চাঁদ (অভিনেতা ও আবৃত্তিশিল্পী); তারপর রিজিয়া ওরফে রিজি; এবং ছোটো আবু আবদুল্লাহ ওরফে চুন্নু (পরে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ফর ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বা বি আই ডি এসের মহাপরিচালক)। গোলাম মোস্তফা বোধহয় আমার এক ক্লাস ওপরে পড়তেন; আবদুল্লাহ তখন খুবই অল্পবয়স্ক, কিন্তু দিনরাত বইপত্র নিয়ে থাকতো এবং তার চশমার কাঁচ তখনই বিজ্ঞজনোচিত ভারি হয়ে উঠেছিল। সারদাবাবু রোডের লেডিজ পার্ক-প্রান্তে থাকতেন এ এম- আনিসুজ্জামান (সাবেক সচিব, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এবং শেখ হাসিনার সরকারের কৃষি-বিষয়ক উপদেষ্টা)। খুলনা জেলা স্কুল থেকে ১৯৪৮ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে তিনি তখন তৈরি হচ্ছিলেন, পরে ওই পরীক্ষায় মেধা-তালিকার ওপরদিকে জায়গা করে নিয়েছিলেন।

আমাদের উল্‌টো দিকে হাজী মজহারউদ্দীনের দুটি বাড়ি। পেছনে বড়ো বাড়িটায় তিনি থাকতেন দুই মেয়ে, এক ছেলে (কাজী মজহারুল আনোয়ার, আইনজ্ঞ) নিয়ে। সামনের অংশ ভাড়া দিয়েছিলেন ইয়াহিয়া সাহেবকে। তিনি বোধহয় ছিলেন মুহুরি, তাঁর ছেলে হারুন ছিল আমাদের বন্ধু। হাজী মজহার—পেশায় মোক্তার—অত্যন্ত রসিক মানুষ ছিলেন। আমরা যে-বাড়িতে থাকতাম, তার মালিক ছিলেন বিপন্নপালক বসু। একজন তাঁর খোঁজ করে না পেয়ে মোক্তার সাহেবের কাছে সন্ধান চাইলে তিনি বলেছিলেন, 'আরে কী হয়েছে, জানো না? উনি গেছলেন কলকাতায়, সেখানকার যত বিপন্ন, তারা ওঁকে বললো, 'বিপন্নপালক, তুই বোস'। উনি ভদ্রলোক মানুষ, কী আর করেন, সেখানেই বসে গেলেন। এখন উনি উঠতে চাইলেই যে উঠতে পারবেন, তা

মনে হয় না।' হাজী সাহেবের আরেক মজার গল্প ছিল তাঁর নিজের পেশায় রত মোক্তারদের নিয়ে। কোনো এক সাহেব (জেলা?) ম্যাজিস্ট্রেট মোক্তারদের একেবারে দেখতে পারতেন না। মোক্তাররা জামিনের আবেদন করলে তিনি নাকি আসামীকে কাঠগড়া থেকে সরিয়ে বসিয়ে রেখে মোক্তারকে ডেকে পাঠাতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, তিনি ওই ব্যক্তিকে চেনেন কিনা। মোক্তার ইতস্তত করলে তিনি আবেদনপত্র দেখিয়ে পরিহাসের সুরে বলতেন, 'দুই টাকা পাও, 'চিনি' লিখে দাও?' সেই ম্যাজিস্ট্রেটের বিদায়কালে মোক্তার বার অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে সংবর্ধনা দিয়েছিল। বক্তৃতা দিতে উঠে সাহেব নাকি সম্বোধন করেছিলেন 'মুকতিয়ারস অ্যান্ড জেন্টলমেন' বলে। হাজী সাহেব রহস্যচ্ছলে বলতেন, 'সাহেব যাওয়ার সময়েও, আমাদের অতিথি হয়েও, মোক্তারদের ভদ্রলোক বলে স্বীকার করে গেলো না।' হাজী সাহেবের পাশের বাড়িতেই থাকতেন এ এফ এম আবদুল জলিল, অ্যাডভোকেট। ইতিহাসচর্চায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল, তখনই *ইউরোপীয় সভ্যতায় ইসলামের দান* নামে তাঁর একটি বই বেরিয়ে গেছে এবং তার পরপরই বোধহয় *ইবনে খালদুন* প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে তাঁর *সুন্দরবনের ইতিহাস* প্রভূত প্রশংসালাভ করে। তিনি মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তবে খুলনায় তখন মুসলিম লীগ বলতে আবদুস সবুর খানকেই (পরে খান আবদুস সবুর বলে অধিকতর পরিচিত) বোঝাতো। জলিল সাহেব আবার সবুর খানের অনুসারী ছিলেন না।

আবদুস সবুর খান, এ এফ এম আবদুল জলিল, এ এইচ দেলদার আহমদ এবং আমার মেজোদুলাভাই সৈয়দ আলী হোসেন পরস্পর বন্ধু ছিলেন, জলিল সাহেব ছাড়া অপর তিনজন সম্ভবত এক সময়ে সহপাঠীও ছিলেন। দুলাভাই রাজনীতি না করলেও মুসলিম লীগের সমর্থক ছিলেন এবং সবুর খানের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল—তার জন্যে তাঁর যে কখনো অসুবিধে হয়নি, তা নয়। ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের পরে আবদুল জলিল মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন পেয়ে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে সবুর খান পরাজিত হন তাঁর অগ্রজ যুক্তফ্রন্ট-প্রার্থী গনি খানের কাছে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে দেলদার আহমদ অংশগ্রহণ করেছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই; তবে আওয়ামী লীগ প্রার্থী হিসেবে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যদের দ্বারা তিনি পাকিস্তান গণপরিষদে নির্বাচিত হন এবং সোহ্‌রাওয়ার্দী ও ফিরোজ খান নুনের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আসনলাভ করেন। সবুর খান ১৯৬২ সালে আইউব খানের মন্ত্রিসভায় স্থানলাভ করেন, কিন্তু গণতান্ত্রিক কোনো সরকারে তাঁর জায়গা হয়নি।

১৯৪৭-৪৮ সালে, আমরা যখন খুলনায় ছিলাম, তখন সবুর খানের ছিল একচ্ছত্র প্রভাব ও প্রতিপত্তি। তিনি বহুকাল ধরে মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় ছিলেন, ১৯৪৬ সাল থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য ছিলেন। এক সময়ে তিনি সাহিত্যচর্চা করতেন এবং হবীবুল্লাহ বাহার ও শামসুননাহার-সম্পাদিত *বুলবুলে* তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল (শুধু আবদুস সবুর নামে)। তিনি দাবাড়ু ছিলেন। তরুণ বয়সে তিনি নাকি উদ্‌যোগ করে শরৎচন্দ্রকে খুলনায় নিয়ে এসেছিলেন। তাছাড়া শুনেছি,

কলকাতার পেশাদার মঞ্চের নাটকাভিনয়ের আয়োজনও তিনি করতেন খুলনায়। তিনি কলকাতার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে ফুটবল খেলেছেন, খুলনায় তাঁর নিজস্ব ফুটবল দল ছিল ইউনিয়ন ক্লাব। খেলায় ইউনিয়ন ক্লাব হেরে গেলে খুলনার শান্তি বিঘ্নিত হওয়া ছিল অনিবার্য।

লেডিজ ক্লাবের উলটো দিকে একটা রেস্টুরেন্ট ছিল। রেস্টুরেন্ট না বলে চায়ের দোকান বলাই সংগত। এক সকালে দেখি, একজন আরেক ব্যক্তির শার্টের বুকের কাছটা খামচে ধরে তাকে বের করে নিয়ে আসছে চায়ের দোকান থেকে। দুজনেই যুবক। আগ্রাসী যুবক অপরজনকে দাঁড় করালো লেডিজ ক্লাব আর সারদাবাবু রোডের সংযোগস্থলে। তারপর নিজের পায়ের স্যান্ডেল খুলে তাকে জুতোপেটা করলো। শেষে বাধ্য করলো কান ধরে তাকে ওঠবস করতে। আশপাশে অনেকে ভিড় করলেও কেউ বাধা দিল না, মীমাংসা করতে এগোলো না। ব্যাপার কী? ওই লোকটি নাকি চায়ের দোকানে বসে সবুর খান সম্পর্কে নিন্দাসূচক উক্তি করেছে। ওঠবস করানোর পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো এই বলে যে, আরেকবার যদি সে এই অপরাধ করে, তবে তার পরিণাম ভালো হবে না। এই ঘটনা আমার মনে একটা প্রবল বিতৃষ্ণা জাগায়—সে বিতৃষ্ণা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি, না নির্বিশেষ নেতাদের প্রতি, না রাজনীতির প্রতি—তা এখন আর হলফ করে বলতে পারবো না।

কংগ্রেসের রাজনৈতিক ধারাটি মনে হয়, হঠাৎ করেই খুলনায় শুকিয়ে যায়—কারো দেশত্যাগ, কারো নিষ্ক্রিয়তার ফলে। তবে বামপন্থী রাজনীতির একটা গোপন ধারা সেখানে প্রবাহিত ছিল। এর মূল নেতারা হয় দেশত্যাগী, নয়তো আত্মগোপনকারী। মুসলিম লীগের প্রগতিশীল দলের ছাত্রনেতা আবু মোহাম্মদ ফেরদাউসকে অনেকে কমিউনিস্ট—অর্থাৎ পাকিস্তানের ধ্বংসসাধনে উদ্যত—বলে মনে করতো। তাঁর ব্যবহার কিন্তু একেবারেই ধ্বংসাত্মক মনে হতো না। তিনি ছোটো-বড়ো সবার সঙ্গেই সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করতেন। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন-খ্যাত আবুল হুসেনের অনুজ ইমাউল হোসেনের একটি ছাপাখানা ছিল বাজারের কাছে—ফেরদাউস ভাইয়ের বসবার একটা জায়গা ছিল সেখানে। ইমাউল হোসেন কোনো রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, তবে অগ্রজের উদারনৈতিকতা তাঁকেও স্পর্শ করেছিল।

খুলনায় এসে বাড়িঘর পেতে অক্টোবরের শেষ বা নভেম্বরের প্রথম হয়ে গিয়েছিল। ফলে আমাকে আর স্কুলে ভর্তি করার সুযোগ ছিল না। আমি বেশ হেসেখেলে বেড়াচ্ছিলাম। আমার মতো মুকুল ফৌজ-করা কয়েকজন জুটেছিল খুলনায়। আমরা সেখানে মুকুল ফৌজ গঠন করে সার্কিট হাউজের মাঠে প্যারেড করতে শুরু করে দিলাম।

২.

১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে খুলনা জেলা স্কুলে ভর্তি হলাম অষ্টম শ্রেণীতে। জেলা স্কুল ভবনটা সুন্দর। তার পাশে ছিল স্কুলের হস্টেল। মূলত হিন্দু হস্টেল। মুসলিম হস্টেলের একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিল সম্ভবত অল্পকাল আগে, একটু দ্রুততার সঙ্গে।

হিন্দু-মুসলমানের ভেদ ধরা পড়তো শুধু দুভাবে। জেলা স্কুলে আমাদের প্রত্যহ টিফিন দেওয়া হতো মাসে আট আনা ফিসের বিনিময়ে। টিফিন খেয়ে পানি খাওয়ার সময়ে একজন কেউ ঘটি উঁচুতে ধরে পানি ঢেলে দিতো, আমরা আঁজলা করে খেতাম। ওই সময়ে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের ছোঁওয়া-ছুঁয়ি এড়াবার সচেতন প্রয়াস দেখা দিতো। অথচ আমরা একসঙ্গে পড়ছি, এক বেঞ্চে বসছি, একত্রে ওঠাবসা করছি, বইপত্র টানাটানি করছি, দুষ্টুমি করছি এবং শাস্তি পাচ্ছি। দ্বিতীয় ভেদের বিষয়টা প্রকট হতো ধ্রুপদী ভাষা শেখার সময়ে। হিন্দু ছেলেরা সব সংস্কৃত পড়তে যেতো, মুসলমান ছেলেরা আরবি, কেউ কেউ আরবির বদলে উর্দু নিতে পারতো।

পার্ক সার্কাস হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে উঠে আমি উর্দু নিয়েছিলাম। দাঙ্গার পরে হিন্দু ছাত্র না থাকায় ভাগাভাগিটা হিন্দু-মুসলমানে না হয়ে হয়েছিল আরবি-উর্দুতে। প্রকৃতপক্ষে মাত্র কয়েকমাস স্কুলে যেতে পেরেছিলাম সে-বছরে। যশোর যাওয়া, কলকাতা ত্যাগ করা, খুলনায় এসে সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে ভর্তি না হওয়া—এসব কারণে পড়াশোনার ভিত্তিটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল, সেটা সবচেয়ে বেশি প্রকটিত হলো উর্দু ক্লাসে। ক্লাস এইটে আমাদের পড়ার কথা *উর্দু কি দুসরি কিতাব*। অথচ *পহেলি কিতাবই* ঠিকমতো পড়া হয়নি। ক্লাসে দুই সেকশন করে দেয়া হলো—*পহেলি* ও *দুসরি* পড়ুয়াদের। ওদিকে বাজারে বই পাওয়া যায় না—বইয়ের দোকানে আনতে বললে অগ্রিম টাকা রাখে বটে, কিন্তু বই এনে দেয় না। আমাদের কয়েকজনেরই উর্দুপাঠ আর অগ্রসর হলো না।

আমাদের উর্দু পড়াতেন হেড মৌলভি, মওলানা আবদুর রহমান বেখুদ। তিনি জবরদস্ত মওলানা ছিলেন। পরে ঢাকায় চলে আসেন এবং বেতারে, শিক্ষায়তনে, বাইরে নানা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সুপরিচিত হন। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান-রচিত *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের* উর্দু অনুবাদ তিনি করেছিলেন এবং তা প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। যাহোক, উর্দুতে আমাদের অগ্রগতি দেখেই হোক কিংবা ধর্মে মতি দেখেই হোক, মওলানা বেখুদ ঘোষণা করে দিলেন, ক্লাস করতে হলে প্রত্যেক ছাত্রকে স্কুলের নিকটবর্তী মসজিদে গিয়ে জোহরের নামাজ আদায় করতে হবে টিফিন পিরিয়ডে। টিফিনের পরই তাঁর ক্লাস ছিল সপ্তাহে একদিন না দুদিন, আমরা সেই ক্লাসের দিনে জোহরের নামাজ পড়তাম। নামাজে কারা অনুপস্থিত ছিল, তিনি তা জানতে চাইতেন, কিংবা অনেক সময়ে নিজেই শনাক্ত করতে পারতেন। অপরাধীকে সারা পিরিয়ড বেঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। মওলানা বেখুদের আদেশের দুটো ফল দেখা দিয়েছিল : এক, মসজিদে ছুটতে গিয়ে মাঝে মাঝে আমাদের টিফিন খাওয়া হতো না; দুই, মুসলমান ছেলেরা আর হাফ প্যান্ট পরে স্কুলে আসতে পারতো না—বাধ্য হয়ে তাদের পাজামা পরতে হতো।

খুলনা জেলা স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন আবদুল ওয়াজেদ খান চৌধুরী (তাঁর নামী ছাত্রদের একজন ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক সুবীর রায়চৌধুরী)। তিনি এতোই কড়া প্রকৃতির ছিলেন যে, অফিস-ভবনে নিজের কক্ষ থেকে বেরিয়েছেন জানতে পারলে, পাশে আমাদের ক্লাস-ভবনের সব ঘর ঠাণ্ডা হয়ে যেতো। তিনি আমাদের পড়াতেন চার্লস ল্যামের *স্টোরিজ ফ্রম শেকসপীয়র*—ওটা ছিল ইংরেজি র‍্যাপিড রিডার। তিনি ইংরেজিতে পড়াতেন, ক্লাসে বাংলা বলতেন না।

প্রয়োজনে এক শব্দের একাধিক ইংরেজি প্রতিশব্দ ব্যবহার করতেন, আমাদের বুঝিয়ে ছাড়তেন। তাঁর ক্লাস করে আমরা এত আনন্দ পেতাম, তা বলার নয়। তিনি ক্লাসে আমাদের প্রশ্নও করতেন ইংরেজিতে এবং ইংরেজিতে তার জবাব চাইতেন। আমরা প্রায় সকলে ভুল ইংরেজিতে জবাব দিতাম। তিনি তা নিয়ে কখনো বিদ্রূপ করেন নি, বরঞ্চ প্রত্যেকের ভুল সংশোধন করে দিতেন, ভুলের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে দিতেন। পরে তিনি ঢাকার টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ভাইস-প্রিন্সিপাল এবং অবসর নিয়ে চাঁদপুর কলেজে প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন। শেষ জীবনে তিনি বাংলা সাহিত্যচর্চা করতে শুরু করেন। তাঁর একমাত্র উপন্যাসের ফাইল-কপি আমাকে চট্টগ্রামে পাঠিয়ে বলেছিলেন ভূমিকা লিখে দিতে। আমি সে-ভূমিকার পাণ্ডুলিপি ডাকে দিয়েছিলাম, তবে তা তাঁর হাতে পৌঁছোবার আগেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

স্কুলে আমার একদল বন্ধু জুটেছিল। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল হালিম চৌধুরীর ছেলে মঞ্জু আমার সহপাঠী। আমার এক ক্লাস নিচে এস ডি ও আবু আহমদ ফয়জুল মহীর ছেলে তসলিম, আমাদের হেডমাস্টারের ছেলে মোরশেদ এবং অবসরপ্রাপ্ত মুনসিফ আবদুল ওয়াহাবের ছেলে লাবলু—শামসুল মোরশেদ (আমার সঙ্গে পার্ক সার্কাস হাই স্কুলে পড়তো)। মুনীর চৌধুরীর অনুজ মনজুর এলাহী বড়ো কোম্পানির নির্বাহী হয়েছিল, অল্পকাল হলো মারা গেছে। ইতিহাসবিদ সালাহউদ্দীন আহমদের অনুজ তসলিমউদ্দীন আহমদ এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক। মোরশেদ চৌধুরী সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদ থেকে অবসর নিয়েছে, তবে অধিক পরিচিত হয়েছে টেলিভিশনের নাট্যকার হিসেবে। শামসুল মোরশেদ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (আইন) পদ থেকে অবসর নিয়েছে, তার ছোটো বোন অকালমৃত ফরিদা রহমান বি এন পিতে সক্রিয় এবং পঞ্চম জাতীয় সংসদে এম পি ছিল। আমার আরেক সহপাঠী ছিল কামাল সাইদ—সেও বিমানের পরিচালক পদ থেকে অবসরপ্রাপ্ত।

তসলিমের ওপর একটা অত্যাচার হতো এই যে, বন্ধুরা তাকে চেপে ধরতো বাবার কাছ থেকে সিনেমার পাস জোগাড় করতে। অনিচ্ছুক তসলিম এক-আধবার পিতাকে আবেদন জানাতো। তিনি অত্যন্ত নরমভাবে উর্দুতে বলতেন, এই চাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। ওদের বাড়িতে কথাবার্তা হতো উর্দুতে।

খুলনা জেলা স্কুলে আমি একটা নতুন ব্যবস্থা দেখি। শ্রেণীকক্ষের ছাদের নিচে বিশাল পাখা—আর পাখাওয়ালা দড়ি দিয়ে তা টানছে। অনেক সময়ে প্রখর রৌদ্রের মধ্যে ভবনের বাইরে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে দড়ি বের করে নিয়ে তাকে পাখা টানতে হতো। কালেক্টরেটেও একই ব্যবস্থা দেখেছিলাম। জিনিসটা ভালো বলে মনে হয়নি।

কলকাতায় স্কুল কাছে ছিল বলে টিফিন পিরিয়ডে বাসায় এসে ভাত খেয়ে যেতাম। ফলে বেলা দশটায় গরম ভাত খাওয়ার অভ্যেস হয়ে ওঠেনি। খুলনা জেলা স্কুল বাড়ির অত কাছে নয়। খালুর মুনশিপাড়ার বাড়ি ছিল স্কুলের কাছে। স্কুল খোলা থাকলে আমি প্রায়ই সেখানে গিয়ে দুপুরে খেয়ে আসতাম। খালা আমার জন্যে খাবার নিয়ে বসে থাকতেন, আমি যা পছন্দ করি তেমন খাবার তৈরি করতে সচেষ্ট থাকতেন, যত্ন করে খাওয়াতেন এবং যদিও আমার আবার যাওয়া নিশ্চিত ছিল, তবু পুনরায় যেতে বলতেন তাঁর বাড়িতে।

৩.

১৯৪৮ সালের জানুয়ারির এক সন্ধ্যায় মা বললেন বাড়ির পাশের মুদির দোকান থেকে কিছু একটা নিয়ে আসতে। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ ছিল। করাঘাত করতেই মুদি বেরিয়ে এলেন। আমার চাহিদা জানালাম। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন, 'মহাত্মা গান্ধিকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। খবর পেয়ে দোকান বন্ধ করে দিয়েছি। আজ আর কেনাবেচা করবো না। কিছু মনে করবেন না যেন।'

বাড়িতে এসে খবর দিলাম। গান্ধি পার্কে যেতে চাইলাম বেতারের সংবাদ শুনতে। আব্বা নিষেধ করলেন। বললেন, 'গোলমাল লেগে যেতে পারে। বাইরে যেয়ো না।' পরে বুঝেছিলাম, গান্ধি-হত্যাকাণ্ডে তিনি ভারতব্যাপী দাঙ্গা-হাঙ্গামার আশঙ্কা করেছিলেন এবং তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পাকিস্তানেও গোলযোগের ভয় করেছিলেন। গান্ধির হত্যাকারী যে একজন হিন্দু, এ-সংবাদে তিনি—এবং তাঁর মতো আরো অনেকে—কথঞ্চিৎ স্বস্তি পেয়েছিলেন।

গান্ধির মৃত্যুতে পাকিস্তান-সমর্থকদের মধ্যে সেই প্রথম তাঁর প্রশংসা শুনেছিলাম। পাকিস্তানের বিরোধিতা করে থাকলেও গান্ধি পাকিস্তানের সঙ্গে সুসম্পর্ক চেয়েছিলেন; তাছাড়া দেশবিভাগের সময় অবধি ভারতীয় মুসলমানদেরকে সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন—এসব কথা তাঁরা বলেছিলেন। আরেকটি কথা তখন শুনেছিলাম না পরে, সে-সম্পর্কে খুব নিশ্চিত নই। গান্ধি নিহত হওয়ায় শোকপ্রকাশ করতে গিয়ে জিন্নাহ্ বলেছিলেন, 'হি ওয়াজ এ গ্রেট হিন্দু লিডার।' গান্ধিপন্থী নন, এমন পাকিস্তানিদের কেউ কেউ বলেছিলেন, এই মন্তব্যে জিন্নাহ্‌র অনুদারতা প্রকাশ পায়—তিনি অন্তত তাঁকে গ্রেট ইন্ডিয়ান লিডার বলতে পারতেন।

কিছুকাল পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এলেন পূর্ববঙ্গ-সফরে। খুলনায়ও সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। সার্কিট হাউজ-ময়দানে প্রধানমন্ত্রী কুচকাওয়াজ দেখবেন এবং বক্তৃতা দেবেন। আমরা চাইলাম মুকুল ফৌজের পক্ষ থেকে তাঁকে গার্ড অফ অনার দিতে। কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ ছিল না। প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচিই শুধু বাঁধা ছিল না, কে কী করবেন তাও স্থির করা ছিল। তার মধ্যে মুকুল ফৌজকে ঢোকানো কষ্টকর ছিল। তা শুনে আমরা খুবই মনোকষ্ট পেলাম। কে একজন পরামর্শ দিলেন, জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটকে যদি আমরা সম্মত করাতে পারি, তাহলে কুচকাওয়াজে আমাদের জায়গা হতে পারে। দিন দুই চেষ্টার পরে আমরা জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের দেখা পেলাম তাঁর বাড়িতে, বিকেলের একটু পরে। আমি নিজেদের কথা বললাম। আবদুল হালিম চৌধুরী জানতে চাইলেন আমাদের পিতৃপরিচয়, আর আমরা কে কোথায় কোন ক্লাসে পড়ি। তারপর বললেন, 'আচ্ছা, ভেবে দেখবো।' পরে শুনলাম, আমাদের প্রার্থনা মনজুর হয়েছে। নির্দিষ্ট দিনে মুকুল ফৌজের গার্ড অফ অনারে নেতৃত্ব দিলাম আমি এবং মার্চ করে হেঁটে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্যালুট দিয়ে করমর্দন করে এলাম। ধন্য হয়ে গেলাম।

মার্চ মাসে একটু অস্থির-অস্থির ভাব। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট হবে একদিন। রাষ্ট্রভাষা কী, তা যদিও বা বুঝলাম, তার গুরুত্ব বুঝলাম না। এই অবস্থায় কবি আবুল হোসেনের অনুজ, মুসলিম ছাত্রলীগের নেতা এস

এম আমজাদ হোসেন (পরে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আবদুল মোনায়েম খানের অধীনে শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন) আমাকে ডেকে নিয়ে বোঝালেন, এই ধর্মঘট সফল হলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষা করাই দায় হবে। অতএব, আমি যেন ধর্মঘটে যোগ না দিই এবং আমার বন্ধুদেরকেও যেন বলে দিই ধর্মঘট না করতে।

আমজাদ হোসেনের কথায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হলো। আমি সংকল্প করলাম, পাকিস্তান-রক্ষার জন্যে আমি ধর্মঘটে যাবো না, তবে কেন জানি না, আর কাউকে কিছু বললাম না। ধর্মঘটের দিনে যথারীতি স্কুলে গেলাম। ধর্মঘটের নেতারা যখন আমাদের ক্লাস থেকে বের করে আনলেন মিছিল করার জন্যে, তখন আমি চুপিসারে পালিয়ে গেলাম স্কুলের অফিস-ভবনে। সেখানে হেডমাস্টার কিংবা অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারের ঘরে ঢুকে লুকিয়ে রইলাম। সার্ যখন জানতে চাইলেন আমার কী চাই, তখন কাঁদো কাঁদো হয়ে বললাম, 'আমি মিছিলে যেতে চাই না সার্। বাইরে গেলে ওদের সঙ্গে মিছিলে যেতে হবে। তাই এখানে—।' প্রশ্রয় পাওয়া গেল। মিছিল কিন্তু চলে গেল প্রাঙ্গণ পেরিয়ে সদর রাস্তায়। পাকিস্তানের জন্যে আমার যেটুকু করার, সেটুকু করতে পেরেছি বলে স্বস্তি পেলাম বটে, কিন্তু বুঝলাম যে, মিছিলে যারা গেছে, সংখ্যায় তারা অনেক ভারি। পাকিস্তানের কী হবে ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরে এলাম।

পরের মাসেই, বোধহয়, কবি ইকবালের জন্মবার্ষিক-উপলক্ষে খুলনায় স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা হয়। আমি কোমর বেঁধে একটা রচনা লিখে ফেললাম এবং পুরস্কার পেয়ে গেলাম। পুরস্কারস্বরূপ দুটি বই নিয়েছিলাম কবি আবুল হোসেনের হাত থেকে : আবদুল মওদুদের *ইসলাম ইউরোপকে যা শিখিয়েছে* আর এ এফ এম আবদুল জলিলের *ইউরোপীয় সভ্যতায় ইসলামের দান*।

এই উপলক্ষেই, মনে হয়, তরিকুল আলমের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁদের পরিবার খুবই সংস্কৃতিমনস্ক। তরিকুল আলম এবং তাঁর স্ত্রী আভা আলম—দুজনেই সংস্কৃতিজগতে সুপরিচিত হয়েছিলেন। বড়ো ভাই জহুরুল আলম সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। এঁদের বোন আনোয়ারা বেগম ওরফে রাণু সরকারি কলেজে বাংলার অধ্যাপক ও অধ্যক্ষরূপে কাজ্ করে অবসর নিয়েছেন, উর্দু থেকে অনুবাদ করে সুনাম অর্জন করেছেন, তাছাড়া রবীন্দ্র-অধ্যয়ন-চক্র নামে ঢাকার একটি সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব স্বীকার করেছেন। খুলনায় তাঁদের মাও ছিলেন সঙ্গে। এঁদের বাড়ি থেকে 'সংকেত' নামে একটি হাতে-লেখা পত্রিকা বের হবে বলে সংবাদ পাওয়া গেল। কলকাতায় থাকতে শিবরাম চক্রবর্তীর 'দুজনে যেথায় মিলেছে সেথায়' নামে একটি গল্প পড়েছিলাম—টেলিফোনে ভুল সংযোগের গল্প। *ইত্তেহাদ* পত্রিকায় রোকনুজ্জামান খানকে ক্রমাগত টেলিফোন ধরতে দেখতাম। শিবরামের গল্পের ছায়া-অবলম্বনে এবং ঘটনাস্থল একটি পত্রিকা অফিসে স্থাপন করে 'টেলিফোন' নামে একটি গল্প লিখে ফেলি। এখন ওই হাতে-লেখা কাগজে লেখাটা জমা দিয়ে এলাম। জহুরুল আলম মনে করিয়ে দিলেন, আমি নাকি গল্পটা তাঁদের কাছে দিয়ে বলেছিলাম, 'সংকেতের জন্যে একটা গল্প রেখে যাচ্ছি। আপনাদের পছন্দ হলে প্রকাশ করবেন।' একটি বালকের এহেন কথায় তাঁদের মনে নাকি বেশ অনুকূল ভাব জেগেছিল। গল্পটি পত্রস্থ হয়েছিল।

তরিকুল আলম উদ্‌যোগ নিয়েছিলেন খুলনায় 'নজরুল-নিরাময় সমিতি' গঠন করার। নজরুলের অসুস্থতার কথা জানতাম। এই সভায় তাঁর চিকিৎসার সংকটের বিষয়ে জানলাম। যথারীতি কমিটি গঠিত হলো, কিন্তু অর্থসংগ্রহের বিষয়ে খুব একটা অগ্রগতি হয়নি।

৪.

খুলনায় এসে আব্বার মধ্যে অতিরঞ্জনের প্রবণতা লক্ষ করলাম। কলকাতায় আমাদের আর্থিক সচ্ছলতা যতোটুকু ছিল, সেটা তিনি বহুগুণে বাড়িয়ে বলছেন লোকজনের কাছে। এতে আমি একটা ধাক্কা খেলাম।

খুলনায় আব্বার পসার জমতে একটু সময় নিল, কিন্তু তা একটুই। একটা কম্পাউন্ডার জোগাড় করা তাঁর জন্যে সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কলকাতায় যিনি আব্বার কম্পাউন্ডার ছিলেন—আবদুল মাবুদ—আমরা তাঁকে লালুভাই বলে ডাকতাম, তিনি কলকাতায় থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। খুলনায় বাড়ি পাওয়ার পরে মমতার বন্ধনবশত তাঁকে একটা পোস্টকার্ড লিখি এবং সম্মান জানিয়ে তাঁর নাম লিখি, মি. এ মাবুদ, এস্কোয়ার। তিনি আব্বার কাছে নালিশ করে চিঠি লিখলেন, আনিসের কিছু লেখাপড়া হচ্ছে না, ক্লাস সেভেনে পড়ে অথচ নামের আগে মিস্টার লিখলে পরে যে এস্কোয়ার লেখা যায় না, তাও এখনো শেখেনি। আব্বা বিনা মন্তব্যে সেই চিঠি আমাকে দেখালেন। মনে হলো, লালুভাই যে খুলনায় আসেননি, তা আমার জন্যে ক্ষতিকর হয়নি।

ডাক্তার ও কম্পাউন্ডারের কাজ আব্বাকে একসঙ্গেই করতে হচ্ছিল। একদিন রোগীবাড়ি যাবেন বলে রিকশা ডেকে সামনের সিঁড়ি ভাঙছেন। মনে হয়, একটু অন্যমনস্ক ছিলেন। হঠাৎ করে পিছলে পড়ে গেলেন। আমাদের বাড়ি ও রাস্তার সংযোগস্বরূপ কংক্রিটের একটা স্ল্যাব ছিল নালার উপরে। তাতে তাঁর একটা হাঁটু ঠুকে গেল। আমি ঘরের ভেতরে ছিলাম। তাঁকে পড়ে যেতে দেখে দৌড়ে গিয়ে ওঠাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তিনি উঠতে পারলেন না। লোকজন ধরাধরি করে তাঁকে ঘরে নিয়ে এলো, তারপর হাসপাতালে নিয়ে গেল। আমি সঙ্গে গেলাম। আব্বা নিজেই বলছিলেন, হাঁটুর হাড় বোধহয় ভেঙে গেছে। এক্স-রে করে দেখা গেল, প্যাটেলা ফ্র্যাকচার্ড হয়েছে। ডাক্তারেরা পরামর্শ দিলেন অপারেশন করতে, কিন্তু আব্বা রাজি হলেন না। তখন হাসপাতালে সাধারণ একটা ব্যান্ডেজ করে দিলো, তবে তাতে যে বিশেষ কাজ হবে, এমন ভরসা দিলো না। আব্বা শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন এবং কিছুদিন নিজের ওষুধ খেলেন। তারপর ভাঙা-হাড়-জোড়া-দেওয়ায়-সিদ্ধহস্ত বলে নিজেকে দাবি করেন, এমন এক ব্যক্তি মাগুর তেল বা অনুরূপ কিছু একটা দিয়ে চিকিৎসা করলেন কিছুকাল। তাতে ভাঙা হাড় জোড়া লাগল বটে, কিন্তু ঠিক মুখোমুখি লাগল না, একটা আরেকটার ওপরে খানিক চেপে বসলো। আব্বা হাঁটতে পারলেন, তবে পা মুড়ে বসতে পারা সম্ভবপর হলো না।

আব্বা অনেকদিন শয্যাশায়ী থাকায় নানা অসুবিধা দেখা দিলো। প্র্যাকটিস বন্ধ রাখতে হলো বলে আর্থিক সংগতির অভাব হলো। আরো অসুবিধে হলো আমার। আব্বা ছাড়া বাড়িতে পুরুষ মানুষ আমি একাই, ফলে স্কুল-যাওয়া বন্ধ রেখে আমাকে সংসারের কিছু কাজ করতে হতো। প্রতিদিন আব্বা বাজার করতেন—এ তাঁর দীর্ঘকালের শখ। এখন হাট-বাজারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ আমাকে সে-দায়িত্ব নিতে হলো। মাঝে মাঝে দুবারও যেতে হতো বাজারে। বাড়িতে সবসময়ে পুরুষ চাকর থাকতো না বলে আমাকে একটা অপ্রীতিকর কাজ করতে হতো—মুরগি জবাই করা।

প্রবাদ-বাক্যের অনুসরণে বিপদ একা এলো না। আব্বা শয্যাশায়ী, আমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এরই মধ্যে বড়োরকম চুরি হয়ে গেল বাড়িতে। মায়ের গয়নাগাটি প্রায় সবই গেল, সামান্য যে নগদ টাকা ছিল ঘরে তাও গেল। চুরির তদন্ত করতে উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তারা এলেন—সহানুভূতি জানাতে এলেন খুলনা রেঞ্জের ডি আই জি শামসুদ্দোহা (পরে আই জি এবং তারপরে আইউব খানের মন্ত্রী), কিন্তু চোরাই মাল কিছুই উদ্ধার হলো না।

এর মধ্যে চৌমুহনী থেকে এক যুবক এসে হাজির হলেন। নাম একরামউল্লাহ চৌধুরী, আব্বার কাছে হোমিওপ্যাথি শিখবেন, এই সংকল্প করে এসেছেন। তাঁর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হলো আমাদের বাড়িতে। নম্র স্বভাবের অতি সজ্জন মানুষ—আব্বা-মাকে নিজের বাপ-মার মতো দেখতেন। তিনি আসায় আমার কাজের চাপ কমলো। আবার নিয়মিত স্কুলে যেতে শুরু করলাম। একরামউল্লাহকে প্রায়ই আব্বার বকাবকি শুনতে হতো, তিনি তাতে কিছু মনে করতেন না। ভাবতেন, ওটা গুরুর কাছে শিষ্যের প্রাপ্য। পরে তিনি চৌমুহনীতে বেশ নামকরা হোমিওপ্যাথ হন, তাঁর বিষয়সম্পত্তিরও উন্নতি ঘটে। বিনয় করে বলেন, এসবই এখনো নাকি আব্বার কল্যাণে।

এই সময়ে আমার এক বন্ধু জুটলেন—আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড়ো, নাম নজরুল। তিনি আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কাটাতে চাইতেন, অতটা সময় আমি দিতে পারতাম না এবং তা নিয়ে তিনি অনুযোগ করতেন। তিনি আমাকে মাঝে মাঝে সিনেমায় নিয়ে যেতেন এবং সাহিত্য সম্পর্কেও আমার সঙ্গে আলোচনা করতেন। বাড়ির নিষেধের কারণে আমি উপন্যাস পড়ি না জেনে তিনি হেসে অস্থির। বললেন, 'উপন্যাস-অবলম্বনে তৈরি-করা সিনেমা তুমি দেখতে পারছো—তাতে বাধা নেই, অথচ সেই মূল উপন্যাস পড়তে পাবে না, এ কেমন কথা?' আমি বোঝালাম, শরৎচন্দ্রের *রামের সুমতি* পড়েছি এবং দেখেছি; কিন্তু যাকে বলে নভেল, তা আমার পড়া নিষেধ। তিনি বললেন, তোমাকে ভেবে দেখতে হবে, নিষেধটা যুক্তিপূর্ণ কিনা। আমি ভেবে দেখলাম: এই নিষেধের পক্ষে যুক্তি খুঁজে পেলাম না। কিছুকাল পর থেকে উপন্যাস পড়তে শুরু করলাম।

নজরুলের বন্ধুত্বের মধ্যে একটা প্রবলতা ছিল, তাতে আমি স্বস্তি পেতাম না। নদীর ওপারে তাঁদের বাড়িতে একবার আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। নৌকায় চড়েছিলাম বাড়ির নিষেধ অমান্য করে। সাঁতার জানতাম না বলে নৌকা চড়াও আমার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল।

৫.

পাকিস্তান হওয়ার পরপরই ছোটোবু-দুলাভাই কলকাতা থেকে সরাসরি চলে এসেছিলেন ঢাকায়। কিছুকাল পরে দিনাজপুর থেকে ঢাকায় বদলি হলেন বড়োদুলাভাই—তিনিও সপরিবারে চলে এলেন। দুই পরিবার শান্তিনগরে একটা বাড়ি ভাড়া করলেন, বাড়িটার নাম 'প্রমথ নিবাস'।

বোনদের আমন্ত্রণে ১৯৪৮ সালের জুন মাসে—স্কুলের বন্ধে মনে হয়—আমি কয়েকদিন কাটাতে এলাম তাদের সঙ্গে। খুলনা থেকে বরিশাল হয়ে স্টিমারে এলাম ঢাকায়—প্রায় দুই দিন দুই রাতের যাত্রা। তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী হওয়ায় কেবিনে এলাম খুব আরাম করে। নদী দেখতে ভালো লেগেছিল—নদী যে এতো বড়ো হতে পারে, সে-সম্পর্কে আমার ধারণাই ছিল না। নদীর বাতাসও খুব উপভোগ্য, আর তাতে বোধহয় খিদে বাড়ে। স্টিমারের খাওয়া খুব ভালো। সাহেবি কায়দার খাওয়াই খেলাম—দেড় টাকায় লাঞ্চ, আর পৌনে দু টাকা কিংবা দু টাকায় ডিনার। অর্ডার দেওয়ামাত্র চা চলে আসে। স্টিমারঘাটে নৌকা ভেড়ে—মিষ্টি, দই, কলা এবং নানারকম ফল নিয়ে নৌকা এসে লাগে স্টিমারের গায়ে। এক টাকায় কুড়িটা রসগোল্লা পাওয়া যায়, আর অমন নরম ও সুস্বাদু রসগোল্লা আমি আগে খাইনি।

ঢাকা তখনো ছোটো শহর। মফস্বলের একটা শহর হঠাৎ করে প্রাদেশিক রাজধানী হয়ে গেছে, কিন্তু দায়িত্ব সামলে উঠতে পারছে না। সবচেয়ে সংকট বাড়িঘরের—কী থাকার জন্যে, কী অফিসের জন্যে। ঢাকা শহরের চৌহদ্দি তখন গেন্ডারিয়া, বাকল্যান্ড বাঁধ, পুরানা পল্টন ও পিলখানায় সীমাবদ্ধ। পুরানা পল্টন পেরিয়ে আমাদের যেতে হতো শান্তিনগরে— সেটা ঠিক শহরের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হতো না।

আমার মামাতো ভাই সৈয়দ কামরুজ্জামান কলকাতা থেকে আই এসসি পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি এসসি পাস কোর্সে ভর্তি হয়েছিলেন। প্রথমে ছিলেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে। বড়োবু-ছোটোবু বাড়িভাড়া নেওয়ায় হল ছেড়ে উনিও থাকতে লাগলেন ওঁদের সঙ্গে। আমি ঢাকায় বেড়াতে এলে তিনি আমাকে শহর দেখালেন তাঁর সাইকেলে চড়িয়ে। খুব গর্বের সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয়-এলাকার ঘরবাড়ি চিনিয়ে দিলেন। কী সবুজ রমনা, কী গাছে-ঢাকা রাস্তা, কার্জন হলের কী গাম্ভীর্য, কী সৌন্দর্য সলিমুল্লাহ হলের। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

ঢাকার যানবাহন তখনো প্রধানত ঘোড়ার গাড়ি, রিকশাও কিছু আছে। মেয়েরা পর্দা রেখে চলবে, বিশেষ করে পুরোনো ঢাকায় এটাই ছিল প্রত্যাশিত। ছোটোবুকে নিয়ে ছোটোদুলাভাই পটুয়াটুলির দিকে গিয়েছিলেন। তাতে উভয়কেই কিছু কটু মন্তব্য শুনতে হয়েছিল।

এ কথা শুনতে খারাপ লেগেছিল, কিন্তু ঢাকার আর সবকিছু সেই খারাপ-লাগাকে ঢেকে দিয়ে ভালোলাগাকেই প্রধান করে তুলেছিল।

৬.

আমাদের আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত ব্যক্তিদের অনেকেই ভিটেমাটি ছেড়ে খুলনায় চলে আসতে লাগলেন। আমার এক মামা—মায়ের মামাতো ভাই—সৈয়দ আবদুল হালিম বি এসসি পাস করে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ডেমনস্ট্রেটর হয়েছিলেন। খুলনায় এসে পুলিশ লাইনের কাছে বাড়ি নিয়ে স্বগৃহেই ল্যাবরেটরি স্থাপন করে ওষুধ তৈরি করতে শুরু করলেন। মায়ের ছোটো মামা—আমাদের আবু নানা—কিছুকাল পরে খুলনায় এসে হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করতে লাগলেন। আরো অনেকে এসেছিলেন। খুলনায় সবার জায়গা হয়নি। আমার বিধবা মেজোচাচি ছেলেমেয়ে নিয়ে ঠাঁই করলেন সেনহাটিতে। মায়ের ফুফাতো বোন—আমাদের গালু খালা—তিনিও বসতি করলেন সেখানে। ওই জায়গাটা খুদে বসিরহাটে পরিণত হলো। খুলনা ছাড়া ঢাকায় ও অন্যত্র যে অনেকে স্থান করেছিলেন, তাও জানা যাচ্ছিল।

বাস্তু ছেড়ে যেমন আসছিলেন অনেকে, বাস্তু ত্যাগ করেও তেমনি চলে যাচ্ছিলেন অন্যেরা। তাঁদের আমরা চিনতাম না, তবে স্থানীয় লোক বলে মেজোদুলাভাই চিনতেন কাউকে কাউকে। এঁদের চলে যাওয়ার মধ্যেও একটা বিচিত্র ব্যাপার ছিল। কেউ কেউ সবাইকে বলে-কয়ে জায়গা ছাড়ছিলেন, কেউ কেউ চলে যাচ্ছিলেন চুপিচুপি। আগের রাতেও অনেক সময়ে প্রতিবেশীরা জানতে পারতো না যে, পরদিন সকালে সে-বাড়ি খালি হয়ে যাবে। কেউ বিষয়সম্পত্তির ব্যবস্থা করে যেতেন; কেউ পরে করবেন বলে ঠিক করে যেতেন; কেউ সবকিছু ফেলে অজানার পথে পা বাড়াতেন। যাঁরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন, তাঁদের মনোভাব অনুমান করতে পারতাম আব্বার মতো যাঁরা চলে এসেছিলেন, তাঁদেরকে দেখে। নতুন জায়গায় লালিত আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এক ধরনের বিষাদ-বেদনা তাঁদের মধ্যে কাজ করছিল ফেলে-আসা স্থানের জন্য। অভ্যস্ত জীবনের সহজ নাব্যতা এবং স্মৃতিময় দিনের হাতছানি তখনো তাঁদের টানছিল। সতত না হলেও স্মৃতি তো অধিকাংশই সুখের। তবে এর ব্যতিক্রমও দেখেছি কারো কারো মধ্যে—যেমন, আমার মা। কলকাতা ছাড়ার কারণে কোনো বিষণ্ণতা তাকে স্পর্শ করেনি। খুলনায় এসে যেসব ছোটোখাটো অসুবিধে তাকে ভোগ করতে হতো, মা তা হাসিমুখেই মেনে নিয়েছিল। সকালে খবরের কাগজ পড়া তার জীবনযাত্রার অবিচ্ছিন্ন অংশ ছিল—তারপর দিনের অন্যভাগে তা খুঁটিয়ে পড়া। খুলনায় স্থানীয় পত্রিকা ছিল না, গোড়ার দিকে ঢাকায়ও নয়, কলকাতার সংবাদপত্র এসে পৌঁছোতো বেলা তিনটে-চারটের দিকে।

১৪ আগস্টে পাকিস্তানের বছরপূর্তি হলো। চারদিকে সাজসাজ রব। শুধু রব নয়, প্রকৃতই সাজসজ্জা ও আলোকমালা, বিদ্যুৎ না থাকলে মোমবাতির সারি লাগানো, জনসভা, এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনাচক্র ও ভাষণ। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে পাকিস্তান যে এক বছর টিকে রইলো, এটাই বড়ো ঘটনা। আরো বড়ো ব্যাপার, নতুন দেশের অশেষ সম্ভাবনা—সে-আস্থাই সবাই প্রকাশ করলেন। দেশের যা-কিছু অভাব, দু দিনেই তা কেটে যাবে—নিজের পায়ে ভর করে একটু শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারলেই হলো—এ-বিশ্বাস ছিল ব্যাপক—উদ্দীপনার তাই অভাব ছিল না। মনে পড়ে, এ-বছরেরই গোড়ার দিকে নূরুল ইসলাম নামে অপরিচিত এক গায়ক সদলে

কলকাতায় গিয়ে—বোধ হয় টুইন কোম্পানিকে দিয়ে—একটি রেকর্ড তৈরি করে নিয়ে এসেছিলেন। ফরিদপুর অঞ্চলে নিজের বাড়ি ফেরার পথে আমাদের তা শুনিয়ে গেলেন খুলনায়। রেকর্ডের দু পিঠেই পাকিস্তান ও জিন্নাহ্-সম্পর্কিত গান। একটির প্রারম্ভিক কলি ছিল, 'বলো রে ভাই পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। যেমন কথা, তেমনি সুর। তবু আমরা সবাই পুলকিত হয়েছিলাম। আর আমি অবাক হয়েছিলাম এই ভেবে যে, পাকিস্তান সম্পর্কে এমন চাঞ্চল্যকর গানের রেকর্ড ভারতে তৈরি করা সম্ভবপর হলো কী করে! মনে মনে শিল্পীর প্রতিভা, সাহস ও দক্ষতার প্রশংসা না করে পারি নি।

এই নির্মল পরিবেশে অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হলো। সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখে আমাদের প্রিয় কায়েদে আজম ইন্তেকাল করলেন। তিনি অসুস্থ, এ-খবর পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু অসুখটা যে অতো গুরুতর, তা বোঝা যায়নি। তাঁর মৃত্যুতে শহরে নামলো শোকের ছায়া, নিকটাত্মীয় হারানোর বেদনায় মোহ্যমান হলেন অনেকে। জিন্নাহ্র অভাবে পাকিস্তান টিকে থাকতে পারবে কিনা, অনেকের মনে উদিত এই প্রশ্ন গভীর বিষাদের মধ্যেও কেউ কেউ উচ্চারণ করে ফেললেন। জিন্নাহ্র মৃত্যুর সুযোগে ভারত না পাকিস্তান দখল করে ফেলে, এমন আশঙ্কাও ব্যক্ত করলেন কেউ কেউ। কারণ, পাকিস্তান যে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারবে না, ভারতের দায়িত্বশীল নেতাদের কেউ কেউ এমন ভবিষ্যদ্বাণী করে রেখেছিলেন। যে-দুই নেতার জন্যে দেশে ইংরেজ শাসনের অবসান সম্ভবপর হলো, মাত্র কয়েকমাসের মধ্যে তাঁরা উভয়েই লোকান্তরিত হলেন। তবু আমাদের সান্ত্বনা ও গৌরব এই যে, গান্ধিকে ওরা মেরে ফেলেছে, আর জিন্নাহ্র মৃত্যু হয়েছে রোগাক্রান্ত হয়ে—সেখানে কারই বা হাত আছে!

জিন্নাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনে আমরা কার্পণ্য করিনি, এ-বিশ্বাস ভেঙেছিল কিছুকাল পরে। তাঁর জীবনের শেষ দিকে তাঁর প্রতি সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ঔদাসীন্যের অভিযোগ ছিল জিন্নাহ্র মৃত্যুতে প্রদত্ত ফাতেমা জিন্নাহ্র শোকবাণীতে। তবে তাঁর স্বকণ্ঠে শোকবাণী রেকর্ড করার পরেও সেই অংশ বাদ দিয়ে তাঁর বক্তব্য প্রচারিত হয়েছিল প্রচার-মাধ্যমে। জিন্নাহ্র জীবনের শেষ দিনগুলো সম্পর্কে সরকার-নিয়োজিত তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক (কর্নেল এলাহী বখশ) কিছুকাল পরে একটি বই প্রকাশ করেন। তাতে অসুস্থ জিন্নাহ্র প্রতি তখনকার ক্ষমতাসীন নেতাদের অবহেলা ও অসৌজন্যের উল্লেখ ছিল। সে-বই পড়ার সুযোগ বেশি লোকের হয় নি, কেননা পাকিস্তান সরকার অচিরেই বইটি নিষিদ্ধ করেন। তাতে বরঞ্চ গ্রন্থে বর্ণিত তথ্যের সঙ্গে অন্যদের জল্পনা মিলে অনেক কথা ছড়িয়ে গিয়েছিল।

জিন্নাহ্র মৃত্যুতে আমরা প্রায় সকলেই ব্যক্তিগতভাবে শোকাচ্ছন্ন হয়েছিলাম। সর্বত্র ভাবগম্ভীর শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমাদের স্কুলে আয়োজিত শোকসভাও হয়েছিল এই উপলক্ষের যোগ্য। হেডমাস্টার সভাপতিত্ব করেছিলেন এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের কেউ কেউ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। একতা-ইমান-শৃঙ্খলা-রক্ষার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সকলেই। সভায় আমি কিছু বলতে সাহস করি নি, তবে জিন্নাহ্র প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তাঁর জীবন ও কীর্তি সম্পর্কে ঘরে বসে একটা রচনা লিখে ফেলেছিলাম। আমার হাতে তথ্য ছিল *দৈনিক আজাদে* প্রকাশিত তাঁর সম্পর্কে নানা লেখা এবং আমাদের বাড়িতে রাখা এ এ রউফের (তিনি নামের বানান লিখতেন

Ravoof, ফলে বহুকাল আমি তা রাভুফ মনে করেছিলাম) *মিট মিস্টার জিন্নাহ্* বইটা। জিন্নাহ্‌কে সরোজিনী নাইডু হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের দূত বলেছিলেন এবং জিন্নাহ্ হিন্দু-মুসলিম মিলনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন, আমার লেখায় এ-বিষয়টা গুরুত্ব পেয়েছিল। লেখাটা আমি বেশ কয়েকদিন ধরে যত্ন করে তৈরি করেছিলাম, তবে তা কোথাও প্রকাশ করতে দিই নি—প্রকাশ করার কথাও ভাবি নি।

৭.

খুলনায় এসে চলাফেরার স্বাধীনতা পেয়েছিলাম। আব্বার পা-ভাঙার ফলে তাঁকে নিয়ে বাড়ির সবাই ব্যস্ত থাকতো, প্রয়োজনে আমার ডাক পড়তো, নইলে আমার ওপর তেমন খবরদারি করার সময় কারো ছিল না। বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তাঘাটে হেঁটে হেঁটে কথা বলার সময় খুব পাওয়া যেতো। বাড়ির ভেতরে বন্ধুদের ডেকে কিংবা তাদের বাড়ির মধ্যে গিয়ে আড্ডা দেওয়া ছিল নিয়মের বাইরে। তবে আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি এবং রাণু আপা বা মুসা ভাইদের বাড়ি—যেখানে পুরো পরিবারের সঙ্গেই একটা আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে উঠেছিল—সেসব ক্ষেত্র ছিল আলাদা। অনেক সময়ে বন্ধুদের ডেকে আনাও সহজ ছিল না। আমাদের সামনের বাসায় হারুন থাকতো, কিন্তু তার চলাফেরার ব্যাপারে অভিভাবকের বেশ কড়াকড়ি ছিল। সন্ধ্যার পরে তার বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। প্রতিকারের একটা উপায় ঠাওরালাম আমরা। হারুনের বাসার সামনে গিয়ে তাকে না ডেকে নিজের নিজের নাম ধরে ডাকতাম। যেমন, আমি 'আনিস আনিস' বলে হাঁক দিলে তার অভিভাবকরা বুঝতে না পারলেও হারুন বুঝতে পারতো যে, আমি তাকে ডাকছি। আর সেই সংকেত পেয়ে সুবিধেমতো পড়া ছেড়ে উঠে কিছুক্ষণ সে গল্প করে কাটিয়ে ফিরে যেতো। এই পরিস্থিতিতে আমাদের আড্ডা জমলেও আমার পড়াশোনার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল।

আনাড়ি ছিলাম বলে খেলাধুলোর সুযোগ নিজে তেমন পেতাম না, তবে বড়োদের খেলা দেখতে যেতাম। ফুটবল খেলায় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতো বলে সেখানেও সবসময়ে যাওয়া হতো না, তবে ব্যাডমিন্টন খেলা দেখতে যাওয়ায় কোনো ঝামেলা হতো না। এই অবস্থায় বই পড়ার যে-সুযোগ ছিল, সেটা পুরোপুরি কাজে লাগানো যেতো।

কলকাতার জীবনে নিসর্গের সঙ্গে তেমন পরিচয় গড়ে ওঠেনি। খুলনায় এসে প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথমবারের মতো সচেতন হলাম এবং তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করলাম। প্রেমকাননে ঘুরে ঘুরে গাছপালা এবং মানুষের তৈরি তার নানারকম নকশা দেখতে ভালো লাগতো। প্রেমকানন ছাড়িয়ে বয়রায় মেজোবুর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথে অরণ্যানীর শোভা যেমন চোখে পড়তো, তেমনি বনজ একটা গন্ধ নাকে এসে লাগতো। এ সত্ত্বেও, স্বীকার করতে হবে যে, ফুল-পাখি-গাছ আমি বেশি শনাক্ত করতে শিখি নি এবং আজো পারি না। এরিক মারিয়া রেমার্কের *তিন বন্ধু* উপন্যাসের নায়ক তিনটের বেশি ফুলের নাম জানতো না; তা পড়ে আমার নিজের কথা মনে পড়েছিল। রূপসার

ঘাটে বসে বসে বহুবার খেয়া নৌকার আনাগোনা দেখেছি। শহরে বিদ্যুতের সরবরাহ কম ছিল বলে রাতের আকাশও অনেকটা পরিষ্কার করে নিজের সৌন্দর্য নিয়ে হাজির হতো। বন্ধুদের সঙ্গ না পেলে একা একা পথ চলেছি, নদীর ঘাটে এসে বসেছি, আকাশের দিকে চেয়ে দেখেছি।

গ্রামের সঙ্গে আমার সামান্য যা পরিচয়, তারও সূচনা হয়েছিল খুলনায়। বয়রা তখনো গ্রাম। সেখানে ক্ষেত-খামার, ফলমূল, পশুপাখি, পুকুরঘাট—এসব দেখা যেতো। মেয়েরা ধান ভানতো, ঢেঁকিতে পা দিতো এবং গৃহস্থালির নানারকম কাজ করতো। বাড়ির মেয়েরা কী কাজ করবে, মুনিষ ও কাজের মেয়েরা কী করবে, তার সুস্পষ্ট ভাগ ছিল। মেজোবুর শ্বশুরবাড়িতে আরেকটা মজার বিষয় লক্ষ করেছিলাম। সেখানে বাড়ির মেয়েদের একটু বেশি স্বাধীনতা ছিল বাড়ির বউদের চেয়ে। মেজোবুর ননদেরা ছিলেন বাড়ির মেয়ে, আর মেজোবু ও তার শাশুড়ি ছিলেন বাড়ির বউ।

এমনি করে যখন বাড়ির বাইরের জীবনের সঙ্গে একটু একটু পরিচিত হচ্ছি, তখন ঢাকা থেকে বড়োবু-দুলাভাই চিঠি লিখলেন আমাদের খুলনার পাট উঠিয়ে ঢাকায় চলে আসতে। খুলনার জীবন একটু দুর্ঘটনা-কণ্টকিত হয়েছিল আমাদের পক্ষে। ঢাকায় গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে বেশি বেগ পেতে হবে না, বরঞ্চ সেখানে সূচনা শুভ হতে পারে। আমার দুই বোন একত্র বাস করছে, আমরা অনায়াসে একই বাড়িতে থাকতে পারি। আগে বলেছি, বড়োদুলাভাইয়ের পরামর্শকে আব্বা খুব গুরুত্ব দিতেন। সুতরাং একটু অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করে তিনি পদ্মাপার হওয়ার সিদ্ধান্তই নিলেন। মেজোদুলাভাই নিজে থেকে পরামর্শ দেওয়া তেমন পছন্দ করতেন না, সুতরাং তিনি কিছু বললেন না। মেজোবু একটু ক্ষুণ্ন হলো, কিন্তু বয়রা থেকে এসে সে সবসময়ে আমাদের দেখাশোনা করতে পারতো না; ঢাকায় দু বোন তা পারবে, এ ভেবে সে-ও চুপ করে রইলো। এখন শুধু আমার বার্ষিক পরীক্ষার অপেক্ষা।

পরীক্ষা ভালো হলো না। ফল বেরোবার আগেই সব বেঁধেসেধে ঢাকায় রওনা হওয়া গেলো। তার আগে কিছু আসবাবপত্র বেচে দেওয়া হলো, তবু সঙ্গে যা গেলো, তার পরিমাণ সামান্য নয়। ডিসেম্বরের এক সন্ধ্যায় ঢাকাগামী স্টিমারে উঠলাম সকলে। আমাদের সহযাত্রী এক সুবেশ সুদর্শন ব্যক্তি। পরদিন তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আব্বা জানালেন, ইনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল হালিম চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র কবীর চৌধুরী—বরিশালে কনট্রোলার অফ ফুড। পিতার সঙ্গে দেখা করে কর্মস্থলে ফিরে যাচ্ছেন। এঁরই অনুজ মুনীর চৌধুরী কমিউনিস্ট হওয়ার অপরাধে জেল খাটছেন।

রওনা হওয়ার পরদিন রাতে বাদামতলি ঘাটে এসে পৌঁছোলাম। শুনলাম, নবাববাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে স্টিমারের বাঁশি বাজানো নিষেধ—তাঁদের অসুবিধে হবে বলে। স্টিমারঘাটে দুলাভাই ছিলেন। দুটো ঘোড়াগাড়িতে লোক আর মালপত্র তুলে চললাম। শান্তিনগরে প্রমথ নিবাসে এসে নামলাম ঘুমজড়িত চোখে।

আবার অন্যখানে জীবন শুরু হলো।

৮.

ঢাকায় আসবার পরেই, ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর ও ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারিতে, কার্জন হলে অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন। একরাশ কৌতূহল নিয়ে আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। প্রবেশাধিকার অবাধ দেখে এক সময়ে ভেতরে গিয়ে আসনও গ্রহণ করলাম সাহস করে।

এর আগে একবারমাত্র সাহিত্য-সম্মেলনে গিয়েছিলাম। সেটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে, বোধহয় ১৯৪৬ সালে। কায়কোবাদ সেখানে ছিলেন মূল সভাপতি, অন্তত মঞ্চে তাঁকে অনেকক্ষণ বসে থাকতে দেখেছিলাম। আমি গিয়েছিলাম আব্বার হাত ধরে। প্রবেশপথে শেরওয়ানি-পরিহিত তরুণ সৈয়দ আলী আহ্‌সান *শহীদ নজীর* নামে একটি বই বিক্রি করছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নজীর আহমদ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের প্রাঙ্গণে ছুরিকাঘাতে নিহত হন। বইটির প্রচ্ছদে নজীরের ছবি ছিল আর ছিল লাল লাল রক্তপুঞ্জ আঁকা। আব্বা একবার আমাকে আসনে বসিয়ে রেখে দাদা সম্পর্কে পরিবেশিত কোনো এক তথ্যগত ত্রুটি সংশোধনের অনুরোধ জানাতে গিয়েছিলেন সম্মেলনের সংগঠকদের কাছে।

কার্জন হলে আব্বা ছিলেন না, আমি একা ছিলাম। মঞ্চে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে সমাসীন দেখেছিলাম। আমি খুব মুগ্ধ হয়েছিলাম মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ বাহারের বক্তৃতা শুনে। তিনি তখন পূর্ব বাংলার স্বাস্থ্যমন্ত্রী। ঢাকা শহরকে মশককুলের হাত থেকে রক্ষা করে তিনি প্রভূত সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর বাগ্মিতা আমার মনে খুব দাগ কেটেছিল। সভা চলাকালে শ্রোতাদের মধ্য থেকে কেউ উঠে কোনো বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। বেশ একটা চাপা উত্তেজনার আভাস পেয়েছিলাম সম্মেলনে। পরে জেনেছিলাম, প্রাদেশিক শিক্ষাসচিব ফজলে করিম ফজলী মূল সভাপতি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ভাষণের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে বাংলা ভাষা সম্পর্কে আপত্তিকর কিছু বলেছিলেন, তা নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাহারের সঙ্গে তাঁর প্রকাশ্য বাদানুবাদ হয় এবং শ্রোতাদের আপত্তির মুখে ফজলী মঞ্চ থেকে নেমে আসতে বাধ্য হন। এসব ঘটেছিল সভাস্থলে আমার পৌঁছোবার আগে—তবে তখনো তারই জের চলছিল। সম্মেলন চলেছিল দুদিন ধরে, দুদিনই আমি গিয়েছিলাম। সম্মেলন-শেষে যখন বেরিয়ে আসছিলাম, তখন ধুতিচাদর-পরিহিত শ্মশ্রুমণ্ডিত এক বয়স্ক ব্যক্তি আমাকে লক্ষ করে পরিচয় জানতে চান। তিনি নিজের পরিচয় দেন জগন্নাথ কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান ত্রিপুরাশঙ্কর সেন বলে। তাঁর নামের শেষে শাস্ত্রী উপাধি যুক্ত ছিল, সেটার উল্লেখ তিনি তখন করেননি।

শান্তিনগরে এসে প্রথম যার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়, সে মনু। ভালো নাম গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদ (তখন নামের বানান লিখতো দন্ত্য-স দিয়ে)—পরবর্তী জীবনে *সচিত্র সন্ধানীর* সম্পাদক ও সন্ধানী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী। তখন আমি ক্লাস নাইনে উঠবো, সে ক্লাস সিক্সে। আমাদের বাসার দক্ষিণে খানিকটা খালি জমি, তার পরেই ওদের বাড়ি—এখন সেখানে বিশাল গাজী ভবন উঠেছে। মনুর বাবা গাজী শামসুদ্দীন আহমদ পুলিশে চাকরি করতেন। বেশ ডাকসাইটে মানুষ—আমরা তাঁকে ভয়ই পেতাম, যদিও ভয় পাওয়ার মতো কোনো কিছু ঘটে নি। তাঁর ছিলেন দুই ভাই—আমরা তাঁদের ডিপুটি

কাকা ও ডিফু কাকা বলে ডাকতাম। আপন না হলেও তাঁর আরো এক ভাই ছিলেন—আমাদের মানিক কাকা—তিনি তখন মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র। তিনি—গাজী গোলাম মোস্তফা—আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় পদে পরে আসীন হয়েছিলেন। মনুর মা ছিলেন খুব স্নেহশীলা—এখনো তাই আছেন। মনুর বড়ো বোন ছিলেন হেনা, ছোটোবোন কণার তখন জন্ম হয়েছে কী হয় নি।

শান্তিনগরের পরিবেশটা ছিল খুব ভালো। এলাকাটা তখনো ঢাকা শহরের বাইরে বলে গণ্য ছিল। দুপুরে ঘরে বসে পথচারীদের কথা শুনেছি : 'কই যাও?'—'ঢাকায়।' বিদ্যুৎ ও কলের পানি তখনো সেখানে পৌঁছোয়নি—ছোটো রাস্তা, দুপাশে প্রচুর গাছপালা, এখানে-ওখানে পুকুর। পাখ-পাখালির আওয়াজ পাওয়া যেতো, ফুলের সুঘ্রাণ অকস্মাৎ নাকে এসে লাগতো। নিরিবিলি জায়গা, সত্যিই শান্তিপূর্ণ, তবে মাঝে মাঝে যে অশান্তি হতো না, তা নয়। অনেক বিশিষ্টজন তখন এখানে থাকতেন। কবি গোলাম মোস্তফা থাকতেন দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মাহফুজা খাতুন, প্রথম পক্ষের দুই ছেলে —মোস্তফা আজিজ ও মোস্তফা মনোয়ার এবং দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে পাশাকে নিয়ে। তাঁর শ্যালিকারাও কেউ কেউ আসতেন—তাঁদের মধ্যে একজন, আমাদের নৌবাহিনীর এককালীন প্রধান অ্যাডমিরাল এম. এ. খানের স্ত্রী, 'সুরভি' নামক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান চালিয়ে—লোকচক্ষুর আড়ালে থেকেও—সুপরিচিত হয়েছেন। কবির শ্যালিকারা আসা-যাওয়া করলে আমরা তাঁর 'শ্যালিকা' কবিতার দু-চার লাইন আওড়াতাম। তবে তাঁর শ্যালকেরা এলে প্রায়ই শান্তিভঙ্গ হতো। কী কারণে যেন তাঁরা মোস্তফা আজিজের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন, তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দিতেন। এরকম ঘটনার সময়ে মাঝে মাঝে কবির বাসগৃহের সামনে পাড়ার লোক জড়ো হয়ে মোস্তফা আজিজের পক্ষ নিতো। মোস্তফা আজিজ ছবি আঁকতেন—পেনসিলে প্রতিকৃতি আঁকতেন এতো দ্রুত ও নিখুঁত যে, তা দেখতে কৌতূহলীরা ভিড় করতো। মুস্তফা মনোয়ার ওরফে মন্টু (পরে চিত্রশিল্পী, পুতুল-নাচের অধিকর্তা এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের কর্মকর্তা) আর আমি একই ক্লাসে পড়তাম। তার অনেক গুণ ছিল—ছবি আঁকতো, গান গাইতো, প্রখর রসবোধের অধিকারী ছিল। সে সাইকেল চালাতো—কখনো সামনে আমাকে বা আর কাউকে নিয়ে এবং সাইকেলে সাধারণত আলো না নিয়ে। এখন বিস্ময়কর মনে হবে যে, তখন সাইকেলে দ্বিতীয় আরোহী নেওয়া এবং বিনা বাতিতে সাইকেল চালানো বেআইনি ছিল এবং পুলিশ পারলে সে সাইকেলওয়ালাকে ধরতো। মন্টুকে একবার এক পুলিশ হেঁকে জিজ্ঞেস করলো, 'দো আদমি কিঁউ?' মন্টুর উত্তর : 'আওর এক নেহি মিলা।' আরেকবার তাকে অমন করে হেঁকে প্রশ্ন করা হলো : 'সাইকেলমে বাত্তি নেহি হ্যায় কিঁউ?' দ্রুত প্রস্থান করতে করতে মন্টু আকাশের চাঁদ দেখিয়ে বলেছিল : 'আল্লাহ্ মিয়া এত্তা বাত্তি দিয়া, সাইকেলমে বাত্তিকা জরুরত কেয়া হ্যায়?'

গোলাম মোস্তফা তখন হেডমাস্টারের কর্ম থেকে অবসর নিয়েছেন। তাঁর বাড়িতে একটা অর্গ্যান ছিল—সেটা বাজিয়ে তিনি গান গাইতেন—প্রায়ই রবীন্দ্র-সংগীত। আব্বার সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে তিনি আসতেন আমাদের বাড়িতে। *নও-বাহার* পত্রিকায় তিনি যখন পালাক্রমে কুরআন শরিফের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করছিলেন, তখন একদিন

বলেছিলেন : 'আল্লাহ্‌র কী কুদরত! রসুলুল্লাহ ছিলেন উম্মি, তাঁর কাছেই নাজেল করলেন কোরান। আর আমি আরবি জানি না, আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন কোরানের তরজমা।'

গোলাম মোস্তফার জ্যেষ্ঠা কন্যা—আমাদের জ্যোৎস্না আপা এবং তাঁর ইনজিনিয়ার স্বামী মজিদ সাহেব থাকতেন কবির এক-আধটা বাড়ির পরে। তাঁদের জ্যেষ্ঠা কন্যা ফরিদা মজিদ প্রধানত ইংরেজিতে অনুবাদ করে এবং কিছু মৌলিক রচনা লিখে সুপরিচিত হয়েছে। অপর কন্যা ফাহমিদা মজিদ ওরফে মঞ্জু একসময়ে ভালো নাচতো, পরে ইংরেজিতে চমৎকার ছড়া লিখেছিল, যেসব ছেলেমেয়ের শারীরিক বা মানসিক ত্রুটি আছে, তাদের মধ্যে কাজ করে এখন। আমি যে-সময়ের কথা বলছি, তখন অবশ্য তারা খুবই ছোটো।

তাদের পাশের বাড়িতে আমার মামা—মায়ের মামাতো ভাই—সৈয়দ সাখাওয়াত আলী কিছুকাল ছিলেন। মায়ের এক মামাতো বোনের ছেলে—টুকু ভাই—থাকতেন সেখানে, অকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইউসুফ সাহেব নামে এক সরকারি কর্মকর্তা—তখন বোধহয় ম্যাজিস্ট্রেট—গোলাম মোস্তফার নিকটতম প্রতিবেশী ছিলেন। একবার তিনি কী এক গোলযোগে পড়েছিলেন—বাড়িতে পুলিশ এসে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল। ছাড়া পাওয়ার পরে ওখানকার পাট উঠিয়ে তিনি চলে যান। তাঁর বাড়িটা কিনে নেন তখনকার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্‌ বাহার। তিনি এ-বাড়িতে প্রবেশ করার আগে আমরা শান্তিনগর ছেড়ে গেছি।

শান্তিনগরের আরেক বিশিষ্ট অধিবাসী ছিলেন ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু। অতি ভালো মানুষ, শিল্পে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট, সংসার-উদাসীন। তিনি শচীন দেববর্মণের খুব অনুরাগী ছিলেন। তাঁর কন্যা বকুল—আমার চেয়ে দু-এক বছরের বড়ো—পিতার কাছ থেকে গানের তালিম নিয়েছিলেন। তখনই তিনি ঢাকা বেতারের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন।

এঁদের কাছাকাছি থাকতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের তরুণ শিক্ষক এ এন এম মাহমুদ—পরে ড. আবু মাহমুদ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর বাড়ির সঙ্গে ছিল প্রচুর জমি—তিনি সেখানে এতোরকম গাছ লাগিয়েছিলেন যে, সেটা ছোটোখাটো বোটানিকাল গার্ডেন মনে হতো। তাঁর ছিল মাটির মূর্তি গড়ার শখ—কাজটা তিনি খুব সুন্দর করে সম্পন্ন করতে পারতেন। প্রকৃতি ও শিল্পের প্রতি এই অনুরাগ সত্ত্বেও ক্রোধান্বিত হয়ে স্ত্রীকে (তিনি সম্ভবত কামরুন্নেসা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন) প্রহার করা তাঁর পক্ষে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল ; অনেক সময়ে তাঁর স্ত্রীর চিৎকার শুনে তাঁর বাড়ির সামনে লোক জড়ো হয়ে তাঁকে ডাকাডাকি করতেন। মাহমুদ সাহেব ভেতর থেকেই তাঁদের বলে দিতেন অন্যের পারিবারিক ব্যাপারে মাথা না গলাতে। অথচ আমাদের মতো অপোগণ্ডের সঙ্গেও তাঁর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত মধুর। যদিও একটু ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা ছিল তাঁর স্বভাবের অন্তর্গত।

আমাকে ডেকে নিয়ে একবার বি এ পরীক্ষার খাতার ওপরের পৃষ্ঠায় নম্বর তোলা এবং সেই নম্বর যোগ করার কাজ করিয়েছিলেন। তখন তাঁর কথাবার্তায় তীব্র

কমিউনিস্ট-বিরোধিতা প্রকাশ পেতো। তিনি বোধহয় তখন এম এন রায়ের র‍্যাডিকাল হিউম্যানিজম-পন্থী ছিলেন।

ঢাকা কলেজের ইংরেজি শিক্ষক মোহাম্মদ নোমানও ছিলেন ওই পাড়ায়। তাঁর মতো সৌজন্যপরায়ণ মানুষ খুব বেশি দেখিনি। কথাবার্তা খুব কম বলতেন, যথারীতি আমাদের সবার খোঁজখবর নিতেন এবং কুশল জিজ্ঞাসা করতেন। তাঁর অনুজ মোহাম্মদ ফারুক—পরে জাহাঙ্গীরগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক—তখন বাংলায় এম এ পড়তেন। তাঁর সঙ্গে রাস্তায় অনেক হেঁটেছি। হাঁটতে হাঁটতে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতেন, তাঁর বিশেষ প্রিয় কবিতা ছিল 'বিজয়িনী'।

এই স্বভাব আরো একজনের ছিল—তাঁর নাম আবদুল মালেক। তিনি ছিলেন ঘোরতর র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট। ওই দলের প্রকাশনা বিক্রি করাই তাঁর একমাত্র কাজ ছিল—আমাকে অনেক বই বিনে পয়সায় দিয়েছিলেন। তাঁর একটা হাত কোনো এক দুর্ঘটনায় কনুই থেকে কেটে গিয়েছিল, হয়তো এর ফলেই তাঁর স্বভাবে কিছু উগ্রতার ঝোঁক ছিল। রবীন্দ্রকাব্যের তিনি ছিলেন যথার্থ অনুরাগী—*সঞ্চয়িতার* অধিকাংশ এবং তার বাইরের বহু কবিতা তাঁর মুখস্থ ছিল। তিনিও পথ চলতে চলতে আবৃত্তি করতেন। *শেষের কবিতার* কবিতাগুলি তাঁর মুখেই প্রথম শুনি। 'আনিলাম/অপরিচিতের নাম/ধরণীতে/পরিচিত জনতার সরণিতে' কিংবা 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?' শুনতে শুনতে আমারই প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল এবং অবশ্যপাঠ্য বিবেচনা করে *শেষের কবিতা* পড়েছিলাম। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল মোতালেব পরে চিকিৎসক হিসেবে যশস্বী হয়েছিলেন, তখনো তিনি ছাত্র। এঁরা ছিলেন অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের ভাগ্নে। মনসুরউদ্দীন তখন সিলেটে অধ্যাপনা করতেন, কিন্তু তাঁর পরিবার-পরিজন মালেক ভাইদের সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতেন। ছুটিতে ঢাকায় এলে অধ্যাপক আমাদের বাড়িতে অবশ্যই আসতেন। একবার আমার কাছ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে আমার দাদা শেখ আবদুর রহিম সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখেছিলেন *মাহে নওতে*। আমি মালেক ভাইয়ের বাড়ি প্রায়ই যেতাম—একদিন মনসুরউদ্দীন সাহেব তাঁর স্ত্রীকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিলেন 'মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের মহিষী' বলে।

ওই পাড়ায় আরো থাকতেন রাবেয়া খাতুন, খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক। তাঁকে চিনতাম, তবে কথাবার্তা তেমন হতো না। আরো কিছুটা দূরে সিদ্ধেশ্বরীতে থাকতেন শিল্পী আমিনুল ইসলাম ও কাইয়ুম চৌধুরী। কাইয়ুম চৌধুরীর সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় হয় নি। কিন্তু সরকারি আর্ট কলেজের ছাত্র আমিনুল ইসলামের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা আমার পক্ষে খুব লাভজনক হয়েছিল। মনসুরউদ্দীন সাবধান করে দিয়েছিলেন, 'খবরদার কমিউনিস্টদের পাল্লায় পড়বে না। এই দেখো না, আমিনুল ইসলাম—কতো ভালো ছেলে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে মিশে নষ্ট হয়ে গেল।' আমি অবশ্য তাঁর মধ্যে নষ্ট হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখি নি। তাঁর সূত্রে শিল্প ও সাহিত্যক্ষেত্রের বহুজনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল, এজন্যেও আমি তাঁর কাছে ঋণী।

৯.

ঢাকায় আসার পরে প্রথম কর্তব্য হয়ে দাঁড়ালো স্কুলে ভর্তি হওয়া। কামরু ভাইয়ের আনা খবরের ওপরে ভরসা করে তাঁর সাইকেলে চেপে কলেজিয়েট স্কুলে এলাম ভর্তি-পরীক্ষা দিতে। পরীক্ষায় পাশ করলাম না ফেল করলাম বলা শক্ত। বাংলা, ইংরেজি, অঙ্কে পাশ করেছিলাম—কিন্তু ক্লাস নাইনে নেওয়া হবে দুজন ছাত্র। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ফলাফলের ভিত্তিতে আমি তৃতীয়ও হতে পারিনি। সুতরাং ভালো স্কুলে ভর্তি হওয়ার আশায় ছাই পড়লো।

কামরু ভাইই খোঁজ করে জানলেন, বেসরকারি বিদ্যালয় প্রিয়নাথ হাই স্কুলে (এখন নবাবপুর গভর্নমেন্ট হাই স্কুল) ক্লাস নাইনে ছাত্র নেবে। ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে এবারে মনোনীত হলাম। স্কুলটা তখনো কাপ্তানবাজারেই ছিল। স্কুলের দুটি ভবন—সামনেরটা ছোটো, হেডমাস্টার, অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার ও শিক্ষকদের বসার ঘর, অফিসঘর, লাইব্রেরি। ম্যাপের সংগ্রহ থাকতো শিক্ষকদের বসার ঘরে। বড়োটা মূল ভবন, নতুন। আমাদের হেডমাস্টারের নাম ছিল হেমচন্দ্র বিশ্বাস, তবে ঢাকা শহরে তিনি শিবাজী হেডমাস্টার নামে পরিচিত ছিলেন। কেননা তাঁর গোঁফদাড়ি ছিল ইতিহাস বইতে দেখা শিবাজীর মতো। তিনি খুব রাশভারি মানুষ ছিলেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার সুরেশবাবুও ছিলেন গম্ভীরপ্রকৃতির, কিন্তু তাঁর কথা ছিল বেশ মমতাভরা। শচীনবাবু একটু খুঁড়িয়ে হাঁটতেন—জনশ্রুতি ছিল, রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগের কারণে পুলিশের শাসনবশত তাঁর পায়ে এই ক্রটি ঘটে। তাঁরা দুজনেই সন্ধ্যায় রথখোলায় (এখন টিপু সুলতান রোড) সলিমুল্লাহ্ ইমপিরিয়াল কলেজে শিক্ষকতা করতেন। আরেকজন শিক্ষক ছিলেন বি এ, বি এসসি, বি কম। এমন অপূর্ব সংযোগের হেতু শুনেছিলাম, বি এস সি পাশ করার পরে রাজনৈতিক কারণে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন—সেখানে বৃথা সময় না কাটিয়ে বাকি দুটি পরীক্ষা দিয়েছিলেন। নিখিলবাবুর ক্লাসে একদিন পড়া না পারায় তিনি আমাকে পাতাবাহার আখ্যা দিয়েছিলেন। তার তাৎপর্য বুঝতে পারি নি বলে অন্যেরা ব্যাখ্যা করেছিল, পাতাবাহার যেমন দেখতে ভালো, কিন্তু কোনো কাজে আসে না, তেমনি আমাকে দেখলে পড়ুয়া বলে মনে হয়, তবে আসলে আমি তা নই। নিখিলবাবুর মনে কী ছিল কে জানে! তবে এটা যে আমার সুনাম নয় তা বোঝার মতো ক্ষমতা ছিল। আমাদের স্কুলে এক ট্রেনি টিচার এসেছিলেন—তিনি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে পড়তেন, প্র্যাকটিকাল ডেমনস্ট্রেশনের জন্যে কোনো স্কুলে পড়ানো ছিল তাঁদের পক্ষে বাধ্যতামূলক—তিনি আমাদের বাংলা পড়াতেন। যেমন ভালো পড়াতেন, তেমনি সুন্দর ছিল তাঁর ব্যবহার। তাঁর পরীক্ষকেরা মাঝে মাঝে ক্লাসে উপস্থিত হতেন, তবে তিনি থাকতেন অবিচলিত। যেদিন তিনি শেষবারের মতো আমাদের ক্লাস নিয়ে চলে গেলেন, সেদিন আমি তাঁর জন্যে কেঁদে ফেলেছিলাম। ভবেশবাবু ছিলেন খুব আমুদে মানুষ। এমনিতে আমাদের ক্লাস নেওয়ার কথা তাঁর ছিল না। একবার কোনো শিক্ষক এক মাসের ছুটিতে গেলে তিনি তাঁর বদলে এসেছিলেন। ক্লাসে এসেই ছুটিতে যাওয়া শিক্ষকের নাম করে বললেন, 'উনি তো একমাস পরেই চলে আসবেন—এই চার সপ্তাহে আমি আর কী পড়াবো? তাঁর চেয়ে বরঞ্চ তোমাদের কাছে গল্প বলি।' আমরা মহা উৎসাহে সায়

দিলাম। তিনি আমাদের শুনিয়েছিলেন *লা মিজারেবল*, *ট্রেজার আইল্যান্ড* ও আরো দুটি ক্লাসিক রচনার সারসংক্ষেপ। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছিলাম এবং ওসব বইয়ের বাংলা ভাষ্যের সন্ধানে বেরিয়েছিলাম।

১৯৪৯ সালে আমরা যখন ক্লাস নাইনে ভর্তি হলাম, আমাদের স্কুল তখন ঢাকা বোর্ডের অধীনে—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশনের সিলেবাসের চেয়ে তার পাঠ্যতালিকা পৃথক। সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, উর্দু—কোনোটা শেখাই বাধ্যতামূলক ছিল না। ধ্রুপদী ভাষার বদলে আমি নিলাম স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, আর অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে বাণিজ্যিক ভূগোল। আমাদের ইতিহাস ও ভূগোলের ক্লাসে মানচিত্র ব্যবহার করা হতো। বাণিজ্যিক ভূগোল ক্লাসে তার ব্যবহার ছিল একটু বেশি। ওই ক্লাসে আর কিছু শিখিনি—ম্যাপ দেখতে এবং প্রাণান্ত পরিশ্রম করে আমাদের উপমহাদেশের মানচিত্র আঁকতে শিখেছিলাম।

নবম ও দশম শ্রেণীতে বাংলা পাঠ্যবই ছিল *সাহিত্য-পরিচিতি*—গদ্য ও পদ্য দু খণ্ড। বই দুটিতে বাংলা সাহিত্যের বড়ো লেখকদের রচনা ও তাঁদের জীবনকথা সংকলিত হয়েছিল, তাছাড়া বাংলা সাহিত্যের যুগনির্দেশসূচক সমৃদ্ধ আলোচনা ছিল। ওসব পড়ে বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা হতো। আমাদের বাংলা দ্রুতপঠন ছিল *গল্পবীথি*—অমন অনবদ্য ছোটোগল্প-সংকলন খুব বেশি দেখিনি। তারাশঙ্করের 'খাজাঞ্চিবাবু', বনফুলের 'পাঠকের মৃত্যু' এবং শওকত ওসমানের 'আব্বাস'—এ গল্পগুলোর কথা মনে পড়ে বিশেষ করে। অবাক লাগে, রবীন্দ্রনাথের কোন গল্প তাতে ছিল—'ছুটি' না 'কাবুলিওয়ালা'—তা ঠিক বলতে পারছি নে। হয়তো একটা মূল বইতে, আরেকটা দ্রুতপঠনে ছিল। ইংরেজি পড়ার আনন্দ যতোটা সংকলনগ্রন্থ থেকে পেয়েছিলাম, তার চেয়ে বেশি পেয়েছিলাম দ্রুতপঠন জিম করবেটের *ম্যান ইটার্স অফ কুমায়ুন* থেকে। ইংরেজি সংকলনগ্রন্থের যে-রচনার কথা এখন বিশেষ করে মনে পড়ে, আশ্চর্যের বিষয়, তা শেক্‌সপিয়রের 'ব্লো ব্লো দাউ উইন্টার উইন্ড' গানটি। এখানে আরেকটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলা ও ইংরেজি সংকলন ও দ্রুতপঠনের যেসব রচনা পাঠ্য ছিল না, সেগুলো পড়তেও আমি কসুর করিনি।

স্কুলে আমার সহপাঠীদের মধ্যে ছিল সৈয়দ মোহাম্মদ নেয়ামাল বাসির—নামের প্রথম অর্ধেক সে ছেঁটে দিয়েছিল। জাতীয় সংসদের বিতর্ক-সম্পাদক থাকা অবস্থায় অকালে তার মৃত্যু হয়। পারিবারিক সূত্রে সে উর্দু ও ফারসি খুব ভালো করে এবং কাজ চালানোর মতো আরবি শিখেছিল। তখন তার প্রধান ঝোঁক ছিল ইকবালের উর্দু ও ফারসি কবিতার অনুবাদ করা। নবাবপুরের সংলগ্ন একটি গলির এক বাড়িতে সে জায়গির থাকতো এবং মৌলিক কবিতাও লিখতো, সেসব কবিতার সঙ্গে ওই বাড়ির কারো সংশ্লেষ থেকে থাকতে পারে। যাঁর বাড়ি, তিনি এমন সদাশয় ছিলেন যে, আমরা গেলেও বিরক্ত হতেন না। তাঁর এক ছেলে আমাদেরই সমসাময়িক ছিল, সেও খুব বন্ধুসুলভ আচরণ করতো। তবে গৃহকর্তার ভদ্রতার সুযোগ আমরা খুব নিই নি। তখন নেয়ামাল বাসিররা তিন ভাই জীবিত—বড়ো নেয়ামাল ওয়াকিল, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানিতে চাকরি করতেন; দ্বিতীয় নেয়ামাল বাসির স্বয়ং; তৃতীয় নেয়ামাল

বশীর—মুর্শিদাবাদ জেলার তালিবপুরে স্বগ্রামে পড়াশোনা করতেন। বাসির ও বশীরকে আবার বাড়িতে ডাকা হতো বসির ও বাশীর বলে। দুজনের প্রকৃত বা ডাকনামের এ-পার্থক্য অন্যের পক্ষে সহজে ধরা যেতো না বলে পরবর্তীকালে কনিষ্ঠ নিজের নামের রূপান্তর ঘটান বশীর আল্‌হেলালে। তিনি যশস্বী কথাসাহিত্যিক, ওয়াকিল ভাই নাটক-উপন্যাস লিখতেন, বাসির অনুবাদ করে সুপরিচিত ছিল। তাঁদের নামের ইতিহাস জানা না থাকায় বাসিরকে আমরা নেয়ামাল (কেউ কেউ নিজস্ব উচ্চারণে নেয়ামুল এবং কেউ কেউ মজা করে নয়া মাল) বলে ডাকতাম। শুধু তার পারিবারিক পরিবেশে বাসির বলতাম।

সহপাঠীদের আরেকজন ছিল সৈয়দ আহমদ হোসেন—পরে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতির সেক্রেটারি জেনারেলরূপে সুপরিচিত। তার ডাকনাম কালু এবং সেটাও শুধু আমরা ব্যবহার করতাম তার পারিবারিক আবেষ্টনীতে। তারা থাকতো স্বামীবাগে। নেয়ামাল মুর্শিদাবাদ থেকে পালিয়ে এসে রাজশাহী সরকারি স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়েছিল, তখন আহমদ তার সহপাঠী ছিল, তবে ঢাকায় এসেই তাদের পরিচয় গভীর হয়। আহমদ আবৃত্তি করতো এবং বেতার-নাটকে অভিনয় করতো। এই সূত্রে সে আমাদের চেয়ে কবিতা ও নাটকের খোঁজ বেশি রাখতো। তার বড়ো ভাই (পরে বিচারপতি) সৈয়দ মুহম্মদ (পরে মোহাম্মদ) হোসেন চিন্তাভাবনায় বামপন্থী ছিলেন, তাঁর প্রভাব আহমদের ওপরে পড়েছিল। নেয়ামাল ও আমাকে সে বামপন্থার দিকে টানতে চেষ্টা করতো। কিন্তু আমরা স্থির করলাম, ধর্মহীন সাম্যবাদ আমাদের জন্যে নয়। তবে আমরা তিনজনই ছিলাম ঘনিষ্ঠতম বন্ধু।

আমাদের অন্যান্য সহপাঠীর মধ্যে ছিল আবুল কাসেম—পরে সে আর্মি ইনজিনিয়ারিং কোরে ব্রিগেডিয়ার হয়েছিল। সে পড়াশোনায় যেমন ভালো ছিল, তেমনি ভালো ছিল খেলাধুলায়। পুরানা পল্টন এবং শান্তিনগরের মধ্যবর্তী রামকৃষ্ণপুরে সে থাকতো বাপ-মা-ভাইবোন মিলে। তার বড়ো ভাই কর্নেল বোরহানউদ্দীন ছিলেন আর্মি মেডিক্যাল কোরের সদস্য—তিনি ঢাকার বাইরেই থাকতেন, পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। ভাইদের মধ্যে কাসেম দ্বিতীয়। তার পরের ভাই নূর মোহাম্মদ আমাদের দু ক্লাস নিচে পড়তো—পরে বিমানে উচ্চপদ লাভ করেছিল। কাসেমের ঠিক ওপরে যে-বোন ছিলেন (শিক্ষকতা করতেন), তিনি ব্লেড দিয়ে হাতের কবজি কেটে আত্মহত্যা করেছিলেন—কী কারণে তা আমাদের জানার সুযোগ হয়নি। নূর মোহাম্মদ ওরফে টুনুর সঙ্গেও আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। তারও ছোটো এক ভাই ছিল—তার সঙ্গে অতটা ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ ঘটেনি।

আমাদের সঙ্গে পড়তো সালাহউদ্দীন আহমদ—তার ছোটো ভাই সাইফুদ্দীন আহমদ মানিক বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা। সালাহউদ্দীন খুব গোবেচারা ছিল, নিতান্ত অল্প বয়সে মারা যায়। ওরা থাকতো গোপীবাগে। আরেকজনের নাম ছিল সালেহউদ্দীন—থাকতো সিদ্ধেশ্বরীতে। সে ছিল খুবই চালাক-চতুর এবং সিনেমা-পাগল, পড়াশোনা ছাড়া নানা বিষয়ে ছিল আগ্রহী। নরনারীর মিলনের শারীরতত্ত্ব-ব্যাখ্যা আমি তার কাছেই প্রথম শুনি। আমার কর্মজীবনের শুরুতে এক রাতে গুলিস্তান ভবনের চু-চিন্‌-চাউ রেস্টুরেন্ট থেকে আমরা কয়েকজন বের হতে যাচ্ছি, বারের

দরজার সামনে সালেহউদ্দীনের সঙ্গে দেখা। একটু জড়িত স্বরে সে জানতে চাইলো, সেখানে আমি কী করছি। তাকে বললাম, রেস্টুরেন্ট থেকে খেয়ে বেরোচ্ছি। একবার রেস্টুরেন্টের দিকে, আরেকবার বারের দিকে হাত দেখিয়ে বললো, 'ওদিকে যতো খুশি যাও, খবরদার এদিকে আসবে না। আমি আসি—সে আলাদা কথা, তুমি ভুলেও এদিকে পা দেবে না।' আবদুল লতিফ ছিল বয়সে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো। স্কুল থেকে বের হওয়ার পরে লতিফের সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিল—সে বোধহয় আই এ পাস করে চাকরিতে ঢুকেছিল। নিখিলও আই এ পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের দপ্তরে চাকরি নিয়েছিল। আবদুল মান্নান বিশ্বাস জাতীয় সংসদ-সচিবালয়ের কর্ম থেকে কিছুকাল আগে অবসর নিয়েছে। আমাদের আরেক সহপাঠী হাবিব থাকতো ফকিরাপুলে, শান্তিনগর থেকে সহজেই তার বাড়ি যাওয়া যেতো, তবে স্কুলজীবনের পরে তার সঙ্গে আর দেখা হয় নি।

স্কুলের বাইরে মনুই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যতোটা সময় সম্ভব, আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি। ব্যাডমিন্টন খেলেছি (কাসেম ও টুনুও ছিল দলে), পুকুরে গোসল করেছি। আমি তাকে সাইকেল চালাতে শিখিয়েছি, সাঁতার শেখাবার ব্যর্থ চেষ্টায় সে আমাকে পুকুরে বেশি পানিতে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে—তারপর থেকে আমার পুকুরে যাওয়া আব্বা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

এর মধ্যে খোঁজ পাওয়া গেল আমার কলকাতার বন্ধু কমলের। ওরা গোপীবাগে থাকে। দীর্ঘ পথ হেঁটে তার বাড়ি গেছি, সেও আমার বাসায় এসেছে, তবে কলকাতায় আমরা যেমন ছিলাম, সে-জায়গায় আর ফিরে যাওয়া হয় নি।

১০.

সেই ১৯৪৯-৫০ সালে পুরানা পল্টন ছিল ঢাকার একটি প্রান্ত ; তার মোড়ে, রাস্তার দক্ষিণ দিকটায়, বেশ বড়ো একটা একতলা বাড়ি ছিল, সেটা সর্বদাই বন্ধ থাকতো। বন্ধ বাড়ির মধ্যে রাতে উজ্জ্বল আলো জ্বলতো, তবে বাইরে থেকে কিছু দেখা যেতো না, শোনাও যেতো না। বাড়ির বাইরে শাদা পাথরে একটা নকশা-আঁকা ছিল, তাতে ফ্রি মেসনস লজ লেখা ছিল বলে মনে হয়, তবে লেখা নাও থেকে থাকতে পারে। কামরু ভাইকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম যে, ফ্রি মেসনস হলো খ্রিষ্টানদের একটা গুপ্ত দল, তারা নিয়মিত মিলিত হয় গোপনে, নির্দিষ্ট সাংকেতিক শব্দ উচ্চারণ করেই কেবল এই মিলনক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায়, ফ্রি মেসনস লজে তারা নানারকম আনুষ্ঠানিকতা পালন করে, এবং অনুরূপ লজ ছড়িয়ে আছে নানা জায়গায়—যদিও ঢাকায় এটিই একমাত্র। সেই থেকে রহস্যময় এই রুদ্ধদ্বার গৃহ সম্পর্কে আমার কৌতূহল বেড়ে গিয়েছিল, তবে তা নিবৃত্ত করার কোনো উপায় ছিল না।

ফ্রি মেসনস লজের দক্ষিণেই ছিল ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস। বেশ খানিকটা জায়গার ওপরে তৈরি অতি সুদৃশ্য কাঠের বাড়ি—মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে তার মেঝে। এর লাইব্রেরিটা ছিল খুব সমৃদ্ধ এবং অনেক ভদ্রলোক সেখানে বই

পড়তে—তার চেয়েও বেশি, বিলিতি পত্রপত্রিকা পড়তে—যেতেন। নির্মল গুপ্ত নামে এক সাহেবি চেহারার বঙ্গসন্তান বোধহয় এর পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন, তবে তার চেয়ে বড়ো কথা, সেখানে তিনি সাংবাদিকতার নিয়মিত ক্লাস নিতেন। ঢাকায় এটাই ছিল সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষণ নেওয়ার আদি ব্যবস্থা। পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকার অনেক সাংবাদিককেও তিনি হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর দপ্তরের কাছেই ছিল এ পি পি অফিস—নৈকট্যটা ছিল হয়তো প্রতীকী মাত্র—সেখানে কর্মরত ব্যক্তিদের কেউ কেউ অবশ্য শিক্ষানবিশি করতেন। অদূরে একটা গ্যারাজের মতো ঘরে হিমাংশু রায় নবাবপুর অঞ্চল থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর 'মাই স্টুডিও'—কেবল ছবি তোলার জায়গা নয়, আলোকচিত্র কেমন করে শিল্প হয়ে ওঠে, তারই নিদর্শনের স্থান।

ফ্রি মেসনস লজ আর ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসের মধ্যে ছিল একটা কানাগলি—সেখানে কিছুকাল পরে পাতলা খান লেন থেকে উঠে আসেন সংগীতশিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমদ। তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগের অ্যাডিশনাল সং পাবলিসিটি অফিসার—তাঁর ওপরের পদে কবি জসীমউদ্‌দীন কাজ করতেন, অ্যাডিশনাল সং পাবলিসিটি অর্গানাইজার হিসেবে। আব্বাসউদ্দীন চলাফেরা করতেন সাইকেলে। তিনি যেমন নিরভিমানী ছিলেন, তেমনি ছিলেন রসিক। একবার তাঁকে কে একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কেমন আছেন?' তাঁর উত্তর : 'ভালো।' প্রশ্নকর্তার আরো জিজ্ঞাসা : 'বাড়িতে সবাই ভালো?' আব্বাসউদ্দীনের উত্তর : 'আপনি তো আচ্ছা লোক, সাহেব। বাড়িতে আমার স্ত্রী আছে, তিন ছেলেমেয়ে আছে, সবাই একসঙ্গে ভালো থাকবে—এমন আশা করেন কী করে?' আমাকে একবার বলেছিলেন, 'বুঝলে, আল্লাহ্ যে আছেন, তার চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে।' আমি জানতে চাই, 'কীভাবে?' তিনি বলেন, 'তাছাড়া পাকিস্তান চলছে কী করে?' তাঁর বাড়ির নাম ছিল হীরামন মঞ্জিল—সেখানে মাঝে মাঝে সাহিত্য ও সংগীতের আসর বসতো, তাতে গণমান্য অনেকেই যেতেন, এমন কী আমার মতো সামান্যজনের জন্যেও তার দ্বার অবারিত থাকতো।

রাস্তার উত্তরে 'পরম ভবন' নামে যে-দোতলা বাড়িটি ছিল, তাতে বাস করতেন আমার খালু, তখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিন বিভাগের শিক্ষক, ডা. এ কে এম আবদুল ওয়াহেদ। তাঁর বাড়ির প্রাঙ্গণ ছিল বিশাল এবং সেখানে স্কুল-কলেজে পড়ুয়া তাঁর চার ছেলেমেয়ে—তৌহিদা (বেবীবু), তৈয়বা (রোজীবু), জব্বার (খোকন ভাই) ও সাত্তার (ছোটন) ব্যাডমিন্টন খেলতেন। খালুর ছাত্রদের মধ্যে এক-আধজন এবং পারিবারিক সূত্রে ঘনিষ্ঠদের কেউ কেউও তাতে যোগ দিতেন। এঁদের মধ্যে ডা. কামালউদ্দীন আহমদ পরে বেবীবুকে এবং তাঁর অনুজ জামালউদ্দীন আহমদ (বাংলাদেশের সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী) রোজীবুকে বিয়ে করেন। ও-বাড়িতে নিয়মিত আসতেন সৈয়দ জাফর আলী—সম্পর্কে আমাদের খালাতো ভাই, পেশায় *দৈনিক আজাদের* স্পোর্টস রিপোর্টার। আমরা তাঁকে মুন্না ভাই বলে ডাকতাম। বয়সে তিনি অনেকের চেয়ে বড়ো ছিলেন—কিন্তু তাঁকে দেখে তা বোঝা যেতো না। তাঁর চালচলন কিংবা পোশাক-আশাক থেকেও বোঝার উপায় ছিল না যে, তিনি একজন হাফেজে কুরআন। তাঁর মুখে সর্বদা হাসি লেগে থাকতো। ঢাকার যে-কোনো উল্লেখযোগ্য

খেলায় তাঁর উপস্থিতি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিছুটা কর্তৃত্ব ছিল অনিবার্য। তাঁর অমায়িক স্বভাবের জন্যে তিনি সবার প্রিয় ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি *আজাদের* সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন এবং সে-কাজে তিষ্ঠাতে না পেরে একবার চট্টগ্রাম থেকে, আবার ঢাকা থেকে, ডাইজেস্ট পত্রিকা বের করেছিলেন, তবে সে-উদ্যমে খুব সফল হননি।

ডা. ওয়াহেদের বাড়ির পাশে ছিল প্রাদেশিক সরকারের সুপারিনটেনডিং ইনজিনিয়র খন্দকার আহমদ হোসেনের বাড়ি। তিন সন্তান রেখে তাঁর প্রথম স্ত্রী মারা গেলে তিনি আবার বিয়ে করেন এবং দ্বিতীয় পক্ষেও তাঁর বেশ কয়েকটি সন্তান জন্মায়। আত্মীয়স্বজন এবং ছেলেমেয়েদের পরিচিতজনের আসা-যাওয়া ছিল যথেষ্ট, এক ধরনের কোলাহলে ও-বাড়ি ভরে থাকতো। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র খন্দকার আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ১৯৫০ সালের শেষে কিংবা ১৯৫১ সালের গোড়ায়। তিনি আমার দুই ক্লাস ওপরে পড়তেন বলে তাঁকে ডাকতাম আনু ভাই বলে, তবে আসলেই আমরা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলাম, পরস্পর তুমি বলতাম। তাঁর মারফত গোটা পরিবারের সঙ্গেই আমার অন্তরঙ্গতা জন্মে। কবি ও রাজনীতিক গোলাম কুদ্দুস ছিলেন তাঁর খালাতো ভাই। কিছুটা তাঁর প্রভাবে, কিছুটা পারিপার্শ্বিক কারণে নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আনু ভাইয়ের যোগাযোগ ছিল। সে-কারণে তাঁদের পরিবারের সবাই বেশ রাজনীতিসচেতন ছিলেন।

স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি-পরিচর্যা বিশেষজ্ঞ ডা. হাবিবউদ্দীন আহমদ ছিলেন ও-পাড়ায়। আর ছিলেন অধ্যাপক সাইদুর রহমান। তখনই তাঁর নাস্তিকতা সম্বন্ধে কানাঘুসো শোনা যেতো। পরে যখন তিনি ইসলামি দর্শন সম্পর্কে বই লিখলেন—আসলে পাঠ্য বইই—এবং তার ভূমিকা লেখালেন প্রাদেশিক গভর্নর মালিক ফিরোজ খান নুনকে দিয়ে, তখন কিছু ভ্রূ যে কুঞ্চিত হয়নি, তা নয়। তাঁর পুত্র শফিক রেহমান (সাপ্তাহিক *যায়যায়দিনের* স্বনামখ্যাত সম্পাদক) আমার এক ক্লাস উপরে পড়তেন এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ হলে জানা গেলো যে, সাহিত্যচর্চায় তিনি বিশেষ উৎসাহী—লেখেন কম, কিন্তু পড়েন বিস্তর। হাইকোর্টের বিচারপতি ইমাম হোসেন চৌধুরী তাঁদের প্রতিবেশী ছিলেন এবং বিচারপতির আশ্রয়ে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ পড়তেন ফকির শাহাবুদ্দীন আহমদ—তিনি পরে বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল হয়েছিলেন। পুরানা পল্টনে আরো ছিলেন আলী রেজা—তাঁর মেয়ে রোক্‌সানা ছিলেন বাঙালি মুসলমান মেয়েদের মধ্যে প্রথম পাইলট।

ওই এলাকায় ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্‌যোগে প্রকাশিত মাসিক *মাহে নও* পত্রিকার অফিস। এর সম্পাদক ছিলেন আলী আহমদ, পরে যথাক্রমে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, আবদুল কাদির এবং তালিম হোসেন। *পাকিস্তানী খবর* নামে একটি সাময়িকীও একই ভবন থেকে প্রকাশিত হতো। আলী আহমদ বাংলায় প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। সরকারি কর্মকর্তা—বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের ক্যাডারভুক্ত—মীজানুর রহমান অবশ্য এই ক্ষেত্রে আলী আহমদকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনিও থাকতেন পুরানা পল্টনে—তাঁর প্রথম পক্ষের সন্তান মাহবুব জামাল জাহেদীও সম্ভবত থাকতেন সেখানে। জাহেদীকে সকলে কমিউনিস্ট বলেই

জানতো। আবদুল গনি হাজারীর সঙ্গে মিলে তিনি প্রগতি-সাহিত্যের একটি পত্রিকা বের করেছিলেন *মুক্তি* নামে।

পুরানা পল্টনের শেষ মাথায় ছিল 'চলন্তিকা' রেস্টুরেন্ট। সেখানে চা পাওয়া যেতো দু আনা দামে—সচরাচর লভ্য এক আনা কাপের চেয়ে বেশিতে, তবে সেখানে চা দেওয়া হতো কাপে, আর চিনি-দুধ সরবরাহ করা হতো আলাদা পাত্রে। আমার বন্ধু মইনুদ্দীন মাহমুদ দু আনা পয়সা খরচ করে এক কাপ চা শেষ করে সরবরাহকৃত সবটুকু দুধ কাপে ঢেলে চিনি মিশিয়ে খেতে অভ্যস্ত ছিল। তাতে তার দু আনা খরচ পুষিয়ে যেতো। মইনুরা থাকতো কাছেই। রেস্টুরেন্টের নিকটবর্তী বড়ো একটা মাঠে সে ক্রিকেট অনুশীলন করতো—পরে সে পূর্ব পাকিস্তান ক্রিকেট দলের সদস্য হয়ে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলেছে। ওর আব্বা ডা. ওয়াহিদউদ্দীন মাহমুদ ছিলেন পূর্ববঙ্গের সার্জন-জেনারেল আর আম্মা ছিলেন স্বনামধন্য বেগম শামসুননাহার মাহমুদ। মইনুর একমাত্র বড়ো ভাই মামুন মাহমুদ তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন। পরে পুলিশ সার্ভিসে যোগ দেন এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম কয়েকজন শহীদের অন্তর্ভুক্ত হন।

মইনুদের খেলার মাঠের কাছে ছিল ইসমাইলি সম্প্রদায়ের জামাতখানা—তা আমাদের বেশ কৌতূহল উদ্রেক করতো। ইসমাইলিদের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং আগা খানের প্রতি অবিচল ভক্তির কথা শুনে আমরা অবাক হয়ে যেতাম। তখন প্রথম আগা খান—বর্তমান আগা খানের পিতামহ—জীবিত ছিলেন। তিনি একবার এসেও ছিলেন এই জামাতখানায় এবং আমরা রাস্তার ধারে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম তাঁকে এক নজর দেখতে। বোধহয় সেই সফরকালের আগেই আগা খান আরবিকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কেননা তাঁর ধারণায় সেক্ষেত্রে উর্দু-বাংলা দ্বন্দ্বের নিরসন হবে। জামাতখানার পাশেই ছিল বি এ খানের বাড়ি। পরে তিনি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রক হয়েছিলেন। তাঁর কন্যা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী লিলি খানের সৌন্দর্য, স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও ১৯৪৮ সালে ভাষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণের কথা তখন বেশ একটা আলোচ্য বিষয় ছিল।

এঁদের বাড়ি থেকে অথবা তা পেরিয়ে ছিল রামকৃষ্ণপুরের আরম্ভ—সেটা শেষ হয়েছিল গাজী শাহাবুদ্দিনদের বাড়িতে এসে। রামকৃষ্ণপুরের নাম আজ আর তেমন কেউ জানে না। তার কারণ, পাড়ার মসজিদে এক জুমার নামাজের শেষে স্থির হয় যে, ওই নামটা পাকিস্তানের কোনো জায়গার পক্ষে অনুপযোগী। পুরানা পল্টনের পরের এলাকা বলে তাঁরা এর নতুন নাম দিলেন নয়া পল্টন। আজিমপুরের সন্নিহিত অঞ্চলে, ই পি আরের এক নম্বর গেটের কাছে, নতুন পল্টনের খবর বোধহয় তাঁরা রাখতেন না। যাই হোক, সমবেত মুসুল্লিদের সিদ্ধান্ত-অনুসারে, বড়ো কাঠের হরফে আলাদা করে লাল-নীল-সবুজ কালিতে 'নয়া পল্টন' লিখে সারা রামকৃষ্ণপুরে সেঁটে দেওয়া হলো এবং ডাক-পিয়নকে বলে দেওয়া হলো যে, নয়া পল্টন ঠিকানায় যতো চিঠিপত্র আসবে, তা যেন রামকৃষ্ণপুরের আগের ঠিকানায় বিলি করা হয়। এইভাবে পালিত হয় পাকিস্তানের মর্যাদা সমুন্নত রাখার দায়িত্ব।

নয়া পল্টনে যাঁরা বাস করতেন, তাঁদের মধ্যে দু-একটি পরিবারের সঙ্গে আমার

বিশেষ সৌহার্দ্য হয়। আবদার রশীদের পরিবার তার মধ্যে একটি। ১৯৪৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে এম এ প্রথম পর্বের ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন এবং ১৯৫১ সালে এম এ শেষ পর্ব পাশ করে যান—উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী পেয়ে। তিনি থাকতেন তাঁর বড়ো ভাই আবদুল হালিমের বাড়িতে। তাঁর মেজো ভাই আবদুস সালাম দিনাজপুরে চাকরি করলেও বছরে একাধিকবার ঢাকায় আসতেন। তিনি যেসব কবিতা লিখতেন, তা তাঁর স্ত্রী মোসলেমা সালামের (ডলি) নামে ছাপা হতো, প্রধানত *বেগম* পত্রিকায়। এঁদের কন্যারা সবাই সংগীতকুশলী, তাদের মধ্যে সবচেয়ে নাম করেছে আবিদা সুলতানা। ওঁদের সেজো ভাইও হালিম সাহেবের সঙ্গে থাকতেন—তিনি সেতার বাজাতেন। রশীদ ভাই বাজাতেন বেহালা, গান গাইতেন অর্গ্যান সহযোগে। তাঁদের বাড়িতে একটা বড়ো গ্রন্থাগার ছিল। সমকালীন বাংলা সাহিত্যের এতো ভালো সংগ্রহ আমি আর কারো বাড়িতে দেখিনি। এই পারিবারিক সংগ্রহ থেকে বই নিয়ে পড়তে পড়তে বাংলা সাহিত্যের প্রতি আমার বিশেষ অনুরাগ জন্মায়। ছেলেবেলায় বাংলা চলচ্চিত্রের প্রভাবে সংকল্প জেগেছিল, বড়ো হয়ে আইনজীবী হবো। এখন মনে হলো, আমি ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্য পড়বো এবং অধ্যাপনা করবো।

নয়া পল্টনের বাসিন্দা ছিল আমার বন্ধু আবুল কাসেমরাও। এখনকার খ্যাতনামা স্নায়ুরোগ-বিশারদ ডা. আবদুল মান্নান তখন নয়া পল্টনে থেকেই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে পড়তেন। আরো অনেকের মধ্যে কাজী শামসুল ইসলাম ও কাজী নূরুল ইসলাম—এই দুই ভাইয়ের কথা বলা দবকার। প্রথমজন সাংবাদিকতা করতেন, তবে ক্রীড়া-সংগঠক হিসেবে অধিকতর পরিচিত ছিলেন। দ্বিতীয়জন—ডাকনাম মনু—তখন জগন্নাথ কলেজে বি এ পড়তেন। মনু ভাইয়ের ছিল একটা সবুজ র‍্যালে সাইকেল। তিনি রোজ সেটা এতো ঝাড়মোছ করতেন যে, আমাদের অনেকের কাছে তা বাড়াবাড়ি মনে হতো। বিশেষ করে, বৃষ্টির দিনে, হাতে জুতো নিয়ে, এক পা কাদা ঘেঁটে ঘরে ফিরে হাত-পা ধুয়ে যখন তিনি ঘরে রেখে-যাওয়া শুকনো সাইকেলের পরিচর্যা করতেন, তখন আমরা তাঁকে না খেপিয়ে পারতাম না।

১১.

১৯৪৯ সালে ঢাকায় প্রথম শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রেসকোর্স ময়দানে বিশাল এলাকা টিন দিয়ে ঘিরে বেশ কয়েকদিন ধরে এই মেলা হলো। তখন ইনডাস্ট্রিই বা কী, তার আর ফেয়ারই বা কী! কিন্তু টিকিট-কেনা দর্শকের কমতি হয়নি। পাটজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী হয়েছিল ভালো। কাপ্তাই পানি-বিদ্যুৎ প্রকল্পের একটা মডেল ছিল—তা দেখে দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমরা অনেকেই বেশ উৎফুল্ল হয়েছিলাম। শিল্পসামগ্রীর বাইরেও সেখানে অনেক কিছু ছিল। একটা দোকানে ঝোলানো ছিল মস্ত বড়ো এক গেঞ্জি—তাতে একটা কাগজ সেঁটে লিখে দেওয়া হয়েছিল, যার গায়ে সেটা আঁটবে, তাকে গেঞ্জিটা বিনা পয়সায় দিয়ে দেওয়া হবে।

সেটা দেখতে বেশ ভিড় জমেছিল, কিন্তু অমন অস্বাভাবিকরকম লম্বা-চওড়া মানুষ বিধাতা সৃষ্টি করেননি, কাজেই শেষ পর্যন্ত দোকানের বিজ্ঞাপন হিসেবেই সেটা কাজ করে। মেলায় কয়েকটা খাবারের দোকান ছিল। তার মধ্যে একটায় তৈরি হচ্ছিল বিশাল আকারের পরোটা। সেটা দেখতেও জড়ো হচ্ছিল অনেকে, আর কী এক হিসেবে তার ভগ্নাংশ বিক্রি হচ্ছিল, তার ক্রেতার অভাব ছিল না। মেলারই মধ্যে ঘেরাটোপ দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল—তার জন্যে আবার আলাদা টিকিট। পি সি সরকারের ম্যাজিক দেখতে সেখানে গিয়েছিলাম। আবাল্য শুনে আসছি, যাদুসম্রাট তিনি, অথচ এতকাল কলকাতায় থেকেও তাঁর ম্যাজিক দেখার সৌভাগ্য হয়নি। তাই এবার আর সুযোগ ছাড়লাম না।

দর্শনীয় বটে Sorcer-এর ম্যাজিক—সরকারের এই প্রতিবর্ণীকরণ যে Sorcerer শব্দের খুব কাছাকাছি, এটুকু জ্ঞান তখন হয়েছিল। যাদুতে তাঁর নৈপুণ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাক্-বৈদগ্ধ। তাছাড়া, তিনি একেক ম্যাজিক দেখান একেক রকম পোশাক পরে : কখনো আরব শেখের, কখনো সামরিক বড়োকর্তার, কখনো কালো স্যুট কালো বো পরে ইংরেজ সাহেবের, কখনো বা অপারেশন থিয়েটারে কর্মরত সার্জনের। প্রতি খেলার সঙ্গে যেমন সদৃশ পোশাক, তেমনি সমঞ্জস নেপথ্য-সঙ্গীত ও মঞ্চসজ্জা। সার্জন সেজেছিলেন একজনের জিভ কেটে জোড়া দেবেন, তা দেখাতে। তিনি মঞ্চে আহ্বান করেছিলেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল ডাক্তারকে। ডাক্তার নন, এমন একজন মঞ্চে উঠে গিয়েছিলেন, পি সি সরকার বাধ্য করলেন তাঁকে নেমে আসতে। তারপর মাইক্রোফোনে ইংরেজিতে বললেন : আমি শুনেছি, পূর্ব বাংলার সার্জন-জেনারেল এখানে উপস্থিত আছেন, তিনি যদি দয়া করে ওপরে আসেন, আমি কৃতার্থ হবো। ডা. ওয়াহিদউদ্দীন মাহমুদ যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে হলো। জিভ কেটে শারীরবিদ্যায় পারদর্শীর মতো সমবেত চিকিৎসকদের তিনি দেখিয়ে দিলেন, জিভের কাটা অংশের সঙ্গে বাকি অংশের যোগ কোথায়। তারপর নির্ভুলভাবে সেটা জুড়ে দিলেন। পি সি সরকার আরো একটা কাজ করেছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষদিকে পাকিস্তানের পতাকার পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, আমার জাতীয় পতাকার পাশে দণ্ডায়মান হয়ে নিজেকে আমি গৌরবান্বিত মনে করছি। সে কী তুমুল করতালি! আমি তো মুগ্ধ। তবে কি টাঙ্গাইলের এই সন্তান আমাদের মতো পাকিস্তানি হয়ে যাবেন? আমার উৎসাহের আগুনে পানি ঢেলে দিলেন কামরু ভাই। বললেন, ওটা নেহাৎ সৌজন্যের কথা, মনোমুগ্ধকর আরেক ইন্দ্রজাল।

এরকম সময়েই শখের বশবর্তী হয়ে ছোটোবু যোগ দিল পাকিস্তান উইমেন্স ন্যাশনাল গার্ডে। সালোয়ার-কামিজ পরে বেশ কদিন রাইফেল থেকে গুলি ছোঁড়ার প্র্যাকটিস করে এলো এবং এ-সূত্রে অনেকের সঙ্গে তার সৌহার্দ্য হলো। তবে কিছুকাল পরেই এসব ছেড়ে দিয়ে যে-কে-সেই হয়ে গেল।

ছোটোদুলাভাইয়ের দূরসম্পর্কিত এক ভাগিনেয়ীও পাকিস্তান উইমেন্স ন্যাশনাল গার্ডে ছিলেন। ওঁদের সঙ্গে ছোটোবুদের খুব মেলামেশা ছিল। ভদ্রমহিলা গৃহিণী, ঢাকা বেতারে নিয়মিত নাট্যাভিনয় করতেন। তাঁর স্বামী ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা, তিনি এক মেয়ে ও এক ছেলের মা। বেশ কিছুকাল পরে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি

জামাতার অগ্রজকে বিয়ে করেন। মুসলিম-পরিবারে মেয়েদের উদ্‌যোগে বিবাহবিচ্ছেদ ও তাদের পুনর্বিবাহ কমই হতো। ফলে এই ঘটনা তখন ঢাকায় বেশ আলোড়ন তুলেছিল। আমার এক মামাতো বোনেরও এমন হয়েছিল। তবে তিনি থাকতেন মফস্বল শহরে, তাঁর ক্ষেত্রে আলোড়ন যদি ঘটে থাকে, তবে বৃহত্তর আত্মীয়সমাজেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। আলোড়ন মানে নিন্দামুখরতা। সেই বয়সেই আমার মনে হয়েছিল, বিচারটা একপেশে হয়ে যাচ্ছে।

সেই সময়ে আমিও এক কাণ্ড করেছিলাম। আমাদের পাড়ায় শামসুর রহমান নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন—বোধহয় বি এ পাশ করে সদ্য ঢুকেছিলেন ছোটোখাটো কোনো চাকরিতে। প্রেমের ফাঁদ-পাতা ভুবনে তিনি এবং তাঁর প্রতিবেশিনী, স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী, ধরা দিয়েছিলেন, যদিও সে-যুগে প্রেমে পড়া খুব সহজ ছিল না। শামসুর রহমান এসে আবদুল মালেককে বললেন কী কী কথা—এসব ক্ষেত্রে বাংলা উপন্যাসের নায়কেরা যেমন বলে থাকে। মালেক ভাইয়ের অনুকম্পা হলো। তিনি মেয়েটির বাবার কাছে বিয়ের পয়গাম নিয়ে গেলেন। বাবা যথারীতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং মালেক ভাইয়ের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করলেন। এতেই প্রমাদ গণলেন মালেক ভাই। তিনি বললেন, প্রস্তাব-প্রত্যাখ্যানটা বড়ো কথা নয়, তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহারটাই বড়ো। এখন এটা তাঁরই সম্মানের বিষয়। ওই মেয়ের সঙ্গে ওই যুবকের বিয়ে হতেই হবে। তিনি মেয়েটির ইলোপ করার ব্যবস্থা করলেন এবং সেই কাজে সাহায্য নিলেন আহমদ ও আমার।

এ যেমন এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, তেমনি একটা করুণ অভিজ্ঞতাও আমার হয়েছিল। আমার একটি বোন জন্মেছিল ১৯৫০ সালে। তার নাম রাখা হয়েছিল নাজমুননেসা। তার জন্মের সময়ে আমি খুব দৌড়োদৌড়ি করেছিলাম। তবে তার সঙ্গে প্রাণের বন্ধন গড়ে ওঠার আগেই অকালে তার মৃত্যু হয়।

১২.

ঢাকার সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে যদি আমার প্রথম পরিচয় হয়ে থাকে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে, তবে তার বিস্তার ঘটে লেখক-শিল্পী মজলিসের অনুষ্ঠানাদিতে। স্কুলের সহপাঠী আহমদ হোসেন যেহেতু বেতারে নাট্যাভিনয় ও মঞ্চে কবিতা আবৃত্তি করতো, তার সঙ্গেই এই সংগঠনটির যোগাযোগ ঘটেছিল আগে এবং তার উদ্‌যোগেই আমি মজলিসের অনুষ্ঠান দেখতে যাই। প্রগতি লেখক সংঘ কিংবা প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষে পাকিস্তানে অস্তিত্বরক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়ায় প্রথমে কাজী মোতাহার হোসেনকে সভাপতি ও সরদার ফজলুল করিমকে সম্পাদক করে গড়ে ওঠে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ। সরদার ফজলুল করিম জেলে চলে গেলে সাহিত্য সংসদের কার্যক্রম থেমে যায়। এ-সময়ে আবির্ভাব হয় লেখক-শিল্পী মজলিসের, সম্ভবত ১৯৪৯ সালে। এর সভাপতি কে ছিলেন, মনে পড়ে না; তবে সম্পাদক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী। নজরুলের বহু কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন অমিয়বাবু এবং পত্রিকায় প্রকাশ করা ছাড়াও লেখক-শিল্পী

মজলিসের নজরুল-জয়ন্তীতে মূলের পাশাপাশি অনুবাদও আবৃত্তি করতেন তিনি। লেখক-শিল্পী মজলিস প্রধানত উদ্‌যাপন করতো রবীন্দ্র ও নজরুল -জয়ন্তী, তবে ইকবালের জন্ম বা মৃত্যু বার্ষিকেও অনুষ্ঠান করে বলে মনে হয়। এসব অনুষ্ঠান হতো কার্জন হলে, লিটন হলে ও মাহবুব আলী ইনস্টিটিউটে (নবাবপুর রেলওয়ে ক্রসিংয়ের ধারে, রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিনোদনের উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত দোতলা একটি মিলনায়তন)। কাজী মোতাহার হোসেন, অজিতকুমার গুহ ও অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী এতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। লিটন হলে এঁদেরই রবীন্দ্র-জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে ১৯৫০ সালে মুনীর চৌধুরীর কণ্ঠে 'সাধারণ মেয়ে' কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তখন এঁদের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-সংগীত প্রধানত গাইতেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র শাহজাহান হাফিজ (বাংলাদেশ আর্মি মেডিক্যাল কোরের উপ-প্রধানরূপে অবসরপ্রাপ্ত), আহসানুল্লাহ্ ইনজিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র সুলতানুল আলম (বহুকাল প্রবাস জীবনযাপন করে ফ্রান্সে মারা যান বলে শুনেছি) এবং গেণ্ডারিয়া অঞ্চলের অধিবাসী আফসারী খানম। অবশ্য এঁদের সবারই শিক্ষকতুল্য ছিলেন আবদুল আহাদ—ঢাকা বেতারের স্টাফ আর্টিস্ট : বেতারে এবং বেতারের বাইরে বহুজনকে গান শেখালেও অনুষ্ঠানাদিতে তেমন গাইতে চাইতেন না। শান্তিনিকেতনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আরো একজন শিল্পী ছিলেন—হামিদুর রহমান—বেতারে কখনো-সখনো গাইলেও বাইরে কখনো গাইতেন না এবং ফটোগ্রাফির নেশাকে পেশা করে তুলে নবাবপুরে এক স্টুডিও বানিয়ে সংগীতজগৎ থেকে দূরেই থেকে গেলেন। প্রাদেশিক সরকারের সং সাবলিসিটি বিভাগে কর্মরত সোহরাব হোসেন, ও বেদারউদ্দীন আহমদ এবং বেতার-শিল্পী অঞ্জলি রায় লেখক-শিল্পী মজলিসের অনুষ্ঠানে নজরুল-গীতি (তখনো নজরুল-সংগীত কথাটার চল হয় নি) গেয়েছিলেন এক-অধিবার। তবে নিয়মিত নজরুল-গীতি ও গজল গাইতেন লায়লা আর্জুমান্দ বানু—তখন বোধহয় পড়তেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (তাঁর বড়ো বোন লুলু বিলকিস বানু ফারসিতে অনার্স ও এম এ-তে প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলেন)। নজরুল-গীতি ছাড়াও শেখ লুত্‌ফর রহমান গাইতেন গণসংগীত। ফররুখ আহমদ-অনূদিত ইকবালের একটি কবিতায় সুর দিয়েছিলেন তিনি (পরে নেয়ামালও কবিতাটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছিল)। তার প্রথম চরণ : 'ওঠো দুনিয়ার গরিব-ভুখাকে জাগিয়ে দাও'। গানটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, তবে বেতারে সে-গানটি কেউ কোনোদিন গাইতে পারেননি, কেননা ও-গানের ভাব কমিউনিস্ট-আদর্শসুলভ বলে তা বেতার-কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পায়নি। অনুষ্ঠানে আব্বাসউদ্দীনকে কদাচিৎ পাওয়া যেতো, তিনি থাকলে শ্রোতাদের উৎসাহের অন্ত থাকতো না। তবে তাঁর মেয়ে ফেরদৌসী বয়সে নিতান্ত কনিষ্ঠ হলেও শিল্পীদের মধ্যে স্থান করে নিয়েছিল। আহমদ ছাড়াও আবৃত্তি করতেন মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ও রফিকুল ইসলাম (পরে যথাক্রমে জাহাঙ্গীরনগর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক)। এসব অনুষ্ঠানে যাঁদের যন্ত্রসংগীত শুনেছি বলে মনে পড়ে, তাঁদের মধ্যে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর পরিবারভুক্ত ও ঢাকা বেতারের স্টাফ-আর্টিস্ট বাহাদুর হোসেন খাঁ (সেতার) ও ফুলঝুরি খাঁর (এসরাজ) কথা মনে পড়ে। আর মনে পড়ে ওয়ারিস আলীর (দুর্ঘটনায় নিহত বিমান-চালক) গিটার এবং মোহাম্মদ হোসেন খানের তবলা-বাদন।

লেখক-শিল্পী মসলিসের উদ্‌যোগ ছাড়াও বহু অনুষ্ঠান হতো। উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিল্পীদের জন্যে ছিল আলাদা আসর আর তার মধ্যমণি ছিলেন ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ খান। তাঁর পুত্র ইউসুফ খান কোরায়শী তখন সবে নাম করছেন। আর এঁদের সঙ্গে ছিলেন মোহাম্মদ হোসেন খসরু, মুনশী রইসউদ্দীন, ফুল মোহাম্মদ খান। যন্ত্রসংগীতের দিকপাল ছিলেন ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ—কিন্তু তিনি তো থাকতেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। তাঁর বাদন বহুকাল কেবল বেতারেই শুনেছি।

ওদিকে জনসন রোডের সংলগ্ন এক গলিতে ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুলের দু-কামরা নিয়ে জয়নুল আবেদিন সরকারি উদ্‌যোগে প্রতিষ্ঠা করেন আর্ট ইনস্টিটিউট। আমিনুলের সূত্রে সেখানে যাতায়াত করি। শিল্পীরা গঠন করেছেন ঢাকা আর্ট গ্রুপ। গ্রুপের প্রথম প্রদর্শনী হয় লিটন হলে, ১৯৫১ সালে। ততোদিনে আমি কলেজে পৌঁছে গেছি।

১৩.

শান্তিনগরে নিজেদের বাসা থেকে কাপ্তানবাজারে আমাদের স্কুলে হেঁটেই যেতাম। আব্বার ডাক্তারখানা ছিল স্কুলের খুব কাছে—স্টেশন রোডে। ওই ডাক্তারখানা ছাড়িয়ে একটু আগে গেলেই পড়তো ঢাকা রেল স্টেশন—অধিকাংশ লোকেই তার উল্লেখ করতো ফুলবাড়িয়া স্টেশন বলে। ১৯৫০ সালে পাঁচ হাজার টাকায় আব্বা একটা পুরোনো অস্টিন-৮ কিনলেন নূরুল আমিন মন্ত্রিসভার সদস্য ডি এন (দ্বারকানাথ) বারুড়ীর কাছ থেকে। মন্ত্রী সেটা অল্পদিনই ব্যবহার করেছিলেন। বাড়িতে গাড়ি আছে, ড্রাইভার আছে, সময়মতো আব্বা নিজের কাজে যাবেন। আমি কিন্তু আগের মতোই হেঁটে স্কুলে যাচ্ছি। কাসেম ও টুনু ছিল আমার নিত্যসঙ্গী, অন্য স্কুলের ছাত্ররাও কেউ কেউ রাস্তায় যোগ দিতো। পথে আমরা গাছ থেকে কী এক ছোটো ফল ছিনিয়ে নিয়ে খেতাম। সেটা খাওয়ার পরে পানি খেলে বেশ মিষ্টি লাগতো।

কলকাতায় স্কুল ছিল বাড়ির কাছে, খুলনায় খালার বাড়ি ছিল স্কুলের নিকটে—টিফিন পিরিয়ডে ভাত খেয়ে নিতে কোনো অসুবিধে হতো না। ঢাকায় এসে সে-সুবিধে আর রইলো না। তাই আগে টিফিনের জন্য যে দু-চার পয়সা পেতাম, তা বেড়ে এখন চার আনায় দাঁড়ালো (নবীন পাঠকদের বলে দেওয়া ভালো যে, তখন তিন পাইতে এক পয়সা, চার পয়সায় এক আনা এবং ষোলো আনায় এক টাকা হতো)। রোজ চার আনা খরচ করতাম না; একদিন তিন আনা ব্যয় করে পরের দিন যাতে পাঁচ আনা থাকে হাতে, তার ব্যবস্থা করতাম। তিন আনা দিয়ে বিস্কুট বা বরই বা আমসত্ত্ব এবং এটা-ওটা খেতাম, আর বিনি পয়সায় খেতাম বরফ। স্কুলের কাছেই ছিল ঢাকা আইস ফ্যাক্টরি—তার গেটের কাছে বরফের বড়ো বড়ো চাঙ ভেঙে বিক্রি করা হতো। বরফ ভাঙার সময়ে তার টুকরো ছড়িয়ে পড়তো চারদিকে—টিফিনের সময়ে আইস ফ্যাক্টরির গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আমরা তা কুড়িয়ে নিলে কেউ আপত্তি করতো না। লাল-নীল-সবুজ রঙের সিরাপ দেওয়া বরফকুচি খাওয়ার লোভটা তাতে সংবরণ করা যেতো। একদিন পর পর ক্যাপিটাল রেস্টুরেন্টে গিয়ে চার আনা দিয়ে চপ এবং এক

আনায় এক কাপ চা খেতাম। আমার টিফিন-খরচা এক আনা বাড়িয়ে দিলে রোজই সেখানে খেতে পারতাম, কিন্তু বাড়ি থেকে যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তা বাড়াতে বলার কথা কখনো মনে আসেনি। মনে আসাটা তখনকার দিনে স্বাভাবিক ছিল না।

ক্যাপিটাল রেস্টুরেন্টে প্রায়ই পাওয়া যেতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রুহুল আমিনকে। এই শীর্ণকায় তরুণ ছিলেন রেভোলিউশনারি সোশিয়ালিস্ট পার্টির সদস্য। মাঝে মাঝে স্কুলের গেট থেকেও তিনি আমাকে ক্যাপিটাল রেস্টুরেন্টে নিয়ে যেতেন। তিনি আমাকে প্রধানত বলতেন নূরুল আমিন সরকারের অনাচারের কথা—সেই মর্মে প্রচারপত্রও দিতেন, নিজে পড়ে যাতে অন্যকে দিই, তাই। তবে তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য হয়তো ছিল আমাকে তাঁর রাজনৈতিক দলের প্রতি আকৃষ্ট করা।

নিজের অন্য একটা শখের কারণে টিফিন খাওয়া বিঘ্নিত হতো। ডাকটিকিট জমানোর নেশা আমাকে হঠাৎ করে পেয়ে বসেছিল। শান্তিনগর থেকে পটুয়াটুলি হেঁটে যাওয়া-আসা করতাম ডাকটিকিট কিনতে। প্রথমে নিজেই খাতা বানিয়ে তাতে স্ট্যাম্প সেঁটে রাখতাম, পরে অ্যালবাম কিনে হিন্‌জ দিয়ে টিকিট লাগাতাম। ছোটো আকার থেকে ক্রমশ বড়ো আকারের অ্যালবাম কিনে সব টিকিট আবার তাতে বসাতাম। আমাদের স্কুলের কাছে ছিল ওয়ারী পোস্ট অফিস। তার এক অবাঙালি কর্মচারী কী করে যেন ছাত্রদের ভিড় থেকে আমাকে বার করে নিয়েছিলেন। পোস্ট অফিসে গেলে তিনি টিকিট দেবেন বলতেন, সেই লোভে আমি প্রায়ই যেতাম এবং অধিকাংশ সময়ে টিকিট পেতাম। এ দাক্ষিণ্যের মধ্যে যে খানিকটা অসততা আছে, সেটা বুঝেও মেনে নিয়েছিলাম, যেমন মেনে নিয়েছিলাম টিকিট আনতে গেলে ঠিকমতো টিফিন না-খাওয়ার অসুবিধেটা। যেদিন ওয়ারী পোস্ট অফিসে যেতে হতো, সেদিন আসা-যাওয়াতেই টিফিন পিরিয়ডটা কেটে যেতো। কখনো পথে কিছু খেতে খেতে যেতাম, কখনো খাওয়াই হতো না।

এ সময়ে আমার আরেকটা ঝোঁক হয়েছিল লিপটনের চায়ের টিনের লেবেল জমানো। লেবেল জমিয়ে পুরস্কার পাওয়া যেতো। সবুজ, হলদে ও লাল—তিন রঙের লেবেল ছিল, তাদের মূল্যমানও ছিল ভিন্ন। ভালো পুরস্কার পেতে হলে ধৈর্য ধরে বেশ কিছু লেবেল জমিয়ে যথাস্থানে পাঠিয়ে অপেক্ষা করতে হতো ডাকপিওনের হাতে কী আসবে, তার জন্যে। আমার যন্ত্রণায় বাড়ির তিন পরিবার (বড়োবু, ছোটোবু ও আমাদের) লিপটনের টিন কিনতে বাধ্য হতো। মনে পড়ে, কামরু ভাইয়ের সঙ্গে একবার সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলে গেছি তাঁর বন্ধু মেসবাহউদ্দীন খানের (পঞ্চম জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য ছিলেন) ঘরে। গিয়ে দেখি, টেবিলের ওপরে লিপটনের টিন রাখা। আমি তৃষিত নয়নে একবার সেই টিনের দিকে, আরেকবার একটু ভয়ার্তচিত্তে কামরু ভাইয়ের দিকে তাকাচ্ছিলাম। আমার মধ্যে যে একটা সংকট চলছে, মেসবাহউদ্দীন তা ধরে ফেললেন। ফলে বেণীর সঙ্গে মাথাও দিলেন তিনি—চা খাওয়ালেন এবং চায়ের টিনটা ন্যাড়া করে ফেললেন।

স্কুলের কথায় ফিরে যাই। ১৯৫০ সালের গোড়ায় বার্ষিক অনুষ্ঠান হবে—তাতে মঞ্চস্থ হবে রবীন্দ্রনাথের *ফাল্গুনী* নাটক। আমাদের স্কুল থেকে সদ্য জগন্নাথ কলেজে চলে-যাওয়া অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ আসছেন মহড়ায় সাহায্য করতে—তাঁকে সেই

প্রথম আমি দেখি। আমাকে বাছাই করা হলো শেক্‌সপিয়রের *জুলিয়াস সিজার* নাটক থেকে মার্ক অ্যানটনির বক্তৃতা আবৃত্তি করতে—সেটা আমাদের কোনো পাঠ্যবইতে ছিল কিনা মনে করতে পারছি না। বক্তৃতা মুখস্থ হলো বটে, কিন্তু বলার সময়ে 'দি ইভিল দ্যাট মেন ডু লিভ্‌স আফটার দেম'—এই চরণে ডু-র পরে ছেদ না পড়ে লিভ্‌সের পরে একটা ছেদ এসে যেতো। আমাকে যতোই বোঝানো হতো যে, মাঝে ও চরণের শেষে থামতে হবে জায়গামতো, আমি তা কিছুতেই করে উঠতে পারতাম না। শেষ পর্যন্ত মার্ক অ্যান্টনি ও আমি বাদ পড়লাম।

তবে বার্নার্ড শ যখন মারা গেলেন, তখন স্কুলের শোকসভায় তাঁর সম্পর্কে লিখিত কিছু একটা পড়তে বলা হলো আমাকে। কামরু ভাইয়ের কাছ থেকে নিয়ে বার্নার্ড শ-র নাটক তখন পড়ছি। *ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যানের* শেষে যে-ম্যাকসিমগুলো ছিল, তার একটা উদ্‌ধৃত করে আমার লেখা শুরু করেছিলাম : 'লাইফ লেভেলস অল মেন, ডেথ রিভিলস দি এমিনেন্ট'। লেখাটার জন্যে শিক্ষকদের প্রশংসা পেয়েছিলাম, পরে সেটা পত্রস্থ করেছিলাম 'মুকুরে'।

১৪.

১৯৪০ সালে প্রকাশিত মায়ের *হাতেম তাই*-প্রসঙ্গে একবার উল্লেখ করেছিলাম যে, ১৯৪৯ সালে তা ঢাকায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। এবারও প্রকাশক হিসেবে আমার নাম ছাপা হয়। বইটি মুদ্রিত হয়েছিল লালবাগের তমদ্দুন প্রেসে (তমদ্দুন মজলিসের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না) এবং সেই সূত্রে এর স্বত্বাধিকারী তৈয়বুর রহমানের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা জন্মেছিল। প্রুফের প্রথম কিস্তি পেয়ে আব্বা আমাকে ডাকলেন এক ছুটির দিনের দুপুরবেলায়। বললেন, 'তোমাকে প্রুফ-দেখা শিখিয়ে দিই।' বিছানায় উপুড় হয়ে তিনি প্রুফ দেখতেন, আমি আধশোয়া অবস্থায় তাঁর পাশে থেকে প্রুফ-সংশোধন দেখতাম। প্রুফ দেখার ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ ছিল এ টি দেবের *ইংলিশ-বেঙ্গলি ডিকশনারির* শেষে দেওয়া প্রুফ-সংশোধনের নিয়মাবলি। পরে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে গিয়ে দেখলাম, তাঁর অবলম্বিত রীতি খানিকটা পালটে গেছে। যেমন, ডিলিট (বাদ) বোঝাতে তিনি বড়ো হাতের ডি লিখে তার পরে পরিষ্কার একটা টান দিতেন; আর সাধারণত তা লেখা হতো ছোটো হাতের ডিয়ের সঙ্গে পেঁচানো টান দিয়ে। হয়তো এসব কারণে *হাতেম তাইয়ের* চূড়ান্ত প্রুফ দেখে দিয়েছিলেন দৈনিক *আজাদের* জেনারেল ম্যানেজার আবদুল হাকিম খাঁ—রাজনৈতিক কর্মী মন্টু খান ও সাংবাদিক আবেদ খান তাঁর সুযোগ্য পুত্র। কোনো একটা সম্পর্ক ধরে হাকিম সাহেবকে আমি নানা বলে ডাকতাম এবং সেই সূত্রে মন্টু খান ও আমি পরস্পরকে মামু বলে এসেছি তাঁর মৃত্যু অবধি।

আবদুল হাকিম খাঁ *হাতেম তাইয়ের* প্রুফ দেখে দিলেন, বেনজীর আহমদ দ্বিতীয় মুদ্রণের ভূমিকা লিখলেন, স্বনামে লিখে দিলেন প্রশংসাবাক্য, প্রকাশক হিসেবে আমার দায়িত্ব দাঁড়ালো পত্রিকায় সমালোচনার জন্যে বই পৌঁছে দেওয়া। পত্রিকাই বা তখন

আর কতো! দৈনিকের মধ্যে *আজাদ* আর মাসিকপত্রের মধ্যে *মাহে-নও*, *নওবাহার* ও *অগত্যা*। সব কাগজে বই পৌঁছেছিলাম কিনা, তা মনে নেই, তবে *নওবাহার* ও *অগত্যায়* যে নিজে হাতে করে বই দিয়ে এসেছিলাম তাতে সন্দেহ নেই।

অগত্যা তখন নতুন বের হচ্ছে, ফজলে লোহানী তার সম্পাদক আর সৈয়দ নাসিরুদ্দীন হায়দার প্রকাশক। এঁরা যথাক্রমে আমার পার্ক সার্কাসের মন্টু ভাই ও সবুজ ভাই। *অগত্যা* ছিল হালকা চালের পত্রিকা, তবে সরকার ও প্রতিষ্ঠিত লেখকদের সম্পর্কে এর তীব্র বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা পত্রিকাটিকে জনপ্রিয় করেছিল। *অগত্যার* আক্রমণের বিশেষ লক্ষ্য ছিলেন মীজানুর রহমান (বাংলায় অতিরিক্ত আরবি-ফারসি শব্দপ্রয়োগের প্রবণতার জন্যে) ও গোলাম মোস্তফা (পাকিস্তান-অনুরাগে অতিশয়তার কারণে এবং তার ফলে মনগড়া আদর্শের মাপকাঠিতে নজরুল ইসলামের রচনার বিরূপ সমালোচনার জন্যে) এবং গল্পকারদের মধ্যে (অবাস্তবতা ও আদিরসের বাহুল্যহেতু) কামরুল ইসলাম ও সুরাইয়া চৌধুরী (সুচরিত চৌধুরীর ছদ্মনাম)। একজনের প্রসঙ্গে *অগত্যা* লিখেছিল : 'প্রতিকার আছে জানা/ মাথার উপরে সুপুরি রাখিয়া কাষ্ঠপাদুকা হানা।' তখনকার নবীন লেখকদের অনেকেই—মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, (মীজানুর রহমানের পুত্র) মাহবুব জামাল জাহেদী, ফতেহ্ লোহানী, আনিস চৌধুরী, তাসিকুল আনাম খাঁ, আলাউদ্দিন আল আজাদ, হাসান হাফিজুর রহমান এতে লিখতেন, হয়তো বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরও। এঁদের সকলের লেখায়ই একটা নতুন স্বাদ সঞ্চারিত হয়েছিল। এখন এটা সংবাদ বলে মনে হবে যে, 'ভান্টু উবাচ' নামে একটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে *অগত্যায়* প্রকাশ করেছিলেন মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, তবে তা শেষ হয়নি। *অগত্যা* চালাতে চালাতেই ফজলে লোহানী ও তাসিকুল আলম খাঁ এবং ওই গোষ্ঠীর হয়তো আরো কেউ কেউ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (মরহুম)-সম্পাদিত *পাকিস্তান টুডে* পত্রিকায় যোগ দেন। পরে, ১৯৫১ সালে, দৈনিক *সংবাদ* প্রকাশিত হলে ফজলে লোহানী ও আনিস চৌধুরী এতে যোগ দেন সহকারী সম্পাদকরূপে, তাসিকুল আনাম খাঁ হয়তো তার আগেই চলে যান দৈনিক *মর্নিং নিউজে*।

অগত্যায় কয়েক লাইনে *হাতেম তাইয়ের* দ্বিতীয় মুদ্রণের—ঠিক সমালোচনা নয়—প্রকাশের খবর বেরিয়েছিল। *নওবাহারে*, যতদূর মনে পড়ে, অনুকূল সমালোচনা হয়েছিল। সরদার জয়েনউদদীন *চন্দ্রবিন্দু* নামে একটি পকেট-পত্রিকা বের করেছিলেন খানিকটা *সচিত্র ভারতের* আদর্শে। পকেটে রাখার উপযোগী এই স্বল্পায়ু পত্রিকায় *হাতেম তাইয়ের* একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল। তবে *হাতেম তাই* তেমন বিক্রি হয়নি। আবু জাফর শামসুদ্দীনের বইয়ের দোকান কিতাবিস্তানে আমি কয়েক কপি পৌঁছে দিয়েছিলাম, দ্বিতীয়বার দেওয়ার আর প্রয়োজন হয়নি। বোধহয় বেনজীর আহমদের পরামর্শের ফলেই আব্বা ভাবলেন, বইটিকে যদি নবম ও দশম শ্রেণীর বাংলা দ্রুতপঠনের তালিকাভুক্ত করা যায়! তখন ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ডের সেক্রেটারি ছিলেন এককালের বিশিষ্ট ছাত্রনেতা আবদুল ওয়াসেক। বই আর আব্বার চিঠি নিয়ে গেলাম তাঁর কাছে। তিনি পরামর্শ দিলেন পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁর কাছে যেতে। আবার আব্বার চিঠি ও বই নিয়ে তাঁর বাড়ির

দরজায়। আমার মতো স্কুল-ছাত্রকেও অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, তবে বইটির কোনো গতি হয়নি।

তখনকার ঢাকার পত্রপত্রিকার নাম করার সময়ে অর্ধ-সাপ্তাহিক *পাকিস্তানের* কথা বলিনি। এর সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ মোদাব্বের, পত্রিকা বের হতো প্রতি শুক্রবার ও সোমবারে। কলকাতা-জীবনের শেষ পর্বে মোহাম্মদ মোদাব্বের যোগ দিয়েছিলেন দৈনিক *ইত্তেহাদে*। হয়তো সে-কারণে আর ঢাকায় এসে *আজাদের* সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করেননি তিনি। নিজের বাসস্থান ৩২ পুরানা মোগলটুলির একতলায় প্রেস বসিয়ে তিনি অর্ধ-সাপ্তাহিক *পাকিস্তান* প্রকাশ করতে থাকেন। তাঁর পরিবারের সকল সদস্যই এই পত্রিকা-প্রকাশে সহযোগিতা করতেন। সম্পাদকীয় মোদাব্বের সাহেবই লিখতেন, তাঁর স্ত্রী—শিশুসাহিত্যিক হোসনে আরা—লেখালিখিতে হাত লাগাতেন নইলে প্রুফ দেখতেন। ছেলেমেয়েরা কেউ প্রেসের কাজ তদারকি করতো, কেউ ছাপার কাগজ কিনে আনতো, কেউ গ্রাহকদের নাম ঠিকানা লিখে কাগজ ডাকে দেওয়ার ব্যবস্থা করতো। বি বি সি-খ্যাত সিরাজুর রহমান প্রথমে এই পত্রিকার নবিশ এবং পরে রীতিমতো সাব-এডিটর হয়ে যান। তবে সংবাদ তৈরি করার চেয়ে অন্য পত্রিকা—বিশেষত, কলকাতার দৈনিক *সত্যযুগ*—কেটে কেটে অর্ধ-সাপ্তাহিক *পাকিস্তানের* প্রেস কপি তৈরি করা হতো। সম্পাদকীয় এবং ফিচারজাতীয় দু-একটি লেখা ছিল মৌলিক। ১৯৫১ সালে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী চৌধুরী ওরফে মোহন মিয়া *মিল্লাত* নামে একটি দৈনিক প্রকাশ করেন, *পাকিস্তান* টিকিয়ে রেখেই মোদাব্বের সাহেব তাতে যোগ দেন সম্পাদকরূপে। পরে তিনি *মিল্লাতের* সম্পাদকীয় দায়িত্ব ছেড়ে দিলে সিকানদার আবু জাফর তার সম্পাদক হয়েছিলেন। *মিল্লাত* বেশিদিন টেকেনি, তবে *পাকিস্তান* অনেকদিন চলেছিল।

১৫.

১৯৫০এর ফেব্রুয়ারিতে সীমান্তের দুপারে সাম্প্রসায়িক দাঙ্গা বেধে গেল। কীভাবে এর সূচনা হয়, বলতে পারি না। কেউ বলেন, দাঙ্গা শুরু হয় কলকাতায়, তারপর তা ছড়িয়ে পড়ে খুলনা ও ঢাকায়। কেউ বলেন, আরম্ভ হয়েছিল খুলনায়, তার প্রতিক্রিয়া হয় কলকাতায় এবং তার প্রতিক্রিয়ায় ঢাকায়। আমরা যে-অঞ্চলে থাকতাম, সে-অঞ্চলে কিছু হয়নি, নতুন ঢাকাতেই নয়। কিন্তু পুরোনো ঢাকায় দস্তুরমতো লুঠপাট, খুনোখুনি। বাড়িতে সকলেই খুব খারাপ বোধ করছিলেন—কামরু ভাই তো বিশেষ করে—কিন্তু কারো কিছু করার সুযোগ ছিল না। আমাদের স্কুলের শিক্ষক অশোকবাবু স্কুলের কাছেই ছুরিকাহত হন এবং পরে মারা যান। অনেক শিক্ষক চলে যান সীমান্ত পেরিয়ে। এদিকে ভারত থেকে আসা নিঃস্ব অসহায় উৎপীড়িত মানুষের জন্যে শরণার্থী শিবির খোলা হয় স্কুলে। ক্লাস বন্ধ হয়ে যায় দীর্ঘ সময়ের জন্যে। কিছুদিন অপেক্ষা করে আমাদের ক্লাসের অনেকে অন্য স্কুলে চলে গেল—যেমন, কাসেম গিয়ে ভর্তি হলো কলেজিয়েট স্কুলে। তবে আমরা দশ-বারো জন মাটি কামড়ে পড়ে রইলাম। স্কুল খুলে

দেওয়ার আবেদন আমাকেই রচনা করতে হয়—তা নিয়ে আমরা কজন যাই পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে। তাঁদের অপারগতার কথা জেনে আবার যাই শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদের বাসায়। দেখা না পেয়ে ফিরে আসতে হয় বার দুই, তারপর দেখা হয়। বাড়ির বাগানে দাঁড়িয়ে আমাদের আবেদন হাতে নেন তিনি, তাতে একবার চোখ বুলিয়ে এবং আমাদের কথা শুনে প্রতিকারের আশ্বাস দেন। কিন্তু স্কুল আর খোলে না, আমি বাড়িতেই থাকি।

১৯৫০-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেমে যাওয়ার পরে দুটো মর্মান্তিক সংবাদ এসে পৌঁছোলো আমাদের কাছে : আমার এক মামা নিহত হয়েছেন, আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না আমার এক ফুফাতো ভাইয়ের।

মায়ের মামাতো ভাই সৈয়দ শুজাত আলী জার্মানি থেকে লেদার টেকনোলজি পড়ে দেশে ফিরে ঊর্ধ্বতন পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন বাটা কোম্পানিতে। সেই সূত্রে থাকতেন বাটানগরে, কোম্পানির বাড়িতে। কলকাতায় থাকতে সেখানে আমরা একবার গিয়েছিলাম—কী পরিপাটি বাড়ি! শুজু মামু মাঝে-মধ্যে কলকাতায় আমাদের বাড়ি আসতেন, তাঁকে দেখে খুব ভালো লাগতো—সুপুরুষ, সুবেশ, সুরুচিসম্পন্ন, মিত কিন্তু প্রিয়-ভাষী। দাঙ্গা শুরু হলে দুর্বৃত্তেরা এই মানুষটিকে বাড়ি থেকে বের করে আনে। দোতলা থেকে যখন তাঁর পরিবারের উৎকণ্ঠিত সদস্যেরা তাঁকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে দেখতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে, তখন বাড়ির সামনে—এবং তাঁদের চোখের সামনেই—তাঁকে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ড যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, মানসিক আঘাত কাটিয়ে উঠতে তাঁদের বহুদিন লেগেছিল।

আমার ফুফাতো ভাই সৈয়দ আবুল হোসেনের জীবনে যা ঘটেছিল, তা শুধু সিনেমার কাহিনীর সঙ্গেই তুলনীয়। তিনি ছিলেন আমার মেজো ফুফুর বড়ো ছেলে। চাকরি করতেন কলকাতায়, সপ্তাহান্তে চলে যেতেন মেদিনীপুরে—বিধবা মা, একমাত্র অনুজ ও সদ্যবিবাহিত স্ত্রীর কাছে। দাঙ্গার খবর পাওয়ার আগেই তিনি ট্রেনে করে মেদিনীপুর থেকে কলকাতা রওনা হয়েছিলেন। অল্প কিছুদূর যাওয়ার পরে ট্রেনটি আক্রান্ত হয়। বেশ কিছু যাত্রী হতাহত হয়—তাদের মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায়নি। একজন প্রত্যক্ষদর্শী (তিনি পরে ঢাকায় বাসা বেঁধেছিলেন এবং মিলাদ পড়িয়ে বেশ ভালোভাবেই দিন গুজরান করেছিলেন) অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ফুফুকে খবর দিলেন, রেলগাড়ির যে-কামরায় আবুল ভাই ছিলেন, সে-কামরা আক্রান্ত হতে তিনি দেখেছেন। কলকাতায় আবুল ভাই পৌঁছোননি এবং মেদিনীপুরেও ফিরে আসেননি—তাঁর কোনো খোঁজই পাওয়া যায়নি। রোরুদ্যমান ফুফু এক সময়ে মেনেই নিলেন যে, জ্যেষ্ঠপুত্রকে তিনি হারিয়েছেন। তাঁর তরুণী—এবং বিধবা—পুত্রবধূকে পিত্রালয়ে ফিরিয়ে নেওয়া হলো এবং ফুফুর সম্মতি নিয়েই তাঁর আবার বিয়ে দেওয়া হলো।

কিছুকাল পরে আবুল ভাইয়ের স্বহস্তলিখিত একটি চিঠি ফুফুর হস্তগত হয়। করাচি থেকে লেখা। তার মর্ম এই যে, ট্রেনটি আক্রান্ত হওয়ার পরে কামরার জানালা দিয়ে উলটোদিকে তিনি লাফিয়ে পড়েন এবং দৌড়ে পালাতে যান। তারপর তাঁর স্মৃতি লুপ্ত হয়ে যায়। কী করে কী হলো, কিছুই তাঁর মনে পড়ে না। স্মৃতি যখন ফিরে এলো তখন নিজেকে তিনি আবিষ্কার করেন করাচিতে।

পুত্র বেঁচে আছে—এর চেয়ে আর আনন্দের সংবাদ ফুফুর পক্ষে কী হতে পারে! তারপরও তিনি কঠিন মানসিক সংকটে পড়লেন। ছেলেকে কি জানাবেন যে, তার স্ত্রী পুনর্বিবাহিত? একদা যে ছিল পুত্রবধূ, তাকে কি জানাবেন যে, সধবা অবস্থাতেই তার আবার বিয়ে হয়ে গেছে? পরের কাজটি ফুফুকে করতে হয়নি। এক কান থেকে আরেক কানে এই বার্তা রটে গেল—রটবে নাই বা কেন, সংবাদটা আনন্দের—আবুল হোসেন জীবিত আছে। এতে সেই তরুণীর কী প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল, তা জানার উপায় নেই। তবে ফুফু একটু দেরি করে আবুল ভাইকেও সত্য ঘটনা জানালেন। আবুল ভাই আর মেদিনীপুরে ফিরলেন না—অন্তত বহুকাল, আর দারপরিগ্রহও করলেন না জীবনে। করাচিতেই চাকরি করে, পড়াশোনা চালিয়ে, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সহকারী গ্রন্থাগারিক হলেন। অবসর নিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের গ্রন্থাগারিকরূপে, আর বেশ কিছুকাল রোগভোগের পরে মারা গেলেন ঢাকায়।

এদিকে আবদার রশীদের মুখে শুনলাম, তাঁদের অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের শিক্ষক সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় গোপীবাগের দিকে ছুরিকাহত হন, কিন্তু প্রাণে বেঁচে যান। সুস্থ হয়ে উঠে তিনি চলে যান পশ্চিমবঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো অনেক শিক্ষক এমনি করে চলে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ গণেশচরণ বসুও ছিলেন।

১৬.

কথা বলতে বলতে মনু আর আমি একদিন ঠিক করে ফেললাম, হাতে-লেখা একটা মাসিকপত্র বের করবো। মনু হবে প্রকাশক, আমি সম্পাদক। পত্রিকার নামও স্থির হয়ে গেল, 'মুকুর'। শেষ পর্যন্ত চৈতন্য হলো যে, পত্রিকা-সম্পাদক হিসেবে আমি যথেষ্ট মানানসই নই। তখন কাজী নূরুল ইসলামের কাছে গিয়ে প্রস্তাব করলাম, তিনি ও আমি দুজনে সম্পাদনা করবো। তিনি সম্মত হলেন। মূলত তিনি সুন্দর হাতের লেখায় আমাদের দুজনের সংগৃহীত ও সম্পাদিত লেখাগুলো চূড়ান্তভাবে নকল করে দিতেন। আমরা জনসন রোডের রয়্যাল স্টেশনারি থেকে বেশ দামি কাগজ কিনতাম পত্রিকার জন্যে। আবদার রশীদের ঘাড়ে ছিল সচিত্রকরণের ভার। কয়েক সংখ্যা পরে কাজী নূরুল ইসলাম দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ায় সেই স্থান নিলেন রশীদ ভাই। আমিনুল ইসলাম ও মুর্তজা বশীর আমাদের পত্রিকার জন্যে ছবি দিয়েছিলেন। প্রধান লেখকদের মধ্যে আবদার রশীদ, নেয়ামাল বাসির ও আমি ছিলাম, তাছাড়া অনেকের লেখা সংগ্রহ করতে পারতাম এবং আমার চেয়ে বয়সে বড়ো লেখক বা লেখিকার রচনা অমনোনীত করতে ইতস্তত করতাম না। কামরু ভাই অনুবাদ করতে শুরু করেছিলেন বার্নার্ড শ-র *ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান*, তবে সেটা সম্পূর্ণ হতে পারেনি। তবু হাতে-লেখা পত্রিকায় শ-র নাটকের অনুবাদ সামান্য বিষয় ছিল না। আমি অনেক কিছু লিখতাম : সম্পাদকীয়; *সচিত্র ভারতের* অনুকরণে কৌতুককর ঘটনার সংক্ষিপ্ত বা গুরুতর কোনো উদ্‌ধৃতি এবং সেই সঙ্গে সরস মন্তব্য; ছোটোগল্প—তার মধ্যে কিছু ছিল বনফুলের

প্রভাবজাত নিতান্ত ক্ষুদ্র রচনা; প্রয়োজনে রাজনৈতিক বিষয়ে খোলা চিঠি। কবুল করবো, কবিতা লেখার দুঃসাহসও করেছিলাম, তবে বেনামিতে। পাঠ্যবই থেকে মার্কিন কবি জেমস রাসেল লাওয়েলের 'ইউসুফ' কবিতাটি ছন্দে অনুবাদ করে দিয়েছিলাম। একটি কবিতা আমি শুরু করেছিলাম, শেষ করেছিল নেয়ামাল। সেটার কথা আমার মনেই পড়তো না, যদি না *নেয়ামাল* বাসির গ্রন্থে (ঢাকা, ১৯৯৩) আবুল আহসান চৌধুরী তা সংকলন করে দিতেন। আমাকে না জানিয়েই কবিতাটি নেয়ামাল ছাপিয়েছিল *ইনসাফ* পত্রিকায়, 'তোমাকে' শিরোনামের নিচে লিখেছিল 'সনেটটি একক মস্তিষ্কের অভিব্যক্তি নয়'। কবিতাটি এই :

তোমায় আমায় দেখা হয়েছিল যবে
আকাশে তখন ছিল নাকো কোনো চাঁদ,
স্বপন-পরীরা আসেনিকো কলরবে,
মায়ার মালায় পড়েনিকো কোনো ফাঁদ।
তোমায় আমায় দেখা হয়েছিল বলে
বনের পাখিরা আসেনিকো গান গেয়ে,
উষার বাতাসে, ফুলের সুরভি-তলে
প্রেমের মধুর মিনতি যায়নি ছেয়ে।

তোমায় দেখেছে নীরবে আমার আঁখি
তুমিও দেখেছ কতকাল ধরে মোরে
তোমার মুখেতে মুখখানি মোর রাখি,
বলিয়াছি : প্রিয়ে, চল যাই দূরে সরে।
আমরা তবুও পারিনি পুরাতে সাধ।
নিয়তি? বিধাতা? কার এই অপরাধ?

আমি আট চরণ লিখে নেয়ামালকে ওটা দিয়েছিলাম শেষ করার জন্যে। দেখছি, সে আমার প্রথম ছয় চরণ রেখে নিজে বাকি আট চরণ রচনা করেছিল। তাছাড়া, আমার 'তোমায় আমায়' ছাপা হয়েছে 'তোমার আমার' এবং 'পাখিরা' ছাপা হয়েছে 'কোকিলা'। আমার রচনাংশ ছিল কৌতুকপ্রবণ—নেয়ামালের হাতে তা গুরুতর প্রেমের কবিতা হয়ে ওঠে।

আমার সাহিত্যসাধনা কেবল হাতে-লেখায় সীমাবদ্ধ ছিল না, সে-কথাটা এখানে জানান দেওয়া ভালো। খুলনার হাতে-লেখা পত্রিকা 'সংকেতে' আমার যে-গল্প 'টেলিফোন' নামে পত্রস্থ হয়েছিল, সেটা আমার কাছে ছিল না। ঢাকায় এসে আমি তা আবার নতুন করে লিখি। তখন গোলাম মোস্তফা *নও-বাহার* পত্রিকা পরিচালনা করতেন, সম্পাদক হিসেবে ছাপা হতো ওঁর স্ত্রী মাহফুজা খাতুনের নাম। দ্বিতীয় 'টেলিফোন' তাঁর হাতে না দিয়ে ডাকে পাঠিয়ে দিলাম পত্রিকার অফিসে। কিছুকাল পরে মোস্তফা আজিজ খবর দিলেন, 'তোমার গল্প *নও-বাহারে* ছাপা হচ্ছে।' সেই সংখ্যা বের হলো ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরে, তাতে আমার গল্প এবং নিচে স্বাক্ষর এ টি এম আনিসুজ্জামান। ছাপার অক্ষরে আমার নাম দেখে খুশি হয়ে বোধহয় বাড়ির সকলে গল্পের পাকামি মাফ করে দিয়েছিলেন। এর পরপরই আলী আহমদ সাহেব আমাদের বাসায় এসে হাতে-লেখা 'মুকুরে' আমার অতি ছোটোগল্প 'মশা' পড়ে বললেন কপি

করে দিতে—*মাহে-নও*তে ছেপে দেবেন। এবারে আমি নামের আগের ইংরেজি বর্ণগুলো বাদ দিলাম। সম্পাদক আমার লেখায় হাত দিলেন না, কিন্তু নামটা শুদ্ধ করে দিলেন আনিস-উজ-জামান। গল্পটি ছাপা হয়েছিল, যতদূর মনে পড়ে, ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়। একাধিক পত্রিকায় গল্প মুদ্রিত হওয়ায় আনন্দিত হয়েছিলাম ঠিকই, এবং আত্মবিশ্বাসও কিছু জন্মেছিল। তবু 'মুকুরে' সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে লেখা পত্রস্থ করে যেন বেশি তৃপ্তি পেতাম।

হাতে-লেখা 'মুকুর' বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। শান্তিনগর-নয়া পল্টনের সীমানা ছাড়িয়ে তা দ্রুত পৌঁছে গেল সিদ্ধেশ্বরী-পুরানা পল্টনে এবং, মনুর মামাবাড়ির সূত্রে, রোকনপুরে। শফিক রেহমান একটা গল্প দিলেন, সেটা সংশোধন করে দেওয়ার জন্যে আমি আবার পাঠিয়ে দিলাম তাঁকে। এ-ঘটনা যে তিনি ভোলেন নি, তা টের পেলাম, যখন তাঁর *রিপুকাহিনী* (ঢাকা, ১৯৭২) প্রকাশিত হলে তার একটি কপি উপহার দিতে গিয়ে আমাকে তিনি উল্লেখ করেছিলেন 'আমার প্রথম সম্পাদক' বলে। আবদুল হাইয়ের ভৈরববাসী মামা মিন্নাত আলী তখন কলেজের ছাত্র এবং উঠতি গল্প-লেখক। চিঠি লিখে তাঁর কাছ থেকেও লেখা আদায় করলাম। সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এ কে এম সাদেক তখন ওই মহল্লার বাসিন্দা, বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এম এ পড়েন, তিনিও 'মুকুরে' লিখতেন। 'মুকুর' আমার অনেকটা সময় অধিকার করে রইলো। তবু ছাপার হরফে নিজের নাম দেখার লোভ রয়ে গেল। বনফুলের ক্ষুদ্রাবয়ব ছোটোগল্পের রূপটি আমার খুব ভালো লেগেছিল। 'শিক্ষার মূল্য' নামে এমনি তিনটি গল্প লিখে *আজাদ* অফিসে গিয়ে সাহিত্য-সম্পাদক আহসান হাবীবের কাছে রেখে এলাম। তার প্রথম দুটি তিনি ছেপে দিয়েছিলেন।

'মুকুর' ছাড়া তখন আমাকে যা পেয়ে বসেছিল, তা আড্ডা। ১৯৫০ সালে স্কুল বন্ধ থাকায় যে-স্বাধীনতা পেয়েছিলাম, উত্তরোত্তর তার সীমা প্রসারিত হচ্ছিল। শান্তিনগরে মজিদ সাহেবদের বাড়ির পাশে খালি জমিতে বেড়ার ঘর তৈরি করে এক তরুণ অর্ধেকটায় খুললেন জেন্টস রেস্টুরেন্ট, বাকি অর্ধেকটায় জেন্টস লন্ড্রি। ওটাই আড্ডার প্রশস্ত স্থান হয়ে উঠলো। মনু অতটা নয়, কিন্তু আমি ও মালেক ভাই সময় পেলেই সেখানে চলে যেতাম। আমার কাছে বন্ধুবান্ধব এলে বাড়িতে না বসিয়ে ওখানে নিয়ে গল্প করতাম। তখন বাড়ি থেকে দৈনিক আট আনা হাত-খরচ মনজুর হয়েছে। সুতরাং রেস্টুরেন্টে কেবল বসে থাকতাম না, চায়ের সঙ্গে চিনি-দেওয়া টোস্ট কিংবা ফ্রাই-করা ডিম—আমাদের পরিভাষায় ডিম পোচ—খাওয়া চলতো অনায়াসে। একবার মালেক ভাইয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে পরপর সাতটি ডিম পোচ খেয়েছিলাম বলে মনে পড়ে। অবশ্য তা সম্ভব হয়েছিল ওখানে বাকিতে খাওয়া চলতো বলে। রেস্টুরেন্টের মালিক আমার ওপর এমন ভরসা করতে শুরু করলেন যে, তিনি কোথাও গেলে রেস্টুরেন্ট ও লন্ড্রি দেখার ভার দিয়ে যেতেন আমাকে। সানন্দচিত্তে আমিও তা করতাম। লন্ড্রির কাপড়ের রসিদ লেখার কাজ আমার এতো পছন্দ হয়ে গিয়েছিল যে, অনেক সময়ে, মালিক উপস্থিত থাকলেও, আমি আগ বাড়িয়ে রসিদ লিখে দিতাম।

ওদিকে আমিনুল ইসলামের সৌজন্যে আমার পরিচয়ের সীমাও বাড়তে থাকলো। তিনি একদিন বললেন, 'আমাদের এক বন্ধু যক্ষ্মায় আক্রান্ত, আমি তাকে নিয়মিত

দেখতে যাই। তুমি যদি চাও, নিয়ে যেতে পারি, আলাপ করে ভালো লাগবে। তবে যক্ষ্মারোগীর কাছে যাবে কিনা, ভেবে দেখো।' আমি যেতে রাজি হয়ে গেলাম। আমিনুলের সাইকেলের সামনে চড়ে লক্ষ্মীবাজারে এক বাড়িতে গিয়ে শয্যাশায়ী সাদেক খানের সঙ্গে পরিচিত হলাম। পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতে ডবল অনার্স পড়তে পড়তে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। যক্ষ্মার চিকিৎসা তখন খুব আদিম স্তরে—বেশ কষ্টকর এবং ব্যয়সাপেক্ষ। কমিউনিস্ট পার্টির সংস্রবের কারণে তিনি বোধহয় বাড়ি থেকে তেমন অর্থসাহায্য পেতেন না। চাচার আশ্রয়ে থেকে তাঁর চিকিৎসা চলতো। তাঁর অমায়িক আলাপে মুগ্ধ হয়ে আমিনুলের সঙ্গে আরো কয়েকবার গেছি।

এভাবে আমিনুলের দৌত্যে আলাপ হয়েছিল মুর্তজা বশীরের সঙ্গে। কমিউনিস্ট পার্টির পোস্টার লাগাতে গিয়ে ধরা পড়ে জেল খেটে তখন সদ্য বেরিয়ে এসেছেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র এই কনিষ্ঠ পুত্র। তাছাড়া যোগাযোগ ঘটলো হাসান হাফিজুর রহমানের সঙ্গে। বি এ পাশ করে আর্থিক কারণে এম এ না পড়ে তিনি *বেগম* পত্রিকা দেখাশোনা করতে শুরু করেছেন। তাঁর কবিতা পড়েছি আশরাফ সিদ্দিকী ও আবদুর রশীদ খান-সম্পাদিত *নতুন কবিতায়* (ঢাকা, ১৯৫০)। আলাপ হলো বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের সঙ্গে—*নতুন কবিতা*-সংকলনের শেষ অর্থাৎ কনিষ্ঠতম কবি, আমার চেয়ে মাত্র এক ক্লাস ওপরে পড়ে—এবং ঢাকা কলেজের হস্টেলে থাকে। এই পরিচয়-পর্বের মধ্য দিয়ে আমি নতুনের হাতছানি দেখতে পাই।

১৭.

প্রমথ নিবাসে ছিল তিনটি শোবার ঘর : আমরা, বড়োবুবু ও ছোটোবুবু এক এক ঘরে বাস করতাম। চিলেকোঠার ঘরটা ছিল কামরু ভাইয়ের। রান্নাবান্না আলাদা হতো প্রত্যেক পরিবারে, তবে আদানপ্রদান খুব চলতো। ছোটোদুলাভাই খেতে ভালোবাসতেন : রোববারে সাইকেল চালিয়ে তিনি চলে যেতেন নয়াবাজার, শামবাজার বা অন্য কোনো বাজারে—তখন তিন পরিবারের জন্যেই বাজার করে আনতেন। মস্ত বড়ো মাছ এনে ভাগ করা হতো, মোরগ-মুরগি আসতো বেশ কটি, তরকারিও বিস্তর। তবে বাজার করে এনেই ছোটোদুলাভাই তাঁর সাপ্তাহিক বিনোদনে বসে যেতেন : সদ্যক্রীত মোরগের সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে দিতেন ঘরে-পোষা মোরগের—পরাজিত মোরগটি জবাই করা হতো। ছোটোদুলাভাইয়ের বাজার আব্বার খুব পছন্দ ছিল, কিন্তু এই মোরগের লড়াই তিনি পছন্দ করতেন না। তবে ছুটির দিনেও তিনি ডাক্তারখানায় যেতেন বলে এসব তাঁকে চোখে দেখতে হতো না। দুই দুলাভাইই হাঁস-মুরগি পালতেন, বাড়ির ভেতরের জমিতে তরিতরকারির চাষ করতেন বড়োদুলাভাই—তাঁর কপিক্ষেতটা ছিল বেশ বড়ো। একবার বড়োবুবুর কী এক কথায় রেগে গিয়ে এক নিমেষে একটা দা নিয়ে পুরো কপিক্ষেত উজাড় করে দিলেন আর ফিরতি পথে দায়ের উলটো দিক দিয়ে আঘাত করে হাঁসমুরগির ঘর দিলেন ভেঙে। মাঝে মাঝে ছোটোদুলাভাই ও কামরু ভাইয়ের মধ্যে খাওয়ার প্রতিযোগিতা লেগে

যেতো। বড়োবুর ছোটো ছেলে হারুনের আকিকা-উপলক্ষে সেবারে পোলাও-খাসির গোশ্‌ত-মুরগির আয়োজন হয়েছিল বড়োবুর ঘরে : দুজনে বোধ হয় পাঁচ-ছ প্লেট করে খেয়েছিলেন। খানিক পরে দেখা গেল ছোটোদুলাভাই এক কুড়ুল নিয়ে বাড়িতে রাখা গাছের গুঁড়ি চেলা করছেন, আর কামরু ভাই স্কিপিং করছেন ছাদে।

বাড়িতে বসেই বিক্রেতাদের কাছ থেকে দুধ-ডিম, হাস-মুরগি, তরি-তরবারি কিনতে পাওয়া যেতো। দুপুরের দিকে 'এই যে টাটকা লালমোহন, ক্ষীরমোহন, মিষ্টি দই, পাতক্ষীর' হেঁকে আসতো মিষ্টিওয়ালা। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র ছিল তরুণ ধোপা রূপলাল। নবাবপুরের দিকে একটা গলিতে সে থাকতো—সপ্তাহে একদিন এসে ধোয়া কাপড় ফেরত দিয়ে আবার ময়লা কাপড় নিয়ে যেতো। সে কাপড় ধুতো শ হিসেবে, কিন্তু শ পুরোবার আগেই মাঝে মাঝে দরজায় ঠেশ দিয়ে লজ্জিতমুখে বলতো, 'বাবু, ট্যাকার বড়ো ঠ্যাকা।' লজ্জিত ভঙ্গিটা তার অভিনয়ের অংশ বলে মনে হতো, তাই সবসময়ে তার কথায় মন গলতো না। একবার কামরু ভাইয়ের সাইকেলের সামনে বসে নবাবপুর দিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, 'ওই দেখো, আমার শার্ট পরে রূপলাল যাচ্ছে।' পরের সপ্তাহে তাকে ধরা হলো। প্রথমে সে স্বীকার করবে না, শেষ পর্যন্ত কৈফিয়ত দিলো এই বলে যে, কখনোই সে খদ্দেরদের কাপড় পরে না, বিশেষ ঠ্যাকায় পড়ে ওইদিনই কেবল সে শার্টটা পরেছিল, আর তার এমনি ভাগ্য যে, বাবুর সামনে পড়ে গেল—এখন কী করে সে বোঝাবে যে সত্যিই সে অমন করে না। রূপলালের কথা আমরা কেউ বিশ্বাস করিনি, কিন্তু তাকে কাপড় দেওয়া বন্ধ হয়নি।

১৯৫০ সালে বড়োদুলাভাই বদলি হয়ে চলে গেলেন বরিশালে। মনুর আব্বা বাড়ির সঙ্গে গোটাদুই টিনের ঘর বানালেন—তার একটা ভাড়া নিয়ে ছোটোদুলাভাইও স্বতন্ত্র হয়ে গেলেন। রয়ে গেলেন কেবল কামরু ভাই—তাঁর প্রভাব ক্রমেই গভীরভাবে আমার ওপর পড়ছিল। মুসলিম লীগ সরকারের দুঃশাসন সম্পর্কে তিনি অবহিত করতেন; রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটির তাৎপর্য বুঝিয়ে বলতেন; কোনো কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের ভালোমন্দ ব্যাখ্যা করতেন। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও তাঁর অনুরাগ ছিল সাহিত্যে—বাংলা তো পড়তেনই, ইংরেজিও পড়তেন এবং আমাকেও পড়তে উদ্‌বুদ্ধ করতেন। বুঝি আর না বুঝি, তখনই যে আমি বার্নার্ড শ-র কয়েকটি নাটক পড়েছিলাম, সে তাঁরই দৌত্যে। তাঁকে মান্য করে অন্তত একটি বই পড়িনি—*লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার।* এই নিষিদ্ধ গ্রন্থের একটি কপি কীভাবে যেন পেয়েছিলেন আবদার রশীদ। তাঁর পড়া হয়ে গেলে জানতে চেয়েছিলেন আমি সেটা পড়তে চাই কিনা। আমার হাঁ-সূচক উত্তর পেয়ে বইটা দিয়েছিলেন আমার হাতে। আমাকে তা পড়তে দেখে কামরু ভাই বললেন, 'এ বই পড়ার বয়স তোমার হয়নি।' আমি সঙ্গে সঙ্গে পড়া বন্ধ করে দিলাম। রশীদ ভাইকে বইটা ফেরত দিতে গিয়ে জানলাম, তাঁকেও কামরু ভাই বলেছেন, বইটা আমাকে দেওয়া তাঁর উচিত হয়নি।

কামরু ভাইয়ের কাছে তাঁর কয়েকজন বন্ধু আসতেন—তাঁদের সঙ্গেও আমার বেশ ভাব হয়ে যায়। একজন হায়দার ভাই—তাঁকে আবার প্রায়ই ডাকযোগে চিঠি লিখতেন কামরু ভাই। দেখা হয় অথচ চিঠি লেখেন কেন, জানতে চাইলে কামরু ভাই বলেছিলেন, 'যে-বিষয় নিয়ে চিঠি লিখি, সে-সম্পর্কে সামনাসামনি আলোচনা করি না।'

আমি আর অধিক জানতে চাইনি। কামরুদ্দীন সাহেব—পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অনুষদের ডিন ছিলেন অনেকদিন—আসতেন; তাঁকে আমি ডাকনামে কবীর ভাই সম্বোধন করতাম। রফিকুল আলম ওরফে লুলু ভাই ছিলেন ইতিহাসের ছাত্র এবং বামপন্থী; তিনি থাকতেন ৭ নম্বর ময়মনসিংহ রোডে, সে-বাড়িতেও আমি গিয়েছি। রসায়ন না মৃত্তিকাবিজ্ঞানের ছাত্র রফিকুল ইসলাম সংশ্লিষ্ট ছিলেন গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে একদিন তাঁর খালাতো ভাই মুনীর চৌধুরীর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায়, নীলক্ষেতে, গিয়েছিলাম—মুনীর ভাই সেদিন ঘরে ছিলেন না। এই দুই রফিকই বিলেতে গিয়ে দেশান্তরী হয়ে গেলেন। তৃতীয় রফিকও—এখনকার আইনজীবী ড. রফিকুর রহমান—বন্ধুর মতোই ব্যবহার করতেন আমার সঙ্গে। পরে তিনি বিয়ে করেছিলেন আমার একমাত্র মামাতো বোন—অর্থাৎ কামরু ভাইয়ের ছোটো বোন—হালিমাকে। কামরু ভাইয়ের সঙ্গে এদিক-ওদিক যথেষ্ট ঘুরেছি—হিমাংশু রায়ের 'মাই স্টুডিও'তে, তোপখানায় আবদুল মতিনের ইউ পি পি অফিসে, সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলে। এই হলে একবার গিয়েছিলাম অনুষ্ঠান দেখতে : গণেশ (পরে গওহর জামিল) ও তাঁর বোন শিপ্রা এবং রওশন জামিল (মনুর খালা) ও তাঁর ভাই শাহেজ করিম (পরে আমার সহপাঠী)—এঁদের পরিবেশিত নৃত্য বেশ উপভোগ করেছিলাম।

স্কুল বন্ধ থাকায় আমার কোনো ধরাবাঁধা রুটিন ছিল না, পাঠ্যপুস্তক পড়ারও কোনো তাগাদা ছিল না। বাড়ির কোনো কাজ করতে হতো না, আমি স্কুলের লেখাপড়া করছি না উপন্যাস পড়ছি বা গল্প লিখছি, তা দেখার কেউ ছিল না। আব্বা কোনোদিনই সেদিকে খেয়াল করেননি। তিনি সকালে চলে যেতেন নিজের চেম্বারে, দুপুরে বাড়ি এসে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে আবার যেতেন বিকেলে, ফিরতেন রাতে। সংসারের কাজ সেরে মা খবরের কাগজ পড়তে বসতো। সন্ধ্যায় কখনো কখনো আমার সঙ্গে গল্প করতো : নিকটতম আত্মীয়দের কথা, নিজের জীবনসংগ্রামের বিবরণ। আমি ব্যস্ত থাকতাম নিজের জগতে 'মুকুর' নিয়ে এবং অনুরূপ কাজ নিয়ে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে। একবার ঢাকার রাস্তার নির্দেশিকা রচনায় লেগে গেলাম—তাতে কিছু অতিরিক্ত হাঁটতে এবং সময় ব্যয় করতে হয়েছিল। নাটকের গঠন সম্পর্কে যখন কোনো ধারণাই ছিল না, তখন পলাশি থেকে দেশভাগ পর্যন্ত ঘটনা নিয়ে 'দুশো বছর' নামে অসংখ্য দৃশ্য-সংবলিত একটি নাটক লিখে ফেললাম। সেটা এতোই কাঁচা হয়েছিল যে, 'মুকুরে' পর্যন্ত তার ঠাঁই হয়নি, তবে এই উপলক্ষে এই সময়কার ইতিহাস সম্পর্কে আমার খানিকটা ধারণা হয়েছিল।

নেয়ামাল ও আহমদ এলে চিলেকোঠায় বসে গল্প করতাম। নেয়ামালের আস্তানায়ও যাওয়া হতো, আহমদের বাসায় কম। মনু তো ছিলই। সে একদিন বললো তাদের ভৈরব-বাসকালে অর্জিত বন্ধু আবদুল হাইয়ের (*চিত্রালীর* জনপ্রিয় উত্তর-দা এবং জীবনের শেষে *প্রথম আলোর* সঙ্গে যুক্ত এ টি এম আবদুল হাই) কথা। জানা গেল, হাই আমারও এক ক্লাস ওপরে পড়ে, কিন্তু মনুর বন্ধু। মনুর দৌত্যে তার সঙ্গে পত্রমিতালি হলো। চিঠি লেখায় তার জুড়ি পাওয়া ভার। সাহিত্য-সিনেমা-রঙ্গরস—এসব ছিল চিঠির বিষয়। আমরা আবিষ্কার করলাম—ষড়যন্ত্র করলাম বলাই অধিক সংগত—ডাক বিভাগের আয় না বাড়িয়েও চিঠি লেখা চলে। 'হাই, পাকিস্তান

হাউজ, ভৈরব, ময়মনসিংহ' লেখা খামের মুখটা আলগা করে বন্ধ করে তাকে চিঠি পাঠাতাম। উত্তর লিখে সে নিজের নামটা অক্ষুণ্ন রেখে একই খামে ঠিকানা বদলে 'প্রমথ নিবাস, শান্তিনগর, ঢাকা' লিখে 'রিডাইরেক্ট' করে দিতো। এটাও ছিল আমাদের চিঠি-লেখালিখি উপভোগ করার অঙ্গ।

এই অসাধুতার পাশাপাশি আমার ধর্মে মতি হলো আকস্মিকভাবে এবং তা মনুকেও সংক্রমিত করলো। মনুদের বাড়ির সামনে, আমাদের খেলার মাঠের একধারে, টিনের একটা মসজিদ উঠেছিল (এখন সে-জায়গায় গাজী-ভবনের সামনের বড়ো রাস্তা, মসজিদটা দক্ষিণে সরে গিয়ে পাকা দোতলায় পরিণত হয়েছে)। মনু ও আমি সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে শুরু করলাম এবং তিরিশটা না পারলেও রোজা রাখতে আরম্ভ করলাম। আমি একাধিকবার আজান দিয়েছি মসজিদে এবং এক-আধবার ইমামতিও করেছি (মুসুল্লিদের দুর্ভিক্ষ যে মাঝে মাঝে হতো, এ থেকে তা বোঝা যাচ্ছে)। পাড়ার মুরুব্বিরা আমাদের দুজনের সম্পর্কে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করলেন। একদিন জুম্মার খোতবার সময়ে ইমাম সাহেব সারা বিশ্বের মুসলমানদের কল্যাণ এবং কাশ্মির ও ফিলিস্তিনের মুসলমানদের মুক্তিকামনার সঙ্গে সঙ্গে ইহুদি ও হিন্দুর ওপরে আল্লাহ্‌র লানত যেন নেমে আসে, সেই প্রার্থনা করলেন। আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। যিনি মানুষের দুর্দশা চান, তাঁর পেছনে নামাজ পড়তে ইচ্ছে হলো না। আমি মসজিদে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। মনুও আমাকে অনুসরণ করলো।

ওপরে আমাদের খেলার মাঠের কথা বলেছি। মাঠটা খেলার ছিল ঠিকই, কিন্তু বহুবচনের গৌরব আমার প্রাপ্য নয়। ব্যাডমিন্টন ছাড়া আমি কিছুই খেলতাম না। ক্রিকেটে স্কোরার এবং ফুটবলে কখনো লাইনসম্যান, দু-একবার রেফারি। একবার দু-পাড়ার ফুটবল খেলায় রেফারির দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মার খাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। বিক্ষুব্ধ দলের জন-দুই খেলোয়াড়ের বদান্যতায় সে-যাত্রা রক্ষা পেয়েছিলাম।

এর মধ্যে একদিন আমাদের স্কুলের শিক্ষক ভবেশবাবু খবর পাঠালেন, বেতারে স্কুল-ছাত্রদের অনুষ্ঠানে নিজেদের স্কুলের হয়ে বিতর্কে অংশ নিতে হবে। যত্ন করে স্ক্রিপ্ট লেখা হলো, বোধহয় একবার তা বিনিময়ও করা হলো, তারপর একদিন গেলাম নাজিমউদ্দীন রোডে ঢাকা বেতারের স্টুডিওতে। অনুষ্ঠানের পরিচালক ফররুখ আহমদ। দেখলাম, তিনি ফুলসক্যাপ সাইজের একটা শাদা কাগজ সামনে ধরে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন। আমাদের বিতর্কটা ছিল দুই স্কুলের দুজন করে ছাত্রের মধ্যে। অনুষ্ঠান শেষ করে ভবেশবাবুর নির্দেশমতো ডিউটি রুমে গিয়ে পেলাম পাঁচ টাকার একটি নতুন কড়কড়ে নোট। সেই আমার প্রথম রোজগার।

১৮.

সেকালে নতুন ও পুরোনো ঢাকার সীমারেখাটা টেনে দিয়েছিল নবাবপুরের প্রান্তে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেলসড়কের ফটকটি। ফটকটির এদিকে ঢাকার ডাকবাংলো দিয়ে শুরু হয়েছিল নতুন ঢাকার নিশানা। ডাকবাংলোর একতলায় ভালো রেস্টুরেন্ট ছিল, তবে

অভিজাত বলে পরিচিত ছিল আরেকটু সামনের ডিয়েনফা। নামটি নাকি ছিল ঢাকা নওয়াব ফ্যামিলি অ্যাসোসিয়েশনের আদ্যক্ষরের যোগফল—শুধু ডি-র পরে একটা আই বসানো হয়েছিল। ডিয়েনফার মুখোমুখি ব্রিটানিয়া সিনেমা হল : জীর্ণদশা, তবু ভালো ভালো ইংরেজি ছায়াছবি প্রদর্শনের জায়গা। ডিয়েনফায় খাওয়ার এবং ব্রিটানিয়ায় ছবি দেখার আকর্ষণ ছিল দুর্বার। এক গ্রীষ্মের ছুটিতে আমার মামাতো বোন হালিমা চট্টগ্রামের খাস্তগীর গার্লস স্কুলের হস্টেল থেকে এসে গিয়েছিল শান্তিনগরে। কিছু পয়সা জোগাড় করে দুজনে খেতে গেলাম ডিয়েনফায়—সেখানে খুব ভালো ক্যারামেল কাস্টার্ড (তখনকার ভাষায় পুডিং) এবং আইসক্রিম পাওয়া যেতো। দুটোই আমাদের খাওয়ার শখ, তবে এটুকু মনে হয়েছিল যে, একসঙ্গে বোধহয় দুটো খাওয়া চলে না। তখন একটু অভিনয় করতে হলো। রেস্টুরেন্টে গিয়ে হালিমা অর্ডার দিতে চাইলো আইসক্রিম, আমি বললাম, না, পুডিং খাও। পুরুষের কথাই রইলো। পুডিং খাওয়া শেষ করে, অবুঝ সঙ্গিনীকে যেন নিতান্ত দয়া করছি, এমন ভাব দেখিয়ে দুটো আইসক্রিমেরও অর্ডার দেওয়া হলো। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে আমাদের কারো পক্ষেই আর গাম্ভীর্য অটল রাখা সম্ভব হয়নি।

ডিয়েনফায় আরো খেয়েছি এবং ব্রিটানিয়ায় মাঝে মাঝে ছবি দেখেছি, তবে সংগতির অভাবে একসঙ্গে দুক্ষেত্রে যাওয়ার বিলাসিতা করা সম্ভবপর হয়নি। এই দুই ক্ষেত্রের পরই টিনের ঘের দেওয়া ডি এস এ—ঢাকা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন—গ্রাউন্ড : ফুটবল খেলার জায়গা। কাঠের গ্যালারি ছিল, তবে তার টিকিটের দাম বেশি; আমরা অল্প পয়সার টিকিট কিনে মাঠের সীমানার পাশে ঘাসের ওপর বসে খেলা দেখতাম। বল কখনো আমাদের গায়ের ওপরে এসে পড়তো এবং খেলোয়াড়-রেফারি-লাইনসম্যানদের আমরা একটু বেশি কাছ থেকে দেখতে পেতাম—এটাই ছিল আনন্দ। বাদাম খাওয়াটা ছিল খেলা দেখারই অঙ্গ এবং বাদাম খেতে খেতে দুপাশের দর্শকদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করাটাই রীতি। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান রাষ্ট্রীয় সফরে সেবারে সস্ত্রীক গিয়েছিলেন বিদেশে : গরিব দেশের পয়সা খরচ করে সস্ত্রীক বিদেশ যাওয়াটা তাঁর পক্ষে গর্হিত হয়েছে, এরকম মতামত প্রকাশ করে সঙ্গী দর্শকদের আমার বিজ্ঞতার ভাগ দিয়েছিলাম। রাষ্ট্রাচার-বিষয়ে আমার জ্ঞানের বহর দেখে হোক কিংবা রাষ্ট্রের পেশীশক্তির ভয়ে হোক, ওতেই শঙ্কিত হয়ে একজন বলেছিলেন, এসব কথা প্রকাশ্যে আলোচনা না করাই ভালো।

ডি এস এ-র মাঠে প্রথম শ্রেণীর লীগ খেলায় তখন যেসব দল অংশ নিতো, তাদের মধ্যে ইস্ট পাকিস্তান জিমখানা, ঢাকা ওয়ান্ডারার্স, ওয়ারী ও ভিক্টোরিয়া ক্লাব ছিল উল্লেখযোগ্য। খেলা দেখতে গেলে একটা দলের সমর্থক হয়ে যেতে হয়। আমি হয়ে গেলাম ওয়ান্ডারার্সের সমর্থক—তার যে বিশেষ কোনো কারণ ছিল, তা নয়। তেমনি উদ্দেশ্যহীনভাবে, খেলার শেষে, খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচয় করাটাও খেলা দেখার অংশ হয়ে উঠেছিল।

এর ফলে অন্তত দুজন ফুটবল খেলোয়াড়ের সঙ্গে আমার বেশ অন্তরঙ্গতা জন্মে গেল : কুদরতউল্লাহ ভুঁইয়া ও আরজু। এঁরা দুজনেই তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়-দলে ফুটবল খেলতেন, ক্লাবের হয়ে খেলাটা ছিল তার

বাইরে। পরবর্তীকালে কুদরতউল্লাহ ভুঁইয়া ব্যবসায়ীরূপে ও আরজু কাস্টমস অফিসাররূপে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ১৯৫০ সালের লীগ খেলা দেখার জন্যে কুদরতউল্লাহ্ আমাকে তাঁর ভাগ থেকে একটা সিজন টিকিট উপহার দিয়েছিলেন এবং তাঁর ক্লাব জিমখানার প্রতি আমার নিঃশর্ত সমর্থন দাবি করেছিলেন। ওই সিজন টিকিটের বদৌলতে আমি গ্যালারিতে বসে খেলা দেখতে সমর্থ হয়েছিলাম, নিজেকে ভাগ্যবানই মনে হয়েছিল। খেলা দেখতে দেখতে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে ভাব হয়ে যায়—তাঁদের মধ্যে একজন মুহম্মদ খলিলুর রহমান, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শেষ পর্বের ছাত্র, পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এবং আরো পরে আরো অনেক কিছু। তাঁর সহপাঠী আবদুল মোমেনের—প্রথমে বেসরকারি কলেজে ও পরে সরকারি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক—সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল, যতোটা খেলার মাঠে, তার চেয়ে বেশি খলিল সাহেবের সুবাদে সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলে—তাঁদের আবাসস্থলে।

কুদরতউল্লাহ্ পরের বছরেও সিজন টিকিট দিয়েছিলেন। তবে কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে ফুটবল খেলা দেখা অনিয়মিত হয়ে গেল এবং ১৯৫১ সালের পর আর সে-খেলা দেখা হয়নি। পরে ডি এস এ গ্রাউন্ডের বদলে তার একটু পাশের জায়গায় ঢাকা স্টেডিয়াম হলো এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা দেখতে সেখানে প্রথমবার ঢুকেছিলাম অনেককাল বাদে।

১৯.

পুজোর ছুটির সময়টা পার করে দিয়ে স্কুল খুললো। স্কুলেরও অনেক শিক্ষক ভিটেবাড়ি ছেড়ে চলে যান। অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার সুরেশবাবু রয়ে গিয়েছিলেন—তিনি হন ভারপ্রাপ্ত হেডমাস্টার। শূন্যস্থান পূর্ণ করতে নতুন শিক্ষক এলেন কয়েকজন—খুব বেশি নন। তাঁদের মধ্যে একজন কোরবান আলী—পরে বঙ্গবন্ধু ও এরশাদের মন্ত্রিসভার সদস্য। তিনি আমাদের ক্লাসে এসে প্রায়ই বলতেন যে, তিনি ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি যে আমাদের তেমন পড়াতেন না, সেটা বোধহয় প্রস্তুতিজনিত ব্যস্ততার কারণে। এন এ লস্কর আসেন—পরে তিনি পুরানা পল্টনে একটি পেট্রোল পাম্পের মালিক এবং পরিবহন সমিতির (মালিকদের) অধিকর্তা হন; আইউব খানের নজরে পড়ে তিনি কনভেনশন মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং, যতদূর মনে পড়ে, জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। নতুন আরেকজন শিক্ষক ছিলেন আবদুল খালেক খান। অপেক্ষাকৃত লাজুক স্বভাবের মানুষ ছিলেন তিনি, কিন্তু আমাদের ওপরে ঠিকই নজর রাখতেন। তিনিও ছিলেন রেভোলিউশনারি সোশিয়ালিস্ট পার্টির সদস্য, তবে আমাদের তা জানতে দেননি কিংবা আমাদের সঙ্গে কখনো রাজনীতি নিয়ে আলোচনাও করেননি। তিনি নিজে খুব পড়াশোনা করতেন। সাহিত্যে আমার আগ্রহ আছে টের পেয়ে তিনি একদিন ক্লাসের বাইরে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি কোনো সাহিত্যপত্রিকার নিয়মিত পাঠক কিনা। আমি খুব

উদ্দীপিত হয়ে বলেছিলাম, 'হ্যাঁ, *অচলপত্র* পড়ি।' *অচলপত্র* ছিল দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল সম্পাদিত লঘু রসের পত্রিকা। পত্রিকায় কর্তৃপক্ষ এটার পরিচয় দিতেন 'বড়দের পড়বার এবং ছোটদের দুধ গরম করবার একমাত্র মাসিকপত্র' বলে। এর একটা নির্দিষ্ট লেখকগোষ্ঠী ছিল, তাঁরাও সবাই হালকা চালে লিখতেন। এতে প্রচুর কার্টুন থাকতো, চলচ্চিত্র-সমালোচনা থাকতো, পাঠকদের প্রশ্নের সরস উত্তর থাকতো, বড়ো লেখকদের নিয়ে মশকরা থাকতো। আমার জবাব শুনে খালেক খান বললেন, 'ওটা তো সিরিয়াস পত্রিকা নয়—ভালো সাহিত্যপত্রিকা পড়ো না!' আমার অজ্ঞতা স্বীকার করে জানতে চাইলাম, কী পড়বো? উনি বললেন, *চতুরঙ্গ* বা *ক্রান্তি*। হুমায়ুন কবির-সম্পাদিত *চতুরঙ্গের* নাম জানতাম, কিন্তু সে পত্রিকা পড়িনি; আমার চেনাজানা অনেকের মতেই পত্রিকাটি ছিল নাক-উঁচু। দেখা গেলো, *ক্রান্তি* নামটাই অনেকের অজানা। তবু আমার শিক্ষকের পরামর্শে *চতুরঙ্গ* ও *ক্রান্তি* সন্ধান করেছিলাম, তাতে সফল হইনি, তবে *অচলপত্রের* পাঠক হিসেবে তার পর থেকে একটু কুণ্ঠিত বোধ না করে পারিনি। আবদুল খালেক খান পরে সাংবাদিকতায় প্রবেশ করেন এবং শেষ পর্যন্ত *দৈনিক বাংলা* থেকে অবসর নিয়ে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

আমাদের এক শিক্ষকের পুত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিতে এম এসসি পড়তেন। দুঃখের কথা, পিতাপুত্র উভয়ের নাম ভুলে গেছি। পুরু চশমা-পরা অতি সাধারণ পোশাকের এই তরুণ এলেন আমাদের অঙ্ক পড়াতে। তিনি ভালো ছাত্র ছিলেন বলে সহজেই দু-এক ধাপ ডিঙিয়ে অঙ্ক কষতেন। তারপর আমাদের দুরবস্থা দেখে আবার সে ধাপগুলো দেখিয়ে দিতেন। কিন্তু অঙ্ক আর আমি আয়ত্ত করতে পারলাম না। ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও দশম শ্রেণীতে কয়েক মাস করে স্কুলে যাওয়া হয়নি। ওই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টাও করিনি। আমার বন্ধু কাসেম আমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু আমি ধরেই নিলাম, আমাকে দিয়ে অঙ্ক হবে না। পাটীগণিতটা হাতে রাখলাম, বীজগণিত বাদ দিলাম, জ্যামিতি কিছু শিখি—অধিকাংশই বাদ দিই। এমনি করে টেস্ট পরীক্ষা দিলাম। মোটে দশ-বারোজন ছাত্র, স্কুল বন্ধ থাকায় সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। টেস্ট পরীক্ষায় আমি যে প্রথম হলাম, তাতে কৃতিত্ব তেমন ছিল না। ওই একবারই মাত্র স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম হওয়া সম্ভবপর হয়েছিল আমার পক্ষে। নেয়ামাল বাসির হয়েছিল দ্বিতীয়।

টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে ১৯৫১ সালের জানুয়ারি থেকে আমাদের স্কুল সরকারি হয়ে গেলো। পুরোনো শিক্ষকরা কেউ আর রইলেন না। ম্যাট্রিক পরীক্ষার প্রবেশপত্র কীভাবে পাবো, তা খোঁজ নিতে গেলাম নতুন স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে। তিনি বললেন, এটি এখন সরকারি হয়েছে, এর নাম নবাবপুর গভর্নমেন্ট হাই স্কুল। স্কুলভবন এক হলেও বেসরকারি প্রিয়নাথ হাই স্কুলের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই—তার ছাত্রদের বিষয়েও তাঁদের কোনো দায়িত্ব নেই, তাঁদের কাছে তথ্যও নেই। আমাদের উচিত হবে, প্রিয়নাথ হাই স্কুলের পুরোনো শিক্ষকদের খুঁজে বের করা এবং তাঁদের পরামর্শ নেওয়া। সলিমুল্লাহ্ ইমপিরিয়াল কলেজে গিয়ে ধরলাম সুরেশবাবু ও শচীনবাবুকে। সুরেশবাবু বললেন, সকল তথ্য জানিয়ে বোর্ডকে চিঠি দাও এবং বাড়ির ঠিকানায় অ্যাডমিট কার্ড পাঠাতে অনুরোধ করো। দরখাস্ত নিয়ে বোর্ড অফিসে হাতে হাতে

জমা দিলাম। দরখাস্তে একবার চোখ বুলিয়ে প্রাপক বললেন, নিয়মমাফিক কাজ হবে।

শেষ পর্যন্ত বাড়ি বসে রেজিস্ট্রি-ডাকে প্রবেশপত্র পেয়েছিলাম। আমাদের আসন পড়েছিল কলেজিয়েট স্কুলে—যেখানে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করে বিফলমনোরথ হয়েছিলাম। এবারে আব্বার অনুকম্পা হলো। তিনি জানালেন, পরীক্ষার দিনগুলোতে গাড়ি আমাকে পৌঁছে দেবে হলে, তবে পরীক্ষাশেষে আমাকে ফিরে আসতে হবে নিজে নিজে। আর দু-বেলা পরীক্ষার দিনে টিফিন খেতে আমাকে দেওয়া হবে এক টাকা। দু-বেলা পরীক্ষার মধ্যবর্তী সময়ে শাখারিবাজার ও পটুয়াটুলির সংযোগস্থলে কালাচাঁদ গন্ধবণিকের দোকানে গিয়ে মিষ্টি খেয়ে আসতাম। তাতে পুরো টাকাটা খরচ হতো না। সদরঘাট থেকে পুরানা পল্টন পর্যন্ত বাসে এসে বাকিটা হেঁটে বাড়ি ফিরতাম।

পরীক্ষার সময়ে পরীক্ষার্থীদের শনাক্ত করার প্রয়োজন হয়। এ-ব্যাপারেও নবাবপুর হাই স্কুলের সাহায্য পাওয়া গেলো না। নরম সুরেই তাঁরা বললেন, 'আমরা কি তোমাদের চিনি যে শনাক্ত করবো?' আবার গেলাম সুরেশবাবুর কাছে। তিনি বললেন, 'বোর্ডের অথারাইজেশন ছাড়া তো আইডেনটিফাই করা চলবে না। দেখি চেষ্টা করে।'

প্রথম দিনে শনাক্তকরণ ছাড়াই পরীক্ষা দিলাম। কলেজিয়েট স্কুল-কর্তৃপক্ষ বললেন, তাঁরা আরো একদিন সময় দেবেন আমাদের। সৌভাগ্যক্রমে সুরেশবাবু এসে পৌঁছোলেন যথাসময়ে, আমাদের শনাক্ত করলেন, শুভেচ্ছা জানিয়ে চলে গেলেন। আমরা নিরাপদে পরীক্ষা দিলাম।

তবে আমাদের স্কুলের কারো পরীক্ষাই ভালো হলো না। আমি তো গণিতে মোটে ৫০ নম্বরের উত্তর দিয়েছিলাম। তবু পরীক্ষার শেষে আফসোস হয়নি। মনে হলো, এক যন্ত্রণা থেকে বেঁচে গেলাম। আমি তখন মেতে আছি 'মুকুর' এবং অন্য অনেক কিছু নিয়ে।

২০.

ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বের হলে জানা গেল, আমি দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছি। নেয়ামাল উর্দুতে লেটার পেয়ে দ্বিতীয় বিভাগে, আহমদ তৃতীয় বিভাগে। আমার প্রত্যাশা অধিক ছিল না, তাই বিচলিত হইনি, মার্কশিট পর্যন্ত তুলিনি। আব্বাকে খুশিই হনে হলো—বংশে আমিই প্রথম ম্যাট্রিকুলেট হওয়ার গৌরব অর্জন করেছি, হোক না তা মাঝারি ধরনের। আমার পড়াশোনার বিষয়ে এই প্রথম তিনি আগ্রহ প্রকাশ করলেন। জানতে চাইলেন, অতঃপর আমি কী পড়তে চাই এবং কোথায় পড়তে চাই। বললাম, আই এ পড়বো, জগন্নাথ কলেজে। ঢাকা কলেজে নয় কেন? আমি ভবিষ্যতে বাংলা পড়তে চাই; ইন্টারমিডিয়েটে বাংলা সাহিত্য—পোশাকি ভাষায়, স্পেশাল বেঙ্গলি—পড়লে তাতে সুবিধে হবে। আর স্পেশাল বেঙ্গলি পড়ানো হয় ঢাকার দুটি কলেজে মাত্র : দিনে জগন্নাথ কলেজে, রাতে সেন্ট গ্রেগরিজ কলেজে। সেন্ট গ্রেগরিজ

কলেজ পরে নোটরডেম কলেজে পরিণত হয়েছিল; আর পরের বছর আবু হেনো মোস্তফা কামালের জন্যে অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ঢাকা কলেজে স্পেশাল বেঙ্গলি পড়ানোর অনুমতি সংগ্রহ করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তখন ইন্টারমিডিয়েটের পঠন-পাঠন-পরীক্ষা—সব ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন।

আমার জবাব শুনে আব্বা বললেন, জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপাল খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ যেহেতু তাঁর বন্ধু, অতএব তিনিই আমাকে নিয়ে যাবেন কলেজে। যথাসময়ে কলেজে যাওয়া হলো। খান বাহাদুর সাহেব আমাকে চিনতেন না, তা নয়। আব্বা আমার কৃতিত্বের কথা জাহির করলেন। তারপরও প্রিন্সিপাল আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে পিওনকে দিয়ে ফর্ম আনিয়ে দিলেন। বললেন, পূরণ করে পরদিন নিয়ে আসতে। তাই করলাম এবং কলেজে ভর্তি হয়ে গেলাম। আমাদের স্কুল থেকে আরো দুজন ভর্তি হলো জগন্নাথ কলেজে—নেয়ামাল বাসির ও সৈয়দ আহমদ হোসেন। আমি ও আহমদ একই বিষয় নিয়েছিলাম, আমাদের ইতিহাসের বদলে নেয়ামাল নেয় ফারসি—যদিও ম্যাট্রিকে সে ফারসি না পড়ে উর্দু পড়েছিল।

পুরোনো এবং বিশিষ্ট কলেজ হলেও বেসরকারি কলেজ হওয়ায় এবং এর ছাত্রসংখ্যা অধিক হওয়ায় অন্য কলেজের ছাত্রেরা জগন্নাথ কলেজকে জগুবাবুর পাঠশালা বলতো। তবে একথা এখন জোর দিয়ে বলা যায় যে, জগন্নাথ কলেজে তখন যে-শৃঙ্খলা ছিল এবং যে-যত্ন ও গুরুত্বের সঙ্গে পাঠদান করা হতো, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েও এখন তা অনুপস্থিত। সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে আবদুর রহমান খাঁ এর অধ্যক্ষতার ভার নিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে কলেজ চালিয়েছিলেন। তিনি যেমন রাতে ডিগ্রি ক্লাস চালু করেছিলেন, তেমনি আবার কলেজ থেকে সহশিক্ষা তুলে দিয়েছিলেন। আমাদের দুজন ভাইস-প্রিন্সিপাল ছিলেন দর্শন বিভাগের রেবতীমোহন চক্রবর্তী ও ইংরেজির নূরুল হক। রেবতীবাবু মাঝে মাঝেই কলেজের করিডোর ঘুরে দেখতেন, কোথাও কোনো গোলমাল হচ্ছে কিনা এবং কোনো ক্লাসে শিক্ষক অনুপস্থিত কিনা। হস্টেল-সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন রসায়নের শিক্ষক হরিপ্রসন্ন রায়। আমরা তাঁকে একটু কৃপণস্বভাবের মানুষ বলে মনে করতাম। অনেক পরে তাঁর মৃত্যু হলে জানতে পারলাম আজীবনের সঞ্চিত অর্থ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করে গেছেন—যাতে রসায়নের গবেষণায় কৃতিত্বের জন্যে স্বর্ণপদক দেওয়া যায়। আমাদের অবশ্যপাঠ্য ইংরেজি পড়াতেন শৈলেন ভদ্র, আবদুল মতিন ও লুৎফুল হক। শিক্ষক হিসেবে শৈলেন ভদ্র ছিলেন খুবই আন্তরিক—ছাত্রদের সাহায্য করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। আবদুল মতিন আমৃত্যু শিক্ষকতা ছাড়াও (পরে তাঁর স্ত্রী বেগজাদী মাহমুদা নাসিরের অধ্যক্ষতায় পরিচালিত সেন্ট্রাল উইমেনস কলেজেও পড়াতেন) নাটকে আসক্ত ছিলেন—কলেজে ইংরেজি নাটক অনুষ্ঠিত হতো তাঁরই পরিচালনায়। *নাইন মডার্ন প্লেজ* নামের একটি বইয়ের কয়েকটি রচনা আমাদের পাঠ্য ছিল—মনোগ্রাহী নাটকীয়তার সঙ্গে তিনি তা পড়িয়েছিলেন। লুৎফুল হকও পড়াতেন বেশ সরসতার সঙ্গে—*টেলস অফ হিউম্যান এনডেভার* নামে একটি বই। পরে তিনি কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে ডাক বিভাগের কর্মকর্তা হন এবং অবসর নেন বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে। একবার তাঁর ক্লাসে

পেছন থেকে কে যেন 'লাউডার প্লিজ' বলায় নিজের নামের আদ্যক্ষরের উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন, 'আই অ্যাম এল এইচ, ইউ নো। আই ক্যান বি বোথ হাই অ্যান্ড লো।' নূরুল হক সাহেবও আমাদের দু-একদিন পড়িয়েছিলেন—তবে বয়সের ভারে তাঁর কণ্ঠস্বর তখন খানিকটা ক্ষীণ ও অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলে আমরা তাঁর কথা ভালো শুনতে পেতাম না। ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন নারায়ণচন্দ্র সাহা—তিনি একসময়ে কলেজের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। পড়তেন প্রচুর, রবীন্দ্রসংগীত শুনতে ভালোবাসতেন এবং কনট্র্যাকট ব্রিজ খেলা ছিল তাঁর নেশা। নিজের তৈরি-করা নোট সামনে রেখে তিনি পড়াতেন, মাঝে মাঝে মানচিত্র নিয়ে আসতেন ক্লাসে। তাঁর পড়ানোর গুণে মনে হতো, ইতিহাসের সব ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। সিভিকস (এক পত্র) পড়াতেন আলী আহমদ—ইনি পরে সরকারি কলেজে যোগ দেন এবং বিলেত থেকে পিএইচ ডি করে এসে সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ হন আর লোকপ্রশাসন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের খ্যাতি লাভ করেন। এই বিষয়ের অন্য অধ্যাপক ছিলেন খোরশেদ আলম চৌধুরী—তিনিও পরে সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। ইকনমিকস (আরেক পত্র) প্রথমে পড়াতেন এ বি এম গোলাম কিবরিয়া—তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল সুন্দর, পড়ানোর ভঙ্গি ছিল মনোহর এবং পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল চমৎকার। তিনি যুক্ত ছিলেন ইউ ও টি সি অর্থাৎ ইউনিভার্সিটি অফিসার্স ট্রেনিং কোরের সঙ্গে—এখন সেটার নাম হয়েছে ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর। পরে তিনি পুলিশ সার্ভিসে যোগ দিয়ে আই জি হয়েছিলেন এবং আরো পরে হয়েছিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এবং প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারে উপদেষ্টা। অর্থনীতির আরেকজন শিক্ষক ছিলেন আবুল হোসেন—পরে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হয়েছিলেন। ডিডাকটিভ লজিক পড়াতেন তোফাজ্জল হোসেন খান—পরে বিচারপতি টি এইচ খান নামে সুপরিচিত হন এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী সমিতির সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত হন। ইনডাকটিভ লজিক পড়িয়েছিলেন রেবতীবাবু। তিনি বই ছাড়া পড়াতেন এবং প্রায়ই সরস বাংলায় পাঠ্যবিষয় বুঝিয়ে দিতেন। যে-ভাষায় পড়ান না কেন, আমরা তাঁর ক্লাস খুব উপভোগ করতাম। এখানে কবুল করবো, বড়ো ক্লাসে যেসব শিক্ষকের পড়ানো উপভোগ করতাম না, রোল কলের উত্তর দিয়ে আমরা কয়েকজন সেসব ক্লাস থেকে পালিয়ে যেতাম।

যে-স্পেশাল বেঙ্গলি পড়তে জগন্নাথ কলেজে আসা, তাতে আমরা বেশি ছাত্র ছিলাম না। দুই পত্র বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে স্পেশাল বেঙ্গলির ছাত্রেরা অবশ্যপাঠ্য বাংলার বদলে একপত্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়তো। ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী তখন ভারতে চলে গেছেন, তাঁর জায়গায় বাংলার বিভাগীয় প্রধান হয়েছেন অভয়াচরণ চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন সংস্কৃতবিদ্, পালি-প্রাকৃত ভালো জানতেন—পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে খণ্ডকাল শিক্ষকরূপে পালি-প্রাকৃত পড়াতেন। তিনি আমাদের পড়িয়েছিলেন শরৎচন্দ্রের *চন্দ্রনাথ*। জাত ব্যাকরণিয়া হওয়ায় তিনি শরৎচন্দ্রের ব্যাকরণদোষ যতোটা ধরতেন, উপন্যাসের রসসঞ্চারের দিকে অতোটা লক্ষ রাখতেন না। তাঁর আশঙ্কা ছিল, ঔপন্যাসিকের ব্যাকরণদোষ দেখিয়ে না দিলে, না বুঝে আমরা তা অনুসরণ করবো। বিভাগে অভয়বাবুর পরে ছিলেন অজিতকুমার গুহ।

তিনি আমাদের পড়িয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের *প্রায়শ্চিত্ত* নাটক : খুব ভালো পড়াতেন, তা বলা বাহুল্য। তিনি বলতেন, 'বিদ্যা তো দিতে পারি না, পার্সেন্টেজ দিতে পারি। যারা কেবল পার্সেন্টেজের জন্যে আসো, তারা না এলেও পারো—পরে তাদের পুষিয়ে দেবো।' কিন্তু তাঁর ক্লাস হারাতে চাইতো না কেউই। সুনির্বাচিত শব্দ ব্যবহার করে, সুললিত ভঙ্গিতে, তিনি সাহিত্যরস সঞ্চার করতেন, আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা গ্রহণ করতাম। অজিতবাবু আরো বলতেন, 'কেউ দেরিতে এলে কিংবা আগে চলে যেতে চাইলে নিঃশব্দে যাওয়া-আসা কোরো। আমার পড়ানোর মাঝখানে বিজাতীয় ভাষায় 'মে আই কাম ইন সার্' বলে চিৎকার করে কিংবা চলে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে আমার চিন্তার বা বলার স্রোতে বাধা দিও না।' তবে কেউ কখনো তাঁর ক্লাসে ইচ্ছে করে দেরিতে আসেনি কিংবা আগে চলে যেতে চায়নি। বাংলার অপর শিক্ষক ছিলেন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী—বিশ্বভারতী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কৃতী ছাত্র। বিশ্বভারতী থেকে তিনি এম এ করেছিলেন, কিন্তু সে-ডিগ্রি এখানে অনুমোদিত ছিল না বলে পরে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। অনুমোদিত এম এ ডিগ্রি না থাকার পরেও তিনি যে কলেজে চাকরি পেয়েছিলেন, তার কারণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অনার্সে প্রথম শ্রেণী লাভ করেছিলেন (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উৎসব-উপলক্ষে বাংলা অনার্সে রেকর্ড নম্বরধারী বলে তিনি আবার স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন)। তিনি আমাদের পড়াতেন রবীন্দ্রনাথের *মানসী* ও *লোকসাহিত্য*। খুব যত্ন নিয়ে পড়াতেন এবং তখনই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বড়ো সমালোচকদের লেখা পড়তে আমাদের উৎসাহিত করতেন। অজিতবাবু আর তিনি মিলে বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা-সংসদের পরীক্ষা নিতেন ঢাকায়। সে-পরীক্ষা দিতে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন দুজনেই—কিন্তু আমার আর পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। পরবর্তীকালে—অজিত গুহ জেলে গেলে—কলেজে যোগ দেন আবদুল কাদের। তিনি আমাদের পড়িয়েছিলেন কাজী ইমদাদুল হকের উপন্যাস *আবদুল্লাহ* এবং জসীমউদ্‌দীনের *নকসীকাঁথার মাঠ*।

জগন্নাথ কলেজে ইংরেজি বিভাগে খ্যাতিমান অধ্যাপক ছিলেন ভবানীচরণ রায়—হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। কলেজে অবশ্য তাঁর কাছে পড়িনি—পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আমাদের পড়িয়েছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে যাঁদের ছাত্র না হয়েও কলেজে সস্নেহ সান্নিধ্য লাভ করেছি, তাঁদের মধ্যে আরবির বজলুর রহমান, ইসলামের ইতিহাসের বোরহানউদ্দিন, বাণিজ্যের কামরুল ইসলাম ও আবদুর রউফ মজুমদার, গণিতের কাজী কামরুজ্জামান (অধ্যাপনা ছেড়ে কিছুকাল রাজনীতি করে তিনি কিউ কিউ জামান নামে পরিচিত হয়েছিলেন) এবং ভূগোলের ফজলুল হকের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে।

আমরা কলেজে প্রবেশ করার আগেই সেখানে 'জগন্নাথ কলেজ বাংলা সংস্কৃতি সংসদ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এর সভাপতি, তবে সহ-সভাপতি অজিত গুহই ছিলেন এর মূল সংগঠক। ছাত্রদের মধ্যে দুটি দল ছিল যারা এই সংগঠনকে ভেতরে-ভেতরে অনুমোদন করেনি : একটি ছিল ইসলামি

ভ্রাতৃসংঘ—এর মূল নেতা ইবরাহিম তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তাঁর অনুজ ইয়াহিয়া তখন এটির কর্ণধার ছিলেন, তবে এতে বেশি ছাত্র যোগ দেয়নি; অন্যটি ছিল মুসলিম লীগপন্থী ছাত্র-সংগঠন নিখিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ। আওয়ামী লীগ-সমর্থক পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ তখন কেবল মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। ইসলামী সংস্কৃতি আর বাংলা সংস্কৃতির মধ্যে বিরোধ ধরে নিয়ে অনেকে বাংলা সংস্কৃতি-সংসদের বিপক্ষে ছিল। আমরা কলেজে প্রবেশ করার অল্পকালের মধ্যেই এই সংসদের উদ্‌যোগে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ইন্টারমিডিয়েটের কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখার এবং রাতের বি এ ও বি কম ক্লাসের ছাত্রদের জন্যে এ-প্রতিযোগিতা উন্মুক্ত ছিল। প্রতিযোগিতার জন্যে আমি দিয়েছিলাম প্রবন্ধ ও গল্প; নেয়ামাল দিয়েছিল প্রবন্ধ ও কবিতা; আহমদ অংশ নিয়েছিল কবিতা-আবৃত্তিতে। প্রতিযোগিতার ফল যখন বের হলো, তখন দেখা গেল, আমি গল্পে প্রথম পুরস্কার পেয়েছি (আমার গল্পটি পরে কলেজ-বার্ষিকীতে মুদ্রিত হয়েছিল), আহমদ কবিতা-আবৃত্তিতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে; প্রবন্ধে দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছে নেয়ামাল। কলেজব্যাপী প্রতিযোগিতায় একই স্কুল থেকে আগত প্রথম বর্ষ আই এ ক্লাসের তিন বন্ধু এভাবে পুরস্কৃত হওয়ায় আমরা অনেক ছাত্র-শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম।

২১.

জগন্নাথ কলেজে আমাদের সহপাঠীদের মধ্যে বেশ বড়ো একটা বন্ধুচক্র গড়ে উঠেছিল। নেয়ামাল বাসির, সৈয়দ আহমদ হোসেন ও আমি কলেজে প্রবেশ করেছিলাম একই স্কুল থেকে। পার্ক সার্কাস হাই স্কুলে আমার সহপাঠী খোন্দকার আলী আশরাফকে (*দুর্জন উবাচ*-খ্যাত) সেখানে পাওয়া গেল। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া আর তার ফল প্রকাশের মধ্যবর্তী সময়ে এক সন্ধ্যায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে গিয়ে পরিচয় হয়েছিল আবদুর রহিমের (বাংলাদেশ সরকারের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত) সঙ্গে—সে তখন নোয়াখালি থেকে ম্যাট্রিক দিয়েছে। দেখা গেল, সেও এসেছে জগন্নাথ কলেজে। নারায়ণগঞ্জ থেকে আসতো মসিহুর রহমান (পরে সাউথইস্ট ব্যাংকের পরিচালক ও নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির বোর্ড অফ গভর্নর্সের সদস্য), তেজগাঁ থেকে আমীর আলী (এককালে জগন্নাথ কলেজে ইংরেজির শিক্ষক ও *হলিডে* পত্রিকায় 'লেটার ফ্রম লন্ডন' স্তম্ভের লেখক, বহুকাল হয় লন্ডনপ্রবাসী)। আলী আনোয়ার (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক), তোফাজ্জল হোসেন (বাংলাদেশ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত উপপ্রধান তথ্য-কর্মকর্তা), নাজিম মাহমুদ (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক সংস্কৃতি-কেন্দ্রের পরিচালক), মৃণাল বারুড়ী (মন্ত্রী ডি এন বারুড়ীর পুত্র, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়ার কারণে জেল খেটে-আসা), তৌহিদুর রহমান (যশোরের আইনজীবী ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সহ-সভাপতি), মোহাম্মদ আলী (জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত সদস্য) ও তোয়াব খান (সাংবাদিক) এই বন্ধুচক্রের অন্তর্ভুক্ত

ছিল। বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে সুবেশ ছিল মোহাম্মদ আলী আর মসিহুর রহমান। সতীর্থদের মধ্যে আর ছিল সফিউদ্দীন আহমদ (রাজনৈতিক কর্মী ও পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতির এককালীন সভাপতি), নূরুল ইসলাম (শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইপসির মালিক), আবদুর রশীদ তালুকদার (বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান), নূরুল মোমেন খান (পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিসের কর্মকর্তা), শেখ আবদুল মান্নান (পরে যুক্তরাজ্যে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক), আনোয়ারুল করিম (প্রথমে পি আই এ-র ও পরে বাংলাদেশ বিমানের কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা), আজহারুল ইসলাম (বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত), আনোয়ারুদ্দীন চৌধুরী (বাংলাদেশ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব), এম রশীদুজ্জামান (এককালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক, এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যাপনারত), নয়ীম গহর (কবি ও গীতিকার), লুৎফর রহমান মল্লিক (এর সর্বশেষ কর্মস্থল ছিল বাংলাদেশ ব্যাংক ইনস্টিটিউট), খোরশেদ আলী (ব্যবসায়ী), নূরুল হালিম (পরে জগন্নাথ কলেজেরই ইংরেজির শিক্ষক), হেমায়েত হোসেন (যশোরের নোয়াপাড়া কলেজের অধ্যাপক), কাজী আবদুল মান্নান (খাদ্য বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্থায়ী বাসিন্দা) ও ওয়াহিদুর রহমান (যশোরের বি এ এফ শাহীন কলেজের অধ্যাপনা থেকে অবসরপ্রাপ্ত, খুলনার বাসিন্দা)। আমাদের আরেক সহপাঠী এম এম হক পরে হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন। আমাদের ওপরের ক্লাসে যাঁরা পড়তেন, তাঁদের মধ্যে খন্দকার আনোয়ার হোসেনের গভীর প্রভাব যে আমার ওপরে পড়েছিল, সে-কথা আগে বলেছি। তাছাড়া ছিলেন একরামউল্লাহ চৌধুরী (জগন্নাথ কলেজ ছাত্র-সংসদের সহ-সভাপতি এবং পরে বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব), কাজী নূরুস সোবহান (নাট্যাভিনেতা), কাফী খান (ভয়েস অফ আমেরিকা থেকে অবসরপ্রাপ্ত), আনোয়ারুল ইসলাম (বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউর ট্রপিকাল ক্লিনিকের আংশিক মালিক), শফিকুর রহমান (ইনিও অবসরপ্রাপ্ত) ও ফজল শাহাবুদ্দীন (কবি ও সাংবাদিক)—সে-সময়ে একযোগে কবিতা লিখতেন এবং নবাবপুর সাব পোস্ট অফিসে চাকরি করতেন বলে—আমরা তাঁকে দ্বিতীয় বা ছোটো কায়কোবাদ নামে অভিহিত করতাম। পরে আমাদের এক ক্লাস নিচে ভর্তি হয়েছিলেন আমীর-উল ইসলাম (ব্যারিস্টার), মুস্তাফা সারোয়ার (রাজনীতিবিদ ও শিল্পপতি), জিল্লুর রহমান খান (আমাদের অধ্যক্ষের পুত্র, আমার বাল্যবন্ধু ও বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অশকশ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক), আহমদ হোসেন (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত), এ কে এম আবদুর রউফ (স্থায়ী ঠিকানা প্রেম কানন সাউথ, খুলনার পরিচয়ে চিহ্নিত হতেন, ফিল্ম আর্কাইভসের পরিচালক ছিলেন; এঁর হাতে-লেখা বাংলাদেশ-সংবিধানের মূল কপিতে ১৯৭২ সালে গণপরিষদের সদস্যেরা স্বাক্ষর করেছিলেন), জহির রায়হান (শহীদ সাহিত্যিক ও চিত্রনির্মাতা) ও সৈয়দ শামসুল হক (সাহিত্যিক)।

জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হওয়ার কিছুকাল পরেই শান্তিনগর থেকে আমাদের পাততাড়ি গোটাতে হলো। 'প্রমথ নিবাস' নামে যে-বাড়িতে আমরা থাকতাম, সেটা কলকাতাবাসী মালিকের কাছ থেকে আব্বা কিনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেন নি।

বাড়িটা কিনে নিয়েছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে এ-বিষয়ে কোনো আভাস দেননি, তাতে আব্বা ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। এরকম অবস্থায় একদিন সকালবেলায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে যখন আবেদিন সাহেবের ছোটো ভাই—পরবর্তীকালের চিত্রশিল্পী জুনাবুল ইসলাম—কিছু না বলে-কয়ে বাড়ির জমির সীমানা মাপতে উদ্যোগী হন, তখন আব্বা খুব রেগে গিয়ে তাঁকে বকাবকি করেছিলেন। আমি যতোই বলি, 'উনি আবেদিন সাহেবের ছোটো ভাই', আব্বা ততোই বলেন, 'তাতে কী হয়েছে?' এতে জুনাবুলের কাছে আমি খুব লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলাম। এরপর আব্বা অন্যত্র বাড়ি দেখতে লাগলেন এবং বেশ ধারকর্জ করে ঠাটারিবাজারে একটা বাড়ি (৮৭ বামাচরণ চক্রবর্তী রোড) কিনে ফেললেন। ওই জায়গায় বাড়ি কেনার দুটো কারণ ছিল : প্রথমত, বাড়ির পেছনেই কাঁচাবাজার এবং কাছেই মিষ্টির দোকান; দ্বিতীয়ত, আব্বার ডাক্তারখানা অতি নিকটে। বাসা আর কলেজের দূরত্ব আমার পক্ষেও অর্ধেক হয়ে গেল—বাসে চড়ার আর দরকারই হতো না, হেঁটেই আসা-যাওয়া করতাম। ঠাটারিবাজারের বাড়িতে আমাদের সঙ্গে কামরু ভাইও এলেন। তবে তার পরে আকস্মিকভাবে গ্ল্যাকসো কোম্পানিতে তিনি মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি নিয়ে ফেলেন পড়াশোনা স্থগিত রেখে। মামানির চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে আসছিল—মা-বোনের দায়িত্ব নেওয়ার জন্যেই কামরু ভাই উপার্জনের পথ ধরেছিলেন বলে আমার মনে হয়েছিল।

আই এ ক্লাসের প্রথম বর্ষে থাকতেই আমি ধর্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলি।

২২.

আমাদের নতুন বাসস্থানের অদূরে ছিল পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের অফিস (৪৩ যোগীনগর লেন)। বাড়ির ওপরতলায় থাকতেন সহ-সভাপতি মোহাম্মদ তোয়াহা, সেইসঙ্গে সাধারণ সম্পাদক আলি আহাদও, নিচের তলায় ছিল অফিস। সংগঠনের সভাপতি মাহমুদ আলী তখনো সিলেটে থাকতেন এবং সাপ্তাহিক *নওবেলাল* প্রকাশ করতেন। যতদূর জানি, ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে পূর্ব পাকিস্তান যুব সম্মেলন আহূত হয়। মুসলিম লীগ সরকার এই সম্মেলনের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এমন হওয়ার সম্ভাবনা আঁচ করে উদ্‌যোক্তারা আগেই কিছু প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। অতঃপর বুড়িগঙ্গা নদীতে ভাসমান বোটে নির্ধারিত দিনেই এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মাহমুদ আলীর সভাপতিত্বে। তিনি ছিলেন বিভাগপূর্ব আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক—থাকতেন সিলেটে, পরতেন শেরওয়ানি ও চোস্ত পাজামা। তাঁর নেতা অর্থাৎ আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের এককালীন সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করলে মাহমুদ আলীও মুসলিম লীগের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। যুব-সম্মেলনে মাহমুদ আলীকে সভাপতি ও অলি আহাদকে সাধারণ সম্পাদক করে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ গঠিত হয়। অলি আহাদ ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নেতা (এই

ছাত্রলীগ রয়ে যায় সরকারবিরোধী, আর মুসলিম লীগ-সমর্থক ছাত্র-সংগঠন ছিল নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ), ১৯৪৮ সালের ভাষা-আন্দোলনে তিনি ছিলেন একজন নেতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘট ও আন্দোলনের সঙ্গে সংস্রবের জন্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন, পরে প্রথম স্থান অধিকার করে বি কম পাশ করলেও বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ তাঁকে এম কম ক্লাসে ভর্তি হওয়ার অনুমতি দেননি। অলি আহাদকে যুবলীগের চালকশক্তি বললে অসংগত হবে না। খন্দকার আনোয়ার হোসেন বোধহয় যুবলীগের সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন, তারপর থেকে আমি নিজেই নিয়মিতভাবে যাতায়াত করতাম। সেখানে যাঁদের পাই, তাঁদের মধ্যে তাজউদ্দিন আহমদ (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী), মোহাম্মদ তোয়াহা (তিনি এসেছিলেন ছাত্র ফেডারেশন-কমিউনিস্ট পার্টির পটভূমিকা থেকে), আবদুস সামাদ (সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র), সরদার আবদুল হালিম (ঢাকার আদি বাসিন্দাদের একজন), প্রাণেশ সমাদ্দার (এখন ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য), কে জি মুস্তাফা (বিশিষ্ট সাংবাদিক), এম এ ওয়াদুদ (ছাত্রলীগের নেতা, পরে দৈনিক *ইত্তেফাকের* ম্যানেজার), নারায়ণগঞ্জের শামসুজ্জোহা (আওয়ামী লীগ-নেতা খান সাহেব ওসমান আলির পুত্র) ও শফি হোসেন খান, মোহাম্মদ ইমাদুল্লাহ (বরিশাল থেকে আগত), দেওয়ান মাহবুব আলী (পরে ন্যাপ-নেতা), নূরুল ইসলাম (পরে ভাণ্ডারী পদবিযুক্ত), মিজানুর রহমান (চিত্র-সাংবাদিক), ডা. এম এ করিম ও মোহাম্মদ সুলতানের (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, পরে ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি) কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। যুবলীগে আমি যখন যোগ দিই, তার অল্পকাল পরেই সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলন হওয়ার কথা। সুতরাং প্রচুর কাজ করবার ছিল। অলি আহাদ হঠাৎ করেই আমাকে বললেন যুবলীগের দপ্তর-সম্পাদক হতে। পদটি গঠনতান্ত্রিক ছিল না, সাধারণ সম্পাদকের নির্বাহী ক্ষমতাবলে সৃষ্ট। যেহেতু আমি চিঠিপত্র ও অন্যান্য লেখালিখিতে সাহায্য করছিলাম, বোধহয় সেহেতু আমাকে ওই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আমি সোৎসাহে কাজ করেছিলাম। ১৯৫১ সালের ডিসেম্বরে ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরির মিলনায়তনে যুবলীগের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় দুদিন ধরে। একদিন অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার আগে এস এম আলী (*ডেইলি স্টারের* প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত) ও এ বি এম মূসা (তখন আধা-ছাত্র আধা-সাংবাদিক, পরে সাংবাদিকতায় সুপ্রতিষ্ঠিত) আমাকে ডেকে জানতে চান, আমি যুবলীগে যোগ দিয়েছি কেন। আমি কী বলেছিলাম, মনে নেই, তবে তাঁদের কৌতূহল তা অনেকখানি নিবৃত্ত করেছিল বলে মনে হয়। এস এম আলী যুবলীগের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও সংগঠনে ছিলেন না, মূসা ছিলেন। পরে এখানে আর যাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়, তাঁদের মধ্যে ছিলেন জমিরউদ্দীন আহমদ (পরে রাষ্ট্রদূত), মোতাহার হোসেন সিদ্দিকী (সাংবাদিক), ঢাকা রিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি সৈয়দ আবদুর রহিম মোক্তার ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম, বরিশালের আলী আশরাফ (আর এস পি থেকে এসেছিলেন, পরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক), সিলেটের নূরুর রহমান (এক সময়ে পাকিস্তান সরকারের প্রতিমন্ত্রী), পীর

হাবিবুর রহমান ও তারা মিয়া, ফেনীর খাজা আহমদ. মীর্জা গোলাম হাফিজ (দিনাজপুরের যুবনেতা, তখন সদ্য আইনব্যবসা করার চেষ্টা করছেন ঢাকায়, পরে বিশিষ্ট আইনজীবী ও বি এন পি সরকারের মন্ত্রী), কুমিল্লার মফিজুল ইসলাম (পরে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য), ময়মনসিংহের আবদুর রহমান সিদ্দিকী ও রফিকুল হোসেন, বগুড়ার গোলাম মহিউদ্দীন, চট্টগ্রামের চৌধুরী হারুনুর রশীদ, ও ঢাকানিবাসী উর্দুভাষী সৈয়দ ইউসুফ হাসান। মাহমুদ নূরুল হুদা সংগঠনে ছিলেন, কিন্তু যুবলীগের অনেকের সঙ্গে তাঁর একটা মান-অভিমানের পালা ছিল, তাই সম্মেলনে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও দৈনন্দিন কাজে তিনি অংশ নিতেন না। কামরুদ্দীন আহমদও অল্পই আসা-যাওয়া করতেন। গাজীউল হক (ভাষা-আন্দোলনখ্যাত) যুবলীগে ছিলেন বলে মনে হয়, তবে খুব সক্রিয় ছিলেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসতেন আবদুল মতিন (ভাষা-মতিন নামে খ্যাত), এম এ বারী এ টি (বি এন পি সরকারের উপপ্রধানমন্ত্রী), বাহাউদ্দিন চৌধুরী (সাংবাদিক ও সাবেক সচিব) ও আনোয়ারুল হক খান (অবসরপ্রাপ্ত সচিব) এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে আসতেন মনজুর হোসেন। গাজীউল হকের ছোটোভাই নিজামুল হক (সঙ্গীত ও নৃত্য-শিল্পী) ও আলতাফ মাহমুদ (শহীদ সঙ্গীতশিল্পী) আরেকটু ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এঁরা উভয়েই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন এবং আলতাফ মাহমুদ খুব ভালো পোস্টার লিখতেন। যুবলীগ অফিসের পাশেই এক বাড়িতে থাকতেন আবুল হাসনাত ও আবুল বরকত দু ভাই, তাঁরাও প্রায় আসতেন।

এ-সময়ে যে-ব্যাপারটি আমার—এবং আমার সমকালীনদের—জীবন আন্দোলিত করে, তা রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন। এ কথা সবার জানা যে, পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার আগেই বাংলাকে পাকিস্তানের একটি রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করেছিলেন কিছু তরুণ-প্রবীণ লেখক-সাংবাদিক-অধ্যাপক, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এক্ষেত্রে প্রথম না হলেও তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার ছ মাসের মধ্যে গণপরিষদের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। হবীবুল্লাহ বাহারের একটি সমসাময়িক বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, প্রস্তাবটি যখন মুসলিম লীগ [পার্লামেন্টারি] পার্টির সভায় আলোচিত হয়, তখন তিনি, পূর্ববঙ্গের কয়েকজন প্রতিনিধি এবং কোনো কোনো পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যও এ-দাবি সমর্থন করেন। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে এ-প্রস্তাবের বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত হয়। এ সত্ত্বেও তিনি এবং পূর্ব বাংলার অন্য দুজন সদস্য গণপরিষদে এই প্রস্তাব সম্পর্কে কিছু বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সভাপতি (জিন্নাহ্) তাঁদের অনুমতি দেন নি। পূর্বসিদ্ধান্ত-অনুযায়ী ভোটে এই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। এর প্রতিক্রিয়ায় ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চে পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের সূচনা হয়। এর নেতৃত্ব দেন তমদ্দুন মজলিস ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদ এবং পরে ব্যাপকতর প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদ। ১১ মার্চে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করা হয় এবং সচিবালয়ে পিকেটিং করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ও অলি আহাদসহ অনেকে গ্রেপ্তার হন এবং পুলিশের আক্রমণে আহত হন। আন্দোলনের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন এক চুক্তি

করেন ১৫ মার্চে। তার ফলে বন্দিরা মুক্তি পান বটে, কিন্তু চুক্তির বাকি শর্ত আর পালিত হয়নি। এরই মধ্যে পাকিস্তানের গভর্নর-জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকায় সফরে এসে ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এবং ২৪ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে যে-বক্তৃতা দেন, তাতে উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে বলে ঘোষণা করেন। তাঁর এই বক্তব্যের তাৎক্ষণিক প্রতিবাদও হয়েছিল শ্রোতাদের মধ্য থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদের প্রতিনিধিদল জিন্নাহ্‌র সঙ্গে দেখা করে এ-বিষয়ে স্মারকলিপি দেন ও আলোচনা করেন, তবে তা ফলপ্রসূ হয়নি। যদিও বৃহত্তর জনসমাজ ১৯৪৮ সালের ভাষা-আন্দোলনে তেমন করে সাড়া দেয়নি, তবু পরের বছর থেকে ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা-দিবসরূপে পালিত হতে থাকে।

১৯৫১ সালের ২৭ জানুয়ারি পল্টন ময়দানের এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন পুনরুক্তি করেন যে, উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে। এর প্রতিবাদে ৩০ জানুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদের উদ্‌যোগে ছাত্র-ধর্মঘট, মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওইদিন বিকেলে ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরিতে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদ গঠিত হয় এবং তার আহ্বায়ক নির্বাচিত হন কাজী গোলাম মাহবুব (এখন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও বি এন পি-নেতা)। এই সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু সভা অনেকক্ষণ চলেছিল বলে শেষ পর্যন্ত থাকতে পারি নি। সংগ্রাম-পরিষদে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মওলানা ভাসানী, শামসুল হক, আতাউর রহমান খান এবং নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের দুজন প্রতিনিধি ছিলেন, খিলাফতে রব্বানী পার্টির পক্ষে ছিলেন আবুল হাশিম, যুবলীগের হয়ে ছিলেন অলি আহাদ ও মোহাম্মদ তোয়াহা, তমদ্দুন মজলিসের পক্ষে ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম ও আবদুল গফুর, পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য খয়রাত হোসেন ও আনোয়ারা খাতুন ছিলেন, কামরুদ্দীন আহমদ ও মীর্জা গোলাম হাফিজ ছিলেন, ছাত্রলীগের হয়ে ছিলেন সভাপতি শামসুল হক চৌধুরী (পরে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী) ও খালেক নেওয়াজ খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদের আহ্বায়ক আবদুল মতিন ছিলেন, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হল ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র-সংসদের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকেরা ছিলেন। আরো অনেকে ছিলেন, এমন কী, নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আখতারউদ্দীন আহমদও।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার প্রতিবাদে ৩০ জানুয়ারিতে ঢাকার সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। জগন্নাথ কলেজেও প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদ গঠিত হয়। এর আহ্বায়ক ছিলেন এ আর ভুঁইয়া। সদস্যদের মধ্যে কাজী আশরাফ হোসেন, এ আর ইউসুফ, নেয়ামাল বাসির, সৈয়দ আহমদ হোসেন, আমীর আলী, সফিউদ্দীন আহমদ, আজহারুল ইসলাম ও আমি ছিলাম।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদের সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে ছাত্র-ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিল হয়। ওইদিনে আমরা কয়জন গিয়েছিলাম পোগোজ স্কুল ও সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুলে ধর্মঘট করাতে। প্রথম ক্ষেত্রে কোনো বিঘ্ন ঘটেনি, কিন্তু গ্রেগরিজ স্কুলে পুলিশ এসে হাজির হওয়ায় পিঠটান দিতে বাধ্য হই। ১১ ফেব্রুয়ারি

ছিল পতাকা দিবস। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ট্রেনে চাঁদার টিন নিয়ে আমি টাকা-পয়সা সংগ্রহ করেছিলাম 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান-সংবলিত কাগজের পতাকা কাপড়ে সেঁটে দিয়ে। এভাবেই জনমত সংগঠিত হয়। ১৩ ফেব্রুয়ারিতেও কর্মসূচি পালিত হয়েছিল।

এই ১৩ ফেব্রুয়ারিতে *পাকিস্তান অবজার্ভার* পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ হয়। এর কোনো সম্পাদকীয়তে খলিফা ওসমানের কোনো ত্রুটির উল্লেখ করা হয়েছিল। সেটা ছিল অজুহাত, আসল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের সংবাদ এবং এর প্রতি ওই পত্রিকার সমর্থন প্রচার বন্ধ করা।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদ ঘোষণা করেছিল যে, পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিন ২১ ফেব্রুয়ারিতে ধর্মঘট, সভা ও বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে জগন্নাথ হলের যে-মিলনায়তনে সভার অধিবেশন হওয়ার কথা, সেখানে যাওয়া হবে। ফেব্রুয়ারির বাকি সময় ধরে তারই প্রস্তুতি চলে।

২৩.

একুশে ফেব্রুয়ারিতে সারা প্রদেশের মানুষ যাতে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ ও দাবি জানাতে পারে, তার জন্যে চেষ্টার অবধি থাকলো না। আমি যদিও জগন্নাথ কলেজ রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদের সদস্য ছিলাম, কিন্তু সেখানে বিশেষ কিছু করি নি, আমার সময় ও সামর্থ্য সবটুকুই ব্যয় হয়েছিল যুবলীগে। দপ্তর-সম্পাদক হওয়ায় আমার স্বাক্ষরেই চিঠিপত্র যেতো কেন্দ্র থেকে শাখায়। বেশির ভাগ জেলায় যুবলীগের শাখা ছিল : দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, সিলেট যুবলীগের শক্ত ঘাঁটি ছিল; ঢাকায় সক্রিয় ছিল কেন্দ্রীয় কমিটি আর নারায়ণগঞ্জে ছিল প্রাণবন্ত শাখা। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে আন্দোলন-সংক্রান্ত নির্দেশ সব জেলায় পাঠানো হতো। যুবলীগের পক্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে তার সভাপতি শামসুল হক চৌধুরীর কাছেও কয়েকবার গিয়েছি। তখন স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তান ছিল আমাদের কলেজের সামনে, ভিক্টোরিয়া পার্কের উলটোদিকে। আন্দোলনের প্রস্তুতিকালে অলি আহাদ আমাকে পাঠিয়েছিলেন সেখানে গোলাম কবীরের কাছে। এই অতিশয় ভদ্রলোক ছিলেন স্টেট ব্যাংক কর্মচারীদের নেতা, ট্রেড ইউনিয়ন করবেন বলে কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি গ্রহণ করেননি। এই আন্দোলনে ব্যাংক-কর্মীদের টেনে আনা, বিশেষ করে, ২১ ফেব্রুয়ারিতে তাদের দিয়ে ধর্মঘট করানো যায় কিনা, সে-সম্পর্কে আলোচনা করতে আমি বারতিনেক তাঁর কাছে যাই। ভাষা-আন্দোলনের প্রতি ওই প্রতিষ্ঠানের অনেকের সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও ২১ তারিখে ধর্মঘট করতে তাঁরা সাহসী হননি। ২২ তারিখে কী করেছিলেন, তা আমি বলতে পারবো না।

ওই এলাকায় আরো একটি উল্লেখযোগ্য সংগঠন ছিল। পোগোজ স্কুলের পাশে—কোর্ট এলাকার পেছন দিকে—ছিল পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের অফিস। তখন এর প্রভাবশালী সম্পাদক ছিলেন ফয়েজ আহ্‌মদ। এর মুখপত্র সাপ্তাহিক *সংগ্রাম* সম্পাদনা করতেন কে এম আবদুল কাদের। তিনি আমাদের সহপাঠী

খোন্দকার আলী আশরাফের অগ্রজ ছিলেন বলে তাঁকে বহুদিন ধরে জানতাম। যুবলীগের সূত্রেই সেখানে গেছি এবং ভাষা-আন্দোলন-উপলক্ষেই। ফেডারেশনের নেতৃত্বের সঙ্গে তখন কমিউনিস্টদের একটা বড়োরকম বিরোধ ছিল।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম-পরিষদের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ তোয়াহাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে একটা পুস্তিকা প্রণয়ন করার। তিনি সময় করে উঠতে পারছিলেন না। তখন অলি আহাদ আমাকে বললেন একটা পুস্তিকা লিখতে। আমি লিখলাম, অলি আহাদ তা সংশোধন করে যুবলীগের পক্ষ থেকে অনামে প্রকাশ করলেন। পুস্তিকাটির নাম ছিল *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন/কি ও কেন?* যতদূর জানি, রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে ১৯৫২ সালে প্রকাশিত প্রথম পুস্তিকা ছিল এটাই। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম-পরিষদ পরে তাঁদের পুস্তিকা রচনার ভার দেন বদরুদ্দীন উমরকে। তাঁর লেখাও অনামে ছাপা হয়েছিল, সে পুস্তিকাটি আমার রচনার তুলনায় বড়ো ও ভালো হয়েছিল।

যুবলীগ অফিস হয়ে উঠেছিল রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের একটা বড় কেন্দ্র। আরেকটি কেন্দ্র—বিশেষত ছাত্রসমাজের—ছিল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলে। সেখানে কোনো পাকা বাড়ি ছিল না। সারি সারি ব্যারাক ছিল, তারই বিভিন্ন ঘরে ছাত্ররা বাস করতো। ১১ ফেব্রুয়ারির পরে, মনে হয়, আমি রোজই সেখানে গেছি—বেশির ভাগ সময়ে আহমদ আমার সঙ্গে থাকতো। নেয়ামালও যেতো সেখানে—কখনো কখনো আমরা একসঙ্গে গেছি, কখনো সে আলাদা গেছে। ১১, ১৩, ১৪ ও ২০ নম্বর ব্যারাকের কথা মনে পড়ে—হয়তো কোনো নম্বর ভুল বলছি—সেখানে যাঁরা বাস করতেন, তাঁদের মধ্যে আবদুস সালাম (পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ), আহমদ রফিক (বিশিষ্ট লেখক), মনজুর হোসেন (যুবলীগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, পরে নওগাঁয় ডাক্তারি করতেন), আলীম চৌধুরী (মুক্তিযুদ্ধে শহীদ) ও কবীরউদ্দীন আহমদের (ওই নামে একাধিকজন থাকায় তিনি চিহ্নিত হয়েছিলেন ভদ্র কবীর নামে; পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ হন) সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচয় হয়েছিল। ভাষা-আন্দোলনের সঙ্গে এঁরা প্রত্যেকেই জড়িত ছিলেন। আহমদ রফিক ছিলেন নেতৃস্থানীয় আর মনজুর হোসেন ছিলেন দৌড়ঝাঁপে অগ্রণী। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রনেতাদের আরো কাউকে কাউকে (যেমন, গোলাম মওলা, সাঈদ হায়দার) দেখেছি, তবে এঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে তেমন যোগাযোগ স্থাপিত হয় নি।

একুশে ফেব্রুয়ারিতে বড়ো একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে অনুমান করে ২০ তারিখ বিকেলে সরকারি আদেশে ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। তখন আমরা কয়েকজন কলেজ থেকে ফিরছিলাম, পথে নবাবপুরে পৌঁছে মাইক্রোফোনে এই ঘোষণা শুনলাম। কলেজে ফিরে গেলাম—সবাই খুব উত্তেজিত, কিন্তু কী যে করণীয় সে সম্পর্কে কারো স্পষ্ট ধারণা নেই। এলাম যুবলীগ অফিসে, অলি আহাদকে পেলাম না। জানা গেল, সন্ধ্যায় আওয়ামী মুসলিম লীগ অফিসে (৯৪ নবাবপুর রোড) রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম-পরিষদের জরুরি সভা বসবে, তাতেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। আহমদ ও আমি সেখানে গেলাম। আমরা যদিও মূল সংগ্রাম-পরিষদের সদস্য নই, তবু পর্যবেক্ষক হিসেবে সভায় উপস্থিত থাকার অনুমতি পাওয়া গেল জগন্নাথ কলেজ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম-

পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে। আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ-সভায় ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে-বিপক্ষে মত প্রকাশ করে বক্তৃতা চললো অনেকক্ষণ ধরে। একপক্ষ বলছিলেন, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে সরকার পূর্ব বাংলায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন গুঁড়িয়ে দেওয়ার মতো দমননীতির আশ্রয় নেবে এবং ১৯৫৩ সালে অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচন না করার একটা অজুহাত পেয়ে যাবে। অন্যপক্ষ বলছিলেন, সরকারের অন্যায় আদেশের কাছে মাথা নোয়ালে চলমান আন্দোলন থেমে যাবে এবং জনগণকে সংগঠিত করে আবার সংগ্রাম করা দুরূহ হয়ে দাঁড়াবে। আমার দেখে খুব অবাক লাগলো যে, যুবলীগের দুই নেতা—অলি আহাদ ও মোহাম্মদ তোয়াহা—অভিন্ন বক্তব্য দিতে পারছিলেন না। অলি আহাদ চান ১৪৪ ধারা ভাঙতে, তোয়াহার বক্তব্য অস্পষ্ট—আসলে তিনি অপেক্ষা করছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্তের জন্যে। এই বিতর্ক চলার সময়ে একবার নেয়ামাল বাসির ও আরেকবার আবদুর রহিম এসে খোঁজখবর নিয়ে গেল। ওরা রাস্তার ওপরেই অপেক্ষা করছিল সিদ্ধান্তের জন্যে। সভা শেষ হলো অনেক রাতে। ১১-৪ ভোটে সিদ্ধান্ত হলো যে, ২১ তারিখের কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হলো, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভায় যদি এর বিপরীত সিদ্ধান্ত হয় কিংবা সংগ্রাম-পরিষদের কোনো সদস্য যদি এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষতা করেন, তবে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদ স্বতঃই বিলুপ্ত হবে। যাঁরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করার বিরুদ্ধে অর্থাৎ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অলি আহাদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক আবদুল মতিনকে জানতাম। অন্যদের নাম পরে জেনেছিলাম : ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্র-সংসদের সহ-সভাপতি শামসুল আলম এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র-সংসদের সহ-সভাপতি গোলাম মওলা।

সংগ্রাম-পরিষদের সভা শেষ হওয়ার পরেও অলি আহাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলাম না—তিনি নানাজনের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত ছিলেন। আহমদ ও আমি যখন সভা ছেড়ে বেরিয়ে আসছি, তখন সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র-সংসদের সহ-সভাপতি মুজিবুল হক (বাংলাদেশ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সচিব) রাস্তায় নামলেন। ঠাটারিবাজারের মোড় পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে এলাম। প্রশ্ন করে বুঝতে পারলাম, পরদিন যে কী হবে, সে-সম্পর্কে তিনি অনিশ্চিত এবং কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। আহমদ ও আমি ঠাটারিবাজারের রাস্তায় ঢোকার পরে দেখলাম, অত রাতে বাড়ি ফেরে নি দেখে আহমদের উদ্‌বিগ্ন অভিভাবকদের অনুরোধে তাদের এক প্রতিবেশী তাকে খুঁজতে বেরিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আহমদ চলে যাওয়ার পরে আমি বাড়ি ফিরলাম। শুতে গেলাম উৎকণ্ঠা নিয়ে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হোক, এটা আমিও চাইছিলাম। কিন্তু তারপর কী হবে, তা ভেবে ভয় লাগছিল।

২৪.

বন্ধুদের কারো কারো সঙ্গে আগেই কথা হয়ে ছিল যে, ২১ তারিখ সকালে আমার বাড়িতে জড়ো হয়ে একসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবো। সেই ব্যবস্থামতো নেয়ামাল, তোফাজ্জল ও আলী আশরাফ এলো। আনোয়ার হোসেন ওরফে আনু ভাইও এলেন,

সঙ্গে নিয়ে এলেন আনোয়ারুল ইসলাম ওরফে পেয়ারা ভাইকে। মা বললো সবাইকে কিছু খেয়ে বের হতে। ছোটোবুরা তখন আমাদের বাড়ির একতলায় থাকতো। মা ও ছোটোবু মিলে সবাইকে পেট ভরে পরোটা-ডিম খাইয়ে দিলো। তারপর আমাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে মা জিজ্ঞাসা করলো, পুলিশ যদি আমাকে ধরে নিয়ে যায়, তাহলে আমার জন্যে কী করতে হবে। মায়ের কথায় চমৎকৃত হয়েছিলাম এই ভেবে যে, পুলিশের হাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমাকে সে আন্দোলনে যেতে বাধা দিচ্ছে না, শুধু জানতে চায় যে, আমাকে ছাড়াতে হলে কী করতে হবে। বসার ঘরে এসে বন্ধুদের এ কথা জানালাম। তারা মাকে আশ্বাস দিল, আমাকে দেখেশুনে রাখবে।

পথে বেরিয়েই মনে হলো, আমরা পাঁচজনের বেশি। আমি বললাম, আমরা একটু ভাগ হয়ে পথ চলি না কেন। কে যেন তিরস্কার করে বললো, তুমি তো দেখছি এখনই ভয়ে অস্থির। আমি বললাম, ভয়ে নয়, ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছোবার আগে আমি ঝুঁকি নিতে চাই না। জবাব এলো, এ-ও ১৪৪ ধারা না-ভাঙার যুক্তির মতো। পথে আমাদের মতো অসংখ্য ছোটো ছোটো দল চলেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে; দোকানপাট বন্ধ; পুলিশের গাড়ি দ্রুতগতিতে চলে যাচ্ছে আমাদের পাশ দিয়ে—এ রকম ছোটো ছোটো দল নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে, অর্থাৎ কলাভবনের (এখন যেটা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পূর্ব অংশ) চত্বরে পৌঁছোতে বোধহয় বেলা দশটা হয়ে গেল। বহু ছাত্রের সমাবেশ সেখানে; ছাত্র নন, এমনও আছেন অনেকে; উত্তেজনা টের পাওয়া যাচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ পর গাজীউল হককে সভাপতি করে সভা আরম্ভ হলো। আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা দিলেন, শ্রোতারা প্রায় সমস্বরে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ জানালো। সংগ্রাম-পরিষদের আহ্বায়ক কাজী গোলাম মাহবুব সিদ্ধান্তের পক্ষে বলেন এবং একই প্রতিক্রিয়া ঘটে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে বক্তৃতা করলেন আবদুল মতিন, করতালি দিয়ে শ্রোতারা তাঁকে সমর্থন করলো। অলি আহাদ বক্তৃতা করেন নি, বেশির ভাগ সময়ে তিনি বসে ছিলেন মধুর দোকানে, মাঝে মাঝে একেকজনের সঙ্গে গোপনে কথা বলছিলেন। তিনি যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে, সেটা সবাই জানতো। তবে আবদুল মতিন সভায় সে-কথা বলায় পূর্বরাত্রির সিদ্ধান্ত মতো সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদের অস্তিত্ব আর রইলো না। তাছাড়াও এর অস্তিত্ব ছিল না। বিপুলসংখ্যক ছাত্র ১৪৪ ধারা ভাঙতে চাইছিল, শুধু কীভাবে তা ভঙ্গ করা হবে, সেটাই ছিল প্রকৃত আলোচ্য। স্থির হলো, দশজন করে এক-একটি দল গেট খুলে বেরিয়ে রাস্তায় নামবেন, তারপর যা হয় তা হবে। যেই কথা সেই কাজ। ১৪৪ ধারা ভাঙার জন্যে লম্বা লাইন পড়ে গেল। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে মোহাম্মদ সুলতান একটা খাতায় এই সত্যাগ্রহীদের নাম লিখতে থাকলেন।

আমি এর আগে লিখেছিলাম, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের (পরে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান) নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী প্রথম দলটি বের হয়। অলি আহাদ লিখেছেন, সেটি আমার ভুল—ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র আজমল হোসেনের নেতৃত্বে প্রথম দলটি বেরিয়েছিল। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেন,

প্রথম হওয়ার দাবি তিনি করেন না।

১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত হওয়ামাত্রই আমি অলি আহাদের কাছে গিয়েছিলাম মধুর দোকানে। তিনি যুবলীগ অফিসের চাবি আমার হাতে দিয়ে বলেন, যুবলীগের সকল জেলা শাখার ঠিকানা এবং ভাষা-আন্দোলন-সংক্রান্ত ফাইল অফিস থেকে নিয়ে আমি যেন নিজের কাছে রাখি এবং যুগ্ম-সম্পাদক ইমাদুল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলে কাজ করি। তিনি বলেন, এরপর কখন তিনি কোথায় থাকবেন, তা বলা যাচ্ছে না: অফিসের দায়িত্ব আমার রইলো; আমি যেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করি।

অতএব, আমি গেটের বাইরে যাওয়ার চেষ্টাই করলাম না। আমার বন্ধুদের মধ্যে নেয়ামাল ও আমীর আলী 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' বলতে বলতে বেরিয়ে গেল। যুবলীগের আনোয়ারুল আজিম, ইসলামিক ব্রাদারহুডের ইবরাহিম তাহা, ফজলুল হক হলের আনোয়ারুল হক খান, এস এ বারী এ টি, ফজলে আলী এবং আরো অনেকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে এগিয়ে গেলেন। এঁদের বেরোবার তোড়ে সুলতান আর নাম লিখে কূল পাচ্ছিলেন না। ছাত্রীদেরও একটি দল বেরোলো সুফিয়া ইবরাহিমের (এখন জাতীয় অধ্যাপক সুফিয়া আহমেদ) নেতৃত্বে—তাতে আর যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে শাফিয়া খাতুন (পরে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী) ও রওশন আরা বাচ্চুর কথা মনে পড়ে।

১৪৪ ধারা ভঙ্গকারীদের প্রথমে পুলিশ রাস্তার উলটোদিকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। তারপর ট্রাকে করে তেজগাঁও থানায় নিয়ে যায়, সেখান থেকে পাঠায় জেল-হাজতে। গেট দিয়ে ছাত্রেরা যাতে বের হতে না পারে, সেজন্যে গেটে একবার লাঠিচার্জ করে। এরপর আমাদের উত্তেজনাও বৃদ্ধি পায়। কে যেন কলাভবনের প্রাঙ্গণ থেকে রাস্তায় দাঁড়ানো পুলিশকে লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়লো—আর সঙ্গে সঙ্গে বহুজন এসে ইট-পাটকেল মারতে শুরু করলো পুলিশকে। এটা নেতাদের অভিপ্রেত ছিল না, কিন্তু সকলকে নিয়ন্ত্রণ করা তাঁদের পক্ষেও অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবারে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া শুরু করলো আমাদের দিকে। আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাই, দৌড়ে যাই কলাভবনের পুকুরের দিকে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, কেউ কেউ পুকুরেই ঝাঁপ দেয়: আমি গেঞ্জি ভিজিয়ে নিয়ে চোখে পানি দিই, শুধু শার্ট পরে থাকি, আর অধিকাংশের সঙ্গে ফিরে আসি রণক্ষেত্রে। পুলিশ এবারে গেটের মধ্যে ঢুকে লাঠিচার্জ করে—আমরা প্রাঙ্গণ ছেড়ে কলাভবনের দিকে ছুটে যাই। এক সময়ে দেখি, অনেকে দ্রুতগতিতে উঠে যাচ্ছে দোতলায়। কিছু না বুঝে আমিও তাদের অনুসরণ করি। দোতলার করিডোরের পুবদিকে কয়েকজন শিক্ষককে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ভাইস-চান্সেলর সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন—ছাত্রেরা তাঁকে চাপ দিচ্ছে, বিনা অনুমতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পুলিশের প্রবেশ ও হাঙ্গামার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করতে। তিনি কী বলছিলেন, ভালো শোনা যাচ্ছিল না। আগে তিনি ছাত্রদের অনুরোধ করেছিলেন ১৪৪ ধারা না ভাঙতে, তারা সে-কথা শোনে নি—মনে হয়, তা-ই বলছিলেন। তাঁকে খুব অসহায় দেখাচ্ছিল।

নিচে নেমে দেখি, মধুর দোকানের পাশে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও কলাভবনের মাঝখানে যে লোহার রেলিং ছিল, ছাত্রেরা তা ভেঙে ফেলেছে খানিকটা, আরো খানিকটা ভেঙে ফেলছে। তারপর ওই পথে লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ছে হাসপাতালের প্রাঙ্গণে। আসলে আমাদের লক্ষ্য ছিল পরিষদ-ভবনের দিকে

যাওয়া—জগন্নাথ হলের একটা অংশ নিয়ে সেটা গড়ে উঠেছিল, আর জগন্নাথ হল উঠে এসেছিল ঢাকা হলের (এখনকার শহীদুল্লাহ হল) এক অংশে। যখন সোজা পথে পুলিশ যেতে দিলো না, তখন দেখা যাক, হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ পেরিয়ে পরিষদ-ভবনের দিকে যাওয়া যায় কিনা। আমার একবার মনে হয়েছিল যে, হাসপাতাল-প্রাঙ্গণে আমরা জমায়েত হলে সেখানে না পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে—তাতে রোগীদের কষ্ট বাড়বে। তাকিয়ে দেখি, রোগীরা যতদূরসম্ভব রাস্তার দিকের করিডোরে ভিড় করে ঘটনা অবলোকন করছে। তাদের চোখেমুখে আমাদের প্রতি সমর্থন বা বিরূপতা ফুটে উঠছে কিনা, দূর থেকে তা বোঝা যাচ্ছিল না। সৌভাগ্যবশত হাসপাতালের প্রাঙ্গণে কেউ বেশিক্ষণ থাকে নি—সবাই চলে যাচ্ছিল মেডিক্যাল কলেজ হস্টেলের দিকে। তারই মধ্যে কেউ কেউ আবার পুলিশের দিকে কিছু না কিছু নিক্ষেপ করছিল। ওদিকে পরিষদের অধিবেশনের সময় হয়ে যাচ্ছে। ওই পথেই এম এল এ-রা যাচ্ছেন অধিবেশনে যোগ দিতে। আমরা চাইছি পরিষদ-ভবনে যেতে এবং গমনরত এম এল এ-দের ধরে একটা কোনো প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিতে। হস্টেলের গেট দিয়ে বেরোবার চেষ্টা করতেই লাঠিচার্জ, তারপর কাঁদানে গ্যাসও। বারো-তেরো বছরের একটি ছেলের পায়ে টিয়ার গ্যাসের শেল লেগে ক্ষতের সৃষ্টি হলে সে পড়ে যায়। আমি আরেকজনের সাহায্যে রেলিংয়ের ওপারে অন্যদের হাতে তাকে তুলে দিই হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। উত্তেজনা বাড়ছে, আমরা এগিয়ে যাই, আবার পুলিশের তাড়া খেয়ে ফিরে আসি। এ রকম অগ্রপশ্চাৎ করার মধ্যে প্রথমে মুর্তজা বশীরের সঙ্গে এবং পরে আলাউদ্দিন আল আজাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। গুলি চলতে পারে, এই আশঙ্কা ব্যক্ত করে আজাদ আমাকে সাবধানে থাকতে বলেন। গুলি চলার আশঙ্কা আমার মনে প্রত্যয় জাগায়নি। পরে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন এই বলে যে, গুলিচালনার পূর্বমুহূর্তে নাকি লাল পতাকা নেড়ে ইশারা দেওয়া হয় এবং সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর কাছে লাল পতাকা তিনি দেখেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত বেলা তিনটের একটু পরে গুলি চললো। আহতদের ধরাধরি করে জরুরি বিভাগে নেওয়া হলো। প্রথমে সবাই হতচকিত, তারপর বিক্ষোভ উঠল চরমে। একটু পর পরই একেকজনের মৃত্যুর সংবাদ—কখনো বা নিছক গুজব—ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। প্রথমে তিনজন শহীদের নাম আমরা শুনি—আবুল বরকত, সালাহউদ্দিন ও সালাম। পরে বোঝা যায়, রফিকউদ্দীনকেই ভুল করা হয়েছিল সালাহউদ্দিন বলে—তার মাথার খুলি উড়ে গিয়েছিল। আমানুল হক সে-ছবি তুলেছিলেন এবং পরে তা ছাপিয়ে প্রচার করা হয়েছিল। সালামের নাম শুনে আমরা ধরে নিয়েছিলাম, তিনি আমাদেরই সুপরিচিত, মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। এমনকি. ব্যারাকের যে-কক্ষ ভেদ করে গুলি এসে পড়ে, সে-কক্ষেই তিনি নিহত হন বলে ধারণা করা হয়। পরে জানা গিয়েছিল, শহীদ সালাম ছিলেন সচিবালয়ের পিওন।

কীভাবে যেন মেডিক্যাল কলেজের ১১ নম্বর ব্যারাকে (গেটের সংলগ্ন) একটা মাইক্রোফোন এনে বসানো হলো। মোহাম্মদ তোয়াহার বাংলায় বক্তৃতা করার অভ্যাস ছিল না। তিনি আমাকে বললেন, লিখে লিখে দিতে এবং সেটা দেখে তিনি পড়তে থাকলেন। কিন্তু মুখের কথার সঙ্গে লেখার গতির মিল হয় না। সুতরাং এক সময়ে

লেখার টান পড়লো—তোয়াহা ভাই এক-আধটা কথা যোগ করে বক্তব্য শেষ করে আমাকে মাইক্রোফোন দিলেন। বক্তৃতার অভ্যাস আমারও ছিল না কোনো ভাষাতেই। কয়েক বছর আগে পুলিশ ধর্মঘটের সময়ে সেনাবাহিনীকে দিয়ে পুলিশের ওপরে গুলিচালনা করা হয়েছিল। সেই কথার উল্লেখ করে, মাতৃভাষার দোহাই দিয়ে, পুলিশের উদ্দেশে কিছু বললাম। ততক্ষণে অনেক বক্তা জড়ো হয়েছেন—মাইক্রোফোন নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়েছে। এর মধ্যে পরিষদে মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়ে মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ এলেন সেখানে—তিনি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবি সমর্থন করে এবং গুলিচালনার নিন্দা করে বক্তৃতা দিলেন। একইভাবে পদত্যাগ করে এসেছিলেন *আজাদ*-সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন, কিন্তু তিনি বক্তৃতা করেন নি। শুনেছি, মুসলিম লীগ দলীয় এম এল এ আবদুল খালেকের শেরওয়ানিতে শহীদদের বা আহতদের রক্ত লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওদিকে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কংগ্রেসের সকল সদস্য, পদত্যাগী মওলানা তর্কবাগীশ ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন এবং আওয়ামী মুসলিম লীগের খয়রাত হোসেন ও আনোয়ারা খাতুন পরিষদ-অধিবেশন বর্জন করেন।

গুলিবর্ষণের পর পরই হাসান হাফিজুর রহমান নিজের উদ্‌যোগে একটি প্রচারপত্র লিখে ছাপিয়ে ফেলেন সেই দিনেই। তাতে গুলিচালনার জন্যে দায়ী করা হয় মন্ত্রী মফিজউদ্দীন আহ্‌মদকে। আমার জানামতে, গুলিচালনার প্রতিবাদে লেখা প্রথম প্রচারপত্র ছিল ওটাই। আবেগতাড়িত ওই প্রচারপত্রের বক্তব্য খণ্ডন করে ২৩ ফেব্রুয়ারিতে বিবৃতি দিয়েছিলেন মফিজউদ্দীন—তা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার পরদিনে। পরে জেনেছি, আবদুল্লাহ আল-মুতীর উদ্‌যোগে ও আহমদ হোসেনের সাহায্যে যে-প্রচারপত্র প্রকাশিত হয় ২৭ বা ২৮ তারিখে—তাতে আবদুল গাফফার চৌধুরীর কালজয়ী গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' মুদ্রিত হয়।

গুলিচালনার পরে কেমন একটা থমথমে ভাব নেমে এলো। জানতে পারলাম, ফররুখ আহমদের নেতৃত্বে ঢাকা বেতারের সকল স্টাফ আর্টিস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছেন, অন্যান্য অফিস ত্যাগ করে চলে এসেছেন কর্মচারী-কর্মকর্তারা। রেলওয়ে শ্রমিকেরাও ধর্মঘট করেছেন বলে শোনা গিয়েছিল, তবে সম্ভবত সে-ধর্মঘট হয়েছিল পরদিনে।

একটু পরেই সামরিক বাহিনীর সদস্যেরা এসে পড়লো, ঘোষণা শোনা গেল সান্ধ্য আইন জারির। সান্ধ্য আইন কার্যকর হওয়ার আগে বাড়ি ফেরা দরকার। কলাভবন-মেডিক্যাল কলেজের পেছনের রেললাইন ধরে নবাবপুরের দিকে রওনা হলাম। বাড়িতে যখন পৌঁছোলাম, তখন অবসন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছি। আমার জন্যে বাপ-মায়ের উদ্‌বেগও আমাকে আর স্পর্শ করছে না।

২৫.

২২ ফেব্রুয়ারি সকালে আমার প্রথম কর্তব্য দাঁড়ালো নেয়ামালের জামিন নেওয়া। কামরু ভাইও তার জন্যে কষ্টস্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন। সুতরাং তাঁর সাইকেলের সামনে বসে প্রথমে গেলাম বংশাল রোডে সৈয়দ আবদুর রহিম মোক্তারের কাছে। তাঁর

সাহায্য যে পাওয়া যাবে, এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম। কিন্তু গিয়ে শুনি, তিনি কোর্টে চলে গেছেন। কামরু ভাইয়ের সঙ্গে আবার গেলাম ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। আদালত-প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য, বার লাইব্রেরি এবং উকিল-মোক্তারের চেম্বারও প্রায় জনশূন্য। রহিম সাহেবকে খুঁজে পেলাম না। শুনলাম, এই উত্তেজনার মধ্যে বন্দিদের আনবে না। অতএব, ক্ষুণ্ন মনে ফিরে এলাম কিছু করতে না পেরে।

ফিরতি পথে জনসন রোড-নবাবপুরে দেখলাম খণ্ড খণ্ড মিছিল। জানলাম, একটু আগে নবাবপুরে এক বিশাল মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালিয়েছে এবং একটি বাচ্চা ছেলে আহত হয়েছে—সে বোধহয় বাঁচবে না। একটা ল্যাম্প পোস্টে গুলির দাগ দেখতে পেলাম। আহত ছেলেটিই অহিউল্লাহ কিনা কখনো জানতে পারিনি। আরেকটু এগোতেই দেখি, বংশাল রোডে *সংবাদ*-অফিসে আগুন জ্বলছে। রহিম মোক্তারের বাড়িতে আসা-যাওয়ার পথে *সংবাদ*-অফিস অক্ষত দেখে গিয়েছিলাম। তারপর ক্রুদ্ধ জনতা সরকার-সমর্থক এই পত্রিকার অফিসে হামলা চালায়। ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে কুৎসা রটনার কারণে *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার অফিসও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। একটু ঘুরে বাড়ি ফিরলাম। পথে শুনলাম, হাইকোর্টের সামনে মিছিলে গুলি চলেছে এবং হাইকোর্টের একজন কেরানি নিহত হয়েছেন। কারো কারো মতে অবশ্য হাইকোর্টে কর্মরত সফিউর রহমান গুলিবিদ্ধ হন নবাবপুরে—সেদিন নবাবপুরে একাধিক জায়গায় গুলি চলেছিল।

বাড়ি ফিরে আমি যুবলীগ অফিস থেকে দরকারি কাগজপত্র ও টাইপরাইটারটা আমার বাসায় এনে রাখলাম। অফিসে খোঁজ নেয়ার মতো তখন যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ ইমাদুল্লাহ্ ছাড়া (ইমাদুল্লাহ্ পরে যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন; ১৯৫৬ সালে মিটফোর্ড হাসপাতালে এই দীর্ঘদেহী সুদর্শন যুবকের মৃত্যু হয় জার্মান মিজলসে) আর যুবলীগের কেউ ছিলেন না। ২১ ফেব্রুয়ারিতে ইমাদুল্লাহ্কেও বলা হয়েছিল গ্রেপ্তার না হতে। সকালে মেডিক্যাল কলেজ-প্রাঙ্গণে বিশাল গায়েবানা জানাজার পর তাঁর সভাপতিত্বে সেখানেই এক সভা হয়। সেখানে অলি আহাদই অঘোষিত প্রধান বক্তার ভূমিকা পালন করেন। সভাশেষে মিছিল বের হয়ে সচিবালয়ের দিকে অগ্রসর হলে আবদুল গনি রোডের মোড়ে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। আরেকটি মিছিল পুরোনো ঢাকা হয়ে ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে এলে পুলিশের লাঠিচার্জের শিকার হয়।

সেদিনও ঢাকায় দোকানপাট ঠিকমতো খোলেনি, রেল চলেনি। চারদিকে থমথমে ভাবটা ভাঙছে কেবল মানুষের বিক্ষোভ-প্রদর্শনে এবং সশস্ত্র পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গাড়ির দ্রুত চলাচলে। সেদিন পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের সভায় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার সুপারিশ করা হয়, পরে পাকিস্তান গণপরিষদ অবশ্য সে-সুপারিশের বিবেচনা স্থগিত করে রাখে। ওদিকে সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হল, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল ও জগন্নাথ কলেজে রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদ সক্রিয় থাকে। তবে আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল মেডিক্যাল কলেজ হস্টেল। নেতারা যে যখন পারতেন, এখানে আসতেন; বৈঠকও এখানেই বসতো; এখান থেকেই কর্মসূচি ছড়িয়ে পড়তো সারা দেশে। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদ কার্যত ভেঙে যাওয়ায় আন্দোলনের নেতৃত্বদানের

দায়িত্ব এসে পড়ে প্রকৃতপক্ষে যুবলীগের ওপরে, মূলত অলি আহাদের ওপরে। দিনাজপুরে দবিরুল ইসলাম ও নূরুল হুদা কাদের বখশ, রাজশাহীতে আতাউর রহমান, কুষ্টিয়ায় আসহাবুল হক, নোয়াখালিতে খাজা আহমদ, সিলেটে নূরুর রহমান, নারায়ণগঞ্জে শামসুজ্জোহা ও শফি হোসেন খান রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে বড়ো ভূমিকা পালন করেছিলেন—এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন যুবলীগের স্থানীয় নেতা। চট্টগ্রাম যুবলীগের আহ্বায়ক মাহবুবুল আলম চৌধুরী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন চৌধুরী হারুনুর রশীদ। তবে ২১ তারিখেই রোগশয্যায় মাহবুবুল আলম চৌধুরী লেখেন একুশের প্রথম কবিতা—'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি'। পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে বেশ কষ্ট করে এটি ছাপা হয় চট্টগ্রামে এবং তা ছড়িয়ে পড়ে দেশের প্রায় সর্বত্র। তবে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং তার সকল কপি বাজেয়াপ্ত হয়।

২১ ফেব্রুয়ারিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করাই যে সংগত ছিল, তা মেনে নিয়ে, গোপন কমিউনিস্ট পার্টি এখন আন্দোলন বেগবান করার চেষ্টা করে। তাদের পক্ষ থেকে শহীদুল্লা কায়সার মেডিক্যাল কলেজ হস্টেলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। সে-সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, তবে কমিউনিস্ট পার্টির আর যে-দুজনকে অধিকাংশ সময়ে মেডিক্যাল কলেজ হস্টেলে দেখেছি, তাঁদের মধ্যে একজন হস্টেলেরই বাসিন্দা মনজুর হোসেন, অপরজন সাদেক খান। সাদেক খান একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি রাজনীতিতে যোগ দিলাম কেন। আমি বলেছিলাম, আমি তো রাজনীতি করছি না; যুবলীগ তো অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান; আর ভাষা-আন্দোলন তো অন্য ব্যাপার। সাদেক খান হেসেছিলেন। আসলে আমার মতো বহুজনই ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নিজের অজান্তেই রাজনীতিতে জড়িয়ে গিয়েছিল। মেডিক্যাল কলেজ হস্টেলে তখন আমি নিত্য যাতায়াত করি। আহমদও প্রায় আমার সঙ্গে যায়। সেখানে অনেককে দেখি—যেমন, কে জি মুস্তাফা, আলী আকসাদ, হাসান হাফিজুর রহমান ও একজন নেতার ভূমিকায় আহমদ রফিককে।

জগন্নাথ কলেজে মাইক বসিয়ে আন্দোলনের প্রচারকার্য চালানো আবশ্যক হয়ে পড়লো, কিন্তু তা করতে হবে পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে। আব্বার গাড়িতে একটা রেডক্রস লাগানো ছিল—তাঁর কাছে গাড়ি চাইলাম, কী কাজে ব্যবহার করবো, তাও বললাম। তিনি নির্দ্বিধায় রাজি হলেন। ২৩ তারিখ সকালে সেই গাড়ি নিয়ে লক্ষ্মীবাজারের এক মাইকের দোকান থেকে সাজসরঞ্জাম নিয়ে কলেজ-হস্টেলে পৌঁছোলাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে বক্তৃতা শুরু হয়ে গেল। দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের—এখনকার ভাষায় হরতালের—ডাক ছিল সেদিন। ঢাকায় পূর্ণ ধর্মঘট হয়েছিল—পথঘাট কেবল যানবাহনশূন্য ছিল না, অনেক পরিমাণে জনশূন্য ছিল।

প্রধানত মেডিক্যাল কলেজ ও ইনজিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রেরা মিলে—মেডিক্যাল কলেজ হস্টেলের সামনে যে-জায়গায় গুলি চলেছিল, সেখানে—রাতারাতি শহীদ মিনার গড়ে তোলে। এর নকশা করেছিলেন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সাঈদ হায়দার। ২৩ তারিখে আবুল কালাম শামসুদ্দীন তা উদ্‌বোধন করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন বোধহয় শহীদ সফিউর রহমানের পিতা। এই মিনার দেখতে মানুষের ঢল নেমেছিল এবং তারা যে-যেমন পারছিল, সেখানে টাকা-পয়সাও দিয়ে যাচ্ছিল। মায়ের

আগ্রহাতিশয্যে বিকেলবেলায় রিকশায় চেপে তাঁকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন আব্বা। কাউকে না বলেই আমার মৃত বোন নাজমুননেসার সোনার হার মা সঙ্গে নিয়েছিল এবং আব্বাকে অবাক করে দিয়েই শহীদ মিনারের পাদপ্রান্তে সেই স্বর্ণহার নিবেদন করে এসেছিল। মুর্তজা বশীরের একটি কবিতায় এই হার দেওয়ার কথা উল্লেখ আছে—যদিও দাত্রী যে আমার মা, সেটা তিনি জেনেছিলেন পরে। এসব দানসামগ্রী মেডিক্যাল কলেজের সংগ্রাম-পরিষদের কাছে গচ্ছিত ছিল।

ডাক-পিওনকে বলে রেখেছিলাম, যুবলীগের চিঠিপত্র যেন আমার বাসায় দিয়ে যায়। ২৩ তারিখে একটা টেলিগ্রাম পেলাম ফরিদপুর জেল থেকে। রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে সেখানে কয়েকদিন ধরে অনশন করছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদ। একুশের হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে অনশনের কারণ হিসেবে তার প্রতিবাদও তাঁরা যুক্ত করেছেন এবং সে-সংবাদ জানিয়েছেন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদককে। এই টেলিগ্রামের ভিত্তিতে একটা খবর তৈরি করে আমি *আজাদ* পত্রিকায় দিয়ে আসি এবং তা যথারীতি মুদ্রিত হয়।

ঠাটারিবাজারে আমাদের দু-চারটে বাড়ির ব্যবধানে থাকতেন রশিদ চৌধুরী—তখন আর্ট কলেজের ছাত্র। তাঁর বাবা ছিলেন সুপরিচিত মুসলিম লীগ-নেতা এবং সম্ভবত তখন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ইউসুফ হোসেন চৌধুরী। তবে ভাষা-আন্দোলনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংশ্লিষ্ট হতে রশিদ চৌধুরীর পক্ষে তা বাধাস্বরূপ হয়নি। বাড়িতে বসেই তিনি আন্দোলনের অনেক পোস্টার লিখেছিলেন। কিছু পোস্টার নিয়ে আমি সাইকেলে করে মেডিক্যাল কলেজ হস্টেলের দিকে রওনা হলাম। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। পুরোনো রেলস্টেশনের সামনে দিয়ে পশু-হাসপাতালের মুখে যেমনি বাঁক নিয়েছি, পুলিশ আমাকে ধরে ফেললো। কারণ পোস্টার বহন করা নয়, সাইকেলে বাতি না থাকা। সেটা বুঝেও আমি বিপন্ন বোধ করলাম এই কারণে যে, থানায় যদি নিয়ে যায়, তাহলে পোস্টারের জন্যে আমার দুর্গতি হবে। পশু-হাসপাতালের দেয়ালে সাইকেল ঠেস দিয়ে রেখে আমি খবরের কাগজে মোড়া পোস্টার নিয়ে ইতস্তত হাঁটতে লাগলাম এবং অন্ধকারের সুযোগে দেয়ালের ওপর দিয়ে তা হাসপাতালের মধ্যে ফেলে দিলাম। বাতিহীন সাইকেলের আরো দু-একজন চালক এবং আমাকে খানিক পরেই সতর্ক করে দিয়ে পুলিশ ছেড়ে দিল। তখন ফেলে-দেওয়া পোস্টারের জন্যে আমার আফসোসের সীমা রইলো না।

২৩ তারিখে নারায়ণগঞ্জে বড়োরকম সভা-সমাবেশ-বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়, আর খান সাহেব ওসমান আলি ছাড়াও তাঁর পুত্র শামসুজ্জোহা ও মুস্তফা সারওয়ার গ্রেপ্তার হন। শামসুজ্জোহা ছাড়া যুবলীগের আরেক নেতা সেখানে গ্রেপ্তার হন—তিনি শফি হোসেন খান। কর্মীদের মধ্যে গ্রেপ্তার হয় আমার সহপাঠী মসিহুর রহমান ও বন্ধু মুস্তাফা মনোয়ার। রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে নারায়ণগঞ্জে অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন মর্গ্যান স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মমতাজ বেগম। তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ২৯ তারিখে। পুলিশ তাঁর সঙ্গে অসংগত আচরণ করে; মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পেতে তিনি অস্বীকার করেন; শুনেছি, এ নিয়ে তাঁর পরিবারেও বেশ অশান্তি হয়েছিল।

২৩ তারিখ থেকে ব্যাপক গ্রেপ্তারের পালা শুরু হয়। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে

আবুল হাশিম, আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, মনোরঞ্জন ধর, গোবিন্দলাল ব্যানার্জি, নারায়ণগঞ্জের খান সাহেব ওসমান আলি ও রাজশাহীর মাদার বখশ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। হাশিম সাহেব ছাড়া এঁরা সবাই ছিলেন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা গুলিচালনার নিন্দা করে যে-সভা করেছিলেন, তা অনুষ্ঠানের দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন মোজাফফর আহমদ চৌধুরী (তখন প্রক্টর) ও মুনীর চৌধুরী এবং পরে পৃথ্বীশ চক্রবর্তী (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের রিডার ও অধ্যক্ষ)। জগন্নাথ কলেজে আমাদের শিক্ষক অজিতকুমার গুহও প্রথম দফায় গ্রেপ্তার হন বাড়ি থেকে।

২৪ তারিখের বড়ো ঘটনা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ-হস্টেলের প্রাঙ্গণে পুলিশের অতর্কিত প্রবেশ এবং শহীদ মিনার ভেঙে ফেলা। ঘটনাটি ঘটে আমাদেরই চোখের সামনে। পুলিশ আসার খবর পেয়ে আমরা কয়েকজন হাসপাতালের প্রাঙ্গণে লোহার রেলিংয়ের ধারে অকুস্থলের যতোটা সম্ভব কাছে সমবেত হই। শেরওয়ানি-পাজামা-পরা দীর্ঘদেহী ইমাদুল্লাহ্ রেলিংয়ের শিক ধরে সজলচক্ষে ও রুদ্ধকণ্ঠে চিৎকার করছিলেন, 'ক্যামেরা, ক্যামেরা, কেউ একজন ক্যামেরা নিয়ে এসো। ওরা শহীদ মিনার ভেঙে ফেলছে—ছবি তুলে রাখো, ছবি তুলে রাখো।' ওই মুহূর্তে সত্যিই মনে হয়েছিল, মিনারের ওপরে যতো আঘাত, তা আমাদের গায়ে এসে পড়ছে।

২৫ তারিখে ঢাকায় ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল। ধর্মঘট-পালনের এবং আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে নেতাদের নির্দেশে আমি একটি প্রচারপত্র তৈরি করি। সেটা মুদ্রণের দায়িত্বও পড়ে আমার ওপরে। পাকিস্তান বুক ডিপোর মালিকের ছেলে বদরুদ্দীন আহমদ ওরফে মাখন ঝুঁকি নিয়ে নিজেদের প্রেসে তা ছেপে দিয়েছিলেন। এই যোগাযোগটা আবার ঘটিয়ে দিয়েছিলেন আনু ভাই। মুদ্রিত প্রচারপত্রটি ২৪ তারিখ রাতে আমি গোপনে ফজলুল হক মুসলিম হলের ঘরে ঘরে বিলি করি। ধর্মঘট যথাযথভাবে পালিত হয়। কিন্তু ২৫ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয় অনির্দিষ্টকালের জন্যে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সকল ছাত্রকে হল ছাড়তে বাধ্য করা হয়। এতে আন্দোলনের শক্তি অনেকটা কমে যায়। সেদিনই পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঢুকে পড়ে সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলে। প্রোভোস্ট ড. এম ওসমান গণিকে তারা হলের সামনের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করে এবং তাঁর অনুমতি ছাড়াই হলে খানাতল্লাশি করে। তল্লাশির সময়ে হাউজ-টিউটরদের কাউকে না কাউকে তারা সঙ্গে যেতে বাধ্য করেছিল। শুনেছি, কর্তাব্যক্তিদের কেউ গণি সাহেবের দিকে সিগারেট এগিয়ে দিলে তিনি তা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেন। হল থেকে মাইক্রোফোন নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ, মেডিক্যাল কলেজ-হস্টেলেও অতর্কিতে প্রবেশ করে মাইক ছিনিয়ে নিয়েছিল। একই দিনে আমাদের কলেজে পুলিশ ঢোকে। সেখান থেকেও তারা মাইক্রোফোনটি নিয়ে যায়—কী করে মালিকের ক্ষতিপূরণ করবো, সে-দুশ্চিন্তায় আমার অনেক সময় কাটে। পরে জেনেছিলাম, তিনি থানা থেকে মাইক উদ্‌ধার করেছিলেন এই বলে যে, ছাত্রেরা জোর করে তাঁর দোকান থেকে সেটা ছিনিয়ে নিয়েছিল। আমাদের কলেজ-হস্টেলে খানাতল্লাশির সময়ে এক মজার ঘটনা ঘটে বলে শুনেছিলাম। তরুণ শিক্ষকদের অনেকে কলেজ-হস্টেলে থাকতেন। তল্লাশির সময়ে অর্থনীতির শিক্ষক এ

বি এম গোলাম কিবরিয়ার টেবিলে সিডনি ও বিয়েট্রিস ওয়েবের *সোভিয়েত কমিউনিজম* বইটি দেখে পুলিশ তা বাজেয়াপ্ত করে এবং কিবরিয়া সাহেবকেও ধরতে চায়। অন্য শিক্ষকেরা সবাই মিলে বোঝান যে, বইটি শিক্ষামূলক, নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির প্রচারমূলক নয়। পরে কিবরিয়া সাহেব প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে পুলিশ সার্ভিসে ঢোকেন এবং বাংলাদেশ আমলে পুলিশের ইনস্পেক্টর-জেনারেলের পদসহ আরো অনেক পদের অধিকারী হন। ২৫ তারিখে ফজলুল হক হল, ইনজিনিয়ারিং কলেজ ও মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল থেকেও পুলিশ মাইক্রোফোন অপহরণ করে। এরপরে আন্দোলনের প্রধান নেতাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয় এবং কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তাঁদের আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সকলে পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে কাজ করছিলেন, এবারে তাঁরা আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। এই অবস্থায় ৫ মার্চে আহূত ধর্মঘট সফল হয়নি। সরকারও এই প্রথমবার দমননীতির সাফল্যের স্বাদ অনুভব করে।

নেতাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বের হওয়ার পরে অলি আহাদের অগ্রজ—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক—ড. এ করিম একদিন সকালে আমার বাসায় এসে খবর দেন যে, অলি আহাদ আত্মগোপন করে আছেন, তবে বিশেষ একটি শব্দ-লেখা চিরকুট নিয়ে কেউ এলে বুঝতে হবে যে, অলি আহাদই তাকে পাঠিয়েছেন। প্রথম চিরকুট নিয়ে আসেন চিকিৎসক এম এ করিম। মিটফোর্ড থেকে এল এম এফ পাশ করে তিনি জগন্নাথ কলেজে যখন আই এসসি পড়েন, তখন কলেজের ছাত্র-সংসদের সহ-সভাপতি হয়েছিলেন। সেটা অবশ্য জগন্নাথ কলেজে আমরা ভর্তি হওয়ার আগে। তাঁর অনুজ বাকী আমাদের সমসাময়িক ছিলেন। পরে ডা. করিম নবাবপুর রোডে কিশোর মেডিক্যাল হল নামে একটি ফার্মেসি প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেটি রাজনৈতিক ব্যক্তিদের একটি মিলনক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ডা. করিম যুবলীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তবে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে বোধহয় তাঁর যোগ ছিল গভীরতর। হয়তো সে-কারণেই তিনি বেশি সামনে আসতেন না। তাতে আত্মগোপনকারী রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল।

অলি আহাদের দ্বিতীয় চিরকুট নিয়ে আসেন আমার পূর্বপরিচিত আশরাফুল ইসলাম—এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনা স্টেট ইউনিভার্সিটির এলিজাবেথ সিটি ক্যাম্পাসে অধ্যাপনা করেন। তিনি বললেন, তাঁর সঙ্গে যেতে হবে। র‍্যাংকিন স্ট্রিটের উলটো দিকে দক্ষিণ মৈশুণ্ডির ভূতের গলিতে এক বাসায় গিয়ে অলি আহাদকে পেলাম। তিনি জানতে চাইলেন, শান্তিনগরে ডা. মোতালেবের বাড়ি আমি চিনি কিনা। ডা. মোতালেব ছিলেন মালেক ভাইয়ের অগ্রজ, সুতরাং সে-বাসা বিলক্ষণ চিনতাম। অলি আহাদ বললেন, সন্ধ্যার পরে সেখানে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম-পরিষদের সভা বসবে—সেখানে তাঁকে পৌঁছে দিতে হবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করে রিকশায় চেপে অলি আহাদ ও আমি রওনা হলাম। নির্দিষ্ট জায়গায় তাঁকে পৌঁছে দিয়ে আমি হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরলাম।

আমি অন্যত্র লিখেছিলাম এবং আরো কেউ কেউ লিখেছিলেন (যেমন, হাসান হাফিজুর রহমান-সম্পাদিত *একুশে ফেব্রুয়ারী* (ঢাকা, ১৯৫৩) বইতে সংকলিত কে জি

মুস্তাফা ও কবিরউদ্দীন আহমদের লেখা ঘটনাপঞ্জি) যে, এই সভা হয় ফেব্রুয়ারির শেষে। অলি আহাদ লিখেছেন, ৭ মার্চ, শুক্রবার, সন্ধ্যা সাতটায়। সেই রাতেই ডা. মোতালেবের বাড়ি ঘেরাও করে সংগ্রাম-পরিষদের উপস্থিত সকল সদস্যকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। কেবল কাজী গোলাম মাহবুব ঘরের মাচায় লুকিয়ে থেকে আত্মরক্ষা করেন। সংগ্রাম-পরিষদের এই সভার খবর সদস্যদের বাইরে জানা ছিল ডা. মোতালেব, সাদেক খান, হাসান পারভেজ (শান্তিনগরের পীর সাহেব আবদুল গফুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, পরে ব্যারিস্টার; এঁরা বাড়িতে উর্দু বলতেন) ও আমার। নেতারা ধরা পড়ার পরে এর জন্যে একেকজন আমাদের একেকজনকে দায়ী করতে থাকলেন। কেউ দায়ী করলেন ডা. মোতালেবের অনুজ মালেক ভাইকে—সেকথা তাঁর কানে যাওয়ায় রটনার উৎস বলে আমাকে গণ্য করে তিনি বেশ রুষ্ট হন। সাদেক খান দায়ী করেন রহিম চৌধুরীকে—তিনি ছিলেন সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল ছাত্র-সংসদের সাধারণ সম্পাদক হেদায়েত হোসেন চৌধুরীর বন্ধু এবং মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল। আবার রহিম চৌধুরী যে সভার সংবাদ পেয়ে যান, তার জন্যে অনেকে দায়ী করেন সাদেক খানকে।

পরে পুলিশের কাছে কাজী গোলাম মাহবুব আত্মসমর্পণ করেছিলেন—মওলানা ভাসানী ও আরো কেউ কেউ তেমন করেছিলেন। কাজী গোলাম মাহবুব জেলখানায় গিয়ে অলি আহাদের কাছে সভার খবর জানাজানির জন্যে আমাকে দায়ী করেন। তাঁর একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, পুলিশের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চে বশীর নামে আমার কোনো আত্মীয় কাজ করতেন (আসলে তিনি ছিলেন মোহাম্মদ তোয়াহার আত্মীয়)। কাজী গোলাম মাহবুবের কথাটা তোয়াহা একেবারেই উড়িয়ে দেন, কিন্তু অলি আহাদ তা বিশ্বাস করেন। অবশ্য জেল থেকে বেরোবার পরে এই মিথ্যা সন্দেহপোষণের জন্যে তিনি আমার কাছে দুঃখপ্রকাশ করেন। বদরুদ্দীন উমর যখন ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছিলেন, তখন কাজী গোলাম মাহবুব তাঁর সন্দেহের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন, তবে অলি আহাদ আমাকে দোষ দেননি (বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, চট্টগ্রাম, ১৯৮৫, পৃ ৪৪১-৫৫)। কিন্তু পরবর্তীকালে *জাতীয় রাজনীতি/ ১৯৪৫ থেকে ৭৫* (ঢাকা, ১৯৮২; দ্বি-স ১৯৮৯; তৃ-স ১৯৯৭) বইয়ের প্রথম দুই সংস্করণে অলি আহাদ লেখেন যে, সভায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও 'অজ্ঞাত কারণে' হাসান পারভেজ ও আমি গ্রেপ্তার হইনি। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, আমি ও হাসান পারভেজ সংগ্রাম-পরিষদের সদস্য ছিলাম না, তাই ওই সভায় আমাদের অংশগ্রহণের প্রশ্ন ছিল না এবং আমি কেবল তাঁকে সভাস্থলে পৌঁছে দিয়ে আসি সভার খবর জানার সঙ্গে সঙ্গেই। *ভোরের কাগজে* প্রকাশিত (২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫) আমার স্মৃতিকথামূলক একটি লেখা পড়ে দ্বিতীয়বার তাঁর ভুল ভাঙে। তাঁর বইয়ের তৃতীয় সংস্করণে আমার লেখাটি তিনি সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত করেন এবং 'অজ্ঞাত কারণে' কথাটা বাদ দিয়ে দেন; তবে আমি যে সভায় উপস্থিত ছিলাম, এই ভুল খবর রয়ে যায়। পরবর্তীকালে কাজী গোলাম মাহবুবের আচরণ এবং কথাবার্তা থেকে আমার মনে হয়েছে যে, ওই অপবাদ তিনি আর বিশ্বাস করেন না।

ফেব্রুয়ারির শেষে ভাষা-আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। মার্চে আর আন্দোলনের রেশ

থাকেনি। সংগ্রাম-পরিষদের নেতারা গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ায় আন্দোলন নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে। সারা দেশেই রাজনৈতিক কর্মীদের ধরপাকড় চলেছিল। নেতারা কেউ জেলে, কেউ আত্মগোপনে। আন্দোলন না থাকলেও সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদ নতুন করে গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলো। এপ্রিলের শেষে বার লাইব্রেরি হলে আহূত সভায় আতাউর রহমান খানকে আহ্বায়ক করে নতুন কমিটি গঠিত হয়। সে-সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম, তবে সেখানে আমার কোনো ভূমিকা ছিল না। ফেব্রুয়ারির শেষেই যুবলীগের অফিস সিল করে দেয় পুলিশ। ইমাদুল্লাহ্ ও আমি মিলে জেলা শাখাগুলোর সঙ্গে কিছু যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু জেলা-পর্যায়ের নেতারা গ্রেপ্তার হয়ে গেলে যোগাযোগের সুযোগটিও থাকলো না। পুলিশের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোক যুবলীগের অফিস ও আমাদের বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করে, বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে আমার কাছ থেকে কথা বের করতে চায়। তারপর তারা ক্ষান্ত হয়—আর কিছু জানার দরকার ছিল না বলে।

২৬.

একটু পেছনে ফিরে ফেব্রুয়ারি মাসেরই একটা ঘটনার কথা বলি। ১৩ ফেব্রুয়ারিতে *পাকিস্তান অবজার্ভার* পত্রিকা সরকারি আদেশে নিষিদ্ধ হয়ে যায়, সে কথা বলেছি। ওই পত্রিকার কোনো সম্পাদকীয়তে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সমালোচনা ছিল, প্রসঙ্গত খলিফা ওসমানের স্বজনপ্রীতির উল্লেখ ছিল। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অজুহাতে পত্রিকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। জগন্নাথ কলেজে সেদিন আমাদের ইতিহাস ক্লাসে নারায়ণবাবু বলেছিলেন, *অবজার্ভারে* হজরত ওসমান সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, ইতিহাসে তার সত্যতা পাওয়া যায়। ইতিহাস পড়তাম আমরা আট-দশজন মাত্র। তারই মধ্যে মুসলিম লীগ-সমর্থক এক ছাত্র নারায়ণবাবুর কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে গেলো। ক্লাসে সে কিছু না বললেও ক্লাস শেষ হওয়ার পর ঘোষণা করলো, ইসলামের অবমাননা করায় নারায়ণবাবুকে সে দেখে নেবে। আমি তাকে বললাম, নারায়ণবাবু তো ইসলাম সম্পর্কে কিছু বলেননি, হজরত ওসমান সম্পর্কে ইতিহাসবিদ্দের কথা উদ্‌ধৃত করেছেন মাত্র। আমার কথায় কর্ণপাত না করে সে রাগে গরগর করতে লাগলো। আমি দৌড়ে গিয়ে গৃহাভিমুখী নারায়ণবাবুকে ধরলাম পথের মধ্যে। কারো নাম না করে জানালাম, তাঁর কথায় কোনো কোনো ছাত্র ক্ষুব্ধ হয়েছে—তিনি যেন সাবধানে থাকেন এবং ওসব প্রসঙ্গ আর অবতারণা না করেন। নারায়ণবাবু আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে ইতিহাসের সত্যাসত্য আলোচনা করতে না পারলে আর কোথায় করবো? এতো অসহিষ্ণু হলে তোমরা ইতিহাস পড়বে কী করে!' তখনই তিনি আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলেন এবং নিজের বক্তব্যের সমর্থনে ইতিহাসের অন্তত তিনটি বইয়ের সাক্ষ্য দেখাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমি সেদিন অবশ্য তাঁতিবাজারে তাঁর বাড়ির দরজা থেকে কলেজে ফিরে এসেছিলাম।

ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো, তা বলতে পারি না, কিন্তু রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে দিলো। আন্দোলন-পরবর্তী বন্ধের পরে কলেজ যখন আবার খুললো তখন আন্দোলনের রেশ না থাকলেও মুসলিম লীগ-বিরোধী ভাবাবেগ খুব প্রবল ছিল। সরকার-সমর্থকরা সেই যে চুপসে গেলো. সে-অবস্থার আর পরিবর্তন হয়নি।

একুশে ফেব্রুয়ারির বন্দিদের কারামুক্তি ঘটলো মার্চ মাসের প্রথমে। তখন কলেজ খুলেছে কিনা মনে নেই, তবে আমি বাড়িতে ছিলাম। দুপুরের খাওয়া লাগাচ্ছে টেবিলে—ঠাটারিবাজারে এসে আমরা চেয়ার-টেবিলে বসে খেতে শুরু করি,— এমন সময়ে মনে হলো নেয়ামাল ডাকছে আমার নাম ধরে। লাফ দিয়ে ঘরের বাইরে এসে দেখি সত্যিই সে আমার নাম ডাকতে ডাকতে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। আমি তো বটেই. বাড়ির সকলেই উল্লসিত, এমনকি আমাদের কাজের ছেলে কোরবানও—সে ১৯৫০ সালে আমাদের পরিবারে প্রবেশ করে ২৬ বছর একটানা এখানেই ছিল। নেয়ামাল জানালো, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে গিয়েছিল আলুবাজারে তার মেসে, কিন্তু মেস বন্ধ, তাই আমাদের বাড়ি চলে এসেছে। আব্বা তাকে বললেন, যতদিন দরকার হয় আমাদের বাড়িতে থাকতে। নেয়ামালের কাছে তার জেল-জীবনের অভিজ্ঞতার কথা শুনলাম, আর শুনলাম তার সহবন্দি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের কথা।

কলেজ খোলার কিছুকাল পরেই মনে হয় মুসলিম লীগ-সমর্থক এক ছাত্র—আমাদের ওপরের ক্লাসে পড়তেন—নেয়ামালের কোনো মন্তব্যে উত্তেজিত হয়ে ক্যান্টিনের মধ্যেই তাকে এমন জোরে লাথি মেরেছিলেন যে, নেয়ামাল খুব ব্যথা পেয়েছিল। এ নিয়ে অধ্যক্ষের কাছে নালিশ করবো কিনা, তা নিয়ে আমরা বহু আলোচনা করি এবং নালিশ না করার সিদ্ধান্ত নিই। পরে সেই ছাত্রটি নিজের অসংযত আচরণের জন্যে নেয়ামালের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন।

অধ্যক্ষের কাছে আমরা দল বেঁধে গিয়েছিলাম অজিতবাবুর মুক্তিলাভের চেষ্টা করার অনুরোধ জানাতে। এই দল বেঁধে যাওয়ার মানবিক ও রাজনৈতিক মূল্য ছিল, কিন্তু তার প্রয়োজন ছিল না। কেননা অধ্যক্ষ আমাদের জানালেন, তিনি এরই মধ্যে অজিত গুহের মুক্তি চেয়ে সরকারের কাছে চিঠি দিয়েছেন। তিনি আমাদের বলেননি, তবে আমরা পরস্পর শুনেছিলাম যে, অজিতবাবু যখন কারাবন্দি, তখন পুলিশের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোক—আমরা তাদের উল্লেখ করতাম বুদ্ধিজীবী বলে—অধ্যক্ষের কাছে এসে অজিতবাবুর রাজনৈতিক মত ও কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁর কাছে জানতে চায়। খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ নাকি উত্তরে বলেছিলেন, অজিত গুহ যে একজন ভালো শিক্ষক ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি, এ কথা তিনি বলতে পারেন; শিক্ষকের রাজনৈতিক মতামত সম্পর্কে খোঁজখবর রাখা অধ্যক্ষের দায়িত্বের অন্তর্গত বলে তিনি মনে করেন না। পরে খান বাহাদুরকে এর খেসারত দিতে হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে প্রদেশে ৯২ (ক) ধারার শাসন প্রবর্তিত হলে সরকার তাঁকে অধ্যক্ষের পদ থেকে সরিয়ে দেয়।

কলেজ-অধ্যক্ষের সঙ্গে আমার একটা ছোটো সংঘাতের কথা এখানেই বলে নেওয়া যায়। কলেজে যখন ছাত্র-সংসদের নির্বাচন দেওয়া হয় তখন আমরা—সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সরকারবিরোধী ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ছাত্রেরা—সংযুক্ত ছাত্রফ্রন্ট নামে এক নির্বাচনী জোট তৈরি করে মাঠে নেমে পড়ি। আহমদ ছিল এর

প্রধান নেতা, আমার কাজ ছিল ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচি রচনা করা। সেটি প্রকাশিত হওয়ার দু-একদিনের মধ্যেই অধ্যক্ষ কলেজের সকল ছাত্রের এক সভা ডাকলেন নির্বাচন সম্পর্কে কিছু বলবেন বলে। বিশাল এক ক্লাসঘরে আমরা সমবেত হলাম। সামান্য ভূমিকার পরে শেরওয়ানির পকেট থেকে সেই মুদ্রিত ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচি বের করে জানতে চাইলেন সেটা কার লেখা? তখন ইংরেজিই ছিল এসব বক্তৃতা বা সংলাপের মাধ্যম। তাঁর প্রশ্ন শুনে একটু ইতস্তত করে দুরু দুরু বক্ষে উঠে ক্ষীণস্বরে কবুল করলাম, আমার। তিনি প্রশ্ন করলেন, এতে লেখা হয়েছে কলেজ-লাইব্রেরি থেকে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে অন্য কোনো বই ছাত্রদের দেওয়া হয় না—এই অভিযোগ সত্যি? আমি বললাম, জি, সার্। উনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি প্রমাণ করতে পারবে? বললাম, আমি *অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট* উপন্যাসটা লাইব্রেরি থেকে নিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পাঠ্যবই নয় বলে আমাকে দেওয়া হয়নি। অধ্যক্ষ জানতে চাইলেন, তুমি কি কখনো এ নিয়ে আমার কাছে অভিযোগ করেছিলে? স্বীকার করলাম, না সার্। এবারে তিনি চড়া গলায় বললেন, তাহলে এ বিষয়ে ছাপার অক্ষরে অভিযোগ ছড়ানোর অধিকার তোমার নেই। তোমার উচিত ছিল প্রতিকারের সহজ উপায় খোঁজা। কলেজের ছাত্র হয়ে অধ্যক্ষের কাছে প্রতিকার না চেয়ে, নিয়মের পথে অগ্রসর না হয়ে, এটাকে তুমি নির্বাচনী ইস্যু বানিয়েছো। নিজের আচরণে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।

ঘরসুদ্ধ সকলের দৃষ্টি একবার অধ্যক্ষের দিকে, একবার আমার দিকে ঘুরছে। অধ্যক্ষের ভর্ৎসনায় আমি সত্যিই লজ্জিত হয়ে গেলাম, মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে। তিনি সভা ভঙ্গ করে দিলেন। তারপর আমার ভয় ধরলো, খান বাহাদুর যদি এসব কথা আব্বাকে বলে দেন, তবে আমার দুর্গতির সীমা থাকবে না। আরেক ভয় হলো, এই সভায় যা ঘটলো, তা হয়তো নির্বাচনে আমাদের প্রতিকূলে যাবে। দুটো ভয়ই অমূলক ছিল। নির্বাচনে আমরা জয়ী হয়েছিলাম, অধ্যক্ষ আব্বাকে কিছু বলেননি। ১৯৫৮ সালে তাঁর কাছ থেকে একটা শংসাপত্র চাইতে গেলে তিনি আমার গুণপনার পরিচয় দিয়ে অন্যান্য কথার সঙ্গে 'জেন্টলম্যানলি ইন কনডাক্ট' লিখেছিলেন। সেই মুহূর্তে আমার ওই দিনের ভর্ৎসনার কথা মনে পড়েছিল। ওই তিরস্কার থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছিলাম; তিনি যে আব্বাকে এ বিষয়ে কিছু বলেননি, তা থেকেও শিক্ষা নিয়েছিলাম; আবার তাঁর দেওয়া শংসাপত্রের ঔদার্য থেকেও কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেছিলাম।

লাইব্রেরির বই দেওয়া যে একটা নির্বাচনী ইস্যু হতে পারে, এটা নিশ্চয় এখন বিস্ময়কর মনে হবে। আসলে আমাদের বেশির ভাগ দাবি-দাওয়া ছিল কলেজ-কেন্দ্রিক। তবে সেখানেও কেউ কেউ বৃহত্তর রাজনীতির যোগ ঘটাতো। যেমন, নির্বাচন-উপলক্ষে দেওয়া বক্তৃতায় আমীর আলী বলেছিল, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী মুসলিম লীগ সরকার এবং তার আজ্ঞাবাহী কলেজ-কর্তৃপক্ষ হস্টেল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করে না।

আমাদের সময়ে জগন্নাথ কলেজ বার্ষিকী যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে আমার সেই পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প, নেয়ামালের কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথের গণচেতনা

সম্পর্কে আহমদের প্রবন্ধ ছাপা হয়। দু-বছরই নাট্যাভিনয় হয়েছিল। একবার মতিন সাহেবের পরিচালনায় *দি বিশপস ক্যান্ডলস্টিক* অভিনীত হয়েছিল বিধায়ক ভট্টাচার্যের *মাটির ঘরের সঙ্গে*। শেষেরটি পরিচালনা করেছিলেন কাফী খাঁ—আহমদ ছিল সহকারী পরিচালক। নায়কোচিত চেহারা নিয়ে ওই নাটকে অভিনয় করেছিল আসাদ রেজা—পরবর্তীকালে সে আলহাজ শাহ্ সুফি কায়সার চিশতি আল-কাদেরী আল-জিলানী নাম ধারণ করে দীন ও দুনিয়া দুয়েরই উন্নতি করে। নারীচরিত্রে অভিনয় করেছিল জিল্লুর রহমান খাঁ ও আবদুর রহিম—তাদের বেশ মানিয়েছিল। অভিনয়ের সময়ে দুষ্টু ছেলেরা মঞ্চ লক্ষ করে ডিম ছুঁড়ে মেরেছিল, তার একটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অধ্যক্ষ এবং তাঁর স্ত্রীর আসনের মাঝে এসে পড়েছিল। তবে নাট্যাভিনয় মানসম্পন্ন হয়েছিল। তখন বংশাল রোডে *সংবাদ*-অফিসের পরের এক বাড়ি থেকে মহীউদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় দৈনিক *আমার দেশ* বের হতো। তাতে কাজী ফজলুর রহমান (পরে সচিব ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা) ওই নাট্যাভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করে বিস্তৃত এক সমালোচনা লিখেছিলেন। তখন তিনি ওই কাগজে খণ্ডকাল কাজ করতেন।

২৭.

ভাষা আন্দোলনের জের আপাতত শেষ হতেই আনু ভাই ধরে বসলেন নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে নেয়ামাল, আহমদ ও আমাকে সংশ্লিষ্ট হতে হবে। তিনজনের হয়ে আমি বললাম, মার্কসবাদের কিছুই যেখানে জানিনে, সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন অর্থহীন; তবে, হ্যাঁ, কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের জন্য তাঁদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল। আনু ভাই বললেন, তাহলে মার্কসবাদ সম্পর্কে পড়াশোনা করো—কমিউনিস্ট পার্টির অনুশীলন-ক্লাসে যোগ দাও। তাই করলাম। আনু ভাই আমার বাসায় নিয়ে এলেন এক ভদ্রলোককে—মাটিতে পাটি বিছিয়ে আমাদের ক্লাস শুরু হলো। পাঠ্য নির্দিষ্ট হলো অমিত সেনের [সুশোভন সরকার] *ইতিহাসের ধারা* এবং নীহার সরকারের *রাজনীতির গোড়ার কথা* ও *অর্থনীতির গোড়ার কথা*। কিছুকাল পরে আমাদের ক্লাসের জায়গা হলো সিদ্ধেশ্বরী স্কুলে—ভদ্রলোক ছিলেন ওই স্কুলেরই শিক্ষক। তখন তিনি বলে দিলেন, কেউ জিজ্ঞেস করলে আমরা যেন বলি ম্যাট্রিকের কোচিং ক্লাস করছি। পরে জেনেছিলাম, ভদ্রলোকের নাম মোহাম্মদ ইসমাইল। স্কুল-শিক্ষকতা ছেড়ে তিনি উত্তরজীবনে ঢাকা জেলা আদালতে ওকালতি করতেন। মনে হয়, তখনো কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল, তবে এ-বিষয়ে আমরা কোনো আলাপ করিনি।

ইসমাইল সাহেবের কাছে আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা বেশিদিন চলেনি। কী কারণে, তাও এখন মনে পড়ে না। এরপর যার যার পড়াশোনা তার ওপর বর্তালো। তখন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ইতিহাস ও দর্শন এবং মার্কসবাদ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে লিখে চলেছেন। আমরা গোগ্রাসে তা পড়ছি। নতুন সাহিত্য ভবন থেকে অনিলকুমার সিংহের সম্পাদনায় *নতুন সাহিত্য* বের হচ্ছে—এর পাতায় নানান

নতুনত্বের পরিচয় পাচ্ছি : লাইসেংকোর জীববিজ্ঞান, পাভলভের মনোবিশ্লেষণ (দেবীপ্রসাদের দৌত্যে তার আগেই পরিচয় হয়েছে ফ্রয়েডের সঙ্গে)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞানের ছাত্র এবনে গোলাম সামাদ আর অর্থনীতির ছাত্র কবিরউদ্দীন আহমদ এসব নিয়ে বিতর্ক করছেন ওই পত্রিকায়ই—তাতে আমার খুব গর্ববোধ হচ্ছে। প্রগতি-সাহিত্য আর সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা সম্পর্কে নতুন জ্ঞান লাভ করছি *নতুন সাহিত্য* ছাড়াও *পরিচয়* আর *অগ্রণী* থেকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত অখ্যাত লেখকের উপন্যাসও পড়ছি। পড়ছি ঋষি দাসের *শেক্সপীয়র* ও *বার্নার্ড শ*। বোধহয় প্রথমোক্ত বইটি পড়ার আগেই দুটি বইয়েরই সমালোচনা পড়ি *পরিচয়ে*, নীরেন্দ্রনাথ রায়ের লেখা—সমালোচনা তো নয়, আলাদা প্রবন্ধই বলা যায় তাকে। অরবিন্দ পোদ্দারের *বঙ্কিম-মানস* পড়ার আগেই এমনি করে নীরেন্দ্রনাথকৃত তার সমালোচনা পড়ে ভাবনা জাগছে মনে, রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ে তাঁর লেখাও পড়ছি উৎসুক হয়ে। শুধু বামপন্থী সাহিত্যই পড়ছি, তা নয়। দেব সাহিত্য কুটির থেকে বেঙ্গল পাবলিশার্সে উন্নতি হয়েছিল আমার; এখন সিগনেট প্রেসের বই—দিলীপ গুপ্তের যত্নকৃত মুদ্রণ আর সত্যজিৎ রায়ের চমৎকার প্রচ্ছদ—চোখ জুড়োচ্ছে, মন ভোলাচ্ছে, নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে দিচ্ছে। কামরু ভাই বললেন একদিন, চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে যদি সিগনেট প্রেস থেকে আমার বই বেরোয়, তবে তিনি পুরস্কৃত করবেন আমাকে। আমি গল্প লিখি—তা ছাপা হয় পত্রিকায়, আর মনে মনে ভাবি, অমন দিন কি আর আসবে!

কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সেই প্রাথমিক সংযোগের ফলেই আমাদের প্রত্যেককে একটা ছদ্মনাম (পার্টির পরিভাষায় *টেক-নেম*) নিতে হলো। আত্মগোপনকারী নেতাদের মধ্যে পরিচয় হলো এ এন এম শহীদুল্লা (পরে শহীদুল্লা কায়সার) আর রমেন মিত্রের সঙ্গে—অবশ্যই তাঁদের *টেক-নেমে*। দেখা-সাক্ষাতের জায়গা আমাদেরই বাড়ি—আব্বাকে এক নজর দেখে চিনে ফেললেন শহীদুল্লা : জানতে চাইলেন, আমরা পার্ক সার্কাসে ছিলাম কিনা। অথচ তিনি যে জহিরের অগ্রজ, সেটাই আমার জানা হলো না।

কমিউনিস্ট পার্টির সূত্রেই যোগাযোগ হয় ডা. আইয়ুব আলীর পরিবারের সঙ্গে। তাঁর শ্যালক শফিকুর রহমানকেও আনু ভাই দলে টেনেছিলেন। তাঁদের বাড়িটা ছিল নবাবপুরের পুলটার আগেই পুবদিকে। সে-বাড়ি আমরা ব্যবহার করেছি গোপন সভা করতে কিংবা চিঠি চালাচালি করতে। ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী ও শ্যালিকা আমাদের যথেষ্ট সমাদর করতেন। ডা. আইয়ুব আলীর পুত্র সারোয়ার আলী তখন ছিল খুবই ছোটো। পরে সে নিজেও ডাক্তার হয়েছে এবং বামপন্থী আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী এবং বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের নেতা ও ছায়ানটের নেতৃস্থানীয় পুরুষরূপে বিখ্যাত হয়েছে।

তখনকার মতো আমাদের কাজ—চিঠিপত্র আনা-নেয়া করা; গোপনে কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার বিলি করা; পার্টির দলিলপত্রের যে-অংশ হাতে আসে, সে-সম্পর্কে মতামত দেওয়া। নতুন স্বপ্নের ঘোর লাগছে চোখে : দেশটা বদলে যাবে, দুনিয়া বদলে যাবে; সুখশান্তিতে থাকবে সবাই, সম্পদের সুষম বণ্টন হবে: অভাব থাকবে না, দারিদ্র্য থাকবে না; সব জঞ্জাল ধুয়ে যাবে, পরিষ্কার হয়ে উঠবে মানুষ আর তার পরিপার্শ্ব। আর এ সবকিছুর মূলে আমারও একটা ভূমিকা থাকবে!

২৮.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনো বি এ পাস কোর্স পড়ানো হতো। ১৯৫১ সালে বি এ করে এম এ ক্লাসে ভর্তি হলেও হাসান হাফিজুর রহমান পড়াশোনা চালাতে পারলেন না—তাঁকে চাকরি নিতে হলো। নূরজাহান বেগম-সম্পাদিত সাপ্তাহিক *বেগম* পত্রিকা কলকাতা থেকে ঢাকায় উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন। পটুয়াটুলির সওগাত প্রেস থেকে সেটা ছাপা হয়। এই *বেগম* পত্রিকার দেখাশোনার ভার প্রথমে নিয়েছিলেন আবদুল গাফফার চৌধুরী—সে-পর্বে আমার সঙ্গে এর যোগ ছিল না—এখন নিলেন হাসান। রান্না আর সেলাইয়ের কপি নাসিরউদ্দীন সাহেব নিজেই দিতেন। যেসব লেখা আসতো তার থেকে বাছাই করার দায়িত্ব হাসানের। কোনো সংখ্যায় সুবিধামতো লেখা না পেলে লেখা তৈরি করে দেওয়াও সে-দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর ছিল সম্পাদকীয়-রচনা।

জগন্নাথ কলেজের পেছনের গেট দিয়ে বেরোলেই পটুয়াটুলি—সওগাত প্রেস খুবই কাছে। হাসানের অন্যান্য বন্ধুর মতো আমিও সেখানে যেতাম আড্ডা দিতে। প্রেসের ফোরম্যান রওশন এসে এক তাড়া প্রুফ দিয়ে যেতো। উপস্থিত সুধীবৃন্দ তা সংশোধন করে দিতেন। রওশন প্রুফ দিয়ে বললো, 'কবিতাটা মেক-আপে বড়ো হয়ে গেছে, চার লাইন ছেঁটে দিন।' আমরা কেউ না কেউ কাজটা করে দিতাম। ছবির অস্পষ্ট প্রুফ টেবিলে রেখে রওশন বলতো, 'সাহেব বলেছেন, কবিতায় ক্যাপশন লিখে দিতে—দু লাইন কী চার লাইন।' কেউ না কেউ লিখে দিতো। মনমতো লেখা নেই—কলকাতা-থেকে-আসা দৈনিক *সত্যযুগে* ছাপা কোনো লেখা কাঁচিকাটা করে ওপরে-মধ্যে-শেষে কিছু লিখে দিয়ে প্রেসে দিয়ে দেওয়া হতো। নির্দিষ্ট সময়ে নাসিরউদ্দীন সাহেবের নির্দেশমতো আমাদের প্রত্যেকের জন্যে আসতো গরম সিঙাড়া, সুস্বাদু রসগোল্লা এবং মিষ্টি চা। লোক বেশি হয়ে গেলেও ভাগাভাগি করে খেতে হতো না—দ্বিতীয় দফা খাবার আসতে দেরি হতো না।

এই সওগাত প্রেস আর *বেগম*-অফিস ঘিরে গড়ে উঠলো পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের তৎপরতা। সংসদের সভাপতি ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ আহমদ। প্রথম যে-কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়—আমি সে-সময়েই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হই—তার সহ-সভাপতিদের মধ্যে ছিলেন, সুফিয়া কামাল, অজিতকুমার গুহ, কামরুল হাসান, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। হয় কোষাধ্যক্ষ নয় সহ-সভাপতি ছিলেন আবদুল গনি হাজারী। হয়তো সৈয়দ নূরুদ্দীন ও খান সরওয়ার মুরশিদও ছিলেন সহ-সভাপতি। কমিটির সদস্য ছিলেন সরদার জয়েনউদ্দীন, লায়লা সামাদ, আবদুল্লাহ্ আল-মুতী, ফজলে লোহানী, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ ও (শিল্পী) আমিনুল ইসলাম আর সম্ভবত আনিস চৌধুরী। পাক্ষিক সাহিত্যিসভা করার পরিকল্পনাটা কার মাথা থেকে এসেছিল, মনে পড়ে না, তবে সেটা খুব ফলপ্রসূ হয়েছিল। প্রেস-সংলগ্ন একটি বড়ো ঘরে শতরঞ্চি ও চাদর বিছিয়ে আমাদের সভা হতো, নাসিরুদ্দীন সাহেবের বদান্যতায় চা-নাশতা খাওয়া যেতো, স্বরচিত লেখা পড়া হতো এবং প্রায়শই তার কঠোর সমালোচনা হতো। সাহিত্য সংসদের কর্মকর্তা ছাড়া আসতেন—বেশির ভাগ নিয়মিত,

কেউ কেউ কালেভদ্রে—সরকারি অফিস থেকে সৈয়দ মোস্তফা আলী (সৈয়দ মুজতবা আলীর অগ্রজ), চৌধুরী শামসুর রহমান, মতিনউদ্দীন আহমদ, মতিউল ইসলাম, আবু ইসহাক, রহীমউদ্দীন সিদ্দিকী, আলী আজম (ডাইরেক্টর অফ ইনডাস্ট্রিজ), আকবর হোসেন, আতোয়ার রহমান, আহমদ মীর (প্রকৃত নাম মহীউদ্দীন আহমদ); সাংবাদিকতার ক্ষেত্র থেকে মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, রওশন ইজদানী, হাবিবুর রহমান, গোলাম রহমান; বেসরকারি চাকরি থেকে মহীউদ্দীন, আজিজুল হাকিম, নেয়ামাল ওয়াকিল; ব্যবসা-জগৎ থেকে আবু জাফর শামসুদ্দীন; কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে এ কে নাজমুল করিম, নূরুল মোমেন, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও আ ন ম বজলুর রশীদ; বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কিংবা সবে তার পাট চুকানো ব্যক্তির মধ্যে শাহাদাৎউল্লাহ্, লুৎফর রহমান সরকার, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, ওসমান জামাল, শামসুর রাহমান, এম আর আখতার (মুকুল), গাজীউল হক, মোহাম্মদ সুলতান, আতাউর রহমান, মিন্নাত আলী, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, রফিকুল ইসলাম, এনায়েত সোবহান, আবিদ হুসেন; কলেজ থেকে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, নেয়ামাল বাসির, তোফাজ্জল হোসেন, মনিরুজ্জামান; আর্ট কলেজ থেকে মুর্তজা বশীর, রশিদ চৌধুরী; মেডিক্যাল কলেজ থেকে জামালউদ্দীন, সালেহ আহমদ। জেল থেকে বেরিয়ে নিয়মিত এসেছেন শহীদ সাবের; কারাজীবন থেকে মুক্তি পেলে সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত। পরে এসেছেন আল মাহমুদ, ফজল শাহাবুদ্দীন, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, শওকত আলী, জহির রায়হান, জিয়া হায়দার, এনামুল হক, দ্বিজেন শর্মা। ওপরের তালিকা থেকে বিস্মৃতিবশত কিছু নাম হয়তো বাদ পড়েছে, বিভ্রমবশত হয়তো কিছু নাম যুক্ত হয়ে গেছে অকারণে। তবে একেবারে সত্যি এই যে, চিরজাগ্রত প্রহরীর মতো ছিলেন খালেদ চৌধুরী—ছবি আঁকা ছেড়ে নিরন্তর পাঠে নিরত, *বেগম*-অফিসই তাঁর প্রকৃত ঠিকানা, আমরা তাঁকে জানতাম চলিষ্ণু অভিধান বলে। একবার ফজলে লোহানী কী একটা বলেছিলেন; জলদগম্ভীর স্বরে উচ্চারিত হলো, 'মিথ্যাভাষণ সর্বদা দুষ্য'। খালেদ চৌধুরীর উক্তি শুনে ফজলে লোহানী একেবারে থেমে গেলেন। আরেকবার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটা অনুষ্ঠানে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী বক্তৃতা করছিলেন। তাঁর কোনো বক্তব্যের অনুমোদন করে খালেদ চৌধুরী বললেন, 'অবশ্য অবশ্য'। একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বক্তা বসে পড়লেন; তিনি ভেবেছিলেন শ্রোতাদের কেউ বিরক্ত হয়ে 'বোসো, বোসো' বলছেন।

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদে আমি যোগদান করলে আমাদের বাড়িই হয়ে ওঠে এর অফিসের ঠিকানা। তমদ্দুন মজলিসের বিকল্প বা প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা হতো সাহিত্য সংসদকে। তমদ্দুন মজলিসের লক্ষ্য ছিল, তাঁরা যাকে মনে করতেন ইসলামি সংস্কৃতি, তার প্রচার ও প্রসার। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, আমরা যাকে মনে করতাম অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ধারা, তার বিকাশ। গোষ্ঠীপ্রীতির দুর্নাম ছিল আমাদেরও। অনেকে এক-আধবার এসে আর এদিকে পদার্পণ করেননি। আবু হেনা মোস্তফা কামাল এক অধিবেশন থেকে ফিরে গিয়ে ডাকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন আমাকে। লিখেছিলেন, গোষ্ঠীবদ্ধতার যে-কথা তিনি শুনেছিলেন আমাদের সম্পর্কে, একবার এসে তা অনেকখানি সত্য বলে মনে হয়েছে তাঁর, তবে আমার ব্যবহার ছিল তা থেকে

অনেকখানি মুক্ত। গোষ্ঠীপ্রীতি সত্ত্বেও ক্ষুরধার সমালোচনা থেকে অনেকেই পরিত্রাণ পেতেন না। একজনের গল্প সম্পর্কে মন্তব্য করতে উঠে আবিদ হুসেন একবার বলেছিলেন : 'লেখকের উচিত আপাতত লেখা বন্ধ রেখে পাঠ করা। যদি তিনি জানতে চান, কী পড়বেন তাহলে তারও একটা তালিকা আমি করে দিতে পারি। তাঁর আরম্ভ করা উচিত প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের *বোধোদয়* দিয়ে।' সেদিন আমি বলেছিলাম, 'সাহিত্য সংসদের লক্ষ্য সাহিত্যসৃষ্টিতে সাহায্য করা; যে রকম ধ্বংসাত্মক সমালোচনা আজ শুনলাম, তা এই উদ্দেশ্যসাধনে সাহায্য করে না।' সভার পরে আবিদ আমাকে বললেন : 'তুমিও আমাকে দিলে? তোমার আব্বা না আমাকে তোমার গার্জিয়ান নিযুক্ত করেছিলেন?' কখনো কখনো লেখকেরাও পালটা আক্রমণ করতেন সমালোচকদের। সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্‌র কবিতার দুরূহতা সম্পর্কে মন্তব্য করে সারওয়ার মুরশিদ বলেছিলেন, '*ওয়েস্ট ল্যান্ড* কাব্যে পাঠকের সুবিধার্থে টি এস এলিয়ট যেমন টীকা সংযোজন করেছিলেন, আতীকুল্লাহ্‌র উচিত, কবিতায় তেমন টীকা সংযুক্ত করা।' জবাবে আতীকুল্লাহ্ বলেছিলেন, 'কবিতা-প্রকাশের সময়ে এ-কথা বিবেচনা করে দেখবো।' ড. মুরশিদ তখন *নিউ ভ্যালুজ* নামে একটি উন্নতমানের পত্রিকা সম্পাদনা করতেন।

সাহিত্য সংসদে আমরা মাঝে মাঝে বিশেষ সভার আয়োজন করতাম। একবার গোর্কি সম্পর্কে একটা বিশেষ অধিবেশন হয়েছিল। আমি খেটেখুটে একটা প্রবন্ধ লিখে তাতে পড়ি। পড়ার সময়ে স্নায়ুর চাপবশত বাঁ হাত রেখেছিলাম সভাপতির টেবিলের ওপরে। কাজী মোতাহার হোসেন আমার হাত সরিয়ে দিলেন। পরে সভাপতির ভাষণে বললেন : 'আজকাল মুদ্রার বড়ো অভাব, তাই মুদ্রাদোষ দূর করাই প্রয়োজন।' একবার আমরা সুকান্ত সম্পর্কে আলোচনা-সভার ব্যবস্থা করতে চাই। কাজী সাহেব জানতে চাইলেন, সুকান্ত কে। 'কবি' বলা যথেষ্ট নয় ভেবে আমরা তাঁকে সুকান্তের কবিতার বই এনে দিলাম। নির্দিষ্ট সভার দিনে তিনি এসেছিলেন ছেলের শার্ট পরে এবং, ওপরের একটা বোতামঘরে নিচের বোতাম লাগিয়ে। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন : 'এই সভা-অনুষ্ঠানের প্রস্তাবের আগে আমি সুকান্তের নাম শুনিনি। আমার ছেলেকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, সে একজন নামকরা কবি, এমন কি তার গানও আছে। তার দুটি গান আমার ছেলে গেয়ে শোনালো। তারপর এদের সংগ্রহ করে দেওয়া তার কাব্যগ্রন্থ পড়লাম। কিছুকাল আগে আমি *ভাঙা তলোয়ার* নামে একটি কাব্য পড়েছিলাম। সুকান্তের কবিতা পড়ে বুঝলাম, এ-তলোয়ার ভাঙা নয়।' আরেকবার বঙ্কিমচন্দ্র নিয়ে আলোচনা হয়, সে-প্রসঙ্গে পরে আসবো।

সাহিত্য-সংসদ ১৯৫৮ পর্যন্ত চলেছিল। এ-প্রসঙ্গেও পরে ফিরে আসতে হবে। একটা কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। একবার অন্যত্র এক সভায় গিয়ে কাজী মোতাহার হোসেন আমাদের দিকে ইশারা করে বললেন, 'এদের একটা সাহিত্য সংগঠন আছে।' তারপর পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সভাপতি আমার কাছে জানতে চাইলেন, 'কী যেন নাম তোমাদের সংগঠনের?'

২৯.

কোরিয়ায় যুদ্ধ শুরু হওয়ায় আমাদের পাটের চাহিদা বেড়েছে। পাটব্যবসায়ীরা যথেষ্ট লাভ করছেন, পাটচাষীরাও তার কিছু ভাগ পাচ্ছেন। সারা বিশ্ব আণবিক যুদ্ধের আশঙ্কায় আতঙ্কিত। যুদ্ধবিরোধী মনোভাব প্রবল হচ্ছে, শান্তির জন্যে সমবেত চেষ্টার প্রয়াস দেখা দিচ্ছে।

এই অবস্থায় ঢাকায় ১৯৫১ সালের মধ্যভাগে আতাউর রহমান খানকে সভাপতি, মোহাম্মদ তোয়াহাকে সাধারণ সম্পাদক এবং প্রাণেশ সমাদ্দার ও আলী আকসাদকে যুগ্ম সম্পাদক করে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান শান্তি কমিটি। কিছুকাল আগে কলকাতায় শান্তি-সম্মেলনে যোগ দিয়ে ফেরার পর আলী আকসাদ কারারুদ্ধ হন। মুক্তি পাওয়ার পরেই তাঁর সঙ্গে আহমদ ও আমার পরিচয় হয়। তোয়াহা এর মধ্যে যুবলীগের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় শান্তি কমিটি চালাবার দায়িত্ব অনেকখানি বর্তায় আকসাদের ওপরে। খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ও হাসান পারভেজ পরপর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তারপর থেকেই আলী আকসাদ তার সাধারণ সম্পাদক। পেশাগতভাবে তিনি সাংবাদিকতায় নিয়োজিত হয়েছিলেন আর রাজনৈতিকভাবে ছিলেন গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য।

বিশ্ব শান্তি পরিষদের উদ্‌যোগে ১৯৫২ সালের অক্টোবরে পিকিংয়ে (এখন বেইজিং) এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে মানকি শরীফের পীরসাহেবের নেতৃত্বে পাকিস্তানের একটি প্রতিনিধিদল যোগদান করে। এর সদস্যদের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ছিলেন মিয়া ইফতিখারউদ্দীন ও মাহমুদুল হক ওসমানী এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে আতাউর রহমান খান, তফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়া, শেখ মুজিবুর রহমান, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ও ইউসুফ হাসান। পাসপোর্ট না পাওয়ায় আকসাদের যাওয়া হয় নি। এই সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন ড. সাইফুদ্দীন কিচলু এবং তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন উমাশঙ্কর যোশী ও মনোজ বসু, হয়তো মকবুল ফিদা হুসেনও। দেশে ফিরে নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে মনোজ বসু লেখেন দুই পর্ব *চীন দেখে এলাম* (কলকাতা, ১৯৫৩ ও ১৯৫৫)। সম্মেলনে মনোজ বসু ও শেখ মুজিবুর রহমান বাংলায় বক্তৃতা দেন। এ খবর পেয়ে, বলা বাহুল্য, আমরা খুব উল্লসিত হই।

আমাদের প্রতিনিধিদল ঢাকায় ফিরে এলে ঢাকা জেলা বোর্ডের মিলনায়তনে পূর্ব পাকিস্তান শান্তি কমিটির উদ্‌যোগে তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন চীনের জাতীয় পোশাক পরে—গলাবন্ধ কোট আর ট্রাউজার্স। তাঁর সঙ্গে আমার বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। তিনি *যুগের দাবী* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করতেন—সেটা ছিল মূলত যৌনবিষয়ক পত্রিকা—১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের পরে তা রূপান্তরিত হয় সমাজ ও রাজনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিকে। পরে তিনি পত্রিকাটি কমিউনিস্ট পার্টিকে দিয়ে দেন। চীন সফরের প্রভাবে ইলিয়াস মার্কসবাদে আস্থাবান হন। ইউসুফ হাসান তো গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অন্য প্রতিনিধিরা মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট না হলেও চীনের সমাজব্যবস্থা, জনগণ ও নেতাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সম্মেলনে শেখ মুজিব বাংলায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন বলে সংবর্ধনা-সভায় তিনি ভাষণ দিতে দাঁড়ালে আমরা বেশ জোরে করতালি দিয়েছিলাম। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠ যেমন চিত্তাকর্ষক ছিল, তেমনি তাঁর মৃত্তিকাসংলগ্ন ভাবভঙ্গি ও কথাবার্তা ছিল আনন্দদায়ক। অনুষ্ঠানের বিরতির সময়ে তাঁর সঙ্গে বোধহয় খোন্দকার ইলিয়াস আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

শান্তি কমিটির এই পর্যায়ে কিছু লেখালেখির দায়িত্ব বর্তেছিল আমার ওপর, তাছাড়া সভার আয়োজন করলে তার জন্যেও খাটাখাটি করতে হতো। আমাকে সামনে যেতে হয়েছিল পরে—১৯৫৩ সালের মধ্যভাগে। ঢাকা জেলা শান্তি সম্মেলনের অনুষ্ঠান হলো জগন্নাথ কলেজে—অধ্যক্ষ খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ জিমনাসিয়ামটাই শুধু ব্যবহার করতে দিলেন না, উদ্‌বোধনও করলেন। শিল্পী আমিনুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক ও আমাকে যুগ্ম-সম্পাদক করে ঢাকা জেলা শান্তি কমিটি গঠিত হলো। কমিটিতে শিল্পী বিজন চৌধুরীও সদস্য ছিলেন। আমিনুল ইসলাম ইতালিতে চলে গেলে আমি হয়েছিলাম ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক। তবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়ে যাওয়ায় জেলা পর্যায়ের সংগঠনটি আমরা বেশিদিন চালাতে পারলাম না।

৩০.

আমি যখন জগন্নাথ কলেজে আই এ প্রথম বর্ষে পড়ি, তখন মুজিবুর রহমান ঢাকা কলেজে বি এ দ্বিতীয় বর্ষে পড়েন এবং কলেজেরই একটি হস্টেলে থাকেন। কী করে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, মনে নেই, তবে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, তাঁকে আমি বাংলা পড়াতে পারি। অনেক দ্বিধার পরে আমি সম্মত হলাম তাঁকে সাহায্য করতে। আমি একদিন পায়ে হেঁটে তাঁর হস্টেলে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্য বা প্রবন্ধ কিংবা শরৎচন্দ্রের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করতাম, তিনি আমাকে প্রচুর আপ্যায়ন করতেন। তিনি আরেকদিন রিকশা করে আসতেন আমাদের বাড়িতে আলাপের জের চলতো, আপ্যায়ন হতো সামান্য।

১৯৫২ সালের এপ্রিলে আমার জলবসন্ত দেখা দিলো। সবার সঙ্গ এড়িয়ে নিজের ঘরে একা থাকি। এর মধ্যে তিনি এসে পড়লেন। নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি রোজ আসতেন আমাকে দেখতে এবং তাসের কী একটা খেলা শিখিয়ে নিয়ে সময় কাটাতেন। তাঁর এই স্বেচ্ছাসেবা আমাকে আপ্লুত করেছিল। বি এ পাশ করে তিনি বোধহয় রাজধানী ছেড়েছিলেন, তাই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। অনেক পরে যখন তিনি ঢাকায় স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তানে কাজ করেন, তখন হঠাৎ করে একবার দেখা হয়, কিন্তু পুরোনো যোগাযোগ আর পুনঃস্থাপিত হয় নি।

১৯৫২ সালেই আমাদের পরিবারে একজন নতুন সদস্য যুক্ত হয়—আমার চাচাতো ভাই আমিনুজ্জামান। দুই মেয়ে গতায়ু হলে আমার মেজোচাচি এই একমাত্র ছেলেকে নিয়ে খুলনায় থাকছিলেন। মায়ের কাছে তার লেখাপড়ার সুবিধে হবে না মনে করে আব্বা তাকে ঢাকায় আনিয়ে ভর্তি করে দেন গ্র্যাজুয়েটস স্কুলে—বোধহয় ষষ্ঠ শ্রেণীতে।

কলেজে উঠতে উঠতে আমিন ছোটোগল্প লেখা শুরু করে এবং বেশ খ্যাতিলাভ করে। পরিচালক সুভাষ দত্ত দুটি ছোটোগল্প নিয়ে *আয়না ও অবশিষ্ট* নামে যে-চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন, তার দ্বিতীয় গল্পটি ছিল আমিনের। সে নিজের গল্পগ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিল, কিন্তু পরে আর তা ছাপার উদ্‌যোগ দেয় নি, বরঞ্চ না-ছাপতেই সচেষ্ট হয়েছিল।

চাচি একবার হজে যাওয়ার পথে ঢাকায় এসে আমিনের পড়ার টেবিলে রবীন্দ্রনাথের *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যটি দেখতে পান। ওটি ছিল তার পাঠ্যতালিকা-ভুক্ত বই। হজ থেকে ফেরার পথে চাচি কুণ্ঠার সঙ্গে আব্বাকে বলেন যে, তিনি আমিনকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। আব্বা কারণ জানতে চাইলে বলেন, এখানে সে ধর্মকর্ম করে না, তদুপরি হিন্দু পুরাণকাহিনী মুখস্থ করে। চাচিকে ধমকের সুরে আব্বা বললেন, আগে এম এ পাশ করুক, তারপর তুমি ওকে নিয়ে যেয়ো।

১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করে আমিন মায়ের কাছে খুলনায় ফিরে যায়। যে-বিধবা মা সন্তানদের নিয়ে এতো কষ্ট করেছেন, তাঁকে খুশি করার চেষ্টায় সে আত্মনিয়োগ করে। সে একটি ব্যাংকে চাকরি নেয়, ছোটোগল্প লেখা ছেড়ে দেয়, ধর্মকর্মে মনোযোগী হয়। তার দাম্পত্য জীবনেও অনেক বিঘ্ন ঘটে। বস্তুত, আমাদের বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পরে নিজের জীবনে সে ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন ঘটায়। তাতে সে কতোটা তৃপ্তি পেয়েছিল এবং চাচিই বা কতোটা আনন্দলাভ করেছিলেন, তা আমার পক্ষে বলা সম্ভবপর নয়। আমার যেসব বন্ধুবান্ধব তাকে ছেলেবেলা থেকে জানতো, তারা যখন আমার কাছে আমিনের খোঁজ করে, তখন আমি মুখে বলি, সে খুলনায় আছে এবং ভালো আছে, কিন্তু মনে মনে বলি, সে হারিয়ে গেছে।

৩১.

আহসান হাবীব তখন থাকেন মাহুতটুলীতে—ঠাটারিবাজার থেকে আমি প্রায়ই তাঁর কাছে যাতায়াত করি। তিনি একদিন বললেন, একজন সহকারী খুঁজছেন—মূলত তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরি করার জন্যে—তবে তাছাড়াও টুকটাক কাজ আছে—নকলনবিশিই প্রধান, আমি কি সময় দিতে পারবো, পারিশ্রমিক নিতান্তই সামান্য হবে। হাবীব ভাইকে আমি এতোই ভালোবাসতাম যে, বিনা পারিশ্রমিকেও তাঁর কাজ করে দিতে রাজি ছিলাম, তবে তাতে হয়তো যাওয়া-আসার বাধ্যবাধকতা থাকতো না। ১০ টাকা না ১৫ টাকা মাসোহারায় ঠিক মনে নেই, তাঁর সচিবের বা সহকারীর কজে নিযুক্ত হলাম। সপ্তাহে বোধহয় চারদিন যেতাম, পাণ্ডুলিপি নকল করতাম; আমার পছন্দসই কবিতা পরিকল্পিত গ্রন্থ থেকে বাদ দিলে আপত্তি করতাম; তাঁর নতুন লেখা কবিতা শুনে মতামত দিতে দেরি করতাম না। একবার বরিশালে গেলেন এক সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি হয়ে; সভাপতির ভাষণ সম্পর্কে বেশ প্রগল্‌ভ উক্তি করেছিলাম বলে মনে পড়ে। তাতে এক আধুনিক কাব্যগ্রন্থের যে-কাল্পনিক নাম তিনি দিয়েছিলেন, আমার মতে, তা শোনামাত্র সবাই ধরে নেবে যে,

তিনি কবি রাম বসুকে নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন। হাবীব ভাই সহাস্যে বললেন, কাব্যগ্রন্থের নাম যদিও রাম বসুর কাব্যের অনুকরণ, তবে তাঁর লক্ষ্য তিনি নন, বরঞ্চ এক ধরনের আধুনিক কবি—যাঁরা বাংলা কবিতার ঐতিহ্য থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করেছেন।

আহসান হাবীবের বাড়িতে পরিবেশটা ছিল খুব ঘরোয়া। সুফিয়া ভাবি তো আমাকে ভালোবাসতেনই, কেয়া, পলিন, পাবলো, রীনা এঁদের সকলের কাছে আমি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিলাম। রীনার একটা উক্তি এখনো মনে পড়ে। মায়ের ওপর রাগ করে সে বাবাকে বলেছিল, অফিস থেকে আসার সময়ে দোকান থেকে একটা নতুন মা কিনে আনতে। হাবীব ভাইয়ের কাছে যাঁরা আসতেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ করেও বেশ আনন্দ পেতাম। প্রাবন্ধিক-প্রকৌশলী জহুরুল হকের সঙ্গে পরিচয় হয় হাবীব ভাইয়েরই বাসায়। তাতে আজীবনের এক শুভাকাঙ্ক্ষী লাভ করা গিয়েছিল।

একবার জ্বরে পড়ে হাবীব ভাইয়ের বাড়ি যাইনি বেশ কদিন। জ্বর ছাড়ার পরে কোনো বন্ধুর পীড়াপীড়িতে সিনেমা দেখতে গেলাম 'মানসী'তে। শান্তিনগরে থাকতে অভিভাবকদের ওপরে রাগ করে সিনেমা দেখা বন্ধ করেছিলাম। এতে তাঁরা অপ্রস্তুত হওয়ায় এবং বন্ধুবান্ধবদের নির্বন্ধে সিনেমা না-দেখার সংকল্প পরিহার করতে হলো। এটা সেই পর্বের ঘটনা যখন আমি সদ্য প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেছি। তার একদিন পর হাবীব ভাইয়ের কাছে যাওয়ায় উনি জানতে চাইলেন, আমি এ কদিন যাইনি কেন। আমি বললাম, 'জ্বর হয়েছিল।' উনি বললেন, 'তোমাকে যেন 'মানসী'তে দেখলাম পরশু।' তাও কবুল করলাম। দুটোই যে সত্য, দেখলাম, সেটা বোঝানো একটু দুরূহ হয়ে গেলো। হাবীব ভাই কথা বাড়ালেন না, আমিও আর কিছু বললাম না, কিন্তু তাঁর কাজ করার আনন্দ চলে গেলো। তিনিও সেটা টের পেলেন। বললেন, 'তোমার হয়তো সময় করে উঠতে অসুবিধে হচ্ছে।' আমিও অতি উৎসাহভরে বললাম, 'জি', যদিও অসুবিধে তেমন ছিল না। তারপর হাবীব ভাইয়ের বাড়িতে অনেকবার গেছি, কিন্তু কাজের সূত্রে নয়। তাঁর অনুজ মুস্তফা জামাল একটা প্রকাশনা ও পুস্তকবিক্রয়-প্রতিষ্ঠান করেছিলেন আরমানিটোলায়। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর *লাল সালুর* দ্বিতীয় সংস্করণ সেখান থেকে বেরিয়েছিল। বিনা স্বার্থে সেখানেও অনেক গেছি।

'মানসী' সিনেমা হলটা ছিল বংশাল রোডে—পরে তার নাম হয়েছিল 'নিশাত', যখন লাবিবউদ্দীন সিদ্দিকী সেটা কিনে নিয়েছিলেন। 'মানসী' নাম আবার ফিরে এসেছিল বটে, কিন্তু তারপর কী হলো, কে জানে! এখানে তখন প্রধানত বহুল আলোচিত হিন্দি ফিল্ম দেখানো হতো—*আওয়ারা, মহল* প্রভৃতি। দিলীপকুমার ও রাজকাপুর এবং নার্গিস ও মধুবালা তখন প্রিয় তারকা।

বাংলা ছবি দেখতাম প্রধানত সদরঘাটের 'রূপমহলে' এবং নবাবপুর রোডে জেলা আদালতের কাছে 'মুকুলে'। 'মুকুলে' সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস *বাবলার* চলচ্চিত্ররূপ দেখে আমাদের কলেজ-হস্টেলের এক বাসিন্দা বেশ কিছুদিন এমন উন্মনা ও অস্বাভাবিক হয়ে রইলো যে তা সকলের উদ্‌বেগের কারণ হয়েছিল। 'রূপমহলে' দেখা ছবির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের *রজনীর* ভাষ্য *সমর* (নামের এই পরিবর্তনের কারণ এখনো বুঝিনি), উৎপল দত্ত ও দেবযানী-অভিনীত *মাইকেল মধুসূদন* (এর একটা

বিরূপ সমালোচনা লিখে *আজাদে* দিয়েছিলাম, ভাগ্যিস তা ছাপা হয়নি), পাহাড়ী সান্যালের অনবদ্য অভিনয়ে সমৃদ্ধ *বিদ্যাসাগর*, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের তিনটি গল্প অবলম্বনে তৈরী *বরযাত্রী* এবং আর্থার কোনান ডয়েলের *হাউন্ডস অফ বাস্কারভিল*-অবলম্বনে নির্মিত ও অজয় কর-পরিচালিত *জিঘাংসা* ছবির কথা খুব মনে পড়ে। 'রূপমহল' আমাদের কলেজের বেশ কাছে ছিল—তার গায়ে ছিল টিনের একটা রেস্টুরেন্ট—সেখানে ঢাকাই পরটা খুব উচ্চমানের হতো। তবে আমাদের বেশি আকর্ষণ ছিল উলটোদিকের রিভারভিউ কাফের প্রতি—ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে সেখানে এসে চা খাওয়া চলতো। 'মুকুলে'র পাশে ছিল ও কে রেস্টুরেন্ট—একই সঙ্গে রেস্টুরেন্ট ও বার—খাবার-দাবারের মূল্য কিছু বেশি; তাই ওখানেই খাবো, এমন সংকল্প করে, যথেষ্ট প্রস্তুত হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকতো না। ওর পাশে একটা পেট্রোল পাম্পে গাড়ির টায়ারে বিনি পয়সায় বাতাস ভরে দেয় বলে বিজ্ঞপ্তি ছিল 'ফ্রি এয়ার' এবং তার নিচে 'মুক্ত বাতাস'। অনুবাদের এই বিভ্রম আর সহ্য করতে না পেরে পদাতিক আহসান হাবীব একেবারে স্টেশনের ম্যানেজারের কাছে গিয়ে উর্দুভাষায় জানিয়ে এসেছিলেন যে, ইংরেজি ও বাংলায় যা লেখা হয়েছে, তার অর্থ এক নয়।

আরমানিটোলায় 'নিউ পিকচার হাউজ' একদা ছিল নাট্যমঞ্চ, তবে তখন তাতে ছবিই দেখানো হতো এবং মূলত হিন্দি ছবি। দিলীপকুমারের অগ্রজ নাসির খান ও শোভনা সমর্থের কন্যা নূতন সমর্থ (তাঁর সম্পর্কে *অচলপত্রে*রই মন্তব্য ছিল, 'নূতন নূতন সবাই সমর্থ থাকে')-অভিনীত *নাগিনা* (নূতনের সেটাই ছিল প্রথম চলচ্চিত্রাভিনয়, তাঁদের সঙ্গে বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রথিতযশা অভিনেতা বিপিন গুপ্তও ছিলেন) আমি দুবার দেখেছিলাম। জেলখানার কাছে 'নিউ প্যারাডাইজ' নামে অত্যন্ত বাজে হলে প্রতি সপ্তাহে নতুন ও ভালো ইংরেজি ছবি চলতো—*এ টেল অফ টু সিটিজ*, *লা মিজারেবল* (চার্লস লটন-অভিনীত), *অ্যাডভেঞ্চার অফ রবিনহুড* (এরল ফ্লিন-অভিনীত) ইত্যাদি সেখানে দেখেছি। একদিন ছবি আরম্ভ হওয়ার পরেই আমাদের ডা. আরেফিন ওরফে লালু ভাইয়ের গলা ভেসে এলো সামনের সারি থেকে : 'আরে ই ছবি যে সেদিন দেখলুম গো!' প্রতি সপ্তাহে নতুন ছবি আসতো বলে ডাক্তার সাহেব টিকিট কেটে ঢুকে পড়েছেন, তারপর ছবি শুরু হলে টের পেলেন, কোনো দুর্জ্ঞেয় কারণে একই ছবি দ্বিতীয় সপ্তাহে দেখানো হচ্ছে। 'নিউ প্যারাডাইজ' ছিল হাসান হাফিজুর রহমানের প্রিয় সিনেমা হল। পয়সা ধার করে সেখানে আমাদের নিয়ে সিনেমা দেখতে গেছেন কিংবা না খেয়ে খাওয়ার পয়সায় ছবি দেখে ঘরে ফিরেছেন—এমন অনেকবার ঘটেছে।

আরো দুটি সিনেমা হলে আমরা যেতাম—ইংলিশ রোডের কাছে 'নাগরমহলে' ও ওয়াইজঘাটে 'মায়া'য়। 'মায়া'য় বসে একবার ছবি দেখছি আর আনমনে হাতের সোনার আংটি খুলছি আর পরছি; হঠাৎ হাত ফসকে আংটি গড়িয়ে পড়লো এবং প্রেক্ষাগৃহের ঢালু মেঝেতে গড়িয়ে গড়িয়ে সামনের দিকে তার যাওয়ার আওয়াজ শুনতে পেলাম, ছবি শেষ হওয়ার পরও সেটা আর উদ্ধার করতে পারিনি।

৩২.

আমি কলেজে থাকতেই ঠাটারিবাজারে আমাদের বাড়িটা হয়ে উঠেছিল আমার বন্ধুদের মিলনস্থল। অনেক সময়ে আমাকে না জানাতে পারলেও তারা আমার ওখানে বসবার ব্যবস্থা করে ফেলতো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। আমি কোনোদিন হয়তো সে-সময়ে থাকতাম না; কোনোদিন হয়তো বাইরে থেকে ফিরে দেখতাম, নিচের তলায় বসবার ঘরে জমজমাট আড্ডা চলছে। সলিল চৌধুরীর 'কোনো এক গাঁয়ের বধূর' গানটির 'ডাকিনী যোগিনী/এলো শত নাগিনী'র সুরে আমীর আলী গাইছে, 'মৃণাল বারুড়ি/কান দুটি পাকড়ি/আমার কাছে নিয়ে এসো রে।' কিংবা টেবিল বাজিয়ে তোফাজ্জল ঘাড়ের কসরত করে হিন্দি সিনেমার কোনো জনপ্রিয় নাচের অনুকরণ করছে। সকলের বসার মতো চেয়ারও নেই—তারই মধ্যে কোরবান সবাইকে চা খাওয়াচ্ছে, কখনো মসি নিজের পয়সা দিয়ে খাবার কিনে আনাচ্ছে।

আড্ডা দিতে ঢাকার বাইরেও গেলাম একবার। আবদুল হাই প্রস্তাব করলো তাদের ভৈরবের বাড়ি যেতে। সে-ই সঙ্গে করে ট্রেনে চেপে নিয়ে গেল। 'পাকিস্তান হাউজে' বোধহয় দু রাত কাটালাম সানন্দে। মিন্নাত আলী এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র (পরে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী) আবদুর রউফের সঙ্গে সেবারেই চাক্ষুষ পরিচয় হলো। মিল্লাত আলীর ঝোঁক ছিল বিখ্যাত সাহিত্যিকদের সঙ্গে পত্রালাপ করা। তাঁর সংগ্রহে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ বড়ো বড়ো মানুষের চিঠি দেখে আমি খুবই অভিভূত হই। মিন্নাত আলী নিজের চিঠিতে স্বাক্ষর করতেন মিনু বলে। তাতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানতে চেয়েছিলেন, তিনি হিন্দু না মুসলমান; আর বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় জানতে চেয়েছিলেন, তিনি ছেলে না মেয়ে।

ঢাকায় ফিরে এলাম একা। পথে কোনো স্টেশনে চা খেতে নেমেছিলাম। চা খেয়ে ফিরতে ফিরতে ট্রেন চলতে শুরু করেছে। লাফ দিয়ে উঠলাম তেমন আয়াস স্বীকার না করেই। আব্বার পরিচিত কেউ দেখে ফেলেছিলেন আমাকে। তিনি বোধহয় সেই ছোটো-আমি কেমন বড়ো হয়েছি, লাফ দিয়ে ট্রেনে উঠতে পারি, এই মনে করেই ঘটনাটা বিবৃত করেছিলেন আব্বাকে। আব্বা খুব রেগে গেলেন। আমার যে কোনো বুদ্ধি-বিবেচনা হয়নি, চলন্ত ট্রেনে ওঠার বিপদ সম্পর্কে আমি যে একেবারেই অনবহিত, তা নিয়ে তীব্র তিরস্কার করলেন। আমি মাথা নিচু করে চুপ করে থাকলাম। আরেকবার অবস্থা হয়েছিল এর চেয়ে শোচনীয়। পুলিশ বিভাগের কেউ—সম্ভবত ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের সদস্য—আব্বাকে জানালেন, তাঁর সম্ভাবনাময় পুত্র দিনরাত কেবল রাজনীতি করে বেড়াচ্ছে। ডাক্তারখানা থেকে ফিরে এসে এক রাতে আব্বা শুধু তিরস্কার করে ছাড়লেন না, আমি যখন লেখাপড়া করি না, তখন বইপত্র রেখে আর কী হবে—এই বলে আমার টেবিলের সব পাঠ্যবই ফেলে দিতে উদ্যত হলেন। অনেক কষ্টে মা তাঁকে নিবৃত্ত করলো। ফলে মাকে এ-কথা শুনতে হলো যে, আমি যে বয়ে যাচ্ছি, সে অনেকটা তার প্রশ্রয়ের কারণে। সে-রাতে আব্বার বকুনি খেয়ে মনে মনে আমাকে স্থির করতেই হলো যে আর যাই করি, পরীক্ষার ফলটা ভালো করতে হবে।

আর যাই করি-র মধ্যে নিয়মিত ক্লাস করাটাও ছিল। নারায়ণবাবুকে খুশি করতে

ইতিহাসের মোটা বই পড়ছি, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর পরামর্শে পড়ছি প্রমথনাথ বিশীর রবীন্দ্র-সমালোচনা। লেখালিখি চলছে, আড্ডা দিচ্ছি বিস্তর—*বেগম*-অফিসে, নিজের বাসায় এবং আনু ভাইদের বাড়িতে। আনু ভাইয়ের খালাতো ভাই মাইনুল হাসান ওরফে জুবায়ের ও নাইমুল হাসান ওরফে মুন্না (এঁদের পিতা ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ রাশেদুল হাসান—শহীদ সাইদুল হাসানের অগ্রজ—অত্যন্ত গোঁড়া ও প্রতিক্রিয়াশীল মানুষ) এবং ফজলে হাসান আবেদ (পরে ব্র্যাক-খ্যাত)—এঁরা সবাই তখন কলেজে নানা শ্রেণীতে পড়েন। আনু ভাইয়ের অগ্রজ আকরম ভাই লয়েডস ব্যাংকে চাকরি করতেন। এঁরা সর্বদা একসঙ্গে না হলেও অনেকেই থাকতেন সেখানকার আড্ডায়। তাছাড়া সাহিত্য সংসদের কাজ আছে—পাক্ষিক সভার বিজ্ঞপ্তি এবং সভাশেষে তার বিবরণী ছাপাতে যেতে হয় সংবাদপত্রে—প্রায় আমাকেই তা করতে হয়। আবার গোপনে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ করতে হয়। আমাদের জনাপাঁচেককে নিয়ে গড়ে ওঠে একটা সেল—সদস্যপদ লাভের ব্যাপারটা এতো দূরে যে ভাবাই যায় না তখনো। প্রকাশ্যে যুবলীগেরও কিছু কাজ রয়েছে।

ভাষা-আন্দোলনের পরে যুবলীগের শক্তি যতোটা বাড়তে পারতো, অতোটা বাড়েনি, তার একটা কারণ নিজেদের শক্তি কেন্দ্রীভূত না করে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেওয়া। সে কথা একটু পরেই খোলাসা করা যাবে। যুবলীগের নতুন কমিটিতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন মোহাম্মদ তোয়াহা, কিন্তু তিনি কারাবন্দি থাকায় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হন আবদুস সামাদ (আজাদ) এবং এরই মধ্যে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইমাদুল্লাহ সাধারণ সম্পাদক হন। দক্ষিণ মৈশুন্ডিতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন আবদুস সামাদ, কিন্তু আগেরবারের মতো সমাগম হলো না, জমলোও না। পরে, ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত যুবলীগের ভাঙা হাটে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন কামরুজ্জামান।

এরই মধ্যে যুবলীগে এবং তার বাইরে আমার অগ্রজস্থানীয়েরা স্থির করলেন, একটা অসাম্প্রদায়িক ছাত্র-সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। ভাষা-আন্দোলনের পরে অসাম্প্রদায়িকতার ওপরে অনেক বেশি জোর পড়েছিল এবং তা খুব সফলভাবে। নতুন সংগঠনের ঘোষণাপত্রের—হয়তো সেইসঙ্গে গঠনতন্ত্রেরও—খসড়া রচনার ভার আমার ওপর পড়লো। সে-দায়িত্ব পালন করলাম সানন্দে। তবে প্রশ্ন রয়ে গেল, আমি সময় কোথায় দেবো—যুবলীগে, সাহিত্য সংসদে, না গঠিতব্য ছাত্র ইউনিয়নে? অনেক আলোচনার পর আমার অভিপ্রায়ই অনুমোদিত হলো—সাহিত্য সংসদই হবে আমার কাজের মূল ক্ষেত্র, তবে যুবলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে। আহমদ হোসেনের প্রধান দায়িত্ব হবে ছাত্র ইউনিয়নে কাজ করবার। বিপ্লবী বন্ধুদের কেউ কেউ আমার ইচ্ছাকে 'পলায়নী মনোবৃত্তি' বলে আখ্যা দিলেন, তবে রমেন মিত্রের সমর্থন আমি পেলাম। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন আত্মপ্রকাশ করলো ১৯৫২ সালের এপ্রিলে : মোহাম্মদ সুলতান সভাপতি, মোহাম্মদ ইলিয়াস—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র—সাধারণ সম্পাদক, উভয়েই গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। ছাত্র ইউনিয়নের প্রথম কমিটিতে আহমদ সদস্য থাকলো, আমীর আলী ও আলী আশরাফের কাজের ক্ষেত্রও হলো সেটা।

৩৩.

১৯৫২ সালের মে মাস নাগাদ বোধহয় (*মর্নিং নিউজ* পত্রিকায় এক কলামের বক্স করে একটা খবর বের হলো—শিরোনাম, উদ্‌ধৃতিচিহ্নের মধ্যে 'শেলীজ ওন শপ'। বিবরণটা এই যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র (১৯৫১ সালে ইতিহাসে এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারী) মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ওরফে শেলী বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার নিযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু পুলিশ-রিপোর্ট খারাপ হওয়ায় তিনি চাকরি হারিয়েছেন এবং তারই প্রতিবাদস্বরূপ গলায় ট্রে ঝুলিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়-এলাকায় সিগারেট বিক্রি করছেন, আর সেই চলমান দোকানের নাম দিয়েছেন 'শেলীজ ওন শপ'। পরে শেলীভাই জানিয়েছেন, পুলিশ-রিপোর্ট-সম্পর্কিত তথ্য যথার্থ নয়, তিনি কারাবন্দি ছিলেন জেনে কর্তৃপক্ষের অস্বস্তির কারণে তিনি চাকরি ছাড়েন। প্রদোষকালে তাঁর সন্ধানে গেলাম। আমার মনে হচ্ছে, কলাভবনের গেটের বাইরে—তবে তা কার্জন হলের সামনেও হতে পারে—মালিকসহ দোকানটি পাওয়া গেলো। তখনো সিগারেট ধরিনি, সুতরাং সেভাবে প্রতিবাদে অংশ নেওয়া যায় না। আমি তাঁর সামনে গিয়ে নিজের নাম বললাম, আর জানালাম, একুশে ফেব্রুয়ারির ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারীদের আরেকজন—কারাগারে তাঁরই কক্ষবাসী—নেয়ামাল বাসির আমার বিশেষ বন্ধু। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আপন করে নিলেন। পরে আরো যোগাযোগ না হলে হয়তো শুধু সেদিনের স্মৃতিই রয়ে যেতো, কিন্তু এখন দেখি, সেদিনকার পরিচয় নানা ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে অনেক ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

ঠাটারিবাজারে আসার পরে আব্বার শখ হলো, দাদার মৃত্যুবার্ষিক অনুষ্ঠান করবেন। মোহাম্মদ মোদাব্বের তখন দৈনিক *মিল্লাতে*র সম্পাদক। আব্বা পরামর্শ করলেন তাঁরই সঙ্গে। দাদা সম্পর্কে বেনজীর আহমদের কবিতাটা তিনি গানে রূপান্তর করলেন। তারপর আমাকে দিয়ে তা পাঠিয়ে দিলেন শেখ লুত্‌ফর রহমানের কাছে—সুর দিয়ে অনুষ্ঠানে গাইবার জন্যে। লুত্‌ফর ভাইয়ের সঙ্গে ততোদিনে আমার পরিচয় হয়ে গেছে—তাঁর পাতলা খান লেনের বাড়িতে একাধিকবার গেছি। সুতরাং লুত্‌ফর ভাইকে রাজি করাতে বেগ পেতে হলো না। আব্বা গেলেন এ কে ফজলুল হকের কাছে—তিনি সম্মত হলেন সভায় কিছু বলতে। আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও বেনজীর আহমদও আব্বাকে সাহায্য করলেন। জুলাইয়ের শেষে জেলা বোর্ড হলো সভা হলো। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছিলেন সভাপতি। তাঁর অনুরোধে আব্বাও কিছু বললেন—সবটা সাধু বাংলায়। ফজলুল সাহেব আসতে না পারার জন্যে দুঃখ করে চিঠি পাঠালেন। কাগজে খবরটা বেশ ভালো করেই বের হলো।

দৈনিক *মিল্লাত* ছিল প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী চৌধুরী ওরফে মোহন মিয়ার পত্রিকা। খুব যে ভালো চলেছিল, তা নয়। আমাদের বন্ধুবান্ধবদের কেউ কেউ ছাত্রাবস্থায় সেখানে কাজ করতো। ছাত্রদের পক্ষে পত্র-পত্রিকায় কাজ পাওয়াটা ঢাকায় তখন নতুন। তার আগে আনুকূল্যপ্রার্থীরা প্রধানত জায়গির থাকতো। যারা হস্টেলে থাকার খরচ কুলোতে পারতো না কিংবা খণ্ডকাল চাকরির কারণে হস্টেলের শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারতো না, তারা মেসে থাকতো। অবশ্য মেসের বেশির ভাগ বাসিন্দা ছিলেন কর্মজীবী। তবে কলেজে উঠেই নেয়ামাল

জায়গির ছেড়ে মেসে থাকতে শুরু করেছিল।

১৯৫২ সালের আগস্ট মাসে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন। এর উদ্‌যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অজিতনাথ নন্দী, কুমিল্লা পৌরসভার চেয়ারম্যান অতীন্দ্রমোহন রায়, ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ আখতার হামিদ খান, ওই কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা ও সুলেখক আসহাবউদ্দীন আহমদ এবং ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক আবুল খায়ের—অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক হিসেবে তিনি অপরিসীম পরিশ্রম করেছিলেন। ভাষা-আন্দোলনলব্ধ অসাম্প্রদায়িক বাঙালি চেতনার বিশেষ প্রকাশ যে এতে ঘটতে যাচ্ছে, তাতে সন্দেহ ছিল না।

ঢাকায় আমার বন্ধু ও পরিচিতজনেরা অনেকেই কুমিল্লা যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। আনুভাই আমাকে পাকড়াও করলেন, কুমিল্লা যেতে হবে। সম্মেলনের কেবল শ্রোতা হওয়ার জন্যে বাড়িতে টাকা চাইতে মন সরলো না। তাই বললাম, অর্থাভাব—যেতে পারবো না। আনুভাই আমাকে বগলদাবা করে নিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা সুরাহা করে ফেললেন। কিছুকাল হলো মাহমুদ আলী তাঁর সাপ্তাহিক পত্রিকা *নওবেলাল* সিলেট থেকে সরিয়ে এনেছেন ঢাকায়—সাংবাদিক হিসেবে সেখানে যোগ দিয়েছেন আলী আকসাদ। মাহমুদ আলীকে বোঝানো হলো, এত বড়ো একটা সম্মেলন—*নওবেলালের* নিজস্ব সংবাদদাতা সেখানে পাঠানো অবশ্যকর্তব্য; আর আকসাদ যেহেতু পত্রিকা ছেড়ে তিন-চারদিনের জন্যে বাইরে থাকতে পারবেন না, অতএব বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে আনিসকে পাঠানো দরকার। তা-ই হলো, তবে আমার পরিচিতি হলো সাংস্কৃতিক সংবাদদাতার—প্রায় গেঞ্জির বুকপকেটের মতোই।

কুমিল্লায় পৌঁছোবার পর আমাকে ঠেলে দেওয়া হলো সাংবাদিকদের সঙ্গে। *আজাদের* বদরুল হায়দার চৌধুরী অনায়াসে আমার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করলেন। সম্মেলনকক্ষে সাংবাদিকদের সারিতে আমার বসবার জায়গা হলো এবং কনিষ্ঠ বলে বেশি সমাদরও পেয়ে গেলাম। ফলে যে-আড্ডার আশায় আনুভাইয়ের এতো প্রয়াস, তা সব ভেস্তে গেলো। আমাদের সেই বই-পাগলা মোয়াজ্জম মামু তখন কুমিল্লা কালেক্টরেটে চাকরি করেন দিনে, অফিস সেরে যতোটা সময় পারেন, কাটান পাবলিক লাইব্রেরিতে, রাতে মেসে এসে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, আর আব্বার নির্দেশমতো তাঁর বন্ধু, তখন কুমিল্লায় ফিশারিজ অফিসার, এস বি রহমানের সঙ্গে দেখা করলাম—এক বেলা করে খেলাম উভয়ত্র। সেখানেও আনুভাইদের বাদ দিয়ে—তাঁরা ফোঁসফোঁস করতে লাগলেন।

সম্মেলন খুব জমজমাট হয়েছিল। মূল সভাপতির ভাষণে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি-বিরোধী চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন—এক. দেশবাসীকে, দুই. চক্রান্তকারীদের। পরে জেনেছিলাম, তাঁর অভিভাষণ লিখে দিয়েছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আহমদ শরীফ। মাহবুব-উল-আলমও বেশ ভালো ভাষণ দিয়েছিলেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দিক দিয়েও এ সম্মেলন ছিল উল্লেখযোগ্য; ঢাকা থেকে অগ্রণী শিল্পীসংঘ এবং চট্টগ্রাম থেকে প্রান্তিক শিল্পীসংঘের অনুষ্ঠান বেশ মনোজ্ঞ হয়েছিল। ঈশ্বর পাঠশালার প্রাঙ্গণে রমেশ শীল ও ফণি বড়ুয়া যুদ্ধ বনাম শান্তি

বিষয়ে কবির লড়াই করেছিলেন। যুদ্ধবিরোধী একটা প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছিল সম্মেলনে। আমার রিপোর্টে সে-সম্পর্কে লিখি যে, সেনানিবাসের এই শহরে যুদ্ধবিরোধী ধ্বনি প্রবল হয়েছিল।

কুমিল্লায় পরিবেশিত গণসংগীতের রেশ কানে নিয়ে আমরা যখন ট্রেনে ফিরছি, তখন আবদার রশীদ বললেন, 'লেখো না এমন গান—পুরোনো গান আর কতো গাইবো!' আমি ঝোঁকের মাথায় বলে ফেললাম, 'লিখবো।' ঢাকায় ফিরে দুটি দীর্ঘ গান লিখেছিলাম—রশীদ ভাই সুর দিয়ে তা গেয়েছিলেন। এর একটির সংক্ষিপ্ত ভাষ্য স্বরলিপিসহ ছাপা হয়েছিল আলীম চৌধুরী ও আহমদ কবীর-সম্পাদিত *যাত্রিক* পত্রিকায়। আমার লেখা গান শুনে বদরুল হাসান বললেন, 'আজ থেকে তোমার নতুন নামকরণ হলো পানি চৌধুরী।' পানি চৌধুরী কেন? সীমান্তের ওদিকে সলিল চৌধুরী আছেন—আমার গানে তাঁর প্রভাব স্পষ্ট। সলিলের পাকিস্তানি সংস্করণ পানি ছাড়া আর কী হতে পারে!

অগ্রণী শিল্পী সংঘের কথাটা এখানে বলে নিই। এর প্রতিষ্ঠা বোধহয় ঘটেছিল রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের আগেই, তবে এর নিয়মিত কাজকর্ম শুরু হয় তার পরে। এর প্রাণপুরুষ ছিলেন দুজন : আমার সহপাঠী নাজিম মাহমুদ এবং সঙ্গীতশিল্পী আবদুর রাজ্জাক (এখন লন্ডনপ্রবাসী আবদুর রাজ্জাক সৈয়দ)। তাছাড়া এর সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বদরুল হাসান, মন্টু খান, মাসুদ আলী খান ও নাসিম আলীর কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। অগ্রণী মূলত ছিল গণসংগীতের সংগঠন, তবে অন্যান্য গানও মাঝে মাঝে পরিবেশিত হতো। এখানে গানের ক্লাস হতো এবং প্রগতিশীল যে-কোনো উদ্‌যোগে ডাক পড়লে এর শিল্পীরা সেখানে বিনি পয়সায় গান গেয়ে আসতেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গান, সলিল চৌধুরী-রচিত ও সুরারোপিত গান এবং নাজিম মাহমুদের মতো অগ্রণীর সংশ্লিষ্ট কারো কারো গান আবদুর রাজ্জাকের দেওয়া সুরে গেয়ে বেড়াতেন এর শিল্পীরা। ১৯৫২ সালে মে-দিবসের সকালে মাহবুব আলী ইনস্টিটিউটে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল, তার প্রধান অংশগ্রহণকারী ছিলেন অগ্রণীর শিল্পীরা, স্ক্রিপ্ট লিখে দিয়েছিলাম আমি। এই অনুষ্ঠানের উদ্‌যোক্তাদের একজন ছিলেন আলী আকসাদ, তিনি কোরাসে গলা মিলিয়েছিলেন। আহমদ আবৃত্তি করেছিল, নেয়ামাল পড়েছিল ইকবালের একটি কবিতার স্বকৃত বঙ্গানুবাদ।

১৯৫২ সালে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে অগ্রণী শিল্পী সংঘ যোগ দিয়েছিল এবং সুনাম অর্জন করেছিল। ১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে, যুক্তফ্রন্টের প্রচারাভিযানের অংশস্বরূপ, তার শিল্পীরা নারিন্দা অঞ্চলে, প্রধানত ঢাকার আদিবাসীদের মধ্যে, বেশ কিছু সংগীতানুষ্ঠান করেছিল। সরদার আবদুল হালিম ছিলেন এর সংগঠক এবং আলী আকসাদ একজন অংশগ্রহণকারী। ১৯৫৪ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনেও অগ্রণী শিল্পী সংঘের যোগদান ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৫৫-৫৬ সালের দিকে মিয়া ইফতেখারুদ্দীন ঢাকায় এলে তাঁর সম্মানে অগ্রণী একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তাঁর সঙ্গে অনুষ্ঠানে এসেছিলেন প্রাদেশিক চিফ সেক্রেটারি এন এম খান। নেয়ামাল উর্দুতে স্বাগত জানাবে বলে স্থির

হয়েছিল, কিন্তু মিয়া সাহেব তাকে থামিয়ে দিয়ে চার্লি চ্যাপলিনের কোনো এক ছবির উল্লেখ করে ইংরেজিতে বলেছিলেন, সেখানে চ্যাপলিন অপরিচিত জায়গায় গিয়ে একটিমাত্র বাক্য বলেছিল। তা এই যে, তোমরা যা বলছো, তা আমি তোমাদের ফিরিয়ে দিচ্ছি : আমাকে তোমরা ভালো বললে সেটা তোমাদেরকেই আমি বলছি; খারাপ বললেও একই কথা। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হওয়া পর্যন্ত অগ্রণী শিল্পী সংঘ সক্রিয় ছিল। এর কোনো কোনো অনুষ্ঠানে শেখ লুত্ফর রহমান অংশ নিয়েছিলেন।

৩৪.

রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের পরে দেশের আবহাওয়া কেমন পরিবর্তিত হয়ে গেল, তার একটা উদাহরণই পাওয়া যায় ঢাকার উর্দু লেখকদের আচরণে। সংখ্যায় তাঁরা যে খুব বেশি ছিলেন, তা নয়, তবু এখানে উর্দু সাহিত্যের একটি ধারার বিকাশে তাঁরা সচেষ্ট ছিলেন। ঢাকার একমাত্র উর্দু দৈনিক তখন *পাসবান*—লিথোগ্রাফে ছাপা হয়—তাতেই তাঁরা অনেকে লিখতেন, তবে ভারতের বা পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু সাহিত্যপত্রিকায় লেখা ছাপতে পারলেই খুশি হতেন। এখন এর পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি লেখকদের সঙ্গেও একটা যোগাযোগ রাখতে তাঁরা সচেষ্ট হলেন এবং আমরাও এটা প্রমাণ করার জন্যে ব্যস্ত হলাম যে, আমাদের আন্দোলন কোনো ভাষার বিরুদ্ধে নয়। ঢাকার উর্দু ও বাঙালি লেখকদের মধ্যে সংযোগের বড়ো সেতু ছিল নেয়ামাল বাসির এবং তারপরে ছিলেন আতোয়ার রহমান। এঁরা শুধু উর্দু সাহিত্যের অনুবাদ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, উর্দু-বাংলার সখ্য গড়ে তুলতেও প্রয়াসী ছিলেন। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের প্রতি উর্দু লেখকদের কয়েকজন—সকলেই প্রায় বামপন্থী—যৌথভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন। হঠাৎ করে একদিন তাঁরা আমাকে আহ্বান জানালেন, কায়েদে আজম কলেজের (এখন সোহ্রাওয়ার্দী কলেজ) কোনো একটি ক্লাসকক্ষে উর্দু লেখকদের কাছে আমি যেন পূর্ব বাংলার তৎকালীন বাংলা সাহিত্য এবং শাশ্বত বাংলা লোকসাহিত্য সম্পর্কে কিছু বলি। আমি সেখানে গিয়ে যাঁদের পেলাম, তাঁদের মধ্যে সালাহউদ্দীন মোহাম্মদ, কলিম সাসারামি, সরুর বারাবাঁকভি, ইউসুফ হাসান ও হাসান পারভেজের কথা মনে পড়ে। এঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন বামঘেঁষা। ড. ওয়াজাহাত হাসান আন্দালিব শাদানির মতো উর্দু সাহিত্যের স্তম্ভকে তাঁরা আনতে পারেননি, তবে উর্দু ও ফারসি বিভাগে তাঁরই শিষ্যপ্রতিম সহকর্মী হানিফ (কোরেশি) ফউক বোধহয় এসেছিলেন। কী যে আমি বলতে চাইলাম আর অত্যন্ত কদর্য ইংরেজিতে কী যে বললাম এবং শ্রোতারাই বা কী বুঝলেন, তা বলার আর উপায় নেই। তবে এটা মোটামুটি স্থির হয়ে গেল যে, পূর্ব পাকিস্তানের উর্দু ও বাংলা সাহিত্যসেবকেরা নিয়মিত মতবিনিময় করবেন এবং সকল প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং জনস্বার্থবিরোধী সরকারি উদ্যোগের বিরুদ্ধে একযোগে ভূমিকা রাখবেন।

রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের আগেই যেমন একটি অসাম্প্রদায়িক ছাত্র-সংগঠন প্রতিষ্ঠার বিষয় আলোচিত হয়েছিল—যার ফলে ওই আন্দোলনের পরে গঠিত হয়েছিল পূর্ব

পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন—, রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের পরে ঠিক তেমনি করে একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল গঠনের কথা উঠলো এবং তাতে নেতৃত্ব দিলেন মাহমুদ আলী। যুবলীগের সাংগঠনিক কাঠামোটি তিনি অনেক পরিমাণে কাজে লাগান, তবে ভেতর থেকে এ উদ্‌যোগকে সমর্থন ও সাহায্য করে কমিউনিস্ট পার্টি। তাই, এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকায় যে-সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, তার অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন দেওয়ান মাহবুব আলী, আর মাহমুদ আলী ছিলেন সম্মেলনের আহ্বায়ক। সম্মেলনে অনেকেই স্বেচ্ছাসেবা দিয়েছিলেন—তার মধ্যে আমরা তিন বন্ধু—নেয়ামাল, আহমদ ও আমিও ছিলাম। বরাবরের মতো লেখালিখির কাজটাই বরাদ্দ হয়েছিল আমার জন্যে, তবে অন্য ফাইফরমাসও খাটতে হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে শুভেচ্ছা জানাতে সম্মেলনে এসেছিলেন মিয়া ইফতিখারউদ্দীন ও শওকত হায়াত খান। উর্দুতে পারঙ্গমতার জন্যে নেয়ামালকে দেওয়া হয়েছিল তাঁদের দেখাশোনার ভার। আর আহমদ ব্যস্ত ছিল সাংগঠনিক কাজে। সম্মেলনে মিয়া সাহেবের বক্তৃতা খুব হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। সম্মেলনশেষে জন্ম হলো গণতন্ত্রী দলের—কৃষকনেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশ তার সভাপতি, আর সদ্য অবসর-নেওয়া যুবনেতা মাহমুদ আলী সাধারণ সম্পাদক। সহ-সভাপতিদের মধ্যে তিনজনের কথা মনে পড়ে : মাহমুদ নূরুল হুদা, *আমার দেশ*-সম্পাদক মহীউদ্দীন আহমদ ও খুলনার অ্যাডভোকেট আবদুল জব্বার। দুই যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন দেওয়ান মাহবুব আলী আর রাজশাহীর আতাউর রহমান। কমিটিতে মীর্জা গোলাম হাফেজ, প্রাণেশ সমাদ্দার, নূরুর রহমান, আবদুর রব সেরনিয়াবত ও খাজা আহমদ ছিলেন আরো অনেকের সঙ্গে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে প্রচার-সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আহমদের অগ্রজ মুহম্মদ হোসেন। অবিলম্বে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় গণতন্ত্রী দলের শাখা গড়ে উঠলো—সেসব ক্ষেত্রেও নেতা ও কর্মীরা এলেন প্রধানত যুবলীগ থেকে। গণতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠা আমাদের কাছে গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা বড়ো পদক্ষেপ বলে মনে হলো। শুরু থেকেই দলটি একটা তৈরি মুখপত্র পেয়ে গেল—*নওবেলাল*। তাতে আমি কিছুকাল একটি কলাম লিখেছিলাম, লেখকের ছদ্মনামটি ঠিক করে দিয়েছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান—আবাবিল।

আলী আকসাদই তখন পুরোপুরি *নওবেলাল* দেখেন। মার্চ মাসের এক সকালে আমাদের বাড়ির নিচে তাঁর হাঁকডাক শুনে দ্রুত নেমে এলাম। কী ব্যাপার? স্তালিন মারা গেছেন। ঢাকায় সকালের কোনো কাগজেই খবরটা ছাপা সম্ভব হয়নি। তাই *নওবেলাল* সন্ধ্যায় টেলিগ্রাম বের করবে। অতএব আমাকে তক্ষুনি যেতে হবে পটুয়াটুলির সন্নিহিত রমাকান্ত নন্দী লেনের পাইওনিয়ার প্রেসে। এম এ মোহাইমেনের মালিকাধীন ওই প্রেসে শুধু *নওবেলাল* ছাপা হতো তা নয়, সরকারবিরোধী এবং কখনো কখনো বেআইনি প্রচারপত্র ও পুস্তিকাও মুদ্রিত হতো। টেলিগ্রামটাও বের হবে সেখান থেকে।

স্তালিনের মৃত্যুসংবাদে একটা বিষাদ ও অস্থিরচিত্ততা আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল। তবু তারই মধ্যে লিখতে বসে গেলাম। কিছু লিখি, কম্পোজ হতে যায়; আবার কিছু

লিখি, প্রুফ সংশোধন করতে হয়। কেউ সংবাদপত্রের অফিস থেকে কেউবা এজেন্সি রিপোর্ট নিয়ে আসেন—তাতে কাজ বেড়ে যায় : কিছু পুরোনো লেখা বাদ দিয়ে নতুন কিছু লিখতে হয়। বেলা বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত টেলিগ্রাম বের করার পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়—কতোটা দেরি হয়ে গেছে বলে আর কতোটা সরকারি প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে, তা বলা শক্ত। সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় এক নাগাড়ে কাজ করেও টেলিগ্রাম বের করতে না পারার দুঃখ আমার যুক্ত হয় স্তালিনের মৃত্যুশোকের সঙ্গে।

৩৫.

ভাষা-আন্দোলনের পরে আমাদের অনেকেরই মনে হলো, নিজেদের একটা সাহিত্যপত্রিকা দরকার। ফজলে লোহানী-সম্পাদিত *অগত্যা* এক অর্থে আমাদেরই কাগজ ছিল, কিন্তু তার হাল্‌কা চাল এক সময়ে যথেষ্ট উপভোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ওই মুহূর্তে আর পর্যাপ্ত ও তৃপ্তিকর মনে হলো না। কিছু সলা-পরামর্শের পর স্থির হলো, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনকেই ধরে পড়তে হবে আবার *সওগাত* বের করার জন্যে। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী অন্যত্র লিখেছেন যে, তিনি যখন *বেগম* পত্রিকা দেখাশোনা করেন, তখনই *সওগাত* পুনঃপ্রকাশের বিষয় স্থির হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের ফলে পরিকল্পিত সময়ে আর তা আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি ('ঢাকার সাহিত্য সংসদে সওগাতের ভূমিকা', মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, ঢাকা, ১৯৮৫)। এটা খুবই সম্ভবপর। তবে তা অন্যেরা জানলেও আমার জানা ছিল না, কেননা, আমি যখন *বেগম* অফিসে ও *সওগাত* প্রেসে যাতায়াত করতে শুরু করি, তখন হাসান হাফিজুর রহমান ওই পত্রিকা দেখতেন, অর্থাৎ গাফ্‌ফার চৌধুরী তা ছেড়ে গিয়েছিলেন। তাই একদিন, যতদূর মনে পড়ে, হাসান হাফিজুর রহমানকে অগ্রবর্তী করে আবদুল্লাহ্ আল-মুতী, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও আমি প্রায় করজোড়ে নাসিরউদ্দীন সাহেবের সামনে উপস্থিত হয়ে আমাদের প্রস্তাব উত্থাপন করলাম। তিনি যা বললেন, তার মর্মকথা এই যে, কলকাতায় *সওগাত* ছিল তরুণদের মুক্তবুদ্ধির পত্রিকা—সেটা মর্যাদালাভ করেছিল অনেকের সাধনায়। ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করবে না জেনেও তিনি *সওগাত* পুনঃপ্রকাশ করতে রাজি, কিন্তু আমরা কি *সওগাতে*র জন্যে তেমন একনিষ্ঠভাবে কাজ করতে প্রস্তুত? আমরা সকলে সমস্বরে 'জি হ্যাঁ, জি হ্যাঁ' বললাম। নাসিরউদ্দীন সাহেব একটু ভেবে দেখার সময় নিলেন এবং কয়েকদিন পরেই জানালেন যে, আমাদের কথার ওপর নির্ভর করে তিনি একটা ঝুঁকি নিতে রাজি। *বেগমে*র দায়িত্ব ছিল হাসানের স্কন্ধে, সুতরাং *সওগাতে*রও ভার পড়লো তাঁরই ওপরে। তবে নাসিরউদ্দীন সাহেব একটি শর্ত জুড়ে দিলেন যে, 'সাময়িকী'-শিরোনামে *সওগাতে*র সম্পাদকীয় তিনি লিখিয়ে আনাবেন ওয়াজেদ মিয়াকে দিয়ে। ওয়াজেদ মিয়া মানে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, দীর্ঘকাল *সওগাতে*র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কলকাতায়, কিন্তু সেই যে ১৯৩৫-৩৬ সালের দিকে মহানগরী ত্যাগ করে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন স্বগ্রামে—তখনকার খুলনা জেলার বাঁশদহে—আর সেখান

থেকে নড়েননি। তাঁর ওপরে অগাধ আস্থা নাসিরউদ্দীন সাহেবের—সে আস্থা আর কারো ওপরে স্থাপন করা তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

উদ্যমী হাসান হাফিজুর রহমান সর্বশক্তি দিয়ে *সওগাত* পুনঃপ্রকাশের উদ্‌যোগে মেতে গেলেন। আমাদের প্রতি নিতান্ত প্রীতিবশত বোরহান আর আমার লেখা ছাড়া নবকলেবরে *সওগাতের* প্রথম সংখ্যা বের করতে তিনি গররাজি। তাঁর ইচ্ছে বোরহান পূরণ করতে পারেনি, তবে তাঁর দাবি মেনে নিয়ে একটা ছোটোখাটো প্রবন্ধ তাঁর হাতে সমর্পণ করলাম। সব লেখা প্রেসে দেয়া হলো। তারপরই দেখা দিলো একটা বড়ো সংকট। প্রুফ দেখতে গিয়ে ধরা পড়লো, 'সাময়িকী'র একটা অংশে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে সহানুভূতিহীন মন্তব্য আছে। আমরা প্রমাদ গণলাম এবং নাসিরউদ্দীন সাহেবকে জানিয়ে এলাম যে, আমাদের সংশ্রব যে-*সওগাতের* সঙ্গে, তাতে এমন কথা ছাপা হওয়া চলবে না। নাসিরউদ্দীন সাহেব বললেন, আমাদের কথা তিনি ওয়াজেদ মিয়াকে জানাবেন এবং ওই লেখা যদি পরিবর্তন করতে তিনি সম্মত হন, ভালো, নইলে তিনি জোর করতে পারবেন না। বেশ কদিন গেল। তারপর এলো এই প্রসঙ্গের পুনর্লিখন। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী এবারে ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে কটাক্ষ পরিত্যাগ করলেন, কিন্তু এ-কথা লিখতে ভুললেন না যে, ধর্মভাষা আরবিই হওয়া উচিত পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। আমরা হতোদ্যম হয়ে একাদিক্রমে কদিন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলাম, ধরনা দিলাম নাসিরউদ্দীন সাহেবের কাছে; কিন্তু কোনো ফলোদয় হলো না, 'সাময়িকী'তে ও-কথাই থাকলো।

অবশেষে অগ্রহায়ণ ১৩৫৯-চিহ্নিত *সওগাতের* ৩৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। তার সূচিটি এই :

পূর্ব বাংলার সাহিত্য	... ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন
মেফিস্টোফিলিসের প্রতি ফাউষ্ট (কবিতা)	... শামসুর রাহ্‌মান
বিজ্ঞানী-দার্শনিক ইব্‌নে সীনা	... আবদুল্লাহ্‌ আল-মুতী
দর্শক (কবিতা)	... আবুল হোসেন
মৌন নয় (গল্প)	... শওকত ওসমান
হজরত আবদুল কাদের জিলানীর যুক্তিবাদ	... এম. আবদুল হাই
প্রিয়তমাসু (কবিতা)	... আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্‌
তিমির-বিদার (কবিতা)	... সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্‌
মুসলিম জগৎ	
অজন্তা (গল্প)	... আলাউদ্দিন আল আজাদ
সাম্প্রতিক ছড়া (ছড়া)	... ফয়েজ আহ্‌মদ
শিল্প ও সংস্কৃতি	... আবদুল গণি হাজারী
	... আনিসুজ্জামান
	... কামরুল হাসান
অনুভব (কবিতা)	... আশরাফ সিদ্দিকী
সাময়িকী	

পুস্তক-পরিচয়	... আনোয়ারুল হক খান
	... খালেদ চৌধুরী

সূচিপত্রের একটু টীকাভাষ্য দিই। কাজী মোতাহার হোসেনের লেখাটি ছিল ১৯৫২ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সাহিত্য অধিবেশনের সভাপতির ভাষণ। শামসুর রাহমানের কবিতাটি যথেষ্ট আলোচনার বিষয় হয়েছিল। শওকত ওসমানের গল্পটি ছিল ভাষা-আন্দোলন নিয়ে, পরে তা হাসান হাফিজুর রহমান-সম্পাদিত *একুশে ফেব্রুয়ারী* গ্রন্থে (ঢাকা, ১৯৫৩) সংকলিত হয়। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্‌র কবিতাটি তাৎক্ষণিকভাবে দারুণ সাড়া জাগিয়েছিল এবং এই মেজাজের আরো কয়েকটি কবিতার সঙ্গে তা তাঁর *সাতনরীর হার* (ঢাকা, ১৯৫৫) বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। আলাউদ্দিন আল আজাদের গল্পটি পরে তাঁর *মৃগনাভি* (ঢাকা, ১৯৫৩) গল্প-সংকলনে স্থান পেয়েছিল। 'শিল্প ও সংস্কৃতি'-বিভাগে আবদুল গণি হাজারী লিখেছিলেন, 'সাহিত্যে বিপন্নবাদ', আমি লিখি 'প্রগতি সাহিত্য-প্রসঙ্গে', আর কামরুল হাসান লিখেছিলেন 'পূর্ব বাংলার শিল্পকলা'। 'পুস্তক-পরিচয়' অংশে হাসানের বন্ধু—ফজলুল হক মুসলিম হলের বাসিন্দা, ভাষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী এবং মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য-সচিব—আনোয়ারুল হক খান আলোচনা করেন কাজী আবদুল ওদুদের *শাশ্বত বঙ্গ* নিয়ে, আর খালেদ চৌধুরী লেখেন শওকত ওসমানের সদ্যপ্রকাশিত দুটি গল্প-সংকলন *পিঁজরাপোল* এবং *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প* সম্পর্কে। নিজের লেখায় আমি সেই পুরোনো প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলাম—বিষয়বস্তু ও রচনাভঙ্গির আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে, আর কোনো কোনো প্রগতিশীল কবি (সমর সেন, মণীন্দ্র রায়) যে প্রেমের কবিতা লিখবেন না বলে পণ করেছিলেন, তার কঠোর সমালোচনা করে। সেই ১৯৫২ সালে, আমার জিজ্ঞাসা ছিল, নরনারীর প্রেম যেহেতু সমাজজীবনের একটা প্রাগ্রসর অধ্যায়, সুতরাং প্রগতিশীল কবিরা কেন প্রেমের কবিতা লিখতে পরাঙ্‌মুখ হবেন? তবে, যিনি সমাজের আর সকল সমস্যা বিস্মৃত হয়ে কেবলই ফুলপাখি চাঁদতারা ও প্রেমের কবিতা লিখবেন, তাঁর সম্পর্কেও আমার সমালোচনা ছিল প্রবল। বালভাষিত আর কাকে বলে! ওই লেখায় একটা তথ্যগত ভ্রান্তির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন শামসুর রাহমান, মুদ্রণের আগে তা সংশোধনের সুযোগ পেয়েছিলাম কিনা, এখন আর মনে পড়ে না।

সওগাত বেশ একটা প্রভাব সৃষ্টি করতে এবং সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিল। সাহিত্য সংসদের বদৌলতে এর চারপাশে তরুণ ও মুক্তচিন্তার লেখক অথবা পাঠক দুইয়েরই অভাব হলো না। নাসিরউদ্দীন সাহেব খুশি হলেন।

সওগাত-প্রকাশের কারণেই হোক, অথবা রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন-পরবর্তী পরিবর্তিত সামাজিক মেজাজের জন্যেই হোক, ফজলে লোহানী স্থির করলেন, ইয়ার্কি-ফাজলামি বাদ দিয়ে *অগত্যার* একটা গুরুতর রূপ দেবেন। *সওগাত* বের হলো ১৯৫২ সালের শেষে, আর পুনর্জন্মপ্রাপ্ত *অগত্যা* ১৯৫৩ সালের প্রথমে। *অগত্যার* প্রচ্ছদ বদলে গেল, চরিত্র বদলে গেল, লেখার বিন্যাস বদলে গেল। সেই সংখ্যার শুরুতে স্থান পেলো আমার দীর্ঘ প্রবন্ধ 'বাংলা গণকবিতার ধারায় সুকান্ত ভট্টাচার্য' এবং হয়তো সেই পাপে এই সংখ্যার পরেই *অগত্যার* তিরোধান ঘটলো।

কলেজে পড়বার সময়ে লেখার এক নতুন ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিলাম *সবুজ নিশান* নামে ছোটোদের এক পত্রিকায়। এর সম্পাদক ছিলেন তৈয়বুর রহমান, লালবাগে নিজের তমদ্দুন প্রেস থেকে পত্রিকা বার করতেন। পত্রিকা দেখাশোনা করতেন কবি-সাংবাদিক হাবীবুর রহমান। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী-সংবলিত একটি বই ছিল ম্যাট্রিকুলেশনে আমাদের র‍্যাপিড রিডার। কলেজে পাঠ্য ছিল *টেলস অফ হিউম্যান এনডেভার* নামে চিত্তাকর্ষক এক বই। এই দুই বই থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে *সবুজ নিশানের* জন্যে দেদার লিখেছি। নেয়ামাল তাতে অনেক কবিতা লিখেছিল। আরেকজন নিয়মিত লেখক ছিলেন মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্—ঢাকা কলেজে আমার এক ক্লাস অগ্রবর্তী ছাত্র। দেখলাম, তিনিও তাঁর পাঠ্য *টেলস অফ হিউম্যান এনডেভার*-অবলম্বনে লিখছেন। বেশ মজাই হতো। তাঁর একটা লেখা ছাপা হলে আমি বুঝে নিতাম, ওই লেখাটার মূল-অবলম্বনে আমার আর লেখা চলবে না। তিনিও হয়তো ওরকমই সবক নিতেন। আমরা উভয়েই মূলের স্বীকৃতি দিতাম। এই প্রেস থেকেই সৈয়দ আবদুল মান্নান-সম্পাদিত মাসিক *তাহযিব* পত্রিকা বের হতো। লেখা দিতে গিয়ে আমি সাধারণত তাঁকেই পেতাম। কোনো এক লেখায় ইংরেজি থেকে বাংলায় লিপ্যন্তর করতে আমি একটি নামের বানান ভুল করেছিলাম। সৈয়দ আবদুল মান্নান পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়ে ও তৎক্ষণাৎ পড়ে আমাকে দিয়ে ভুল শুধরিয়েছিলেন।

এদিকে কলেজে টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেল। আহমদ ও আমি একসঙ্গে পরীক্ষার ফর্ম জমা দিয়েছিলাম বলে আমাদের আসন পড়েছিল পাশাপাশি বা সামনে-পিছে। পরীক্ষার তদারকি করতে এসে নারায়ণবাবু পাকড়াও করলেন : 'পরীক্ষার হলেও তোমরা একসঙ্গে কেন?' আমরা বললাম, 'সিট যেমন পড়েছে।' উনি কিছু শুনতে চাইলেন না, আমাকে উঠিয়ে একেবারে হলের পেছনের বেঞ্চে বসিয়ে দিলেন।

টেস্ট পরীক্ষার ফল বের হলে একটা গল্প খুব চালু হয়েছিল। কোনো এক বিষয়ে নম্বর খুব কম পাওয়ায় আমাদের এক সহপাঠীকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক আলী আহমদ একটু তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'এতে তুমি এত কম নম্বর পেলে!' বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে সে জবাব দিয়েছিল, 'স্যার, আমি একা মানুষ—ওতেই চলে যাবে।' আহমদও কম নম্বর পেয়েছিল লজিকে। স্থির হলো, আমার বাসায় দুজনে একসঙ্গে লজিক পড়বো। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা দাঁড়ালো আহমদের পড়ায় এবং আমার পড়ানোয়। তাতে অবশ্য আমারই লাভ হয়েছিল বেশি।

৩৬.

সওগাত অফিসে একদিন আসতেই আমার হাতে পেনসিলে লেখা দীর্ঘ এক কবিতা তুলে দিলেন হাসান হাফিজুর রহমান। কবিতাটির কোনো শিরোনাম ছিল না, আরম্ভের লাইনটি ছিল 'আম্মা তার নাম ধরে একবারও ডাকবে না তবে আর?' কবিতাটির ভাব কোথাও কোথাও দুরূহ বলে মনে হলেও তা পড়ে আমি আবেগে আপ্লুত হয়েছিলাম। *সওগাত* তখনো বের হয়নি, সুতরাং জানতে চাইলাম, 'কোথায় ছাপবেন?' হাসান বললেন, 'দেখি।' *সওগাত* প্রেসে তখন ছাপা হচ্ছিল ফজলুল হক হল বার্ষিকী, হাসানই

তার সম্পাদক। বার্ষিকীর সে-সংখ্যা বেশ একটা সাহিত্যপত্রিকার রূপ ধারণ করেছিল। প্রোভোস্টের ছবি, কী ইউনিয়নের ছবি, কী সম্পাদনা-পরিষদের ছবি, কী খেলোয়াড়দের গ্রুপ ছবি—এসব কিছুই ছাপা হয়নি। ধূসরপ্রায় কার্টিজ কাগজের প্রচ্ছদ ছাপা-কাগজের চেয়ে তিনদিকের মাপ একটু বেশি ছিল। তাতেই কবিতাটা ছাপা হলো 'অমর একুশে' নামে। ওই কবিতায় এক জায়গায় 'পঞ্চাশ জন আর নেই' আছে। এর কারণ, রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন থেমে যাওয়ার পরে আমরা সকলে এই রটনায় আস্থা-স্থাপন করেছিলাম যে, আন্দোলনে ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। মূল পাণ্ডুলিপিতে বোধহয় 'চল্লিশ জন আর নেই' ছিল। পঞ্চাশ জন কবিজনোচিত অতিরঞ্জন।

এই কবিতা লেখার পর থেকে হাসানের মাথায় ঘুরতে থাকলো, পরের একুশে ফেব্রুয়ারির আগে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন নিয়ে একটা সাহিত্য-সংকলন প্রকাশ করতে হবে। পাইওনিয়ার প্রেসে বাকিতে বই ছাপার ব্যবস্থা হলো, বাদামতলির এইচম্যান কোম্পানিও ভরসা দিলেন বাকিতে ব্লক তৈরি করে দেবেন। পরিচিত সবার কাছেই হাসান লেখা চাইলেন। এমন সময়ে জেলখানার ভেতর থেকে কমিউনিস্ট-নেতা খোকা রায়ের চোরা-পথে পাঠানো প্রবন্ধ 'সকল ভাষার সমান মর্যাদা' আবদুল্লাহ্ আল-মুতীর কাছে পৌঁছোলো। অতি ক্ষুদ্রাক্ষরে লেখা প্রবন্ধটি আমি হাতে কপি করি। স্থির হয়, হাসানের পরিকল্পিত সংকলনে এটাই যাবে একমাত্র প্রবন্ধ হিসেবে—লেখকের নাম দেওয়া হয় আলী আশরাফ। হাসানের অনুরোধে সংকলনের জন্যে আমি একটা গল্প লিখে ফেললাম। হাসান বললেন, তার আরম্ভটা খুব ভালো হয়েছে, সমাপ্তিটা নিরাশ করে। কদিন পরে শেষটা বদলে হাসানের হাতে 'দৃষ্টি' সমর্পণ করলাম। ভাষা আন্দোলন-উপলক্ষে শামসুর রাহমানের কোনো কবিতা ছিল না; তাগাদা দিয়েও যখন তা পাওয়া গেল না, তখন কলকাতার *পরিচয় পত্রিকায়* প্রকাশিত তাঁর সদ্যপ্রকাশিত একটি কবিতা সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন হাসান। আর সংকলিত হলো আবদুল গনি হাজারী, আনিস চৌধুরী, ফজলে লোহানী, আতাউর রহমান, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্, আলাউদ্দিন আল আজাদ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সৈয়দ শামসুল হক ও জামালউদ্দীনের কবিতা—হাসানেরটা তো আছেই; শওকত ওসমান, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, আতোয়ার রহমান, সিরাজুল ইসলামের গল্প এবং আমারটাও; মুর্তজা বশীর ও সালেহ আহমদের নকশা; আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ও তোফাজ্জল হোসেনের গান এবং কবিরউদ্দিন আহমদের লেখা ঘটনাপঞ্জি। আমিনুল ইসলাম প্রচ্ছদ আঁকলেন; মুর্তজা বশীরের একটা লিনোকাট গেল মুখপাতে; পাদপূরণের জন্যে বিজন চৌধুরী ও বশীরের কয়েকটি স্কেচ গেল—তবে বইতে বিজনের নাম যায়নি। হাসানের সঙ্গে ভাগাভাগি করে আমরা দু-একজন প্রুফ দেখলাম। কিন্তু সম্পাদকীয় গোছের কিছু একটা যাওয়া দরকার। হাসান হঠাৎ ঘোষণা করলেন, তিনি আর লিখতে পারবেন না। শেষে ওই দায়িত্ব পড়লো আল-মুতীর ঘাড়ে—তিনি পরদিনই সেটা এনে দিলেন। মুখবন্ধ হিসেবে ওটাই ছাপা হলো স্বাক্ষরবিহীনভাবে। হাসান একদিন বললেন, 'একটা উৎসর্গপত্র লেখো।' তিনিও লিখতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু মন দিতে পারলেন না। কিছু কাটাকুটির পর আমি একটা দাঁড় করালাম—হাসানের পছন্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে বাদামতলিতে ব্লক প্রস্তুতকারকের দপ্তরে যাওয়া হলো। সেখানেই ট্রেসিং পেপারে, সরু

নিবের কলমে, চাইনিজ ইংকে ওটা নকল করে দিলাম। তা ব্লক করে উৎসর্গ ছাপা হলো আমার অস্পষ্ট হাতের লেখায়, বাঁকা হয়ে যাওয়া লাইনে।

এর কিছুকাল আগে মোহাম্মদ সুলতান ও এম আর আখতার (মুকুল) মিলে বখশিবাজারে মেডিক্যাল হস্টেলের উলটো দিকে পুঁথিপত্র নাম দিয়ে একটা বইয়ের দোকান খুলেছিলেন (ভালো বইয়ের দোকান করার চিন্তা এঁদের অনেকের মাথায় ছিল, বাংলাবাজারে ফজলে লোহানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বল্পজীবী বুকস অ্যান্ড বুকস)। পকেট সাইজের কয়েক পৃষ্ঠায় তাঁরা বইয়ের একটা তালিকা ছেপেছিলেন—তার গোড়ায় বই সম্পর্কে অনামে আমার একটা লেখা ছিল (আমাদের আদর্শ ছিল সিগনেট প্রেসের *সাহিত্যের খবর*)। হাসান তাঁর এই দুই বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে স্থির করলেন, একুশে ফেব্রুয়ারি সংকলনটা বের হবে পুঁথিপত্র প্রকাশনী থেকে, প্রকাশক হিসেবে নাম যাবে মোহাম্মদ সুলতানের।

অনেক চেষ্টা করেও একুশে ফেব্রুয়ারিতে বইটা বের করা গেল না। লেখা পাওয়ায় দেরি একটা কারণ, কিন্তু কাগজ তো নগদ পয়সায় কিনতে হচ্ছিল, সেই নগদ জোগাড় করতে সময় লাগছিল। বই বের হলো মার্চে, তা নিষিদ্ধ হয়ে গেল এপ্রিলে। প্রেসের দেনার জন্যে মোহায়মেন সাহেবের ভাই মকিত সাহেব একদিন আমার সামনেই হাসানকে যা-তা বললেন। সেই রাতেই হাসান বাড়ি চলে গেলেন। তারপর জমি না গুড় বিক্রি করে প্রেসের দেনা শোধ করলেন।

তবে ১৯৫৩ সালে একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপিত হয়েছিল মহাসমারোহে। হাজার হাজার মানুষ—নারীপুরুষ, বালবৃদ্ধ—খালি পায়ে আজিমপুর কবরস্থানে শহীদ বরকত ও সফিউর রহমানের সমাধিতে এবং মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের সামনে—প্রথম গুলিবর্ষণের জায়গায়—পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে। কবরস্থানে মেয়েদের প্রবেশ করা নিয়ে একটু গোলযোগ হয়েছিল। কবরস্থানের পরিচর্যা যাঁরা করতেন, তাঁরা বলেছিলেন, সেখানে মেয়েদের প্রবেশ শরা-অনুযায়ী নিষিদ্ধ। মেয়েরা—বেশিরভাগ দল-বেঁধে-যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্রী—কিছুক্ষণ গেটে দাঁড়িয়েছিল। ভিড় উত্তরোত্তর বাড়তে থাকায় এবং আগন্তুকদের বাক্য ক্রমশ তপ্ত হতে থাকায় কবরস্থানের পরিচর্যাকারীরা শেষ পর্যন্ত অপ্রসন্নচিত্তে মেয়েদের ঢুকতে দিয়েছিলেন, তবে বলে দিয়েছিলেন, তাদের সকলকে মাথায় কাপড় দিয়ে যেতে হবে। কবরে ফুল দেওয়ার ব্যাপারেও তাঁরা প্রথমে আপত্তি করেছিলেন। বলেছিলেন, কবর জিয়ারত করা চলবে, কিন্তু ফুল দেওয়া শেরেক বলে তাঁরা তার অনুমতি দেবেন না। তবে অপেক্ষমাণ ব্যক্তিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ নিয়ে আর চাপাচাপি করেননি। একটা শর্ত সবাই মেনে নিয়েছিল : প্রভাত-ফেরির গান গাওয়া হয়েছিল কবরস্থানের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত, ভিতরে নয়।

প্রভাত-ফেরির গান ছিল তিনটি : পূর্ব পাকিস্তান সরকারের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোশারফউদ্দীন আহমদের (রাজনীতিবিদ মহিউদ্দীন আহমদের মধ্যম ভ্রাতা) রচিত ও সুরারোপিত 'মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল ভাষা বাঁচাবার তরে/আজিকে স্মরিও তারে'; গাজীউল-হক রচিত ও বোধহয় তাঁর অনুজ নিজামুল-হক সুরারোপিত 'ভুলবো না এই একুশে ফেব্রুয়ারি/ভুলবো না'; আর আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী-রচিত ও আবদুল লতিফ-সুরারোপিত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'। সন্ধ্যায় কার্জন হলের

অনুষ্ঠানেও এ গানগুলো গীত হয়েছিল। সেখানে শেখ লুত্ফর রহমানের কণ্ঠে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটি শুনে কী যে রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম, তা বলা যায় না।

১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে, আমার মনে হয়, সংগঠিত উদ্যোগের চাইতে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল বেশি। সংগঠনের ব্যানার ছিল, কিন্তু পাড়া ও মহল্লার পোস্টারই ছিল অধিক। ক্ষোভ ও শোক প্রকাশের চেয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি ছিল তীব্রতর। মনে হচ্ছিল, তখনই এই দাবি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে এবং মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের মনে যথেষ্ট উত্তাপ সঞ্চিত হয়েছে।

এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ যখন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনকে পদচ্যুত করেন তখন তাই ছাত্ররাসুদ্ধ বেশিরভাগ নাগরিকই খুব উল্লসিত হয়েছিলাম। সে-উল্লাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে আমরা দেরি করিনি। তখন আমাদের মনে হয়নি যে, একটা অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন একটা সরকারের অপসারণও গণতন্ত্রের জন্যে একটা বড়োরকম হুমকি। গণপরিষদ ভেঙে দেওয়ার বিষয়টা চ্যালেঞ্জ করে স্পিকার তমিজউদ্দীন খান যখন কিছুকাল পরে সিন্ধু হাইকোর্টে মামলা করলেন, তখন আমাদের অনেকের চৈতন্যোদয় হয়েছিল। কিন্তু ততোদিনে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর শাসন, প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের রাজনীতি এবং পাকিস্তান সরকারের ওপর মার্কিন প্রভাব বেশ প্রবল হয়েছে। সিন্ধু হাইকোর্টে তমিজউদ্দীন খান জয়ী হলেও পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টে সে-রায় বাতিল করে আপসমূলক একটা ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দেন।

এই সময়ে আমার একটি বোন জন্ম নিয়ে আঁতুড়েই মারা যায়।

৩৭.

ওদিকে হাসান রাগ করে *সওগাতের* চাকরি ছেড়ে দিলেন। কিছু না জেনেই পরদিন সকালে *সওগাত* অফিসে গিয়ে আমি নাসিরউদ্দীন সাহেবের সামনে পড়ে গেলাম। হাসানের বদলে আমাকেই তিনি তিরস্কার করলেন। আমাদের জন্যে তিনি কাগজ বার করছেন, আর আমাদের কোনো ভালোবাসা নেই পত্রিকার প্রতি, দায়িত্ববোধ নেই। এমনকী, একটা সংখ্যা ছাপার মাঝখানে পত্রিকা ফেলে হাসান যে এভাবে চলে গেল, সে ভেবেও দেখলো না, এর পরিণাম কী! তারপর তিনি রওশনকে ডেকে বললেন আমাকে চা-নাশতা দিতে আর *সেইসঙ্গে সওগাতের* বাকি প্রুফ। দু-তিনদিন লাগলো পত্রিকার কাজ শেষ হতে। তারপর যখন পত্রিকার কপি আনতে গেছি, নাসিরউদ্দীন সাহেব জানতে চাইলেন, ওই সংখ্যায় আমার লেখা আছে কিনা। লেখা যে নেই, তা তাঁকে জানালাম এবং খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। উনি রওশনকে ডেকে বললেন আমাকে একটা কপি এনে দিতে।

বেগম-সওগাতের ভার তখন নেন সানাউল্লাহ্ নূরী—সেকথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। তারপরে সে-দায়িত্ব নিলেন আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী। কিছুকাল পরে তিনিও দায়িত্ব ত্যাগ করলেন। তাঁর হাতে *সওগাতে* আমার একটা গল্প ছাপা হয়েছিল।

তিনি বললেন, সব লেখার বিল করে এসেছেন, আমি যেন নাসিরউদ্দীন সাহেবের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাই। আমার আগমনের উদ্দেশ্য জেনে সম্পাদক প্রীত হলেন না। বললেন, সাহিত্য সাধনার জিনিস, অর্থোপার্জনের উপায় নয়। তিনি দেখেছেন, এককালে লেখা ছাপা হলেই লেখকেরা আনন্দিত হতো। এখন ছেলে-ছোকরারা লিখে টাকা চায়।

তিনি বললেন সেদিন সন্ধ্যায় যেতে। গিয়ে দেখি, খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন বসে। লেখার জন্য টাকা নিতে এসেছি জেনে কবি মঈনুদ্দীন জানতে চাইলেন, *সওগাতে* লেখার জন্যে টাকা দেওয়া হয় নাকি? নাসিরউদ্দীন সাহেব আমাকে দশ টাকা দিলেন এবং কবিকে বললেন, কারো নিতান্ত প্রয়োজন হলেই টাকা দেন।

সেই রাতে আমি স্টিমারে বরিশাল রওনা হয়েছিলাম বড়োবুদের কাছে যাবো বলে। স্টিমারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করার প্রতি আমার দুর্বলতা ছিল। ডেকের বাতাস আর চমৎকার সাহেবি খানাদানা আমাকে খুব টানতো। *সওগাতের* টাকাটা পাওয়ার ফলে খাওয়াদাওয়ার বিলাসিতা করতে আর দ্বিতীয়বার ভাবতে হয়নি।

পরে *সওগাতে* আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন হাবীবুর রহমান ওরফে ফিরোজ এবং তারপরে জিয়াউর রহমান। হাবীবুর রহমান পরে জনসংযোগ-কর্মকর্তা হিসেবে সুপরিচিত হন। জিয়াউর রহমান এখন ভয়েস অফ আমেরিকার বাংলা বিভাগে কর্মরত সুপরিচিত বেতার-সাংবাদিক।

এদিকে আই এ পরীক্ষা এসে গেল। লেখায় একটু ছেদ পড়লো। তখন সারা পূর্ব বাংলার সকল কলেজের ইনটারমিডিয়েট পরীক্ষা নিতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কার্জন হলে আমাদের সিট পড়লো। নিজেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো। পরীক্ষার শেষদিন আর দশজনের মতো আমিও দেয়ালে ছুঁড়ে কালির দোয়াত ভেঙে এলাম।

শেষ পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে কার্জন হলের সামনেই পেয়ে গেলাম আমাদের দুই অগ্রজপ্রতিম সুলতানুজ্জামান খান (পরে সচিব ও জাতিসংঘ-ব্যবস্থার কর্মকর্তা) ও আবদুর রাজ্জাককে (মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সুইডেনে বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারাভিযানের প্রধান ও পরে আমাদের রাষ্ট্রদূত)। তাঁদের সঙ্গে অনেকক্ষণ বাগানে বসে গল্প করলাম।

এ-সময়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আন্দোলনে জড়িয়ে যাই। ঘটনার শুরুটা কীভাবে হয়েছিল, এখন তা মনে নেই; তবে ছাত্রদের রাজনীতি ও সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ নতুন নিয়ম ঘোষণা করেন। ছাত্রসমাজ তাৎক্ষণিকভাবে একে কালাকানুন বলে অভিহিত করে এবং সকল ছাত্র-সংগঠনের প্রতিনিধিরা একযোগে প্রতিবাদ জানাবার সিদ্ধান্ত নেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে দশজন ছাত্রনেতার স্বাক্ষরে বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষকে এক স্মারকলিপি দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ সেই দশজনকেই বহিষ্কার করেন।

এর পরেই ব্যাপক ছাত্র-আন্দোলনের সূচনা হয়। রাষ্ট্রভাষা, বন্দিমুক্তি, ঢাকা কলেজে ২১ ফেব্রুয়ারি পালনের দায়ে কয়েকজন ছাত্রের বিরুদ্ধে বহিষ্কারাদেশ—এসবও কালাকানুন-বিরোধী আন্দোলনের বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুজ্জামানকে আহ্বায়ক করে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় এবং তাতে ছাত্র ইউনিয়নের মোহাম্মদ সুলতান ও মোহাম্মদ ইলিয়াস, যুবলীগের কে জি মুস্তাফা ও গাজীউল হক, ইসলামিক ব্রাদারহুডের ইবরাহিম মোহাম্মদ তাহা ও সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ এবং

ছাত্রলীগের জিল্লুর রহমান এবং আরো কেউ কেউ সদস্য ছিলেন।

আমার আই এ পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোহাম্মদ ইলিয়াস আমাকে এই আন্দোলনের কাজে ভিড়িয়ে দিলেন। আমি বিকেলে মধুর দোকানে গিয়ে বসতাম। সন্ধ্যা নাগাদ মোহাম্মদ ইলিয়াস এসে প্রেস বিজ্ঞপ্তি বা সংগ্রাম কমিটির বিবৃতির বিষয় বলে যেতেন। আমি খসড়া করে কখনো কোনো নেতাকে দেখাতে পারতাম, কখনো নিজে নিজেই তা চূড়ান্ত করে কামরুজ্জামানের সই নিজেই দিয়ে খবরের কাগজে পাঠাবার ব্যবস্থা করতাম।

আন্দোলনের পক্ষে অধিকাংশ ছাত্রের সমর্থন থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। তিন-চার মাস পরে বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ নমনীয় হন। ছাত্রনেতাদের বহিষ্কারাদেশ তুলে নেওয়া হয় এবং ছাত্র-রাজনীতি-সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। শুধু এই নিয়ম বলবৎ থাকে যে, বিশ্ববিদ্যালয়-চত্বরে সভা-অনুষ্ঠানের জন্যে প্রক্টরের অনুমতি লাগবে।

আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে অনেক বলে-কয়ে প্রচারকার্যের দায়িত্ব থেকে আমি অব্যাহতি নিই। ততোদিন আনু ভাইয়ের বি এ পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তার খালাতো বোনের স্বামী মজুমদার সাহেব শ্রীমঙ্গলের অদূরে রাজঘাট টি এস্টেটের ম্যানেজার। সেখানে কদিন বেড়িয়ে আসবো বলে স্থির হলো। আনু ভাই, তার বড়ো আকরাম ভাই, ওঁদের খালাতো ভাই নাইমুল হাসান ওরফে মুন্না (তারই বোনের কাছে আমরা যাচ্ছি) ও আমি এক রাতে ট্রেনে করে শ্রীমঙ্গল রওনা হলাম। ছুটি ও স্বাধীনতা উপভোগ করার চরম প্রতীক হিসেবে যাত্রাপথে ট্রেনে দুটি সিগারেট খেলাম। সেই আমার প্রথম ধূমপান—তারপরও বহুদিন সিগারেট ধরিনি।

চা-বাগানটা বেশ বড়ো। ম্যানেজারের জিপে চড়ে পর্যায়ক্রমে তা দেখা হলো। ঘর থেকে বের হওয়ার সময়ে তিনি হাতে একটা ব্যাটন নেন—দরকারমতো তা ব্যবহারও করেন। বাংলোতে ফিরে এলে ম্যানেজারের অসংখ্য সেবকের অন্তত দুজন জুতো-মোজা খুলে দেয়, স্যান্ডেল এগিয়ে দেয়, হুকুম তামিল করে। মজুমদার সাহেব আমাকে লক্ষ্য করেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, 'কী, *দুটি পাতা একটি কুঁড়ি* মনে পড়ছে?' *দুটি পাতা একটি কুঁড়ি* চা-বাগানের শ্রমিকদের মানবেতর জীবন নিয়ে মুল্‌ক রাজ আনন্দের উপন্যাস *টু লিভস অ্যান্ড এ বাডের* নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়-কৃত বঙ্গানুবাদ। সত্যি তা মনে পড়ছিল, কিন্তু তা কবুল করতে সৌজন্যে বাধলো—একটু হেসে জবাব এড়িয়ে গেলাম। আমাদের থাকাটা খুব আরামদায়ক হয়েছিল, সন্দেহ নেই, কিন্তু কুলি-কামিনের জীবন দেখে এবং সে-সম্পর্কে আরো কিছু শুনে মন বিষণ্ন না হয়ে পারেনি।

এদিকে আবদুল হাইকে কেন্দ্র করে আমাদের মধ্যে একটা আবর্তন ঘটছিল। ম্যাট্রিক পাশ করে সে ভৈরব থেকে চলে গেলো রংপুরে, কারমাইকেল কলেজে পড়তে। সেখানে তার নতুন বন্ধুদের মধ্যে একজন হলো রংপুরেরই ধাপনিবাসী আখতারুজ্জামান মোহাম্মদ আবদুল আলী, সংক্ষেপে এ জেড এম আবদুল আলী, আরো সংক্ষেপে খোকন। হাই তার সম্পর্কে আমার কাছে লিখলো এবং আমার সম্পর্কে তাকে বললো। আমরা উভয়েই পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হতে আগ্রহী হলাম। পত্র-মিতালি দিয়ে শুরু হলো। ১৯৫২ সালে খোকন আই এ পরীক্ষা দিয়ে ঢাকায় এলে

প্রথম সাক্ষাৎ হলো। আমাদের বন্ধুতা আজো গভীর।

হাই যে কেবল আমাকেই চিঠি লিখতো, তা নয় মনুর বড়ো বোন হেনাকেও লিখতো। সে-চিঠি আবার বহন করতে হতো আমাকেই। মনুদের টিনের বাড়ির একাংশ ছোটোবুরা যখন ভাড়া নিয়েছিল, তখন হাইয়ের চিঠি আমার কাছে আসতো, আমি তা চালান করে দিতাম ছোটোবুকে, ছোটোবু তা প্রাপককে দিয়ে দিতো। একই পথে ফিরতি ডাকও যেতো। আমরা ঠাটারিবাজারে চলে এলে ছোটোবুরাও সেখানে চলে এলো একতলায় থাকতে। অনেকের মাথায়ই বজ্রাঘাতের উপক্রম। তবে সৌভাগ্যক্রমে ছোটোবুদের জায়গায় মনুদের ভাড়াটে এলেন ছোটোদুলাভাইয়ের মামা সম্পর্কে এক ভদ্রলোক—রাজনীতিবিদ ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদ মশিউর রহমানের ভাই—নাম বোধহয় ডা. ফজলুর রহমান। তাঁর স্ত্রীকে ছোটোবু যা বোঝাবার তা বোঝালো। এখন আমার পিওনগিরি আগের মতো সহজ রইলো না। ঠাটারিবাজার থেকে হেঁটে নয়াপল্টনে গিয়ে সুযোগমতো মামীর হাতে পত্র সমর্পণ করা এবং উত্তর সংগ্রহ করে ডাকে দেওয়া দস্তুরমতো খাটুনির ব্যাপার।

এ-সময়ে *বেগমে* ফাতেমা হাই নামে আমি দু-একটা লেখাও ছেপেছি। নামকরণটা একটু আগে হয়েছিল, এই যা, তবে তা অব্যর্থ হয়েছিল।

আই এ পরীক্ষার ফল বের হলে দেখা গেল, প্রথম বিভাগে পাশ করেছি। আমার যে-সহপাঠী বাড়িতে আমার ফলাফলের খবর সোৎসাহে পৌঁছে দিয়েছিল, সে কিন্তু ফেল করেছিল। তখন ১০০০ নম্বরের পরীক্ষায় ৫০০ পেলে প্রথম বিভাগ পাওয়া যেতো। আমি পেয়েছিলাম ৫৮৮। জগন্নাথ কলেজ থেকে যারা আই এ পরীক্ষা দিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে ভালো করেছিলাম। শিক্ষকেরা খুব খুশি হয়েছিলেন, বৃহত্তর পারিবারিক আবেষ্টনীর সকলেও।

আমাদের সময়ে আই এ পরীক্ষায় প্রথম হন (পরে ডক্টর) কামাল হোসেন, দ্বিতীয় মোকাম্মেল হক (পরে সচিব এবং মন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন আমলা)। সাবেক অ্যাটর্নি-জেনারেল মাহমুদুল ইসলামও প্রথম দশজনের মধ্যে ছিলেন; তাঁর স্থান কতো ছিল, এখন মনে পড়ছে না। আমার স্থান অনেক নিচে ছিল—৩৮।



আলো ভুবনভরা

আব্বা বললেন, 'চলো তাহলে, তোমাকে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের কাছে নিয়ে যাই।'

এখনকার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পুবদিকের উত্তর-দক্ষিণ বাহু তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন। পুরো ভবনটাই ছিল কলা অনুষদের; ১৯৪৬ সালে, মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালকে জায়গা দিতে গিয়ে বাকিটা ছেড়ে দিতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়কে। সীমিত পরিসরের এই কলাভবনের একতলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, দোতলায় ক্লাসঘর এবং শিক্ষক আর ছাত্রীদের কমনরুম। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলেই চোখে পড়তো, মস্ত বড়ো একটা ঘড়ি ঝুলছে—করিডোরের দু বাহু যেখানে মিলেছে, তার মাথায়। সেই ঘড়ি দেখে বেয়ারা ক্লাসের ঘণ্টা বাজাতো। প্রতি সপ্তাহে একটা নির্দিষ্ট দিনে ঘড়িতে দম দিতে হতো। বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ঘড়িবাবু ছিলেন—তাঁর কাজ ছিল সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যত ঘড়ি আছে, তাতে দম দেওয়া। নিজের কবজিতে লাগানো ঘড়ির সঙ্গে তিনি সকল ঘড়ির সময় মিলিয়ে নিতেন।

কলাভবনের সিংহদ্বার ছিল প্রক্টরের দখলে : ওপরে বাসা, নিচে অফিস। তার পশ্চিমে ছিল কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের কমনরুম : টেবিল টেনিস, ক্যারম, দাবা খেলা হতো—তাসও; খবরের কাগজ পড়ার জন্যে সেটা ছিল ভালো জায়গা। তার পশ্চিমে টিনশেডে মধুর দোকান—একদিকে হাসপাতাল অন্যদিকে বড়ো রাস্তার কোল ঘেঁষে। সেটাই ছিল ছাত্রদের প্রকৃত মিলনক্ষেত্র।

কলাভবনের দক্ষিণ-পুবে রেল লাইনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল দোতলা ফ্যাকালটি বিল্ডিং। কলা অনুষদের ডিনের এবং ওই অনুষদের অন্তর্গত বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষদের অফিস সেখানে। বাণিজ্য বিভাগের একতলা শ্রীহীন ঘরগুলো পুকুরের ধার দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে একটু বাঁকা হয়ে পৌঁছোতো ফ্যাকালটি বিল্ডিংয়ের কাছে। তখন স্বতন্ত্র বাণিজ্য অনুষদ ছিল না, সমাজবিজ্ঞান অনুষদ ছিল না—এসব বিষয়ের বিভাগগুলো ছিল কলা অনুষদের অধীন। অনুষদ বলতে আর ছিল বিজ্ঞান ও আইন। কার্জন হল এলাকায় বিজ্ঞান অনুষদের ছিল বিশাল সাম্রাজ্য। আইন অনুষদের ক্লাস হতো সন্ধ্যার পরে কলাভবনেই : আইনের ছাত্রেরা সাধারণত দিনে কোথাও চাকরি করতেন নয়তো মাস্টার্স পড়তেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে ছিল আরো দুটি অনুষদ : ঢাকা মেডিক্যাল কলেজকে নিয়ে চিকিৎসা অনুষদ; আর সবে

কলেজে রূপান্তরিত আহসানউল্লাহ ইনজিনিয়ারিং স্কুলকে নিয়ে প্রকৌশল অনুষদ। ক্ষীণকায় কৃষি অনুষদ ছিল কৃষি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগকে জড়িয়ে।

কলাভবনের প্রবেশদ্বার পেরিয়ে গাড়িতে বসে ভেতরে যেতে খুব সংকোচ বোধ হচ্ছিল। শিক্ষকদের দু-একটা গাড়ি অবশ্য রাখা আছে এদিকে-ওদিকে। তবে বেশি করে চোখে পড়ার মতো ছিল সুপরিসর এক ঘোড়াগাড়ি—গাড়িটা রাখা বেলতলায়, ছাড়া-পাওয়া ঘোড়া অদূরে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে। পরে জেনেছিলাম, ওটা মেডিক্যাল অফিসারের নিজস্ব বাহন—তাঁরও অফিস ফ্যাকালটি বিল্ডিংয়ের দোতলায়।

একতলায় বাংলা বিভাগের দপ্তরে জানা গেল, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সে-সময়ে দোতলায় ডিনের অফিসে। শহীদুল্লাহ্ সাহেব তখন বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ এবং কলা অনুষদের ডিনও। বিভাগের পিওন পরামর্শ দিলো, ভর্তি ফরমে যেন সাবসিডিয়ারি বিষয়ের বিভাগীয় প্রধানদের স্বাক্ষর নিয়ে একেবারে ডিনের দপ্তরে যাই। তাহলে একই সঙ্গে বিভাগের অধ্যক্ষ ও অনুষদের ডিনের স্বাক্ষর পাওয়া যাবে।

বাংলা বিভাগের পাশের ঘরটাই ইংরেজির। সেখানে পাওয়া গেল সৈয়দ আলী আশরাফকে—তিনি আব্বার পূর্বপরিচিত। তাঁর কাছে জানা গেল, ইংরেজি বিভাগের প্রধান আছেন ছুটিতে, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মিস্টার গোমেজ গেছেন ক্লাসে—এখনই এসে পড়বেন। আব্বাকে বসতে বলে, আমার ভর্তি-ফরমে চোখ বুলিয়ে তিনি বললেন, 'ততক্ষণে তুমি হিস্ট্রির হেড অফ দি ডিপার্টমেন্টের সই নিয়ে এসো।'

অধ্যাপক আবদুল হালিম ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ। তাঁর কাছে যেতে হলে বিভাগের পিওনকে পেরোতে হবে। সে আমাকে করিডোরে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে ফরমটা নিয়ে ভেতরে চলে গেল—এমন সামান্য ব্যাপারে হেড সাহেবকে বিরক্ত করা অকারণ। দু-মিনিটের মধ্যে হালিম সাহেবের সই নিয়ে এসে একগাল হেসে সে ফরমটা ফেরত দিলো। পরে সে-হাসির অর্থ জেনেছিলাম। ছাত্রদের ভর্তি ও পরীক্ষার ফরম কিংবা বিভাগ-বদলির দরখাস্তে বিভাগীয় অধ্যক্ষের স্বাক্ষর সে সংগ্রহ করে দেয়, বিনিময়ে কিছু বখশিস প্রত্যাশা করে। ধিরজু ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আর কোনো পিওনের এমন প্রত্যাশা ছিল বলে আমার জানা নেই।

এবারে গোমেজ সাহেবের সই নিলাম ফরমে। আব্বা আমাকে নিয়ে দোতলায় উঠলেন। ডিনের অফিসে দরজার পর্দা সরাতেই শহীদুল্লাহ্ সাহেব স্বাগত জানালেন আব্বাকে, তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য জেনে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। তারপর আমার হাত থেকে ফরম নিয়ে একবার চোখ বোলালেন, তারপর যথাস্থানে সই দুটো দিয়ে, আমার হাতে ফরম সোপর্দ করে বললেন, 'ওয়েলকাম—টোয়াইস।' টোয়াইস কেন, বুঝতে পারিনি। শহীদুল্লাহ্ সাহেব নিজেই ব্যাখ্যা করলেন : 'তুমি আমার বিভাগে ভর্তি হচ্ছো, তাই একবার ওয়েলকাম। আর তুমি আমার দেশের ছেলে, তাই আরেকবার ওয়েলকাম।' সংকীর্ণ অর্থে ওই দেশ সম্পর্কে আমার যে তেমন স্মৃতি ছিল না, তেমন অনুভূতিও নয়, এটা তাঁর জানবার কথা নয়।

ভর্তির দরখাস্তে এবারে লাগবে প্রোভোস্টের সই। তখন নামে যদিও চারটে হল ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে, কার্যত ছিল তিনটে। পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথ হল

অধিকার করে নিয়েছে পূর্ববঙ্গ সরকার। তার মিলনায়তন সংস্কার করে হয়েছে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের সভাকক্ষ এবং তার স্পিকারের অফিস। আবাসিক ভবনদুটির একটিতে হয়েছে কী এক সরকারি অফিস—সম্ভবত পোস্ট মাস্টার জেনারেলের। অন্যটিতে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়েরই রেজিস্ট্রারের অফিস। জগন্নাথ হলের আবাসিক ছাত্রদের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে ঢাকা হলের (এখন শহীদুল্লাহ্ হল) অর্ধেকটা এবং একই প্রোভোস্টের অধীনে একই দপ্তরে চলছে দুই হলের প্রশাসন। মুসলিম ছাত্রদের জন্যে নির্ধারিত সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল ও ফজলুল হক মুসলিম হলে স্থান-সংকুলান হচ্ছে না—সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের পশ্চিমে বেড়ার ব্যারাক করে তৈরি হয়েছে হলের বর্ধিত অংশ, যার অন্য পরিচয় ইকবাল হল বলে (এক সময়ে বখশিবাজারের কাছাকাছি একটি বাড়িতে মেস করে ছাত্রেরা থাকতো এবং তার নাম দিয়েছিল ইকবাল হলের নর্থ ব্লক)। ছাত্রীদের কোনো হল ছিল না। তারা যুক্ত থাকতো বিভিন্ন হলে, অনাবাসিক ছাত্র হিসেবে, আর অল্পসংখ্যক ছাত্রীর আবাসিক ব্যবস্থা ছিল—এখন যেখানে রোকেয়া হল, সেখানে—একটি বাড়িতে। তাকে আমরা জানতাম চামেলি হাউজ বলে : বোধহয় নামটা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদি ছাত্রীনিবাস 'দি চামারি'র বঙ্গীয় সংস্করণ।

আমি যে সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলেরই অনাবাসিক ছাত্র হবো, মনে মনে তা স্থির করে রেখেছিলাম। অতএব প্রোভোস্টের অনুমোদন নিতে সেখানে গেলাম। প্রোভোস্ট ডক্টর মুহম্মদ ওসমান গণি—মৃত্তিকা-বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ও হেড এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর। গিয়ে বুঝলাম, তাঁর দেখা পাওয়ার প্রয়োজন নেই, জো নেই। হলের হেড ক্লার্ক ময়েজউদ্দীন সাহেবের কাছেই অনাবাসিক ছাত্রদের সকল দেন-দরবার করতে হবে। ভর্তি-ফরমটা বোধহয় তাঁর হাতেও দিতে পারিনি, তাঁর অধীন করণিককে দিয়েছিলাম। পরদিন যথারীতি প্রোভোস্টের স্বাক্ষরযুক্ত হয়ে সেটা পাওয়া গেল। তারপর ফিস জমা দেওয়ার তারিখ জানা গেল এবং রেজিস্ট্রারের দপ্তরের দোতলায় হলের-নাম-লেখা নির্ধারিত জায়গায় টাকা-পয়সা দিয়ে এলাম।

ওই হিসেবের মধ্যে এক টাকা রেসিডেন্স ইনসপেকশন ফি ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী তখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রের—অর্থাৎ কার্জন হলের—পাঁচ মাইল ব্যাস-সীমার মধ্যে অনাবাসিক ছাত্রকে বাস করতে হতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মচারী সাইকেলে করে দেখে আসতেন ছাত্রের বাসস্থান স্বাস্থ্যকর কিনা এবং লেখাপড়ার অনুকূল পরিবেশসম্পন্ন কিনা।

তারপর একদিন বিজ্ঞাপিত হলো, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করেছি। তাতেও পালা শেষ হলো না। এবারে দুটি আবশ্যিক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হলো : একটি শরীরচর্চায় সামর্থ্যের এবং অন্যটি শারীরিক সুস্থতার। নির্ধারিত দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে হাজিরা দিলাম। শরীরচর্চার পরিচালক ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান দূরবর্তী দ্বীপের মতো বিরাজ করছেন; ক্ষিতীশদা নামে লম্বা মেদহীন উদ্যমী সহকারী পরিচালক আমাদের দৌড়োতে বললেন, হাই জাম্প ও লং জাম্প দিতে বাধ্য করলেন। এসবে আমার নৈপুণ্য ও আগ্রহ কোনোটাই ছিল না। আমি লক্ষ করলাম,

প্রথমবারে যারা মোটামুটি সফল হচ্ছে, দ্বিতীয়বার তাদের আরেকটু দুরূহ পরীক্ষা দিতে হচ্ছে, সেবারে পারলে তৃতীয়বার। আমি খানিকটা ইচ্ছে করেই দ্বিতীয়বারে ব্যর্থ হলাম। আমার নামের পাশে কী একটা চিহ্ন দিয়ে ক্ষিতীশদা বললেন, তোমাকে নিয়মিত দৌড়ঝাঁপ করতে হবে। মাথা নেড়ে চলে এলাম।

স্বাস্থ্য-পরীক্ষা হলো মেডিক্যাল অফিসারের দপ্তরে। সেখানে বড়ো বড়ো জারে নানা রঙের তরল ওষুধ সাজানো। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচয়-সংবলিত কঙ্কালের একটা বড়ো ছবি। রোগীকে পরীক্ষা করার বেড। মেডিক্যাল অফিসারের দপ্তরের বাকি আসবাবপত্র। তার মধ্যে তিনি নির্লিপ্ত হয়ে বসে আছেন আর তাঁর সহকারী আমার নাড়ি দেখছেন, শরীরের তাপমাত্রা লিখে রাখছেন; চোখের নিচের পাতা টেনে দেখছেন, পেট টিপছেন, হাঁটুর নিচে হাতুড়িমতো কী-একটা দিয়ে আচমকা আঘাত করছেন; স্টেথোস্কোপ কানে লাগিয়ে তার অন্যপ্রান্ত আমার বুকে ঠেকিয়ে আদেশ করছেন শ্বাস বন্ধ রাখতে, স্বাভাবিকভাবে নিতে ও জোরে টানতে; তাঁর কথামতো জিভ বের করলেও তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে কী-একটা যন্ত্র দিয়ে জিভ চেপে ধরছেন; ছোটো টর্চ লাইট দিয়ে কান, নাক ও গলার ভেতরটা দেখছেন; কালো পরদা টেনে দিয়ে দেয়ালে ঝোলানো বর্ণমালা পড়তে বলছেন। এত কিছুর পর আব্বার কাছে একটা পোস্টকার্ড এলো মেডিক্যাল অফিসারের কাছ থেকে : বিশেষজ্ঞ দিয়ে যেন আমার টনসিল পরীক্ষা করানো হয় এবং তাঁর পরামর্শমতো যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বলা বাহুল্য নয় যে, তা করা হয়নি।

২.

প্রফেসর ও হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম এ বি এল (ক্যাল) ডি লিট (প্যারিস), ডিপ্লো ফোন (প্যারিস) ছাড়া তখন বাংলা বিভাগের শিক্ষক ছিলেন পাঁচজন—সবাই লেকচারার : মুহম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান, কাজী দীন মুহম্মদ, মযহারুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। আবদুল হাই এই বিভাগেরই কৃতী ছাত্র, সরকারি কলেজে পড়িয়ে বিভাগে যোগ দিয়েছেন, তারপর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ধ্বনিতত্ত্বে এম এ ডিগ্রি করে সদ্য ফিরেছেন। আলী আহসান এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম এ পাশ করে কলেজে পড়িয়ে এবং কিছুকাল কলকাতা ও ঢাকা বেতারে চাকরি করে বিভাগে যোগ দিয়েছেন। তাঁর নিয়োগ সম্ভবপর হয়েছিল তাঁর সমালোচক-খ্যাতির জন্যে এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার কারণে; তাছাড়া দৃষ্টান্তও ছিল—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহিতলাল মজুমদার বি এ ডিগ্রি নিয়েই সাহিত্যকর্মের জোরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের লেকচারার হয়েছিলেন (বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক এম এ ডিগ্রি দিয়েছিল চারুচন্দ্রকে; শুনেছি, মোহিতলাল তা নিতে অস্বীকার করেছিলেন)। দীন মুহম্মদ ও মযহারুল ইসলামও বিভাগের কৃতী ছাত্র। রবীন্দ্রনারায়ণবাবু, শুনেছিলাম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় ও পালিতে এম এ করেছিলেন। এঁদের বাইরে গবেষণা-সহায়ক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন

আহমদ শরীফ : তিনিও এই বিভাগের ছাত্র, কলেজে ও বেতারে চাকরি করেছিলেন আগে; তাঁর পিতৃব্য আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে যেসব পুঁথি উপহারস্বরূপ দিয়েছিলেন, তার তালিকা প্রণয়ন করা এবং তা থেকে নির্বাচিত কাব্য সম্পাদনা করা ছিল তাঁর দায়িত্ব। বিভাগে একজন সহকারী ছিলেন, তাঁর নাম ভুলে গেছি। পিওন ছিল সাত্তার। ১৯৪০ সালে ফজলুল হক মুসলিম হলের প্রথম প্রোভোস্ট নিযুক্ত হয়ে ড. শহীদুল্লাহ্ তাকে সেখানে নিযুক্ত করেছিলেন, পরে নিয়ে আসেন বাংলা বিভাগে। এমন বিশ্বস্ত, দায়িত্বশীল, সৌজন্যপরায়ণ এবং চোখকান-খোলা মানুষ খুব কম দেখা যায়।

১৯৫৩ সালে প্রথম বর্ষ বাংলা অনার্স ক্লাসে আমরা ভর্তি হয়েছিলাম দশজন : নূর-উল-আলম (এখনকার খবর জানা নেই), এ এস এম জহুরুল হক (কোনো মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির অধ্যাপক, মরহুম), কে এফ এম ওয়াহিদুল্লাহ (পরে সোরবোন থেকে ডি লিট করে পি আই এ-র গ্রাউন্ড ট্রেনিং ইনসটিটিউটে যোগ দিয়েছিলেন, বাংলাদেশ বিমানের গ্রাউন্ড ট্রেনিং স্কুলের প্রধান হিসেবে কর্মরত অবস্থায় মারা যান), মোহাম্মদ সাদেক আলী (সরকারি কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব থেকে অবসর নিয়ে রাজশাহীতে বাস করেন), আইউব আলী (চট্টগ্রামের সিটি কলেজে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করে অকালে মৃত্যুবরণ করেন), খেলাফত হোসেন (এখন কোথায় জানি না), মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ (এখনকার সংবাদ অজ্ঞাত) ও আমি—এই আটজন ছেলে; আর মেয়ে মাত্র দুজন—চেমন আরা (সরকারি কলেজের অধ্যক্ষরূপে অবসর নিয়ে ঢাকায় আছেন) ও শহীদা খাতুন (এখন আর নেই)। কয়েক দিন পরে গুঞ্জন শুনলাম, বাংলা বিভাগে এবারে অনেক ছেলেমেয়ে ভর্তি হয়েছে। কথাটা বোধহয় সত্য, এর আগে দশজন ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে বাংলা অনার্স ক্লাসে প্রবেশ করেনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমাদের ঠিক আগের বছরে ছিলেন দুজন : লুৎফুল হায়দার চৌধুরী আর সাবেরা খাতুন শামসুন আরা। তাঁদের মহা সুবিধে ছিল এই যে, একজন কোনো কারণে ক্লাস করতে পারবেন না জানলে তিনি অপরজনকেও আসতে বারণ করতে পারতেন এবং দুজনে মিলে শিক্ষককে বলে আসতে পারতেন যে, তারও কষ্ট করে আসার দরকার নেই। চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ ও সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে অনার্সের ছাত্রেরা তখন তৃতীয় বর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পড়তো। কিন্তু তাতেও ছাত্রসংখ্যা নগণ্যই রয়ে যেতো।

আমি ভর্তি হলাম বাংলায়; বন্ধুদের মধ্যে আমীর আলী, নাজিম মাহমুদ ও আলী আনোয়ার গেল ইংরেজিতে; রহিম ইতিহাসে; মোহাম্মদ আলী ও রশীদুজ্জামান রাষ্ট্রবিজ্ঞানে; আলী আশরাফ দর্শনে। আহ্মদ গেল বি এ পাস কোর্সে পড়তে—যেহেতু সে আইন পড়বে শেষ পর্যন্ত, সুতরাং অনার্স পড়বার কষ্ট স্বীকার করতে চায় না। পরীক্ষায় অকৃতকার্য বন্ধুরা পরেরবারের জন্যে তৈরি হতে থাকলো। তবে তাতে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ায় কোনো বাধা ছিল না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে শিক্ষকেরা ছাত্রীদের কমনরুম থেকে মেয়েদের সঙ্গে করে ক্লাসে নিয়ে আসতেন এবং ক্লাসশেষে আবার তাদের সেখানে পৌঁছে দিতেন। আমাদের সময়ে আর সে-নিয়ম ছিল না, তবে ছাত্রীরা যথাসময়ে এসে করিডোরে

দাঁড়িয়ে থাকতো, ক্লাসঘরে শিক্ষক প্রবেশ করার পরেই তারা সেখানে ঢুকতো এবং তাদের জন্য সামনের সারিতে একটা বেঞ্চি খালি রাখা হতো। এক সময়ে সুনির্দিষ্ট কারণ দেখিয়ে আবেদন করে প্রক্টরের উপস্থিতিতেই কেবল ছেলেমেয়ের মধ্যে বাক্যালাপ হতে পারতো। সে-নিয়ম ফাঁকি দেওয়ার জন্যেই হয়তো, দেখতে পেতাম, কোনো ছাত্রী একটু আগে এবং একটু পেছনে কোনো ছাত্র হাঁটতে হাঁটতে জীবনের লেনদেন করছেন। ছাত্রীদের কমনরুমকে কেন্দ্র করে একটি সংসদ কাজ করতো শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে। সেই সংসদের কাজে আলী আহ্সান সাহেব আমাকে একবার পাঠিয়েছিলেন (পরে ডক্টর) হালিমা খাতুনের কাছে। পাঠাবার আগে বিভাগের ছাপ-দেওয়া কাগজে লিখে দিয়েছিলেন, কেন আমায় পাঠাচ্ছেন তা ব্যাখ্যা করে। সে-কাগজ কমনরুমের পিওনকে হস্তান্তর করতে হয়েছিল। মেয়েদের আপনি বলাই রীতি ছিল, এর ব্যত্যয় হলে মনে করা হতো ধোঁয়ার পেছনে আগুন আছে। সে-আগুন কখনো কখনো স্পষ্টই দেখা যেতো। কয়েক জোড়া ছাত্রছাত্রীর সম্পর্ক সকলের গোচরে ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকও এক ছাত্রীর সঙ্গে কলাভবনের সীমানার মধ্যে অনেক হাঁটাহাঁটি করতেন। তাঁর এবং আরো অনেকের প্রয়াস সফল হয়েছিল। এই পরিস্থিতির একটা কৌতুককর দিকও ছিল। আমাদের এক সহপাঠীর কাছে সময় জানতে চেয়েছিল একটি মেয়ে। তাতেই সহপাঠী কেমন ঘোরের মধ্যে পড়ে গেল—রাফ খাতার অর্ধেকটা জুড়ে তার বিবৃতি আর জিজ্ঞাসা : পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে মেয়েটি কটা বাজে জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘড়ির কি অভাব আছে, করিডোরেই তো মস্ত বড়ো ঘড়িটা ঝুলছে; তাছাড়া প্রশ্নটা তাকেই করা কেন; তার কণ্ঠের সুরে কি শুধু সময় জানার ব্যগ্রতা ছিল না আরো কিছু। অন্য বিভাগের এক সহপাঠী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছিল শেরওয়ানি-পায়জামা ও কিঞ্চিৎ দাড়ি নিয়ে। এক দীর্ঘ অবকাশের পর তাকে দেখা গেল শ্মশ্রুহীন এবং শার্ট-ট্রাউজার জুতো-মোজায় সুশোভিত। শোনা গেল, কোনো সহপাঠিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টায় তার এই রূপান্তর।

ছেলেদের মধ্যেও পরস্পরকে আপনি বলাই ছিল রীতি—এরও ব্যতিক্রম ছিল। শিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ ছাত্রছাত্রীদের আপনি বলে সম্বোধন করতেন—তবে বেশিরভাগ শিক্ষকই ছেলেমেয়েদের তুমি বলতেন।

আমরা যখন প্রথম বর্ষে ঢুকলাম, তখন কিছুদিন তৃতীয় বর্ষের সঙ্গে একত্র ক্লাস করতে হয়েছিল। তৃতীয় বর্ষে তখন ছিলেন সন্‌জীদা খাতুন, আলী আসগর ভূঁইয়া এবং চৌধুরী লুৎফর রহমান—এককালে লেখক-খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। একসঙ্গে ক্লাস করলেও এঁদের সঙ্গে পূর্বগামী-উত্তরগামীর ব্যবধানটা রয়ে গিয়েছিল। তবে আমাদের সর্দার পোড়ো ছিলেন এম এ প্রথম পর্বের মুজিবুর রহমান খান (রেডিও পাকিস্তান থেকে খবর পড়ে 'পাঠক' মুজিবুর রহমান বলে সর্বত্র পরিচিত হয়েছিলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেওয়ার পরে ইন্তেকাল করেন)। তিনি তখন ঢাকা বেতারে চাকরি করতেন স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে, বেতারে ছাড়াও রঙ্গমঞ্চে চমৎকার অভিনয় ও আবৃত্তি করতেন। বি এ পাশ করার বেশ কিছুকাল পরে হয়তো এম এ পড়তে এসেছিলেন—সকলের মধ্যেই বয়সে একটু বড়ো ছিলেন। তাঁর

মজলিসি স্বভাব যেমন আমাদের আনন্দ দিতো, তেমনি তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আমাদের বিস্মিত ও মুগ্ধ করতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মভঙ্গের দায়ে একবার পড়তে হয়েছিল আমাকে, তিনিও অভিযুক্ত হয়েছিলেন।

আমাদের আড্ডার প্রকৃষ্ট স্থান ছিল মধুর দোকান। মধু তখনো মধুদা হয় নি এবং তারও দোকানও ঠিক ক্যান্টিন বসে পরিচয়লাভ করেনি। বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিকথায় আদিত্যর কথা আছে, তার চা-খানা ছিল কলাভবনের বাইরে। পুত্র মধু সেটা কলাভবনের চত্বরে স্থানান্তরিত করতে সমর্থ হয়েছিল। তার দোকানটা শ্রীহীনই বলা যেতে পারে—লম্বা লম্বা টেবিল-বেঞ্চ, মলিন কাপ-প্লেট, খাওয়ার আয়োজনও এমন কিছু নয়। কিন্তু তার আকর্ষণ মোহনীয়, সময়ে-অসময়ে সেখানে না গেলে, মনে হয়, দিনটা বৃথা গেল। ছাত্রীরাও দু-এক সময়ে দল বেঁধে সেখানে এসে বসতো, তাতে এমন-কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হতো না। মধু বলতো, তার ওখানে না-খেয়ে কেউ পরীক্ষায় ভালো করেনি কিংবা বড়ো চাকরি পায় নি। আসলেই মধুর দোকান একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। সন্ধ্যাবেলায় মধু বসতো বাকির খাতা নিয়ে, জানতে চাইতো কে কে এসেছিল। তারপর নিজেই লিখে রাখতো : হাসান সাহেব? দেড় টাকা; তাহা সাহেব? এক টাকা বারো আনা। এভাবে কর ধার্য করার অর্থনীতি জানতে চাইলে মধু বলতো : 'কখনো বেশি লেখি, কখনো কম লেখি; মোটের ওপর পুষাইয়া যায়—আমরাও আপনেগোও।' আমি কখনো তার বাকির খাতায় নাম লেখাইনি, তবে যারা লিখেয়েছিল, তারা বলতো, মধুর ঋণ অপরিশোধ্য—ছাত্রজীবন শেষ করে কর্মজীবনেও তা তাড়া করতো। মধু কী করে যেন মেধাবি ও প্রতিবানদের চিনে নিতো—তাদের প্রতি ছিল তার বিশেষ দরদ। তবে সাধারণভাবেই ছাত্রদের সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো।

এই মধুর দোকানে বসে কথাপ্রসঙ্গে কে যেন সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মবার্ষিক পালনের প্রস্তাব করলো। তা-ই ঠিক হলো। ডাকসুর কমনরুমের একদিকে টেবিল টেনিস খেলা চলছে, অন্যদিকে অল্প কজন নিয়ে আমাদের সভা। মুজিবুর রহমান খান সভাপতি, আমি প্রবন্ধ-পাঠক, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (তখন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র) আলোচক। কে যেন আবার শখ করে সভা-অনুষ্ঠানের খবর কাগজে ছাপিয়ে দিল। কদিন পরে প্রোভোস্টের উর্দিপরা চাপরাশি বাড়ি বয়ে এসে আমার নামে এক বন্ধখাম দিয়ে গেল। খুলে দেখি, প্রোভোস্ট লিখেছেন, প্রক্টরিয়াল রুলস ভঙ্গ করার অভিযোগ এসেছে আমার বিরুদ্ধে; শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না কেন, তার কারণ দর্শাতে নির্ধারিত দিনক্ষণে প্রক্টরের কাছে হাজির হতে হবে। আমি তো ভয়ে অস্থির—বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন বোধহয় এখানেই ভঙ্গ হলো।

পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে জানলাম, মুজিব ভাই ও বোরহান উভয়েই অনুরূপ চিঠি পেয়েছেন। তাতে আশঙ্কা দূর হলো না। মুজিব ভাই অবশ্য ভরসা দিলেন, ভয় নাই, ওরে ভয় নাই। তিনি প্রক্টরের বাড়ির চারপাশে দুদিন ঘোরাঘুরি করলেন; আমাদের বলে দিলেন, যা বলার তিনিই বলবেন, পারতপক্ষে আমরা যেন মুখ না খুলি।

অর্থনীতি বিভাগের রিডার ডক্টর মজহারুল হক প্রক্টর—খুব কড়া মানুষ বলে

পরিচিত। সামনে যেতে তিনি বসতে বললেন। মুজিব ভাই তাঁর অসুস্থ পুত্রের সংবাদ জানতে চাইলেন এবং বেশ কিছুক্ষণ অসুখবিসুখ-প্রসঙ্গে নানামত জাহির করে আশা প্রকাশ করলেন যে, সারের ছেলে ভালো হয়ে উঠবে। তাঁর কথা শেষ হলে প্রক্টর বললেন, ও-বিষয়ে আলোচনার জন্যে আমাদের তলব করা হয়নি; বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ভেঙে, প্রক্টরের অনুমতি-ব্যতিরেকে, আমরা যে সভা করলাম, সে-সম্পর্কে আত্মপক্ষ সমর্থনে আমাদের কী বলবার আছে? মুজিব ভাইকে বললেন, 'তুমি তো সভাপতি ছিলে, আগে তুমি বলো।' মুজিব ভাই বললেন, 'সভাপতি আর কী সার্, বাচ্চারা যেমন রাজা-রাজা খেলে, ওরকম। সেখানে একটাই ভাঙা চেয়ার ছিল—আমি বয়োজ্যেষ্ঠ দেখে আমাকেই তাতে বসিয়ে ওরা বললো, আপনি সভাপতি।' প্রক্টর বললেন, 'দেখো, আমি বিলেতে দেখে এলাম, স্টুডেন্টস ইউনিয়ন নানারকম সভা-সমিতি করে, তাদের সে এখতিয়ার আছে। আর তোমরা নিজে থেকে— ।' মুজিব ভাই কথাটা লুফে নিলেন, 'আমরাও, সার্, আশা করছিলাম, বিলিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওসব নিয়মকানুন আপনি এখানে চালু করবেন। আমাদের তো ইউনিয়ন নেই—' (তখন কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদ ছিল না)। প্রক্টর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি তো প্রবন্ধ পড়েছ। ফার্স্ট ইয়ারে এসেই নিয়ম ভাঙা শুরু করেছ, পরে কী করবে?' মুজিব ভাই মাঝে ঢুকে পড়লেন, 'দোষ দিলে আমাকেই দিন সার্, ও নতুন ভর্তি হয়েছে, ইউনিভার্সিটির নিয়মকানুন সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ।' এবার বোরহানকে ভর্ৎসনা করলেন ড. হক। আমাদের পারিবারিক পরিচয় নিয়ে বললেন, বোরহানের ও আমার আব্বাকে তিনি চেনেন, আমাদের কাছ থেকে এ রকমটা তিনি আশা করেননি। মুজিব ভাই আবেদন করলেন, 'বয়সের দোষে একটা অবিবেচকের কাজ করে ফেলেছে—ওদের ছেড়ে দিন, সার্। শাস্তি দিতে হলে আমাকেই দিন। তবে একটি কথা বলবো, সার্, ব্রিটিশ ইউনিভার্সিটির ডিসিপ্লিন যদি আমাদের এখানে এনফোর্স করা যায়, তবে এরকম আর হবে না। আর সেটা শুধু আপনিই পারেন করতে, এ কথা আমি জোরগলায় বলবো।' প্রক্টর বললেন, 'ভবিষ্যতে আর এমন করবে না।'

আমরা ছাড়া পেলাম।

৩.

আই এ পরীক্ষা দিয়ে যখন ফলাফলের অপেক্ষায় বসে ছিলাম, তখন সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা আমার মনকে খুব আলোড়িত করেছিল। কোথায় এর শিকড়, কীভাবে এর বৃদ্ধি, কেমন তার প্রকাশ—এসব বিষয়ে জানবার চেষ্টা করছিলাম। সেইসঙ্গে ইচ্ছে হলো, বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টা একটু অনুসন্ধান করে দেখতে। বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠের* কথা মনে পড়লো এ-প্রসঙ্গে। কী না অসাধারণ গুরুত্ব পেয়েছে এ উপন্যাস! এক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ একে দেখেছে প্রধানত ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী সংগ্রামের প্রেরণাস্বরূপ, অন্য সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ লোক একে দেখেছে মূলত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশরূপে: 'বন্দেমাতরম্'

গীতটি স্বাদেশিকতার মন্ত্ররূপে একদিকে নন্দিত, অন্যদিকে পৌত্তলিকতার বাণীরূপ বলে প্রত্যাখ্যাত; এক সমাজে *আনন্দমঠের* বহ্ন্যুৎসব হয়েছে, তার প্রবল প্রতিক্রিয়া ঘটেছে অন্য সমাজে।

শেষ পর্যন্ত, বেশ সময় নিয়ে, 'আনন্দমঠ ও বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' নামে দীর্ঘ এক প্রবন্ধ লিখে ফেললাম। হাসান হাফিজুর রহমান বললেন, পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের একটা বিশেষ অধিবেশন ডেকে শুধু এই প্রবন্ধটি পড়া হোক। ততদিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গেছি। প্রবন্ধের একটা কপি সৈয়দ আলী আহসানের হাতে তুলে দিয়ে হাসান তাঁকে অনুরোধ জানালেন সভায় আলোচনা করতে, আরো দু-একজনকেও একই কথা বললেন। আলী আহসান আমাকে একদিন বললেন তাঁর গোপীবাগের বাসায় যেতে। সেখানে যাওয়ার পরে তিনি বলেছিলেন, *আনন্দমঠ* যে দুই সম্প্রদায়ে দুভাবে গৃহীত, এই বাস্তবতা ভুলে গেলে চলবে না। আমি লিখেছিলাম, 'বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের ঐতিহ্য।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, একজন ব্যক্তি কী করে ঐতিহ্য হয়? আমি বলেছিলাম, 'যে-অর্থে আমরা বলি শেক্সপিয়র পড়েছি।' আমার লেখা সম্পর্কে তাঁর আরো কয়েকটি আপত্তির কথা বলে তিনি জানতে চাইলেন, অরবিন্দ পোদ্দারের সদ্যপ্রকাশিত *বঙ্কিম-মানস* পড়েছি কিনা। বইটি আমি দেখিনি বলায় তিনি বললেন, 'যে-মার্কসবাদী সমালোচনার চেষ্টা তুমি করেছ, সেটা ও-বইতে করা হয়ে গেছে, তবে স্বভাবতই সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে গভীর আলোচনা সেখানে প্রত্যাশিত নয়।' তিনি যে সাহিত্য সংসদে আমার প্রবন্ধের আলোচনা করতে যাবেন না, আমাকে তা বলে দিলেন এবং সেদিন কিংবা তার কয়েকদিন পরে আমাকে *বঙ্কিম-মানস* পড়তে দিলেন।

এদিকে আমন্ত্রণলিপি বিলি হয়ে গেল; সংবাদপত্রে একটু ভালো করেই সভার বিজ্ঞপ্তি বের হলো। নির্দিষ্ট দিনে বহুজনে সভায় এলেন—সচরাচর যাঁরা সংসদের সভায় আসেন না, এমন শ্রোতাও। প্রবন্ধ পড়লাম, কিছু আলোচনাও হলো। সবচেয়ে উত্তেজিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন। আমার লেখায় ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষ সম্পর্কে কার্ল মার্কসের পর্যবেক্ষণের উদ্‌ধৃতি ছিল। মনসুরউদ্দীন সাহেব প্রথমে জানতে চাইলেন, বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় মার্কসের উদ্‌ধৃতি কেন এবং উপসংহারে বললেন, আমাকে পাকিস্তান থেকে অবিলম্বে বের করে দেওয়া উচিত।

আমার পক্ষসমর্থনে অপ্রত্যাশিতভাবে এগিয়ে এলেন ঢাকা কলেজে মনসুরউদ্দীন সাহেবের কনিষ্ঠ সহকর্মী হেশামউদ্দীন আহমদ। পরে জেনেছিলাম, ছাত্রজীবনে বামপন্থার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল এবং কর্মজীবনে রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না রেখেও আত্মগোপনকারী রাজনৈতিক নেতাদের কোনো না কোনোভাবে তিনি সাহায্য করতেন। তিনি বললেন, মার্কসের যেসব কথা প্রবন্ধে উদ্‌ধৃত হয়েছে, তা সাহিত্য-সম্পর্কিত নয়, ভারতের তৎকালীন সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের একজন ছাত্র যে মার্কসের লেখা পড়েছে এবং তার বক্তব্যের সঙ্গে যে সে-লেখার যোগসাধন করতে সমর্থ হয়েছে, তাতে তিনি সন্তুষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে রায় দেওয়ার আগে তাঁর রচনা পাঠ ও বিশ্লেষণের যে-চেষ্টা এই প্রবন্ধে আছে, তাকে তিনি স্বাগত জানাচ্ছেন।

পরে *বঙ্কিম-মানস* পড়ে উপকৃত হয়েছিলাম; নিজের লেখাটিও আদ্যোপান্ত পরিমার্জিত করেছিলাম। সেটা চেয়ে নিয়ে শহীদ সাবের ছাপিয়েছিলেন *সংবাদের* ঈদ সংখ্যায়, ১৯৫৫ সালে। সে-সংখ্যাটি ডবল ক্রাউন আকারের হৃষ্টপুষ্ট বই হয়ে বেরিয়েছিল। তাতেই মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। শহীদ সাবের উদ্‌যোগ না নিলে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হতো কিনা সন্দেহ, কেননা ও-বিষয়ে অত বড়ো লেখা ছাপাবার জায়গা সত্যিই ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে প্রবন্ধটা সাহিত্য সংসদে পড়ার পরে আমি চাইলাম, উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানদের লেখায় ফুটে-ওঠা সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যের দিকটায় চোখ দিতে। এবারে লেখা হলো আরেকটি বড়ো প্রবন্ধ যত না সাহিত্য নিয়ে, তার চেয়ে বেশি সে-সময়কার সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পটভূমি নিয়ে। এ-প্রবন্ধ শেষ হতে হতে আমি দ্বিতীয় বর্ষে উঠে গেছি।

৪.

আমাদের সময়ে, অন্তত কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে, শিক্ষকদের নামের শেষে সার্ জুড়ে দিয়ে তাঁদের উল্লেখ করার রীতি ছিল না। সামনে তাঁদের সার্ বলতাম বটে (মহিলা খুব কমই ছিলেন শিক্ষকদের মধ্যে—খুব আড়ষ্টভাবে তাঁদের ম্যাডাম বলা হতো), তবে তাঁদের নামের পরে সাহেব বা বাবু যোগ করে (অথবা পুরো নাম ধরে) আড়ালে তাঁদের নির্দেশ করতাম। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের কাছে গিয়ে যেমন হাই সাহেবের উল্লেখ করতে বাধতো না, তেমনি হাই সাহেবের সামনে শহীদুল্লাহ্ সাহেব বা ডক্টর শহীদুল্লাহ (এমনি করে, মিস অ্যালসপ, ডক্টর ফাতেমা সাদেক) বলতে পারতাম অনায়াসে।

শহীদুল্লাহ সাহেব ও শরীফ সাহেব ছাড়া বিভাগের আর সকল শিক্ষকই আমাদের পড়িয়েছিলেন প্রথম বর্ষে। প্রত্যেক শিক্ষকের সঙ্গে বেশ একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল—বিশেষ করে কাজী দীন মুহম্মদের সঙ্গে—উনি আমাদের টিউটোরিয়াল করাতেন। আলী আহসান সাহেবকে যদিও আগে চিনতাম, তাঁর বক্তৃতার মনোমুগ্ধকর ভঙ্গির পরিচয় নতুন পেলাম তাঁর ক্লাসে। রবীন্দ্রনারায়ণবাবু আমাদের পড়াতেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ*। তিনি মূল বই থেকে পড়ে শোনাতেন আর খুব আক্ষরিক ব্যাখ্যা দিতেন (*বনফুল* মানে বনে যে-ফুল ফুটেছে, *নীলদর্পণ* অর্থাৎ নীলসংক্রান্ত বিষয়ের দর্পণ)। ক্লাসের প্রায় সকলে আমাকে পাকড়াও করলো, তাঁকে বলতে হবে, কেবল রিডিং যেন না পড়েন। বাধ্য হয়ে একদিন একান্তে তাঁকে বললাম, 'সার্, *নীলদর্পণ* আমরা সকলে পড়ে নিয়েছি, ওটা লাইন ধরে না পড়ালেও চলবে; আপনি যদি সমালোচনার ওপরে জোর দেন, আমরা বেশি উপকৃত হবো।' তিনি এতে বিচলিত হলেন বটে, কিন্তু রাগ করলেন না; বললেন, তাই হবে। কিন্তু তারপরও আমরা উপলব্ধি করলাম যে, তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশিত মানের আলোচনা পাচ্ছি না।

ইতিহাসে আমাদের পাঠ্য ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন এবং মধ্য ও আধুনিক

যুগ), ব্রিটেনের ইতিহাস (তার বিকল্পে ইসলামের ইতিহাস) এবং আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পড়াতেন আবদুল করিম (পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলর)—তাঁর ক্লাস আমরা খুব উপভোগ করতাম। ব্রিটিশ হিস্ট্রি একদিন পড়িয়ে বিলেতে চলে গেলেন আবু ইমাম (পরে রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)—সে-জায়গায় এলেন এ এফ এম সাঈদ (অর্থনীতিবিদ এ এন এম মাহমুদ বা আবু মাহমুদের অগ্রজ) : কথার সঙ্গে মিলিয়ে তিনি যেমন অঙ্গভঙ্গি করতেন, তাতে আমরা খুব মজা পেতাম।

ইংরেজি সাহিত্য পড়াতেন বি সি (ভবানীচরণ) রায় (তিনি জগন্নাথ কলেজ থেকে এসে খণ্ডকাল পড়াতেন, পরে সার্বক্ষণিক হয়েছিলেন) ও আর এ গোমেজ। ভবানীবাবু দুর্দান্ত ছাত্র ছিলেন, কিন্তু তাঁর কাছে *এ মিডসামার নাইটস ড্রিম* পড়ে আমরা যত শব্দার্থ শিখেছিলাম, শেক্সপিয়র পড়ার আনন্দ অতটা পাইনি।

তখন বি এ অনার্সের সকল ছাত্রকে এক পত্র ইংরেজি পড়তে হতো, তাকে বলা হতো জেনারেল ইংলিশ। প্রথম বর্ষের শেষে যে-বার্ষিক পরীক্ষা হতো, তাতে অনার্সের বিষয়ে এক পত্রের সঙ্গে এই ইংরেজি এক পত্রেও পাশ করতে হতো; তারপর সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার সময়ে আবার সে-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হতো। প্রথম বর্ষে আমাদের জেনারেল ইংলিশ পড়িয়েছিলেন সৈয়দ আলী আশরাফ। তিনি সদ্য কেমব্রিজ-ফেরত, ইংরেজি উচ্চারণ সম্পর্কে অতিশয় সজাগ, ড্যানিয়েল জোনসের *ইংলিশ প্রোনাউনসিং ডিকশনারি* ছিল প্রায় তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী (শুনেছি, সহকর্মীদের ইংরেজি উচ্চারণ-সংশোধনের স্পৃহাও তিনি দমন করতে পারতেন না)। তিনি ইংরেজি ডিকটেশন দিতেন, আমরা তাঁর উচ্চারণ ঠিকমতো অনুসরণ করতে পারতাম না; ক্লাসের শেষে অনেকে মিলে নিজেদের লেখা মিলিয়ে তাঁর কথা উদ্ধারের চেষ্টা করতাম। তিনি হোম টাস্ক দিতেন এবং যত্ন করে তা সংশোধন করতেন; তবে সবার সামনে যে খাতা ধরে আমাদের ভুলগুলো আলোচনা করতেন, তাতে আমরা লাভবান হলেও খুব লজ্জা পেতাম।

তবু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার শিহরণ আমরা অনুভব করতাম ঠিকই। আমাদের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে একেক লেখকের জগৎ, ইতিহাসের একেক অধ্যায়। লাইব্রেরিতে বসে নামজাদা সমালোচকের বই পড়ছি—অন্যথা যা পড়া হতো না। সেইসঙ্গে সেখানে পাচ্ছি পুরোনো সব পত্রিকা—*পরিচয়*, *চতুরঙ্গ*, এমনকি *সবুজপত্র*ও। আমার উৎসাহ দেখে রিডিং রুম সুপারিনটেনডেন্ট আবু যোহা নূর আহমদ–তিনি নিজেও লেখক ছিলেন—একদিন আমাকে নিয়ে গেলেন লাইব্রেরির ভেতরে, স্ট্যাকে। কতো মাপের কতো ধরনের বই, পুরোনোগুলো কী সুন্দর করে বাঁধানো। শেলফে তার সারি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, পাতা খুললে কেমন একটা সৌরভ পাওয়া যায়। কোনো কোনো বইতে লেখকের স্বাক্ষর দেখা যায়, অনেক বইতে বিক্রেতার দোকানের সিল, সব বইতেই লাইব্রেরিতে তা সংগ্রহের তারিখ—শুধু সেদিকে চেয়ে থাকতেও ভালো লাগে।

৫.

১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ছাত্রদের (কলেজের নয়) বি এ পাস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলো শেষবারের মতো। বোধহয় অনার্সের ক্রমবর্ধমান ছাত্রদের স্থান-সংকুলান করার জন্যে পাস কোর্স তুলে দেওয়া হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে—বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কলেজের অসম প্রতিযোগিতা দূর করাও হলো তাতে। এই শেষবারে পাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রফিকুল (তখন রাফিকুল) ইসলাম বাংলায় এম এ ক্লাসে প্রথম পর্বে ভর্তি হলেন। তাঁকে চিনতাম আগে থেকেই—ফজলুল হক মুসলিম হলের উলটোদিকে রেলওয়ের এক বাংলোয় তাঁরা থাকতেন, বাড়ি জুড়ে ছিল একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। রফিকুল ইসলাম এসরাজ বাজাতেন, আর তাঁর নেশা ছিল ছবি তোলায়; তাঁর কনিষ্ঠ আতিকুল ইসলাম ভালো রবীন্দ্র-সংগীত গাইতেন, নিজের পোশাক-আশাকের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখতেন।

রফিকুল ইসলাম বিভাগে ভর্তি হওয়ায় মুজিবুর রহমান খান, তিনি ও আমি মিলে ছাত্রদের মধ্যে একটা মোড়ল-বৃত্ত রচিত হলো। প্রায় সব বিষয়েই আমাদের মাতব্বরি। আমাদের দাবিতে এবং শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রশ্রয়ে বিভাগে সেমিনার বা পাঠকক্ষ—ডক্টর মজহারুল হকের বাঁকা কথায় 'মিক্সড কমনরুম'—চালু হলো। এখানে সব প্রয়োজনীয় পাঠ্যবই এনে ফেলায় তার অপেক্ষায় লাইব্রেরিতে দাঁড়িয়ে থাকার সময় অনেকখানি বেঁচে গেল—অনেকখানি এজন্যে যে, তারপরও লাইব্রেরিতে যাওয়ার প্রয়োজন রয়ে গেল। আমরাই পালা করে সেমিনারে ডিউটি দিতাম। তারপর বার্ষিক বনভোজনের চাঁদা তোলা, তার জায়গা ঠিক করা, খাদ্যসম্ভার এবং হাঁড়িকুড়ি-জ্বালানি-বাবুর্চি সংগ্রহ করার নেতৃত্ব আমাদের, ফিরে এসে আয়-ব্যয়ের হিসাব নোটিস-বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়াও ছিল আমাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। প্রথমবারে আমরা গিয়েছিলাম জয়দেবপুরে। শহীদুল্লাহ্ সাহেব চাদর বিছিয়ে বসে হাই সাহেবের সঙ্গে গল্প করছিলেন আর একটু বেলা হলে খাবারের কী অবস্থা, তার খোঁজ করছিলেন। বাবুর্চির কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করছিলেন আলী আহসান সাহেব ও দীন মুহম্মদ সাহেব—রন্ধনকর্মে এঁরা উভয়েই পারদর্শী ছিলেন। ছেলেমেয়েরা কেউ কেউ আয়োজনে সাহায্য করছিল, বেশিরভাগই এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তাদের ওপর দূর থেকেই একরকম চোখ রাখছিলেন হাই সাহেব। অন্যবিভাগের যেসব ছাত্রছাত্রী বাংলা সাবসিডিয়ারি পড়তো, তারাও কেউ কেউ গিয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক নাট্যকার নূরুল মোমেন, জগন্নাথ কলেজের শিক্ষক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী এবং টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক আ ন ম বজলুর রশীদ গিয়েছিলেন অতিথি হয়ে। লতিফা রশীদ-আ ন ম বজলুর রশীদ—এই ভাইবোনের নেতৃত্বে চমৎকার একটা গানের আসর বসেছিল। সেই দিনটা আমরা সকলেই প্রাণ ভরে উপভোগ করেছিলাম।

আলী আহসান সাহেবের সক্রিয় সহযোগিতায় বিভাগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একটা গতি এসেছিল। আমাদের প্রথম বর্ষের পালা যখন শেষ হয়ে আসছে, তখন একটা অনুষ্ঠান করা গেল। তার মুখ্য আকর্ষণ ছিল বনফুলের 'কবয়ঃ' একাঙ্কিকা এবং মধুসূদনের *মেঘনাদবধ কাব্যের* প্রথম সর্গের অভিনয়। প্রথমটিতে মুজিবুর রহমান খান হয়েছিলেন লেখক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স ও বাংলা সাবসিডিয়ারি ক্লাসের ছাত্রী

জহরত আরা চন্দ্রমুখী। দ্বিতীয়টিতে মুজিবুর রহমান খান রাবণ, রফিকুল ইসলাম ভগ্নদূত বা সারণ এবং সাবেরা খাতুন চিত্রাঙ্গদা। তাছাড়া আবৃত্তি ও গানও হয়েছিল। উইংসে অপেক্ষমাণ প্রথম পর্বের একজন ছাত্রকে দেখিয়ে আলী আহসান আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ও ওখানে কী করছে?' বললাম, 'গান গাইবার অপেক্ষায় আছেন।' দৃষ্টিতে একটু কঠোরতা এনে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'গান? ও কী গান গাইবে?' বললাম, 'পল্লীগীতি।' এবার সুর নরম হলো : 'তাই বলো।' এতে অবশ্য পল্লীগীতির প্রতি সুবিচার করা হয়নি, হয়তো সেই শিল্পীযশোলিপ্সুর প্রতিও নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের একটা বড়ো ক্ষেত্র ছিল সংস্কৃতি সংসদ। তখনো আমাদের কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদ ছিল না, অবশ্য হল ইউনিয়ন ছিল—তাদের উদ্যোগে নাট্যাভিনয় ও সঙ্গীতানুষ্ঠান, বিতর্ক-সভা ও সাহিত্য-প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং বার্ষিকীর প্রকাশ ঘটতো। দল-মত-হল-নির্বিশেষে সকল ছাত্রের নিজস্ব তবে বিশ্ববিদ্যালয়-অনুমোদিত সাংস্কৃতিক সংগঠন ছিল সংস্কৃতি সংসদ। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক খান সারওয়ার মুরশিদ। আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করি, তখন এর সভাপতি ছিলেন ইংরেজি বিভাগের এম এ শেষ বর্ষের ছাত্র আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (কবি; পরে সচিব, মন্ত্রী ও রাষ্ট্রদূত)—তিনি সম্ভবত দু বছর ওই পদে ছিলেন। সকল ছাত্রের সংগঠন হলেও সংস্কৃতি-সংসদে প্রাধান্য ছিল বামপন্থী ছাত্রদের—এর কাজকর্মেও তা প্রকাশ পেতো।

আমরা প্রথম বর্ষে থাকতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (আগে নাম ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, তবে ১৯৪৮ সাল থেকে পাঁচ বছর কোনো সংসদ ছিল না) গঠনতন্ত্র সিন্ডিকেটের অনুমোদন লাভ করে। এতে ছাত্রের বদলে ভাইস-চান্সেলর পদাধিকারবলে সভাপতি থাকবেন বলে বিধান করা হয়। হল-সংসদ নির্বাচনের সময়ে প্রতি হল থেকে চারজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে কেন্দ্রীয় সংসদে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আবার কর্মকর্তা নির্বাচন করবেন। সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে হলের ভিত্তিতে ঘুরবে। সেবারে সহ-সভাপতির পদ পড়েছিল সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভাগে। তাতে হল-সংসদের নির্বাচন কিছু অতিরিক্ত গুরুত্ব লাভ করেছিল।

সে-বছরে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ মিলিতভাবে প্যানেল দিয়েছিল—বোধহয় সেই প্রথম। তবে ছাত্র-সংগঠনের নামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো না, নির্বাচনের জন্যে প্যানেলের একটা দলনিরপেক্ষ নাম (যেমন, 'অভিযাত্রী') থাকতো। প্রার্থী বাছাই করতো পার্লামেন্টারি বোর্ড—তার কাজ ছিল ভালো ছাত্রদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া এবং বিভিন্ন জেলার ছাত্রদের থেকে প্রার্থী বাছাইয়ের ব্যাপারে ভারসাম্য রক্ষা করা। প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল ভোটারদের কাছে বড়ো বিবেচ্য। তাদের পরিচয় দেওয়ার এবং দলের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি ব্যাখ্যা করার জন্যে হলে এবং কলাভবনের আমতলায় সভা হতো। তাছাড়া শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে ক্লাসে ঢুকেও প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হতো; কোনো কোনো শিক্ষক অনুমতি দিতেন না, তবে অধিকাংশই দিতেন—যদিও পাঁচ-সাত মিনিটের বেশি সময় বরাদ্দ করতেন না। সেবার আমাদের প্যানেলের পক্ষে মুখ্য বক্তা ছিলেন আজিজুল জলিল (বিশ্বব্যাংক থেকে অবসরপ্রাপ্ত),

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ও আবুল মাল আবদুল মুহিত (উত্তরজীবনে সচিব, মন্ত্রী ও গ্রন্থকার)। বিপক্ষ দলের প্রধান বক্তা ছিলেন সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ (ব্যারিস্টার), মোস্তফা কামাল (সাবেক প্রধান বিচারপতি) ও ইবরাহিম মোহাম্মদ তাহা (মরহুম)। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেলের পক্ষে একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন আমার সহপাঠী চেমন আরা। যার যার প্যানেলের পক্ষে প্রচার চালিয়ে আমরা এক রিকশায় বাড়ি ফিরেছি—তিনি বনগ্রামে, আমি ঠাটারিবাজারে। আজকের দিনে এমন ঘটনা ভাবাই দুঃসাধ্য।

নির্বাচনের শেষে হলের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী সহ-সভাপতি পদপ্রার্থীরা দলীয় ব্যাজ ছিঁড়ে ফেলে সহমর্মিতা ও একাত্মতা জ্ঞাপন করে বক্তৃতা দিতেন। ফল বেরোবার পরে হলের প্রাঙ্গণে বস্ত্যুৎসব করে বিজয়োৎসব পালিত হতো। তবে দুই দলে রেশারেশি যে একেবারে শেষ হয়ে যেতো, তা বলা যায় না।

সে-বছরে সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল ছাত্র-সংসদে আমাদের সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী ছিলেন এ বি এম আবদুল লতিফ মিয়া (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত), সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী আলাউদ্দিন আল আজাদ (সাহিত্যিক ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক) এবং যুগ্ম-সম্পাদক পদপ্রার্থী এম মোকাম্মেল হক। আর কেন্দ্রীয় সংসদে মনোনীত প্রার্থী ছিলেন এস এ বারী এ টি, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, ফরিদা বারী মালিক (বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী, পরে খান) ও ফরিদউদ্দীন আহমদ (অ্যাডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট)।

এই নির্বাচনে বেশ খেটেছিলাম এবং অনেকটা এই সূত্রে আজীবনের বন্ধু লাভ করেছিলাম কয়েকজন—তাঁদের মধ্যে নুরুল হক (পরিকল্পনা কমিশনের অবসরপ্রাপ্ত সদস্য) ও আবুল মাল আবদুল মুহিত বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য।

সেবারে আমাদের পুরো প্যানেল নির্বাচিত হয়েছিল। এই সূত্রে এস এ বারী এ টি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতির পদ লাভ করেছিলেন। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পরে হল থেকে গভীর রাতে স্বামীবাগে বাড়ি ফেরার পথে আমাদের বাড়িতে এসে খবরটা জানিয়ে যায় বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। সে সাহিত্য-সম্পাদক হয়েছিল আর, এখন ভাবলে অবাকই লাগে, শামসুর রাহমান নির্বাচিত হয়েছিলেন গ্রন্থাগারিক।

৬.

১৯৫৩ সালে, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ভর্তির অনতিকাল পরে, পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সংস্কার সাধিত হয়। এতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজিকিউটিভ কাউনসিলের সুপারিশক্রমে সরকার ভাইস-চান্সেলর নিয়োগ করতো। একজিকিউটিভ কাউনসিলের সুপারিশ করার ক্ষমতা এখন লোপ পেল, সরকার সরাসরিই ভাইস-চান্সেলর নিয়োগের অধিকারী হয়ে গেল। নতুন বিধান-অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের—সেইসঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি কলেজের

শিক্ষকদেরও—রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ হয়। কিছুকাল আগে প্রদেশের দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয়—রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়—প্রতিষ্ঠার জন্যে যে-আইন প্রণীত হয়, তাতেও ওরকম বিধি রাখা হয়েছিল।

এই নববিধান নিয়ে অসন্তোষ থাকলেও তেমন প্রতিবাদ হয়েছিল বলে মনে পড়ে না। তবে দেশব্যাপী সরকারবিরোধী যে-আবহাওয়া তখন বিরাজ করছিল, তাতে আইনের এসব পরিবর্তনের একটা ব্যাখ্যাই সকলের মনে জাগে : সরকার সাধারণভাবে শিক্ষক-সমাজকে এবং বিশেষভাবে উচ্চশিক্ষা-পর্যায়ের শিক্ষকদের ভয় পেতে শুরু করেছে। স্বায়ত্তশাসিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্মে সরকারের হস্তক্ষেপ এর মধ্যেই গুঞ্জনের সৃষ্টি করেছিল। পছন্দমতো ভাইস-চান্সেলর নিয়োগের ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরে সরকার একটু বেশি প্রভাব খাটাবার সুযোগ করে নিচ্ছে বলে ধারণা হয়। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গ সরকার বহুদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে শহরের বাইরে কোথাও নিয়ে যেতে চাইছিল। রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে ছাত্রদের নিবৃত্ত করা এবং জনসাধারণের ওপর ছাত্রদের রাজনৈতিক প্রভাববিস্তারে বাধা দেওয়া তার উদ্দেশ্য বলে গণ্য হয়েছিল। হয়তো এমন সন্দেহ খানিকটা অমূলক ছিল। কেননা, ছাত্রদের কাছ থেকে কোনো বড়োরকম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার আগেই, ১৯৪৮ সালে, বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরের চিন্তাটা সরকারের মাথায় এসেছিল।

কিন্তু ১৯৫৩ সালে পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। ছাত্রসমাজ সাধারণভাবে মুসলিম লীগ সরকারের বিরোধী। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে না জড়িয়েও উচ্চ পর্যায়ের বহু শিক্ষক কোনো না কোনো সরকারি নীতির বিরোধিতা করছিলেন। তার ওপর পূর্ববঙ্গে সাধারণ নির্বাচন তখন সামনে এসে গেছে। ১৯৪৬ সালের পরে এই অঞ্চলে কোনো সাধারণ নির্বাচন হয়নি। ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলে একটি উপনির্বাচন হয়েছিল, তাতে মুসলিম লীগ-প্রার্থী হেরে যান—অবশ্য পরে একটি ট্রাইব্যুনাল সে-নির্বাচনী ফল বাতিল করে দেয়। কিন্তু তারপরে পরিষদে প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটা আসন শূন্য হলেও উপনির্বাচনের ব্যবস্থা হয়নি। সরকারপক্ষ স্পষ্টতই নির্বাচনকে ভয় পাচ্ছিল এবং ছাত্র-শিক্ষকদের সাধারণভাবে প্রতিপক্ষ বিবেচনা করছিল—এই ছিল আমাদের ধারণা।

তবে কতোদিন আর নির্বাচন ঠেকিয়ে রাখা যায়! শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করা হলো যে, ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ববঙ্গে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের সম্ভাবনা দেখা দিলে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক তাঁর বহুখ্যাত কৃষক-প্রজা পার্টির নামের অনুসরণে কৃষক-শ্রমিক পার্টি নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করলেন। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক-শ্রমিক পার্টি ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বরে মুসলিম লীগ-বিরোধী নির্বাচনী মোর্চা যুক্তফ্রন্ট গঠন করল। পরে মওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বাধীন নেজামে ইসলাম পার্টি, হাজী মোহাম্মদ দানেশের নেতৃত্বাধীন গণতন্ত্রী দল এবং আবুল হাশিমের নেতৃত্বাধীন খেলাফতে রব্বানী পার্টি যুক্তফ্রন্টে যোগ দেয়। কমিউনিস্ট পার্টি তখন নারিন্দায় সরদার আবদুল হালিমের বাড়ির এক ঘরে অফিস খুলেছিল—তাদেরকেও যুক্তফ্রন্টের অংশীদার করার চেষ্টা হয়, তবে ফজলুল হকের স্নেহভাজন মওলানা আতাহার আলীর বিরোধিতার কারণে তা সম্ভবপর হয়নি। মনে

পড়ে, পল্টন ময়দানে যুক্তফ্রন্টের এক জনসভা শেষ হওয়ার পরে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনখ্যাত ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রনেতা মনজুর হোসেন মঞ্চের কাছে গিয়ে ফজলুল হকের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলতে থাকলেন, 'পার্টিকে নিতে হবে, পার্টিকে নিতে হবে' (অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টিকে যুক্তফ্রন্টের শরিক করে নিতে হবে)। হক সাহেব জানতে চাইলেন, 'আরে মিয়া, তোমার কোন পার্টি, কও না! পার্টি তো একটা আমারও আছে।' থতমত খেয়ে মনজুর জানালেন, 'কমিউনিস্ট পার্টি।' হক সাহেব তাঁর কথার সরাসরি জবাব না দিয়ে বললেন, 'কুকুর-বিড়াল সবসুদ্ধ মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে এক কাতারে জমায়েত হইতে পারে।' তবে যুক্তফ্রন্টের যে-কর্মীশিবির হয়েছিল, তাতে কমিউনিস্ট পার্টিসহ সকল দলের কর্মী অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

নির্বাচনী সংগঠনে ও প্রচারণায় যোগ দিলেন পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। যুক্তফ্রন্ট পরিচিত হলো হক-ভাসানী-সোহ্‌রাওয়ার্দীর দল হিসেবে এবং পরে তার নির্বাচনী প্রতীক নৌকো দিয়ে। ৫৬ সিমসন রোডে যুক্তফ্রন্টের অফিস খোলা হলো, কামরুদ্দীন আহমদ হলেন তার দপ্তর-সম্পাদক। এককালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের দপ্তর-সম্পাদক ফরমুজুল হকও অফিসের কাজ বেশ করেছিলেন। যুক্তফ্রন্টের ঘোষণাপত্র প্রণয়নের ভার দেওয়া হয় বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও আওয়ামী লীগ দলীয় নেতা আবুল মনসুর আহমদকে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিকে মনে রেখে তিনি স্থির করেন, ঘোষণাপত্রে ২১টি দফা থাকবে। আবুল মনসুর আহমদের লেখায় পড়েছি, তিনি ২১ দফা প্রণয়ন করার পরে মওলানা ভাসানী দাবি করেন, কোরআন ও সুন্নার বরখেলাফ কোনো আইন করা হবে না, এই মর্মে একটি দফা থাকতে হবে। ২২ দফা এড়িয়ে ২১ দফা রাখবার খাতিরে ঘোষণাপত্রের সূচনায় 'নীতি' বলে লেখা হলো : 'কোরাণ ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাফ কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।' ২১ দফার প্রথম দফায় বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার এবং অপর তিন দফায় একুশে ফেব্রুয়ারিতে সরকারি ছুটি ঘোষণার, শহীদ মিনার নির্মাণের এবং মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন বর্ধমান হাউজে বাংলা ভাষার গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপনের অঙ্গীকার ছিল। অন্যান্য প্রতিশ্রুতির মধ্যে ছিল দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রাব্যবস্থা ছাড়া আর সব বিষয় প্রদেশের ওপর ন্যস্ত করে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ এবং পাট-ব্যবসার জাতীয়করণ। আর সেইসঙ্গে—'কালাকানুন' বলে অভিহিত—ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন বাতিল করা।

অল্প সময়ের মধ্যে যুক্তফ্রন্টের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ওঠে এবং ফজলুল হকের বাসভবনের রাস্তা কে এম দাস লেনে মনোনয়ন-প্রার্থীদের ভিড়ে চলাচল দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। তাঁদের একজনের কথা বেশ মনে পড়ে—আমার পূর্বপরিচিত লুৎফর রহমান জুলফিকার। রাজনীতিতে তাঁর কোনো ভূমিকার কথা আমার জানা ছিল না। তিনি বরিশাল অঞ্চলের লোক, ফজলুল হককে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। হক সাহেবের সঙ্গে তাঁর কী কথা হয়েছিল, জানি না, তবে মনোনয়ন পাবেন বলে তিনি ধরে নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত যখন তাঁর আশা পূর্ণ হলো না, তখন হক সাহেবের ওপর বেজায় চটে গিয়েছিলেন।

মনোনয়নের বিষয়ে যুক্তফ্রন্টে বেশ সমস্যা হয়েছিল। তা নিয়ে মওলানা আতাহার আলী একবার দলবলসমেত যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে গেলেন, পরে আবার ফিরে এলেন। মওলানা ভাসানীও একবার রাগ করে পাঁচবিবিতে গিয়ে বসে থাকলেন, বহু সাধ্য-সাধনার পর তাঁকে ফিরিয়ে আনা হলো। যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন না পেয়েও ফজলুল হক কিংবা ভাসানীর সমর্থন নিয়ে কেউ কেউ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তবে শুধু এঁরাই নন, নেজামে ইসলাম, গণতন্ত্রী দল. খেলাফতে রব্বানী পার্টিও যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোথাও কোথাও নিজেদের প্রার্থী দাঁড় করায়। কমিউনিস্ট পার্টিও কোনো কোনো আসনে তা করেছিল—তবে তারা যুক্তফ্রন্টের শরিক দল না হওয়ায় সে-কাজ অনৈতিক বলা যায় না। যশোরের যে-কেন্দ্র থেকে কমিউনিস্ট রাজবন্দি আবদুল হক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, সেখানে যুক্তফ্রন্ট কাউকে মনোনয়ন দেয়নি। যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন না পেয়েও যাঁরা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আমাদের কাছের মানুষ—গণতন্ত্রী দলের দেওয়ান মাহবুব আলী—একজন।

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের অভূতপূর্ব সাফল্যের (২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২৩টি, পরে চারজন স্বতন্ত্র সদস্য যুক্তফ্রন্টে যোগ দিয়ে আসনসংখ্যা উন্নীত করেন ২২৭এ) পেছনে ছিল সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাংগঠনিক দক্ষতা, হক-ভাসানীর জনপ্রিয়তা এবং বিপুলসংখ্যক ছাত্র-কর্মীর নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস—ছাত্রেরা তখন জনসাধারণের চোখে বিপুল মর্যাদার অধিকারী। নির্বাচনে আহমদ, নেয়ামাল ও আমি পুরোনো ঢাকার একটি আসনে যুক্তফ্রন্ট-মনোনীত গণতন্ত্রী দলের প্রার্থী গোলাম কাদের চৌধুরীর পক্ষে কাজ করেছিলাম : ওরা দুজন বেশি করেছিল, আমি সামান্য—পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন নিয়ে তখন আমি ব্যস্ত।

নির্বাচনের সময়কার একটা ছবি এখনো আমার চোখে ভাসে। গ্রাজুয়েট্‌স স্কুলে একটা নির্বাচনী কেন্দ্র ছিল, সেখানে ভোটদান শেষ হয়ে গেছে। প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আছেন সোহ্‌রাওয়ার্দী—গেরুয়া পাঞ্জাবি-শাদা পাজামা-পরা। খুবই ক্লান্ত চেহারায় তৃপ্তির একটা আভাস আছে। দু-একজন সাংবাদিক ছিলেন ধারে-কাছে। নির্বাচনের ফল সম্পর্কে তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করছিলেন তাঁদের কাছে। পরে যখন সকল আসনের ফলাফল বেরিয়ে গেল, সোহ্‌রাওয়ার্দী তখন একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন : গণতন্ত্রের কার্যকরতার জন্যে শক্তিশালী বিরোধী দল দরকার। আইনসভায় তেমন বিরোধী পক্ষ ছিল না বটে, তবে শক্তিধর বিরোধীরা অন্যত্র কাজ করছিল—তাও গণতন্ত্র ধ্বংস করতে, সেটা তখনো কারো মনে হয়নি।

যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে আমরা যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেলাম। ভাবলাম, দেশটাকে নতুন করে ঢেলে সাজানো হবে। এতো বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে লক্ষ্য-অর্জনে যুক্তফ্রন্টের অসুবিধে হবে না এবং একই কারণে কেন্দ্রীয় সরকারও পূর্ব বাংলার কথা শুনতে বাধ্য হবে। কিন্তু নির্বাচনের ফল বেরোবার তিন সপ্তাহের মধ্যেও মন্ত্রিসভা-গঠনের কোনো উদ্‌যোগ দেখা গেল না, বরঞ্চ যুক্তফ্রন্টের মধ্যে শরিকি কোন্দলের কথা শোনা গেল। ফজলুল হক প্রত্যাশিতভাবে যুক্তফ্রন্টের সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হলেন। এপ্রিলের ২ তারিখে তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করলেন : তিনি প্রধানমন্ত্রী আর মন্ত্রী তাঁর দলের আবু হোসেন সরকার ও সৈয়দ আজিজুল হক

(নান্না মিয়া) এবং নেজামে ইসলামের আশরাফউদ্দিন আহমদ চৌধুরী—যিনি এক সময়ে কংগ্রেসের রাজনীতি করতেন। যুক্তফ্রন্টের বড় শরিক আওয়ামী লীগের কেউ মন্ত্রিসভায় না থাকায় এবং কিছুটা অন্য কারণেও অসন্তোষ দেখা দিলো। হক সাহেব যখন শপথ নিয়ে গভর্নমেন্ট হাউস থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরার পথে প্রথম বাঁকটি নিয়েছেন, তখন সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের কিছু ছাত্র তাঁর গাড়ি থামিয়ে নানারকম শ্লোগান দিতে থাকল, তার মধ্যে একটি ছিল 'স্বজনপ্রীতি চলবে না।' হক সাহেব গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জানতে চাইলেন, 'কিসের স্বজনপ্রীতি?' ছাত্রেরা বললো, 'আপনি নান্না মিয়াকে মন্ত্রী বানিয়েছেন।' হক সাহেব পাল্‌টা প্রশ্ন করলেন, 'নান্না এম এল এ হয় নাই?' 'তা হয়েছেন।' 'এম এল এ হইলে মন্ত্রী হওয়া যায় না?' 'তা যায়।' 'তাইলে?' 'তাহলেও উনি আপনার ভাগনা।' এবার ফজলুল হকের জিজ্ঞাসা : 'আমার ভাগনা বলে কি পচে গেছে?' ছাত্রেরা কী বলবে, ভেবে পেল না, হক সাহেবের গাড়ি গন্তব্যের দিকে চলে গেল।

ছয় সপ্তাহ পরে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত হলো : আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, আবদুস সালাম খান, শেখ মুজিবুর রহমান ও হাশিমউদ্দীন আহমদ নতুন মন্ত্রী হলেন। সেদিনই আদমজী জুট মিলে বাঙালি-অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গায় কয়েক শ শ্রমিকের মৃত্যু হয়। সবার ধারণা হয় যে, যুক্তফ্রন্ট-মন্ত্রিসভাকে দোষী করার জন্যে অবাঙালি শ্রমিকদের উসকে দিয়ে এবং তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে দাঙ্গা বাধানো হয়েছে। দাঙ্গার খবর পেয়ে শেখ মুজিবুর রহমানসহ মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য আদমজীতে ছুটে গিয়েছিলেন—কিন্তু ততক্ষণে ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়ে গেছে।

ঘটনাক্রম ঠিক মনে নেই, তবে এর পরে মওলানা ভাসানী বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে স্টকহোম রওনা হয়ে যান। সোহ্‌রাওয়ার্দী ফিরে যান করাচিতে। ফজলুল হক যান কলকাতায় বেসরকারি সফরে। সেখানে ভাবাবেগবশত তিনি এই মর্মে বক্তৃতা দেন যে, বাংলার কৃত্রিম রাজনৈতিক বিভাজন সত্ত্বেও উভয় অংশের মানুষের ঐক্য অটুট আছে। হক সাহেবের বক্তব্য অতিরঞ্জিত করে প্রকাশিত হয় *নিউইয়র্ক টাইমসে*। তার সূত্র ধরে ৩০ মে তারিখে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলায় ৯২ক ধারা জারি করে অর্থাৎ মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে গভর্নরের শাসন প্রবর্তন করে। চৌধুরী খালিকুজ্জামানের জায়গায় গভর্নর হয়ে আসেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা-সচিব মেজর জেনারেল ইসকান্দর মীর্জা।

সন্ধ্যা হয়-হয়। আমি বাড়ি ফিরছিলাম। বাড়ি পৌঁছোবার আগেই, এক প্রতিবেশী দৌড়ে এসে আমাকে বললেন, যা ভয় করা হচ্ছিল, তাই ঘটে গেছে—৯২ক ধারা জারি হয়ে গেছে। বাইরের অন্ধকারের চেয়ে গভীর এক অন্ধকার আমাকে আচ্ছন্ন করলো।

৭.

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের ১৯৫২-৫৩ সালের 'কার্যনির্বাহক সমিতি'র কর্মকর্তা ও সদস্যদের নামের তালিকা নিম্নরূপ :

সভাপতি : ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন;
সহ-সভাপতি : বেগম সুফিয়া কামাল, অধ্যাপক সরওয়ার মুর্শেদ [খান সারওয়ার মুরশিদ], আবদুল গণি [গনি] হাজারী, মোস্তফা [মুস্তাফা] নূরউল ইসলাম;
সাধারণ সম্পাদক : ফয়েজ আহমদ;
সহ-সম্পাদক : হাসান হাফিজুর রহমান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর;
বিভাগীয় সম্পাদক : আলাউদ্দিন আল আজাদ, ফজলে লোহানী (সাহিত্য), আবদুল্লাহ্ আল-মুতী (বিজ্ঞান), আমিনুল ইসলাম (চিত্রকলা), এম আর আখতার [মুকুল] (প্রচার);
সদস্য : শামসুর রাহমান, আনিস চৌধুরী, দৌলতননেছা খাতুন, লায়লা সামাদ, সরদার জয়েনউদ্দীন, আতাউর রহমান, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, আনিসুজ্জামান, শেখ লুৎফর [ল্‌ত্‌ফর] রহমান।

১৯৫৩ সালে এই কমিটির আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার কথা। তাই বছরের শেষে সাধারণ সদস্যদের একটি সম্মেলন ডেকে নতুন কমিটি নির্বাচনের পরিকল্পনা হলো। কাজ করার দায়িত্ব মূলত পড়লো হাসান হাফিজুর রহমান, আবদুল্লাহ্ আল-মুতী, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও আমার ওপরে; ফয়েজ আহমদ সঙ্গে রইলেন, আর মাথার ওপরে আবদুল গনি হাজারী। আমি একদিন প্রস্তাব করে বসলাম, সংসদের সাংগঠনিক সম্মেলনের সঙ্গে একটা সাহিত্য-সম্মেলন করলে ভালো হয়। কথাটা সকলের মনঃপূত হলো এবং সেরকম আয়োজন চলতে থাকল। এরপর হাসান প্রস্তাব করলেন, আমাদের সাংগঠনিক সম্মেলন আলাদা হোক আর আমরা একটা প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মেলন করি, তাতে ন্যূনতম মতৈক্যের ভিত্তিতে সাহিত্য সংসদের বাইরের যতজনকে সম্ভব জড়িত করা হোক। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরে পাশাপাশি দুটি আয়োজন চলল—একদিনের সাংগঠনিক সম্মেলন ও কয়েকদিনব্যাপী সাহিত্য-সম্মেলনের।

সাহিত্য-সম্মেলন করতে অভ্যর্থনা সমিতি চাই—শেষ পর্যন্ত সেটা বেশ বড়ো হয়ে গেল। আমাদের অনুরোধে জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ তার সভাপতি হতে সম্মত হলেন আর যুগ্ম-সম্পাদক হলেন আবদুল গনি হাজারী ও আবু জাফর শামসুদ্দীন (সাহিত্য সংসদে তাঁর আসা-যাওয়া থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন আমাদের সংগঠনের বাইরে)। অভ্যর্থনা সমিতির সভায় সম্মেলনের উদ্‌বোধকরূপে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র নাম সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সম্মেলনের মূল সভাপতিরূপে আমি প্রস্তাব করি ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদের নাম। আমার তিন পুরুষের পরিচিত এই অশীতিপর সাহিত্য-সাধক তখন খুলনার অদূরে দীন জীবন যাপন করছিলেন। তাঁকে সম্মান জানালে আমাদের একটা কর্তব্য করা হবে, তিনিও খুশি হবেন। সেইসঙ্গে আমার মাথায় এও ছিল যে, আমাদের কিছু কথা বলতে তাঁকে রাজি করানো যাবে। এ নাম নিয়েও কোনো আপত্তি হলো না, তবে স্থির হলো, তাঁকে আমিই ব্যক্তিগতভাবে লিখব, তিনি সম্মত হলে আনুষ্ঠানিক পত্র যাবে। ড. শহীদুল্লাহ্ কেবল আমাকে বললেন, 'উনি কোন ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট পেয়েছেন, সেটাও একটু জেনে নিও।' কিছু না ভেবেচিন্তে পূর্বধারণাবশত বললাম,

'সার্, আমি তো জানি, উনি হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি লিট পেয়েছেন।' শহীদুল্লাহ্ সাহেব বললেন, 'সে-কথা আমিও শুনেছি, কিন্তু ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেটদের তালিকায় ওঁর নাম খুঁজে পাইনি।' এ কথায় আমি খুব বিব্রতবোধ করলাম। আমাকে উদ্ধার করতেই যেন শহীদুল্লাহ্ সাহেব বললেন, 'ওঁকে মূল সভাপতি করতে চাও, করো, আমার কোনো আপত্তি নেই। তুমি তো ওঁকে চিঠি দেবেই, তখন জীবনকথা জানার মতো করে জেনে নিও, উনি যে নামের সঙ্গে ডক্টর লেখেন, সেটা কোথাকার।' আমি বলতে পারলাম না যে, চিঠিতে এমন প্রশ্ন করা আমার পক্ষে দুরূহ।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী আমার চিঠি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সম্মতি জানালেন। আরো লিখলেন, তিনি অশক্ত, আমরা যেন তাঁর সভাপতির অভিভাষণ লিখে রাখি, ছাপার আগে তিনি একবার দেখে দেবেন। মুতী ভাই ও আমি মিলে তাঁর অভিভাষণ তৈরি করলাম। আমাদের বাড়িতে *সওগাতের* একটা পুরোনো সংখ্যা ছিল : তাতে বাঙালি মুসলমানদের সাহিত্য-সমিতি-গঠনের প্রয়াস এবং তার সঙ্গে নিজের সম্পৃক্ততার বিষয়ে আবদুল গফুর সিদ্দিকীর একটা লেখা ছাপা হয়েছিল। সেটা ব্যবহার করলাম, আর মুতী ভাই 'মণিকাঞ্চনযোগে'র মতো কিছু কিছু পুরোনো শব্দ প্রয়োগ করলেন। অভিভাষণটা সিদ্দিকী সাহেবের লেখা বলেই প্রতিভাত হলো।

সাহিত্য-সম্মেলনের ঘোষণাপত্র খুব যত্ন করে লেখেন শহীদ সাবের। অভ্যর্থনা সমিতিতে তা পড়ার পরে তাঁকে কিছুটা পুনর্লিখন করতে হয়, কিন্তু তাতে তিনি বা আমরা কেউ দ্বিধা করিনি এই কারণে যে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এতসব মানুষের স্বাক্ষর পাওয়া যাচ্ছে। আমি প্রস্তাব করলাম, স্বাক্ষরকারীদের নাম বর্ণানুক্রমে সন্নিবেশিত হোক। কে-একজন পরিহাস করলেন, 'কেন, তোমার নাম আ দিয়ে বলে?' বললাম, 'তাহলে আর নামের বিন্যাস নিয়ে কথা উঠবে না।' শেষ পর্যন্ত বর্ণানুক্রমে নাম সাজানোর দায়িত্ব আমাকেই পালন করতে হয়েছিল।

এই ঘোষণাপত্র এবং বিশিষ্ট লেখক, চিত্রশিল্পী, সংগীতশিল্পী ও সাংবাদিক প্রভৃতির নামসহ স্বাক্ষরকারীর এত দীর্ঘ তালিকা পূর্ব বাংলায় তো বটেই, পশ্চিম বাংলায়ও বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত *অগ্রণী* পত্রিকায় ঘোষণাপত্র ও স্বাক্ষরদাতাদের নামের সম্পূর্ণ তালিকা পুনর্মুদ্রিত হয়। এখানে যে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা নতুন ভাবের জোয়ার এসেছে, ঘোষণাপত্র তারই ইঙ্গিতবাহী বলে গণ্য হয়। পশ্চিমবঙ্গের অনেক লেখককে আমরা সম্মেলনে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তাতে তাঁরা সকলেই উল্লসিত হয়েছিলেন, যদিও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রবোধকুমার সান্যালের মতো অনেকে অপরাগতা জানিয়েছিলেন। তবে অন্নদাশঙ্কর রায়ের অপারগতার প্রকৃতি ছিল ভিন্ন : তিনি লিখেছিলেন, বাংলার এক অংশ থেকে আরেক অংশে পাসপোর্ট-ভিসা করে আসতে তাঁর মন সায় দিচ্ছে না।

দেশে-বিদেশে এমন সাড়া জাগানো সত্ত্বেও সাহিত্য-সম্মেলনের বিরোধিতাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সংগঠন হিসেবে তমদ্দুন মজলিস, পত্রিকার মধ্যে দৈনিক *আজাদ* এবং ব্যক্তি হিসেবে অনেকে এই আয়োজনকে পাকিস্তানের আদর্শবিরোধী এবং দুই বাংলার একীকরণের উদ্যোগ হিসেবে আখ্যা দিলেন। শহীদুল্লাহ্ সাহেব

উদ্‌বোধক হবেন জেনেও যেমন আমাদের বিভাগে সৈয়দ আলী আহসান সম্মেলনে প্রবন্ধ পড়তে চাইলেন না, তেমনি আহমদ শরীফ ও কাজী দীন মুহম্মদ সম্মত হলেন।

এটা বলতেই হবে যে, এই বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েও উদ্‌যোক্তারা কেউ পিছপা হননি। *আজাদ* বিরুদ্ধে গেল বলে *ইত্তেফাক* আমাদের পক্ষ নিল, তাতেও একটু সাহস পাওয়া গেল। তবে সকলের সদিচ্ছাই ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জগন্নাথ কলেজে প্রস্তুতিমূলক যেসব সভা হতো, শহীদুল্লাহ্ বোধহয় তার প্রত্যেকটিতেই যোগ দিয়েছিলেন। এক সন্ধ্যায় আলোচনা হতে হতে হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তে বললেন, 'কাল না তোমার পরীক্ষা, তুমি এখানে কী করছ? যাও, বাড়ি গিয়ে পড়ো গে।' আমাকে চলে আসতে হলো। পরদিন বার্ষিক পরীক্ষা দিলাম। ফল বেরোলে জেনেছিলাম, আলী আহসান সাহেব পরীক্ষক ছিলেন, আমি প্রথম হয়েছি।

এদিকে ১৯৫৪ সালের ১৪ এপ্রিল (১ বৈশাখ ১৩৬১) মাহবুব আলী ইনস্টিটিউটে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের দিনব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসায় অজিত গুহ ও মুনীর চৌধুরী কারাগার থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন। তাঁরা অতিথি হয়ে অল্পক্ষণের জন্যে এলেন। সাধারণ সদস্যদের অনেকে এই বলে সমালোচনা করলেন যে, সংসদ কয়েকজনের কুক্ষিগত। সরদার জয়েনউদ্দীন তার জবাবে বললেন, 'সংসদের কাজে যাদের পাওয়া যায়, তাদেরই বেশি দেখা যায়—সভায় ও সমিতিতে। সংখ্যায় তারা বেশি নয়, তাই সংসদ তাদের দখলে বলে ভুল হতে পারে।'

এই সভায় গঠনতন্ত্র সংশোধিত হয়ে নতুন কার্যনির্বাহী সমিতি নির্বাচিত হলো। কাজী মোতাহার হোসেন আগের মতোই সভাপতি রইলেন। আতোয়ার রহমান হলেন নতুন সাধারণ সম্পাদক। বিভাগীয় সম্পাদকের পদ তুলে দিয়ে চারজনের সম্পাদকমণ্ডলী রাখার যে-বিধান হলো তাতে নির্বাচিত হলাম আবদুল্লাহ্ আল-মুতী, হাসান হাফিজুর রহমান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও আমি। সাংগঠনিক সম্মেলন বেশ সফল হলো।

এরপর আমরা কোমর বেঁধে লাগলাম সাহিত্য-সম্মেলনের কাজে। অর্থ সংগ্রহের জন্যে নানা দরজায় ধরনা দেওয়া হলো। সানাউল হক তখন নারায়ণগঞ্জের এস ডি ও। আমরা কজন তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাদের পাঠালেন রণদাপ্রসাদ সাহার কাছে। আর পি সাহা আমাদের বিমুখ করেন নি। সম্মেলনের প্রস্তুতি সম্পর্কে অভ্যর্থনা সমিতির দপ্তর-সম্পাদক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের সাক্ষাৎকার বের হলো কাগজে—*ইত্তেফাকে* সেটা দু কলাম শিরোনাম দিয়ে ছাপা হলো। যাঁদের অনুরোধ করা হলো তাঁদের মধ্যে দু-একজন ছাড়া সবাই প্রবন্ধ লিখতে বা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে রাজি হলেন। চট্টগ্রাম থেকে এবং প্রদেশের অন্য জায়গা থেকেও প্রতিনিধিদল আসবে বলে জানিয়ে দিলেন। লায়লা সামাদ একটি ট্যাবলো পরিবেশনের ব্যবস্থা করলেন। নাটকাভিনয় ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন হলো। আমিনুল ইসলাম, রশিদ চৌধুরী, আবদুস সবুর, ইমদাদ হোসেন সাজসজ্জার ভার নিলেন; শেষে তা তত্ত্বাবধান করার জন্যে জয়নুল আবেদিনকেও পাওয়া গেল। 'আমার বাংলা' নামে আমানুল হকের

আলোকচিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হলো।

এর মধ্যে একটা কৌতুককর ঘটনা ঘটেছিল। লায়লা সামাদের পিতা খান বাহাদুর আমিনুল হক একদিন সম্মেলনের দপ্তরে এলেন। তখন বোরহান আর আমি ছাড়া সেখানে আর কেউ ছিলেন না। তিনি আমার পিতৃবন্ধুও, সকলের মুরুব্বি তো বটেই। তাঁর খুব ইচ্ছে, তাঁর লেখা একটা নাটক যেন সম্মেলনে পরিবেশিত হয়। আমরা যখন বললাম, সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে, আর কিছু করার অবকাশ নেই, তখন তিনি বোরহানের মুখের দিকে চেয়ে দুঃখের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা যদি নতুন লেখককে উৎসাহ না দেন, তবে কে দেবে?'

৮.

যেমন স্থির হয়েছিল, আবদুল গফুর সিদ্দিকী আমাদের বাড়িতেই এসে উঠলেন। পাইওনীয়ার প্রেসে সব অভিভাষণ ছাপা হচ্ছিল, তাঁরটার মেক-আপ প্রুফ দেখানো হলো তাঁকে। তিনি এক জায়গায় সংশোধন করে পরে তা প্রত্যাহার করে নিলেন। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

২৩ এপ্রিল কার্জন হলে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের উদ্‌বোধন হলো। ঘোষকের দায়িত্ব পালন করলাম আমি। প্রথমে খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ পড়লেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অধিবেশন। তাঁর একটি কথায় আমাদের খটকা লেগেছিল : পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ধর্মীয় অনুভূতির কথা বিবেচনা করে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন নারীচরিত্র-বর্জিত নাটক লেখার। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এরপর দিলেন উদ্‌বোধনী ভাষণ। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি কোনো কোনো মহলের বিজাতীয় মনোভাব এবং বাঙালি নামটি পর্যন্ত পাকিস্তানবিরোধী বলে গণ্য করার প্রবণতার তীব্র সমালোচনা করে তিনি ইঙ্গিত করলেন যে, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন সাহিত্য-সম্মেলন-অনুষ্ঠানের অনুকূল হয়েছে। অভ্যর্থনা সমিতির যুগ্ম-সম্পাদকের প্রতিবেদন পাঠ করলেন আবু জাফর শামসুদ্দীন। সবশেষে মূল সভাপতির অভিভাষণ দেওয়ার জন্যে আহূত হলে আবদুল গফুর সিদ্দিকী বললেন, 'রসুলুল্লাহর সাহাবিদের একজন ছিলেন আনিস। আমারো একজন আনিস আছে। আমি এখন তাকেই বলবো, আমার ভাষণ পাঠ করে দিতে।' আমি এর জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু তাঁর কথায় খুব সম্মানিত বোধ করে ভাষণটি পড়ে দিলাম। ভাষণটির রচনায় ও প্রুফ-সংশোধনে আমার অংশ থাকায় সেটা অনেকখানি মুখস্থ হয়ে গেছিল। শ্রোতাদের তা জানার কথা নয়। তাৎক্ষণিকভাবে ভাষণটি পড়েছি মনে করে তাঁরা অনেকেই আমার প্রশংসা করলেন।

সম্মেলন হয়েছিল তিন দিন ধরে। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক ব্যক্তি ও দল এসেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছিলেন রাধারাণী দেবী, নরেন্দ্র দেব, কাজী আবদুল ওদুদ, মনোজ বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দীপেন তখন *পরিচয়*-সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু এমনই

নিরহংকারী ও আত্মবিলোপপ্রবণ মানুষ যে, জগন্নাথ কলেজে সম্মেলনের দপ্তরে এসে বললেন, তিনি প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিতে চান আর তখন কে যেন তাঁকে কলেজ-ভবনের ঘরে বিছানা পেতে শুয়ে থাকতে বললো, তিনিও অম্লানবদনে তাই করলেন। স্থানীয় প্রতিনিধিদের রাখার জন্যে অধ্যক্ষ কলেজের মূল ভবনের দোতলা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদের ভাগ-যোগ করে রাখা হয়েছিল বিভিন্ন ভদ্রলোকের বাসায়। দীপেনের আসার খবর আমরা ঠিকমতো পাইনি, সেবারেই তাঁর সঙ্গে অনেকের প্রথম পরিচয়। পরের দিন সকালে জগন্নাথ কলেজ থেকে উদ্ধার করে তাঁকে অতিথির মর্যাদা দেওয়া গিয়েছিল।

সম্মেলনের একটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। নিরুপায় হয়ে তাঁর অধিবেশনের সময় দ্বিতীয়বার পরিবর্তন করলে তিনি আমাকে বললেন, 'তোমরা আমারে ফুটবল বানাইতেছো ক্যান?' আমি লজ্জা পেয়ে মাফ চাইলাম। তাঁর অধিবেশনেই আমার একটি প্রবন্ধ পড়ার কথা ছিল—মাইক্রোফোনের গোলযোগে সেটা পড়া সম্ভবপর হয়নি। সভাপতি অবশ্য ঘোষণা করেছিলেন যে, প্রবন্ধটি পঠিত বলে গণ্য হবে, তবে পরে *আজাদ* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পত্রে মন্তব্য করা হয়েছিল যে, এমনকি মাইক্রোফোন পর্যন্ত আমার প্রবন্ধ-প্রচারে অসম্মতি জানায়।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন মনন-সাহিত্য শাখার সভাপতি হতে রাজি হয়েছিলেন, তবে আমাদের বিরুদ্ধপক্ষের চাপে শেষ পর্যন্ত আর সম্মেলনে আসেননি। আমাদের অনুরোধে মুনীর চৌধুরী ওই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন—তাতে প্রবন্ধ পড়েছিলেন কবীর চৌধুরী। সভাপতির ভাষণে মুনীর চৌধুরী বলেছিলেন যে, দুই বৎসরের অধিক কাল রাষ্ট্রীয় অতিথি হয়ে থাকার ফলে তাঁর যে দৈহিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, তাতে তিনি সভাপতির আসন অধিকার করার যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন; নইলে যে-অধিবেশনে তাঁর অগ্রজ প্রবন্ধ পাঠ করছেন, সেখানে তাঁকে সভাপতিত্ব করতে বলা কেন?

কাজী মোতাহার হোসেন, মাহবুব-উল-আলম, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, আবুল ফজল, সুফিয়া কামাল, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্ বিভিন্ন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। জসীমউদ্‌দীন ও মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ছিলেন, তবে তাঁরা সভাপতিত্ব করেছিলেন কিনা মনে করতে পারছি না। মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা কি শাখা-সভাপতি ছিলেন? শওকত ওসমান, মুহম্মদ আবদুল হাই, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, কাজী দীন মোহাম্মদ (*গোলকচন্দ্রের আত্মকথা*-খ্যাত), নূরুল মোমেন, আহমদ শরীফ, কাজী দীন মুহম্মদ, মতিনউদ্দীন আহমদ, আবদুল্লাহ আল-মুতী, আলাউদ্দিন আল আজাদ ছিলেন প্রবন্ধ-পাঠকদের মধ্যে। কাজী দীন মুহম্মদের প্রবন্ধটিও তাঁর অনুরোধে আমাকে পড়ে শোনাতে হয়; কেননা, ঘটনাক্রমে তাঁর প্রবন্ধপাঠ ও শুভপরিণয় একই সময়ে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। এ কে নজমুল করিম ও মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন, তবে তাঁরা প্রবন্ধ পড়েছিলেন কিনা, নিশ্চিত বলতে পারছি না। আরো যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, মোহাম্মদ মোদাব্বের, হোসনে আরা, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, সিকানদার আবু জাফর, সৈয়দ নুরুদ্দিন, সরদার জয়েনউদ্দীন, হাবীবুর রহমান, আতোয়ার রহমান, লায়লা সামাদ, শামসুর

রাহমান, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, আতাউর রহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, ফয়েজ আহমদ, রফিকুল ইসলাম, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও জহির রায়হান। এ এফ এম আবদুল জলিল ও আসহাবউদ্দীন আহমদ ছিলেন বলে মনে হয়। তবে উপরে বর্ণিত তালিকায় অত্যুক্তি-ঊনোক্তি ঘটা খুবই সম্ভবপর।

বহু রাত পর্যন্ত রমেশ শীলের কবিগান শ্রোতাদের জমিয়ে রেখেছিল। সংগীতে চট্টগ্রামের প্রান্তিক শিল্পী সংঘ আর ঢাকার অগ্রণী শিল্পী সংঘ সুনাম অর্জন করেছিল। চট্টগাম থেকে এসে কলিম শরাফী গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। শেখ লুত্ফর রহমান, আবদুল লতিফ, বেদারউদ্দীন আহমদ, আবদুল আলিম, আবদুল হালিম চৌধুরী, আতিকুল ইসলাম ও ফজলে নিজামী নানা ধরনের গান পরিবেশন করেছিলেন। গানের একটি আসরে মওলানা ভাসানী উপস্থিত ছিলেন, যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী আতাউর রহমান খান উপস্থিত ছিলেন উদ্‌বোধনী অধিবেশনে। বর্ধমান হাউজে অনুষ্ঠিত আমানুল হকের আলোকচিত্র-প্রদর্শনী 'আমার বাংলা' দেখতে যেমন জনসমাগম হয়েছিল, তেমনি তা প্রশংসিত হয়েছিল। এটি উদ্‌বোধন করেছিলেন শিল্পী জয়নুল আবেদিন। ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীবাহিনী স্বেচ্ছাসেবা দিয়ে শৃঙ্খলারক্ষায় সাহায্য করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিকেরা বক্তৃতা করেছিলেন। অংশগ্রহণকারী ও শ্রোতাদের দাবিতে তিনদিনব্যাপী সম্মেলন আরো একদিন বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

সাহিত্য-সম্মেলন খুব সফল হয়েছিল, এর অসাম্প্রদায়িক ও গণমুখী চরিত্র সকলের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তবে দীর্ঘকাল ধরে *আজাদ* পত্রিকায়—সম্পাদকীয় ও চিঠিপত্র স্তম্ভে—সম্মেলনকে আক্রমণ করা হয়েছিল এর বামঘেঁষা চরিত্রের জন্যে এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে সাহিত্যিক আমন্ত্রণ করার কারণে। দীপেনের শারীরিক ত্রুটি ছিল—আক্রমণ থেকে বাদ যায়নি। আমার বিরুদ্ধে একটা চিঠি বের হয়েছিল আবু হেনা মোস্তফা কামালের স্বাক্ষরে—তিনি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত পত্র দিয়ে আমাকে জানিয়েছিলেন, ওটা তাঁর লেখা নয়, কিন্তু মুরুব্বিস্থানীয় এমন একজনের লেখা যে তিনি প্রতিবাদও করতে পারছেন না। ওই চিঠিতে বলা হয়েছিল যে, বঙ্কিমচন্দ্রকে আমাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্য প্রতিপন্ন করে লেখা প্রবন্ধের পুরস্কারস্বরূপ আমি সাহিত্য-সম্মেলনে প্রবন্ধ পড়ার সযোগ পেয়েছি।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত সাহিত্যিকরা সকলেই সম্মেলনের উদারমনস্ক ভাবে অভিভূত হয়ে খুব সুন্দর বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমার ওপর ভার পড়েছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে দেখাশোনা করার। দেবীপ্রসাদ চাইলেন রিপন কলেজে তাঁর শিক্ষক গোবিন্দচন্দ্র দেবের (এঁকে তিনি *আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন* বইটি উৎসর্গ করেছিলেন) সঙ্গে দেখা করতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে তাঁকে নিয়ে গেলাম—তিনি গোবিন্দ দেবকে পায়ে ধরে প্রণাম করলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় চাইলেন তাঁর স্কটিশ চার্চ কলেজের সহপাঠী ফররুখ আহমদের সাক্ষাৎ। তাঁকে বললাম, নীতিগত কারণে ফররুখ ভাই আমাদের সম্মেলনের বিরোধী। সুভাষদা হেসে বললেন, 'তা হোক, ঢাকায় এসে ওর সঙ্গে দেখা না করে ফেরা যায় না।' ফররুখ আহমদকে আগে থেকে বলে-কয়ে নাজিমউদ্দীন রোডে রেডিও অফিসের উলটোদিকের চা-খানায়—যেখানে অনুষ্ঠানের অবসরে ফররুখ ভাই বসে থাকেন,

সেখানে—তাঁকে নিয়ে গেলাম। দুই বন্ধু পরস্পরকে আলিঙ্গন করে গল্পে মেতে উঠলেন।

সুভাষদা ও দেবীদা উভয়েই চাইলেন ইলা মিত্রের সঙ্গে দেখা করতে। নাচোল সংগ্রামের এই নেত্রী দীর্ঘকাল কারাভোগ করে এবং অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করে বন্দি অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসারত। ওঁদের সেখানে নিয়ে গেলাম। ইলা মিত্রকে দেখলাম কঙ্কালসার—বিছানার সঙ্গে একেবারে মিশে আছেন। আশেপাশে ইউনিফর্ম-পরা পুলিশ ও শাদা পোশাকের গোয়েন্দা দুইই ছিল। তবে কেউ আমাদের বাধা দেয়নি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর দুটি কবিতার বই নিয়ে গিয়েছিলেন ইলা মিত্রের জন্যে। তাঁর ইঙ্গিতে সুভাষদা *নাজিম হিকমতের কবিতা* থেকে আবৃত্তি করে শোনালেন।

এ ঘটনার একটি পাদটীকা আমি অন্যত্র উল্লেখ করেছি, এখানে তার পুনরাবৃত্তি করি। কমিউনিস্ট পার্টির আত্মগোপনকারী নেতাদের একজনের সঙ্গে সাংগঠনিকভাবে আমার যোগ ছিল, আমি তাঁকে জানতাম তাঁর ছদ্মনামে—রমজান ভাই বলে। সাহিত্য-সম্মেলনের আগে-পরে তাঁর কাছে অনুযোগ করেছি কমিউনিস্ট পার্টি সম্মেলনের কাজে যথেষ্ট সাহায্য করছে না বলে। তিনি বলতেন, 'তুমি যে এত কাজ করছো, সেটাও পার্টির কাজ হলো; আর পূর্ব পাকিস্তানের নানা জায়গা থেকে তো আমাদের লোকেরা সম্মেলনের ডাকে সাড়া দিয়েছে, এতে যোগ দিতে আসছে, সেটাও কি আমাদের কিছু করা নয়?' আমি তাঁর কথা মানতে চাইলাম না। সাহিত্য-সম্মেলন শেষ হওয়ার পরে তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমি খুব উত্তেজিতভাবে বললাম, সুভাষদা-দেবীদাকে নিয়ে ইলা মিত্রকে দেখে এসেছি। কেমন দেখলাম, তিনি জানতে চাইলেন। আমিও চোখের দেখা ও মনের ছবি মিলিয়ে সবটা বর্ণনা করলাম। পরে যখন জানতে পারি, রমজান ভাইই হচ্ছেন ইলা মিত্রের স্বামী রমেন মিত্র, তখন বেশ বিব্রত হয়েছিলাম।

ঢাকা বেতারের কর্মকর্তাদের অনুরোধে আবদুল গফুর সিদ্দিকীকে নিয়ে গেলাম তাঁদের অফিসে। একজন প্রোগ্রাম-অর্গানাইজার সিদ্দিকী সাহেবের কাছে জানতে চাইলেন, উনিশ শতকের গোড়ায় বাংলা গদ্যের যে সংস্কৃতীকরণ হয়, তার কোনো প্রতিক্রিয়া সমকালীন 'পুঁথিসাহিত্যে' ঘটেছিল কিনা। সিদ্দিকী সাহেব সামান্য একটু ভেবে বললেন, ঘটেছিল। তখন তাঁরা চাইলেন, এ বিষয়ে তিনি যেন একটা বা দুটো কথিকা পাঠ করেন। তাঁকে কবে নিয়ে আসবো, সে দিনতারিখও আমার সঙ্গে স্থির হয়ে গেল।

দু-একদিনের মধ্যে সিদ্দিকী সাহেব আমার হাতে কয়েকটি উদ্‌ধৃতি তুলে দিলেন—দোভাষী রীতিতে লেখা কয়েকটি কবিতার টুকরো। কবি ও কাব্যগ্রন্থের নাম দেওয়া আছে। বেতার-কর্তৃপক্ষ যা চেয়েছিলেন, এসব চরণে ঠিক তা-ই আছে—বাংলার সংস্কৃতীকরণের নিন্দা, এমন কি, বিদ্যাসাগর-মদনমোহন তর্কালংকারের নামও রয়েছে। আমার মনে কোনো সন্দেহ রইলো না যে, ফরমাশ পেয়ে সিদ্দিকী সাহেব এগুলো লিখেছেন এবং কাল্পনিক কবি ও কাব্যগ্রন্থের নাম দিয়ে দিয়েছেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

আমার ঘোর কাটার আগেই তিনি বললেন, 'ভাই, রেডিও-টকের বিষয় তো তোমার জানা। এই উদ্‌ধৃতিগুলো দিলাম। তুমি এগুলো জায়গামতো বসিয়ে আমার

টক-দুটি লিখে দিও।' অনন্যোপায় হয়ে লিখলাম; যথারীতি রেকর্ড করা হলো; প্রচারও করা হয়েছিল। আবদুল গফুর সিদ্দিকী আর্থিক কষ্টে ছিলেন। বেতারের কথিকা থেকে পাওয়া ওই সামান্য টাকাও তাঁর পক্ষে সহায়স্বরূপ ছিল।

তাঁকে নিয়ে *মাহে নও* অফিসেও গিয়েছিলাম আবদুল কাদিরের কাছে। কাদির সাহেব তাঁর কাছে লেখা চেয়েছিলেন, তিনিও দেবেন বলে অঙ্গীকার করেছিলেন। সিদ্দিকী সাহেব আশা করেছিলেন, এবারে ঢাকায় এসে সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের ফলে হয়তো তাঁর পক্ষে সরকারি সাহিত্যিক-ভাতা পাওয়ার পথ সুগম হবে। আবদুল কাদির সরকারি কর্মকর্তা—তিনি হয়তো এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন। তাই তাঁর কাছে যাওয়া।

৯.

কলকাতা থেকে আগত সাহিত্যিকদের বেশ কয়েকটি সংবর্ধনা দেওয়া হয় ঢাকায়। তার মধ্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজেই হয় দুটি অনুষ্ঠান : প্রথম সভাটির আয়োজন করেছিল বোধহয় ডক্টরস ক্লাব। সার্জন কে এস আলম (পরে উনিই ইলা মিত্রকে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন তাঁর সঙ্গী-চিকিৎসকরূপে) চমৎকার একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'দুজাতির মানুষের দেশ নেই : চিকিৎসক আর শিল্পীদের।' দ্বিতীয়টির উদ্‌যোগ ছিল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র-সংসদের। কলেজের অধ্যক্ষ ড. এ কে এম আবদুল ওয়াহেদ সভাপতিত্ব করেছিলেন। ওই অনুষ্ঠানে সাজেদুর রহমান ও তাঁর সঙ্গীরা আমার লেখা সেই গানটি—যার কথা ও স্বরলিপি বেরিয়েছিল আলীম চৌধুরী ও আহমেদ কবির সম্পাদিত-*যাত্রিক* পত্রিকায়, সেটি—পরিবেশন করেছিলেন। সাজেদুর রহমানের ডাক নাম ছিল মাস্তানা : ওই নামেই তিনি সর্বত্র পরিচিত ছিলেন। নির্ধারিত কালের বেশি সময় তিনি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন, তবে সেখানকার সাংস্কৃতিক জীবনে তাঁর খুব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তিনি নিজে লিখতেন, গাইতেন, নাচতেন ও গানে সুর দিতেন। বেশ কিছু সঙ্গী জুটিয়ে তিনি একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। কুয়াশা ছদ্মনামে লেখা তাঁর গোয়েন্দা-কাহিনীর সিরিজ এক সময়ে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি হয়েছিলেন ঢাকা ডেন্টাল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ।

মাস্তানা ও তাঁর সঙ্গীদের গাওয়া আমার গানের পরে শুনলাম, মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে, এইমাত্র যে-গানটি পরিবেশিত হলো, তা লিখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অমুক। তিনি বোধহয় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন, তাঁকে সামনে আসতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আমার কর্ণের আকস্মিক রক্তিমা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না, তবু কোনোমতে নিজের আসনের সামনে উঠে দাঁড়ালাম। এরপর একদিকে 'সামনে সামনে' অন্যদিকে 'মঞ্চে মঞ্চে' ধ্বনির মধ্যে আমি প্রথমে মঞ্চের নিচে দাঁড়িয়ে শ্রোতাদের সালাম দিলাম, তারপরে সজ্জিত মঞ্চে পাদপ্রদীপের আলোয় যথাসম্ভব লজ্জিত হয়ে দ্বিতীয়বার সকলকে অভিবাদন জানালাম। সভাপতি ড. ওয়াহেদ—আমার

খালু—তখনই ডেকে বললেন, তুমি যে গান লেখো, তা তো জানতাম না। বমাল ধরা পড়ার পরে 'লিখি না' বলাও যায় না। পরে তিনি আমাকে বহুবার ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞেস করেছেন, কি, গান লিখছো তো, কিংবা নতুন গান কী লিখলে? সংবর্ধিত সাহিত্যিকদের মধ্যে মনোজ বসু ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন।

সাহিত্য-সম্মেলনের বিরুদ্ধে যেসব সমালোচনা হয়েছিল, তার একটি ছিল পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানানো। পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি আস্থা এবং স্থানীয় উর্দু সাহিত্যিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্যে সম্মেলনের এক সন্ধ্যায় মুশায়েরার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল এবং তাতে ঢাকার খ্যাতনামা উর্দু কবিদের বেশির ভাগই উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাতে সমালোচকেরা ভোলেন নি। সম্মেলনের শুরু থেকেই সমালোচনার ঝড় বয়ে গেল। তার ওপর সম্মেলনের সাফল্য যেন তাঁদের আরো ক্ষিপ্ত করে তুললো। বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সংগীতশিল্পীর বিবৃতি ও পত্র তাঁরা সংগ্রহ করলেন, সম্মেলনের বিরুদ্ধে কেউ কেউ একাধিকবার নিজের মনোভাব জ্ঞাপন করতেও ছাড়লেন না। সম্মেলনের শেষে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সম্মেলন পরিচালনা সমিতি নামে একটি কমিটি গঠিত হয় ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকীকে সভাপতি ও ড. কাজী মোতাহার হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে। উদ্দেশ্য : প্রতি বছর সাহিত্য-সম্মেলন করা। গোষ্ঠীপ্রীতির অভিযোগ এড়াতে ভিন্ন মতাবলম্বী বহু শিল্পী-সাহিত্যিককে এই কমিটিতে রাখা হয়েছিল। তাঁরা একেক করে নাম প্রত্যাহার করে নিতে লাগলেন, এমনকি, আমাদের সঙ্গে যাঁরা সাহিত্য-সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ। পরিচালনা সমিতি ভেস্তে গেল, অনেককে নিয়ে কাজ করার আশাও শেষ হয়ে গেল।

১০.

সাহিত্য-সম্মেলন শেষ হওয়ার তিন সপ্তাহের মাথায় দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরী কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। শেষবার নিজের দল নিয়ে তিনি ইউরোপ সফর করতে যাওয়ার আগে কার্জন হলে তাঁদের পরিবেশনা দেখে আনন্দিত হয়েছিলাম। বুলবুল চৌধুরী, আফরোজা বুলবুল, অজিত সান্যাল ও শম্ভুর নিপুণ নৃত্য এবং তিমিরবরণের সংগীত সত্যিই মুগ্ধ করেছিল। বুলবুলের ইউরোপ-সফরকে পাকিস্তানি সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বমূলক প্রদর্শন হিসেবে বিবেচনা ও প্রচার করা হয়েছিল। অথচ নৃত্যশিল্প নিয়েই তো পাকিস্তানে বিতর্ক ছিল, আর বুলবুলের অনেক নৃত্যের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ও শ্রেণীশোষণবিরোধী ভাবের সঙ্গে পাকিস্তানের সরকারি সংস্কৃতি-ভাবনার কোনো মিল ছিল না। তবু তাঁর হাফিজের স্বপ্ন, আনারকলি, চাঁদ সুলতানা প্রভৃতি নৃত্য মুসলমানের নিজস্ব শিল্পের প্রতিফলন বলে গণ্য হয়। ফলে, বুলবুল চৌধুরী সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তবে ইউরোপ থেকে ফিরে তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমশ ভেঙে পড়তে থাকে, চেষ্টা করেও শেষরক্ষা করা যায়নি।

বুলবুলের মৃত্যুতে তাঁর বন্ধু মাহমুদ নূরুল হুদার উদ্‌যোগে কার্জন হলে বেশ বড়ো একটা শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। বেগম শামসুননাহার মাহমুদ সভাপতিত্ব করেছিলেন এবং পাকিস্তানের সরকারি পর্যায় থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশ থেকে বহু শোকবার্তা এসেছিল। শোকসভায় নূরুল হুদা প্রস্তাব করলেন, মরহুম শিল্পীর স্মরণে বুলবুল ললিতকলা কেন্দ্র বা বুলবুল একাডেমি অফ ফাইন আর্টস গঠন করা হোক। সোৎসাহে এ প্রস্তাব গৃহীত হলো।

মাহমুদ নূরুল হুদার কথা একটু বলে নিই। নোয়াখালির (এখন ফেনীর) এই সন্তান ছিলেন মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্‌র (বাহার) মাতুল। সেই সূত্রে ক্রীড়া ও সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তবে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হন ছাত্রনেতা হিসেবে। তিনি ছিলেন নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক, নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের যুগ্ম-সম্পাদক এবং জিন্নাহ্‌র মনোনয়নক্রমে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিল-সদস্য। ১৯৪০ সালে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের আন্দোলনে যে-কমিটি গঠিত হয়, সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন তার সভাপতি এবং নূরুল হুদা সম্পাদক। এ কে ফজলুল হক-প্রতিষ্ঠিত এবং কাজী নজরুল ইসলাম-সম্পাদিত *নবযুগ* পত্রিকার তিনি ছিলেন জেনারেল ম্যানেজার ও পরে বার্তা-সম্পাদক। ছ-সাত বছর তিনি সোহ্‌রাওয়ার্দীর ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ-প্রতিষ্ঠার জন্যে যে-অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়, তার সভাপতি ছিলেন তিনি, আবার গণতন্ত্রী দলেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সহ-সভাপতি ছিলেন।

বুলবুল চৌধুরীর সঙ্গে নূরুল হুদার যোগাযোগ হয় উভয়ের ছাত্রাবস্থায়, কলকাতার বেকার হস্টেলে থাকার সময়ে। তাঁরা দুই বন্ধু মিলে কলকাতায় ওরিয়েন্টাল ফাইন আর্টস অ্যাসোসিয়েশন (ওফা) গঠন করেছিলেন। বুলবুল চৌধুরীর নৃত্য-সম্প্রদায়ের ম্যানেজার হিসেবেও নূরুল হুদা দেশবিদেশে ঘুরেছেন। বুলবুলের স্মরণে ওফা নামের সাদৃশ্যে নূরুল হুদা বুলবুল অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস (বাফা) গঠন করতে চান।

বুলবুলের শোকসভায় যে-স্মৃতি কমিটি গঠিত হয়, তাতে হুদা ভাই তাঁর আত্মীয়া শামসুননাহার মাহমুদ ও আনোয়ারা বাহার চৌধুরীকে জড়িত করেন। তাছাড়া বিচারপতি মোহাম্মদ ইবরাহিম ও ড. কাজী মোতাহার হোসেনকে, তাঁর কলকাতার পরিচিত সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া), মোহাম্মদ মোদাব্বের, এম এ মোহাইমেন ও কামরুল হাসানকে, গণতন্ত্রী দলে তাঁর সহকর্মী সৈয়দ মুহম্মদ হোসেনকে, বুলবুলের নৃত্য-সম্প্রদায়ের সদস্য ওস্তাদ খাদেম হোসেন খান ও অজিত সান্যালকে যুক্ত করেন এবং আহমদ ও আমাকে অন্তর্ভুক্ত করেন। আমরা দুজন ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ, তবে খেটেছিলাম যথেষ্ট। বুলবুলের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে, ১৯৫৫ সালের ১৭ মে তারিখে, বাফার আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন ঘটে। পূর্ব বাংলায় রীতিসম্মতভাবে নৃত্যগীতবাদ্য-শিক্ষাদানের এটিই ছিল প্রথম প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর বিধবা বেগম রানা লিয়াকত আলী খানকে সভাপতি এবং বিচারপতি মোহাম্মদ ইবরাহিমকে নির্বাহী সভাপতি হতে সম্মত করান হুদা ভাই, নিজে হন সাধারণ সম্পাদক। ওপরে যাঁদের নাম করেছি, তাঁরা সবাই কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হয়েছিলেন—আহমদ ও আমিও। বাফার প্রতিষ্ঠালগ্নে সংগীতশিল্পী আবদুল আহাদ ও বেদারউদ্দীন আহমদের এবং পরে

বাফার প্রতিষ্ঠালগ্নে সংগীতশিল্পী আবদুল আহাদ ও বেদারউদ্দীন আহমদের এবং পরে সেলিনা বাহারের [পরে সেলিনা বাহার জামান] ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বাফার প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হিসেবে আমাদের অনেকেরই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল ।

১১.

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নানা ধরনের জটিলতা দেখা যাচ্ছিল, তার সবটা আমার বুদ্ধি-বিবেচনার গম্য ছিল না। পূর্ব পাকিস্তান যখন ৯২ক ধারার যাঁতাকলে পিষ্ট, তখন—১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে—গভর্নর-জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ পাকিস্তান গণপরিষদ ভেঙে দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে আমরা অনেকেই এতে সন্তোষ প্রকাশ করলাম। আমাদের বিবেচনায়, যে-গণপরিষদ একটি সংবিধান-প্রণয়নে ব্যর্থ হয়েছে এবং পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচনের পরে যে-গণপরিষদে এই প্রদেশের সদস্যেরা অধিকাংশই প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র হারিয়েছেন, সে-গণপরিষদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কোনো সংগত কারণ নেই।

এখানে একটা টীকা দিয়ে রাখি। পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয়ের পর মধুর দোকানে বসে আমি প্রস্তাব করেছিলাম যে, গণপরিষদের যেসব সদস্য প্রাদেশিক নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেককে কটাক্ষ করে তারবার্তা পাঠানো যাক। তারবার্তাটি হবে একটি ইংরেজি প্রবাদমাত্র : Failures are the pillars of success; ঠিকানা হবে পাকিস্তান গণপরিষদ, করাচি। আশেপাশে অনেকেই রাজি হয়ে গেলেন, টাকা-পয়সাও দিলেন; কেউ কেউ অবশ্য সন্দেহ প্রকাশ করলেন যে, সদস্যেরা এটাকে উৎসাহবাক্য মনে করতে পারেন। কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাফ অফিসে যখন আমি তারবার্তাগুলো পাঠাতে এলাম, তখন দেখা গেল, পয়সার কিছু ঘাটতি পড়ছে। একেবারেই অজানা এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বাকি পয়সাটা দিয়ে দিলেন। এতে ওইসব সদস্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনোভাব খানিকটা বোঝা যাবে।

আমরা ওই মনোভাব থেকেই পরিচালিত হলাম। গভর্নর-জেনারেলের পক্ষে গণপরিষদ ভেঙে দেওয়া যে কতোটা অগণতান্ত্রিক ও হঠকারী কাজ, আমরা তা বুঝলাম না—দেশের অধিকাংশ মানুষই বোঝে নি। বাতিল গণপরিষদের স্পিকার তমিজউদ্দিন খান অবশ্য গভর্নর-জেনারেলের এই আদেশের বিরুদ্ধে মামলা করলেন সিন্ধু চিফ কোর্টে, কিন্তু তার আগেই প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী নিজের মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করে ফেলেন গভর্নর-জেনারেলের ইঙ্গিতে, হয়তো প্রধান সেনাপতি আইয়ুব খানের ইঙ্গিতেও। তাঁর এই নতুন মন্ত্রিসভা 'ক্যাবিনেট অফ ট্যালেন্টস' আখ্যা পেয়েছিল। এই প্রতিভাবানদের মধ্যে আইয়ুব খান থাকলেন, ইস্কান্দর মির্জা পূর্ব বাংলার গভর্নরের পদ ছেড়ে কেন্দ্রে মন্ত্রী হলেন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে খান আবদুল গাফফার খানের ভাই ডা. খান সাহেবকে আনা হলো, সিন্ধুর প্রতিনিধিত্ব করলেন গোলাম আলী তালপুর, পূর্ব বাংলার একজন মন্ত্রী রয়ে গেলেন—১৯৪৯ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে—তিনি ডা. আবদুল মোতালেব মালিক।

এর অব্যবহিত পরেই গভর্নর-জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ এলেন পূর্ব

বাংলা-সফরে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পদচ্যুতির পরে এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও তার সমর্থকদের এবং আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ও তার সমর্থকদের মধ্যে ক্ষমতালাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছিল—যদিও সে-আশা তখন সুদূরপরাহত। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট ভাঙার উদ্দেশ্যে কেউ না কেউ এঁদের লোভ দেখাচ্ছিলেন। তার ফলে, গভর্নর-জেনারেলকে ঢাকা বিমানবন্দরে সংবর্ধনা-জ্ঞাপনের জন্যে ফজলুল হক ও আতাউর রহমানের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে গেল। দুজনেই বিমানবন্দরে গেলেন মালা নিয়ে। আমার বন্ধু আহমদ হোসেনও ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে গোলাম মোহাম্মদকে মাল্যভূষিত করে এলো—পরে তা নিয়ে ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে বিরাট তর্ক লেগে গেল যায় এবং তার জের চলে বহুকাল ধরে।

জনপ্রতিনিধিরা যখন এভাবে গভর্নর-জেনারেলকে প্রকাশ্য সমর্থন জানালেন, সিন্ধু চিফ কোর্ট তখন রায় দিলেন যে, গণপরিষদ ভেঙে দেওয়া গভর্নর-জেনারেলের এখতিয়ার-বহির্ভূত এবং সে-কারণে অবৈধ হয়েছে। সরকার এ-রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করলেন ফেডারেল কোর্টে আর তখনই সকলকে অবাক করে দিয়ে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন আইনমন্ত্রী হিসেবে।

সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রী হওয়ায় আপাতত লাভ হলো দুটো : শেখ মুজিবুর রহমান এবং আরো কেউ কেউ কারামুক্ত হলেন—৯২ক ধারা জারি করার পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল; আর মওলানা ভাসানী দেশে ফিরে আসতে পারলেন। আগেই বলেছিলাম যে, পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন প্রবর্তন করার সময়ে মওলানা ভাসানী ছিলেন স্টকহোমে—বিশ্ব শান্তি পরিষদের সম্মেলনে যোগ দিতে। তারপরে তিনি ইউরোপেই রয়ে গিয়েছিলেন—বেশিরভাগ সময়ে লন্ডনে—সেখানে তাঁকে তুলনা করা হয়েছিল রেড ডিন্ অফ ক্যান্টারবারির সঙ্গে (মওলানার কয়েক মাসের প্রবাস জীবন নিয়ে তাঁর সঙ্গী খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস পরে লিখেছিলেন *ভাসানী যখন ইউরোপে*, ঢাকা, ১৯৫৭)। পূর্ব বাংলার গভর্নর ইস্কান্দর মির্জা ঘোষণা করেছিলেন যে, ভাসানী রাষ্ট্রদ্রোহী এবং দেশে ফিরে এলে তাঁকে গুলি করা হবে। মওলানা ভাসানী ইউরোপ থেকে ফিরে এসেছিলেন ভারতে : বোম্বাইতে জাহাজ থেকে নেমে কলকাতায়, সেখান থেকে তাঁর পুরনো ঘাঁটি আসামে। মন্ত্রী হওয়ার পরে সোহ্‌রাওয়ার্দী কলকাতা থেকে মওলানাকে ঢাকায় ফিরিয়ে আনেন। ইস্কান্দর মির্জা তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী—মওলানাকে গুলি করা দূরে থাক, গ্রেপ্তারও করতে পারেন নি।

তবে মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রিসভায় সোহ্‌রাওয়ার্দী যোগদান করে তাকে যে বৈধতা দিয়েছিলেন, তাতে এই লাভের তুলনায় ক্ষতি হয়েছিল অনেক বেশি। ফজলুল হকও পিছিয়ে থাকেন নি, তিনিও আঁতাত করেছিলেন গোলাম মোহাম্মদের সঙ্গে। তার ফলে, সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রী হওয়ার ১৫ দিনের মাথায় তাঁর মনোনীত আবু হোসেন সরকার স্বাস্থ্যমন্ত্রী হলেন কেন্দ্রে।

হক-সোহ্‌রাওয়ার্দী মিলে এই ছাড় দেওয়ার হাতে হাতে ফল আমরা পেলাম ১৯৫৫ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে। ভাষা-আন্দোলনের শহীদদের জন্যে শোকপ্রকাশ তখন নিষিদ্ধ হয়েছিল সরকারিভাবে। ছাত্রেরা অবশ্য তা মানে নি, সেকথা পরে বলবো। তবে

কয়েকদিনের মধ্যেই আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় নতুন সরকার ক্ষমতাসীন হয়, আওয়ামী লীগ রয়ে যায় ক্ষমতাবলয়ের বাইরে। অবশ্য তার আগেই তমিজউদ্দিন খানের মামলায় এবং অব্যবহিত পরে আরো একটি মামলায় ফেডারেল কোর্ট যে-রায় দেন, তাতে গণপরিষদ ভাঙাটা অবৈধ বলা হলো না বটে, তবে নতুন গণপরিষদ নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া হলো। সে-নির্বাচন হয় ৩০ মে তারিখে, বিভিন্ন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের ভোটে, পরোক্ষভাবে এবং প্রেফারেনশিয়াল ভোটিং সিস্টেমে।

পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার স্পিকার নির্বাচিত হয়েছিলেন আবদুল হাকিম—খুলনা থেকে নির্বাচিত পরিষদ-সদস্য, আইনজীবী ও নজরুল-কাব্যের ইংরেজি অনুবাদক। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নাজিম মাহমুদ আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার বদৌলতে পাশ নিয়ে স্পিকারের গ্যালারিতে (কখনো কখনো বাধ্য হয়ে দর্শকের গ্যালারিতে) বসে ব্যবস্থাপক সভার কার্যক্রম দেখার এবং অনেক কিছু জানার সুযোগ আমাদের হয়। এর মধ্যে দর্শকদের সারিতে বসে দেখেছিলাম গণপরিষদ-সদস্য-নির্বাচন। এখন কাগজপত্রে দেখছি, যুক্তফ্রন্টের ১৬ জন, আওয়ামী লীগের ১২ জন, কংগ্রেসের চার জন, ইউনাইটেড পিপলস প্রোগ্রেসিভ পার্টির দুজন, তফসিলি ফেডারেশনের দুজন, মুসলিম লীগের একজন, কমিউনিস্ট পার্টির একজন এবং নির্দলীয় একজন নির্বাচিত হয়েছিলেন। আমার স্পষ্টই মনে পড়ে যুক্তফ্রন্টের ১৬ জনের মধ্যে কৃষক-শ্রমিক পার্টির ফজলুল হক (সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছিলেন), হামিদুল হক চৌধুরী ও ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) এবং নেজামে ইসলামের মওলানা আতাহার আলী ও ফরিদ আহমদ, আওয়ামী লীগের সোহ্‌রাওয়ার্দী (দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পান), আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান, জহিরুদ্দীন ও আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, কংগ্রেসের বসন্তকুমার দাস, ইউপিপিপির কামিনীকুমার দত্ত, মুসলিম লীগের মোহাম্মদ আলী (দেশের প্রধানমন্ত্রী), কমিউনিস্ট পার্টির সরদার ফজলুল করিম (জেল থেকে নির্বাচিত) এবং নির্দলীয় সদস্য (প্রাক্তন বাণিজ্যমন্ত্রী) ফজলুর রহমানের নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা। মুসলিম লীগের এতকালের ও এতবড়ো একজন নেতা ফজলুর রহমান যে নির্দলীয় প্রার্থী হয়েছিলেন, এটা বিস্ময়কর; প্রাদেশিক পরিষদে মুসলিম লীগের তেমন সদস্য না থাকা সত্ত্বেও মোহাম্মদ আলী যে নির্বাচিত হলেন, এটাও বিস্ময়কর—আঁতাতের ফল ছাড়া আর কিছু নয়; সবচেয়ে বিস্ময়কর সাত বছরের কমিউনিস্ট কারাবন্দি সরদার ফজলুল করিমের বিজয়। আমার মনে পড়ে নির্বাচনের ফলাফল জেনে যখন পরিষদ-ভবন থেকে বেরিয়ে আসছি, সামনের ফুটপাতে অপেক্ষমাণ ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন আমাদের বন্ধু নুরুল হক। তিনি আমাকে দেখেই অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে জানতে চাইলেন, সরদার ভাই হয়েছেন, সরদার ভাই হয়েছেন? আমি যখন বললাম, হ্যাঁ, তখন তাঁর মুখে যে-হাসি ফুটে উঠলো, তা শুধু স্বস্তির নয়, দিগ্‌বিজয়ের। সরদার ফজলুল করিমকে তখনো দেখি নি, শুধু তাঁর কথা শুনেছি। তাঁর বিজয় মনে হলো আদর্শের বিজয়, আমার বিজয়। তিনি নয়টি প্রথম ভোট পেয়েছিলেন। পরে তাঁর বিরোধীরা প্রশ্নটা তুলছিলেন—প্রাদেশিক পরিষদে কমিউনিস্ট সদস্য তেমন না থাকা সত্ত্বেও সরদার ফজলুল করিম কী করে নির্বাচিত হলেন, যে-প্রশ্ন আমার মনে জেগেছিল বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর জয়লাভে।

১২.

সাহিত্য-সম্মেলনের প্রস্তুতিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বার্ষিক পরীক্ষা দিয়েছিলাম। তখন প্রথম বর্ষশেষে আমাদের দুই পত্র পরীক্ষা দিতে হতো : অনার্সের বিষয়ে এক পত্র এবং সাধারণ ইংরেজিতে এক পত্র। দুই পত্রেই পাশ করা আবশ্যিক ছিল। বাংলায় আমি প্রথম হয়েছিলাম, ইংরেজিতেও উতরে গিয়েছিলাম; কিন্তু আমাদের দুই সতীর্থ বাংলায় পাশ করেও ইংরেজিতে ফেল করেছিল। ফলে তাদেরকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হলো। আমার খুব খারাপ লেগেছিল। তবে ওই দুজনের একজন আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিল, 'কিচ্ছু ভেবো না, পাস কোর্সে বি এ পাশ করে আবার এই বিভাগেই এম এ-তে ভর্তি হবো। তখন আবার একসঙ্গে পড়া যাবে।' হারাধনের দশটির মধ্যে এখন 'রইলো বাকি আট'।

দ্বিতীয় বর্ষে আমরা সাধারণ ইংরেজি পড়লাম বিভাগীয় অধ্যক্ষ প্রফেসর জে এস টার্নারের কাছে। টার্নার প্রত্যেক ক্লাসে সেদিনকার *পাকিস্তান অবজারভারের* একটা কপি বগলদাবা করে আনতেন, তারপর তার চিঠিপত্রের স্তম্ভ থেকে অশুদ্ধ ইংরেজি বোর্ডে লিখে আমাদের শুদ্ধ করতে বলতেন, আমরা না পারলে নিজে শুদ্ধ করে দিতেন; আমাদের অপারগতা নিয়ে কখনো হাসিঠাট্টা করতেন না, ক্লাসের সবাইকে যতটাসম্ভব অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ দিতেন; শুদ্ধাশুদ্ধের পার্থক্য বুঝিয়ে দিতেন, তাতে আমাদের খুব উপকার হতো। সাবসিডিয়ারি ক্লাসে ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন পড়াতেন ইংরেজি প্রবন্ধ, আমাদের যে-কোনোরকম অজ্ঞতা তাঁর কৌতুক উদ্রেক করতো। আমাদের পাঠ্য কোনো একটি প্রবন্ধে ড্রুয়ারি লেনের উল্লেখ ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ড্রুয়ারি লেন কোথায়? আমি বললাম, লন্ডনে। তিনি বললেন, তা সকলেই জানে। লন্ডনের কোথায়? আমি বলতে পারলাম না। এবারে তিনি মোকাম্মেলকে ধরলেন। মোকাম্মেল বললো, এটা লন্ডনের থিয়েটার-এলাকা। ড. হোসায়েন তাতেও খুশি নন, আবার জানতে চাইলেন, লন্ডনের কোথায়? লন্ডনের ভূগোল আমাদের জানা ছিল না, তিনি খুবই হতাশ হলেন। আরেকবার কী এক কথায় আমি বলেছিলাম থাইল্যান্ড। ড. হোসায়েন অমনি বললেন, 'বেগ ইওর পার্ডন?' বুঝলাম, আমার উরুশ্চারণের ভুল হয়েছে। জবাব দিলাম, আমি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি দেশের কথা বলছিলাম সার্, তার নামটার বানান টি-এইচ-এ-আই-এল-এ-এন-ডি। উনি মৃদু হেসে বললেন, 'ও, ইউ মিন টায়ল্যান্ড?' আমার চুপ করে থাকার পালা।

বি সি রায় পড়াতেন জর্জ এলিয়টের উপন্যাস *সাইলাস মারনার*, আর এ গোমেজ পড়াতেন কবিতা। কিছুদিন পর কী যে হলো, ঘন ঘন বদল হলো শিক্ষকের। জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা একদিন প্রবন্ধের ভূমিকা করলেন তো খান সারওয়ার মুরশিদ দুদিন পড়ালেন কবিতা। মিসেস শাহনওয়াজ নামে এক ইংরেজ মহিলা কিছুকাল পড়িয়েছিলেন বার্নার্ড শ-র নাটক *আর্মস অ্যান্ড দি ম্যান*। রোলকল করার সময়ে অনেকেই 'ইয়েস সার্, সরি, ইয়েস ম্যাডাম' কিংবা 'প্রেজেন্ট সার্, আই মিন প্রেজেন্ট ম্যাডাম' বলতো। তিনি বলতেন, দেখো, সার্ বা ম্যাডাম যা-ই বলো, তাতে কিছু এসে যায় না, কিন্তু নিজেদের ভুল সংশোধন করতে যেয়ে বৃথা সময় নষ্ট

কোরো না। উঁচু ডেস্কের ওপরে দুহাত তালুবন্দি করে তিনি যখন কথা বলতেন, আমরা স্পষ্টই দেখতাম তা কাঁপছে। শেষ পর্যন্ত তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন, এবারে নাটক পড়াতে এলেন মুজিবুল হক (অবসরপ্রাপ্ত সচিব)। তিনি আমাদের মধ্যে ভূমিকা বন্টন করে দিয়ে নাটকের সংলাপ পাঠ করতে বলতেন, তাতে কেউ মজা পেতো, কেউ বিব্রত হতো। শেষকালে এ-নাটক পড়িয়েছিলেন মুনীর চৌধুরী—তবে তা বেশ পরের কথা।

ভারতবর্ষের মুসলিম শাসনামলের ইতিহাস পড়াতেন ওয়াদুদুর রহমান; ব্রিটিশ শাসনামলও তাঁর পড়াবার কথা ছিল, কিন্তু অতদূর পৌঁছোতে পারেন নি। কী করেই বা পারবেন! তিনি ক্লাসে এলে মূলত জহরত আরা—মাঝে মাঝে অন্য কেউ—বলতো, 'সার্, আজ পড়া থাক, আপনি গল্প বলুন, আমরা শুনি।' তিনি একটু আপত্তি করে গল্প করতেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজনীতিক আতাউর রহমান খান ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমলা খান শামসুর রহমানের, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংবা অন্য টুকিটাকির। ইউরোপের আধুনিক ইতিহাস পড়াতেন সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রথম দু-একটি ক্লাসের পর তিনি বাংলায় পড়ানো শুরু করলেন—আমাদের খুব ভালো লাগতো। এতে এক ছাত্র একদিন আপত্তি করে বসলো। বললো, যেহেতু আমাদের পরীক্ষা দিতে হবে ইংরেজিতে, অতএব, সার্ যেন ইংরেজিতেই পড়ান। আমরা অনেকে বাংলায় বক্তৃতা শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করলেও—সেই যে সার্ বললেন, 'আচ্ছা, তাই হবে'-তারপর থেকে তিনি ইংরেজিতেই পড়িয়ে গেলেন।

এদিকে বাংলা বিভাগে পরিবর্তনের ঢেউ লাগলো। করাচি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ খুলবে বলে রিডার চায়। আমাদের তিন শিক্ষক—মুহম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান ও কাজী দীন মুহম্মদ—সেখানে প্রার্থী হলেন এবং করাচি গেলেন সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হতে। খরচটা সম্পূর্ণ বা অর্ধেক বহন করেছিল করাচি বিশ্ববিদ্যালয়। কাজটা পেলেন সৈয়দ আলী আহসান—আমাদের দ্বিতীয় বর্ষের পড়া অসমাপ্ত রেখে তিনি চলে গেলেন। এদিকে রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী নিজের সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা ঠিকমতো বিশ্ববিদ্যালয়কে দেখাতে অপারগ হওয়ায় বোধহয় চাকরি ছেড়ে দিলেন। তারপর শোনা গেল ড. শহীদুল্লাহ্ অবসর নিচ্ছেন।

এই সময়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন জীবনানন্দ দাশ। বাংলা বিভাগে আমরা শোকসভার আয়োজন করলাম। আমরা অনুরোধ করে নিয়ে এলাম জীবনানন্দের ছাত্র কথাসাহিত্যিক শামসুদ্দীন আবুল কালামকে এবং *চতুরঙ্গে* জীবনানন্দর কাব্যগ্রন্থ-সমালোচনাকারী কবি আবুল হোসেনকে। শোকসভায় তাঁদের দুজনের মধ্যে তর্ক লেগে গেল জীবনানন্দ দাশকে নির্জনতার কবি বলা সংগত কিনা, এই নিয়ে। সভাপতি ড. শহীদুল্লাহ্ তাঁদের থামিয়ে বললেন, এটা শোকসভা—ডিবেটিং ক্লাব নয়। সভাপতির ভাষণে তিনি বললেন, 'রবীন্দ্রনাথ কবিগুরু, আমিও কবিগুরু। রবীন্দ্রনাথ কবিদের মধ্যে গুরুস্বরূপ; আর আমি কবিদের শিক্ষক—অজিত দত্ত থেকে মযহারুল ইসলাম পর্যন্ত কবি আমার ছাত্র। জীবনানন্দ দাশও আমার ছাত্র ছিল—সেকথা আমার মনে ছিল না, পথে একদিন দেখা হতে সে-ই বলেছিল।' জীবনানন্দ যে কোথায় কখন তাঁর ছাত্র ছিলেন, তা অবশ্য আমরা জানতে পারিনি।

শহীদুল্লাহ্‌র কার্যকাল যে শেষ হয়ে আসছে, তা আমরা জানতাম। এমন কি, কাজী মোতাহার হোসেন, জসীমউদ্‌দীন, গোলাম মোস্তফা ও মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের মধ্যে কেউ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন, এমন কথাও শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবসরগ্রহণের রীতি ছিল ৩০ জুনে। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভাইস-চান্সেলর এসেছেন ড. ডব্লিউ এ (ওয়ালটার অ্যালেন) জেনকিনস—প্রতিষ্ঠাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক। তিনি ছিলেন ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসের লোক, চাকরির শেষে বিলেতে ফিরে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে তাঁকে আনা হলো ১৯৫৩ সালের শেষে। তিনি স্থির করলেন, ১৯৫৪ সালের নভেম্বরে শহীদুল্লাহ্‌কে অবসর দেওয়া হবে। আমরা এই শুনে ভাবলাম, শহীদুল্লাহ্‌কে আরো কিছুকাল—অন্তত ৩০ জুন পর্যন্ত—রাখার জন্যে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাবো। মুজিব ভাই একটু নিস্পৃহভাবে বললেন, 'তার আগে সারের মতটা একটু জেনে নিও।' আমরা দল বেঁধে গেলাম অধ্যক্ষের ঘরে। বললাম, 'সার্‌, আপনি যেন আরো কিছুকাল বিভাগে থাকেন, এজন্যে আমরা ভাইস-চ্যান্সেলরের কাছে স্মারকলিপি দিতে চাই।' তিনি নিষেধ করলেন। বললেন, 'দেখো, তোমরা আমাকে ভালোবেসে এমন করতে চাইছো, কিন্তু অন্যেরা মনে করতে পারে, আমার ইঙ্গিতে তোমরা এমন করছো। সেটা আমার পক্ষে সম্মানজনক হবে না। তাছাড়া, আবদুল হাই বা কী ভাববে!' তখন আমরা বুঝলাম, তাঁর উত্তরাধিকারী পর্যন্ত স্থির হয়ে গেছে। আমরা আর কোনো দরখাস্ত করলাম না। তবে খুব আন্তরিকভাবে এবং যথাসাধ্য রুচিসম্মতভাবে তাঁকে বিদায় দেওয়ার আয়োজন করলাম। আমরা তাঁকে তিনটি বই উপহার দিলাম—*অক্সফোর্ড কম্প্যানিয়ন টু ইংলিশ লিটারেচর*, *ধ্বন্যালোক* ও *লোচন*, আর বাংলা সাহিত্যের একটি বই। বাংলা বিভাগ থেকে অবসর নেওয়ার পরদিন শহীদুল্লাহ্‌ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার যোগ দিয়েছিলন ফরাসি ভাষার খণ্ডকাল শিক্ষক হিসেবে। যোগ দিয়ে এসে তিনি আমাদের বিভাগে অধ্যক্ষের ঘরে একবার এলেন। মুহম্মদ আবদুল হাই অধ্যক্ষের আসন ছেড়ে শহীদুল্লাহ্‌কে তাতে বসতে বললেন। 'নো, নো, ইট বিলংস টু ইউ' বলে পাশের একটা চেয়ারে তিনি বসলেন।

১৩.

১৯৫৪ সালের গোড়ায় বড়োদুলাভাই বরিশাল থেকে বদলি হয়ে গেলেন রংপুরে। ছুটিতে আমি সেখানে বেড়াতে গেলাম। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী হিসেবে ট্রেনে রওনা হলাম ঢাকা থেকে। ভালো করে সকাল হওয়ার আগে পৌঁছোলাম বাহাদুরাবাদে। সেখানে ফেরি ধরতে হয়, যদিও ছাড়তে তার দেরি। ফেরিতে উঠে আরাম করে নাশতা খাওয়া গেল। তিস্তামুখঘাটে এসে আবার ট্রেন—এবার ব্রড গেজের।

বড়োবুবুরা থাকতো গোমস্তাপাড়ায়। জীবন সেখানে একরকম নিস্তরঙ্গ। বিদ্যুৎ নেই, কলের পানি নেই। খবরের কাগজ পৌঁছোয় প্রকাশের পরদিন দুপুর তিনটে নাগাদ। প্রধান খবরগুলো জানা হয়ে যায় তার আগেই—ট্রানজিস্টর রেডিওর বদৌলতে। চার

ভাগ্নে-ভাগ্নির সঙ্গে গল্প করি, তাদের বই পড়ে শোনাই। দুলাভাই একদিন নিয়ে গেলেন তাজহাটে—ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর পৈতৃক প্রাসাদে। সামনের আঙিনায় তাঁর দু-একটি ভাস্কর্য এবং সিঁড়িতে উঠতে ও ড্রইংরুমে ঢুকতে পরিবারের সদস্যদের তৈলচিত্র চোখে পড়ে। আমার বন্ধু আবদুল আলীদের বাড়ি ধাপে। যতোদূর মনে পড়ে, বি এ পাশ করে সে বাড়িতে—এমনও হতে পারে যে, ঢাকায় দর্শনে এম এ প্রথম পর্বে ভর্তি হয়ে বাড়ি ফিরেছে। তার সঙ্গেই বেশি সময় কাটাই, দেখতে যাই কারমাইকেল কলেজ বা শহরের কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—আলী সেখানে হাওয়াইয়ান গিটারে বাংলা গানের সুর তোলে। তাদের বাড়ির অদূরে থাকেন কায়সুল হক—খ্যাতিমান লেখক, বাড়ির নামও সাহিত্য-ভবন। কায়সুল হকের কাছে দেখতে পাই বিখ্যাত বিখ্যাত সাহিত্যিকের চিঠি—অন্নদাশংকর রায় থেকে বুদ্ধদেব বসুর, আবু সয়ীদ আইয়ুব থেকে আরো অনেকের। কায়সুল হক তখন পরিকল্পনা করেছিলেন পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যিকদের লেখা নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশ করবেন। তাঁর সংগ্রহের অনেকগুলো চিঠি এই দাবির উত্তরে লেখা। তবে চিঠি লেখা ছিল কায়সুল হকের অভ্যাসের অন্তর্গত—ওভাবেই অনেকের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল।

রংপুরে আর গিয়েছিলাম সহপাঠী শহীদার বাড়িতে। তিনিও ছুটি কাটাতে স্থায়ী ঠিকানায় এসেছেন। আমি গিয়ে খবর দিতেই অল্প সময়ে বেরিয়ে এলেন। খানিকক্ষণ গল্প করে চা খেয়ে ফিরলাম।

যুবলীগের সূত্রে পরিচিত আজিজুল হক ও বিশ্ববিদ্যালয়-সূত্রে পরিচিত জাহিদুল হক চৌধুরীকে রংপুরে পেলাম। নতুন পরিচয় হলো কাজী মোহাম্মদ ইদরিসের ভ্রাতা নাট্যকার কাজী মোহাম্মদ ইলিয়াসের সঙ্গে এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী মিলি চৌধুরী ও তাঁর ভাই মাসুদুল হক চৌধুরীর সঙ্গে। (এঁরা দুজনেই ১৯৭১ সালে শহীদ হয়েছিলেন)।

রংপুরের বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী আজীবন নিষ্ঠাবান বামপন্থী আমিনুল ইসলাম ১৯৫৭-৫৮ সালে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন *নীলা মিতা পুতুল এবং রাজনীতি* (ঢাকা, ১৯৮৭) নামে। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি, তাতে আমার রংপুরের ব্যক্তিগত সফর অনেক গৌরবান্বিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বিবরণটি কৌতূহলোদ্দীপক বলে উদ্‌ধৃত করছি।

> ...মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমানে যুদ্ধজোট তৈরি করছে।...শান্তির শক্তিও বসে নেই।...পূর্ব বাংলাতেও গঠিত হয়েছে শান্তি কমিটি। আওয়ামী লীগের অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট আতাউর রহমান খান সভাপতি। প্রধান পৃষ্ঠপোষক মওলানা ভাসানী। শাখা গঠিত হচ্ছে জেলায়।
>
> কমিটি গঠিত হবে রংপুরেও। ঢাকা থেকে এসেছেন শান্তি কমিটির সহ-সম্পাদক আনিসুজ্জামান। মিউনিসিপ্যাল হলে সভা ডেকেছেন গণতন্ত্রী দলের নবনির্বাচিত এম, এল, এ এ্যাডভোকেট আজিজুল হক। তারিখ ৩০শে মে, ১৯৫৪।
>
> ...১৯ মে ১৯৫৪ সাল। দেশের জীবনে একটা কলংকজনক দিন। মোহাম্মদ আলী এই তারিখে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তিতে স্বাক্ষর

করলেন।...১৯৫৬ [১৯৫৪?] সালে পূর্ববাংলা আইন পরিষদের ১৬৫ জন সদস্য এই চুক্তির প্রতিবাদ করে বিবৃতি দিয়েছেন। খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, আলী আকসাদ, আনিসুজ্জামান—এরা ছিলেন এই বিবৃতি প্রচারের উদ্যোক্তা। একই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ছাত্রনেতা এস এ বারি এটি এই ঘৃণ্য চুক্তির নিন্দা করেছেন।...

৩০ মে, ১৯৫৪। মিউনিসিপ্যালিটি হলে সভা শুরু হয়েছে। গণতন্ত্রী দল এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল গণ ও ছাত্র সংগঠনের লোকজন, বারের কিছু প্রবীণ ও নবীন উকিল সভায় এসেছেন।...রাত ৮টা, আসলে সন্ধ্যে। কারণ মাসটা মে মাস। আচমকা খবর এলো, কেন্দ্রের মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব বাংলার শতকরা ৯৭ জন লোকের ভোটে নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দিয়েছেন।...মুহূর্তে সভায় নেমে এলো বিষাদের ছায়া। সভাপতি সভা ভেঙ্গে দিলেন।

যে যার বাড়ী ফিরলাম।...

...ভোর ৫টায় গ্রেপ্তার হলাম।

এই বিবরণের সঙ্গে আমার স্মৃতির তেমন মিল নেই। ১৯৫৪ সালের ৩০ মে আমি ঢাকায় ছিলাম। রংপুরে গিয়েছিলাম অক্টোবর-নভেম্বরের দিকে। সেখানে শান্তি কমিটি গঠনের কথা আমার মনে নেই। তবে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে প্রচারে শরিক হয়েছিলাম আর সেকালে কোথাও গেলে ছাত্র ইউনিয়নের বা শান্তি কমিটির কিংবা বামপন্থী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হতো। আমিনুল ইসলামের লেখার এমন একটা ভিত্তি ছিল বলে মনে হয়। উপন্যাস উপন্যাসই। তবু এভাবে আমার কথা লেখার জন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করি।

১৪.

১৯৫৪ সালে বাংলা বিভাগে যাঁরা প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আবু হেনা মোস্তফা কামাল, নেয়ামাল বাসির, মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক), মাহমুদ শাহ কোরেশী (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা একাডেমীর প্রাক্তন মহাপরিচালক ও গণবিশ্ববিদ্যালয়ে ডিন), আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, জহির রায়হান, বদরুল হাসান, মাকসুদা বেগমের (রোকেয়া হলের সিনিয়র হাউজ টিউটর) কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। আবু হেনা মোস্তফা কামাল ম্যাট্রিক-ইন্টারমিডিয়েটে স্ট্যান্ড-করা ছাত্র। অত ভালো ছাত্র এর আগে আর বাংলা বিভাগে পড়তে এসেছিল কিনা সন্দেহ। নেয়ামালের ভর্তি নিয়ে একটা ছোটোখাটো ইতিহাস হয়ে গেল। ম্যাট্রিকে সে উর্দুতে লেটার পেয়েছিল; তারপর আই এ ক্লাসে এসে নিল ফারসি—তাতেও বোধহয় শতকরা ৭৬ নম্বর পেয়েছিল। ড. শহীদুল্লাহ্ মহা খুশি। বাংলায় অনার্স পড়া ছাত্রদের তিনি ইংরেজি সাবসিডিয়ারি নিতে উৎসাহিত করতেন—নেয়ামালকে ও গাফ্‌ফার চৌধুরীকে তিনি

ইংরেজি নিতে প্রবৃত্ত করলেন। তার ওপর, তিনি চাইলেন, নেয়ামাল ফারসিও পড়ুক। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে একসঙ্গে তিনটি ভাষা-সাহিত্য পড়ার সুযোগ ছিল না। শহীদুল্লাহ্ সাহেব নেয়ামালকে দিয়ে দরখাস্ত করালেন বিশেষ অনুমতি প্রার্থনা করে। বিষয়টা গেল একাডেমিক কাউন্সিলে এবং শহীদুল্লাহ্র চেষ্টায় তার দ্রুত ও অনুকূল নিষ্পত্তি হলো। বাংলায় অনার্সের সঙ্গে নেয়ামাল সাবসিডিয়ারি নিতে পারলো ইংরেজি ও ফারসি। আউয়াল এসেছিলেন মেডিক্যাল কলেজের পড়া ছেড়ে, কোরেশী চট্টগ্রাম কলেজ থেকে। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী তখনই সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক, জহির উদীয়মান।

বদরুল হাসানের কথা একটু সবিস্তারে বলতে ইচ্ছে করছে। তিনি ছিলেন শিল্পী কামরুল হাসানের অনুজ। কলকাতা থেকে ম্যাট্রিক পাস করে ঢাকায় এসে তাঁকে কিছুকাল মুনশিগঞ্জে থাকতে হয় সবচেয়ে বড়ো ভাইয়ের কাছে। সেখানে লেখাপড়ার সুবিধা হচ্ছিল না বলে মেজো ভাই কামরুল হাসানের কাছে চলে আসেন। পড়াশোনার খরচ চালাতে তাঁকে কখনো টিউশনি, কখনো সংবাদপত্রে চাকরি করতে হতো—কখনো দুই করতেন। তাঁর ছিল অসাধারণ রসবোধ—রফিকুল ইসলামের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে তিনি হাত বাড়িয়ে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন : বদরুল হাসান, ম্যাট সাপ ক্যাল; অর্থাৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাপ্লিমেন্টারিতে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন। একটু বেশি বৃষ্টি দেখলে বলতেন, 'আজ ঝালমুড়ি ও লেপমুড়ির দিন।' বদরুল কিছুকাল *মিল্লাতে* চাকরি করেছিলেন। ঠিকমতো বেতন পেতেন না বলে বার্তা-কক্ষের দরজায় বড়ো বড়ো করে লিখে রাখতেন : 'বেতন চাহিয়া লজ্জা দিবেন না।' কাগজের মালিক মোহন মিয়া পত্রিকার অফিস-পরিদর্শনে আসছেন জানতে পারলে তাঁর চোখে পড়ে, এমন জায়গায়, কাগজ সেঁটে দিতেন 'আবার মোহন' (ওই নামে মোহন-সিরিজে শশধর দত্তের একটি বই ছিল)। বদরুল গল্প করতেন : পত্রিকায় সংবাদের প্রুফ এলে দেখা যেতো অসমাপ্ত কম্পোজের পরে লেখা আছে, 'আর টাইপ নাই।' এটা বোধহয় নিছক গল্পই। প্যারডি-রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। রবীন্দ্রনাথের 'বন্দী বীর' কবিতার যে-খানিকটা প্যারডি করেছিলেন, তা ছিল এ রকম :

বুড়িগঙ্গার তীরে
টুপি লাগাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে পীরের দোওয়ায় জাগিয়া উঠিল শেখ—
পরে ইসলামি ভেক।

তাঁর এই প্রবণতা আমাকেও সংক্রমিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের 'আত্মত্রাণ' কবিতার প্রথম কয়েক চরণের প্যারডি করেছিলাম :

বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা—
বিপদে যেন পড়তে নাহি হয়।
দুঃখতাপে-ব্যথিত চিতে নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
সেই প্রয়োজন ভাবতে লাগে ভয়।

একদিন বেলতলায় বসে কয়েকজন ছাত্রী কুল (বরই) খাচ্ছিলেন। বদরুল তাঁদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে তাঁরা তাঁকেও খেতে ডাকলেন। বদরুল একটু থেমে বললেন,

'ছি, ছি, আমি আপনাদের কুল খাবো!'

সময়টাই ছিল যেন নির্মল পরিহাসের। প্রতি ইংরেজি নববর্ষে কলাভবনের গাড়িবারান্দায় শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের খেতাব দিয়ে দেওয়ালপত্র টাঙিয়ে দেওয়া হতো—বিজ্ঞান-ভবনেও নিশ্চয় এমন হতো। তাতে রঙ্গব্যঙ্গ থাকতো, রুচিবোধের অভাব থাকতো না। প্রথমবারের কিছু খেতাবের কথা মনে পড়ে। আবিদ হুসেনের নামের পাশে লেখা হয়েছিল : 'মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য'—তখন তাঁর মুখে অনেক ব্রণ উঠেছিল। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবকে কটাক্ষ করে তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'সচেতন পায়জামা'। আমাকে খেতাব দেওয়া হয়েছিল 'হাফ টিকিট'—বোধহয় দেহমনের অপরিপক্বতার কারণে।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, নেয়ামাল বাসির ও বদরুল হাসান—তিনজনেই ফজলুল হক মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র হয়েছিলেন। গাফ্ফারের কথা ঠিক বলতে পারি না, কিন্তু এতে বাকি দুজনের থাকার খুব সুবিধে হয়েছিল। নেয়ামালকে তার আগে থাকতে হতো মেসে; বদরুল থাকতেন কামরুল ভাইয়ের সঙ্গে, কিন্তু প্রায়ই তাঁর সঙ্গে রাগ করে ভাইয়ের বাড়ি ছেড়ে এদিকে-ওদিকে আস্তানা খুঁজতেন। যদিও অর্থোপার্জনে তাঁদের অনেকটা সময় যেতো, কিন্তু হল তাঁদের অনুকূল আশ্রয় দিয়েছিল।

১৫.

এই ১৯৫৪ সালেই একদিন মধুর দোকানে ঢুকেছি, রফিকুল ইসলাম মহা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'কোথায় ছিলে এতোক্ষণ! মুনীর ভাইকে জেলখানা থেকে নিয়ে এসেছিল ভাইভা দিতে।' কারাগার থেকে মুনীর চৌধুরী বাংলায় এম এ পরীক্ষা দিয়েছিলেন—প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পঠনপাঠনে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন সহবন্দি অজিত গুহ। ১৯৫৩ সালে এম এ প্রাথমিক পর্বের পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, এবারে চূড়ান্ত পরীক্ষা দিলেন। প্রিজন ভ্যানে করে তাঁকে কলাভবনে আনা হয়েছিল মৌখিক পরীক্ষা দিতে, পরীক্ষার সময়েও স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন ঘরের মধ্যে বসেছিল। বহিরাগত পরীক্ষক ড. মুহম্মদ এনামুল হক তাতে আপত্তি করেছিলেন এই বলে যে, পরীক্ষার্থীর সঙ্গে অপর কেউ থাকতে পারে না। তাতে কাজ হয়নি। ওই অবসরে রফিকুল ইসলামের মতো দু-একজন মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে কিছু বাক্য-বিনিময় করতে পেরেছিলেন, কিন্তু পরীক্ষা শেষ হতেই তাঁকে আবার দ্রুত গাড়িতে করে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সে-বছর বাংলায় এম এ শেষ পর্বের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলেন চারজন : মুনীর চৌধুরী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ও এ কে এম আমিনুল ইসলাম।

আলাউদ্দিন আল আজাদ এর আগের বছরে অনার্সে প্রথম শ্রেণী লাভ করেন। আমাদের বিভাগে ১৯৪৫ সালে অনার্সে প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলেন ভবতোষ দত্ত—তার আট বছর পরে প্রথম ফার্স্ট ক্লাস পেলেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। এতে সকলেই খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। এম এ-তে তিনি যে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন, তা সম্ভবত

তাঁর মনঃপূত হয়নি। নিজের শিক্ষাজীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি সর্বদা 'বি এ অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং এম এ-তে বিভাগীয় ছাত্রদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম' লিখে এসেছেন।

আলাউদ্দিন আল আজাদের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘকালের। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ *জেগে আছি* (ঢাকা, ১৯৫০) পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তার পরেই আলাপ। *অগত্যায়* একবার পত্রিকার পরবর্তী বিশেষ সংখ্যার ঘোষণা বেরিয়েছিল, তাতে আজাদের 'এক হাজার এক রাত্রি' নামে একটি গল্প বেরোবে বলে জানানো হয়েছিল। গল্পের নামের নিচেই এই মর্মে গল্পকারের পরিচিতি ছিল : এতো বন্ধুবান্ধব সত্ত্বেও যাকে না খেয়ে থাকতে হয়, সেই আলাউদ্দিন আল আজাদ। পড়ে আমার ভারি খারাপ লাগলো। মাকে বললাম, 'মা, একজন বড়ো লেখককে এক বেলা খাওয়াতে হবে।' মা বললো, 'ঠিক আছে।' আলাউদ্দিন আল আজাদ তখন থাকতেন বাংলাবাজারে—শান্তিনগর থেকে পায়ে হেঁটে গিয়ে তাঁকে নেমন্তন্ন করে এলাম। পরে বুঝেছিলাম, *অগত্যার* বিজ্ঞাপনে অতিরঞ্জন ছিল। যাই হোক, নির্দিষ্ট সন্ধ্যায় বাংলাবাজারে গিয়ে ওঁকে নিয়ে এলাম, তারপর আবার পৌঁছে দিতে গেলাম। বাংলাবাজারের মোড়ে এসে উনি বললেন, 'চলো, তোমাকে এগিয়ে দিই।' হাঁটতে হাঁটতে নবাবপুরের পুল পর্যন্ত এসে আবার আমি ওঁকে এগিয়ে দিতে গেলাম। আজাদ বললেন, নজরুল আর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় নাকি পরস্পরকে এগিয়ে দিতে গিয়ে এক রাতই কাটিয়ে দিয়েছিলেন রাস্তায়। ১৯৫১ সালে *ধানকন্যা* বের হলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার পাঁচ কপি বিক্রির ভার নিয়েছিলাম। এক কপি নিজে রাখলাম, চার কপি একে-ওকে গছালাম। বইয়ের টাকা যখন আজাদকে পৌঁছে দিতে গেলাম সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের বর্ধিত অংশে—তখন তিনি সেখানে থাকেন—তিনি আমাকে কমিশন দিতে গেলেন। আমি একচোট হেসে নিয়ে জানালাম, কমিশন পাওয়ার জন্যে বইগুলি বিক্রি করিনি।

মায়ের প্রসঙ্গ যখন উঠলো, তখন আরেকটি কথা বলে নিই। নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পরে হাসান হাফিজুর রহমানকে খুব ধরেছিলাম, এম এ ক্লাসে পড়বার জন্যে। তিনি প্রথমে এড়িয়ে গিয়েছিলেন, পরে কবুল করেছিলেন, ভর্তি হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ হাতে নেই। আমি মাকে এসে ধরলাম, 'টাকা না দিলে হাসান ভাইয়ের ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া ঘটবে না।'

হাসান বাংলায় এম এ ক্লাসে ভর্তি হলেন। পাঁচ কিস্তি পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিস মায়ের কাছ থেকে এনে দিয়েছিলাম। পরে, যখন পেরেছিলেন, হাসান সব টাকা শোধ করে দিয়েছিলেন—যদিও মা ঠিক ঋণ হিসেবে দেয়নি। আমি জানতাম, টাকা ফেরত না নিলে হাসানের আত্মসম্মানে লাগবে—তাই টাকা নিয়ে মাকে ফেরত দিতে দ্বিধা করিনি।

আমার নিজের ফিস দেওয়ার একটা মজার গল্প আছে। আই এ পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা বৃত্তি পেয়েছিলাম। প্রথম পাঁচ কিস্তি বেতন দেওয়ার পরে বৃত্তির ঘোষণা এলো। আর বেতন দিতে হলো না, পাঁচ কিস্তির টাকাও ফেরত পাওয়া গেল, সেইসঙ্গে মাসে পনেরো টাকা হিসেবে বৃত্তির অর্থ। কিস্তির টাকা বাড়িতে ফেরত দিতে হয়নি, তাই রাতারাতি বড়োলোক হয়ে গেলাম। দ্বিতীয় বর্ষে উঠে

সেশন ফি দিতে হবে, তখন আর পে-বুক (বেতন দেওয়ার বই) খুঁজে পাই না। উপায়? উপায় রেজিস্ট্রারের কাছে দরখাস্ত করে নতুন পে-বুক চাওয়া এবং জরিমানা দেওয়া। দরখাস্ত নিয়ে যেতে হলো সহকারী রেজিস্ট্রার কে সি রায়ের কাছে—পিওনের হাত দিয়ে সেটা পাঠালাম, পিওনকে তিনি বললেন আবেদনকারীকে ডেকে দিতে। গেলাম। রায় মহাশয় নিম্নকণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'হারালো কী করে?' বললাম, 'সার্, অনেকদিন তো ওটার দরকার হয়নি, কোথায় যে রেখেছি, এখন খুঁজে পাচ্ছি না।' এবার তাঁর গলা উঁচুতে চড়লো—'অনার্স ক্লাসের ছাত্র, স্কলারশিপ পাও, এই তোমার সেন্স অফ রেসপনসিবিলিটি? জানো, নতুন পে-বুকের জন্যে চার আনা ফাইন দিতে হবে?' মৃদুস্বরে বললাম, 'জানি, সার্।' এবারে তিনি ফেটে পড়লেন, 'ও জানো! তারপরও পে-বুক যত্ন করে রাখোনি। চার আনা ফাইন দেবে—গায়ে লাগবে না, না?—বাপের পয়সা!' বলতে বলতে তিনি খস্খস্ করে দরখাস্তের ওপরে অনুমতিজ্ঞাপক কথা লিখে দিলেন।

ঘটনাটা আমার প্রায় মনে পড়ে। ভাবি, একজন ছাত্র অবহেলার কারণে চার আনা জরিমানা দেবে—এমন সম্ভাবনায় এখন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কর্মকর্তা উদ্‌বিগ্ন হবেন? ছাত্রদের কেউ কি তাঁর তিরস্কার নীরবে মেনে নেবে? নাকি, পরশুরামের বাঁটলোর মতো বলবে, 'তাতে আপনার পিতার কী?'

১৬.

৯২ক ধারার আমলে ১৯৫৫ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি এসে গেল। সরকারি আদেশ যা, তাতে দিনটি পালন কার্যত নিষিদ্ধ হয়ে গেল। ধর্মঘট করা চলবে না, মিছিল করা যাবে না, সভা হতে পারবে না। কিন্তু এসব নিষেধাজ্ঞায় কি একুশে উদ্‌যাপন করা থেকে ছাত্রদের বিরত রাখা যায়? সেই ১৯৫২ সালের মতোই আগেভাগে সিদ্ধান্ত হয়ে গেল আদেশ অমান্য করার। খবর পুলিশেরও অজ্ঞাত রইলো না। ১২ ফেব্রুয়ারিতে সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলে ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি আবুল মাল আবদুল মুহিত ও সাধারণ সম্পাদক মহবুব আনাম, জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি নীরোদচন্দ্র নাগ [উনি এই বানান লিখতেন], ছাত্রলীগ-সভাপতি আবদুল মমিন তালুকদার ও আবদুল আউয়াল প্রমুখ ছাত্রনেতাকে গ্রেপ্তার করা হলো। শুধু ঢাকায় নয়, নারায়ণগঞ্জেও যুবনেতা ও শ্রমিকনেতাদের কেউ কেউ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। কিন্তু তাতে কী! একুশের সকালবেলায় কলাভবনের মাথায় এবং হলগুলিতে কালো পতাকা উড়লো, আমরা ক্লাস না করে প্রাঙ্গণে জড়ো হলাম, স্লোগান দেওয়া হলো—রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

সকালে এস পি-র নেতৃত্বে একদল পুলিশ সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের কালো পতাকা নামাবার আদেশ দিলো। এ নিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের বচসা শুরু হয়ে গেল। এক পর্যায়ে প্রোভোস্ট ড. মুহম্মদ ওসমান গণি মধ্যস্থতা করতে এসে এস পি-র কাছে অপমানিত হন। ফলে ছাত্রেরা আরো ক্ষেপে গেল—তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ইব্রাহিম তাহা—পুলিশ তাঁকে ধরে নিয়ে গেল।

এই ধরপাকড়ের খবরে কলাভবনের প্রাঙ্গণে সমবেত ছাত্রেরা অনেক বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ে। কলাভবনের ফটক বন্ধ-করে-দেওয়া, প্রাঙ্গণে আমরা, বাইরে পুলিশ-বাহিনী। সিটি এস পি মূল ফটকের কাছে এসে আদেশ দিলেন আমাদের ছত্রভঙ্গ হতে আর কালো পতাকা নামিয়ে ফেলতে—নইলে পুলিশ ভেতরে ঢুকবে। এতে উত্তেজনা আরো বাড়লো। পুলিশ শেষ পর্যন্ত লাঠিচার্জ করতে করতে ঢুকলো—প্রাঙ্গণে ছাত্রদের মারলো, যাদেরকে পারলো গ্রেপ্তার করলো। আমরা কেউ কেউ পালিয়ে আশ্রয় নিলাম লাইব্রেরির স্ট্যাকে। লাইব্রেরির দরজা পর্যন্ত পুলিশ তাড়া করেছিল, কিন্তু ভেতরে ঢোকেনি। আর কিছু ছেলে আশ্রয় নিয়েছিল দোতলায়—শিক্ষকদের কমনরুমে। সিটি এস পি-র নেতৃত্বে পুলিশ কলাভবনের মধ্যে ঢুকে পড়লো। এটাই ছিল অভাবিত, কিন্তু ব্যাপারটার ওখানেই শেষ নয়। সিটি এস পি শিক্ষকদের কমনরুমে ঢুকে আশ্রয়-নেওয়া ছাত্রদের গ্রেপ্তার করতে চাইলেন। কয়েকজন শিক্ষক দরজা আগলে রইলেন—কমনরুমে তাঁরা পুলিশকে ঢুকতে দেবেন না। জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা খুব রেগে গিয়ে সিটি এস পি-কে বললেন, 'ইউ শুড বি অ্যাশেমড অফ ইওরসেলফ—ওয়্যারন্ট ইউ এ স্টুডেন্ট অফ দিস ইউনিভার্সিটি?' পুলিশ নিয়ে নিতান্ত অনিচ্ছায় তিনি ফিরে গেলেন।

গ্রেপ্তার বড়ো কম হয়নি—আমাদের বন্ধু আমীর আলী, মোকাম্মেল হক, বিজ্ঞানের ছাত্র আবুল কাসেম (ক্রীড়াবিদ্ হিসেবে সুপরিচিত), সিদ্দিকুর রহমান (অবসরপ্রাপ্ত সচিব ও রাষ্ট্রদূত), ও আরো অনেকে; ছাত্রীদের মধ্যে ফরিদা বারী মালিক, কামরুন্নাহার লাইলী, ফরিদা বেগম, শহীদা খাতুন ও আরো কয়েকজন। গ্রেপ্তার-হওয়া ছাত্রদের পুলিশ মারপিট করেছিল। এর এক অভিনব প্রতিবাদ করেছিলেন আবুল কাসেম। থানায় যখন তাঁর নাম লেখার পরে তাঁর বাবার নাম জানতে চাওয়া হয়, তিনি বলেন, 'ভুলে গেছি।'—'বাবার নাম ভুলে গেছেন? ইয়ার্কি হচ্ছে?'—'জানেন না, মেরে বাবার নাম ভুলিয়ে দেয়—আপনারা আমার তাই করেছেন'—কাসেমের উত্তর।

জেলখানায় আমীর আলীও এমনি কাণ্ড করেছিল। এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তাকে আনুষ্ঠানিক জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি প্রশ্ন করেন,'আপনি কি সি এস এস (কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরির জন্য প্রতিযোগিতামূলক) পরীক্ষা দেবেন?' আমীর আলীর পালটা প্রশ্ন, 'কেন, আপনার কি মেয়ে আছে?' চোখমুখ লাল করে ভদ্রলোক উঠে গিয়েছিলেন—আরেকজনকে পাঠিয়েছিলেন জিজ্ঞাসাবাদ করতে।

সহপাঠী শহীদার জেলে-থাকা অবস্থায় তাঁদের র‍্যাংকিন স্ট্রিটের বাড়িতে গিয়েছিলাম, তিনি কেমন আছেন জানতে। তিনি ছাড়া পাওয়ার পরে আবার দেখা করতে যাই। এক সময়ে শহীদা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনি গ্রেপ্তার হলেন না কেন?'

এ-প্রশ্নের কী জবাব দেওয়া যায়! বললাম, 'লাইব্রেরির মধ্যে পালিয়ে ছিলাম।' কিন্তু জানতাম, এটি প্রশ্নের জবাব হলো না। একটা গ্লানিবোধ নিয়েই ফিরলাম।

১৭.

১৯৫৩ সালে যখন সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের অনাবাসিক ছাত্র হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলাম, তখন ১৯৫২-৫৩ শিক্ষাবর্ষের হল-বার্ষিকী-সম্পাদক কাজী ফজলুর রহমান বার্ষিকীর জন্যে আমার কাছে একটা গল্প চাইলেন। আমি তাঁকে মনে করিয়ে দিলাম যে, তিনি যে-শিক্ষাবর্ষের বার্ষিকী-সম্পাদক, তার পরের বছরে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছি, সুতরাং আমার লেখা তাতে ছাপানো ঠিক হবে না। তিনি বললেন, বার্ষিকীগুলো অনেকদিন ধরে আর সময়মতো বের হয় না; বার্ষিকী যখন বের হচ্ছে, সে-সময়ের ছাত্রদের লেখা ছাপলে কোনো দোষ হওয়ার কথা নয়। তাঁকে 'ছায়াবৃত' নামে একটি গল্প দিলাম এবং তা যথাস্থানে ছাপা হলো। আমার যে পাঁচ-ছয়টি গল্পকে আমি এখনো স্বীকার করতে প্রস্তুত, তার মধ্যে ওটি একটি।

পরের বছরে আমরা যখন হল-নির্বাচনে পুরোপুরি জয়যুক্ত হলাম, তখন ছাত্র-সংসদের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক আলাউদ্দিন আল আজাদ বার্ষিকী-সম্পাদনারও দায়িত্ব নিলেন এবং যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত হলাম অর্থনীতি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র কবিরউদ্দিন আহমদ (এখন বিশিষ্ট প্রবাসী অর্থনীতিবিদ) ও আমি। প্রদেশে ৯২ক ধারা জারি করার পরে অনেকের সঙ্গে আমাদের হল ছাত্র-সংসদের সভাপতি এ বি এম লতিফ মিয়া গ্রেপ্তার হলেন। সাধারণ সম্পাদক আলাউদ্দিন আল আজাদকেও পুলিশ খুঁজতে লাগলো, তিনি বেশ কিছুকাল আত্মগোপন করে রইলেন। বার্ষিকী প্রকাশের আগেই ১৯৫৪-৫৫ সালের সংসদ নির্বাচন এসে গেল। তাতে আমাদের দল থেকে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হলেন এ এম এ [আবুল মাল আবদুল] মুহিত এবং প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন মহবুব আনাম। ওই সংসদ বার্ষিকী-সম্পাদক নিযুক্ত করলেন আজহারুল ইসলামকে (বার্মা ইস্টার্নের দায়িত্বশীল পদ থেকে অবসরপ্রাপ্ত) আর যুগ্ম-সম্পাদক করলেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক) ও মোজাফ্ফর আহমদকে (ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক)। এবারে স্থির হলো, দুই শিক্ষাবর্ষের হল-বার্ষিকী একসঙ্গে বের করা হবে। প্রোভোস্ট এতে সম্মতি দিলেন এই ভেবে যে, তাতে বার্ষিকীর প্রকাশ নিয়মিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। আজাদ সময় দিতে পারলেন না। কবিরউদ্দিন আহমদও ব্যস্ত। কিছুটা সময় দিলেন আজহারুল ইসলাম, তবে বার্ষিকী-প্রকাশের সবটা দায়িত্বই পড়ল তিন যুগ্ম-সম্পাদকের ওপরে। আমরা সংকল্প করলাম, সাহিত্যপত্রের বিশেষ সংখ্যার মতো বেশ বড়ো করে বার্ষিকী প্রকাশ করবো এবং ভালো মানসম্পন্ন লেখাই ছাপবো; প্রোভোস্ট, ছাত্র সংসদ বা অ্যাথলেটিক ক্লাবের ছবি ছাপব চিরাচরিত নিয়ম ভঙ্গ করবো। এর আগে ফজলুল হক মুসলিম হল বার্ষিকীর একটি সংখ্যা এভাবেই বের করেছিলেন সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান।

নর্থ ব্রুক হল রোডে ড. শহীদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহম্মদ যকীয়ুল্লাহ্ রেনেসাঁস প্রিন্টার্স নামে একটি ছাপাখানা চালাতেন। সেখানে আমরা সাহিত্য সংসদ, সংস্কৃতি সংসদ ও অন্য কোনো সংগঠন বা ব্যক্তির কাগজপত্র ছাপতাম। বার্ষিকীর ইংরেজি অংশ সেখানে আমার তত্ত্বাবধানে ছাপতে আমরা মনস্থ করলাম। সিরাজ ও মোজাফ্ফর থাকতেন আজিমপুরে। তাঁদের বাড়ির কাছে, শেখসাহেব বাজারে, স্টার প্রেসে তাঁরা দেখেশুনে

বাংলা অংশ ছাপবেন। শেষে দেখা গেল, সংখ্যাটা দুশ পৃষ্ঠা ছাড়িয়ে যাচ্ছে—দুবছরের বরাদ্দ টাকায়ও এর ব্যয়-সংকুলান হবে না। প্রোভোস্ট অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ করতে নারাজ। তখন আমরা তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিলাম বিজ্ঞাপন ছাপতে। তিনি অনুমতি দিলেন, তবে বিজ্ঞাপনের জন্যে কাউকে অনুরোধ করতে বা চিঠি দিতে সম্মত হলেন না। আমরা ঘুরে ঘুরে দশ-বারো পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন আদায় করলাম—সব টাকা অবশ্য শেষ পর্যন্ত আদায় হয়নি। তবে সবচেয়ে দুঃসাহসিক কাজ যা আমরা করলাম, তা হলো, জয়নুল আবেদিনের কাছে গিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে প্রচ্ছদ এঁকে দেওয়ার দাবি জানানো। বোধহয় আমাদের অনুরোধের অভিনবত্বে হতবাক হয়ে তিনি রাজি হয়ে গেলেন। দুটি লোক কাদায় আটকে যাওয়া গরুগাড়ি ঠেলছে—তাঁর সেই বিখ্যাত ছবির ওটাই বোধহয় প্রথম ভাষ্য—ব্রাশে আঁকা। একাধিক মাধ্যমে এ ছবিটিই পরে আবেদিন সাহেব একাধিকবার এঁকেছিলেন, তাছাড়া কাঠ ও বিভিন্ন ধাতুতেও এ ছবি অন্যের হাতে রূপ পেয়েছে। আমার বিশ্বাস, ওই ছবি প্রথম আমাদের বার্ষিকীর প্রচ্ছদেই ধরা পড়ে। প্রচ্ছদের বর্ণলিপি আবেদিন সাহেব নিজে করেছিলেন, না তাঁর অনুজ জুনাবুল ইসলাম করে দিয়েছিলেন, তা নিয়ে ধন্দ আছে। বিজন চৌধুরী ও আরো দুজনকে দিয়ে আমরা লেখার শিরোনাম এবং আরো কিছু কাজ করিয়ে নিয়েছিলাম; টেলপিস নিয়েছিলাম সংস্কৃতি সংসদের প্রকাশনা, *সংবাদ* ও রেনেসাঁস প্রিন্টার্স থেকে—এসবের পূর্ণ স্বীকৃতি আছে, অথচ প্রচ্ছদ-শিল্পী হিসেবে আছে শুধু জয়নুল আবেদিনের নাম। প্রচ্ছদ দেখে কেউ কেউ ঠাট্টা করলেন : হল-বার্ষিকীর প্রকাশ আটকে আছে—যুগ্ম-সম্পাদকেরা ঠেলে বের করতে চেষ্টা করছেন।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও ফারুক আলমগীরের সৌজন্যে বার্ষিকীর দুটি সংখ্যা উদ্‌ধার করা গেল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার কোনোটারই প্রচ্ছদ নেই। সূচিপত্র ছেপে দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

প্রবন্ধ

বাংলা গদ্য ও রবীন্দ্রনাথ	অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই
নাস্তিকের ধর্ম	ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন
বাংলা সাহিত্যে মুসলিম পুনর্জাগরণের পটভূমি	আনিসুজ্জামান
মেয়েদের ভোটাধিকার	হুসনে আরা
গ্রামবাংলা	আজহারুল ইসলাম
নজরুলের বিদ্রোহবাদ	আনসার আলী

রম্যরচনা

হাসি	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলি	মাহফুজুল হক
রঙ	মোকাম্মেল হক
মধুর পরিবেশ	আতাউল হক
ঋণং কৃত্বা	মিসবাহুল ইসলাম
হাত দেখা	শফিকুর রহমান

Acting	Obaidul Huq Sarkar
The Sundarbans	Lutful Huq
Philately	Juned Ahmed
AL-Biruni as a great scholar	Syed Mohammad Ali
At the Cross-Roads	Ahmad Farid
Egypt to Einstein	Fazley Bary Malik
Bamboo	Ahsanul Huq
Random Shots	A. M. A. Muhith
Poems	
The Life of the unwanted	Md. Hashem
A Girl's grief in the nursery rhyme	Abu Zafar Obaidullah

এরপরে ছিল হল-ছাত্র-সংসদে এবং কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদে নির্বাচিত জনদের তালিকা, সংসদ ও ক্রীড়া সমিতির কার্যবিবরণী, জীবন-সদস্যদের নাম, ১৯২১ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত হল-ছাত্র-সংসদের সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সম্পাদকদের তালিকা, আর ১৯২৬ সাল থেকে বার্ষিকী-সম্পাদকদের নাম।

লেখক-তালিকার অনেকেই সুপরিচিত, কিন্তু কারো কারো পরিচয় দিয়ে দিলে তাঁদের চিনতে সুবিধে হবে। শফিকুর রহমান এখনকার শফিক রেহমান; হুসনে আরা এখন হুসনে আরা কামাল—তিনি, লুৎফুল হক ও আহসানুল হক আরো অনেকের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক; মাহফুজুল হকও শিক্ষক ছিলেন এখানে—হেলিকপ্টার-দুর্ঘনায় তাঁর মৃত্যু হয়; এক সময়ে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ-কর্মকর্তা তরীকুল আলম এবং তাঁর অগ্রজ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা জহুরুল আলম লোকান্তরিত; মরহুম আনসার আলী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা বিষয়ের পরিচালক ছিলেন; কাজী নূরুল ইসলাম ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনে—তিনিও এখন আর সেই। আবিদুর রহমান খ্যাতি লাভ করেছিলেন ব্যবসায়ীরূপে এবং ১৯৭১ সালে ভস্মীভূত *দি পিপল* পত্রিকার সম্পাদকরূপে; আহমদ ফরিদ সিভিল সার্ভিস থেকে অবসর নিয়ে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর; স্থায়ীভাবে প্রবাসে রয়ে গেছেন বেশ কয়েকজন—সৈয়দ মোহাম্মদ আলী ও মাহমুদ হাসান ব্রিটেনে, ফজলে বারী মালিক, জহুরুল হক ও মোহাম্মদ হাশেম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে; মাহবুবল আলম চাকলাদার স্পেনে।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে লেখার পরে 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম পুনর্জাগরণের পটভূমি' নামে আমি যে-দীর্ঘ প্রবন্ধটি লিখেছিলাম, হল-বার্ষিকীতে সেটাই সমর্পণ করি। সম্পাদনা-পরিষদে শিক্ষক সদস্য ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন, মুহম্মদ আবদুল হাই (দু সংখ্যায়) ও মুনীর চৌধুরী। বার্ষিকীর বিষয়ে মুনীর চৌধুরী কখনো উৎসাহ দেখাননি। আমার লেখাটা পাশ করে দিলেন হাই সাহেব, কিন্তু যিনি আমাকে আরো বেশি করে জানতেন ও স্নেহ করতেন—এমনকী, আমার বাড়ি গিয়ে নিজের সদ্যলেখা প্রবন্ধ পড়ে শুনিয়েছিলেন—সেই কাজী সাহেব বেঁকে বসলেন। প্রথমে বললেন,

বার্ষিকীর জন্যে লেখাটি বেশি বড়। তাঁকে যখন বলা হলো, বার্ষিকীতে স্থানাভাব হবে না, তখন তিনি জানালেন, প্রবন্ধে বিষয়ের অসংগতি আছে, ভাষারও ভুল আছে। সিরাজ ও মোজাফ্‌ফর খুব করে ধরলেন কাজী সাহেবকে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো, আমি কাজী সাহেবের বাড়ি যাবো, উনি লেখাটির ত্রুটি নির্দেশ করবেন, সেগুলো সংশোধন করার পরেই প্রবন্ধ ছাপা হবে। গেলাম তাঁর বাড়িতে—সেখানে বহুবার তাঁর কাছে গেছি সাহিত্য সংসদের কাজে। তিনি প্রথমেই বললেন, 'তোমার মাস্টাররাই বাংলা লিখতে পারেন না, তুমি কী করে পারবে!' তারপর দু-তিনটি জায়গায় আমার বাক্যগঠনের বা শব্দপ্রয়োগের ভুল দেখালেন। এরপর বললেন, 'তুমি এতে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের কথা লেখোনি, অথচ শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবের কথা বলেছো—সে কি তিনি তোমার শিক্ষক বলে?' অনেক কষ্টে তাঁকে বোঝালাম যে, আমি, মোটের ওপর, নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের কাল পর্যন্ত লিখেছি। সাহিত্যবিশারদ ও শহীদুল্লাহ্‌র লেখা তার আগেই প্রকাশিত হয়, তাই তাঁদের কথা লিখেছি। মুসলিম সাহিত্য সমাজ তো গঠিত হয় আরো পরে, ১৯২৬ সালে। কাজী সাহেব আমার যুক্তি খণ্ডন করতে পারলেন না, তবে খুব অপ্রসন্ন মনে এই প্রশ্নে ছাড় দিলেন। আমিও ওই দু-তিনটি জায়গা সংশোধন করলাম। এবারে তিনি লেখাটা ছাপতে দিতে সম্মত হলেন—তবে খুব অপ্রসন্নচিত্তে।

বার্ষিকী সম্পর্কে আরো দু-একটা তথ্য জানানো দরকার। কাজী মোতাহার হোসেনের লেখাটি পুনর্মুদ্রণ। শিল্প ও সংস্কৃতি বলে যে একটা ভিন্ন বিভাগ করা হলো, তার কারণ আসকার ইবনে শাইখ, মহবুব আনাম, শওকত আরা, সুলতান আহমদ ও শহীদুল হক প্রভৃতির লেখা একটা শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর ছিল। সেটা করার পরে আমাদের মনে হলো, আর কিছু বিষয়ে লেখা পেলে আমাদের সাংস্কৃতিক মানচিত্রটা স্পষ্ট হয়ে উঠতো। তখন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ছদ্মনামে লিখলেন—যতদূর মনে হয়, লোকশিল্প, সাহিত্য সাময়িকী ও চারুশিল্প নিয়ে। মোজাফ্‌ফর আহমদও ছদ্মনামে একটা লিখেছিলেন—বোধহয় বেতার সম্পর্কে।

বার্ষিকী বেরোবার পরে ছাত্রমহলে তো বটেই, শিক্ষকমহলেও আমাদের প্রয়াস অভিনন্দিত হয়। ঢাকার সাংস্কৃতিক মহলেও এটি সাদর অভ্যর্থনা লাভ করে। এমনকী, আমার লেখাটারও খুব প্রশংসা করেছিলেন ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন ও আরো কেউ কেউ। জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালক ফজলুর রহমান সেটা পড়ে হাই সাহেবের মারফত আমাকে তাঁর অফিসে ডেকে পাঠিয়েছিলেন আলাপ করার জন্যে। প্রবন্ধটা মুহম্মদ আবদুল হাইয়েরও পছন্দ হয়েছিল। এই সূত্রেই তিনি আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন এম এ পাশ করার পরে গবেষণাকর্মে প্রবৃত্ত হতে। বলা যায়, এই প্রবন্ধ আমার জীবনের গতি অনেকখানি নির্ণয় করে দিয়েছিল।

১৮.

ভাষা-আন্দোলনে মুনীর চৌধুরী যখন গ্রেপ্তার হন—১৯৫২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি—তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নিয়োগ ছিল অস্থায়ী। তিনি ক্লাস নিতে পারছেন না, এই অজুহাতে, ওই দিন থেকেই কর্তৃপক্ষ তাঁর নিয়োগের অবসান ঘটান। যুক্তফ্রন্ট-সরকার ক্ষমতাসীন হলে আরো অনেকের সঙ্গে তিনি ছাড়া পান, আবার ৯২ক ধারা জারি হলে আরো অনেকের সঙ্গে তিনিও কারাগারে ফিরে যান। অন্তর্বর্তীকালেও তাঁর কোনো কর্মের সংস্থান ছিল না; তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার যে-উদ্‌যোগ ইংরেজি বিভাগের অধ্যক্ষ জে এস টার্নার নিয়েছিলেন, তা ব্যর্থ করে দেওয়া হয়। শেষ অবধি ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে তিনি শেষবারের মতো কারামুক্ত হলেন। টার্নার আবার উদ্‌যোগ নিলেন; তাঁর আগ্রহাতিশয্যে ভাইস-চান্সেলর ডক্টর জেনকিনস এ-বিষয়ে চিঠি দিলেন প্রাদেশিক চিফ সেক্রেটারি এন এম খানকে; মুনীর চৌধুরীর সাক্ষাৎকার নিয়ে চিফ সেক্রেটারি বিশ্ববিদ্যালয়কে জানালেন, তাঁর নিয়োগে সরকারের আপত্তি থাকবে না। নভেম্বরের মাঝামাঝি মুনীর চৌধুরী ফিরে এলেন ইংরেজি বিভাগে।

আমরা তখনো ইংরেজি সাবসিডিয়ারি ক্লাসের ছাত্র এবং আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তাঁকে ওই ক্লাসে পড়াতে দেওয়া হলো। প্রথম দিনেই মনোমুগ্ধকর ভাষায় ও চমৎকার ভঙ্গিতে তিনি আত্মপরিচয় দিলেন : আমি মুনীর চৌধুরী, আমরা চোদ্দ ভাইবোন। তারপর সামান্য একটু থেমে বললেন : এক মা। তারপর বললেন তাঁর পারিবারিক পরিবেশের কথা, তাঁর ছাত্রজীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থার কথা, নাটকে তাঁর অপরিমিত আগ্রহের কথা, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অকৃত্রিমতায় তাঁর অবিচলিত আস্থার কথা। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলাম। এরই মধ্যে তিনি জানতে চাইলেন, কী নিয়ে আলোচনা করবেন ক্লাসে—ক্লাস শেষ হয়ে আসছিল বলে কোনো নির্দিষ্ট বই তাঁকে বণ্টন করা হয়নি। আমাদের উত্তর তৈরিই ছিল : বার্নার্ড শ-র *আর্মস অ্যান্ড দি ম্যান*। সম্ভবত তিনটি মাত্র বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন ওই নাটক সম্পর্কে—সে যে কী অসাধারণ ছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। আমি—এবং আমার বিশ্বাস, আরো অনেকে—ওই বক্তৃতার কথা স্মরণে রেখেই পরীক্ষায় উতরে গিয়েছিলাম।

ইংরেজি বিভাগে মুনীর চৌধুরীর প্রত্যাবর্তন আর বাংলা বিভাগে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের অধ্যক্ষতাগ্রহণ—এ দুই ঘটনা ঘটেছিল দু সপ্তাহের মধ্যে। বিভাগের দায়িত্ব নিয়েই হাই সাহেব সেটা নতুন করে গড়ে তোলার উদ্‌যোগ নিয়েছিলেন। কর্তৃপক্ষের কাছে, টার্নারের সম্মতিক্রমে, তিনি প্রস্তাব করলেন মুনীর চৌধুরীকে বাংলা বিভাগে খণ্ডকাল শিক্ষক নিয়োগ করতে (সপ্তাহে চারটে বক্তৃতা দেবেন, একশ টাকা অতিরিক্ত ভাতা পাবেন)। কর্তৃপক্ষ রাজি হলেন। এরপর হাই সাহেব উদ্‌যোগ নিলেন তাঁকে বাংলা বিভাগে সার্বক্ষণিক শিক্ষক করে নিয়ে আসার। টার্নার এবারে সহজে রাজি হলেন না, তবে হাই সাহেবের সঙ্গে মুনীর চৌধুরীরও আগ্রহ দেখে শেষে তাঁর বদলির প্রস্তাব সমর্থন করলেন। ভাইস-চান্সেলর নিজের ক্ষমতাবলে তাঁকে ইংরেজি থেকে বাংলা বিভাগে বদলি করে দিলেন, তবে ছ মাসের মধ্যে নির্বাচনী বোর্ডের মুখোমুখি হয়ে তাঁদের সুপারিশ পেতে হবে—এমন একটা শর্ত থাকলো। হাই সাহেব এবারে

জগন্নাথ কলেজ থেকে নিয়ে এলেন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীকে। কিন্তু মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী—এ দুজনের নিয়োগ নিয়ে অনেকের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। দৈনিক *আজাদ* পত্রিকার চিঠিপত্র স্তম্ভে এ সম্পর্কে খুব বিরূপ সমালোচনা হতে থাকলো : একজন সুপরিচিত কমিউনিস্ট এবং শান্তিনিকেতনে দীক্ষাপ্রাপ্ত একজনকে কেন আনা হলো বাংলা বিভাগে, সে কি বিভাগকে পাকিস্তানের আদর্শবিরোধী ঘাঁটি বানানোর জন্যে? হাই সাহেবের কাছে আভাস পেয়েছিলাম যে, এসব লেখালিখির পেছনে আছেন বিভাগেরই দুজন শিক্ষক—তাঁদের চেয়ে কেউ জ্যেষ্ঠতা নিয়ে কিংবা কেউ বেশি বেতন নিয়ে বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন। প্রগতিশীলদের প্রতি *আজাদের* বিরূপতা তো সুপরিচিত। সুতরাং সমালোচনার সঙ্গে তাঁদের পত্রিকায় প্রকাশ পেতে থাকলো এক ধরনের জেহাদি ভাব।

এই সময়টায় আমি বিভাগের ছাত্রদের সংগঠন বাংলা সমিতির সম্পাদক। আমার মনে হলো, *আজাদের* প্রচারণার প্রতিবাদ হওয়া দরকার। কাউকে কিছু না বলে আমি একটা বিবৃতি তৈরি করলাম এবং তা সমর্পণ করলাম *ইত্তেফাকের* বার্তা-সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেনের কাছে। *আজাদের* নীতি তিনি অপছন্দ করতেন, আমাকেও একটু অতিরিক্ত ভালোবাসতেন। সুতরাং পরের দিনই *ইত্তেফাকের* প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলামে আমার বিবৃতিটি স্থান পেল। খুব আত্মতৃপ্তি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিভাগের পিওন সাত্তার আমাকে পাকড়াও করে নিয়ে গেল অধ্যক্ষের কামরায়। হাই সাহেব বললেন : 'কাগজে বিবৃতি দেওয়ার আগে তোমার উচিত ছিল না আমাকে জিজ্ঞেস করা—আমি তো বাংলা সমিতির সভাপতি? তাছাড়া শিক্ষক-নিয়োগ নিয়ে যে-বিতর্ক চলছে, তাতে ছাত্র হয়ে তোমার কিছু বলা একেবারেই সংগত হয়নি। অনেকের ধারণা হবে, ছাত্রদের দিয়ে আমি এসব করাচ্ছি। প্রকাশ্য প্রতিবাদ করার প্রয়োজন বোধ করলে আমিই করতাম—*আজাদ*ও আমার লেখা ছাপাতো। কিন্তু এ-নিয়ে আমি বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাইনি। আর তুমি কাউকে না বলে-কয়ে বিবৃতি দিয়ে বসলে! যাও, ভবিষ্যতে কখনো এমন করবে না।'

এর অল্পকাল পরে নবপ্রতিষ্ঠিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে মযহারুল ইসলাম আমাদের ছেড়ে গেলেন। সেখানে তিনিই হয়েছিলেন ওই বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ।

১৯.

সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার আগে আগে কয়েক মাসের বৃত্তির টাকা একসঙ্গে পেয়ে গেলাম। ১২০ টাকা দিয়ে কেমি নামের একটা হাতঘড়ি কিনলাম—আমার জীবনের প্রথম হাতঘড়ি। আমার ঘরে একটা ট্রাভেলিং ক্লক ছিল, তা দিয়েই এতকাল কাজ চলে আসছিল। এখন মনে হলো, একটা হাতঘড়ি চাই। বৃত্তির টাকা না পেলে অন্তত তখন যে হাতঘড়ি কিনতাম না, তাতে সন্দেহ নেই।

পাশ করে গেলেই হবে মনে করে সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার জন্যে যথেষ্ট পড়াশোনা করিনি। পাশ যে করবো, সে-বিশ্বাস ছিল। তাই ইংরেজি তৃতীয় পত্রে একটা রচনা

অনেকখানি লিখে তা মনঃপূত না হওয়ায় সম্পূর্ণ কেটে দিয়ে নতুন একটা রচনা লিখেছিলাম নিতান্ত অপরিসরে। পাশ অবশ্য করে গিয়েছিলাম, তবে বাংলা অনার্সের যে-চারজন ছাত্র ইংরেজি সাবসিডিয়ারি নিই, তার মধ্যে অনেকেই অকৃতকার্য হন। তৃতীয় বর্ষে সবাই উঠলাম বটে, কিন্তু তাঁদের আবার অনার্সের চূড়ান্ত পরীক্ষার সঙ্গে সাবসিডিয়ারি ইংরেজি দেওয়ার দায় রয়ে গেল।

সবাই তৃতীয় বর্ষে উঠলাম, বলা ঠিক হলো না। দ্বিতীয় বর্ষের শেষে শহীদার বিয়ে হয়ে গেল মীর আবু সালেকের সঙ্গে। তিনিও ১৯৫৩ সালে প্রথম শ্রেণীতে এম এ পাশ করে সরকারি কলেজে শিক্ষকতা করছিলেন তখন, পরে নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করে অবসরজীবনে মৃত্যুবরণ করেন, শহীদাও মারা যান তার কিছুকাল পরে।

শহীদা পড়াশোনা ত্যাগ করায় আমরা সংখ্যায় একজন কমলাম বটে, কিন্তু তৃতীয় বর্ষে রায়হানা বেগম (দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে রায়হানা হক নামে *সংবাদে* লিখে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন) এসে যোগ দেওয়ায় আমরা আবার আট হয়ে গেলাম। তাঁর আব্বা এ এফ এম আবদুল হক (আবদুল হক ফরিদী নামে অধিকতর পরিচিত) যখন করাচিতে বোর্ড অফ ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড সেকেন্ডারি এডুকেশনের চেয়ারম্যান, রায়হানা তখন করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় অনার্স ক্লাসে পড়তেন। পিতা ঢাকায় বদলি হয়ে আসায় কন্যাকেও তাঁর অনুসরণ করতে হলো। করাচি থেকে রায়হানা সাবসিডিয়ারি পাশ করে এসেছিলেন বলে ঢাকায় এসে তৃতীয় বর্ষে ভর্তি হলেন। তাঁর বোন জাহানারা ভর্তি হলেন এক ক্লাস নিচে—ইতিহাস বিভাগে। দুই বোন সবসময়ে একসঙ্গে চলতেন—সেটা খুব চোখে পড়তো এবং সহপাঠিনীর সঙ্গে আমাদের মেলামেশায় কিছু বাধা ঘটাতো। অবশ্য এত বছর পরও তাঁরা যতটা সম্ভব একসঙ্গেই চলাফেরা করে থাকেন।

তৃতীয় বর্ষে উঠে আমাদের কয়েকজনের—চেমন আরা, রায়হানা, নূরউল আলম ও আমার—টিউটোরিয়াল পড়লো হাই সাহেবের সঙ্গে। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে দীন মুহম্মদ সাহেবের সঙ্গে টিউটোরিয়াল করতাম : তিনি খুব ভালো নম্বর দিতেন বলে ধারণা হয়েছিল, আমি ভালো ছাত্র। প্রথম টিউটোরিয়ালে হাই সাহেবের হাতে পেলাম সি+, তদুপরি মন্তব্য : 'তোমাকে ভেবেছিলাম ভালো ছাত্র, এসব কী লিখেছ?' আমার স্বর্গচ্যুতি হলো। তবে সেইসঙ্গে বুঝতে পারলাম যে, অ্যাকাডেমিক লেখায় তিনি রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী এবং তাঁর পছন্দ-অপছন্দ বেশ জোরালো। যতটা সম্ভব নিজেকে সংশোধন করলাম এবং সুফল পেলাম হাতে হাতে।

তৃতীয় বর্ষে হাই সাহেব আমাদের পড়িয়েছিলেন ধ্বনিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব। আগে তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছিলাম—ভালো লেগেছিল। তবে তাঁর নতুন অধীত বিদ্যা ধ্বনিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব পড়াতে তিনি, মনে হয়, অধিক উৎসাহবোধ করতেন। তিনি ওই দুরূহ বিষয়ে আমাদের কৌতূহল জাগ্রত করতে পেরেছিলেন। ওই সময়ে আমাদের বিভাগে পালি-প্রাকৃত পড়াবার মতো শিক্ষক কেউ ছিলেন না। ফলে, সিলেবাস সংশোধন করে ধ্বনিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ইংরেজিতে টাইপ-করা ভাষাতত্ত্ব-সম্পর্কিত শহীদুল্লাহ্‌র দেওয়া একটি নোট উত্তরাধিকারসূত্রে ছাত্রদের হাতে ফিরতো। ওই পত্রে ইংরেজিতেও উত্তর দেওয়া যেতো

বলে ওই নোট সকলে মুখস্থ করতে। বাংলায় উত্তরপত্র লিখবো বলে আমি সেই ইংরেজি নোট ধরে বাংলা করলাম, আর তার সঙ্গে প্রয়োজনমতো জুড়ে দিলাম সুকুমার সেনের *ভাষার ইতিবৃত্ত* থেকে আহৃত কিছু অংশ। ফলে বিষয়টা বুঝতে আমার সুবিধে হয়েছিল, শিক্ষকও আমার অনুশীলনে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

মুনীর চৌধুরী আমাদের পড়িয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের *রাজা* নাটক আর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যতত্ত্ব। *রাজা* নাটকের আধ্যাত্মিক ভাবের সঙ্গে তাঁর কোনো মর্মগত যোগ ছিল না। কিন্তু তাঁর নাটকপাঠের নৈপুণ্য ও অসাধারণ রসজ্ঞতায় এই নাটক এবং এই জাতীয় নাটক উপভোগ করতে ও তার সমস্যার প্রকৃতি অনুভব করতে আমরা শিখেছিলাম। সাহিত্যতত্ত্বের ক্লাসে প্লেটো থেকে টি এস এলিয়ট পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-সমালোচনার ধারা এবং সংস্কৃত সমালোচনা-রীতির যে-পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন, তাও ছিল অনবদ্য। এই ক্লাসে বসে আমি যে-নোট নিয়েছিলাম, তা একটু মার্জনা করে প্রকাশ করলে সাহিত্যসমালোচনা-বিষয়ক একটি পাঠ্যপুস্তক হয়ে যেতে পারতো।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী পড়িয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরীর *বীরবলের হালখাতা*। বহুকাল কলেজে শিক্ষকতার ফলে প্রাঞ্জল করে বোঝাবার অভ্যাস তিনি সহজে আয়ত্ত করেছিলেন। অনার্স ক্লাসে আমরা যে-সমালোচনামূলক পাঠ প্রত্যাশা করি, তার সবটা তিনি মেটাতে পারেননি।

২০.

সাহিত্য-সম্মেলনে যোগ দিতে কলকাতা থেকে এসেছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ। আমার প্রস্তাবে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদে আত্মকথা বলার জন্যে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। তাঁর ডায়েরি তখনো প্রকাশিত হয়নি। কাজী মোতাহার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় তিনি নিজের ব্যক্তিগত ও সাহিত্য-জীবন নিয়ে যা বলেছিলেন, তা খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। শিখা-গোষ্ঠীর আরো একজন সেদিন আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন—মোহাম্মদ আবদুর রশীদ বি এ, বি টি। ওদুদ সাহেবের জামাতা শামসুল হুদাও এসেছিলেন—তাঁরই বাড়িতে ওদুদ সাহেব উঠেছিলেন। এই সভার সাফল্যে প্রবীণদের আত্মকথা শোনার একটা আগ্রহ আমাদের মনে সঞ্চারিত হয়েছিল।

দ্বিতীয়বার সেই সুযোগ এলো ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ যখন ঢাকায় এলেন, তখন। সেটা ১৯৫৪ সালের একেবারে শেষদিকের ঘটনা। সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল ছাত্র-সংসদ তাঁকে আজীবন সদস্যপদে ভূষিত করে। সেই-উপলক্ষে হল-মিলনায়তনে তাঁর অভ্যর্থনার এবং বাদনের আয়োজন হয়েছিল। আলাউদ্দীন খাঁর প্রায় অলৌকিক বাদন সেই প্রথম শুনেছিলাম মুগ্ধ হয়ে। তাঁর সঙ্গে তবলা সংগত করেছিলেন সাখাওয়াত হোসেন ও মোহাম্মদ হোসেন খান। সরোদ ও তবলার প্রতিযোগিতাও খুব জমে উঠেছিল এবং এক পর্যায়ে তবলচির কাছ থেকে বাঁয়া-তবলা টেনে নিয়ে আলাউদ্দীন খাঁ তাতে অপূর্ব লহরা তুলেছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে আমাদের বন্ধু তোফাজ্জল যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে বলেছিল, 'ইচ্ছে হয়, লোকটাকে মেরেই ফেলি।' তারপর

ফজলুল হক মুসলিম হলেও এক সন্ধ্যায় তিনি বাজিয়েছিলেন।

সাহিত্য-সংসদেও ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁকে নেওয়া সম্ভবপর হলো তাঁর জীবনের কথা তাঁর মুখ থেকে শোনার জন্যে। কী যে শিশুসুলভ সারল্য, গুণীজনোচিত বিনয়, অসামান্য নম্রতা ছিল তাঁর চোখে, মুখে, ভাষায়, তা বলা যায় না।

এবারে আমরা স্থির করলাম, আত্মকথা-কথনের একটা সিরিজই করা হবে এবং সম্ভবপর হলে তার অনুলিখন পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হবে। পরবর্তী বক্তা হিসেবে আমি প্রস্তাব করলাম মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর নাম—তাঁকে রাজি করাবার ভার সেহেতু আমার ওপরেই পড়ল। আমি গিয়ে ধরলাম তাঁকে। তিনি বললেন, 'ভাই, আমি বুড়ো মানুষ—চলতে ফিরতে অসুবিধে হয়। তোমরা যদি সত্যিই আমার কথা শুনতে চাও, তাহলে আমার বাড়িতেই একদিন কষ্ট করে এসো—আমি যথাসাধ্য তোমাদের দাবি পূরণ করবো।' সকলেই ওই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। মওলানা সাহেবের বাড়িতে গিয়ে চা-নাশতা সহকারে আমরা তাঁর স্মৃতিকথা শুনে এলাম, *আজাদে* বড় করে খবরও ছাপা হলো।

এতে সবচেয়ে দুঃখিত হলেন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন। তিনি বললেন, 'আকরম খাঁ চিরকাল মুক্তবুদ্ধিচর্চার বিরোধিতা করে এসেছেন। তোমাদের সঙ্গে তাঁর আদর্শগত মিল কোথায় যে, তোমরা তাঁর বাড়িতে গিয়ে সাহিত্য-সংসদের সভা করে আসবে?' আমরা বলতে চাইলাম, মিল না থাকলেও প্রবীণ সংস্কৃতিসেবীদের কথা আমরা তাঁদের মুখ থেকে শুনতে চাই, আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসের উপকরণ তাতে সংগৃহীত হবে। নাসিরউদ্দীন সাহেবের দুঃখবোধ তাতে কমলো না।

আমরাও ওই সিরিজ চালিয়ে যেতে চাইলাম। অত:পর কবি গোলাম মোস্তফা এবং আবারো আমার দৌত্য এবং তাঁর বাড়িতে সভা। এবারে আমাদের মধ্যেও কেউ কেউ ক্ষীণ আপত্তি করলেন, কিন্তু সভা হলো। গোলাম মোস্তফা খুব খুশি হয়ে বললেন, আমাদের মধ্যে উদারতা ও শ্রদ্ধার যে নতুন অভিব্যক্তি তিনি দেখতে পাচ্ছেন, তাতে তিনি একই সঙ্গে চমৎকৃত ও আশান্বিত হয়েছেন। নবীন-প্রবীণের এই যোগ পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন বেগের সঞ্চার করবে।

তা আসলে হয়নি। দু-একজন ছাড়া আমাদের বিরুদ্ধপক্ষ মনে করলেন, এ একটা চালাকি। আমাদের মধ্যে দু-একজন ক্ষুণ্ন হলেন এই ভেবে যে, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আমরা হারাতে বসেছি। নাসিরউদ্দীন সাহেবের মন খারাপ হয়ে থাকলো। *সওগাত*-অফিসে আমাদের পাক্ষিক অধিবেশন কিছুদিন বন্ধ রইল।

২১.

১৯৫৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে শহীদ দিবস পালনে সরকারের বিরোধিতা ও নির্যাতনের কথা আগে লিখেছি। তখন সোহ্‌রাওয়ার্দী নিজে এবং ফজলুল হকের মনোনীত আবু হোসেন সরকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এর মাত্র কদিন আগে যুক্তফ্রন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে ভেঙে যায়। পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট-মন্ত্রিসভা গঠন করা নিয়ে প্রথম

থেকেই একদিকে কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলাম এবং অন্যদিকে আওয়ামী লীগের মধ্যে মন-কষাকষি শুরু হয়েছিল, প্রদেশে ৯২ক ধারা অর্থাৎ নির্বাচিত মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে গভর্নরের শাসন প্রবর্তিত হলেও সে-মনোমালিন্যের অবসান হয়নি। কোনো কোনো মহল যুক্তফ্রন্ট ভাঙার প্ররোচনা দিচ্ছিল এবং তারই ফলে ১৯৫৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারিতে যুক্তফ্রন্টের সংসদীয় দলের সভায় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। কেন যে এ-সভা ডাকা হয়েছিল, তা মনে পড়ে না, তবে সভায় আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যেরা যুক্তফ্রন্টের নেতারূপে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অনাস্থা-প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং কৃষক-শ্রমিক দলের সদস্যরা ফজলুল হকের প্রতি আস্থা-প্রস্তাব আনয়ন করেন। অল্প ভোটে ফজলুল হকই জয়ী হন, কারণ যুক্তফ্রন্ট ভাঙার বিরোধী গণতন্ত্রী দল তাঁর পক্ষে ছিল আর আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ১৯-২০ জন সদস্য তাঁকে ভোট দিয়েছিলেন। এঁরা আওয়ামী লীগের সঙ্গে থাকলে ফজলুল হক পরাজিত হতেন, তবে ভোটাভুটির পরে আতাউর রহমান খান নিজেকে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত নেতা বলে দাবি করেন। কার্যত ওইদিনই যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায়, তবে শেষ পর্যন্ত ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন অংশ যুক্তফ্রন্ট বলে এবং আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন অংশ আওয়ামী লীগ হিসেবে পরিচিত হয়।

জুনের ৩ তারিখে ৯২ক ধারা প্রত্যাহার করা হয় এবং কয়েকদিনের মধ্যে আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। আওয়ামী লীগের যেসব সদস্য ফেব্রুয়ারি মাসে ফজলুল হককে ভোট দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আবদুস সালাম খান ও হাশিমউদ্দীন আহমদ মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছিলেন। আগস্ট মাসে অসুস্থ গোলাম মোহাম্মদকে সরিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইসকান্দর মীর্জা গভর্নর-জেনারেল হলেন, পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশন বসলো, বরিশালের আবদুল ওয়াহাব খান—আমার সহপাঠী সেলিমের পিতা—তার স্পিকার নির্বাচিত হলেন, কেন্দ্রে মুসলিম লীগ-যুক্তফ্রন্ট কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলো, এককালের আমলা ও পরে অর্থমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রী হলেন, ফজলুল হক হলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বগুড়ার মোহাম্মদ আলী যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত পদে ফেরত গেলেন। এর অল্পকাল পরে ঢাকায় পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক সভায় পাঞ্জাবের এক আহরার-নেতা এ ধরনের সমীকরণ করেছিলেন : ফজলুল হক কী, না রাষ্ট্রদ্রোহী; রাষ্ট্রদ্রোহী কী, না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী; অতএব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কী, না রাষ্ট্রদ্রোহী।

ফেব্রুয়ারিতে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাওয়ার পরে আওয়ামী লীগের ওপরে ফজলুল হক হাড়ে-হাড়ে চটে গেলেন। কেন্দ্রে মুসলিম লীগের সঙ্গে আওয়ামী লীগের কোয়ালিশন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, শুধু আওয়ামী লীগ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী করতে চাইছিল বলে মীমাংসা হতে সময় লাগছিল। তখন ফজলুল হকই আগ বাড়িয়ে মুসলিম-লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবি না তুলেই। কমিউনিস্ট-নেতা মীর্জা আবদুস সামাদের কাছে শুনেছি, তাঁকে বাড়িতে ডেকে পাঠিয়ে ফজলুল হক কমিউনিস্ট পার্টির কাজ চালিয়ে যেতে উৎসাহ দেন এবং পরবর্তী নির্বাচনে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট বা নির্বাচনী আঁতাত করবেন বলে ধারণা দেন। অথচ ১৯৫৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টিকে যুক্তফ্রন্টে নেওয়ার ব্যাপারে মওলানা ভাসানী

ছিলেন প্রস্তাবক, সোহ্‌রাওয়ার্দী নিমরাজি, আর ফজলুল হক ঘোর বিরোধী।

পাকিস্তান হওয়ার পরে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়নি বটে, তবে এর নেতাদের নামে হুলিয়া ছিল বলে তাঁরা সকলেই আত্মগোপন করে ছিলেন। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি থেকে পাকিস্তানের কিংবা পাকিস্তানের দুই অংশের পার্টি ভাগ হতেও কিছু সময় লেগেছিল। ১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে—সরকারি কড়াকড়ি একটু শিথিল হওয়ায়—কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে কাজ করতে শুরু করেছিল, তবে তার অধিকাংশ নেতা তখনো আত্মগোপন অবস্থায় ছিলেন। এ-সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র ছিলেন মীর্জা আবদুস সামাদ (তাঁর স্ত্রী লায়লা সামাদ ছিলেন বিশিষ্ট লেখক এবং সাহিত্য সংসদে আমাদের সহকর্মী); সাংবাদিক কে জি মুস্তাফা এবং শান্তি পরিষদের নেতা আলী আকসাদ প্রকাশ্যে পার্টির কাজ করতে শুরু করেন। ৯২ক ধারা জারি হতেই এঁরা সবাই আত্মগোপন করেন—মীর্জা সামাদ চলে যান কলকাতায়। আমার মনে হয়, আহমদ তখনো প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ করতে শুরু করেনি, পুলিশ তার খোঁজাখুঁজি করলে সে-ও আত্মগোপন করে, যদিও তার অগ্রজ—গণতন্ত্রী দলের প্রচার-সম্পাদক—সৈয়দ মুহম্মদ হোসেন কারারুদ্ধ হন। ৯২ক ধারা উঠে গেলে আলুর বাজারে মতি সর্দারের বাড়িতে বা তাঁর ব্যবস্থাপনায় একটি ঘরে কমিউনিস্ট পার্টির অফিস খোলা হয় (মতি সর্দার ছাত্র ইউনিয়নকেও অফিসের জায়গা করে দেন)। মীর্জা আবদুস সামাদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন দুই নূরুন্নবী এবং বগুড়ার আবদুল মতিন। এ-সময়ে নেয়ামাল ও আহমদ উভয়েই প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ করতে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে ঘোড়াগাড়িতে মাইক্রোফোনযোগে নেয়ামাল প্রচার চালাতো উর্দুতে, আহমদ বাংলায়। পল্টনে কমিউনিস্ট পার্টির জনসভায় লোক-সমাগম কম হতো না। অনেকে কমিউনিস্ট মতাদর্শের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও এ-দলের লোকদের সৎ ও আদর্শনিষ্ঠ বলে মানতেন, অনেকে অবশ্য তাঁদের গণ্য করতেন পাকিস্তানবিরোধী বলে।

আবু হোসেন সরকার কমিউনিস্ট পার্টির উপকার করেছিলেন। মন্ত্রিসভা-গঠনের পর তিনি বিনা বিচারে আটক রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়েছিলেন। তাছাড়া রাজনৈতিক কারণে যত হুলিয়া জারি হয়েছিল, তাও তাঁর সরকার প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। এতে সবচেয়ে লাভবান হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি।

তবু নীতির প্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে যুক্তফ্রন্ট বা আওয়ামী লীগ কোনো পক্ষকেই সমর্থন করা সম্ভবপর হয়নি। সেটা আরো কঠিন হয়ে গেল অল্পকাল পরে। প্রথমে হলো পুলিশ-ধর্মঘট—বেতন ও অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধির দাবিতে। এর পেছনে বাম রাজনীতির গন্ধ পেয়ে সরকার আবার রাজনীতিবিদদের গ্রেপ্তার করতে লাগলেন—বিশেষ করে যাঁরা সদ্য মুক্তিলাভ করেছিলেন, তাঁদের। কমিউনিস্ট পার্টি এতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

কিছুকালের মধ্যে দেখা দিয়েছিল খাদ্য-সংকট। এসব সময়ে যেমন হয়, প্রথমে মূল্যবৃদ্ধি, তারপর মজুতদারি। এর প্রতিবাদে যেসব সভা ও মিছিল হলো, তাতে আওয়ামী লীগের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত কম শক্তি নিয়েও কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থকেরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। ঢাকায় ভুখা মিছিলে গুলি চলে চকবাজারে, তাতে

কয়েকজনের মৃত্যু হয়। ফলে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ-সভা হয়, সেখানে একজন একটা বুলেটের খোল দেখিয়ে বলে, এই বুলেটই ক্ষুধিতের প্রাণ হরণ করেছে। ওই সভায় সাখাওয়াত হোসেন খুব নাটকীয় বক্তৃতা দেন। খাদ্য-সংকটের কারণে মওলানা ভাসানী অনশন করেন এবং সরকারের প্রতি সমর্থনে ভাটা পড়ে।

এই সময়ে প্রাদেশিক স্পিকার আবদুল হাকিমের বাড়িতে আমরা খুব আড্ডা দিতাম তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নাজিম মাহমুদের সঙ্গে। নাজিম মাহমুদের কাছে আভাস পাই যে, আসন্ন বাজেট-অধিবেশনে নাটকীয় কিছু ঘটতে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট দিনে দর্শকের গ্যালারিতে আমরা অধীর আগ্রহে বসে আছি। এক সময়ে মীর্জা গোলাম হাফিজ স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন যে, পরিষদের যেসব সদস্য গ্রেপ্তার হয়েছেন, বাজেট-অধিবেশনে তাঁদের আনবার ব্যবস্থা না হওয়ায় তাঁদের এবং পরিষদের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। স্পিকার এ-বিষয় বসন্তকুমার দাসের—তিনি তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও—মতামত শুনতে চাইলেন। বসন্তকুমার দাসের পরে আরো দু-একজন কিছু বললেন। তারপর মীর্জা গোলাম হাফিজ দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে বন্দি সদস্যদের পরিষদে না আনা পর্যন্ত অধিবেশন মুলতুবি রাখার প্রস্তাব করলেন। অধিবেশনে অল্প সময়ের জন্যে বিরতি দেওয়া হলো—বিরতির পরে স্পিকার রুলিং দেবেন। বিরতির সময়ে দর্শকদের মধ্যে নানারকম গুঞ্জন উঠল এবং মন্ত্রী বা হুইপদের কাউকে কাউকে স্পিকারের খাস কামরায় ছুটে যেতে দেখা গেল। বিরতির পরে স্পিকার দীর্ঘ ভাষণ দিয়ে বললেন, তিনি মনে করেন, সরকার পরিষদের অধিকার ক্ষুণ্ন করেছে এবং নির্বাচিত সদস্যদের জেলে রেখে তিনি বাজেট-আলোচনা করতে দিতে পারেন না। অতএব অর্থমন্ত্রীকে বাজেট-উত্থাপনের অনুমতি তিনি দিচ্ছেন না এবং পরিষদের অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণা করছেন।

প্রকৃতপক্ষে এই রুলিংয়ের অর্থ দাঁড়ালো এই যে, সরকার যথাসময়ে বাজেট পাশ করাতে পারবেন না এবং তাতে তাঁদের এক ধরনের নৈতিক পরাজয় হবে। তবে রুলিং দেওয়ার সময়ে স্পিকার অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণা করলেও কতোদিনের জন্যে মুলতুবি, উত্তেজনাবশে তা বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। সদস্যদের অনেকে এবং বিশেষ করে সাংবাদিকরা এই অস্পষ্টতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ব্যাপারটা সামলে নেন পরিষদের সচিব সৈয়দ মাহবুবুর রহমান। তিনি বলেন, স্পিকারের রুলিংয়ের শেষ দুটি শব্দ ছিল 'অনির্দিষ্টকালের জন্য', কিন্তু 'মুলতুবি' কথাটা শুনেই সদস্যেরা এমন করে টেবিল চাপড়ে হইচই করছিলেন যে তা শোনা যায়নি।

পরে গভর্নরকে দিয়ে তিন মাসের জন্য বাজেট 'সার্টিফাই' করিয়ে নেওয়া হয়। এর মধ্যে ফজলুল হক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হয়ে এসেছেন। তিনি আবু হোসেন সরকারের আনুকূল্য করতে চান, কিন্তু নিয়মমাফিক পরিষদের মুখোমুখি হওয়ার যে-দায়িত্ব সরকারের ছিল, তা থেকে তাঁদের অব্যাহতি দিতে পারেননি। ওদিকে ওই বাজেট-অধিবেশনের পর যুক্তফ্রন্টের মধ্যে এক ধরনের ভাঙন ধরতে শুরু করে। পরিষদ আহ্বান না করে আবু হোসেন সরকার পদত্যাগ করেন। তার কয়েকদিনের মধ্যে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হয়।

২২.

প্রদেশে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে দুটি বড়ো ঘটনা ঘটে : আওয়ামী মুসলিম লীগের অসাম্প্রদায়িকীকরণ এবং পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র (তখন 'সংবিধান' শব্দটি প্রচলিত হয়নি) গ্রহণ।

আওয়ামী মুসলিম লীগের কাজ ও ভাবনার মধ্যে অসাম্প্রদায়িকতা অনেকদিন ধরে চলে আসছিল। দলের দুয়ার অমুসলমানদের জন্যে উন্মুক্ত করার কথাও ভাবা হয়েছিল, কিন্তু কৌশলগত কারণে নির্বাচনের আগে তা করা হয়নি। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ অবশ্য ১৯৫৪ সালেই 'মুসলিম' শব্দটা সংগঠনের নাম থেকে বাদ দিয়েছিল। ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে যুবলীগ থেকে অনেকেই আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে অসাম্প্রদায়িকতার পক্ষের শক্তি সুদৃঢ় করেন। ফলে, ওই অধিবেশনে আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম থেকে মুসলিম শব্দের বর্জন সহজসাধ্য হয়। মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন, আর যুবলীগ থেকে যাঁরা যোগদান করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অলি আহাদ (তিনি অবশ্য আগেই ভারপ্রাপ্ত প্রচার-সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছিলেন), তাজউদ্দিন আহমদ ও আবদুস সামাদ আজাদ) নানা শাখার সম্পাদকের পদ লাভ করেন। গঠনতন্ত্র-অনুযায়ী সভাপতি যাঁদেরকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত করেন, তাঁদের মধ্যেও যুবলীগ থেকে আসা বেশ কয়েকজন ছিলেন। ফলে আওয়ামী লীগের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী অংশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র-রচনার কাজ শুরু হয় মুসলিম লীগ-যুক্তফ্রন্ট কোয়ালিশনের নেতৃত্বে। শাসনতন্ত্রের বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য যুক্তফ্রন্ট দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুজন শিক্ষককে করাচি নিয়ে যান : আবদুর রাজ্জাক (পরে জাতীয় অধ্যাপক) ও মোজাফফর আহমদ চৌধুরী (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য)। এঁরা দুজনে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ-সংরক্ষণের বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, সে-সম্পর্কে সদস্যদের বোঝাতেন। রাজ্জাক সাহেবের কাছে শুনেছি, শাসনতন্ত্রের বিষয়ে সবচেয়ে উৎসাহ ও মনোযোগ দিয়ে যিনি তাঁদের কথা শুনতেন, তিনি ছিলেন ইউসুফ আলী চৌধুরী ওরফে মোহন মিয়া।

পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা ওই অঞ্চলের চারটি প্রদেশকে একত্র করে এক ইউনিট গঠন করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন, সেই সঙ্গে সংখ্যাসাম্যের নীতির (অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব হবে সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তানের সমান) ওপরেও তাঁরা জোর দিচ্ছিলেন। দুটিই তাঁরা করিয়ে নিতে পেরেছিলেন এবং নতুন শাসনতন্ত্রে পূর্ব বাংলার নাম বাংলা হবে, ফজলুল হকের এই আশ্বাস সত্ত্বেও এর নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। তাছাড়া, পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ প্রভাবশালী সদস্য রাষ্ট্রের নামে ইসলামি প্রজাতন্ত্র শব্দ দুটি রাখতে চেয়েছিলেন, তাঁরা তা করতে সমর্থও হয়েছিলেন। তাঁরা স্বতন্ত্র নির্বাচনপদ্ধতিও বজায় রাখতে চেয়েছিলেন, যদিও পূর্ব বাংলার সদস্যরা দাবি করেছিলেন যুক্ত নির্বাচনপদ্ধতির প্রবর্তন।

শাসনতন্ত্রের খসড়ার বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় বেশ আন্দোলন দেখা দেয়। আওয়ামী

লীগ, কংগ্রেস, গণতন্ত্রী দল, ইউ পি পি এবং পেছন থেকে কমিউনিস্ট পার্টি এই আন্দোলন পরিচালিত করে। এর একটি সুফল এই হয় যে, নির্বাচনপদ্ধতির প্রশ্নটি দুই অংশের ব্যবস্থাপক পরিষদের ওপরে ছেড়ে দেওয়া হয়। পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত হয় যুক্ত নির্বাচন প্রথার সপক্ষে। সে-সময়ে এই বিষয়ে শেখ মুজিবুর রহমান একটি স্মরণীয় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। গণপরিষদে পূর্ব বাংলার নাম বাংলা রাখার প্রস্তাবও করেছিলেন তিনি। সেখানে বিরোধী দলের নেতা ছিলেন সোহ্‌রাওয়ার্দী। যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে সেখানে তিনিও চমৎকার বক্তৃতা দেন। আওয়ামী লীগের অধিকাংশ সদস্যই সংখ্যাসাম্য-নীতিকে পূর্ব বাংলার আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখিয়ে পূর্ব বাংলার জন্যে স্বায়ত্তশাসন এবং উন্নয়ন-ব্যয়বৃদ্ধি দাবি করেন। শেখ মুজিবুর রহমান তখনই দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রাসংক্রান্ত বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রেখে বাকি সব বিষয় প্রাদেশিক সরকারের আয়ত্তে রাখার প্রস্তাব করেছিলেন। ইসলামি প্রজাতন্ত্র নাম রাখার ব্যাপারেও পূর্ব বাংলার সদস্যেরা আপত্তি উত্থাপন করেন।

যাহোক, শাসনতন্ত্র শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয় এবং সেই মুহূর্তে সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যেরা ওয়াকআউট করেন। তবে সোহ্‌রাওয়ার্দী পরে শাসনতন্ত্র-বিলে সই করেছিলেন, শেখ মুজিবের নেতৃত্বে অন্যেরা স্বাক্ষরদানে বিরত থাকেন।

পূর্ব পাকিস্তানে আতাউর রহমান-মন্ত্রিসভা ক্ষমতাগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আবার সকল রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়। এবারে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের গেটে পুরো মন্ত্রিসভা উপস্থিত হয়ে মুক্ত বন্দিদের অভ্যর্থনা জানান। কোনো কোনো বন্দিকে জেলের কম্বল ইত্যাদি নিয়ে যেতেও উৎসাহিত করা হয়।

গণতন্ত্রী দলের মাহমুদ আলী এই মন্ত্রিসভার সদস্য হয়েছিলেন। তাঁর মুখে শুনেছি, শপথ গ্রহণ করতে যাবেন বলে তিনি প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন বাড়িতে, অথচ পুলিশ এসকর্ট আর আসে না। শেষ পর্যন্ত এসকর্ট এসে পৌঁছোলে পুলিশের এক কর্মকর্তা দেরির জন্য মাফ চাইলেন : 'সার্, আমরা বাড়ি খুঁজে পাচ্ছিলাম না।' মাহমুদ আলী উত্তর দিয়েছিলেন : 'অ্যারেস্ট করার সময়ে তো বাড়ি খুঁজে পেতে আপনাদের অসুবিধে হয় না।'

আতাউর রহমানের শাসনকালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সুয়েজ-সংকট নিয়ে আমাদের আন্দোলন। মিসর ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত করে। আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্স—এবং তাদের প্ররোচনায় ইসরায়েলও—মিসর আক্রমণ করে। এই খবর ঢাকায় পৌঁছোলে বিশ্ববিদ্যালয়ে বড়ো প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং তারপরে একটি মিছিল নিয়ে মার্কিন ও ব্রিটিশ তথ্য সার্ভিসের অফিসের সামনে বিক্ষোভের সিদ্ধান্ত হয়। আখতার আহাদ এতে বড়ো ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং শান্তিপূর্ণ মিছিলকে উত্তেজিত করতে পেরেছিলেন। প্রেসক্লাবের উলটোদিকে ইউ এস আই এসের দরজা-জানালার বিশাল সব কাচ ঢিল মেরে ভেঙে দেওয়া হয় এবং পুরানা পল্টনে বি আই এসের পুরো কাঠের বাড়িটাই জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ লাগে। পরদিন পুলিশি হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে আমরা কলাভবন-প্রাঙ্গণে যখন সভা করছিলাম, তখন দেখা গেল, মুখ্যমন্ত্রী

আতাউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের বাইরে গাড়ি রেখে একজন সহকারী ও একজন নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে সভার দিকে আসছেন। তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনলেন, তারপর কিছু বলার জন্যে সভাপতির অনুমতি চাইলেন। অনেকে এতে আপত্তি করেন। তখন আতাউর রহমান বললেন, ওই সভায় তাঁর নাম করে নিন্দা করা হয়েছে, সুতরাং আত্মপক্ষ সমর্থন করে তাঁকে কিছু বলতে দেওয়া উচিত। তাঁর বক্তৃতায় তিনি কূটনৈতিক শিষ্টাচারের বিষয়টি তুলে ধরলেন এবং বললেন, ছাত্রেরা যে-ক্ষয়ক্ষতি করেছে তা পূরণ করতে হবে আমাদের সরকারকে—গরিব করদাতাদের পয়সায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে, প্রতিবাদ জানাবার এই পন্থা আমাদের জাতীয় স্বার্থের অনুকূল কিনা।

তাঁর কথায় আমরা প্রায় সবাই চুপ করে রইলাম। সভাপতির সঙ্গে করমর্দন করে তিনি আবার হেঁটে হেঁটে ফটক পেরিয়ে সরকারি গাড়িতে উঠলেন।

২৩.

বৃত্তির টাকা দিয়ে একটা নতুন সাইকেল কিনেছিলাম। কেনার দু-তিন দিন পরে এক সকালে আবদুল আলী আর আমি সেই সাইকেলযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন থেকে রেজিস্ট্রারের দপ্তরে (এখন জগন্নাথ হলের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের ভবন) গেছি কী এক কাজে। কাজ সেরে নিচে নেমে এসে দেখি, সাধের সাইকেল উধাও।

কী করা যায়? থানায় খবর দেওয়াই প্রথম কর্তব্য। দুই বন্ধু হাঁটতে হাঁটতে লালবাগ থানায় পৌঁছলাম। মূল টেবিলে ইউনিফর্ম পরে একজন বসে আছেন। পাশে ইজিচেয়ারে শুয়ে এবং তার হাতলে এক পা তুলে দিয়ে যিনি বিড়ি খাচ্ছেন, তাঁর পরনে একটা ময়লা লুঙ্গি, খালি গা, মাথাভর্তি জট-পাকানো চুল। তাঁকে পথে-ঘাটে অনেক দেখেছি এবং সযত্নে তাঁর সান্নিধ্য পরিহার করে চলেছি অপ্রকৃতিস্থ ভেবে। এখন বোঝা গেল, তিনি রাজার চর। ইউনিফর্ম একটা প্রশ্ন করেন তো খালি-গা একটা মন্তব্য করেন। নামধাম সাইকেলের বিবরণ লেখার পর ইউনিফর্ম প্রশ্ন করেন, কেন গিয়েছিলাম রেজিস্ট্রারের দপ্তরে? ও আমার কাজ ছিল, কিন্তু আমার বন্ধুটি কী করছিলেন? সাইকেল রেখে যাওয়ার পরে হারানো পর্যন্ত সর্বক্ষণ কি তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন? প্রশ্নবাণে দুজনেই জর্জরিত ও অপমানিত হয়ে ভাবলাম, আর নালিশ করার দরকার নেই। কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। তিনি জানালেন, বিবরণ অসম্পূর্ণ হয়েছে, সাইকেলের নম্বর এবং মালিকানা স্বত্বের প্রমাণ দাখিল করতে হবে—সেগুলো বাড়িতে থাকলে সেখান থেকেই এনে দিতে হবে। খালি-গা এমন ভাবভঙ্গি ও আওয়াজ করতে লাগলেন যে, মনে হলো, কে যে সাইকেল নিয়েছে, তা বুঝতে তাঁর বাকি নেই এবং তাকে ধরতে ও সাইকেল উদ্‌ধার করতে বিলম্ব হওয়ারও কোনো হেতু নেই।

আমাদের উদ্দেশে আব্বার একটি প্রিয় তিরস্কার ছিল, 'এখনো দায়িত্বজ্ঞান হলো না।' সুতরাং বাড়িতে কয়েকদিন একটু মাথা নিচু করেই থাকতে হলো। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্! হঠাৎ একদিন খবরের কাগজে পড়লাম, কয়েকটি চোরাই

সাইকেলসমেত চোর ধরা পড়েছে। উদ্‌ধারকৃত সাইকেলের নম্বরগুলোর মধ্যে আমারটাও আছে।

লাফাতে লাফাতে সূত্রাপুর থানায় গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে কেন, এতদিন পরে তা আর মনে পড়ে না, হয়তো আমাদের বাড়ি ওই থানার অধীন বলে অথবা কাগজে 'নিকটস্থ' থানায় যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল বলে। ছোটো দারোগা অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে একটা তালিকার সঙ্গে আমার দেওয়া নম্বর মিলিয়ে বললেন, হ্যাঁ, পাওয়া গেছে, তবে সেটি নিতে হলে আদালতের অনুমতি লাগবে। আদালতপাড়ায় এসে আমার মেজো খালুর প্রথম পক্ষের জামাতা আনিসউদ্দীন আহমদ মুখতিয়ারকে ধরলাম। স্ট্যাম্প পেপারে আরজি টাইপ করিয়ে (স্ট্যাম্প পেপারের দাম এবং টাইপ করানোর খরচা দিতে হলো, মোক্তার সাহেব কিছু নিলেন না) তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন জানালেন এবং প্রায় তৎক্ষণাৎ দরখাস্ত মনজুর হয়ে গেল এই শর্তে যে, মামলার প্রতিদিনে আলামত হিসেবে ওই সাইকেল আমাকে উপস্থিত করতে হবে।

অনুমতিপত্র নিয়ে সূত্রাপুর থানায় গিয়ে শুনলাম, জিনিসগুলো উদ্‌ধার হয়েছে তেজগাঁও থানাধীন এলাকায়, তাই সেখানকার মালখানা থেকে তা সংগ্রহ করতে হবে (এ-কথা তাঁরা আগে বলেন নি)। গেলাম তেজগাঁও থানায়। সেখানে ভালো করে আদেশনামা পড়ে একজন অপরকে, তিনি আরেকজনকে, এইভাবে কয়েকধাপ হুকুম গড়াবার পর, মালখানার গর্ভ থেকে যা বেরিয়ে এলো, তা সাইকেল নয়, তার অন্তর্নিহিত ত্রিভুজটি মাত্র। আমার ভাগ্যদোষে, সেখানেই সাইকেলের আদি নম্বরটা লেখা থাকে।

মহামান্য দারোগা সাহেবকে বললাম, সাইকেলের এই টুকরোটাই যদি শুধু পাওয়া গিয়ে থাকে, তবে তা নিয়ে আমার কাজ নেই, ওটা থানায়ই থাকুক। তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার নিয়ে এসেছেন, এটা আপনাকে নিয়ে যেতে হবে এবং মামলার শুনানির সময়ে রোজ কোর্টে হাজির করতে হবে। আমাদের পক্ষে আর এটা রাখার কোনো উপায় নেই।'

হৃত সাইকেল উদ্‌ধার করে তাতে চড়ে বিজয়ীর বেশে বাড়ি ফিরছি—এই কল্পনা নিমেষেই তিরোহিত হলো। রিকশা ভাড়া করে ত্রিভুজাকৃতির ওই সাইকেল-অঙ্গ বাড়ি আনতে কতোজনের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি যে আকর্ষণ করলাম এবং দায়িত্বজ্ঞান-সম্পর্কিত পিতৃ-উক্তি যে কতোবার স্মরণ করলাম, তা বলা দুষ্কর।

তারপর একদিন সমন পেয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে সময়মতো হাজির হলাম। মামলা উঠবে। কোর্ট ইনস্পেক্টরের পক্ষে কেউ সেই ত্রিভুজের দায় থেকে আমাকে মুক্ত করলেন। কিন্তু মামলা আর ওঠে না। আসামীকেও দেখলাম—সুবেশ এক তরুণ। দুপুরে কোর্ট ইনস্পেক্টর বললেন, 'চলেন, খেয়ে আসি, মামলা উঠবে লাঞ্চের পরে।' আমি অত্যন্ত সংকোচ বোধ করলাম এই ভেবে যে, দুজন তো দূরের কথা, একজনেরও ভরপেট খাওয়ার মতো পয়সা আমার পকেটে নেই। আমি ইতস্তত করতে লাগলাম। কোর্ট ইনস্পেক্টর প্রায় ধমকের সুরে তাঁকে অনুসরণ করতে বললেন। তারপর ও কে রেস্টুরেন্টের পাশে এক ঢাকাই মোগলাই রেস্টুরেন্টে ঢুকে দেখলাম, আসামী-পক্ষের লোকজন মোরগ-পোলাওয়ের অর্ডার দিয়ে বসে আছে এবং কোর্ট ইনস্পেক্টর ও আমি

তাঁদেরই অতিথি। সত্যি সত্যি আমার গলা দিয়ে খাবার ঢুকছিল না এবং ইনস্পেক্টর সাহেব মুরগির গোশ্‌তকে যথাস্থানে পাঠিয়ে এবং তার অঙ্গসংস্থান সম্পর্কে যথোচিত জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে আক্ষেপ করে বললেন, খেতে পারি না বলেই আমি এত রোগা-পাতলা (পরিচিত পাঠক, বিশ্বাস করুন, আমি এক সময়ে পাতলাই ছিলাম)।

রেস্টুরেন্টের ওই ঘোরের মধ্যে আমি এতই আচ্ছন্ন ছিলাম যে, আদালতে কখন মামলা উঠলো, কখন কে কী বললো এবং কখন মামলার পরবর্তী দিন ধার্য হলো, কিছুই টের পেলাম না। তবে ওই ত্রিভুজ সাইকেলাংশ যে বয়ে বেড়াতে হবে না, তার জন্যে কোর্ট ইনস্পেক্টরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকলাম।

মামলার পরবর্তী শুনানি যেদিনে পড়লো, সেদিন আমার আদালতে পৌছোতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়েছিল। আগের দিন সেই সকালে এসে বসে থেকে বিকেলে মামলা উঠেছিল, পরের দিন দশটার জায়গায় এগারোটা হওয়ায় এমন কিছু যাবে-আসবে না, এমন একটা ভাব ছিল মনের মধ্যে। আদালতে পৌছোনো মাত্র জানতে পারলাম, সেদিন প্রথমেই ওই মামলা উঠেছে এবং গরহাজির সাক্ষী হিসেবে আমার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। কোর্ট ইনস্পেক্টর হাসিহাসি মুখে বলতে থাকলেন, 'আপনারা স্টুডেন্ট মানুষ—আইন-আদালতের কিছু বোঝেন না।'

সেদিন না তার পরদিন, রাতে বাসায় ফিরে দেখি, সূত্রাপুর থানা থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে দুই পুলিশ কনস্টেবল বসার ঘরে অপেক্ষা করছেন এবং আব্বা কী যেন তাঁদের বলছেন। আমার প্রত্যাবর্তনে আব্বা তাঁদের সামনেই আমার দায়িত্বজ্ঞান সম্পর্কে মন্তব্য করলেন এবং আদালতে যথাসময়ে হাজির হতে না পারার মতো কী রাজকর্ম করি, তা জানতে চাইলেন। কনস্টেবল দুজন যথাসম্ভব বিনীত কণ্ঠে আমাকে বললেন, 'সার্‌, ওয়ারেন্ট বেরিয়ে গেছে, আপনাকে থানায় যেতে হবে।'

এইবার আব্বা নিলেন বিপত্তারকের ভূমিকা। বললেন, 'থানায় যেতে হবে কেন? আমার মুচলেকায় সাক্ষীকে ছেড়ে দেবেন। আমার ছেলে সাক্ষী–আসামি নয়। আমাকে আইন দেখাবেন না, আমি বহু বছর ইংরেজ আমলে জুরির কাজ করেছি।' কনস্টেবল দুজন কী বুঝলেন, জানি না, আব্বাকে শুধু বললেন, 'সার্‌, আমরা কিছু পেয়ে থাকি।' ব্রিটিশ আমলের জুরি তাঁদের নগদ-বিদায় দিলেন এবং আমার প্রতি অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি হানলেন।

বড়োবুরা তখন রংপুরে। দুলাভাই সপরিবারে দার্জিলিং-ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছেন এবং তাঁদের আন্তরিক ইচ্ছা, আমি সেই সঙ্গে যোগ দিই। এদিকে আমি—হৃত ও পুনরুদ্‌ধারকৃত সাইকেলের মালিক এবং সেইসূত্রে সরকার বনাম অমুকের গুরুত্বপূর্ণ মামলার সাক্ষী—আদালতে উপস্থিত হতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। চিঠি লিখলাম, আমার আর যাওয়া হচ্ছে না, আপনারাই ঘুরে আসুন। দুলাভাই তৎক্ষণাৎ খবর পাঠালেন, আদালতের অনুমতি নিয়ে যেন তাদের সঙ্গে যোগ দিই। আবার পয়সা খরচ করে আবেদন, মোক্তার সাহেবকে ধরা, আদালতের অনুমতি সংগ্রহ করা। হায়, সাইকেল, কী কুক্ষণে পেয়েছিনু তোর এ অংশ, আমি রে অভাগা!

ঢাকার বাইরে যাওয়ার অনুমতি অবশ্য পেয়েছিলাম। পরে সাক্ষ্যদানের সুযোগও হয়েছিল। নামধাম বলে ত্রিভুজাকৃতির সেই অংশটা আমার বলে দাবি করেছিলাম।

প্রমাণস্বরূপ নম্বরটা কোথায় লেখা আছে, তাও দেখিয়ে দিয়েছিলাম। সাক্ষ্য দেওয়ার আগে কোর্ট ইনস্পেক্টর আমাকে তালিম দিচ্ছিলেন। আমি যখন বললাম যে, যেহেতু জিনিসটা আমারই, সে-সম্পর্কে যে-কোনো সওয়ালের জবাব দিতে পারবো, আমাকে কিছু শেখাতে হবে না, তখন তিনি বলেছিলেন, 'আরে সাহেব, আমার কথা শোনেন। কী বলতে হবে না-বলতে হবে, শিখিয়ে দিচ্ছি। বেশি কথা বলবেন না। আপনারা স্টুডেন্ট মানুষ—আইনের কিছু জানেন না।'

শেষ বাক্যটির মতো সত্য কথা আর কী হতে পারতো!

ওই মামলার আসামী যখন বেকসুর খালাস পেয়ে গেল, তখনো আবার মনে হয়েছিল, আইনের কী বা জানি!

২৪.

রংপুরে পৌঁছে জানা গেল, ট্রেনে করে আমরা যাবো, চিলাহাটি সেখানে মোশাররফ প্রধানের বাড়িতে এক রাত কাটিয়ে হলদিবাড়ি হয়ে দার্জিলিং যাবো। বড়োবুর বাড়িতে যে-ছেলেটি কাজ করতো—আবু বোধহয় তার নাম—সে দুলাভাইয়ের হাতে-পায়ে ধরতে লাগলো, তাকেও সঙ্গে নিতে হবে, সেও দার্জিলিং দেখতে চায়। এক সময়ে দুলাভাই বললেন, 'তুই যদি নিজে নিজে বর্ডার পার হতে পারিস, তাহলে সঙ্গে নেবো।'

প্রধান সাহেব সম্পন্ন মানুষ—সেই সূত্রে দুলাভাইয়ের মক্কেল। কৃষির জমি তাঁর প্রচুর—তাই কৃষি আয়কর-অফিসারকে আপ্যায়ন করা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু এই স্বার্থপরতার অতিরিক্ত কিছু ছিল তাঁর মধ্যে—যা আমাদের প্রতি তাঁর ও তাঁর পরিবারের ব্যবহারে প্রকাশ পেয়েছিল। দুলাভাই যখন আর রংপুরে নন, তাঁর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা নন, তখনো তিনি একটা পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। যে-রাত আমরা তাঁর বাড়িতে কাটিয়েছিলাম, সে-রাতে পরিচয় হয়েছিল আবুল বশর বলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে—তিনি আমাদের কোনো বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পীর প্রথম স্বামী।

পরদিন সীমান্ত পেরিয়ে আমরা যখন ট্রেনের অপেক্ষায় তখন 'দাস্যমুখে হাস্যমুখ বিনীত জোড়কর' আবু এসে উপস্থিত। আমি জানতে চাইলাম, সে সীমান্ত পেরোলো কী করে! সে যা বললো, তা 'নিতান্ত সরল অর্থ, অতি পরিষ্কার; বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার।' সে একটা গরু তাড়িয়ে এপার থেকে ওপারে চলে গিয়েছিল : দুপক্ষের সীমান্তরক্ষীদের জানিয়েছিল যে, অবাধ্য গরু সীমান্ত পার হয়ে গেছিল—সে তাকে ফিরিয়ে আনছে মাত্র।

সীমান্তের ওপারেও দুলাভাইকে অভ্যর্থনা জানাতে কেউ কেউ এসেছিলেন। নির্বিঘ্নে দেশান্তরী হওয়া গেল। ট্রেনে উঠে আমার বড়ো ভাগ্নে মামুন হঠাৎ প্রশ্ন করলো, 'আরেকজন কী করবে!' ব্যাপারটা কী? ক্যুপের মধ্যে লেখা আছে—'তিনজন বসিবেক, দুইজন শুইবেক।' অর্থাৎ দিনের বেলায় নিচের বার্থে তিনজন বসে যাবে, রাতে ওপরে-নিচে দুজন শুয়ে থাকবে। মামুনের যথার্থ প্রশ্ন, তৃতীয়জন করবেটা কী? আমরা ওর প্রশ্নে খুব একচোট হেসে নিয়েছিলাম।

শিলিগুড়ি থেকে লাইট ট্রেন—নিতান্ত খেলনার মতো মনে হয়। ইনজিনের সামনে—বাইরের—দিকে দুজন লোক বসে রেললাইনে বালি ছড়াচ্ছে। রেল সামনেই যাচ্ছে—তবে কখনো কখনো পিছিয়েও আসছে : দু পা এগিয়ে, এক পা পিছিয়ে।

দার্জিলিঙে নির্বিঘ্নে পৌঁছোনো গেল—কিন্তু থাকার জায়গা নিয়ে একটু সমস্যা দেখা দেওয়ায় আমরা আনজুমানে উঠলাম। সেখানে স্থান থাকলে বিনি পয়সায় থাকা যায়—আমরা তার সুযোগ নিলাম। আনজুমান-সংলগ্ন একটি খাবার দোকানে চাপাতি আর কিমা পাওয়া যেতো। দুবেলা তাই খেতে খেতে কিমার প্রতি একেবারেই বিমুখ হয়েছিলাম।

দার্জিলিঙে ভালো কেটেছিল। সকালবেলায় পর্বতের পশ্চাতে সূর্যোদয়, ঘরের খোলা জানালা দিয়ে মেঘের আনাগোনা, হাত বাড়িয়ে মেঘ ধরার চেষ্টা। পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটা, হঠাৎ বৃষ্টি, ভ্রমণকারীদের সঙ্গে অল্পস্বল্প আলাপ। হঠাৎ দেখলাম, পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণের স্কুল—তেনজিং নোরওয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। বেশ শিহরিত হলাম। হিলারি ও তেনজিং কিছুকাল আগে এভারেস্ট জয় করেছেন, সে-সংবাদে কী অপূর্ব শিহরণ হয়েছিল! এভারেস্ট-বিজয় নিয়ে *সবুজ নিশানে* একটা লেখাও ফেঁদেছিলাম। তেনজিংকে না দেখলেও তাঁর প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র দেখেই রোমাঞ্চিত হলাম। পরে কচিকাঁচার আসরে কী একটা লিখেছিলাম—তাতে এই প্রশিক্ষণ-কেন্দ্রের কথা ছিল।

এই ভ্রমণ ছাড়াও আমার জন্যে খুব উপভোগ্য হয়েছিল আমার দুই ভাগ্নে ও দুই ভাগ্নির সঙ্গ। আমি তাদের জন্যে নিয়ে গিয়েছিলাম সুকুমার রায়ের *হ-য-ব-র-ল*-র সিগনেট-সংস্করণ। রোজ সন্ধ্যায়—যখন আর বাইরে বের হওয়া দায়—তাদের পড়ে শোনাতে হতো সে-বই। কী যে উপভোগ করতো তারা—চারজনের বয়স বারো থেকে সাতের মধ্যে। এই বই পড়া ছাড়া মুখে-মুখে গল্প করার বায়না ছিল। আমি যতোদূর পেরেছিলাম, গল্প বলেছিলাম। কী মনে করে যে বার্নার্ড শ-র *অ্যান্ড্রোক্লিস অ্যান্ড দি লায়নের* গল্পটা করেছিলাম, তা জানি না। ওদের খুব ভালো লেগেছিল এবং তাও বারবার বলতে হয়েছিল। বিশেষ করে মেগি ও অ্যান্ড্রোক্লিস যেখানে সিংহের সামনে পড়েছে, মুখরা স্ত্রীকে আড়াল করে চিরকাল তার ধমক-খাওয়া-অ্যান্ড্রোক্লিস যখন মেগিকে পালিয়ে যেতে বলছে, যেখানে সে সিংহের সঙ্গে নাচছে, আর মেগি একটুও খুশি না হয়ে আবার অ্যান্ড্রোক্লিসকে ভর্ৎসনা করছে, কিংবা শেষদিকে যেখানে প্রাণভয়ে সম্রাট প্রিয়তম বন্ধু বলে সম্বোধন করে অ্যান্ড্রোক্লিসকে জড়িয়ে ধরছেন আর তার গায়ের উৎকট গন্ধ সম্পর্কে স্বগতোক্তি করছেন—এসব তাদের খুব পছন্দ হয়েছিল।

শৈলশিখরে এসে পরশুরামের 'কচি-সংসদ' মনে পড়েছিল, তবে কেষ্টর দেখা পাইনি, এমন কি, রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা'র নায়ক-নায়িকারও নয়। তবু এমন একটা পরিতৃপ্তি আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল, যার ব্যাখ্যা সহজসাধ্য নয়। ভূপৃষ্ঠেই আছি, অথচ মনে হচ্ছে, পৃথিবী ছাড়িয়ে আকাশের কাছে এসে পৌঁছেছি। এই মেঘমালা, এই পার্বত্য পথ, আকাশের গায়ে হেলান-দেওয়া-পাহাড়—এ সবই বুঝি অন্য জগতের।

ফেরার সময়ে মামুন ট্রেন থেকে অদূরবর্তী রাস্তা দিয়ে চলমান মোটরগাড়ির বয়ান করতে করতে চলেছে : এই শেভ্রোলেট, এই মরিস, এই অ্যামবাসাডর। আমার বড়ো

ভাগ্নি সেলিমা দেখছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—ফুল, লতা, মেঘ—আর ভাইকে বলছে, 'তুমি কিছুই দেখলে না, কী সুন্দর!'

সেই সুন্দরকে মনে ধারণ করে ঢাকায় ফিরে এলাম।

২৫.

বুলবুল ললিতকলা একাডেমী (বাফা) প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল দুটি : বুলবুল চৌধুরীর স্মৃতি ও নৃত্যকর্মকে ধরে রাখা এবং দেশের এই অঞ্চলে নৃত্যগীতবাদ্যচর্চা সম্প্রসারিত করা। বাফা প্রতিষ্ঠা করে বুলবুলের স্মৃতি জাগরূক রাখা সহজ হয়েছিল। এর পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া গিয়েছিল বেগম রানা লিয়াকত আলী খান, এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর কাছ থেকে। বিচারপতি মোহম্মদ ইবরাহিম ও বেগম শামসুননাহার মাহমুদ এর কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি ছিলেন। মাহমুদ নূরুল হুদা যেমন এঁদের সহযোগিতা আদায় করেছিলেন, তেমনি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন আরো অনেক গণমান্য ব্যক্তিকে।

বুলবুলের নৃত্য-সম্প্রদায়ের দুজন সদস্যকে প্রথমাবধি পাওয়া গিয়েছিল : নৃত্যশিল্পী অজিত সান্যাল এবং সংগীত-পরিচালক সেতারি খাদেম হোসেন খান। হুদাভাই কলকাতায় গিয়ে বুলবুলের পত্নী আফরোজা বুলবুলকে—মেয়ে নার্গিস ও ছেলে শাহেদসহ—নিয়ে এসেছিলেন। মনে করা হয়েছিল যে, ছাত্রছাত্রীদের বুলবুলের সৃষ্টিগুলো শেখাতে তিনি বিশেষভাবে সাহায্য করবেন। বাস্তবে তা হলো না। আফরোজার অহংবোধ ছিল প্রবল এবং বুলবুলের এতকালের বন্ধু ও তাঁর স্মৃতিরক্ষায় প্রণোদিত মাহমুদ নূরুল হুদার সঙ্গে তাঁর সংঘাত লেগে গেল—অনেকটা কর্তৃত্ব নিয়ে। আফরোজা কলকাতা চলে গেলেন, কিছুকাল পর ফিরে এলেন, আবার চলে গেলেন। বুলবুলের এক-আধটি নৃত্য—যেমন, 'হাফিজের স্বপ্ন'—ছেলেমেয়েদের শেখানো হয়েছিল। শেখানোর কাজটি ততো যত্নের সঙ্গে না হওয়ায় তা তেমন সাড়া জাগায়নি।

সাধারণভাবে নৃত্যগীতবাদ্যের প্রশিক্ষণ অনেক সফল হয়েছিল। শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন গওহর জামিল (নৃত্য), এ এম মুজতবা (বাঁশি), বোরহান আহমদ (গিটার), ফুলঝুরি খান (এসরাজ), ইউসুফ খান কোরায়শী (উচ্চাঙ্গ সংগীত), ফজলে নিজামী (রবীন্দ্র-সংগীত), বেদারউদ্দীন আহমদ (নজরুল-গীতি), আরো অনেকে ছিলেন। মোহাম্মদ হোসেন খসরু বোধহয় কিছুকাল অধ্যক্ষতা করেছিলেন, তারপর সে-ভার নেন মুনশী রইসউদ্দীন। রবীন্দ্র-সংগীতশিল্পী আবদুল আহাদ ও নজরুল-গীতিশিল্পী সোহরাব হোসেনও বাইরে থেকে সাহায্য করেছেন। পরে শিক্ষকতায় যোগ দিয়েছিলেন জি এ মান্নান (নৃত্য), বাবুরাম সিং (মনিপুরী নৃত্য), ভক্তিময় দাশগুপ্ত (রবীন্দ্র-সংগীত) ও বারীণ মজুমদার (উচ্চাঙ্গসংগীত)। লায়লা হাসান, রাহিজা খানম ও কাজল ইবরাহিমের মতো নৃত্যশিল্পী এবং জাহেদুর রহিম ও পাপিয়া সরোয়ারের মতো রবীন্দ্র-সংগীতশিল্পী যে বুলবুল একাডেমীরই ছাত্রছাত্রী, এ-নিয়ে একাডেমী গর্ব করতে পারে। বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শবনম (ঝর্ণা বসাক) এখানেই নৃত্যের তালিম

নেয়। চৌধুরী আবদুর রহিম নামে আরেকজন সম্ভাবনাময় রবীন্দ্র-সংগীতশিল্পী বাফা থেকে বেরিয়েছিলেন—পরে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে প্রশাসনিক কাজে যুক্ত হওয়ায় তাঁর শিল্পীজীবনে ছেদ পড়ে। আরো অনেক শিল্পীর কথা বলা উচিত ছিল, কিন্তু সবার নাম করতে পারা এই মুহূর্তে সম্ভবপর নয়।

বুলবুল একাডেমীর পরিচালনভার ছিল কার্যনির্বাহী কমিটির হাতে। সেখানে শিল্পীর চেয়ে শিল্পানুরাগীর সংখ্যাই ছিল অধিক এবং তাঁদের কর্তৃত্ব ছিল শিক্ষকদের চেয়ে বেশি। এ নিয়ে একটা অসন্তোষ পূর্বাপর ছিল। কখনো কখনো কেউ কেউ বাফা ছেড়ে দিয়ে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলেন—যেমন জাগো আর্ট সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন গওহর জামিল। আমরা হুদাভাইকে ঠাট্টা করে বলতাম, আপনার কারণেই এঁরা বাফা ছেড়ে দিয়ে অন্য প্রতিষ্ঠান গড়ছেন; আপনি তাই শুধু বাফার নন, দেশের সকল নৃত্যগীতবাদ্য-শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তবে শিক্ষকদের মধ্যেও সবসময়ে যে নিরবচ্ছিন্ন সম্প্রীতি থাকতো, তা নয়। ভক্তিময় দাশগুপ্ত ও বারীণ মজুমদার উভয়েই একসময়ে ওয়াইজঘাটে বাফার ভবনে সপরিবারে থাকতেন—তাঁদের মধ্যে দুঃখজনক বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল। ভক্তিময় দাশগুপ্ত পরে ভারতেই ফিরে যান।

সরকারি অফিসের কর্মচারী মকবুল মিয়া রোজ বিকেলে এসে প্রশাসনিক কাজকর্ম এবং চিঠিপত্র টাইপ করে দিতেন। সিরাজ মিয়া নামে একজন বয়স্ক টাইপিস্ট ছিলেন—মাঝে মাঝে তিনি এমন ভুল করতেন, যা নিয়ে হাসাহাসি করার একটা সুযোগ সৃষ্টি হতো। পিওন খালেক মূলত বাইরের কাজ করতো। অপর পিওন হাফিজুল্লাহ করতো অফিসের কাজ—কথায় কথায় সে 'পাইলফত্র' (ফাইলপত্র) বলে আমাদের হাস্যোদ্রেক করতো। তার বিরুদ্ধে একবার দুর্ব্যবহারের অভিযোগ এলে সে কৈফিয়ত দিয়েছিল 'আমি তো কবি নই' বলে। অর্থাৎ কবি হলে তার ভাষা ও আচরণ যেমন মার্জিত হতে পারতো, ভাগ্যদোষে সে তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। দেলোয়ার হোসেন ওরফে দিলু মিয়াকে এক সময়ে ভবনের দেখাশোনা ও নিরাপত্তা বিধানের ভার দেওয়া হয়—তার ছেলে আমীর হোসেন বাফায় শিক্ষা নিয়ে ভালো নৃত্যশিল্পী হয়েছিল।

সেকালে বুলবুল একাডেমী সাহসিকতার সঙ্গে একটি কাজ করেছিল। সরকারি মহলে তো বটেই, তাদের প্রচারণার ফলে সাধারণভাবে দেশের আবহাওয়া ছিল ভারত-বিদ্বেষী এবং বাংলার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে সন্দিহান। এই অবস্থায় বাফা তিন দফায় পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীদের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে—অবশ্য বাফার জন্যে অর্থসংগ্রহ তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমে একই সঙ্গে এসেছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস ও সুচিত্রা মিত্র। একাডেমী-প্রাঙ্গণে বিরাট প্যান্ডেল করে তাঁদের সংগীত-পরিবেশনের ব্যবস্থা হয়েছিল। টিকিট তো সবই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল, তারপর অনেক দর্শক টিকিট না পেয়েও প্রবেশ করার জন্যে মূল ফটকে ঠেলাঠেলি করতে শুরু করেন। হঠাৎ করে কলিম শরাফী ছুটে গেলেন গেট সামলাবার জন্যে এবং সেখানে আধো-আলো আধো-অন্ধকারে সামনে যাকে পেলেন, তার নাকে ঘুষি বসিয়ে দিলেন। একটু পরই দেখা গেল, যার নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে, সে আমাদের দিলু মিয়া—গেটের বাইরে থেকে ভিড় সামলাচ্ছিল। দিলু মিয়াও পাল্‌টা আঘাত করার

প্রস্তুতি নিচ্ছিল, কিন্তু কলিম ভাইকে চিনতে পেরে ক্ষান্ত হয় এবং কলিম ভাইও তাকে আঘাত করেছেন বলে দুঃখিত হন।

সুচিত্রা মিত্র ও দেবব্রত বিশ্বাস অনেকক্ষণ গান গেয়ে শ্রোতাদের মন ভরিয়ে দিয়েছিলেন। দুজনেই মূলত রবীন্দ্র-সংগীত গেয়েছিলেন। তবে সুচিত্রা মিত্র সেই সঙ্গে সলিল চৌধুরীর 'ময়নাপাড়ার মেয়ে' গানটিও শোনান—ওটার গ্রামোফোন রেকর্ডও ছিল তাঁর। দেবব্রত বিশ্বাস অধিকন্তু গেয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরারোপিত সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা 'অবাক পৃথিবী' এবং 'বিদ্রোহ আজ'। আসরের শেষ গানটিও গেয়েছিলেন তিনি—নজরুলের 'কারার ওই লৌহ কপাট'। ওরকম মন্দ্রস্বরে, তেজোদ্দীপ্ত ভঙ্গিতে, উদাত্ত কণ্ঠে ওই গান আমি আর কাউকে গাইতে শুনিনি, তাঁর একক কণ্ঠে যে-ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হয়েছিল, অনেক সময়ে সমবেত কণ্ঠেও তা শোনা যায় না। পরে তিনি হেসে বলেছিলেন, 'এটা কপাট-ভাঙার গান নয়, আসর-ভাঙার গান।' তাঁদের গান এমনই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যে, বিরুদ্ধপক্ষ কিছু বলবার সুযোগ পাননি বা বললেও তেমন কোনো ফল হয়নি।

দ্বিতীয় দফায় শান্তিনিকেতন থেকে শান্তিদেব ঘোষের নেতৃত্বে এলো *শ্যামা* নৃত্যনাট্যের দল। নিউ পিকচার হাউসের মঞ্চে দুই সন্ধ্যা এ-নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয়। তখন এ কে ফজলুল হক ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর। তিনি আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন, তবে এই শর্তে যে, অনুষ্ঠানের শেষে তিনি যখন শিল্পীদের সঙ্গে পরিচিত হতে মঞ্চে উঠবেন, তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ছবি (তিনি ছবিটা আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন) মঞ্চে টাঙানো থাকবে। শান্তিদেব ঘোষের সঙ্গে তাঁর পূর্বপরিচয় ছিল, তবু তিনি এবং অপর সকল শিল্পীও ফজলুল হকের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে গৌরববোধ করেছিলেন।

শ্যামার প্রযোজনা হয়েছিল অসামান্য। শ্যামা-চরিত্রে রূপ দিয়েছিল উমা গান্ধি নামে অতি সুন্দরী এক তরুণী আর তার গান গেয়েছিলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়; একটি মেয়ে হয়েছিল উত্তীয়, তার গান গেয়েছিলেন গোরা সর্বাধিকারী; শান্তিনিকেতনের দক্ষিণী নৃত্যশিক্ষক পি নায়ার হয়েছিলেন বজ্রসেন, তার গান কে গেয়েছিলেন, এখন মনে করতে পারছি না, তবে নৃত্যনাট্যের শেষাংশে 'কাঁদিতে হবে রে পাপিষ্ঠা' গানটি গেয়েছিলেন শান্তিদেব ঘোষ। বজ্রসেনের গলা যে এখানে এসে বদলে গেল, তাতে কেউ বিস্ময় মানেনি, কিন্তু শান্তিদেব ঘোষের গলায় ওই গান সকলে মুগ্ধ হয়ে শুনেছিল। গানটি অনেকের কণ্ঠে শুনেছি, কিন্তু সেদিন যেমন শুনেছিলাম, তা তুলনাবিহীন। *শ্যামার* অনুষ্ঠানপত্র লিখেছিলাম আমি, তা আমার সৌভাগ্য বলেই জেনেছি।

তৃতীয় দফায় এলেন শম্ভু মিত্রের নেতৃত্বে বহুরূপী নাট্যদল। গঙ্গাপদ বসু, তৃপ্তি মিত্র, অমর গাঙ্গুলী, মোহাম্মদ জাকারিয়া, কুমার রায়—এঁরা সবাই এসেছিলেন। শাঁওলীও এসেছিল, সে তখন খুব ছোটো। সঙ্গে শিল্প-নির্দেশক খালেদ চৌধুরী এবং আলোক-নিয়ন্ত্রক তাপস সেন। নিউ পিকচার হাউসে বহুরূপী পরপর মঞ্চস্থ করেছিল দুটি নাটক : তুলসী লাহিড়ীর *ছেঁড়াতার* আর রবীন্দ্রনাথের *রক্তকরবী*। *ছেঁড়াতারে* রহিমের চরিত্রে রূপ দিয়েছিলেন শম্ভু মিত্র আর শ্রীমন্তের ভূমিকায় ছিলেন মোহাম্মদ জাকারিয়া (ফুলজান অবশ্যই তৃপ্তি মিত্র)। এ-নিয়ে একটা মজা হয়েছিল। মাহমুদ

নূরুল হুদা অনুষ্ঠানের খুব ভালো সংগঠক ছিলেন, কিন্তু অনুষ্ঠান দেখার মতো ধৈর্য তাঁর ছিল না। আমরা দোতলায় বসে নাটক দেখছি—হুদাভাই এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'শম্ভু কই?' আমি দেখিয়ে দিলাম। 'পাশে ওটা কে?' বললাম, 'জাকারিয়া।' হুদাভাই তালি দিয়ে উঠলেন। বললেন, 'ওয়ান্ডারফুল, চেনাই যাচ্ছে না।' শম্ভু মিত্র মুসলিম-চরিত্রে আর জাকারিয়া হিন্দু-চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এটা বেশ কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল।

বহুরূপী-প্রযোজিত *রক্তকরবী* নিয়ে বহু বিতর্ক হয়েছে, এ-কথা সকলেই জানেন। একটা অভিযোগ ছিল এই যে, এ নাটকে শম্ভু মিত্র কমিউনিস্ট ভাবের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। যাঁরা বহুরূপীর প্রযোজনা দেখেছেন, তাঁরা স্বীকার করবেন, এর অভিনবত্ব ছিল—অভিনয়-ভঙ্গিতে, সংলাপ-আওড়ানোর ধরনে, আর আশ্চর্য সুন্দর আলোকসম্পাতে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই নাটকে কর্ষণজীবী আর আকর্ষণজীবীর যে-দ্বন্দ্বের কথা বলেছিলেন, শম্ভু মিত্র তারই ভিত্তিতে নাটকটির নতুন ব্যাখ্যাদানের সফল প্রয়াস পান।

বুলবুল একাডেমীর এসব উদ্‌যোগ সংস্কৃতিপ্রেমীরা যেভাবে গ্রহণ করেছিল, তাতে বোঝা গিয়েছিল, রাজনৈতিক বিরোধ সাংস্কৃতিক সহযোগের অন্তরায় নয়। ব্যক্তিগতভাবে সেবারে আমার পক্ষে শুরু হয়েছিল মোহাম্মদ জাকারিয়ার আজীবন স্নেহলাভের এবং কুমার রায়ের সঙ্গে অদ্যাবধি অটুট বন্ধুত্বের।

২৬.

১৯৫৬ সালের নানা ঘটনার মধ্যে আমার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বি এ (অনার্স) ডিগ্রি লাভ করা। পরীক্ষা হয়েছিল কার্জন হলে, প্রতি সোমবার, বুধবার ও শনিবারে। মৌখিক পরীক্ষা হয় বিভাগীয় অধ্যক্ষের অফিসকক্ষে। আট পত্র লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষা তিন সপ্তাহের মধ্যে শেষ হয়ে যায়।

মৌখিক পরীক্ষায় বাইরের পরীক্ষক হয়ে এসেছিলেন ড. মুহম্মদ এনামুল হক। তাঁকে প্রথম দেখি প্রথম বর্ষে পড়ার সময়ে। তখনো তিনি মৌখিক পরীক্ষা নিতে এসেছিলেন এবং কর্তব্যকর্ম শেষ করে বিভাগীয় সমিতির এক আলোচনা-সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। সেখানে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পাঠ করেছিলেন তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'চণ্ডীদাস-সমস্যা'। আমি অবশ্য তখন তার মর্ম বুঝতে পারিনি। তবে সভাপতির ভাষণে এনামুল হক সাহেবের আঞ্চলিক উচ্চারণ কেমন একটা ধাক্কা দিয়েছিল।

সেবারের মতো এবারেও মৌখিক পরীক্ষা নিতে ড. হক এসেছিলেন সাহেবি পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে। আমি ঘরে ঢুকতেই অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই আমার সম্পর্কে প্রশংসামূলক উক্তি করলেন তাঁর কাছে। তার মানে, ভালো করে বাজিয়ে দেখুন। প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতেই ভুল করেছিলাম। হাই সাহেব যখন প্রশ্নটা আবার করলেন, তখন চৈতন্য হলো। মৌখিক পরীক্ষা দিলাম আধঘণ্টা ধরে।

তখন পর্যন্ত টিউটোরিয়াল ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর পরীক্ষার ফলাফলে যোগ হতো না। কেবল প্রান্তিক ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষা বাবদ পাঁচ নম্বর যোগ করে প্রার্থীকে দ্বিতীয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে কিংবা তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করার সুযোগ দেওয়া হতো। মৌখিক পরীক্ষা ভালো না হলে লিখিত পরীক্ষার নম্বর থেকে পাঁচ নম্বর কেটে নেওয়ারও বিধান ছিল। কিছুকাল আগে অন্য বিভাগের এক ছাত্রের এম এ পরীক্ষায় এমনি করে পাঁচ নম্বর বিয়োগ করা হয়েছিল। তাতে অবশ্য প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে তাঁর অসুবিধে হয়নি।

মৌখিক পরীক্ষার নম্বর যোগ করার সুযোগ কিংবা লিখিত পরীক্ষার নম্বর বিয়োগ করার প্রয়োজন হয়নি আমার ক্ষেত্রে। ৬৬.৭৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে আমি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। ফলপ্রকাশের পর বিভাগীয় অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'আই অ্যাম প্রাউড অফ ইউ।' এরকম উচ্ছ্বাসের একাধিক কারণ থাকতে পারে। তাঁর অধ্যক্ষতার কালে অনার্সে আমি প্রথম শ্রেণী পেলাম প্রথমে, ১৯৫৩ সালে আলাউদ্দিন আল আজাদের পরে। তখন পর্যন্ত অনার্স পরীক্ষায় আমার প্রাপ্ত নম্বর ছিল বোধহয় সর্বাধিক। তবে বড়ো একটা কারণের কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে গিয়েছিল। আমাদের বহিরাগত পরীক্ষকদের মধ্যে তিনজন ছিলেন ভারতবাসী : সুকুমার সেন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও গণেশচরণ বসু। তখন খাতা দেখে নম্বর দেওয়া ছাড়াও বাইরের পরীক্ষকদের পক্ষে একটা নির্দিষ্ট ফরমে প্রশ্নপত্রের মান, পরীক্ষার্থীদের গুণ এবং সামগ্রিকভাবে বিভাগের শিক্ষাগত কার্যক্রম সম্পর্কে মন্তব্য করতে হতো। তাঁদের কেউ কেউ আমার উত্তরপত্রের কথা আলাদা করে উল্লেখ করেছিলেন বলে শুনেছি।

রায়হানা বেগম আমাদের সঙ্গে পরীক্ষা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তাতে হারাধনের দশটি ছেলের রইলো বাকি সাত। ইংরেজি সাবসিডিয়ারি পরীক্ষায় দুজন আবার আটকে গেলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলেন নূরউল আলম, এ এস এম জহুরুল হক, কে এফ এম ওয়াহিদউল্লাহ্, আর চেমন আরা। কাউকে তৃতীয় শ্রেণী পেতে হয়নি। এর মধ্যে আবার জহুরুল হক চলে গেলেন করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ পড়তে। অনার্স থেকে আমরা চারজন উঠলাম এম এ শেষ বর্ষে। প্রাথমিক এম এ শ্রেণী থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন বেশ কয়েকজন : সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (সরকারি কলেজ এবং রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন, জীবনের শেষদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ ডি করেছিলেন), প্রথম বর্ষ অনার্সে আমাদের সহপাঠী মোহাম্মদ আইয়ুব আলী ও মোহাম্মদ সাদেক আলী, আবুল হাসান শামসুদ্দীন (*নজরুল ইসলামের শ্রেষ্ঠ গল্প* সম্পাদনা করে তখনই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, পরে কলেজে অধ্যাপনা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ ডি করেন), মীর আবুল হোসেন (কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, *নজরুল-সাহিত্য* নামের একটি উৎকৃষ্ট সংকলনের সম্পাদক), ময়েজউদ্দীন আহমদ (শিক্ষকতার চিন্তা একেবারেই মনে না এনে একটানে ই পি সি এস), মোহাম্মদ আবু তাহের (পরে সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ), আহমেদ হোসেন (চট্টগ্রামের সিটি কলেজে অধ্যাপনা করে অবসরপ্রাপ্ত), মোহাম্মদ রেজাউল হক

(সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক) ও মাহমুদা খাতুন (বাংলাদেশের দ্বিতীয় সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য হয়েছিলেন)। আরো কয়েকজন ছিলেন, কিন্তু তাঁরা যে পরে কোথায় গেলেন, তা বলতে পারি না : রেবতীমোহন দেবনাথ, প্রফুল্লকুমার ভাবুক, এম এম আবুল হোসেন, শামসুর রহমান ও মুহম্মদ আবদুল আজীজ। এম এ শেষ বর্ষে সব মিলিয়ে আমরা ছিলাম জনা কুড়ির মতো। এঁদের মধ্যে সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিশিষ্টতা ছিল : তিনি ১৯৫১ সালে মুনশিগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজ থেকে (সেখানে তিনি অরবিন্দ পোদ্দারের ছাত্র ছিলেন) বি এ পাশ করেন, পরে বছর চারেক স্কুল-শিক্ষকতা করে ও সেভাবে পড়াশোনার খরচ সংগ্রহ করে এম এ পড়তে আসেন। প্রাথমিক এম এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলেন, সে-হিসেবে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র ছিলাম, কিন্তু কোনো সংকীর্ণতা ও নীচতা আমাদের সৌহার্দ্য মলিন করেনি।

আমাদের অনার্স পরীক্ষার ফল বেরোবার পরে মুনীর চৌধুরী হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব পড়তে চলে গেলেন রকফেলার ফাউন্ডেশনের বৃত্তি নিয়ে। যাওয়ার আগে বলে গেলেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক—তখন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পরিকল্পনা বোর্ডের সদস্য—আবদুর রাজ্জাক আমার খোঁজ করেছেন, আমি যেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

কিংবদন্তিসম তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তার পূর্বেই আমার কাছে পৌঁছেছিল। তবু যে আগে দেখা হয়নি, তার একটা কারণ, ছাত্র হিসেবে আমার কনিষ্ঠতা; দ্বিতীয় কারণ, মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের অভিপ্রায়ে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্ল্যানিং বোর্ডের সদস্য হিসেবে তাঁর নিয়োগ। মুনীর চৌধুরীর কাছে আমার প্রশংসা শুনে সম্ভবত রাজ্জাক সাহেব আমার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে রাজ্জাক সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। দেখলাম, শেরওয়ানি-পরা ছোটোখাটো মানুষটি চেয়ারে প্রায় ডুবে আছেন। আমাকে বসতে বলে ঢাকার আঞ্চলিক ভাষায় জানতে চাইলেন, এম এ পাশ করে আমি কী করবো। বললাম, ইচ্ছে শিক্ষকতা করার, তবে তার আগে গবেষণা করবো। কী নিয়ে গবেষণা করবো জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলাম, আধুনিক সাহিত্য নিয়ে। রাজ্জাক সাহেব প্রশ্ন করলেন, 'ও আধুনিক সাহিত্য? তা আধুনিক সাহিত্য কইতে কী বুঝান আপনারা?' আমার জবাব : উনিশ শতক থেকে রচিত সাহিত্য আধুনিক। এবারের জিজ্ঞাসা, কী কী লক্ষণ হলে সাহিত্য আধুনিক হয়? বললাম, মানবপ্রধান হলে আধুনিক, ধর্মপ্রধান হলে মধ্যযুগীয়। 'তাইলে চৈতন্যচরিত কী?' আমি একটু উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি, তার সূত্র ধরে তিনি আরো প্রশ্ন করেন। শেষ পর্যন্ত মনে হলো, পালিয়ে আসতে পারলে বাঁচি। ক্লাসে যা শিখেছিলাম, তার অনেকখানি ধূলিসাৎ হয়ে গেল। কিন্তু ফিরে এসে দেখি আমার শান্তি নেই; সারের প্রশ্নের উত্তর পেতে হবে। আবার গেলাম তাঁর কাছে। প্রশ্নের উত্তর উনি যে সব দেন, তা নয়; আরো প্রশ্ন করেন, বইয়ের সন্ধান দেন। আমার নিজের মধ্যেও অনেক প্রশ্ন জাগে, ওঁর কাছে আবার ছুটে যাই।

আমরা অনার্স পাশ করার আগেই শিক্ষক হিসেবে বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন এ কে এম আমিনুল ইসলাম। এম এ পরীক্ষায় ১৯৫৪ সালে তিনি প্রথম শ্রেণীতে চতুর্থ স্থান লাভ করেছিলেন, তাঁর ওপরে ছিলেন যথাক্রমে মুনীর চৌধুরী, আলাউদ্দিন আল আজাদ

ও মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। আমিনুল ইসলামের অনার্স ছিল না। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাওয়া আলাউদ্দিন আল আজাদ এবং একই পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হওয়া মোহাম্মদ আবদুল কাইউমকে বাদ দিয়ে যে তাঁকেই লেকচারারের পদে বাছাই করা হলো, এ নিয়ে তখন গুঞ্জন উঠেছিল। আমিনুল ইসলাম ছিলেন সুদর্শন, সুবেশ ও সুভাষ—আমার সঙ্গে সর্বদাই তিনি বন্ধুসুলভ আচরণ করেছেন। এখন তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নৃতত্ত্বের অধ্যাপক।

মুনীর চৌধুরী বিদেশে চলে গেলে হাই সাহেব কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে নিয়ে এলেন সুধীরচন্দ্র সেনকে। সুধীরবাবু শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন, তবে তাঁর এম এ ডিগ্রি ছিল কলকাতার। প্রসিদ্ধি ছিল যে, শান্তিনিকেতন ছাড়ার সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এক ছত্রের প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন : 'আমার সুধীর বাংলা জানে।' এ কথা আমরা অন্যের কাছে শুনেছি। সুধীরবাবুর কাছে যা শুনেছি, তা এই যে, তাঁর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেখে বিধুশেখর শাস্ত্রী তাঁকে দক্ষিণী বলে ভুল করেছিলেন। সুধীরবাবু থাকতেন ঢাকা হলে, শিক্ষকদের জন্যে নির্দিষ্ট কক্ষে, কিন্তু সেখানকার খাওয়া-দাওয়া সহ্য না হওয়ায় এক বছরের শেষে তিনি কুমিল্লায় আগের কাজে ফিরে যান এবং অচিরে মৃত্যুবরণ করেন। আমার শিক্ষক অধ্যাপক অজিত গুহ ছিলেন তাঁর অনুজপ্রতিম। সেই সূত্রে আমি সুধীরবাবু ও তাঁর বিদুষী স্ত্রী সুধা সেনের কাছাকাছি এসেছিলাম। আর পরে তাঁদের কন্যা সুনন্দা সেন আমার ছাত্রী হয়েছিলেন।

বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ থেকে এসেছিলেন ব্রজেন্দ্রকুমার দেবনাথ। তিনিও কলকাতার এম এ। তিনি নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। বছর তিনেক এখানে পড়িয়ে তিনি এক ছুটিতে কলকাতায় যান, আর ফিরে আসেননি।

তারপরে এসেছিলেন নীলিমা ইব্রাহিম। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্স পাশ করে বাংলায় এম এ করেছিলেন। তাঁর পরিবার ঢাকায় এসে বসতি স্থাপন করলে তিনি হাই সাহেবের অধীনে পিএইচ ডি গবেষক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বিভাগে পদ খালি হওয়ায় তিনি লেকচারার হিসেবে যোগ দেন ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি। আমিনুল ইসলাম একটু আগে যোগ দেওয়ায় তাঁর সঙ্গে আমাদের টিউটোরিয়াল ক্লাস পড়েছিল, বাকি তিনজনের কাছে পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবে এম এ ক্লাসে অজিত গুহ পড়িয়েছিলেন খণ্ডকাল শিক্ষকরূপে। গবেষণা-সহায়ক আহমদ শরীফ আমাদের পাণ্ডুলিপি-পাঠ ও পাঠ-সমালোচনা শেখাতেন। নিজেদের নৈপুণ্যে তাঁকে আমরা কেউ সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলাম বলে মনে হয় না। তিনি আমাদের পিতৃদত্ত নামের বদলে স্ব-আরোপিত নানারকম নামে ডাকতেন : সুনীলকে পণ্ডিত, নূরউল আলমকে ক্রিয়েটিভ জিনিয়াস, আমাকে মনীষী। কিছুকাল তিনি ভারতচন্দ্রও পড়িয়েছিলেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি কখনো এক প্রসঙ্গে স্থির থাকতেন না, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যেতেন এবং অবিশ্রাম তর্ক করতেন। শিক্ষকের বক্তৃতায় যারা শুধু পরীক্ষা পাশের উপকরণ খুঁজতো, তারা এতে একটু হতাশ হতো। তবে তিনি অনেকেরই মনে চিন্তার উদ্রেক করেছিলেন এবং নিজের মতো করে ভাবতে শিখিয়েছিলেন।

২৭.

আবু হোসেন সরকার যখন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী, তখন ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর বাংলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা ঘটে। এতে শুধু যুক্তফ্রন্টের একুশ দফার এক দফা বাস্তবায়িত হয়নি, আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হয়েছিল। ওইদিনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র চোখেমুখে যে-দীপ্তি দেখেছিলাম, তার তুলনা হয় না। তিনি বহুকাল ধরে বাংলা একাডেমীর মতো একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব করে আসছিলেন। বাংলা একাডেমীর রূপদানের জন্যে গঠিত কমিটিতে যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফারসি বিভাগের অধ্যক্ষ ড. ডব্লিউ এইচ এ শাদানীর নামের নিচে তাঁর নামের স্থান হয়েছিল, তবু তা শহীদুল্লাহ্ সাহেবের আনন্দ ম্লান করতে পারেনি।

বর্ধমান হাউজে উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানটা ছিল সংক্ষিপ্ত। 'আয়োজক সমিতি'র সম্পাদক 'স্পেশাল অফিসার' মুহম্মদ বরকতুল্লাহ্ সবাইকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, শিক্ষামন্ত্রী আশরাফউদ্দীন আহমদ চৌধুরী ভাষণ দিয়েছিলেন, আর মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার উদ্‌বোধন করেছিলেন। ১৯৫৬ সালের শেষে ড. মুহম্মদ এনামুল হক বাংলা একাডেমীর প্রথম 'পরিনিয়ন্তা' হয়ে আসেন।

বাংলা একাডেমীর প্রথম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকীর দিনটিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। সাহিত্য সংসদে আমাদের কয়েকজনের মনে হলো, তাঁর মৃত্যুতে বাংলা একাডেমীর উচিত হবে একটি শোকসভার আয়োজন করার। আর যদি একান্তই একাডেমী তা না করে, তবে একাডেমী-ভবনেই সাহিত্য সংসদের উদ্‌যোগে আমরা শোকসভা করবো।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর আর আমি কলাভবন থেকে হাঁটতে হাঁটতে এলাম বাংলা একাডেমীতে। একাডেমীতে সদ্য যোগদানকারী এনামুল হক সাহেবের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল সহজে এবং আমাদের কথাটা দ্রুতই পেড়ে ফেললাম। একাডেমী যে শোকসভার উদ্‌যোগ নেবে না, তা স্পষ্টই বোঝা গেল। একতলার যে-ঘরটি এখন গ্রন্থাগারের সহকারী পরিচালকের দপ্তর, সেটাই ছিল তখন সভার জন্যে নির্দিষ্ট কক্ষ। সেখানে সংসদের পক্ষ থেকে সভা করবার অনুমতি চাইলে ড. হক বললেন, 'দাঁড়াও, কাদিরের সঙ্গে একটু আলাপ করে নিই।' আবদুল কাদির শুধু এনামুল হকের বন্ধু নন, *মাহে-নও* পত্রিকার সম্পাদক এবং সেই অধিকারে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তা। ফোন করে এনামুল হক তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, একাডেমী ভবনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যে শোকসভা করতে দেওয়া ঠিক হবে কিনা।

কাদির সাহেব যে ওপাশ থেকে কী বললেন, তা জানি না, কিন্তু আমরা দেখলাম, এনামুল হক বিস্ফারিত নেত্রে মাঝে মাঝে বলছেন : 'অ্যাঁ! মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট?' 'কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার?' 'আমাদের এখানে কমিউনিস্ট পার্টি তো ব্যান্‌ড।' 'না, না, তাহলে তো অনুমতি দেওয়া যায় না।' ফোন রেখে তিনি আমাদের বললেন, 'কাদির জানালো, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট—আমাদের এখানে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ—সরকারি অফিসে তো তার জন্যে শোকসভা করতে দেওয়া যায় না। তোমরা অন্য কোথাও চেষ্টা করো।' আমরা যতোই বলি যে, কমিউনিস্ট হিসেবে নয়, সাহিত্যিক হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে আমরা শোকসভা

করতে চাইছি, তিনি ততোই মাথা নাড়েন এবং বলেন যে, 'না, না, বাংলা একাডেমীতে এটা করা যাবে না।'

আমাদের খুব রাগ হলো। বাংলা একাডেমী ছেড়ে বেরিয়ে আসতে আসতে আমরা স্থির করলাম, কাদির সাহেবকে কিছু কথা শুনিয়ে দিয়ে আসতে হবে। রিকশা নিয়ে পুরানা পল্টনে *মাহে-নও* অফিসে এলাম। সোজা কাদির সাহেবের অফিসে ঢুকে আমরা বললাম, 'আপনি কীসব উল্‌টোপাল্‌টা বলে বাংলা একাডেমীতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শোকসভা বন্ধ করে দিলেন!' কাদির সাহেব বুঝতে পারেননি যে, এনামুল হকের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার সময়ে আমরা টেলিফোনের পাশেই ছিলাম। কিন্তু তিনি বিচলিত হওয়ার পাত্র নন। আমাদের বললেন, 'এনামুল হক একটা মঘা; কী বললাম আর কী বুঝলো। বোসো, তোমাদের সামনেই ফোন করে দিচ্ছি।' তিনি ফোন করে হক সাহেবকে বললেন, 'আমার সামনে আনিসুজ্জামান আর বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বসে আছে। ওরা সাহিত্য সংসদ থেকে শোকসভা করতে চায়, আপনার কাছে চায় ঘরটা ব্যবহার করতে। এতে আপনি রাজি নন কেন?' 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট তো আপনার কী হয়েছে? আপনি তো আর সভা করছেন না, সে-দায়িত্ব ওদের। আপনি ঘরটা ব্যবহার করতে দিচ্ছেন সাহিত্য—সংসদকে—সেটা তো বেআইনি সংগঠন নয়। আপনি নাহয় সভায় নাই থাকলেন।' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিয়ে দেন। আমি তো বলছি, ঘরটা ব্যবহার করার অনুমতি ওদের দিয়ে দেন।' টেলিফোন রেখে আমাদের বললেন, 'যাও, ঘর পেয়ে যাবে।'

ছুটির আগে এনামুল হককে ধরতে হবে—সুতরাং আবার রিকশা। অত্যন্ত বিষণ্ন বদনে তিনি আমাদের কাছে আবেদনপত্র চাইলেন, সেটা খুব খুঁটিয়ে পড়লেন (বানান ভুলের খোঁজে কি?), তারপর তার ওপরে ইংরেজিতে অনুমতিবাক্য লিখে দিয়ে বললেন, 'এটা এসট্যাবলিশমেন্টে নিয়ে যাও, কী করতে হবে, ওরা বলে দেবে।'

সভায় লোক বেশি হয়নি, তবে নিতান্ত কমও নয়। খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ সভাপতিত্ব করেন। আমরা বেশ কয়েকজন আলোচনা করি। তবু মনের মধ্যে একটা অতৃপ্তি থেকে গেল : এতো বড়ো একজন প্রতিভার বিয়োগে এই দীন আয়োজন!

২৮.

নয়াদিল্লিতে ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রধানত মুল্‌ক রাজ আনন্দ্‌ ও হুমায়ুন কবিরের উদ্‌যোগে আয়োজিত হয় এশীয় লেখক সম্মেলন। আমন্ত্রণ এলো পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের কাছে, হয়তো কোনো কোনো সাহিত্যিকের কাছে ব্যক্তিগতভাবেও তা এসেছিল। সংসদের ভেতরে-বাইরে অনেককে আমরা ধরলাম যাওয়ার জন্যে। কেউ এক পা এগোন তো দু পা পেছোন; আজ যদি বলেন যাবেন, কাল তবে অপারগতা জ্ঞাপন করেন। ওদিকে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য-বিষয়ে একটি লেখা পড়তে হবে। সর্বকনিষ্ঠ হওয়ায় তার দায়িত্ব পড়লো আমার কাঁধে। বলা হলো, একটা

খসড়া তৈরি হলে বড়োরা কেউ দেখে দেবেন। কিন্তু বড়োরা কে যাবেন কে যাবেন না, তাই স্থির করতে পারছিলেন না, সুতরাং লেখার কিংবা লেখা দেখে দেওয়ার সময় আর তাঁদের হয় না। অগ্রবর্তী দল হিসেবে কাজী দীন মুহম্মদ, সরদার জয়েনউদ্দিন আর আমি রওনা হয়ে গেলাম। আমরা লিখতে লিখতে যাবো এবং ওখানে পৌছে সেটা দাখিল করে দেবো। অন্যেরা সময়মতো পৌছোলে লেখা জমা দেওয়ার আগে দেখে দেবেন।

পরে পৌছোলেন গোলাম মোস্তফা, সুফিয়া কামাল, সৈয়দ নূরুদ্দিন, ফয়েজ আহমদ, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আতোয়ার রহমান, সানাউল্লাহ্ নূরী ও আবদুর রাজ্জাক (পরে কন্যাকুমারী-খ্যাত)। আবদুর রাজ্জাকের অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন চিত্রাভিনেত্রী রওশন আরা—সম্মেলনের আকর্ষণে অতটা নয়, যতটা আগ্রা-দিল্লির টানে।

অগ্রবর্তী দলের আমরা তিনজন প্লেনে করে কলকাতা পৌছোলাম। দীন মুহম্মদ সাহেবের পরামর্শমতো সেখানে এক শস্তা হোটেলে উঠলাম এবং ফোন করে আমাদের আগমন-বার্তা জানালাম নির্ধারিত নম্বরে। খানিকক্ষণ পরে আমাদের ঘরের দরজায় টোকা পড়লো। দরজা খুলে যে-ছোটোখাটো মানুষটাকে দেখলাম, তিনি বললেন, 'আমি গোপাল হালদার।' আমাদের দিল্লি যাওয়ার জন্যে ট্রেনের টিকিট নিয়ে এসেছেন। নিজে না এসে আর কাউকে দিয়ে টিকিট পাঠিয়ে দেওয়াই স্বাভাবিক হতো, কিন্তু গোপাল হালদার নিজেই এসেছিলেন এবং যাত্রাপথ ও আবহাওয়া সংক্রান্ত নানা সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। আমাদের পরে যাঁরা ঢাকা থেকে আসবেন, তাঁদের কোনো অসুবিধে হবে না, এ-বিষয়ে আশ্বস্ত করেছিলেন এবং দিল্লি পৌছেই তিনি প্রথমে আমাদের খোঁজ নিতে এসেছিলেন।

দিল্লিতে পৌছে জানা গেল যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসেছেন চারজন : ফয়েজ আহ্‌মদ ফয়েজ, কাতিল শাফায়ি (সরদার জয়েনউদ্দিনের ভাষ্যে 'কাটা সেপাই'), ইজাজ বাটালভি এবং আরো একজন—তাঁর নাম ভুলে গেছি বলে দুঃখিত। আমরা কয়েকজন তাঁদের কারো কারো সঙ্গে কথা বলে স্থির করলাম, পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের নেতা হবেন ফয়েজ আহ্‌মদ ফয়েজ, উপনেতা সুফিয়া কামাল আর সম্পাদক সৈয়দ নূরুদ্দিন। শুধু গোলাম মোস্তফা এ-ব্যবস্থায় একটু নাখোশ হলেন। তিনি বললেন, 'পাকিস্তানে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, প্রতিনিধিদলেও সংখ্যায় আমরা বেশি, নেতা তো পূর্ব পাকিস্তান থেকেই হওয়া উচিত।' কে যেন ছদ্ম-গাম্ভীর্যের সঙ্গে উত্তর করলেন, 'পাকিস্তানের ঐক্যটাই বড়ো কথা।' কবি আর কিছু বলতে পারলেন না। আরেক গোলযোগ বাধালেন কাজী দীন মুহম্মদ। সৈয়দ নূরুদ্দিন যেহেতু প্রতিনিধিদলের সম্পাদক নির্বাচিত হলেন, সেহেতু স্থির হলো, পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য-সংক্রান্ত কাগজটা তিনিই পড়বেন। দীন মুহম্মদ সাহেব প্রবল আপত্তি করে বললেন, 'লেখাটা যেহেতু আনিসুজ্জামানেরই, তাই সেটা ওকেই পড়তে দেওয়া উচিত।' নূরুদ্দিন ভাই ও আমি উভয়েই অপ্রস্তুত। সরদার জয়েনউদ্দিন মিটিমিটি হাসছিলেন। আমাদের ফয়েজ বললেন, 'যিনি প্রতিনিধিদলের সম্পাদক, তিনিই রিপোর্টটি পড়লে ভালো হয়—লেখা যারই হোক না কেন।' দীন মুহম্মদ সাহেব

নাছোড়বান্দা—বললেন, 'যিনি পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের সম্পাদক, তাঁর তো উচিত সারা পাকিস্তানের সাহিত্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট পড়া। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানেরটা যখন এমন একজন পড়ছেন (ইজাজ বাটালভি) যিনি সম্পাদক নন, তখন পূর্ব পাকিস্তানেরটাও সম্পাদক-নন-এমন-কেউ পড়তে পারেন।' অনেকেরই মনে হয়েছিল, আমার মতো একজন কনিষ্ঠ প্রতিনিধির—এম এ ক্লাসের ছাত্রের—চেয়ে বড়ো কেউ পড়লে শোভন হবে, কিন্তু স্পষ্ট করে বলতে না পেরে তাঁরা মৌন অবলম্বন করলেন। এই অবস্থায় আমি বললাম, 'নূরুদ্দিন ভাই-ই পড়ুন।' তাতে প্রায় সবাই স্বস্তিবোধ করলেন, আর দীন মুহম্মদ সাহেব হঠাৎ করে কেঁদে ফেললেন। আবার অস্বস্তির পালা। জয়েন ভাই দীন মুহম্মদ সাহেবের হাত ধরে নিয়ে গেলেন, 'চলেন তো, ডেরায় ফেরা যাক।'

এশীয় লেখক সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার আগের দিনে সদ্যনির্মিত বিজ্ঞান-ভবনে অনুষ্ঠিত হলো ভারতীয় লেখক সম্মেলন। সেখানে আমরা পর্যবেক্ষক। সেদিনই টের পাওয়া গেল যে, ভেতরে-ভেতরে উত্তেজনা দানা বেঁধেছে। হুমায়ুন কবির যদিও কংগ্রেসপন্থী এবং ভারত সরকারের শিক্ষা-সচিব, কিন্তু মুল্‌ক রাজ আনন্দ্‌ সুপরিচিত কমিউনিস্ট। ভারত সরকারের মধ্যে এবং লেখককুলেও কমিউনিস্ট এবং কমিউনিস্টবিরোধীদের দ্বন্দ্ব। একটা কথা ছড়িয়ে গেল যে, এশীয় লেখক সম্মেলনের উদ্‌যোগের পেছনে রয়েছে কমিউনিস্টরা এবং তাদের একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। তখন বান্দুংয়ের হাওয়া বইছে জোরেশোরে, 'হিন্দি-চীনি ভাই-ভাই'য়ের যুগ (চীনও পাঠিয়েছে এক শক্তিশালী প্রতিনিধিদল), তবু রাজনৈতিক টানাপোড়েনও চলছে ভেতরে-ভেতরে। ভারতীয় রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতীয় লেখক সম্মেলন উদ্‌বোধন করতে এলেন না—হয়তো এই আয়োজনের থেকে সরকারকে দুরে রাখাই ছিল তার উদ্দেশ্য। বিরোধী শিবির এটাকে হুমায়ুন কবিরের পরাজয় ভেবে উল্লসিত হলেন। কিন্তু কবির সাহেব হার মানবার পাত্র নন—আয়োজনের মহিমা পুনরুদ্ধার করতে তিনি কিছু বাড়তি ছুটোছুটি করলেন মাত্র।

ভারতীয় লেখক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। দেশের সব রাজ্য থেকে যশস্বী লেখকেরা এসেছিলেন। আগে যাঁদের নাম করেছি তাঁরা বাদে পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছিলেন নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী (তিনি অবশ্য তখন দিল্লি-প্রবাসী), সজনীকান্ত দাস, মনোজ বসু, ভবানী ভট্টাচার্য (আরেকজন প্রবাসী বাঙালি) ও সুলেখা সান্ন্যাল প্রমুখ সাহিত্যিক; অন্য ভাষার লেখকদের মধ্যে এতদিন পরে কাকা কালেলকার, দেবেন্দ্র সত্যার্থী, ভি কে গোকক, গুরবখশ সিং, অমৃতা প্রীতম ও সাজ্জাদ জহিরের কথা মনে পড়ছে—তবে এমনও হতে পারে যে, এঁদের কাউকে কাউকে হয়তো সেখানে নয়, অন্য কোনো সম্মেলনে দেখেছি।

প্রথম দিনেই আমি একটা কাণ্ড করে ফেলেছিলাম। কৃষ্ণবর্ণ, চশমা-চোখে, গলাবন্ধ কোট ও ট্রাউজার-পরা এক প্রতিনিধিকে লিফ্‌টে দেখে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'আই অ্যাম আনিসুজ্জামান ফ্রম পাকিস্তান।' উত্তরে তিনি পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'আমি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।' লজ্জায় মরে গেলাম। তাঁর অনেক ছবি দেখেছি বটে, তবে চাক্ষুষ তাঁকে দেখিনি; তার ওপর ওই পোশাকে তাঁকে দক্ষিণী ঠাউরেছিলাম।

আমি কী ভেবেছি, তাও তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন। তারপর, যতদূরসম্ভব, আমি তাঁকে এড়িয়ে চলেছিলাম।

এমন ভিড়ে তাঁকে এড়ানো কিছু শক্ত ছিল না। কিন্তু দিল্লিবাসী এক ধনী বাঙালি পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিদের নেমন্তন্ন করলেন মধ্যাহ্নভোজে, যাকে বলে বাঙালি আড্ডা—তার জন্যে। তাঁদের প্রশস্ত আঙিনায় সজনীকান্ত দাস ও মনোজ বসু খুব জমিয়েছিলেন। গোলাম মোস্তফা প্রায় সকলের পূর্বপরিচিত বলে তাঁকে নিয়ে বেশ টানাটানি পড়ে গিয়েছিল। নীরদচন্দ্র চৌধুরী গম্ভীর হয়ে ছিলেন এবং একটু পরপর টাইয়ের নট ঠিক করছিলেন। অন্নদাশঙ্কর রায় ও গোপাল হালদারকে সবাই সমীহ করে কথা বলছিলেন। যাঁরা গোপাল হালদারের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং যাঁরা তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শবিরোধী, তাঁরাও সম্ভ্রমের সঙ্গে তাঁকে সম্বোধন করছিলেন কিংবা আড়ালে তাঁকে উল্লেখ করছিলেন। অন্নদাশঙ্কর স্বাভাবিকভাবে তাঁর পূর্ব বাংলার স্মৃতির কথা বলছিলেন আমাদের সঙ্গে।

ভারতীয় সাহিত্য সম্মেলনের শেষে একটি মুশায়েরা আয়োজিত হয়েছিল। সেখানে জনপ্রিয়তায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন ফয়েজ আহ্‌মেদ ফয়েজ। বস্তুত আমাদের দিল্লি অবস্থানের পুরো সময়টায় তাঁর প্রতি ভারতীয় লেখক ও পাঠকদের—বিশেষত উর্দু ও পাঞ্জাবিভাষীদের—শ্রদ্ধাপ্রকাশ ছিল অসাধারণ।

এশীয় লেখক সম্মেলনে ভারত ও পাকিস্তান ছাড়া ইরান, সোভিয়েত ইউনিয়ন (মধ্য এশিয়া), চীন, মঙ্গোলিয়া, উত্তর ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিনস, সিংহল ও নেপালের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। আফগানিস্তান, ভুটান ও জাপান থেকেও কেউ কেউ এসে থাকবেন। এশিয়ার বাইরের দেশের—যেমন মিশর, সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া), যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের—লেখকেরা উপস্থিত ছিলেন পর্যবেক্ষক হয়ে। চীনা প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী মাও তুন, তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখক ছিলেন লাও শেহ। তাঁর গ্রন্থাবলির মধ্যে যখন *রিকশাওয়ালার* নাম শুনলাম, তখন বুঝলাম, বাংলায় আমরা তাঁকেই লাও চাও বলে জানি। তাঁর সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের অনেকের, বিশেষ করে আমার, খুব অন্তরঙ্গতা হয়েছিল। পরে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে অনেক অসম্মান সয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। ওদিকে মধ্য এশিয়ার একজন প্রতিনিধি ছিলেন মির্জা তুরসুনজাদেহ্—তখনই তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৯৪৭ সালে ভারতে—নেহ্‌রুর উদ্‌যোগে অনুষ্ঠিত—এশিয়ান রিলেশনস কনফারেন্স ও ১৯৫৫ সালের বান্দুং সম্মেলনের মূল ভাবটি ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছিল এশীয় লেখক সম্মেলনে। ঠিক ওকাকুরার 'এক এশিয়া'র আদর্শ নয়, কিন্তু এশীয়দের ঐক্য, বিশেষত সদ্য স্বাধীন দেশগুলির স্বাধীন বিকাশ—প্রথম বিশ্বের অনুকরণ থেকে সরে এসে আত্মপরিচয়ের সন্ধান ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা—এই ভাবটা বেশ ফুটে উঠেছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ওই একবারের পরে দ্বিতীয় এশীয় লেখক সম্মেলন আর অনুষ্ঠিত হয়নি।

এশীয় লেখক সম্মেলনের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে ভিন্ন ভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেছিলেন (উপ-রাষ্ট্রপতি) সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, (প্রধানমন্ত্রী) জওহরলাল নেহ্‌রু ও (প্রাক্তন গভর্নর-জেনারেল) চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী। শোনা গিয়েছিল যে, মওলানা আবুল

কালাম আজাদও বক্তৃতা দেবেন। একদিন তাঁকে গাড়ি করে বিজ্ঞান-ভবনের সামনে দিয়ে চলে যেতে দেখলাম—তিনি সম্মেলনে আসেননি।

রাধাকৃষ্ণন খুব সারগর্ভ বক্তৃতা দিলেন—অধ্যাপক যেমন করে শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দেন, সেই ভঙ্গিতে। নেহরু বেশিরভাগ সময়েই গালে ডানহাত রেখে কথা বললেন—তাঁর শেরওয়ানির বোতামঘরে লাগানো টকটকে লাল গোলাপ ছিল সতত দৃশ্যমান—অনেকখানি আলাপচারিতার ভঙ্গিতে। কালো চশমা-চোখে হাসি-হাসি মুখে রাজাগোপালাচারী রঙ্গ-ব্যঙ্গভরা কথা বলে গেলেন। তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন এই বলে : 'আমি খুব আত্মকেন্দ্রিক মানুষ। স্বদেশের বাইরে কোথাও যাইনি এই ভেবে যে, আমাকে যদি পৃথিবীর প্রয়োজন থাকে, তাহলে পৃথিবীই আসবে আমার কাছে, আমার কী দরকার পৃথিবীর কাছে যাওয়ার? এই ঘরে ঢুকে (এইখানটায় তিনি ঘরের চারপাশ, ছাদ ও মেঝের দিকে তাকালেন)-যে-ঘর ভারতীয় ঠিকাদারদের সৌভাগ্যের পরিচয় বহন করে, আমার এ-কথা অন্যেরা না বুঝলেও উপমহাদেশের বন্ধুরা ঠিকই বুঝবেন—এই মিলনায়তনে প্রবেশ করে (এবারে তিনি প্রতিনিধিদের দিকে তাকালেন) আমার মনে হয়েছে, আমি পৃথিবীর মধ্যে চলে এসেছি নিজের অজান্তে। এতে আত্মশ্লাঘায় যে লাগেনি, তা নয়, তবে এটাও অস্বীকার করতে পারছি না যে, অনভ্যস্ত এই বৃহৎ পরিমণ্ডলে এসে ভালোও লাগছে।'

হঠাৎ করে রাষ্ট্রপতি-ভবনে চা খাওয়ার আমন্ত্রণ এলো। এটাই ছিল বুঝি ভারতীয় লেখক সম্মেলনে তাঁর অনুপস্থিতিজনিত কারণে হুমায়ুন কবিরের অস্বস্তির জবাব। রাষ্ট্রপতি-ভবনের দরবার-হলে আমরা মুখোমুখি দাঁড়ালাম দুই সারিবদ্ধ হয়ে। রাষ্ট্রপতি এক সারির সকলের সঙ্গে করমর্দন করে অপর সারির অতিথিদের সঙ্গে করমর্দন করলেন। বেচারা তাতেই হাঁপিয়ে উঠলেন এবং কাঁধে-রাখা ঝাড়নের মতো কী একটা দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে লাগলেন। তাঁর ব্যক্তিগত পটভূমির সকল ঔজ্জ্বল্য সত্ত্বেও তাঁকে মনে হলো বিহারের সাধারণ কিষানদের একজন।

২৯.

কাজী দীন মুহম্মদ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন, তবে নামাজের সময় হলে বলতেন, 'উঠবস করে আসি।' এ কথা কেন বলেন জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'আল্লাহ্ নামাজ কবুল করেন কিনা কী করে জানবো!' নিজের নিয়মানুবর্তিতা সত্ত্বেও তিনি আমাদের নামাজ পড়তে বলতেন না, শুধু দিল্লির জামে মসজিদ দেখতে যাওয়ায় বললেন, 'শিষ্য, এক ওয়াক্ত নামাজ পড়ে ফেলো।' আমি তাঁর কথা রেখেছিলাম।

এশীয় লেখক সম্মেলনের শেষে তিনি চাইলেন সরদার জয়েনউদ্দিন ও আমাকে নিয়ে আগ্রায় ও আজমিরে যেতে। তাজমহল দেখার ইচ্ছে ছিল, তাই আমি তাঁর অনুরোধে সফরসঙ্গী হতে রাজি হলাম, জয়েন ভাই ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলেন। তাজমহল দেখলাম, আগ্রার দুর্গ দেখলাম, সেকেন্দ্রা দেখলাম। তাজমহলকে পেছনে রেখে গুরু-শিষ্য ছবি তুললাম। তারপরে আজমিরে। আমি দীন মুহম্মদ সাহেবকে

বললাম, 'কোনো খাদেমের পাল্লায় পড়বেন না, আমরা নিজেরাই মাজার শরিফ দেখে আসবো।' তিনি সম্মত হলেন। কিন্তু আজমির রেল-স্টেশনে নেমে আমি যেই মুখ-হাত ধুতে গেছি, অমনি তিনি খাদেম-কবলিত হলেন। খাদেমের সঙ্গে তাঁর বাড়ি গিয়ে মালাই-চা খেতে হলো, তারপর দরগায় যাওয়া হলো। দীন মুহম্মদ সাহেব চাইছিলেন না যে, আমি কোনো পয়সাকড়ি খরচ করি। আমি সামান্যই খরচ করেছিলাম। প্রবেশপথ থেকে গোলাপ ফুলের পাতা ও নকুলদানা কেনা হলো। সেগুলো মাজারে সমর্পণ করা হলো। লক্ষ করলাম, সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আবার গেটের দোকানে রাখা হচ্ছে। এসব ব্যাপার ভক্তদের চোখে ধরা পড়ে না। খাজা মঈনউদ্দীন চিশতির মাজারের চারপাশ ঘোরা শেষ হলে একজন ভক্ত গেলাফের খানিকটা উঁচু করে ধরেন, সেখানে একটা সুড়ঙ্গের মতো আছে, তাতে নজরানা দিতে হয়। তারপর একটু এদিক-ওদিক দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো যাঁর কাছে, তিনি একটা বড়ো খাতা নিয়ে বসে। দীন মুহম্মদ সাহেব শ দুই টাকা দেওয়ায় তিনি উর্দুতে বললেন, 'তুমি বাবার এতো বড়ো ভক্ত, আর এই সামান্য উপহার!' সার্ খুব বিনীতভাবে উর্দুতেই বললেন, 'আমরা পাকিস্তান থেকে এসেছি, বৈদেশিক মুদ্রা তো বেশি আনার উপায় নেই।' খাতার লেখক বললেন, 'তাতে কী হয়েছে! তুমি প্রতিশ্রুত পরিমাণ লিখে দাও, ঢাকায় আমাদের লোক আছে। সেখানে দিয়ে পাঠিও।' দীন মুহম্মদ সাহেব তাই করলেন।

দরগায় রান্নার অতিকায় হাঁড়ি দেখে যেমন বিস্ময় জেগেছিল, তেমনি মনে রেখাপাত করেছিল অগণিত হিন্দু-মুসলমান নারী-পুরুষের আন্তরিক ভক্তি। এক মহিলার কথা মনে পড়ে। তিনি বসেছিলেন পাথরের মতো। মনে হয়েছিল, সর্বস্ব হারিয়ে জীবনের প্রতি বীতরাগ হয়ে সাধকের সমাধির পাশে শেষ সান্ত্বনা পেতে এসেছেন।

আজমির থেকে কলকাতায় ফেরার পথে কয়েক ঘণ্টার জন্যে আমরা শান্তিনিকেতনে থেমেছিলাম। তখন বোধহয় ছুটির সময়—পুরো জায়গাই খাঁ খাঁ করছে। আমরা বিশেষ কারো সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করিনি। সাইকেল-রিকশায় চড়ে শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের খানিক খানিক দেখা হলো।

কলকাতায় ফিরে মির্জাপুর স্ট্রিটের এক হোটেলে। দীন মুহম্মদ সাহেব ফিরে যাওয়ার পরেও আমি কয়েক দিন রয়ে গেলাম। সে-সময়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরির বাংলা বইয়ের অসম্পূর্ণ ক্যাটালগ দুই-খণ্ড কিনেছিলাম, আর কিনেছিলাম বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের গ্রন্থ-তালিকা। মানিকতলার বাড়িতে গিয়েছিলাম নজরুলকে দেখতে। প্রমীলা খাটে শুয়ে আছেন, নজরুল মেঝেতে বিছানায় বসে। আমাকে বলা হয়েছিল, কবির ঘরে ঢোকার আগে চশমা খুলে ফেলতে—তাই করেছিলাম। নজরুল একটা বইয়ের পাতা উল্‌টে যাচ্ছিলেন ক্রমাগত। আগন্তুক দেখে কী বলতে চাইলেন বোঝা গেল না। প্রমীলার সঙ্গে কথা বলে ফিরে এলাম।

দিল্লি-আগ্রায় ঐতিহাসিক নিদর্শনের কিছু ভগ্নস্তূপ দেখেছিলাম। নজরুল ইসলামকে তেমনি এক ভগ্নস্তূপ বলেই মনে হয়েছিল।

৩০.

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান—তখন বলা হতো শাসনতন্ত্র—প্রণীত হয়। তার মাস ছয়েকের মধ্যে দাবার ছক বদলে গেল। খুব সম্ভব প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মীর্জা পেছন থেকে কিছু কলকাঠি নেড়েছিলেন। সীমান্ত-গান্ধী খান আবদুল গাফফার খানের ভ্রাতা ডা. খান সাহেব তখন চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সর্বজ্যেষ্ঠ সদস্য। হঠাৎ করে মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিয়ে তিনি রিপাবলিকান পার্টি নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গড়লেন আর মুসলিম লীগ ছেড়ে হুড়হুড় করে তাতে অনেকে ঢুকে পড়লেন। এতে জাতীয় পরিষদে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে পদত্যাগ করলেন প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে এবং মুসলিম লীগ থেকেও। পাকিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথম—কী প্রদেশে কী কেন্দ্রে—মুসলিম লীগ সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাচ্যুত হলো। বিরোধী দলের নেতা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান জানানো হলে ডা. খান সাহেবের রিপাবলিকান পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করলেন তিনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মধ্যে এবারে দেখা গেল আবুল মনসুর আহমদকে—তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন—এবং এ এইচ দেলদার আহমদ ও জহিরুদ্দীনকে। প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে থাকলেন আবদুল আলীম, নূরুর রহমান (সিলেট জেলা যুবলীগের এককালীন নেতা) এবং তফসিলি ফেডারেশনের রসরাজ মণ্ডল।

প্রধানমন্ত্রী হয়ে সোহ্‌রাওয়ার্দী চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব রেখেছিলেন বটে, কিন্তু পাশ্চাত্যের সঙ্গে মিত্রতা করতে তিনি অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের নীতি ছিল সামরিক জোট-বিরোধী, কিন্তু তা সত্ত্বেও সোহ্‌রাওয়ার্দী বাগদাদ চুক্তি—পরে তার নাম হয় সেনটো—এবং সিয়াটোর সমর্থকরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণের পরে যখন তিনি প্রথমবার পূর্ব পাকিস্তান সফরে এলেন, তখন সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল সংসদের আমন্ত্রণে (আবুল মনসুর আহমদের পুত্র মহবুব আনামের কিছু সংযোগ ছিল তার সঙ্গে) হেলিকপ্টারে করে হলের সামনের লনে এসে নামলেন। ছাত্রদের উদ্দেশে প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি সামরিক চুক্তির পক্ষ সমর্থন করলেন এবং স্বায়ত্তশাসন-সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে বললেন যে, পূর্ব পাকিস্তান ৯০ শতাংশ স্বায়ত্তশাসন পেয়ে গেছে। এতে আমরা অনেকে খুব মর্মাহত হলাম, কিন্তু আসল গোলযোগ লেগে গেল আওয়ামী লীগের মধ্যে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এর অব্যবহিত পরেই ময়মনসিংহের (এখন টাঙ্গাইলের) কাগমারীতে দলের কাউনসিল-সভা আহ্বান করেন। সেই সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৭ সালের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারিতে। এতে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব গৃহীত না হলেও মওলানা সাহেব সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেন এবং স্বায়ত্তশাসন না দিলে দেশের পশ্চিমাঞ্চলকে পূর্ব পাকিস্তান 'আসসালামু আলাইকুম'—অর্থাৎ বিদায়—জানাবে বলে ঘোষণা করেন। তাঁর এই ঘোষণা সারা দেশে বড়োরকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, এমন কি, *ইত্তেফাক*ও মওলানার বিরূপ সমালোচনা করে।

তবে *ইত্তেফাক* বেশি বিরূপতা প্রকাশ করেছিল ৮, ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারিতে মওলানা

ভাসানী-আহূত পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন নিয়ে। এর প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি ছিলেন ভাসানী নিজে, আর আহ্বায়ক ছিলেন আবু জাফর শামসুদ্দীন। সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন নানা দেশের বিশিষ্ট সুধীজন। ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন হুমায়ুন কবির এবং তার সদস্য ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, প্রবোধকুমার সান্যাল এবং আরো কেউ কেউ। মিশর, জাপান, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রেরও প্রতিনিধিত্ব ছিল, যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধি ছিলেন ব্রিটিশ কাউন্সিলের ঢাকার আঞ্চলিক প্রতিনিধি ড. কসন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসেছিলেন ড. মাহমুদ হোসেন, আবদুল কাদের এবং নৃত্যশিল্পী মাদাম

সম্মেলনের প্রবেশপথে অসংখ্য তোরণ নির্মিত হয়েছিল এবং সেসবের নামকরণ হয়েছিল জিন্নাহ, গান্ধী, নেহরু, সুভাষ, চিত্তরঞ্জন দাস, সার্ সৈয়দ, মওলানা মোহাম্মদ আলী, হাকিম আজমল খান, তিতুমীর, শরিয়তউল্লাহ্, রুমি, হালি, ইকবাল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ওয়াশিংটন, লিঙ্কন, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুং, শেকসপিয়র, ওয়র্ডসওয়র্থ, বায়রন, শেলি প্রমুখ বিশিষ্ট মনীষীর নামে। সম্মেলন উদ্‌বোধন করেছিলেন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান এবং এর মূল সভাপতি ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা, মুহম্মদ এনামুল হক, আহমদ হাসান দানী, মুহম্মদ ওসমান গণি, এম এন হুদা, আখলাকুর রহমান, নূরুল ইসলাম এবং নানা ক্ষেত্রের আরো অনেক কৃতী পূর্ব পাকিস্তানি এতে যোগ দিয়েছিলেন।

ভাসানীর 'আসসালামু আলাইকুম' বলা এবং ভারতীয় ও রুশ নেতাদের নামে তোরণ-নির্মাণ সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করা হয় দৈনিক *আজাদে* তো বটেই, দৈনিক *ইত্তেফাকেও*। পূর্ব পাকিস্তানকে যারা পূর্ব বাংলা বলে, যারা অখণ্ড বাংলার সংস্কৃতিতে আস্থাবান, মওলানা ভাসানীকে সামনে রেখে তারা কী ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত—এ-প্রশ্ন যেমন উঠল, তেমনি এতো বিশাল আয়োজনের অর্থ কারা জোগান দিল, সে-প্রশ্নও করা হলো। শেষে রায় দেওয়া হলো যে পুরো উদ্‌যোগটাই পাকিস্তানের জাতীয়তা ও সংহতির প্রতি আঘাতস্বরূপ। *ইত্তেফাকে* প্রকাশিত একটি ক্রোধান্ধ রচনায়, যতদূর মনে পড়ে, রাধারাণী দেবীর নৃত্যের উল্লেখ ছিল, যদিও তিনি ছিলেন সাহিত্যিকমাত্র এবং প্রকৃত নৃত্যশিল্পী মাদাম আজুরি এসেছিলেন করাচি থেকে। এই আক্রমণের মুখে মওলানার পক্ষসমর্থন করতে এগিয়ে আসে কাজী মোহাম্মদ ইদরিস-সম্পাদিত দৈনিক *ইত্তেহাদ*, কিন্তু সে-কাগজ আর কতজনই বা পড়ত!

কাগমারী সম্মেলনের পরে আওয়ামী লীগের মধ্যে মতবিরোধ স্পষ্ট ও প্রকাশ্য রূপ নেয়। অচিরেই ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। ঘটনাপরম্পরায় সাংগঠনিক সম্পাদকের পদ থেকে অলি আহাদ সাময়িকভাবে বরখাস্ত হন এবং কোষাধ্যক্ষ ইয়ার মোহাম্মদ খানসহ প্রথম সারির ন-দশ জন নেতা আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর জুলাই মাসে ঢাকায় নিখিল পাকিস্তানভিত্তিক এক গণতান্ত্রিক কর্মী-সম্মেলন আহ্বান করেন ভাসানী।

এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক ঘটনা ঘটে যায়। পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ রংপুরে যুব-উৎসব উদ্‌যাপন করে—প্রাদেশিক সরকার তাতে আনুকূল্যও করেছিল—এটাই ছিল নিভে যাওয়ার আগে যুবলীগের শেষবারের মতো জ্বলে-ওঠা। যুক্ত নির্বাচন প্রথার পক্ষে প্রাদেশিক পরিষদে উত্থাপিত আতাউর রহমান খানের প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। এ-সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান অত্যন্ত মর্মস্পর্শী একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন পরিষদে। একই সময়ে জাতীয় পরিষদে সোহ্‌রাওয়ার্দী সুন্দর একটি ভাষণ দিয়ে যুক্ত নির্বাচন বিল উত্থাপন করেন; শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে স্বতন্ত্র এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে যুক্ত নির্বাচন প্রথার ব্যবস্থা করে সেখানে আইন পাশ হয়। প্রাদেশিক পরিষদে বাংলায় প্রথম বাজেট-বক্তৃতা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ইতিহাস সৃষ্টি করেন। গণতন্ত্রী দলের মহিউদ্দিন আহমদের প্রস্তাবক্রমে কেন্দ্রের কাছে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে। তাতে কেন্দ্রের হাতে মুদ্রা, পররাষ্ট্র ও দেশরক্ষা রেখে বাকি সকল বিষয় প্রদেশের কাছে ন্যস্ত করার ধারণা ব্যক্ত হয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের একুশ দফায় প্রতিশ্রুত স্বায়ত্তশাসন-দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এটি ঘটেছিল ১৯৫৭ সালের এপ্রিলে।

জুলাই মাসের শেষে ভাসানী-আহূত গণতান্ত্রিক কর্মী-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসেছিলেন খান আবদুল গাফফার খান (সীমান্ত প্রদেশ), মিয়া ইফতিখারউদ্দীন ও মাহমুদুল হক ওসমানী (পাঞ্জাব), জি এম সৈয়দ (সিন্ধু), আবদুস সামাদ খান আচকজাই (বেলুচিস্তান) এবং তাঁদের অনেক সমর্থক। পূর্ব পাকিস্তান থেকে এতে যোগ দিয়েছিলেন ভাসানী-সমর্থক আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীরা, গণতন্ত্রী দলের প্রায় সকলে এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা ব্যক্তি। সম্মেলন নির্বিঘ্নে ঘটে নি। প্রথম দিনেই আওয়ামী লীগের সমর্থকেরা রূপমহল সিনেমার ভেতরে ঢুকে পড়ে আক্রমণ চালায়। এতে মিয়া ইফতিখারউদ্দীন ও দেওয়ান মাহবুব আলীসহ অনেকে আহত হন। পরদিন পল্টন ময়দান-এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করায় সম্মেলন-উত্তর নির্ধারিত জনসভা হতে পারে নি, তার ওপর নির্মিত সভামঞ্চে পট্‌কা ইত্যাদি নিক্ষেপ করায় সবকিছু পণ্ড হয়ে যায়। তবে দুদিনের সম্মেলনশেষে নতুন রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হয়। প্রাদেশিক মন্ত্রী মাহমুদ আলী মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে নতুন দলে যোগ দেন।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-গঠনের প্রথম প্রতিক্রিয়া বোধহয় দেখা দেয় পশ্চিম পাকিস্তানে। সেখানে ক্ষমতায় থাকতে হলে রিপাবলিকান পার্টিকে ন্যাপের সমর্থনের মুখাপেক্ষী হতেই হতো। এখন ন্যাপের চাপে রিপাবলিকান পার্টি এক ইউনিট ভেঙে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাক্তন চারটি প্রদেশের পুনরুজ্জীবন এবং তাদের নিয়ে একটি সাব-ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাবে সম্মত হয়। পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে এই প্রস্তাব পাশ হলে প্রেসিডেন্ট মীর্জা ও প্রধানমন্ত্রী সোহ্‌রাওয়ার্দী তার বিরোধিতা করেন। ফলে রিপাবলিকান পার্টি কেন্দ্রে সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। ১৩ মাস প্রধানমন্ত্রিত্বের পর সোহ্‌রাওয়ার্দী পদত্যাগ করেন—তাঁর পূর্বগামী চৌধুরী মোহাম্মদ আলীও ১৩ মাসই প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এবারে জাতীয় পরিষদে

বিরোধী দলীয় নেতা মুসলিম লীগের আই আই চুন্দ্রিগড় রিপাবলিকান পার্টি ও কৃষক-শ্রমিক পার্টিকে নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। তাতে ফজলুর রহমান, আবদুল লতিফ বিশ্বাস, আবদুল আলীম, লুৎফর রহমান ও ফরিদ আহমদ প্রমুখ পূর্ব পাকিস্তানি মন্ত্রী হন। এই মন্ত্রিসভার আয়ুষ্কাল ছিল দুমাসের কম। মুসলিম লীগ চাপ দিয়েছিল রিপাবলিকান পার্টিকে যুক্ত-নির্বাচন প্রথা বাতিল করার জন্যে। মন্ত্রিসভা-গঠনের সময়ে রিপাবলিকান পার্টি এতে রাজি হলেও পরে অসম্মত হয়। তবে দেশে সাধারণ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত এক ইউনিটের অবস্থা অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত তারা বহাল রাখে। সারা পাকিস্তানে ১৯৫৮ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্‌যোগ নিয়েছিলেন সোহ্‌রাওয়ার্দী, তবে তা আরো কিছুকাল উদ্‌যোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

৩১.

দৈনিক *ইত্তেহাদ* উঠে যাওয়ায় তার সহকারী সম্পাদকের দায়িত্বমুক্ত হয়ে হাসান হাফিজুর রহমান যোগ দেন জগন্নাথ কলেজে, বাংলা বিভাগের শিক্ষকরূপে, ১৯৫৭ সালে। একটা ভালো সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে সব সময়ে ছিল, কিন্তু তার জন্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ্য তাঁর ছিল না। এ-সময়ে শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন সিকানদার আবু জাফরের। জাফর ভাইও হয়তো এমন একটা কিছু পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি তখন থাকতেন অভয় দাস লেনে—সেখান থেকেই *সমকাল* প্রকাশের ব্যবস্থা হলো : সিকানদার আবু জাফর সম্পাদক, সহযোগী সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান। একেই বোধহয় বলে মণিকাঞ্চনযোগ।

সমকাল-প্রকাশের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হতেই আমার কাছে লেখা চাইলেন হাসান। তিনি যে-পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত, তাতে আমার লেখা প্রথম সংখ্যায় যাবে না, তা হতে পারে না। এর কিছুকাল আগে বলধা গার্ডেনে অনুষ্ঠিত এক নজরুল-জয়ন্তীতে ছোটো একটা লেখা পড়েছিলাম। সেটাই একটু বাড়িয়ে 'নজরুল ইসলাম ও তাঁর কবিতা' নাম দিয়ে হাসানের কাছে সমর্পণ করা গেল। পত্রিকা ছাপা যখন শেষ, তখন একদিন হাসানের কাছে তা দেখে আনন্দিত হয়ে হাতে নিলাম। কিন্তু, হায়, দেখা গেল, আমার লেখার শেষাংশ—একটা পৃথক নম্বর দিয়ে লেখা—মুদ্রিত হয়নি। হাসানের কাছে জানতে চাইলাম, ব্যাপারটা কী। তিনি অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, 'তাহলে বোধহয় প্রেস থেকে হারিয়ে গেছে।' 'এখন কী হবে?' 'প্রেসে খুঁজে দেখবো। যদি পাওয়া যায়, ভালো, নইলে আবার লিখে দিও। দ্বিতীয় সংখ্যায় ছেপে দেবো।' আমি রাগ করলাম, কিন্তু তাতে লাভ কী! তড়িঘড়ি করে হাসান সূচিপত্রে প্রবন্ধের শিরোনামের নিচে ছেপে দিলেন 'অসমাপ্ত', প্রবন্ধের নিচে আর সেকথা জানাবার সুযোগ ছিল না। ওই সময়ে নজরুলের বন্ধু মঈনউদ্দীন হোসায়ন ঢাকায় বেড়াতে এসেছিলেন। আমাদের বাড়িতে এসে তিনি আমার পড়ার টেবিলে *সমকাল* দেখে পড়তে নিলেন। পরের দিন যখন ফেরত দিলেন, তখন খুব কোমল করে বললেন, 'নজরুলের প্রতি তুমি

সুবিচার করো নি।' তাঁকে বললাম, লেখার শেষাংশটা ছাপা হয় নি, কিন্তু তাতে তাঁর অনুমোদনের অভাব কোনোভাবে পূরণ হলো না। দ্বিতীয় সংখ্যায় যখন বাকি অংশটা ছাপা হলো, তখন তিনি আর ঢাকায় নেই।

সমকালের প্রথম সংখ্যার সূচিপত্র ছিল এরকম :

প্রবন্ধ

প্রথম গণবিপ্লব	মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ্
ভাষা ও কালচার	এ, কে, নাজমুল করিম
কবিতা	
তার আলেখ্য	শামসুর রাহমান
বুড়ো ভোলানো ছড়া	আবুল হোসেন
গল্প	
ফউত	শওকত ওসমান
উত্তাপ	আলাউদ্দিন আল-আজাদ
পলায়ন	সমারসেট মম [অনুবাদ : আনোয়ার জাহিদ
বিভাগ	
পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি	কাজী দীন মুহম্মদ
নজরুল ইসলাম ও তাঁর কবিতা (অসমাপ্ত)	আনিসুজ্জামান
পূর্ব বাংলার শিল্প সৃষ্টির ধারা	কামরুল হাসান
আন্তর্জাতিক ভূতত্ত্ববর্ষ	আবদুল্লাহ আল-মুতী
দাবা খেলা	কাজী মোতাহার হোসেন
সমালোচনা	
[নদী ও মানুষের কবিতা : সানাউল হক]	আবদুল গনি হাজারী
[ঢাকা : আহ্মদ হোসেন দানী]	চাকলাদার মাহবুব-উল আলম
সাময়িকী	

সমকাল যে আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে একটা অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিল, সে-বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। হাসান এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন বছর তিনেক। ততদিনে জাফর ভাই অনেক বেশি করে পত্রিকার হাল ধরেছেন। প্রতি সংখ্যায় এর প্রচ্ছদে থাকছে দেশের খ্যাতিমান চিত্রীদের ছবি। নতুন নতুন লেখক জড়ো করছেন। বইয়ের সমালোচনা করার জন্যে খুঁজে খুঁজে উপযুক্ত লোক বের করছেন। *সমকালের* নিজস্ব ছাপাখানা হয়েছে, প্রকাশনা শুরু হয়ে গেছে। সিকানদার আবু জাফরকে অমরতাদানের জন্যে এক *সমকালই* যথেষ্ট, কিন্তু এর প্রারম্ভিক পর্বে হাসানের অবদানও ভুলে যাওয়ার মতো নয়।

সমকাল প্রকাশের অল্প কিছুকালের মধ্যে সাহিত্য সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন এসে গেল। আতোয়ার রহমান আর সাধারণ সম্পাদক থাকতে চাইছিলেন না, তিন বছর পেরিয়ে চতুর্থ বছরে পদার্পণ করেছেন সেই ভূমিকায়, আর কতো! হাসানকে

আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম, তিনি এ-ভার নিতে রাজি কিনা। তিনি সরলভাবেই বললেন, কলেজ ও *সমকালের* যুগল দায়িত্ব পালন করে সংসদের সাধারণ সম্পাদক হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হবে না। আমি এবারে গিয়ে ধরলাম আবদুল্লাহ আল-মুতীকে, তিনি রাজি হলেন। কয়েকদিন পরে হাসানের সঙ্গে যখন দেখা হলো, তিনি বললেন, 'তুমি নাকি বলে বেড়াচ্ছ যে, আমাকে সংসদের সাধারণ সম্পাদক হতে দেবে না, মুতী ভাইকে করবে। দেখি, তুমি কী করে করো।' আমি তো অবাক। বললাম, 'আপনিই তো বলেছিলেন, সাধারণ সম্পাদক হতে পারবেন না।' তিনি বললেন, 'আমি দাঁড়াবো ইলেকশনে, তারপর দেখা যাবে।'

বোঝা গেল, আমাদের কোনো করিতকর্মা বন্ধু হাসানকে এমন কিছু একটা বলেছেন, যাতে তাঁর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। পরে তিনি আমাকে বলেছিলেন, কারো কাছ থেকে কিছু শুনে আমার ওপর তাঁর তীব্র অভিমান হয়েছিল—অতোটা করা তাঁর উচিত হয় নি। এদিকে হাসানের ব্যবহারে আমি বিমূঢ় ও ক্ষুব্ধ, মুতী ভাই অপ্রস্তুত ও অপমানিত। আমরা ঠিক করলাম, হাসান যদি নির্বাচনই চান, তাই হোক। মুতী ভাই যখন দাঁড়াবেন বলে জানিয়েছেন, তিনি আর বসে পড়বেন না।

নির্বাচনী অভিযান খানিকটা হলো। কিন্তু হাসানের সাংগঠনিক প্রতিভা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। ঢাকা হলের মিলনায়তনে নির্বাচন হলো। আমি আর হাসান পরস্পরের বিরুদ্ধে। মুতী ভাই ও আমি কিছুটা কুণ্ঠিত, হাসান একেবারেই অলজ্জিত ও ক্রুদ্ধ। আমাদের অনেক বন্ধুই গেছেন ভোট দিতে—তাঁদের হাবভাব দেখে এবং কারো কারো একান্ত কথা শুনে ফলাফল আঁচ করতে পেরেছিলাম। হাসান ভালোভাবেই জিতলেন। জেতার পরে বুঝলেন, তাঁর হার হয়েছে। তাঁর উৎসাহে ভাটা পড়লো। কেন জানি না, *সওগাত*-অফিসের বদলে জিন্নাহ্ অ্যাভিনিউতে এক অফিসের দোতলায় কয়েকটা সভা হলো। আমি তার কোনো কোনোটায় থাকলাম। হাসান এবং আমি কেউ ভালো করে কথা বলতে পারি না অন্যজনের সঙ্গে। সাহিত্য সংসদের কাজ থেকে আমি সরে এলাম।

৩২.

এম এ ক্লাসে উঠে জানতে পারলাম, সে-বছর সকল বিষয়ের বি এ অনার্স পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নীলকান্ত সরকার স্বর্ণপদক দেওয়া হয়েছে। সমাবর্তন-উৎসবে স্বয়ং চান্সেলর আমাকে স্বর্ণপদক পরিয়ে দিচ্ছেন, এমন একটা ছবি মনের মধ্যে ভেসে ওঠায় বেশ একটা প্রশান্তির ভাব জাগলো, তবে তা অচিরাৎ ধূলিসাৎ হয়ে গেল রেজিস্ট্রারের চিঠি পেয়ে। তাতে জানানো হয় যে, ওই পদক প্রবর্তনের সময়ে দাতা যে-অর্থ দিয়েছিলেন, তার বার্ষিক সুদ আসে ২৭ টাকা। ওই টাকায় স্বর্ণপদক তৈরি করা যায় না, তাই পদকের বদলে আমার পছন্দসই ২৭ টাকার বই দেওয়া হবে। তালিকা দিলাম এবং বই পেলাম। বইতে অবশ্য লিখে দেওয়া হলো নীলকান্ত সরকার স্বর্ণপদক, তবে নিচে রেজিস্ট্রারের

স্বাক্ষরও স্বহস্তে দেওয়া নয়, রাবার স্ট্যাম্পের ছাপমারা। প্রথম শ্রেণী পেলে ১০০ টাকার বই দেওয়া হতো পুরস্কারস্বরূপ। আমার তালিকানুযায়ীই বই দেওয়া হলো বটে, তবে অমনি হেলাফেরা করে। কোনো অনুষ্ঠান নয়, কোনো কর্মকর্তার উপস্থিতিও নয়, অনির্দিষ্ট দিনের কোনো এক সময়ে একজন করণিকের হাত থেকে এসব সম্মান গ্রহণ করলাম।

এই সময়কার একটি ঘটনা অনেক দিন ধরে কাঁটার মতো আমাকে বিদ্ধ করেছিল। বিভাগের সেমিনারে বসে পড়ছি, হঠাৎ করে অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের প্রবেশ। তিনি আমাকে দেখে সবার সামনে—বেশিরভাগ আমার নিচের ক্লাসের ছাত্রছাত্রী—জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি [অনার্সে] ফার্স্ট ক্লাস পেলে কী করে? আমি তো তোমাকে ফার্স্ট ক্লাস নম্বর দেইনি।' তখন আমার মনে পড়লো, অনার্সের সাত পত্রে প্রথম শ্রেণীর নম্বর পেলেও তৃতীয় পত্রে পেয়েছিলাম ৫৩। বুঝতে পারলাম, ওই পত্রের বহিরাগত পরীক্ষক ছিলেন তিনি। তিনি যে আমাকে পাকিস্তান থেকে বের করে দিতে চেয়েছিলেন এবং মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে বিভাগের সামনে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করতে দেখে একটা তির্যক মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়েছিলেন ('দেয়ার সিমস টু বি নো ডিফারেন্স বিটউইন দি টিচার অ্যান্ড দি স্টুডেন্ট)', সে-কথা আমার মনে ছিল। মুখে প্রায় এসে গিয়েছিল যে, আপনার পত্রে শূন্য পেলেও আমি ফার্স্ট ক্লাস পেতাম (কেননা ঘটনাক্রমে প্রথম শ্রেণীর জন্যে ন্যূনতম নম্বরের চেয়ে আমি ৫৪ বেশি পেয়েছিলাম), তবু নিজেকে সংযত করে নিয়ে মৌন অবলম্বন করলাম। এবারে উনি প্রশ্ন করলেন, 'এক মুসলমান মহিলা পার্নেলের *হার্মিটের* বঙ্গানুবাদ করেছিলেন, তাঁর নাম বলো তো দেখি।' আমি বলতে পারিনি। মনসুরউদ্দীন বললেন, 'কিছু লেখাপড়া জানো না, মাস্টারদের ফাই-ফরমাশ খেটে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছো।' আমি খুবই অপমানিত বোধ করেছিলাম। বিভাগে শিক্ষকতায় যোগ দেওয়ার পরে মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন-সম্পাদিত *হারামণির* পঞ্চম খণ্ডের একটি সমালোচনা লিখি *সাহিত্য পত্রিকায়*। মনসুরউদ্দীনের ছিদ্রান্বেষণ করে তাতে তাঁর বহু ভ্রান্তি ও পরস্পরবিরোধিতার উল্লেখ ছিল। পরে নিজের কাছে লজ্জিত হয়েছিলাম এবং আরো পরে তার জন্যে মনসুরউদ্দীন সাহেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলাম।

এম এ ক্লাসে শ্রেণীকক্ষের পাঠটা তেমন সুবিধের হলো না। মুনীর চৌধুরী তো আগেই চলে গিয়েছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, এবারে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে ভাষাতত্ত্ব পড়তে যাবেন বলে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও কাজী দীন মুহম্মদ দুজনেই ব্রিটিশ কাউন্সিলের বৃত্তির জন্যে প্রার্থী হলেন। ব্রিটিশ কাউন্সিলের আঞ্চলিক প্রতিনিধি ডব্লিউ জে বলের সঙ্গে বিভাগীয় প্রধান মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সখ্য ছিল, উভয়ে মিলে ধ্বনিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি বইও লিখেছিলেন। ছাত্র হিসেবে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর মেধাগত পরিচয়ের সঙ্গে হাই সাহেবের সমর্থন যুক্ত হওয়ায় বৃত্তিটা তিনিই পেলেন। হাই সাহেব এমন ধারণা দিয়েছিলেন যে, পরবর্তী বৎসরে আবেদন করলে কাজী দীন মুহম্মদের প্রার্থিতা তিনি সমর্থন করবেন। নিজের প্রতি সুবিচার হয়নি মনে করে দীন মুহম্মদ সাহেব এই প্রতিশ্রুতিতে আস্থা স্থাপন করেননি। নিজের খরচে ওই বছরই তিনি বিলেত যাবেন

বলে সংকল্প করলেন। তাঁর আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, তার ওপর পাঠ্যবই লিখতে অভ্যস্ত হওয়ায় পাঠ্যবই লিখে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আদিল ব্রাদার্সের কাছ থেকে তিনি বেশ খানিকটা আগামও নিলেন। দুজনেই বিলেত যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তাঁদের পাঠদানে বিঘ্ন ঘটলো—দীন মুহম্মদ সাহেবের ক্ষেত্রে সেটা একটু বেশি হলো। লাইব্রেরি থেকে বই তুলে আমাদের হাতে দিয়ে তিনি কখনো কখনো বলতেন, তোমরা পড়ে নিও। হাই সাহেব উনিশ-বিশ শতকের কয়েকজন কবির এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িয়েছিলেন, আর খুব যত্ন করে পড়িয়েছিলেন বাংলা ভাষার ইতিহাস। এ ক্ষেত্রেও ইংরেজিতে টাইপ-করা মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র নোট ছাত্রদের হাতে হাতে ঘুরতো। তার সঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ইংরেজি বই ও সুকুমার সেনের বাংলা বই মিলিয়ে আমি নিজের মতো করে বাংলায় লিখে নিয়েছিলাম। সেটি কাজে এসেছিল। আহমদ শরীফ পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সমালোচনা কেমন করে পড়াতেন, সেকথা আগে বলেছি।

আমার যতদূর মনে পড়ে, এই ১৯৫৭ সালেই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। এতদিন পর্যন্ত সংস্কৃতি সংঘই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের একমাত্র সাংস্কৃতিক সংগঠন। এখন আবদুল গাফফার চৌধুরী, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ফখরুজ্জামান চৌধুরী, হাসনাত আবদুল হাই, মুস্তাফা জামান আব্বাসী ও আরো কয়েকজন মিলে শিল্প ও সাহিত্য পরিষদ নামে পৃথক সংগঠন গড়লেন। এঁরাও সাহিত্যসভা ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করতেন।

পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে এলো। সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় আর আমি পরস্পর প্রতিযোগী হয়েও বইপত্র আদানপ্রদান করে পড়াশোনা করেছি। তাঁকে একদিন বললাম, 'ফোর্থ পেপারে [বাংলা ভাষার ইতিহাস এবং পাণ্ডুলিপি-পাঠ ও পাঠ-সমালোচনা] আপনি আমার চেয়ে বেশি নম্বর পাবেন, বাকি তিন পেপারে বোধহয় আমি বেশি পাবো।' আমার ধারণা পরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।

চার পত্র লিখিত পরীক্ষা কার্জন হলেই হলো এবং দ্রুত শেষ হয়ে গেল। মৌখিক পরীক্ষায় বাইরে থেকে এলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। তিনি প্রশ্ন করেন, আমি জবাব দিই, তার লেজ ধরে আবার তিনি প্রশ্ন করেন. এইভাবে চললো। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, 'মহাকবি হিসেবে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র সেন ও কায়কোবাদকে গুণানুযায়ী সাজিয়ে দাও।' আমি বললাম, 'আপনি যে ক্রম ধরে বললেন, অমনই।' তিনি নবীন সেনের ওপরে কায়কোবাদকে স্থান দিতে চান, আমি তাঁর যুক্তি খণ্ডন করার চেষ্টা করি। আধঘণ্টা যখন চলে গেল, হাই সাহেব বললেন, 'তুমি এখন এসো।'

মৌখিক পরীক্ষা দিয়েই বেশির ভাগ সহপাঠী চলে গেলেন নানা বেসরকারি কলেজে শিক্ষকতায় যোগ দিতে। হাই সাহেব আমাকে আগেই বলে রেখেছিলেন, কোনো কাজ না নিয়ে আমি যেন গবেষণা-বৃত্তির অপেক্ষায় থাকি—একটা-না-একটা হয়ে যাবে। সেই কথার ওপর নির্ভর করে আমি একাই বেকার হয়ে বসে রইলাম।

১৯৫৭ সালের ডিসেম্বরে পরীক্ষার ফল বের হলো। আমাদের ক্লাসের নিয়মিত ছাত্র ছাড়া কয়েকজন পরীক্ষা দিয়েছিলেন এক সঙ্গে। একজন নোয়াখালি এলাকার স্কুল-শিক্ষক অনিলকুমার মজুমদার—তাঁকে প্রবীণই বলা চলে, স্বদেশী আন্দোলনের

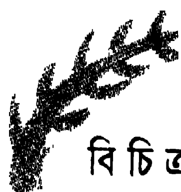
সময়ে পুলিশের গুলিবিদ্ধ হওয়ায় তাঁর একটা পা হাঁটু থেকে কেটে ফেলতে হয়েছিল; তিনি চলতেন ক্রাচে ভর দিয়ে। আমাদের আগের বছরের সুধাংশুশেখর হালদারও (প্রথিতযশা আইনজীবী) বহিরাগত প্রার্থী হয়ে পরীক্ষা দিলো। আর আমাদের সহপাঠী আবদুল মতিন মিয়া দিলো প্রাইভেটে। মোট বাইশজন প্রার্থীর মধ্যে দুজন প্রথম শ্রেণীতে, উনিশজন দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং একজন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলো। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলাম আমি, সুনীল দ্বিতীয়। এবারে টিউটোরিয়াল ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর যোগ হয়েছিল। আমি পেয়েছিলাম ৬৬.২ শতাংশ নম্বর—দশমিকের হিসেবে অনার্সের চেয়ে একটু কম।

শিক্ষকেরা সন্তোষ প্রকাশ করলেন আমার ফলাফলে। বিলেতে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীকে চিঠি লিখে খবর দিলাম (দীন মুহম্মদ সাহেবের ঠিকানা জানতাম না)। তিনি অভিনন্দন জানিয়ে পত্র লিখলেন।

যে-সন্ধ্যায় পরীক্ষার ফল বের হলো, তার পরদিন সকালে আব্বা বললেন, 'চলো, মুরুব্বিদের সালাম করে আসবে।' বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার দিনে যেমন, এদিনও তেমনি সঙ্গে করে প্রথমে নিয়ে গেলেন ড. শহীদুল্লাহ্‌র কাছে। তিনি হয়তো আমার ফল আঁচ করতে পেরেছিলেন—দোওয়া করলেন, তবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন না। তারপর গেলাম মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর কাছে—তিনি খুবই উল্লসিত। বললেন, 'ভাই, তোমার একটা ফটো নিয়ে এসো, আমি নিজে নিউজ লিখে *আজাদে* ছেপে দেবো।' এ-বিষয়ে আমার অনিচ্ছার কথা আব্বা তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, যদিও আমার ছবিসমেত কৃতিত্বের সংবাদ কাগজে বের হলে আব্বাই খুশি হতেন সবচেয়ে বেশি।

আব্বা একবার জানতে চাইলেন, এম এ পাশ তো হলো, এখন কী করবো? বললাম, পিএইচ ডি-র জন্যে গবেষণা। তিনি কী বুঝলেন, জানি না; চুপ করে রইলেন। আমার ইচ্ছায় তিনি কখনো বাধা দেন নি, এবারেও দিলেন না। এম এ পাশ করেও পুত্র রোজগারের সামর্থ্য লাভ করলো না, তা ভেবে তাঁর মন খারাপ হয়েছিল কিনা, বুঝতে পারিনি—বুঝতে চেষ্টাও করি নি।

গবেষণা-বৃত্তির বিজ্ঞাপনের অপেক্ষায় আমি বসে রইলাম। আমার চোখে তখন নতুন স্বপ্নের ঘোর লেগেছে।



বিচিত্র চিত্র

এম এ পরীক্ষা দিয়ে কোনো কাজে যোগ না দিলেও অর্থাগমের একটা আকস্মিক উপায় হয়ে গিয়েছিল। আমাদের বাড়ির উলটো দিকে এক অফিস থেকে কাজী জহিরুল হক বের করলেন সাপ্তাহিক *জনমত*। তার পেছনে সোভিয়েত দূতাবাসের আর্থিক আনুকূল্য ছিল। দূতাবাসের প্রচার-দপ্তরের তৈরি করা ইংরেজি লেখা বিভিন্ন জনকে দিয়ে অনুবাদ করিয়ে পত্রিকায় ছাপানো হতো। অনুবাদকের নাম থাকতো না, পয়সা পাওয়া যেতো বেশ ভালো। জহিরুল হক আমাকে ডেকে নিয়ে অনুবাদের কাজে লাগিয়ে দিলেন। সময়টা ছিল মহাশূন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিযানের যুগ। যেদিন তারা পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করল, সেদিন আমাদের আনন্দ দেখে কে! এটাকে বলা হলো সমাজতন্ত্রের বিজয় কিংবা সমাজতন্ত্রেরই সুফল। পরে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাফল্যের সঙ্গে মহাশূন্য অভিযানে যোগ দিলো, তখন অবশ্য আমাদের সেই ধারণায় আঘাত লাগে। আবার ইউরি গ্যাগারিন যখন মহাশূন্যে প্রথম মানুষ হওয়ার গৌরব অর্জন করলেন, তখন আমাদের বিশ্বাস হলো, মহাশূন্য-অভিযানের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নই এগিয়ে। সে অবশ্য কয়েক বছর পরের কথা, আরো পরে সে-ধারণাও ভেঙেছিল। যাহোক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিষয়ে অনেক লেখা *জনমতে* ছাপা হতে থাকল; তার বেশির ভাগ অনুবাদ, মনে হয়, আমিই করেছিলাম।

উপার্জিত এই অর্থ ব্যয় করতে তেমন সমস্যা হয়নি। কোনটা কারণ আর কোনটা ফল, বলা মুশকিল। আমার হাঁটা কমে গেল, বাসে চড়তে ভালো লাগে না—রিকশায় চলি, আর প্রচণ্ড ঝোঁক হলো বাইরে খাওয়ার। এতদিন কোরবানকে দিয়ে পাড়ার নিতাইয়ের দোকানের সিঙাড়া-মিষ্টি কিংবা নবাবপুর-ঠাটারিবাজারের সংযোগস্থলের নিকটবর্তী দোকান থেকে পরোটা-কাবাব খেয়ে বেশ চলছিল। এখন রেক্সের খাওয়া ছাড়া মুখে রোচে না। জিন্নাহ্ অ্যাভিনিউতে, ডিএনফা বিল্ডিংয়ে, রিট্জ নামে একটি রেস্টুরেন্ট ছিল—সেখানে খুব ভালো কাবাব-পরোটা পাওয়া যেতো। সেখানে মাঝে-মধ্যে খেতাম। রিট্জ মালিকানা.ও নাম বদলে রেক্স হয়ে গেল—খাবারের মান ঠিকই রইলো। তখন প্রায় রোজ সন্ধ্যায় সেখানে যাই। এক সন্ধ্যায় আমার নিত্যসঙ্গী আহমদ হোসেনের সঙ্গে রেক্সে বসে খেতে খেতেই খবর পাই, আমাদের এম এ পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে।

আবদুল আলী চাকরি পেয়েছে ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিতে, তার বান্ধবী মাসুদা—আমাদের লীলু আপা—ডিএনফা বিল্ডিংয়েই সিঙ্গার কোম্পানিতে সেলাইয়ে প্রশিক্ষণ দেন। মসি বরাবর সচ্ছল ছিল; এখন, মনে হয়, তার সংগতিও কিছু বেড়েছে। ফলে রেক্স ছেড়ে আমাদের সান্ধ্য আড্ডা উঠে এলো কাসবাহ্ নামের নতুন এক রেস্টুরেন্টে—সেটা ছিল স্টেডিয়ামের উলটো দিকে এখন যেখানে হামদর্দ দাওয়াখানা—সেই জায়গায় বা তার পাশে। কাসবাহ্‌র আকর্ষণ ছিল ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ সহযোগে মাটন বা চিকেন কাটলেট, পটের চা ও কফি এবং, বিশেষ করে, কোল্ড কফি। সবই আমাদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে। আলী, লীলু আপা, মসি, আহমদ ও আমি প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় এক টেবিলে বসতাম। আমাদের বন্ধু-পরিচিতদের মধ্যে আরো কেউ কেউ অন্য টেবিলে আড্ডা জমাতো—যেমন আমীর আলী বা নূরুল কাদের খান। কারো পকেটে পয়সা কম থাকলে এ-টেবিল ও-টেবিলে আদানপ্রদান চলতো। কেউ কেউ আমাদেরকে নিশ্চিত পাওয়া যাবে জেনে সেখানে ঢুঁ দিতো। কেউ সিনেমা দেখতে যাবে অথচ পকেট খালি; কাসবাহ্‌য় এসে বন্ধুজনদের ওপর শুল্ক ধার্য করে টিকিটের পয়সা সংগ্রহ করতো। কাসবাহ্‌য় পাশ্চাত্য সংগীত বাজতো সর্বক্ষণ—তার মধ্যে একটি গান আমাদের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল : কে সারা সারা—যা হবে তা হবে। মাঝে মাঝে মুখ বদলাবার জন্যে কাছেই লা-সানিতে যেতাম—সেটা ছিল জিন্নাহ্ অ্যাভিনিউতেই, এখন যেখানে অগ্রণী ব্যাংক—সোনালী ব্যাংকের উলটো দিকে—সেখানে।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে কখনো কখনো স্টেডিয়ামের দোকান থেকে বরফে-রাখা সাঁচি পান খাওয়া হতো। গুলিস্তানের উলটো দিকের একটা দোকান থেকেও পান কিনেছি দৈবাৎ, তবে স্টেডিয়ামই ছিল বেশি পছন্দের জায়গা। তাছাড়া সেখানকার বইয়ের দোকানে ঢুকে বইপত্রের পাতা উলটানো চলতো, মাঝে মাঝে বই কেনাও হতো। তবে আমার বই কেনার জায়গা ছিল বাংলাবাজারে। নওরোজ কিতাবিস্তান থেকে বাকিতেও বই কেনা যেতো। *রবীন্দ্র-রচনাবলীর* একটি খণ্ড প্রথম কিনেছিলাম ১৯৫০ সালে, ছাব্বিশ খণ্ডের সংগ্রহ পূর্ণ হয় ১৯৫৭-এ।

পেছনে তাকিয়ে মনে হয়, বড়ো উপভোগ্য ছিল তখনকার দুশ্চিন্তাহীন স্বাধীন জীবন। কিন্তু সত্যিই কি তা দুশ্চিন্তাহীন ছিল?

২.

এরকম কোনো সময়েই বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং আমি সেখানে এক কাণ্ড বাধিয়ে ফেলি।

বাফায় কাজ করতে করতে একটা চিঠি আমার চোখে পড়ে। বাফার সম্পাদককে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের সামরিক সচিব ওই পত্রে জানাচ্ছেন যে, বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর সভাপতির পদ গ্রহণ করতে গভর্নর এ কে ফজলুল হক সদয় সম্মতি জানিয়েছেন। হক সাহেবের প্রতি আমাদের কোনো বিরূপতা ছিল না। কিন্তু কাউকে না জানিয়ে নির্বাচনের আগেই যে মাহমুদ নূরুল হুদা তাঁকে সভাপতি হতে আমন্ত্রণ

জানালেন আর তিনিও এতে সম্মত হয়ে গেলেন, এই ব্যাপারটা আমাদের—বিশেষ করে আহমদ হোসেনের ও আমার—ভালো লাগেনি। চিঠিটা আমি নকল করে নিলাম এবং স্থির করলাম, যথাস্থানে এটা উপস্থাপন করে প্রতিবাদ জানাবো।

বাফার বার্ষিক সাধারণ সভার স্থান নির্ধারিত হলো গভর্নমেন্ট হাউজে। নির্বাহী সভাপতি শামসুননাহার মাহমুদের সভাপতিত্বে সভা শুরু হলো এবং অন্যান্য বিষয়ের আলোচনাশেষে নির্বাচনের সময় এলো। নিজের জায়গায় উঠে দাঁড়িয়ে আমি কম্পিতহৃদয়ে তবে অকম্পিতকণ্ঠে যথাসম্ভব নম্রভাবে প্রথমে একটি চিঠি পড়ার এবং তারপর আমার বক্তব্য দেওয়ার অনুমতি চাইলাম সভাপতির কাছে। অনুমতি পেয়ে বললাম, বাফায় নিত্যকার কাজ করার সময়ে এই চিঠি আমার হাতে এসেছে। চিঠি পড়লাম। তারপর বললাম, এ কে ফজলুল হক সভাপতি হবেন, সে আমাদের সৌভাগ্য। কিন্তু তাঁকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হতে হবে। শুধু সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে তিনি আমাদের বিপাকে ফেলেছেন। এই সভার একটি কর্মসূচি কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন। কিন্তু সভাপতি তো আগেই নির্ধারিত হয়ে গেছেন। তাতে বাফার গঠনতন্ত্রের হানি হয়েছে, আমাদেরও অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে।

আমি যতোই ভদ্রভাবে কথা বলে থাকি না কেন, সভাপতি অস্বস্তি বোধ করলেন, সামনে উপবিষ্ট আমার পিতৃবন্ধু সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া) বিচলিত হলেন বলে মনে হলো, হুদা ভাই ক্রুদ্ধ হলেন। হুদা ভাই বললেন, অনুমতি না নিয়ে তিনি ফজলুল হক সাহেবের নাম কী করে সভাপতির পদের জন্যে প্রস্তাব করবেন—হাজার হোক তিনি গভর্নর? ফজলুল হক সম্মতি জানিয়েছেন মাত্র, নির্বাচিত তো হন নি। আমি জানতে চাইলাম, এখন অন্য নাম প্রস্তাব করলে ফজলুল হক সাহেবকে বিব্রত করা হবে কিনা? আমরা কি স্বাধীনভাবে সভাপতি-নির্বাচনে সমর্থ হবো? নিজেদের মধ্যে আলোচনার জন্যে সভায় কিছুক্ষণ বিরতি দেওয়া হলো। অনেকেই আমাকে বললেন, হুদা ভাই যা করেছেন তা বাফার ভালোর জন্যেই করেছেন; ফজলুল হককে বিতর্কিত করা সংগত হবে না; আমার যা বক্তব্য, তার মর্ম সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়েছে, এখন এ নিয়ে জিদ করে কী লাভ? নির্বাচনের শেষে আমাদের সঙ্গে চা-পানের জন্যে গভর্নর তথা নতুন সভাপতি তৈরি হয়ে আছেন; তাঁকে বসিয়ে রেখে শুধু বিব্রত করা হবে।

সভা পুনরায় শুরু হলে আমার আপত্তি প্রত্যাহার করে নিলাম। আশা প্রকাশ করলাম, সদস্যদের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়, এমন কাজ বাফার কোনো দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ভবিষ্যতে করবেন না।

ওই সভায় উপস্থিত সুধীজনের একজন ছিলেন জয়নুল আবেদীন। তিনি যখন ঢাকা বেতার-কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক ছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে একবার পরিচয় ঘটেছিল। সে-সময়ে তিনি স্যুট-টাই পরে এবং জুতো ছাড়া মোজা পায়ে দিয়ে স্টুডিওর সামনের করিডোরে চলছিলেন কিছু একটা পর্যবেক্ষণ করতে। এখন তিনি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক। সভার শেষে হক সাহেবকে নিয়ে আমরা যখন চা খাচ্ছি, তখন তিনি আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, আমার কথা তাঁর ভালো লেগেছে, আমি যেন পরদিন সকালে সচিবালয়ে তাঁর দপ্তরে গিয়ে এক কাপ চা খেয়ে আসি।

পরদিন গেলাম। জয়নুল আবেদীন আবার বললেন, আমি যেমন শালীন ও শোভন অথচ দৃঢ়ভাবে সভায় বক্তব্য পেশ করেছি, তাতে তিনি খুব 'ইমপ্রেসড' হয়েছেন। আমি এম এ পাশ করে বসে আছি জেনে তিনি প্রস্তাব দিলেন, ইচ্ছে করলে আমি জনসংযোগ বিভাগে একজন কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দিতে পারি। আমি খুবই অবাক হয়ে গেলাম। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে জানালাম, নিজের জন্যে আমার অন্যরকম পরিকল্পনা রয়েছে।

হুদা ভাই কিছুদিন মুখ ভার করে থাকলেন। তিনি যে অসংগত কিছু করেছেন, তা তাঁর কখনোই মনে হয় নি। তবে আমি যে কোনো স্বার্থবুদ্ধি থেকে কিংবা তাঁকে হেয় করার উদ্দেশ্য নিয়ে গভর্নমেন্ট হাউজের সভায় প্রতিবাদ করিনি, ধীরে ধীরে তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন। তারপর আমরা বহুদিন একযোগে ও অন্তরঙ্গভাবে কাজ করেছি।

৩.

অবশেষে বাংলা একাডেমীর দুটি গবেষণা-বৃত্তির প্রত্যাশিত ও অপেক্ষিত বিজ্ঞাপন বের হলো কাগজে। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের তত্ত্বাবধানে কী বিষয়ে আমি গবেষণা করবো, তা আগেই স্থির হয়েছিল। মাসে ২০০ টাকার বৃত্তির জন্যে এখন আবেদন করা এবং সেই সঙ্গে গবেষণা-সম্পর্কিত প্রস্তাব জমা দেওয়ার পালা। দুটিই করতে হবে ইংরেজি ভাষায়।

বাংলা একাডেমীর উদ্‌বোধন যখন হয়েছিল সাড়ম্বরে, তখন নিমন্ত্রণপত্র, মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ, শিক্ষামন্ত্রীর বক্তৃতা, স্পেশাল অফিসারের বক্তব্য—সবই দেওয়া হয়েছিল বাংলায়। তবে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে দৈনন্দিন কাজে ইংরেজির ব্যবহারই চলেছিল স্পেশাল অফিসার মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌র সময় থেকে। ১৬ মাস দায়িত্ব পালন করে তাঁর কার্যকাল শেষ হলে বাংলা একাডেমীর প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হলেন ইস্ট পাকিস্তান সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিসের ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক। তিনি ছিলেন ইংরেজ আমলের কর্মকর্তা—ইংরেজির ব্যবহার তাঁর আমলে শিথিল হলো না, হয়তো শক্ত হলো। এনামুল হক খসড়া রচনা করতেন পেনসিলে—ভুল হলে বা কিছু বদলাতে চাইলে কাটাকুটি না করে ইরেজার দিয়ে মুছে ফেলে তার ওপরে লিখতেন। তারপর ফাউন্টেন পেন দিয়ে তার চূড়ান্ত রূপ দিতেন। সেটা কখনো ওই অবস্থায় ব্যবহৃত হতো, কখনো বা টাইপ করে নেওয়া হতো। তিনি বাংলায় কঠিন কঠিন পরিভাষা তৈরি করতে যেমন পারঙ্গম ছিলেন, তেমনি নিখুঁত ইংরেজিতে অফিসের সব কাজ করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন।

সুতরাং আমার গবেষণা-কর্মের শিরোনাম দিতে হলো Thoughts of the Bengali Muslims as reflected in Bengali literature during the British period (1757-1947) এবং জমা দিতে হলো ফুলস্ক্যাপ সাইজের তিন-চার পৃষ্ঠা কাগজ জুড়ে ইংরেজিতে টাইপ-করা গবেষণা-প্রস্তাব। হাই সাহেবকে সেটা দেখিয়ে নিয়েছিলাম অবশ্যই, তবে তিনি দু-একটি শব্দের বেশি পরিবর্তন করেন নি। পরে তাঁর কাছে শুনেছিলাম, হক সাহেব তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন প্রস্তাবটি তিনি লিখে দিয়েছিলেন কিনা।

কাগজপত্র জমা দিতে হলো বাংলা একাডেমীর সচিব (তখন কর্মাধ্যক্ষ বলা হতো) এ কে এম আবদুল আজিজের কাছে। তিনিও ই পি এস ই এস ক্যাডারের লোক, অত্যন্ত মধুর ছিল তাঁর ব্যবহার। তাঁর দুই ভায়রা ছিলেন আতাউর রহমান সরকারের মন্ত্রী শহীদ মশিউর রহমান এবং আহমদের সম্পর্কে মামা মুজিবুর রহমান; তাঁদের এক শ্যালিকাকে পরে বিয়ে করেছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান। আজিজ সাহেবের কন্যা আফিফা রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক।

গবেষণা-বৃত্তি দুটির একটি পেলাম আমি, অপরটি গোলাম সাকলায়েন। স্ট্যাম্প-পেপারে এক বছরের জন্যে কাজ করার চুক্তিতে সই করলাম। তারপর ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮ তারিখে গবেষক হিসেবে বাংলা একাডেমীতে যোগ দিলাম। পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের চাকরি ছেড়ে আসতে গোলাম সাকলায়েনের কিছু সময় লেগেছিল। তিনি যোগ দিয়েছিলেন আমার কিছুকাল পরে এবং ঠাঁই পেয়েছিলেন ঢাকা হলে।

প্রথমে বাংলা একাডেমীর উচ্চমান সহকারী ও পরে প্রধান সহকারী ছিলেন এ এম এমদাদুর রহমান। তিনি ডি পি আই অফিস থেকে এসেছিলেন, পরিচালকের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। পরে তাঁর আরো পদোন্নতি হয়েছিল এবং তিনি গোলমালেও পড়েছিলেন, তবে তিনি বরাবর আমার আনুকূল্য করেছেন। তাঁর কাছে বৃত্তির মাসিক বিল জমা দিতে হতো, গবেষণা-কর্মের অগ্রগতির ত্রৈমাসিক রিপোর্ট পৌঁছে দিতে হতো এবং আচরণীয় ও অনাচরণীয় কাজের ফিরিস্তি পাওয়া যেতো।

গবেষক হিসেবে আমরা যোগ দেওয়ার পর পরই বাংলা একাডেমীর কাউনসিল-নির্বাচন এসে গেল। সেই সঙ্গে জানা গেল, খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁকে সহ-সভাপতি পদে প্রার্থী করে তমদ্দুন মজলিসের কর্মকর্তারা একটা প্যানেল তৈরি করেছেন। খান বাহাদুর আমাদের অতি প্রিয় মানুষ, কিন্তু তিনি যাঁদের মনোনয়ন নিলেন, তাঁরা নানা দিক দিয়ে আমাদের প্রতিপক্ষ। এই সময়ে ড. আলীম আল-রাজী বাংলা একাডেমীর নির্বাচনে আগ্রহ প্রকাশ করায় আমরা, মানে সাহিত্য সংসদের দল, তাঁকেই সহ-সভাপতি পদে মনোনয়ন দিলাম—কাজটা ঠিক হয়েছিল কিনা সন্দেহ। সদস্যপদে আমাদের প্রার্থী হলেন ড. এ বি এম হবিবুল্লাহ্, অজিতকুমার গুহ, কামরুল হাসান, আবদুল গনি হাজারী, আহমদ শরীফ ও আবদুল্লাহ আল-মুতী। পরে দেখা গেল শওকত ওসমানও মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন—সেটা আর প্রত্যাহার করানোর সুযোগ হয়নি। তমদ্দুন মজলিসের সকলেই নির্বাচিত হয়েছিলেন, আমাদের সকলেরই পরাজয় ঘটেছিল। ছজন বিজয়ী সদস্য ছিলেন ইব্রাহীম খাঁ, আবুল কাসেম, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, তালিম হোসেন, মাহফুজুল হক ও আশরাফ ফারুকী। অনেক বড় বড় সাহিত্যিক ও অধ্যাপক—এমনকি, যাঁদের সঙ্গে তমদ্দুন মজলিসের আদর্শগত যোগ ছিল—তাঁরাও অনেকে প্যানেলের প্রার্থীদের কাছে হেরে গিয়েছিলেন। কারণ, তমদ্দুন মজলিসের কর্মকর্তারা আগে থেকেই নিজেদের সমর্থকদের বাংলা একাডেমীর সদস্য করে নিয়েছিলেন, তাঁরা প্যানেল ধরেই ভোট দিয়েছিলেন। গোলাম সাকলায়েনও নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নিষেধ করেছিলাম এই বলে যে, আমরা একাডেমীর বেতনভোগী না হলেও বৃত্তিভোগী,

নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া বোধহয় সংগত হয় না। তিনি বলেছিলেন, 'সকলে ধরেছে যে!' নির্বাচনের ফল দেখে বোঝা গেল, তিনি প্রতারিত হয়েছেন।

পরে নির্বাচিত কাউনসিল-সদস্যরা যে-দুজন সাহিত্যিককে সহযোজিত করেন, তাঁরা হলেন, শাহেদ আলী ও আসকার ইবনে শাইখ। এই কাউনসিলের সঙ্গে প্রথম থেকেই পরিচালকের বিরোধ লেগে যায়। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যেও বোধহয় মতান্তর দেখা দেয়—বছরখানেক পরে মাহফুজুল হক ও তালিম হোসেন পদত্যাগ করেন। কাউনসিলে সরকার মনোনয়ন দেন কাজী মোতাহার হোসেন, শামসুননাহার মাহমুদ ও নলিনীমোহন দাসকে। পদাধিকারবলে সদস্য ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ (মুহম্মদ আবদুল হাই), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, পরে মযহারুল ইসলাম) এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালক (খান বাহাদুর আবদুল হাকিম)। সহ-সভাপতি, মনোনীত সদস্য ও পদাধিকারবলে সদস্যদের সঙ্গে এনামুল হকের বিরোধ হয় নি, তবে অপর আটজন সদস্য তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিলেন। তার একটা কারণ, তাঁরা তাঁকে যথেষ্ট পাকিস্তানি ভাবাপন্ন বিবেচনা করেন নি।

৪.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো আবাসিক হলে একজন ছাত্র সর্বাধিক চার বছর থাকতে পারতো। সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলে আমার সেই মেয়াদ পূর্ণ হয়েছিল। ফলে পিএইচ ডি-তে ভর্তি হলাম ফজলুল হক মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্ররূপে। সেই সুবাদে একটি পুরস্কারও পাওয়া গেল।

ড. স্ট্যানলি ম্যারন বোধহয় ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে আসেন। কয়েক বছর পর তিনি যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যান, তখন বিশ্ববিদ্যালয়কে কিছু টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন কলা অনুষদে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা আহ্বান করে তাঁর নামে পুরস্কার দিতে। কেবল অনার্স ডিগ্রিধারীরা এ-প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারতো এবং বাংলা বা ইংরেজিতে প্রবন্ধটি লেখা চলতো।

১৯৫৮ সালে প্রতিযোগিতার বিষয় স্থির করা হয় উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ ও সাহিত্য নিয়ে। আমার পক্ষে তা দুরূহ ছিল না, সুতরাং নাম দিলাম প্রতিযোগিতায়। অন্য কোনো বিভাগের এম এ শ্রেণীর এক ছাত্র ছিল একমাত্র প্রতিযোগী। সহযোগী রেজিস্ট্রারের তত্ত্বাবধানে ছুটির সময়ে রেজিস্ট্রারের দপ্তরে বসে প্রবন্ধ লিখতে হলো। পুরস্কারটি আমিই পেলাম।

স্ট্যানলি ম্যারনের অভিপ্রায়-অনুযায়ী মূল প্রবন্ধ—বাংলায় হলে তার ইংরেজি অনুবাদ—পাঠাতে হতো তাঁকে। আমার লেখা অনুবাদ করার দায়িত্ব পড়লো ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক ও মুনীর চৌধুরীর বোন নাদেরা বেগমের ওপরে। তিনি আমাকে ক্রমাগত অভিশম্পাত করতে থাকলেন। অনুবাদ পড়ে স্ট্যানলি ম্যারন আমাকে প্রশংসাসূচক চিঠি দিয়েছিলেন এবং দু-একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রশ্ন

তুলেছিলেন—প্রধানত সমকালীন সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ছোটো ও বড়ো ঐতিহ্য সম্পর্কে। পত্র-বিনিময়ে তাঁর না হোক, আমার লাভ হয়েছিল।

আহমদের দৌড়ে ১৯৫৯ সালে প্রবন্ধটি ছাপা হয় আবদুল ওয়াহাব-সম্পাদিত ইংরেজি সাপ্তাহিক *রেকর্ডে*, ১৯৫৯ সালের শেষদিকে। নাদেরা বেগম অনিচ্ছুক হওয়ায় তাতে অনুবাদকের নাম ছিল না।

৫.

সাংবাদিক আবদুল ওয়াহাব ছিলেন আমার বন্ধু আহমদ হোসেনের মামা—তার মায়ের মামাতো ভাই। ওয়াহাব সাহেবের সাত পুত্রকন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠ সিদ্দিকা, ডাক নাম বেবী। সে খেলাধুলায় পটু ছিল—বেশ কয়েকটি ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়েছিল। গার্লস গাইডে সে ছিল সক্রিয় এবং পাকিস্তান গার্লস গাইডের প্রতিনিধিদলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ব্যাডেন-পাওয়েলের জন্মশতবার্ষিক-উপলক্ষে ১৯৫৭ সালের শেষে ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত গার্লস গাইডের সেনটেনারি ওয়র্লড-ক্যাম্পে অংশ নিয়েছিল, সেই সঙ্গে হংকংও ঘুরে এসেছিল। তার প্রতি আহমদের কিঞ্চিৎ দুর্বলতা দেখা দেয় যখন বেবী ইডেন কলেজে আই এ পড়ছে, আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়তে শুরু করেছে, আর আমি পিএইচ ডি-র জন্যে গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

আহমদের স্বভাবে এক ধরনের প্রবলতা ছিল, যা অনেক সময়ে তার প্রতি অন্যের আনুকূল্য সৃষ্টির অন্তরায় হতো। মনে হয়, এক্ষেত্রে এমনই কিছু ঘটেছিল। বেবীর দাদির সঙ্গে আমার মায়ের এবং তার মামার সঙ্গে আমার বড়োবু-দুলাভাইয়ের পরিচয়ের সূত্রে আমাদের পরিবারের সঙ্গে বেবীদের পরিবারের চেনাজানা ছিল, তবে যাতায়াত ছিল না। আমার কাছে বেবীর গল্প করে এবং বেবীর কাছে আমার কথা বলে আহমদ একের কাছে অপরের যে-ভাবমূর্তি তৈরি করেছিল, নিঃসন্দেহে তা ছিল অনুকূল। ফলে পরস্পরের সম্বন্ধে কৌতূহল ও আগ্রহ জন্মায়নি, এমন কথা বলা যাবে না। বেতারে একদিন বেবীর অনুষ্ঠান ছিল—সেই নাজিমউদ্দীন রোডের বেতার-ভবনে। অনুষ্ঠান শেষ করে যখন সে ফিরছে, তখন আহমদ তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল এবং, মূলত আহমদেরই ইচ্ছায়, স্থির হয়ে গেল যে সময় ও সুযোগমতো বেবী ও আমি পরস্পরের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করবো।

টেলিফোনে আলাপের প্রথম পর্যায়েই বেবী বলে নিয়েছিল যে, আমি যদি—আর কারো পক্ষ থেকে নয়—নিজের থেকে তার সঙ্গে কথা বলতে চাই, তবেই সে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে ইচ্ছুক হবে। আহমদও চাইল, এই শর্ত আমি মেনে নিই। সে মেনে নিতে বারণ করলে আমি তার কথা রাখতাম, তবে বোধহয় মনে মনে ক্ষুণ্ন হতাম।

বেবীর সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ হতো দীর্ঘ সময় ধরে। সে-সময়ে তার আব্বা বাড়ি থাকতেন না, তবে আমার আব্বা-মা প্রায়ই বাড়ি থাকতেন। টেলিফোনটা ছিল তাঁদেরই ঘরে, পাশের ঘরে থাকতাম আমি। টেলিফোন এলেই আমি ছুটে গিয়ে

ধরতাম, তার টেনেও তাঁদের ঘরের দোরগোড়ার চেয়ে বেশি দূরে নিতে পারতাম না। এইভাবেই অনেকক্ষণ কথা বলতাম—আব্বা-মা কী ভাবছেন, তা নিয়ে চিন্তা করিনি। আহমদও প্রায় সময়েই আমার ঘরে থাকতো এবং কথোপকথনের শেষে তার সারাংশ তাকে শোনাতে হতো।

একসময়ে বেবী ও আমি উভয়েই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, আমাদের আলাপের গতি কোন পথে যাচ্ছে। সুতরাং, আমরা নিজেরাই ঠিক করলাম, আমাদের কথাবার্তায় ক্ষান্তি দেওয়া ভালো। কথা বন্ধ হলো। এই পর্যায়ে আহমদকেও সবটা খুলে বললাম। তার প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক ছিল না, অপ্রত্যাশিতও ছিল না।

কথা বন্ধ হওয়ায় বোধহয় বেশি অস্বস্তিতে ভুগতে আরম্ভ করলাম আমি। তরুণ সৈয়দ মুসা রেজা ছিলেন বেবীর দূরসম্পর্কের আত্মীয়। তিনি একসময়ে আমাদের পাড়ায় ছিলেন, বেবীদের সম্পর্ক ধরে আহমদ ও আমিও তাঁকে মুসা নানা বলে ডাকতাম। সূত্রাপুরে চলে যাওয়ার পরেও প্রায়ই তিনি আমাদের বাড়িতে আসতেন আমার সঙ্গে আড্ডা দিতে—তবে আমার বন্ধুদেরও তিনি বান্ধব হয়ে উঠেছিলেন। একদিন আমতা-আমতা করে মুসা নানাকেই বললাম, 'বেবীকে বলবেন, আমাকে যেন ফোন করে।' মুসা নানা যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি বিবেচক। ব্যাপারটা হয়তো তিনি কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। তবে এটা যেন নেহাৎ একটা কুশলপ্রশ্নের ব্যাপার, এমনিভাবেই তিনি আমার অনুরোধটা গ্রহণ করলেন।

কয়েকদিনই পরই বেবীর টেলিফোন পেলাম এবং প্রথমেই সে জানতে চাইলো, ফোন করতে বলেছি কেন। আমার কোনো জুতসই জবাব ছিল না। খানিক বিষণ্নভাবে, খানিক বেপরোয়াভাবে উত্তর দিলাম, 'না বলে পারলাম না বলে।'

৬.

মুহম্মদ আবদুল হাই বললেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের ড. এ আর মল্লিক লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সম্পর্কে পিএইচ ডি করে ফিরেছেন। গবেষণাকর্মটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি, তাই আমার উচিত হবে, রাজশাহী গিয়ে অভিসন্দর্ভটি পড়ে আসা। আমার নিজেরও রাজশাহী যাওয়ার ইচ্ছে ছিল—শুনেছিলাম, ওখানকার পাবলিক লাইব্রেরিতে অনেক দুষ্প্রাপ্য বই আছে, তাছাড়া বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়মের গ্রন্থাগারটিও দেখা দরকার।

তত্ত্বাবধায়কের সুপারিশ নিয়ে দরখাস্ত করলাম বাংলা একাডেমীতে—গবেষণার উপকরণ সংগ্রহ করতে রাজশাহী যাওয়ার অনুমতি এবং ভ্রমণ ও দৈনিক ভাতার মনজুরি চাই। অনুমোদন পেতে বিলম্ব হলো না। তখন রেলে ছিল চার শ্রেণীর ভ্রমণের ব্যবস্থা—ফার্স্ট, সেকেন্ড, ইন্টার ও থার্ড ক্লাস। আমি ইন্টার ক্লাসের টিকিট করেছিলাম, কিন্তু স্টেশনে এসে দেখি, সেখানে প্রচণ্ড ভিড়। টিকিট বদলে সেকেন্ড ক্লাসে গেলাম, ফিরলামও একই শ্রেণীতে। শুনে একাডেমীর উচ্চমান সহকারী এমদাদুর রহমানের মাথায় হাত: 'করেছেন কী আপনি! আপনি তো ইন্টার ক্লাসের উপরে যাতায়াত করতে

এনটাইটেল্‌ড নন। আপনাকে সেই নিয়মেই টি এ বিল করতে হবে। তখন বাকি পয়সা তো আপনার পকেট থেকেই যাবে—ছি, ছি, আমার সঙ্গে একটু পরামর্শও করলেন না!' আমি দার্শনিকোচিত নির্লিপ্ততায় বললাম, 'নিয়ম যদি তেমন হয়, তবে তাই হবে।' তবু উনি সত্যি সত্যি দুঃখ করতে থাকলেন। মাসে তো পাই মোটে ২০০ টাকা, সেকেন্ড ক্লাসে ভ্রমণের বিলাসিতা করে নিজের অপূরণীয় আর্থিক ক্ষতি করে ফেললাম!

এসব অবশ্য রাজশাহী থেকে ফিরে আসার পরের ঘটনা। আমি কিন্তু ভ্রমণটা খুব উপভোগ করেছিলাম—বিশেষ করে, ফেরিতে। তারপরে রাজশাহীতে পৌঁছে কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। তখন সেখানে থাকেন আবদুল আলীর বোন—বিনু আপা বলি তাঁকে- এবং ভগ্নীপতি এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স অফিসার মজহার খান (তিনি আমার বড়োদুলাভাইয়ের সহকর্মী এবং তাঁদের বিয়ের ঘটকালি করেছিলেন আমার বড়োবু ও দুলাভাই)। তাঁদের বাসায় নিঃসঙ্কোচে ওঠা গেল এবং তাঁদের সাহচর্য ও যত্নে দিনগুলো খুব ভালো কাটলো। তাঁদের কন্যা—এখনকার বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা—তখন বোধহয় বছর দুয়েকের শিশু—সেই তাকে প্রথম দেখলাম।

মজহার ভাই আলাপ করিয়ে দিলেন আয়কর-আইনজীবী শান্তিময় ভট্টাচার্যের সঙ্গে (১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পরে রাজশাহী ছেড়ে বহরমপুরে ওকালতি করছেন)। পাবলিক লাইব্রেরিতে আমাকে নিয়ে গিয়ে তিনি বই ঘরে এনে পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। এমন কী, ঢাকায় ফেরার সময়ে পাবলিক লাইব্রেরি থেকে দুটি বই যে নিয়ে আসতে পেরেছিলাম, সে তাঁরই কল্যাণে। বই দুটি অবশ্য যথাসময়ে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে ফেরত পাঠিয়েছিলাম, তাতে লাইব্রেরি-কর্তৃপক্ষের কাছে শান্তিময়ের মুখরক্ষা হয়েছিল।

হাই সাহেব চিঠি লিখে দিয়েছিলেন ড. মল্লিকের কাছে—ওঁরা একসময়ে সহকর্মী ছিলেন রাজশাহী সরকারি কলেজে। ড. মল্লিক বললেন, 'দেখো, আমার থিসিসের তো একটামাত্র কপি—তুমি আমার বাসায় বসেই পড়ো। আমি তো নিজের কাজে বাইরেই থাকবো, আমার পড়ার ঘরে বসে পড়তে তোমার অসুবিধে হবে না।' তথাস্তু। তবে যার জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না, তা মিসেস মল্লিকের নিজের হাতে আপ্যায়ন। তিনি আমার বন্ধু নুরুল কাদের খান ওরফে ঝিলুর বড়ো বোন—তাঁকে দেখে সত্যিই বিমোহিত হয়েছিলাম। ঢাকায় ফিরে ঝিলুকে বলেছিলাম, 'তোমাকে আমরা 'সুন্দর' 'সুন্দর' বলি, কিন্তু বোনের কাছে তুমি কিছু না।' পরবর্তীকালে তাঁর অন্তরের সৌন্দর্যের পরিচয়লাভের বিশেষ সুযোগ হয়েছিল।

মল্লিক সাহেবের চিঠি নিয়ে গেলাম বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়মে। এত বড়ো প্রতিষ্ঠানের কী দুরবস্থা সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলাম, তা অবর্ণনীয়। ভবনের অর্ধেকটা হয়ে গেছে হাসপাতালের লাশকাটা-ঘর, সংগৃহীত ভাস্কর্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বা স্তূপাকারে পড়ে আছে ঘরের মেঝেতে। সহকারী কিউরেটর ও গ্রন্থাগারিক ছিলেন বোধহয় দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। নিজে অর্থ সংগ্রহ করে তিনি সেখানকার বাংলা বইয়ের একটা অসম্পূর্ণ তালিকা মুদ্রণ করেছিলেন। তার এক কপি তিনি উপহার দিয়েছিলেন আমাকে, তবে আমার প্রয়োজনীয় বই সেখানে তেমন পাইনি।

রাজশাহীর দিনগুলো কেবল ক্রীড়াবিহীন কর্মময় ছিল না। তখন সেখানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন খান শামসুর রহমান—বিদ্যাবত্তার কারণে যিনি ডক্টর জনসন নামে

পরিচিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে এক সন্ধ্যায় পরিচয় হয়েছিল ঢাকায়, তাঁর আজিমপুরের সরকারি বাসভবনে। আমি গিয়েছিলাম আফসারী খানমের কাছে—কোনো অনুষ্ঠানের ব্যাপারে। শামসুর রহমান সে-সময়ে *সমকালে* প্রকাশিত নজরুল-বিষয়ে আমার প্রবন্ধটি পড়েছিলেন। আমি বই পড়তে ভালোবাসি, একথা কবুল করায় তিনি জানতে চেয়েছিলেন, কেমন ভালোবাসি, একটা ভালো বইয়ের সন্ধানে আমি ক মাইল হাঁটতে বা সাইকেল চালিয়ে যেতে প্রস্তুত?

সেই জনসন ছিলেন রাজশাহীতে, আর তাঁর বাড়িতেই বাস করছিলেন আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্—কবি ও সি এস পি, আমার দীর্ঘকালের পরিচিত, সেখানে প্রোবেশনার। কখনো কখনো আমরা তিনজনে মিলে নানা বিষয়ে আলাপ করেছি—কথক ডক্টর জনসন, ওবায়দুল্লাহ্ মাঝে মাঝে কিছু বলেন, আমি একেবারেই শ্রোতা; কখনো বা ওবায়দুল্লাহ্ আর আমি পদ্মার ধার দিয়ে হেঁটে বেড়িয়েছি—ছবি দেখে এবং মুখে মুখে ছবি এঁকে।

৭.

সমগ্র পাকিস্তানে স্বতন্ত্র নির্বাচন-প্রথা পুনরায় প্রবর্তনের চেষ্টা করতে গিয়ে আই আই চুন্দ্রিগড় প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হন এবং তাঁর মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বরে রিপাবলিকান পার্টি ও কৃষক-শ্রমিক পার্টির কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন মালিক ফিরোজ খান নুন (মাস কয়েক আগে আততায়ীর ছুরিকাঘাতে ডা. খান সাহেবের মৃত্যু হয়)। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও কংগ্রেস এই সরকারকে সমর্থন করতে রাজি হয়েছিল দুটি শর্তে : পূর্ব পাকিস্তানে যুক্ত নির্বাচন-প্রথা বজায় থাকবে এবং—সোহ্‌রাওয়ার্দী যেমন চেষ্টা করছিলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়ে—১৯৫৮ সালের নভেম্বরে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। চুন্দ্রিগড় উদ্‌যোগ নিয়েছিলেন স্বতন্ত্র নির্বাচনের নীতির ভিত্তিতে ভোটার-তালিকা তৈরি করার। যুক্ত নির্বাচন-প্রথায় নতুন করে ভোটার-তালিকা তৈরি করতে হবে বলে বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সরকার পাকিস্তানে অনুষ্ঠেয় প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সময় ধার্য করে ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে। এই সমঝোতার পরে আওয়ামী লীগ, কংগ্রেস ও ন্যাপ নুন-মন্ত্রিসভায় যোগ দেয়।

এদিকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুব অস্থির হয়ে উঠেছিল। ১৯৫৬ সালে এ কে ফজলুল হক যখন এখানে গভর্নর হয়ে আসেন, তখন তাঁরই দলের আবু হোসেন সরকার ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিছুকাল পরে সে-সরকারের পতন হলে মন্ত্রিসভা গঠন করেন আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খান। সে-সময়ে তিনি গণতন্ত্রী দল, কংগ্রেস ও তফসিলি ফেডারেশনের সমর্থন পেয়েছিলেন। ন্যাপ গঠিত হলে গণতন্ত্রী দল সরকার থেকে বেরিয়ে এই নতুন রাজনৈতিক দলে যোগ দেয়, তবে ন্যাপ তখনো সরকারের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করেনি। কিন্তু আওয়ামী লীগের ভেতরের কোন্দল এবং কংগ্রেস ও তফসিলি ফেডারেশনের সঙ্গে তার বিরোধের ফলে পরিষদে এই

সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ হয়। এই সুযোগে গভর্নর এ কে ফজলুল হক ১৯৫৮ সালের ৩১ মার্চে আতাউর রহমান সরকারকে পদচ্যুত করেন এবং সেদিনই আবু হোসেন সরকারকে নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ পাঠ করান। এর পরপরই কেন্দ্রীয় সরকার—হয়তো সোহ্‌রাওয়ার্দীর অনুরোধে—গভর্নরকে পদচ্যুত করেন। শপথগ্রহণের বারো ঘণ্টা পরে আবু হোসেন সরকার পদচ্যুত হন এবং আতাউর রহমান খান আবার মন্ত্রিসভা গঠন করেন। আড়াই মাস পরে এ-সরকারের পতন হয়—তার একটা প্রধান কারণ, সরকারের প্রতি আস্থাজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে ন্যাপ কোনো পক্ষ নেয় নি। কয়েকদিনের জন্যে আবু হোসেন সরকার-মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় থাকে, কিন্তু ন্যাপ তার বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ায় সে-সরকারও বিদায় নেয়। মাস দুই গভর্নর প্রদেশ শাসন করেন, তারপর ক্ষমতাসীন হন আতাউর রহমান খান। তার পরপরই ঘটে সেই মর্মান্তিক ঘটনা—শাহেদ আলী-হত্যাকাণ্ড।

প্রধানত দলীয় রেষারেষির কারণে স্পিকার আবদুল হাকিমের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে—এমন কি, তাঁর মানসিক সুস্থতা সম্পর্কেও—পরিষদে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। একদিন গায়ের জোরেই তাঁকে পরিষদে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। তাঁর অনুপস্থিতিতে পরিষদের কার্য পরিচালনা করেন ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী। কিন্তু সরকারি ও বিরোধী দলের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের মধ্যে কেউ তাঁকে লক্ষ্য করে চেয়ার ছুঁড়ে মারে এবং আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুদিন পরে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

এই ঘটনায় দেশবাসী বিমূঢ় হয়ে যায় এবং রাজনীতিবিদদের ধিক্কার দেয়। আমরা শাহেদ আলীর রাজনৈতিক দলের সমর্থক না হয়েও এর তীব্র নিন্দা করি। আমাদের কারো কারো জন্যে এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে একটা ব্যক্তিগত বেদনাও কাজ করেছিল। শাহেদ আলীর কন্যা মাহমুদা খাতুন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক) আমাদের দু ক্লাস নিচে পড়তেন। তিনি তখন এম এ ক্লাসের ছাত্রী এবং তাঁর বিয়ে আসন্ন। তাঁর শোক আমাদের অনেকের বুকেই বেজেছিল। তখন আমাদের বন্ধুদের মধ্যে একটি কথা খুব রটেছিল যে, মাহমুদার হাত দেখে কিছুকাল পূর্বে জহির রায়হান নাকি বলেছিল, অচিরে মাহমুদার নিকটাত্মীয়-বিয়োগ ঘটবে। আমি কখনো কথাটা যাচাই করি নি।

ওদিকে এই ঘটনার পরপরই স্পিকার আবদুল হাকিমের জ্যেষ্ঠপুত্র, আমাদের বন্ধু, নাজিম মাহমুদ দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়েই বলেছিল, সেদিন পরিষদে প্রবেশ করতে সমর্থ হলে সম্ভবত মৃত্যুটা ঘটতো তার আব্বারই।

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর একটা বড়ো অংশ দেশে সাধারণ নির্বাচন চাইছিল না। পূর্ব পাকিস্তানে যুক্ত নির্বাচন-ব্যবস্থা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙে পূর্বতন প্রদেশগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাও এই চক্রের পছন্দ হয় নি। শাহেদ আলীর হত্যাকাণ্ড তাদের একটা সুযোগ করে দিলো। তাঁর মৃত্যুর দু সপ্তাহ পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মেজর-জেনারেল ইসকান্দর মীর্জা ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবরে সারা দেশে সামরিক আইন জারি করলেন : শাসনতন্ত্র বাতিল হলো, কেন্দ্রে ও প্রদেশে মন্ত্রিসভা ও পরিষদ ভেঙে দেওয়া হলো। প্রধান সেনাপতি জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হলেন।

পরদিন আইয়ুব খানকে প্রধানমন্ত্রী এবং লেফটেন্যান্ট-জেনারেল আজম খান, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ডব্লিউ এ বার্কি, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল কে এম শেখ, বিচারপতি মোহাম্মদ ইবরাহিম, আবুল কাসেম খান, হাফিজুর রহমান, জুলফিকার আলী ভুট্টো ও খান এফ এম খানকে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হলো; সকল মন্ত্রণালয়ের সচিব প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা হিসেবে গণ্য হলেন।

আরো একটা খেলা হলো ২৭ অক্টোবরে। ইসকান্দর মীর্জাকে প্রেসিডেন্টের পদ ত্যাগ করতে বাধ্য করলেন আইয়ুব খান। বিমানে করে তাকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেখানে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি এক রেস্টুরেন্ট-পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত থাকলেন। আইয়ুব খান একই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব নিলেন। নতুন তিনজন মন্ত্রী হলেন আমাদের অঞ্চল থেকে মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, আর পশ্চিম থেকে মনজুর কাদের ও মোহাম্মদ শোয়েব। জাকির হোসেন এলেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হয়ে।

দেশব্যাপী ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল। আওয়ামী লীগের আবুল মনসুর আহমদ ও শেখ মুজিবুর রহমান, কৃষক-শ্রমিক পার্টির হামিদুল হক চৌধুরী, ন্যাপের হাজী মোহাম্মদ দানেশ ও দেওয়ান মাহবুব আলী প্রমুখ নেতা কারাবন্দি হলেন। অনেকে আত্মগোপন করে থাকলেন। বামপন্থী রাজনৈতিক বইপত্র একবার ফেলে দিয়েছিলাম ১৯৫৪ সালে, প্রদেশে ৯২ক ধারা জারি হওয়ায়। তারপর যা কিছু সংগ্রহ করেছিলাম, রাতের অন্ধকারে আবার তা ফেলে দিয়ে এলাম।

দেশের রাজনীতিতে দীর্ঘ অমানিশার সূচনা হলো।

৮.

সামরিক শাসন জারি হলে দেশব্যাপী যে ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল, তাতে বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর (বাফা) সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ নূরুল হুদাও গ্রেপ্তার হলেন। হুদা ভাইয়ের একটা রাজনৈতিক পটভূমি ছিল : ব্রিটিশ আমলে মুসলিম লীগ করলেও তিনি ছিলেন সোহ্‌রাওয়ার্দীর নিকট মানুষ, আর পাকিস্তান আমলে প্রায় শুরু থেকেই ছিলেন মুসলিম লীগ-বিরোধী রাজনীতিতে—গণতান্ত্রিক যুবলীগ দিয়ে শুরু করেছিলেন, শেষ করেছিলেন গণতন্ত্রী দলের সহ-সভাপতি হিসেবে। গণতন্ত্রী দল যখন ন্যাপের অন্তর্গত হয়ে গেল, তখন তিনি আর নতুন দলে গেলেন না—ততদিনে বুলবুল ললিতকলা একাডেমীই তাঁর সর্বক্ষণ অধিকার করেছিল।

সে-সময়ে জাকির হোসেন এসেছেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হয়ে আর মেজর-জেনারেল ওমরাও খান হয়েছেন প্রদেশের সামরিক আইন প্রশাসক। বাফায় যাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, তাঁদের অনেকে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে ওমরাও খানের সঙ্গে দেখা করলেন এবং বললেন যে, নূরুল হুদা অনেক দিন ধরে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক জীবন যাপন করছেন, তিনি বাফার প্রাণস্বরূপ, তাঁর অভাবে প্রতিষ্ঠানটি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, অতএব হুজুর যদি মেহেরবানি করে তাঁকে মুক্তি দেন তাহলে বাফার উপকার হবে।

ওমরাও খান বিষয়টি বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তার কয়েকদিন পরে হঠাৎ করেই জানা গেল যে, মাহমুদ নূরুল হুদার অনুপস্থিতিতে বাফার কর্মপরিচালনার জন্যে কর্নেল শওকত আলী খানকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়েছে।

কর্নেল শওকত আলী আমাদের অপরিচিত ছিলেন না। একটি সংস্কৃতিমান খ্রিষ্টান পরিবারে তিনি বিয়ে করেছিলেন—ঢাকার সংস্কৃতিজগতে তাঁর স্ত্রী লিলি খান সুপরিচিত ছিলেন। ভদ্রমহিলার ভাইদের মধ্যে বাদল ঘোষ শিল্পস্থাপনা করে এবং রবিন ঘোষ চিত্রপরিচালনা করে যশস্বী হন। কর্নেল শওকত আলীর এক ভাই মুস্তাফিজুর রহমান খান পুলিশ সার্ভিসে ছিলেন, ১৯৫৫ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে সিটি এস পি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অপর ভাই আমানুল্লাহ খান বিশ্ববিদ্যালয়-জীবন থেকে আমাদের অগ্রজপ্রতিম বন্ধু—তিনি বিয়ে করেছিলেন খ্যাতনামা রবীন্দ্র-সংগীতশিল্পী ফরিদা বারী মালিককে (সে-সূত্রে পরে ফরিদা খান)। সেদিক দিয়ে দেখলে বলা যায় যে, কর্নেল শওকত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত ছিলেন না। তবে সামরিক শাসনের সময়ে সামরিক শাসকের নিযুক্তি নিয়ে তিনি এসেছেন, তা-ও কারাবন্দি সাধারণ সম্পাদকের জায়গায়, আমরা এটা আদৌ প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারি নি। তবে ওই অবস্থায় আমাদের কিছু করার ছিল না।

যা করার তা করে দিলেন কাজী মোতাহার হোসেন—তাঁর স্বভাবসুলভ সারল্য দিয়ে। সামরিক শাসন জারি হওয়ার আগে বাফার নির্বাহী সভাপতি ছিলেন বিচারপতি মুহম্মদ ইবরাহিম—তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলরও। এখন তিনি কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী হয়ে যাওয়ায় তাঁর জায়গায় সহ-সভাপতিদের একজন হিসেবে কাজী মোতাহার হোসেন নির্বাহী সভাপতির দায়িত্ব নিলেন। কর্নেল শওকত আলী যোগ দেওয়ার পরে কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম যে-সভা হলো, তাতে সভাপতি হিসেবে তিনি জানতে চাইলেন যে, কর্নেল কোন অধিকারবলে বাফার সাধারণ সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেছেন। কর্নেল যখন বললেন যে, সামরিক আইনের অধীন ক্ষমতাবলে প্রাদেশিক সামরিক আইন প্রশাসক তাঁকে এই দায়িত্বভার দিয়েছেন, তখন সভাপতি জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর নিয়োগপত্র কোথায়? কর্নেল বললেন, সামরিক আইন প্রশাসকের মৌখিক আদেশই যথেষ্ট। কাজী সাহেব বললেন, খবরের কাগজে দেখা যায়, অনেক লোকে সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তার মিথ্যে পরিচয় দিয়ে নানা কিছু করছে—তিনি কী করে জানবেন যে, শওকত আলী তেমন কেউ নন? এরকম প্রশ্ন যে হতে পারে, তার জন্যে কর্নেল একেবারে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর চোখমুখ লাল হয়ে গেল, সভায় উপস্থিত থাকাটাই যথেষ্ট অপমানজনক মনে হলো এবং এমনও হয়তো মনে হলো যে, যিনি সভাপতিত্ব করছেন, তিনি পাগল। তখন কে যেন একটু রহস্য করে সভাপতিকে বললেন, 'সার্, আর্মিতে তো মুখের হুকুমেই লেফট-রাইট করতে হয়, যুদ্ধে যেতে হয়, পিছিয়ে আসতে হয়। ওঁদের জন্যে মুখের কথাই যথেষ্ট।' কাজী সাহেব তাতে সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, 'আপনাকে যদি দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে লিখিত কাগজ দিতে অসুবিধে কোথায়? আমাদের তো বিষয়টা জানতে হবে। আপনি একটা রিট্ন অর্ডার করিয়ে নিয়ে আসবেন।'

এই প্রসঙ্গে একটা কৌতুককর ঘটনা বলি। সামরিক আদালতে ওকালতি করে আতাউর রহমান খানের বেশ পসার হয়েছিল। ওমরাও খানের সঙ্গে তাঁর তখন যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল, এমন একটা রটনা হওয়ায় বহু বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁর কাছে ছুটে আসতেন। এমনি এক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন—তাঁর স্বামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের কেমন ক্লেশ হচ্ছে, তা জানিয়ে ভদ্রলোকের মুক্তি প্রার্থনা করে, ওমরাও খানের কাছে আবেদনপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্যে মহিলা আতাউর রহমান খানকে ধরে বসলেন। আতাউর রহমান বললেন, 'খবরদার, খবরদার, ওই কাজটি করবেন না।' মহিলা সবিস্ময়ে জানতে চাইলেন, 'কেন?' আতাউর রহমান ব্যাখ্যা করলেন, 'বুলবুল একাডেমীতে কী হয়েছে জানেন? নূরুল হুদাকে নিয়ে যাওয়ায় একাডেমীর খুব অসুবিধা হচ্ছে, তাই তাকে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ নিয়ে কয়েকজন কর্তাব্যক্তি জি ও সি-র কাছে গিয়েছিলেন। তাতে নূরুল হুদা ছাড়া পায় নি, কিন্তু ওমরাও খান বাফায় আরেকজন সেক্রেটারি পাঠিয়ে দিয়েছে।'

৯.

জেনারেল আইয়ুব খান এলেন পূর্ব পাকিস্তান সফরে। হর্ষোৎফুল্ল জনতার স্বতঃস্ফূর্ত জয়ধ্বনিতে যে তিনি উৎসাহিত হয়েছিলেন, তা বলা বাহুল্য। এ উপলক্ষে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে এক জমকালো সংবর্ধনা আয়োজিত হলো। তিনি বাংলা একাডেমী পরিদর্শন করতেও এলেন। একাডেমীর পরিচালক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তাঁকে অভিনন্দন ও স্বাগত জানিয়ে যে-অভিভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে স্তুতি ছিল মাত্রাধিক। এমন স্তুতিবাদ একটা বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের প্রধানের পক্ষে নিতান্ত অগৌরবের বিষয়, সরকারি কর্মকর্তার পক্ষেও শোভন কিনা সন্দেহ। তাঁর বক্তৃতায় কী ছিল, তা আন্দাজ করা যাবে *বাংলা একাডেমী পত্রিকার* দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৫) তাঁর স্বাক্ষরে প্রকাশিত 'একাডেমীর কথা'য়। তার খানিকটা উদ্‌ধৃত করি (পরবর্তীকালেও একাধিকবার তিনি আইয়ুব খানের ক্ষমতাগ্রহণকে জাতির অপেক্ষিত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব বলে অভিহিত করেছিলেন) :

> ইহারই [কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হবিবর রহমানের 'একাডেমী ভবনে তশরীফ' আনার] এক সপ্তাহ পরে গত ২৬-১২-৫৮ তারিখে একাডেমী পরিদর্শনার্থে আগমন করেন রাষ্ট্রাধিনায়ক জেনারেল মুহম্মদ আইয়ুব খান। তাঁহার এই পরিদর্শন একাডেমীকে যে সম্মান এবং সারা দেশবাসী তথা জগতের সমক্ষে একাডেমীকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসবে যে মর্যাদা দান করিয়াছে, তাহা বলিবার নয়, উপলব্ধি করিবার বিষয়। একাডেমীর ইতিহাসে ইহা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।
>
> আমাদের রাষ্ট্রাধিনায়কের এই শুভাগমন উপলক্ষেও একাডেমী ভবনে স্থানীয়

লেখক, সাহিত্যিক, শিল্পী ও শিক্ষাবিদগণের এক সম্মেলন আহূত হয়। একাডেমী-পরিচালক সমবেত সুধীবর্গ ও একাডেমীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং একাডেমীর কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণী পেশ প্রসঙ্গে ইহার আর্থিক অসচ্ছলতার কথা উল্লেখ করেন। অভিনন্দনের জবাবে প্রদত্ত রাষ্ট্রাধিনায়কের হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণে সম্মিলিত সুধীবৃন্দের মধ্যে এক অপূর্ব প্রেরণা ও উৎসাহের সৃষ্টি হয়।...

এই সম্মিলনে অজিতকুমার গুহ ও আবদুল গনি হাজারী আমন্ত্রিত হননি—যদিও তাঁরা মাত্র কয়েক মাস আগে একাডেমীর কর্মপরিষদের নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। পরে জেনেছিলাম, আমন্ত্রিতদের তালিকা থেকে তাঁদের নাম সরকারি গোয়েন্দা বিভাগ কেটে দেয়। গোয়েন্দারা নাম কেটে দেওয়ায় আরো দুজনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি : আলাউদ্দিন আল আজাদ ও ফয়েজ আহমদ—এঁরা উভয়েই ছিলেন বাংলা একাডেমীর সদস্য।

ওই চারজনই ছিলেন পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাই এই পরিস্থিতিতে সংসদের কাজকর্ম যে বিঘ্নিত হয়েছিল এবং পরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তা বিস্ময়কর ছিল না।

১০.

আমি যখন গবেষণায় প্রবৃত্ত হই, তখন মুহম্মদ আবদুল হাই আমাকে পই পই করে বলে দিয়েছিলেন যে, অভিসন্দর্ভ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি যেন গবেষণালব্ধ উপকরণ প্রকাশ না করি এবং চাকরি-বাকরির চেষ্টা না করি। পরে এই নিষেধাজ্ঞা তিনি নিজেই ভঙ্গ করেছিলেন।

প্রথমটি করেছিলেন বিভাগের গবেষণাপত্র *সাহিত্য পত্রিকার* জন্যে। *সাহিত্য পত্রিকা*-সম্পাদনা হাই সাহেবের জীবনের মহত্তম কাজ। তাই এর কথা একটু বিস্তারিত বললে হয়তো অসংগত হবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষতার দায়িত্ব নিয়ে মুহম্মদ আবদুল হাই প্রথমে দৃষ্টি দিয়েছিলেন ভালো শিক্ষক আনার এবং তারপর সংগঠিত গবেষণা-কার্যক্রম চালানোর। পিএইচ ডি-পর্যায়ে গবেষণার ব্যবস্থা করা ছিল দ্বিতীয় কর্মসূচির অন্তর্গত। এই ক্ষেত্রে বিভাগ থেকে একটা ষান্মাসিক গবেষণাপত্র-প্রকাশের পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসে। একটা সুযোগও তিনি পেয়ে যান। সোহ্‌রাওয়ার্দী-মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী জহিরউদ্দীনের সঙ্গে তাঁর বিলক্ষণ সৌহার্দ্য ছিল। তাঁকে ধরে তিনি বাংলা বিভাগের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অনুদান পাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এই অনুদানের উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল গবেষণা-বৃত্তিদান, গবেষণাপত্র-প্রকাশ এবং গবেষণামূলক গ্রন্থ-মুদ্রণ। এই ব্যবস্থায় নজরুল ইসলাম সম্পর্কে গবেষণার জন্যে রফিকুল ইসলাম প্রথম বৃত্তি পেয়েছিলেন। প্রথম প্রকাশনা ছিল আহমদ শরীফ-সম্পাদিত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সংগৃহীত *পুথি-পরিচিতি*।

১৯৫৭ সালে, বোধহয় আগস্ট মাসে, *সাহিত্য পত্রিকার* প্রথম সংখ্যা (বর্ষা ১৩৬৪) প্রকাশিত হয়। হাই সাহেব এর নাম ঠিক করেছিলেন *বাংলা সাহিত্য পত্রিকা* এবং এর মুদ্রণ-তত্ত্বাবধানের ভার দিয়েছিলেন রফিকুল ইসলামকে। রফিক খুব জোর করে ধরলেন পত্রিকার নাম থেকে *বাংলা* কথাটা বাদ দিতে, আমিও তাঁকে সমর্থন করেছিলাম। কাইয়ুম চৌধুরী প্রচ্ছদ এঁকে ফেলেছিলেন—তিন লাইনে তিনটি শব্দ, তারপর মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত এবং বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—ছেদ দিয়ে এমন দুটি লাইন। নতুন করে প্রচ্ছদ না এঁকে তিনি প্রথম লাইন বাদ দিয়ে কাজটা করে দিলেন। পত্রিকার সব লেখাই ছিল গবেষণাধর্মী, ব্যতিক্রম ছিল সম্পাদক-কৃত একটি কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা। আমার পরামর্শে এরপর থেকে পত্রিকায় শুধু গবেষণামূলক প্রবন্ধ ভুক্ত করতে এবং গবেষণামূলক গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশ করতে সংকল্প করেন তিনি। *সাহিত্য পত্রিকার* উচ্চ প্রশংসা করে পত্র দিয়েছিলেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অমলেন্দু বসু আর ইব্রাহীম খাঁ, আবদুর রহমান খাঁ, মুহম্মদ এনামুল হক ও মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ প্রমুখ বিদ্বজ্জন।

দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে *সাহিত্য পত্রিকা* দেখাশোনার ভার আমার ওপরে পড়ে। ততদিনে বাংলা একাডেমীর প্রথম প্রকাশনা বের হয়েছে—আহমদ শরীফ-সম্পাদিত দৌলত উজীর বাহরাম খানের *লায়লী-মজনু*। হাই সাহেব আমাকে বললেন তার একটা সমালোচনা লিখতে, যদিও উনিশ শতক-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে আমার প্রকৃত অধিকার ছিল না। আমার সমালোচনা তিনি খুঁটিয়ে পড়লেন এবং দ্বিতীয় সংখ্যার জন্যে তা ছাপতে দিলেন আমারই হাতে। পরবর্তী সংখ্যার জন্যে হাই সাহেব দাবি করলেন পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ। আমার গবেষণালব্ধ উপকরণ দিয়েই ফকির গরীবুল্লাহ্ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখলাম। এটি আমার প্রথম গবেষণামূলক প্রবন্ধ, তা প্রকাশিত হয় *সাহিত্য পত্রিকার* দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (বর্ষা ১৩৬৫)। এতে ব্যবহৃত পাদটীকা ও গ্রন্থপঞ্জির রীতি পরে বাংলার গবেষক অনেকেই গ্রহণ করেন। হাই সাহেব-সম্পাদিত চব্বিশ সংখ্যা *সাহিত্য পত্রিকার* মধ্যে আমার লেখা ছিল বারোটিতে—ছটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ এবং ছটি গ্রন্থ-পরিচয়। একটি গ্রন্থ-পরিচয় ছিল মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন-সম্পাদিত এবং আমাদের বিভাগ থেকে প্রকাশিত *হারামণি* পঞ্চম খণ্ডের। অনেকটা মনসুরউদ্দীনের প্রতি ক্ষোভবশত আমি তাঁর ভূমিকার—'বাউল সাধনা' নামে দীর্ঘ একটি প্রবন্ধের—অনেক ত্রুটি ও অসংগতি নির্দেশ করি। হাই সাহেব যে তা ছেপেছিলেন, তা ছিল তাঁর ঔদার্যের পরিচয়।

১৯৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে একদিন দুপুরবেলায় আমাদের বাড়িতে ফোন করে হাই সাহেব বললেন, শিক্ষকের অভাবে বিভাগে পাঠদান বিঘ্নিত হচ্ছে, আমি যেন অবিলম্বে চাকরির আবেদন করি। আমার খুব আনন্দ হলো, তবে টেলিফোনেই হাই সাহেবকে বললাম, বাংলা একাডেমীতে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত কাজ করতে আমি চুক্তিবদ্ধ। সুতরাং আমার নিয়োগ ফেব্রুয়ারির পয়লা থেকে হলে ভালো হয়। তিনি বললেন, এনামুল হক সাহেবের সঙ্গে তিনি কথা বলে রেখেছেন, কোনো অসুবিধে হবে না; ভাইস-চান্সেলর (বিচারপতি হামুদুর রহমান) তাঁর কথায় আমাকে অ্যাড হক

ভিত্তিতে নিয়োগদান করতে সম্মত হয়েছেন, সুতরাং আমি যেন তখনই বিভাগে গিয়ে দরখাস্ত করি।

একরকম নাচতে নাচতেই বিভাগে গেলাম। অধ্যক্ষ স্বস্থানে অধিষ্ঠিত, সামনের চেয়ারে আমাদের কোনো শিক্ষক বসে। আমাকে দেখে হাই সাহেব জানতে চাইলেন, 'চাকরি যে করতে চাও, গবেষণা ঠিকমতো চালিয়ে যেতে পারবে তো?' উনি যে একটু আগে ফোন করে ডেকে পাঠালেন আমাকে, ওঁর কথায় তার বিন্দুমাত্র আভাস ছিল না। আমি একটু ক্ষুণ্ন হলাম, হয়তো একটু অপমানিতও বোধ করলাম। কিন্তু তখন পালে বাতাস লেগেছে, তরি ঘোরাতে আর ইচ্ছে করলো না। বললাম, 'পারবো, সার্।' দরখাস্ত লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম, উনি হাত বাড়িয়ে সেটা নিলেন এবং বললেন, 'কাল সকালে এসে জয়েন কোরো, রুটিন কালই পেয়ে যাবে।' বাংলা একাডেমীর কথাটা মনে রেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'এনামুল হক সাহেবকে একটু বলে আসি, সার্?' উনি বললেন, 'আমি অবশ্য বলে রেখেছি; তবে তোমাকে একবার যেতে হবে, জানুয়ারির বাকি দিনগুলোর ছুটি চাইতে হবে।'

বাংলা একাডেমীতে গিয়ে এনামুল হক সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমার প্রতি অনুকূল ছিলেন—*বাংলা একাডেমী পত্রিকায়* আমার যে দু-তিনটি লেখা প্রকাশিত হয়, তা তাঁর অনুমোদনক্রমেই হয়েছিল। এখন বললাম, 'আপনি হয়তো জানেন, হাই সাহেব আমাকে ডিপার্টমেন্টে জয়েন করতে বলছেন, কালই। এদিকে একাডেমীর সঙ্গে আমার চুক্তি রয়েছে। এখন কী করি?' তিনি বললেন, 'কাল থেকে তেরো দিনের লিভ উইদাউট পে চেয়ে দরখাস্ত করো।' আমি তখনই দরখাস্ত লিখে এমদাদুর রহমানের সৌজন্যে টাইপ করিয়ে এনামুল হক সাহেবের কাছে নিয়ে গেলাম। উনি ভালো করে পড়ে তার ওপরে মন্তব্য রেখে নিজের কাছে রেখে দিলেন। আমাকে বললেন, 'তোমার নতুন জীবনের জন্য শুভেচ্ছা কামনা করি। কষ্ট করে হলেও, সময়মতো গবেষণা শেষ কোরো।'

১৯৫৯ সালের ১৯ জানুয়ারি আমি অ্যাড হক ভিত্তিতে বাংলা বিভাগে লেকচারারের পদে যোগ দিলাম। সাবসিডিয়ারির দুই বর্ষে তিনটি লেকচার আর অনার্সের প্রথম শ্রেণীর সবকটি গ্রুপ নিয়ে তেরোটি টিউটোরিয়াল ক্লাস। কী পোশাক পরে যাবো, তা নিয়ে চিন্তিত ছিলাম। আহমদের পরামর্শে শেরওয়ানি পরেই যেতে শুরু করলাম—তখন শীতকাল, দিল্লিতে যাওয়া-উপলক্ষে তৈরি কাপড়টা কাজে এলো।

বিভাগে যোগ দেওয়ার দিন দুই পরে নিয়োগপত্র পেলাম। তাতে লেখা গ্রীষ্মাবকাশের প্রথম দিন থেকে আমার চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। বিচলিত হয়ে হাই সাহেবের কাছে জানতে চাইলাম, তাহলে আমার কী হবে—চাকরিও হারাবো, বৃত্তিও পাবো না। উনি বললেন, 'ইউনিভার্সিটির রীতিই এই—গ্রীষ্মের ছুটি এবং ফার্স্ট টার্মে যখন ক্লাস কম থাকে, তখন অ্যাড হক অ্যাপয়েন্টিদের চাকরি থাকে না। হয়তো সেকেন্ড টার্মে আবার নিয়োগ পাবে।' আমি যে খুব আশ্বস্ত হলাম, তা নয়, তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হওয়ায় ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ দুর্ভাগ্য বলে মনে হলো না।

প্রথম শ্রেণীর অনার্সে যাঁদের পেয়েছিলাম (ছাত্রছাত্রীদের আমি অনেকদিন পর্যন্ত আপনি বলে সম্বোধন করেছি), তাঁদের মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মরহুম অধ্যাপক

দিলওয়ার হোসেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মরহুম অধ্যাপক মুহম্মদ শামসুল হক ও অধ্যাপক শামসুননাহার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক এ এইচ এম [হুমায়ুন] আবদুল হাই, গল্পকার জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, সংগীতশিল্পী সৈয়দ আবদুল হাদী, সাংবাদিক সৈয়দ আবদুল কাহহার, ক্যাডেট কলেজের শিক্ষক ও মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ শফিকউল্লাহ, সরকারি কলেজের শিক্ষক কাজী আমিন আহমদ ও নূরুন নাহার, অধ্যাপক ও সংস্কৃতিসেবী আসমা আব্বাসী (তখন চৌধুরী), প্রবাসী সালেহা চৌধুরী, বেসরকারি কলেজে অধ্যক্ষ সালেহ আহমদ, কনসার্নড উইমেন ফর ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের মোফাবেজা খানম পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। সাবসিডিয়ারি ক্লাসে পেয়েছিলাম কবি ও অবসরপ্রাপ্ত সচিব মনজুরে মওলা ও কবি, অবসরপ্রাপ্ত সচিব ও রাজনীতিক মোফাজ্জল করিমকে। সাবসিডিয়ারিতে প্রথম লেকচার-ক্লাসে পাঠ্যবিষয় ছিল নজরুলের *সঞ্চিতা*। বেশ বক্তৃতা দিচ্ছিলাম। হঠাৎ যখন দেখলাম যে ছাত্রছাত্রীদের কেউ কেউ আমার কথা শুনে নোট করছে, তখন বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো—ভুল কিছু বললে তো তাদের খাতায় তা স্থায়ী রূপ পেয়ে যাবে।

ওদিকে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার সুযোগদানের জন্যে এনামুল হককে এবং সময়ের আগে একাডেমী ছেড়ে দেওয়ার জন্যে আমাকে বাংলা একাডেমীর পরিষদ অভিযুক্ত করলেন। পরিচালকের বিরুদ্ধে তাঁরা আনলেন অনিয়মের অভিযোগ, গবেষকের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার। পরিচালকের কাজের নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হলো, আর সিদ্ধান্ত হলো আমার বর্তমান নিয়োগকর্তা অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়কে আমার প্রতিশ্রুতিভঙ্গের কথা জানাবার।

যেদিন এ-প্রস্তাব গৃহীত হয়, সেদিন রাতে পরিষদের সদস্য শাহেদ আলী এসে আমাকে সমুদয় বৃত্তান্ত জানালেন। তাঁর খুব অস্বস্তিবোধ হয়েছিল, কিন্তু দলের বিরুদ্ধে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। হয়তো আমি তাঁর স্ত্রীর সহপাঠী ছিলাম বলে, নিকট প্রতিবেশী ছিলাম বলে কিংবা তিনি অকারণেই আমাকে প্রীতির চোখে দেখতেন বলে অথবা ওই সিদ্ধান্ত সংগত হয়নি মনে করে ওই রাতে অত কষ্ট করে আমার বাড়ি বয়ে এসেছিলেন।

পরদিন হাই সাহেবের কাছে আবার বিষয়টা জানলাম। আমার জন্যে এনামুল হক অপদস্থ হলেন ভেবে আমার খুবই খারাপ লাগল।

পরিষদের সিদ্ধান্তমতো আমার খামখেয়ালিপনা সম্পর্কে খোদ ভাইস-চান্সেলরকে পত্র দেওয়া হয়েছিল। তিনি বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষকে ডেকে ব্যাপারটা জানতে চান। হাই সাহেব সবটা খুলে বলেন—বিভাগে শিক্ষকের প্রয়োজন হওয়ায় আমাকে ডেকে নেওয়ার কথা, বাংলা একাডেমীর পরিচালকের সঙ্গে আমার বিষয়ে পরামর্শের কথা, পরিচালকের সঙ্গে পরিষদের দীর্ঘকালীন বিরোধের কথা—সবই ভাইস-চান্সেলরের গোচরীভূত করেন। অবহিত হয়েছেন লিখে ভাইস-চান্সেলর ফাইল বন্ধ করে দেন।

জানুয়ারি মাসের যে-আঠারো দিনের বৃত্তি আমার পাওনা হয়েছিল, বাংলা একাডেমীতে তা আর আনতে যাইনি।

১১.

আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে ঢুকলাম, তখন নিয়োগলাভের একটা শর্ত ছিল চাকুরের অতীত রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে পুলিশের কাছ থেকে সন্তোষজনক রিপোর্টপ্রাপ্তি। আমার তো কদিনের চাকরি, তা-ও পুলিশ-রিপোর্ট চাই। আমাদের বাসায় এসে গোয়েন্দা বিভাগের এক কর্মচারী বললেন, আমি যেন পরদিন লালবাগে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে যাই, কারণ আমার সম্পর্কে তাঁদের কিছু জিজ্ঞাসা আছে। আমি বললাম, 'জিজ্ঞাসা যখন আপনারাই করতে চান, তখন আপনারা কেন কষ্ট করে আসেন না আমার বাসায়!' ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন, 'অফিসের ফাইলপত্র নিয়ে অত সহজে বাইরে আসা যায় না। তাছাড়া আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন যে, আপনার চাকরি রাখতে হলে আমাদের রিপোর্টের দরকার; কিন্তু যেটা বুঝতে পারছেন না, তা হলো, প্রয়োজনে আমাদের অফিসে আমরা আপনাকে যেতে বলতে পারি।' এরপর আর বাক্‌বিস্তার অপ্রয়োজনীয়।

পরদিন সকালে লালবাগে গেলাম। যিনি আমাকে প্রশ্ন করবেন তাঁর নাম জানা ছিল না, তবু তাঁকে খুঁজে বের করতে তেমন অসুবিধে হলো না। তিনি, দেখা গেল, আমার স্বল্পপরিচিত। পুলিশ ইনস্পেক্টর আমজাদ আলী, ড. শহীদুল্লাহ্ তাঁর খালু, আমাদের পরিবারের অনেককেই তিনি চেনেন। তিনি বললেন, 'আপনি বরঞ্চ খেয়েদেয়ে আসুন।' আমি জানালাম, দেরিতে খেতে আমার অসুবিধে নেই। তিনি হেসে বললেন, 'খেয়েই আসুন, আমাদের বোধহয় অনেকক্ষণ লাগবে।'

আগের দিন থেকে জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়ে যেমন একটা নির্লিপ্ততার ভাব ছিল, সেটা এখন উবে গেল। খেয়েদেয়ে এলাম বটে, কিন্তু এলাম অস্বস্তি নিয়েও। আমজাদ সাহেব বেশ মোটা একটা ফাইল খুলে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন—প্রথমে আমার শিক্ষাজীবন সম্পর্কে, তারপর যুবলীগের সঙ্গে আমার সংস্রব, ভাষা-আন্দোলনের সঙ্গে আমার সংশ্লিষ্টতা এবং যুবলীগ ছেড়ে দেওয়ার কারণ। সবই ঠিকঠাক বললাম; যুবলীগ ছাড়ার কারণ হিসেবে বললাম, পড়াশোনার খাতিরে। তিনি জানতে চাইলেন, যুবলীগ ছাড়ায় সংগঠনের কেউ আমাকে কিছু বললেন না? আমি বললাম, 'হ্যাঁ, ইমাদুল্লাহ্ বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।' ইমাদুল্লাহ্‌র নাম আগেও দু-একবার এসেছিল। আমজাদ সাহেব বললেন, 'আপনি তো দেখছি মৃত ব্যক্তির নাম করে অন্যদের আড়াল করতে চান।' এমন কাজ আমার দ্বারা কিছুতেই সম্ভবপর নয়—এ কথা বলায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এমন তো হতে পারে যে, অন্য কোনো জায়গা থেকে আপনাকে যুবলীগ ছেড়ে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের কাজ করতে বলা হয়েছিল?' আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, 'বাহ্, তা কেন হবে? সাহিত্যের দিকে ঝুঁকলাম বলে সাহিত্য সংসদে গেলাম, আর পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছিল বলে আব্বা বকাবকি করছিলেন, তাই যুবলীগ ছাড়লাম।'

আমজাদ সাহেব একটা নাম করে জানতে চাইলেন, আমি তাঁকে চিনি কিনা। না-সূচক উত্তর দেওয়ায় তিনি বললেন, 'আপনি তাঁকে নিশ্চয় চেনেন, হয়তো অন্য নামে চেনেন, তাঁর সঙ্গে আপনাকে পথে দেখা গেছে বলে আমরা জানি।' তাঁর কণ্ঠস্বর কিছু কঠিন হয়েছে, এটা বুঝতে আমার দেরি হলো না। তিনি বললেন, 'আমরা

আপনাকে সাহায্য করতে চাইছি—আপনি সব কথা এভাবে এড়িয়ে গেলে আমাদের পক্ষে সাহায্য করা সম্ভব হবে না। আচ্ছা, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আপনার সম্পর্কের বিষয়ে বলুন। আপনি বলে যান, দরকার হলে আমি পরে প্রশ্ন করবো।' এবারে আমি সত্যি সত্যি বিপদে পড়লাম—আমি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করতে পারিনি, সদস্যপদ-প্রার্থী (পার্টির পরিভাষায় ক্যান্ডিডেট মেম্বার) পর্যন্ত হতে পেরেছিলাম, কিন্তু তা স্বীকার করার ক্ষেত্র নিশ্চয় গোয়েন্দা দপ্তর নয়। বুকের মধ্যে দুর দুরু করতে লাগল, তবু যথাসম্ভব নিরুদ্বিগ্নভাবে বললাম, 'দেখুন, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তো আমার কোনো সম্পর্ক হয় নি, তবে অনেক কমিউনিস্টের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে।' উনি কোনো প্রশ্ন করলেন না, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন আমার দিকে। আমি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে থাকলাম এবং নিজের থেকেই বলে গেলাম, 'যেমন মীর্জা সামাদ—তাঁর স্ত্রী লায়লা সামাদের সঙ্গে আমাদের অনেকদিনের যোগাযোগ। তাঁর আব্বা খান বাহাদুর আমিনুল হক—ডোডো মিয়া—তাঁর সঙ্গে আমার আব্বার জানাশোনা তো সেই কলকাতা থেকে। লায়লা আপার স্বামী হিসেবে সামাদ ভাইকে চিনি। তারপর ধরুন এ এন এম শহীদুল্লা—তাঁর ছোটো ভাই জহির রায়হান—সে খুব ভালো লেখে আর আমাদের বিভাগেরই ছাত্র—তার সূত্রে শহীদুল্লা ভাইকে চিনি, তাঁর বিয়েও খেয়েছি। কিংবা সাদেক খান—শিল্পী আমিনুল ইসলামের বন্ধু-তিনি যখন যক্ষ্মারোগাক্রান্ত, তখন আমিনুল একদিন তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই থেকে পরিচয়। যেমন, সত্যেন সেন—জেলে থাকতে হোমিওপ্যাথি সম্পর্কে পড়াশোনা শুরু করেছিলেন, জেল থেকে বেরিয়ে আব্বার চেম্বারে বসে থাকতেন—স্রেফ হোমিওপ্যাথি-চর্চার জন্যে। সেইভাবে তাঁকে চিনি। আমি সত্যেন সেনের *মহাবিদ্রোহের কাহিনী* রিভিউ করেছি *সমকালে*। রণেশ দাশগুপ্ত *সংবাদে* ছিলেন, সাহিত্যিক মানুষ, খুব স্নেহ করেন আমাকে।'

আমি থামলাম। আমজাদ সাহেব একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। কোনো কথা বলছেন না। ঘরে অস্বস্তিকর নীরবতা। আমি চেষ্টা করছি আমজাদ সাহেবের চোখে চোখ রাখতে, কিন্তু বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারছি না। সেই নীরবতা ভাঙলো আরেকজনের প্রবেশে।

আমজাদ সাহেব একটু উঠে আবার চেয়ারে বসলেন। আগন্তুক তাঁর চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেলেন, খোলা ফাইলের দিকে কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে মাথা তুললেন। আমজাদ সাহেব তাঁকে বললেন, 'ভালো ছাত্র, স্যার্, কিন্তু কো-অপারেট করছেন না।' আমার দিকে ফিরে স্যারের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'এঁকে চেনেন? ইনিও একজন নামকরা সাহিত্যিক।' চিনি না, সুতরাং চুপ করে থাকলাম।

আমজাদ সাহেব বললেন, 'আবদুল হাফিজ—অনেক বই অনুবাদ করেছেন।' আমি বললাম, 'ওঁর অনুবাদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।' হাফিজ সাহেব খুব ভদ্রভাবে বললেন, 'আপনি ভালো ছাত্র—ইউনিভার্সিটিতে আপনার কেরিয়ার নষ্ট হয়, আমরা তা চাই না। এই ফাইলে আপনার সম্পর্কে অনেক রিপোর্ট আছে। তার কিছু ভুল হতে পারে—কিন্তু বাকিটা তো সত্যি। আপনার পোলিটিকাল লিংকস অ্যাডমিট করুন—আমরা যতোটা পারি, আপনাকে বাঁচাতে চেষ্টা করবো।' এমন নরম কথাই দুর্বল করে

বেশি। আমার চোখের পর্দায় অনেক মুখ, নানান ঘটনা এবং কোনো কোনো গোপন সভার দৃশ্য দ্রুত উঠে মিলিয়ে গেল। যথাসাধ্য জোর দিয়ে বললাম, 'আমি যতটা পারছি, বলছি; কিন্তু যা জানি না, তা কী করে বলবো?'

আবদুল হাফিজ চলে এলেন। জানালার বাইরে বিকেল পড়ন্ত। ঘরে দু-একটা বাতি জ্বললো। আমজাদ সাহেব ফাইল বন্ধ করলেন। কিন্তু তারপরও প্রশ্ন চললো, তবে তাঁর কণ্ঠস্বরের কঠোরতা অনেকখানি দূর হয়েছে। এক সময়ে জিজ্ঞাসাবাদের পালা শেষ হলো। আমি যখন বেরিয়ে এলাম, বাইরে তখন আলো-অন্ধকারের সন্ধি। আমার মনের মধ্যেও তাই।

পরে বুঝতে পেরেছিলাম, হাফিজ সাহেব ও আমজাদ সাহেব মিলে যথাসম্ভব আমার আনুকূল্য করেছিলেন। কারণ, আমার সেই অ্যাড-হক অ্যাপয়েন্টমেন্ট যদিও বা শেষ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আবার নিয়োগ পেতে বাধা হয়নি। সেই আনুকূল্য যে কতদূর ছিল, তা বিশেষ করে উপলব্ধি করেছিলাম, পরে যখন প্রতিকূল পুলিশ রিপোর্টের দরুন বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষকের চাকরি চলে গেল।

প্রথমে কর্মচ্যুত হন মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন—তিনি আমার অল্পকাল পরে ইতিহাস বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন। খবরটা তিনি পান অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে—সেটা বিবৃত করার যোগ্য।

সামরিক শাসন জারি হওয়ার পরে পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্যে প্রেসিডেন্টস অ্যাওয়ার্ড প্রবর্তিত হয়—তার অর্থমূল্য ছিল বেশ ভালো। ১৯৫৮ সালে এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী লাভ করায় পুরস্কারটি তাঁর প্রাপ্য হয়—নিজের পুরস্কারলাভের পত্রটি আনতে তিনি যান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার ইমামউদ্দীন পাটোয়ারীর কাছে (তাঁর পুত্র মোসলেহউদ্দীন সংগীতশিল্পী হিসেবে এবং কন্যা—আমার সহপাঠী—জহরত আরা চলচ্চিত্রশিল্পী হিসেবে যশস্বী হয়েছিলেন)। সিরাজের সঙ্গে ছিলেন তাঁর শিক্ষক ড. আবদুল করিম (তখন সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলে তাঁরই হাউজ টিউটরের কোয়ার্টারে সিরাজ থাকতেন)। পাটোয়ারী সাহেব সানন্দে চিঠিটা সিরাজউদ্দীনকে দিলেন এবং তিনিও উৎফুল্লচিত্তে তা গ্রহণ করে ফিরে আসার উপক্রম করলেন। পাটোয়ারী সাহেব তাঁকে ডাকলেন এবং হঠাৎ করে কান্নায় ভেঙে পড়ে সিরাজউদ্দীনকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর হাতে আরেকটা চিঠি ধরিয়ে দিলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব সিরাজুদ্দীন চিঠি পড়ে আক্ষরিক অর্থে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তখন ড. করিম সেই চিঠিটা পড়লেন এবং তিনিও কাঁদতে কাঁদতে সিরাজকে জড়িয়ে ধরলেন।

এরপর চাকরি হারায় বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। সে ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র—সদ্যপ্রতিষ্ঠিত সমাজতত্ত্ব (এখন সমাজবিজ্ঞান) বিভাগে সে যোগ দিয়েছিল আমার কিছু আগে।

সবশেষে আজিজুর রহমান খান ও এ আই আমিনুল ইসলামের পালা। এঁদের দুজনেরই ছাত্রজীবন ছিল অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ। দুজনেই ১৯৫৯ সালে এম এ পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এই চারজনের মধ্যে আজিজুর রহমান খানের রাজনৈতিক সংযোগ হয়তো ছিল

গভীরতর—আমার থেকে বেশি তো বটেই। তবে সিরাজুদ্দীন আমাকে বলেছিলেন, 'আপনি বেঁচে গেলেন।'

পরবর্তীকালে সিরাজুদ্দীন পাকিস্তানের সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন—প্রতিকূল পুলিশ-রিপোর্ট তার বাধা হয় নি। বাংলাদেশ সরকারের সচিব হিসেবে অবসর নিয়ে তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ হন এবং আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। অন্য কর্ম থেকে অব্যাহতি নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে—সেখান থেকে ছুটি নিয়ে তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্যপদে অধিষ্ঠিত হন এবং আওয়ামী লীগের নির্বাচন-পরিচালনা দলের সদস্যের দায়িত্ব পালন করেন। আজিজুর রহমান খান ও আমিনুল ইসলাম তখন করাচির পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটে গবেষক হয়ে যোগ দেন। লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সে শিক্ষকতা ছেড়ে আজিজ এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক। আমিনুল ইসলাম এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের পরিচালক ও অন্যান্য পদে দীর্ঘকাল বিদেশে কাটিয়ে দেশে ফেরেন এবং সোনালী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব থেকে অবসর নেওয়ার পর মৃত্যুবরণ করেন।

১২.

১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে—বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার নিযুক্তির প্রথম পর্ব শেষ করে, বেকার অবস্থায়—আমি কলকাতায় গেলাম আমার গবেষণার উপকরণ সংগ্রহ করতে। তার আগে অধ্যাপক অজিতকুমার গুহের ইচ্ছায় নিউ এজ পাবলিশার্স নামে ঢাকার এক প্রকাশকের জন্যে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যবই তৈরি করে দিয়েছিলাম। পরে জানা গেল যে, সে-বছর থেকে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নিজেরাই পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করবেন—বাইরের প্রকাশকের বই নেবেন না। আমার প্রকাশক আমাকে কিছু অগ্রিম দিয়েছিলেন এবং আমাব প্রয়োজনের কথা জেনে কলকাতায় কিছু টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তবু ওই মূলধন নিয়ে কলকাতায় হোটেলে থেকে কাজ করা সম্ভবপর ছিল না। অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক বললেন, আমার থাকার ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন।

সামরিক শাসন জারি হওয়ার পরে রাজ্জাক সাহেব ফিরে আসেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফলে দেখা হয় ঘন ঘন, কিছুকাল তো কমনরুমে একসঙ্গে ওঠাবসা করলাম। আমার বন্ধু, ইতিহাসের শিক্ষক গিয়াসউদ্দিন, তাঁর দাবা খেলার সঙ্গী। কমনরুমেই কাজী মোতাহার হোসেন আসেন ওঁর সঙ্গে দাবা খেলতে, কখনো কখনো আর কেউ। কন্‌ট্রাক্ট ব্রিজ খেলার একটা দলও ছিল তাঁর। দিনে কমনরুমে বসে রাজ্জাক সাহেবকে দেখি বিশালাকার *হিস্ট্রি অফ দি মংগলসের* প্রথম খণ্ড কিংবা হুইসিংগার *দি ওয়েনিং অফ দি মিডল এজেস* পড়ছেন, সেদিনই বিকেলে বাড়ি বসে পড়ছেন আগাথা ক্রিস্টির ক্রাইম-নভেল কিংবা দাবা খেলার বা রান্নার কোনো বই। আমি জিজ্ঞেস করি, একটা বই শেষ

না করে আরেকটা বই কেমন করে পড়েন তিনি। উনি হাসেন, জবাব দেন না।

হঠাৎ শোনা গেল, রাজ্জাক সাহেব হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছেন কয়েক মাসের জন্যে এবং যেখানে বসে সামরিক শাসন সম্পর্কে লেখাপড়া করবেন। আমাকে বললেন, আমেরিকা যাওয়ার পথে তিনি দু-একদিন কলকাতায় থেকে যাবেন। তখন আমাদের ডেপুটি হাইকমিশনের সেকেন্ড সেক্রেটারি এনায়েত করিমকে বলে যাবেন, তাঁর বাসায় আমাকে ঠাঁই দিতে। আমি বলি, আপনার চিঠির অপেক্ষায় থাকবো। উনি জানান, এনায়েত করিমের নিতান্ত অসুবিধে থাকলে চিঠি লিখে সেকথা আমাকে জানাবেন; চিঠি না পেলে আমি যেন বুঝি ব্যবস্থা ঠিক আছে। আমি বলি, 'সার্, চিঠি তো ডাকে হারিয়েও যেতে পারে।' উনি আমার কথা গ্রাহ্য করেন না, একটা চিরকুটে এনায়েত করিমের ঠিকানা লিখে আমার হাতে দিয়ে বই পড়তে বসেন।

রাজ্জাক সাহেবের চিঠি এলো না। তবু জানা নেই, শোনা নেই, স্থিরনিশ্চয়তা নেই—কোনো ভদ্রলোকের বাড়িতে মালপত্র নিয়ে কেমন করে উঠি? প্লেনে এক ভদ্রলোককে পেলাম—তিনি কংগ্রেস একজিবিশন রোডে থাকেন, আব্বাকে ভালো করে চেনেন। তাঁর বাসায় স্যুটকেস রেখে থিয়েটার রোডে এনায়েত করিমের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, 'সার্ তো আমাকে আপনার কথা বলে গেছেন, কিন্তু আপনার লাগেজ কই?'

লাগেজ নিয়ে এলাম, তারপর নিউ এজের দেওয়া ঠিকানায় গিয়ে টাকা সংগ্রহ করলাম। পরদিন সকালে বের হবো, এনায়েত করিম বললেন, 'ব্রেকফাস্ট না করে চললেন কোথায়?' আমি খোলাখুলি বললাম, 'আমি আপনার এখানে থাকবো, খাবো বাইরে।' উনি এবং ওঁর স্ত্রী হোসনা (দেখা গেল, তিনিও এককালে কংগ্রেস একজিবিশন রোডের দাস-ভবনে থাকতেন; তিনি আমার আব্বা ও বড়ো বোনকে চিনলেন, তাঁর আব্বার কথাও আমার মনে পড়লো) প্রবল আপত্তি করে বললেন, 'না, কাজের অসুবিধে না হলে আপনি এখানেই খাবেন।' কলকাতায় যে-দেড় মাস ছিলাম, ওঁদের অপরিসীম যত্নে থেকেছি; সাধারণ ছুটির দিন ছাড়া অবশ্য দু-বেলা খেয়েছি বাইরে। ঘরে থাকতাম অল্প সময়ের জন্যে, তখন ওঁদের কন্যা লুনা—মানসিকভাবে প্রতিবন্ধকতার লক্ষণ তার তখনই দেখা দিয়েছিল—খেলতে আসতো আমার ঘরে, তার আকর্ষণ ছিল আমার বৃত্তির টাকা দিয়ে কেনা ঘড়ির দিকে।

হাই সাহেব চিঠি লিখে দিয়েছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার সেনের কাছে। সুনীতিকুমার বললেন, 'শহীদুল্লাহ্ সাহেবের বাংলা ভাষার ইতিহাস নাকি তোমাদের ওখানে বেরিয়েছে! আমি *ODBL* (ওঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি *The Origin and Development of the Bengali Language*) রিভাইজ করব, তার আগে তো ওঁর বইটা আমার দেখা দরকার।' বললাম, আমাদের *সাহিত্য পত্রিকায়* বেরিয়েছে তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত', এখনো বই হয়ে বের হয়নি। *সাহিত্য পত্রিকা* তো আপনাকে পাঠাবার কথা; আপনি যখন পাননি, ফিরে গিয়ে আমি আবার পাঠিয়ে দেবো।' সুনীতিবাবুর কাছে ক্রমাগত লোক আসে—আগে থেকে বলে-কয়ে কিংবা না জানিয়ে, তাঁদের নানা জিজ্ঞাসা, নানা আবদার। তিনি বিরক্ত হন না, এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে অবলীলায় তাঁর জ্ঞানের পরিচয় দেন। এমন কী, আমাকেও বলেন আরেকদিন যেতে।

সুকুমার সেন চিঠি লিখে দিলেন ন্যাশনাল লাইব্রেরি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে—তাতে ওই দুই গ্রন্থাগার ব্যবহার করার সুবিধে হলো। তাঁর কাছে খোঁজ করেছিলাম বর্ধমান সাহিত্যসভা-প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের একটি পুস্তিকা। তিনি বললেন আরেকদিন যেতে—সেটা খুঁজে রাখবেন। আরেকদিন গেলাম। বললেন, খুঁজে পাননি, তবে আমি ঠিকানা রেখে গেলে বর্ধমান থেকে আনিয়ে সেটা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। ঠিকানা দিলাম বটে, কিন্তু পাওয়ার আশা করলাম না। এত বড় মানুষ, আমার কথা মনে রাখা কি সম্ভব হবে তাঁর পক্ষে? ঢাকায় ফিরে আসবার পর সত্যিই পুস্তিকাটি ডাকে পেয়েছিলাম—ওঁর নিজের হাতে আমার নাম-ঠিকানা লেখা। আমি বিস্মিত ও কৃতজ্ঞ।

রোজ সকালে এনায়েত করিমের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যেতাম। আমার মধ্যাহ্নভোজ ছিল সেখানকার ক্যান্টিনের সিঙ্গাড়া ও রসগোল্লা। সেখান থেকে আড়াইটা-তিনটার দিকে বেরিয়ে যেতাম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে—ওখানে তিনটের সময়ে লাইব্রেরি ও অফিস খুলতো। কোনোদিন সেখান থেকে বেরিয়ে চৈতন্য লাইব্রেরিতে যেতাম কিংবা যেতাম অন্য কোথাও। এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে বসে কাজ করেছি, নজরুল পাঠাগারেও বই খুঁজতে গেছি। রাতে বাইরে কোথাও খেয়ে ঘরে ফিরতাম—তবে ভাত নয়, খেতাম রুটি বা পরোটা। ইচ্ছে করেই একটু দেরিতে ফিরতাম যাতে গৃহকর্তা-কর্ত্রীর একান্ততা বা বন্ধুসমাগমে বিঘ্ন না ঘটে। অসুবিধে না ঘটিয়ে দেখা করেছিলাম কাজী আবদুল ওদুদ, মোহাম্মদ আফজাল-উল্ হক, আশুতোষ ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও গোপাল হালদারের সঙ্গে, হয়তো আরো কারো কারো সঙ্গে। দেখা করতে চেয়েছিলাম কমরেড মুজফ্ফর আহ্‌মদের সঙ্গেও—সুভাষ মুখোপাধ্যায় তার ব্যবস্থাও করেছিলেন, কিন্তু এনায়েত করিম নিষেধ করলেন। বললেন, তাঁর ওপর পাকিস্তানি চরদেরও চোখ থাকে, সামরিক শাসনের কালে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করতে না যাওয়াই সংগত।

এনায়েত করিমদের বাড়িতে থাকতে ঢাকা থেকে গেলেন চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট এম এম রহমান, তাঁর স্ত্রী—সরকারি কলেজের বাংলার শিক্ষক—রওশন আরা রহমান ও তাঁদের শিশুপত্র—এখনকার বিখ্যাত চক্ষু-বিশেষজ্ঞ—নিয়াজ রহমান। বস্তুত নিয়াজের কানে অস্ত্রোপচারের উদ্দেশ্যেই ওঁরা কলকাতায় গিয়েছিলেন। করিমদের অতিথি-কক্ষ একটাই, তবু গৃহকর্তা-কর্ত্রীর যত্নে এবং অভ্যাগতদের সৌজন্যে আমার থাকতে কোনো অসুবিধে হলো না। অন্য বাড়িতে উঠলেও করিমদের বাসস্থানে কয়েকদিন বেড়াতে এলেন রাজিয়া খান—তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির শিক্ষক। তাঁর মেজো বোন কুলসুম হুদা ও হোসনা করিম দীর্ঘকালের বন্ধু। রাজিয়ার একটা অসুবিধে হওয়ায় তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলাম ডা. আলী ইমামের কাছে—ইতিহাসের প্রখ্যাত অধ্যাপক আবু ইমামের অগ্রজ তিনি, সেই সূত্রেই পরিচয়। তিনি রাজিয়ার চিকিৎসা করেছিলেন, ফিস নেননি। তাতে আমি একটু অপ্রস্তুত বোধ করেছিলাম। তবে রাজিয়া একদিন আমাকে আরো অপ্রস্তুত করেছিলেন। তাঁকে নিয়ে যেতে হয়েছিল তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে। ভেতরে ঢোকার পূর্ব মুহূর্তে তিনি আদেশ করলেন আমি যেন সে-বাসায় তাঁর আত্মীয় বলে পরিচয় দিই। কেমন আত্মীয় জানতে চাইলে কী বলবো ভেবে আমি অস্থির, তবে শেষ পর্যন্ত সে-রকম

পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। রিকশায় ফেরার পথে যখন রাজিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে অমন বিপদে ফেললেন কেন, তিনি জানতে চাইলেন, একজন অবিবাহিত ও অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে একজন অবিবাহিতা তরুণীকে দেখলে অন্যেরা কী ভাবতে পারে, তা কি আমি বুঝি না?

আমি অবশ্য তখন একজন অনাত্মীয় তরুণীকে পত্র লিখেছিলাম ঢাকায়—আমার কলকাতার ঠিকানা এবং আরো কিছু জানিয়ে। তার কথামতো কলকাতা-সফরে আসা তার ছোটো ভাই আজিজুল ওয়াহাবকে আমার ঠিকানা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম তার ফুফুর বাড়িতে। কেবল ডাকে দেওয়ার সময়ে একজনের চিঠি আরেকজনের নাম-লেখা খামে ভরে দিই। বেবীর চিঠি পেয়ে আজিজের কাছ থেকে ভুল পত্রটা উদ্ধার করলাম। চিঠিটা নিশ্চয় আজিজ পড়েছিল এবং আমার ঠিকানা জেনেও তা ফেরত দিতে বোধহয় সংকোচবোধ করেছিল।

চিঠি দিয়েছিলাম মুহম্মদ আবদুল হাইকেও—আমার কাজের অগ্রগতি জানিয়ে আর একটা অনুরোধ করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখলাম অনেক অবৈতনিক শিক্ষক আছেন। হাই সাহেবকে লিখলাম, ছুটির পরে বিশ্ববিদ্যালয় যখন খুলবে, তখন কি আমাকে অনুরূপ অবৈতনিক শিক্ষক নিযুক্ত করা যায়?

ঢাকায় ফিরে আহসান হাবীবের কাছে শুনেছিলাম, এই প্রস্তাবে হাই সাহেব রুষ্ট হয়েছিলেন এবং এখনকার ছেলেদের মতিগতি সম্পর্কে যে-মন্তব্য করেছিলেন, তা শ্লাঘায় নয়।

১৩.

সামরিক শাসন জারি হওয়ার কিছুকাল পরে—১৯৫৯ সালের গোড়ায়—কেন্দ্রীয় শিক্ষা-সচিব কুদরত-উল্লাহ্ শাহাব পাকিস্তানের লেখকদের সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন। কুদরত-উল্লাহ্ শাহাব আই সি এস ক্যাডারের সদস্য ছিলেন, তবে ছোটো গল্পকার হিসেবে উর্দু সাহিত্যে ছিলেন প্রতিষ্ঠিত। তিনি এককালে ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের সদস্য ছিলেন। আমার ধারণা, এই উদ্যোগের অন্তরালে তথ্য সচিব আলতাফ গওহরেরও কিছু ভূমিকা ছিল। এই উদ্যোগের প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র। কেউ মনে করেছিলেন, এটা হলো সরকারের ছত্রছায়ায় সাহিত্যিকদের সমবেত করার চেষ্টা; কেউ মনে করেছিলেন, এই সুযোগে দেশের লেখকদের জন্যে কিছু সুবিধে আদায় করে নেওয়া যাবে এবং দেশের প্রকাশনা ও মুদ্রণ-শিল্পের উন্নয়ন ঘটবে। করাচিতে পাকিস্তান লেখক সম্মেলন-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয় এবং ড. মুহম্মদ এনামুল হককে নিয়োগ করা হয় পূর্ব পাকিস্তানে ওই সম্মেলনের প্রস্তুতির সমন্বয়কারী। ড. হক আনন্দ ও যত্নের সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। উদ্যোক্তারা কাউকে কাউকে চেয়েছিলেন, করাচি যাওয়ার ব্যাপারে অন্যেরাও যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। সম্মেলনে এ-অঞ্চলের প্রতিনিধিদের মধ্যে ইব্রাহিম খাঁ, জসীমউদ্‌দীন, কাজী মোতাহার হোসেন, গোলাম মোস্তফা, মাহবুব-উল-আলম, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন,

মঈনুদ্দীন, আবুল ফজল, আবদুল কাদির, বেনজীর আহমদ ছিলেন; ছিলেন শামসুননাহার মাহমুদ, সুফিয়া কামাল, মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, নূরুল মোমেন; আরো ছিলেন আবুল হোসেন, আবু রুশ্‌দ, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, শওকত ওসমান ও আবদুল্লাহ্ আল মুতী। করাচি থেকে যোগ দিয়েছিলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্।

প্রেসিডেন্ট আইউব খান তাঁর বক্তৃতায় ভোলতেয়ারকে উদ্‌ধৃত করে বলেছিলেন যে, কোনো লেখকের সঙ্গে তাঁর মতদ্বৈধ হতে পারে, তবে সেই লেখকের মতামত-প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে তিনি এসে দাঁড়াবেন। এটি বেশ উৎসাহব্যঞ্জক বাক্য ছিল। তবে সম্মেলনে জোর পড়েছিল পাকিস্তানি ভাবাদর্শের প্রতি লেখককুলের আনুগত্যের আবশ্যকতার ওপরে। সকলকে রুশ-ভারতের সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্পর্কেই মূলত সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল, যদিও তার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নামও যুক্ত করা হয়েছিল—নইলে বক্তব্যটা বেআব্রু হয়ে পড়ে। এই সম্মেলনের শেষে পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড—বাংলায় পাকিস্তান লেখক সংঘ—গঠিত হয় এবং দুই অঞ্চলে তার দুটি আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়।

লেখক সংঘের পূর্ব পাকিস্তান শাখার সম্পাদক হলেন কাজী মোতাহার হোসেন। কাজী সাহেবকে আমরা সবসময়ে সভাপতিস্থানীয় গণ্য করে এসেছি—তিনি সম্পাদক হওয়ায় একটু বিসদৃশ লাগলো বই কি। এই শাখার উদ্‌যোগে গোলাম মোস্তফার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রিকা *পূরবী*। হাই সাহেব ছিলেন এর সহ-সম্পাদক, তবে অচিরেই তিনি এ-দায়িত্ব ছেড়ে দেন। ড. এনামুল হকও প্রাদেশিক কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। এই ধরনের চাপা অসন্তোষের মুখে পত্রিকা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে এক বৈঠক আহ্বান করা হয়। তাতে ফররুখ আহমদ ও আমি প্রথমবার যোগ দিই। *লেখক সংঘ পত্রিকা* নাম দিয়ে নতুন মাসিক পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত হলো, গোলাম মোস্তফাই সম্পাদক রইলেন। এক বছর পর এটিই *পরিক্রম* নাম গ্রহণ করে প্রথমে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও রফিকুল ইসলামের যৌথ সম্পাদনায় এবং পরে কেবল সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশ পেতে থাকে।

লেখক সংঘের প্রথম যে-নির্বাচন হয় ঢাকায় তাতে মুনীর চৌধুরী হেরে গিয়েছিলেন। পরে অবশ্য তিনি লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখার সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রাদেশিক লেখক সংঘের একটা জমকালো সম্মেলন হয়েছিল ঢাকায়, ইনজিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট (পরে ইনজিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন) মিলনায়তনে। তাতে প্রধান বা বিশেষ অতিথি হয়ে এসেছিলেন আলহাজ্ জহির-আল-দীন ওরফে লাল মিয়া। তিনি এককালে কংগ্রেসে ছিলেন, এখন সামরিক সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর লেবাস ছিল পাকিস্তানি আদর্শের প্রতীক। তাঁর নবীনা স্ত্রীও যে-পোশাকে সম্মেলনে এসেছিলেন, তাও ছিল বেশ পশ্চিম পাকিস্তানি—তাতে তিনি সহজে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

১৪.

অবকাশের পর বিশ্ববিদ্যালয় যখন খুললো, আমি একটু লজ্জিতভাবেই সেখানে আসা-যাওয়া করতে লাগলাম। ছাত্রছাত্রীরা সব নতুন ক্লাসে উঠেছে। দেখা হলে সাগ্রহে জানতে চায়, তাদের ক্লাস নেবো কি না। যখন বলি, আমি আর এখন শিক্ষকই নই, তখন তারা বেশি অপ্রস্তুত হয়, না আমি, তা বলা মুশকিল। শিক্ষকদের কমনরুমে যাই কখনো গিয়াসুদ্দিনের সঙ্গে গল্প করতে, কিন্তু সেখানকার সুযোগ-সুবিধে ব্যবহারের অধিকার যে হারিয়েছি, এই সত্য পদে পদে খোঁচা দেয়।

জুলাই মাসের প্রথম থেকে মুহম্মদ আবদুল হাই আমাকে জুটিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের গবেষণা-বৃত্তি—মাসে দু শ কী আড়াই শ টাকা। শিক্ষক হিসেবে পেতাম তিন শ টাকা বেতন আর তিরিশ টাকার মহার্ঘ ভাতা। মাসোহারা কমলো বটে, তবে এপ্রিলের শেষ থেকে জুনের শেষ পর্যন্ত যে একেবারেই বেকার ছিলাম, সে-দুরবস্থা ঘুচলো।

সেপ্টেম্বর মাসের দিকে বোঝা গেল, ব্রজেন্দ্রকুমার দেবনাথ ছুটি থেকে আর ফিরে আসছেন না। তখন আবার আমাকেই ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো হতে হলো। সেপ্টেম্বরের শেষে কিংবা অক্টোবরের গোড়ায় আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলাম শিক্ষক হিসেবে। আমাকে যুক্ত করা হলো ঢাকা হলের সঙ্গে। হাউজ টিউটর না হলেও শিক্ষকদের কোনো না কোনো হলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়। থাকতে হয় এখনো, তবে তখন কাজও কিছু করতে হতো। গণিত বিভাগের রিডার ড. মুশফিকুর রহমান ছিলেন ঢাকা হলের প্রোভোস্ট। হলের বার্ষিক ভোজে একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চান্সেলর ড. মাহমুদ হাসানকে—তিনি তখন পূর্ব পাকিস্তান সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য—প্রধান অতিথি করে নিয়ে আসা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় ছাত্রদের গুঞ্জন কোলাহলে পরিণত হয়। তার মধ্যে ড. হাসান যেই গর্জন করে উঠলেন, দিস ইজ নট দি ট্রাডিশন অফ দি ঢাকা হল, সেই মিলনায়তন নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

গভর্নর জাকির হোসেন চলে গেলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন লেফটেন্যান্ট-জেনারেল আজম খান। নতুন চান্সেলর চাইলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে, বিশেষ করে, শিক্ষকদের উদ্দেশে কিছু বলতে। শিক্ষক ও অতিথি নিয়ে তখন আর কার্জন হলে জায়গা হচ্ছিল না—প্যান্ডেল করে সভা হলো। তাঁর বক্তব্যে ছাত্রদের প্রতি তাঁর অপরিসীম সহানুভূতি প্রকাশ পেল। তিনি বললেন, ছাত্রেরা আনকোরা প্রস্তরখণ্ডের মতো—তাদের ঘষে-মেজে উজ্জ্বল ও উপযোগী করার দায়িত্ব শিক্ষকদের। শিক্ষকেরা যেন আত্মাভিমানবশত এ কথাটি ভুলে না যান। তিনি আরো বললেন, ছাত্র অকৃতকার্য হলে তিনি ধরে নেবেন শিক্ষক অকৃতকার্য হয়েছে। কারণ শিক্ষক নিজের কাজ ঠিকমতো করলে ছাত্রের কৃতকার্য না হয়ে উপায় নেই।

তাঁর বলার ভঙ্গিতে আমরা মজা পেয়েছিলাম। তবে তাঁর কথায় যে কিছু ভাবনার খোরাক ছিল, তা অস্বীকার করবার জো ছিল না।

১৫.
করাচি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে সৈয়দ আলী আহসান বাংলা একাডেমীর পরিচালকের দায়িত্ব নেন ১৯৬০ সালে। একাডেমীতে যোগ দিয়ে নানা বিষয়ে তিনি নির্ভর করতে শুরু করেন মুনীর চৌধুরীর ওপর আর অফিস-ঘরে বসে আড্ডা জমাতে থাকেন সিকানদার আবু জাফর ও সানাউল হককে নিয়ে। যাঁদের সঙ্গে তাঁর চিন্তার সাযুজ্য ছিল না, তাঁদেরকে তিনি কাছে ডাকলেন। মনে হলো, যাঁদের সঙ্গে তাঁর ভাবাদর্শগত মিল, তাঁদেরই যেন দূরে ঠেললেন। করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে পি ই এন প্রভৃতির মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাঁর যোগ বাড়ে। তারও একটা প্রভাব তাঁর ওপরে পড়েছিল বই কি! আলী আহসান সাহেব আলাওলের রচনাবলি প্রকাশের পরিকল্পনা করলেন। এসব আমার ক্ষেত্র নয় জেনেও তিনি জোর করলেন, আমি যেন আলাওলের একটি কাব্য সম্পাদনা করে দিই। আর যাঁদেরকে এ-কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছিলেন, তাঁরা হলেন আহমদ শরীফ, কাজী দীন মুহম্মদ ও মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। আলী আহসান নিজে নিয়েছিলেন *পদ্মাবতী* সম্পাদনার ভার। করাচি থাকতেই, মূলত এ কাজের জন্যেই, তিনি হিন্দি শিখেছিলেন।

আলী আহসান সাহেব বাংলা একাডেমীতে যোগ দেওয়ার পরেই রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিক উদ্‌যাপনের সময় হয়ে এলো। একদিন আহমদ হোসেন ও আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, এই উপলক্ষে তো বাংলা একাডেমীর কিছু করা কর্তব্য। তিনি বললেন, 'দেখো, রবীন্দ্রনাথকে পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে দেখা হয়, আমরা তার চেয়ে তাঁকে ভিন্নভাবে দেখি। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে যা হতে যাচ্ছে, তার অনুকরণে এখানে আমরা কিছু করবো, তা প্রত্যাশিত নয়।' আমরা বলি, 'পশ্চিমবঙ্গের অনুকরণে কেন, আমাদের মতো করেই আমরা রবীন্দ্র-জন্মবার্ষিকী পালন করবো।' তিনি বলেন, ব্যাপারটা আমরা যতো সহজ বলে ভাবছি, আসলে তা নয়। তিনি ভাববার সময় নিলেন। আমরা যখন আবার গেলাম, তখন তিনি বলেই দিলেন যে, বাইরের সংগঠন হয়তো এ-রকম উদ্‌যোগ নিতে পারে, কিন্তু বাংলা একাডেমীর মতো আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান এ-দায়িত্ব নিতে পারবে না।

আমরা বুঝলাম, জাতীয় প্রতিষ্ঠান ছাড়াই এ-কাজটা আমাদের করতে হবে এবং তার জন্যে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার বাইরে থেকে।

বাস করছি অনেকগুলো বৃত্তের মধ্যে। বাংলা বিভাগে আমার পরে যোগ দিয়েছেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, তবে ফেলো হিসেবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন পর্যায়ের (প্রফেসর-রিডার-লেকচারার) শিক্ষকদের বাইরে ওই পদটা কিছুকাল চালু ছিল। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান লেকচারার হওয়ার আগেই কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে এম এ ডিগ্রি করে এবং প্রাদেশিক তথ্য বিভাগে কাজ করে রফিকুল ইসলাম লেকচারার হয়ে যোগ দেন বিভাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার যোগ দেওয়ার আগে তিনি কিছুকাল পড়িয়েছিলেন—তারপর যোগ দিয়েছিলেন বাংলা একাডেমীতে। মুনীর চৌধুরী অনেককাল হয় আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছেন। এক দুই করে আমরা তিনজন তাঁকে ঘিরে ওঠাবসা করি। নতুন বই পড়লে তার কথা বলেন তিনি, নয়তো আমরা নতুন কী পড়লাম তা জানতে চান কিংবা কোনো বিষয়ে হালে কী বই বেরিয়েছে

তার খোঁজ নিতে বলেন। আমরা যে-বিষয় পড়াই, তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কথা বলেন: নিজে যে-বিষয় পড়ান, সে-সম্পর্কে মনে কোনো প্রশ্ন জাগলে আলোচনা করেন আমাদের সঙ্গে। খোশগল্প তো আছেই—তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে উচ্চ ও তুচ্ছ বিষয়ে কথা বলা, রঙ্গরসিকতা করা। তাঁর টানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের নূর মোহাম্মদ মিয়া মাঝে মাঝে এসে বসেন আমাদের সঙ্গে, তবে তাঁর আসল জায়গা অন্য বৃত্তে।

সেখানে মধ্যমণি আবদুর রাজ্জাক—সকলের সার্। সেই বৃত্তে তিনি কথক, অন্যেরা শ্রোতা। সেখানে মুনীর চৌধুরী আছেন, নূর মোহাম্মদ মিয়া আছেন। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন আছেন তাঁর সকল গাম্ভীর্য ও সাহেবিয়ানা নিয়ে—আঞ্চলিক ভাষায় কিছু বলে মাঝে মাঝেই তা ছিদ্র করে দেন রাজ্জাক সাহেব। মৃদু রসিকতা নিয়ে আছেন অর্থনীতির ড. মজহারুল হক এবং স্বল্প ভাষণ নিয়ে ড. এম এন হুদা। এর মধ্যে আছেন ড. খান সারওয়ার মুরশিদ—তবে যেন একটু দূরবর্তী। মোজাফফর আহমদ চৌধুরীও আছেন—তবে তিনি বেশিরভাগ সময় কাটান লাইব্রেরিতে, মাঝে মাঝে তার গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িবারান্দার কাছে দাঁড়িয়ে দু-তিন টানে আস্ত একটা সিগারেট শেষ করে আবার ঢুকে যান তার গর্ভে। পাকিস্তানের টেস্ট ক্রিকেট চললে কমনরুমের ঝরঝরে রেডিওতে তিনি কান লাগিয়ে শোনেন ধারাবিবরণী—সে-সময়ে কেউ কথা বললে বিরক্ত হন। আমি একদিন জানতে চেয়েছিলাম, খেলা দেখতে উনি মাঠে যান না কেন। বলেছিলেন, তাঁর অত ধৈর্য নেই। এ কথা কি অবিশ্বাস্য নয় যে, লন্ডনে উনি দেড় বছর থাকলেন, অথচ একটা নাটক দেখলেন না, ওঁর প্রিয় খেলা ক্রিকেট দেখতেও একদিন ওভাল বা লর্ডসে গেলেন না। কিংবা সেই কারণেই হয়তো যে-ডিগ্রি করতে অন্যের তিন বছর লাগে, দেড় বছরেই তা করে ফেলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, সার্ একদিন তাঁকে বলেছিলেন, আপনারা যে এতো সোশাল সায়েন্স পড়েন, হিউম্যানিটিজের কিছু আয়ত্তে না থাকলে তা অপূর্ণই থেকে যায়। মোজাফফর সাহেব জানতে চান, কী পড়বেন। সার্ বলেন, শেকসপিয়র দিয়েই আরম্ভ করেন। লাইব্রেরি থেকে শেকসপিয়রের রচনাসমগ্র নিয়ে গিয়ে দুদিন পর মোজাফফর সাহেব জিজ্ঞেস করেন, শেকসপিয়র পড়ে ফেলেছি—এবার কী পড়বো? অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে থেকে রাজ্জাক সাহেব বলেন, থাক, ওতেই চলবে। এহেন মোজাফফর সাহেবকে কী একটা বলে আমি নিজের অজান্তেই চটিয়ে দিই। মুনীর চৌধুরী আমাকে বললেন, 'মোজাফফর বলেছে, তুমি তাঁর সঙ্গে বেআদবি করেছো।' আমি অনেক কষ্টে সংলাপটা মনে করে তাঁর কাছে আওড়ালাম। তিনি বললেন, 'তা নোয়াখালির সন্তান হিসেবে কাউকে বিশেষ করে সম্মানিত করতে চাইলে সে রাগ করতে পারে বই কী! যাও, বাড়ি গিয়ে মাফ চেয়ে এসো।' সেদিনই ক্লাস শেষ করে ছুটি আজিমপুরে তাঁর সরকারি বাড়িতে। পরদিন মুনীর চৌধুরী জানান, 'মোজাফফর বলেছে, তুমি বেআদব নও।' সারের প্রশ্রয়ে সবদিক থেকে কনিষ্ঠ হয়েও আমি তাঁর আড্ডায় ঢুকে পড়ি। তাঁর সঙ্গে আমার সমসাময়িক আরো দুজনের ভাব—ইতিহাসের গিয়াসউদ্দিন আহমদ আর সমাজতত্ত্বের কে এ এম সাদউদ্দীনের। তবে তাঁদের সঙ্গে যোগটা মূলত দাবা খেলার, আমার সঙ্গে প্রয়োজনরহিত। সারের দাবা খেলার বা তাস খেলার বন্ধুরাও সস্নেহে দৃক্‌পাত করেন আমার প্রতি—যেমন ব্যায়ামবিদ আবদুস শুকুর

কিংবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুর রহমান। এই রহমান সাহেবের মুখেই সেই কৌতুককর গল্পটা শুনি : এক লোক হাত দেখাতে গেছে জ্যোতিষীকে—জ্যোতিষী বলেন, 'আপনার জীবনের প্রথম চল্লিশ বছর একটু দুঃখ-কষ্টে যাবে, তারপর—', জ্যোতিষী একটু থামেন এবং সেই অবকাশে লোকটি বলে, 'তারপর তা সয়ে যাবে, এই তো?' রাজ্জাক সাহেবের বৃত্তে অল্পকালে আমাকেও সয়ে নিয়েছিলেন সবাই। রসায়ন বিভাগের মোকাররম হোসেন খোন্দকারের দরজা ছিল সারের জন্য অবারিত, আমিও সেখানে প্রবেশের অধিকার লাভ করেছিলাম। অবশ্য তার আরেকটা সূত্র ছিল এই যে, তাঁর স্ত্রী মেহেরুননেসা খোন্দকার—আমি তাঁকে আপা বলতাম—এম এ ক্লাসে আমার ছাত্রী ছিলেন।

কলাভবনে শিক্ষকদের কমনরুমে করিডোরের দুপাশে ছিল দুটি ঘর : পশ্চিম দিকেরটায় বসতেন জ্যেষ্ঠরা—সেখানে সোফা ছিল, পত্রপত্রিকা ছিল, ঝরঝরে রেডিওটা ছিল; পুবের ঘরে বসতেন কনিষ্ঠরা—অবশ্য তার ব্যতিক্রমও ছিল। এই ঘরে আমাদের আরেকটা বৃত্ত ছিল, সেখানে থাকতেন ইংরেজির সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, পরে রওশন জাহান (উইমেন ফর উইমেন-খ্যাত) ও আবু হেনা (অবসরপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার); ইতিহাসের গিয়াসউদ্দিন আহমদ; রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মোকাম্মেল হক; সমাজতত্ত্বের বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও পরে সাদউদ্দীন; অর্থনীতির মোজাফফর আহমদ ততদিনে চলে গেছেন প্যারিসে, নইলে এখানেই থাকতেন। গিয়াসউদ্দিন ও আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের খাতিরে নীলিমা ইব্রাহিমও এসে বসতেন আমাদের সঙ্গে।

পশ্চিমের ঘর থেকে যাঁরা পুবের ঘরে আসতেন, তাঁদের মধ্যে আবদুর রাজ্জাক ছিলেন প্রধান, পুব থেকে যাঁরা পশ্চিমে যেতেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মুনীর চৌধুরী। ইংরেজির খান সারওয়ার মুরশিদ, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ও ভবানীচরণ রায় ছিলেন উভচর। আইনের নূরুল মোমেন তখন প্রক্টর : দু-ঘরেই তাঁর যাতায়াত, তবে নিজের নাটকের কথা শোনাতে তিনি আমাদের ঘরেই আসেন বেশি। ইতিহাসের আবু সাঈদও এ-ঘর ও-ঘর করতেন, তবে তাঁর অনুজ অর্থনীতির আবু মাহমুদ, একই বিভাগের হরিহর ধর ও কুলসুম হুদা, ইংরেজির কে এম এ মুনিম, এনামুল করিম, নাদেরা বেগম ও হোসনে আরা হক, ইতিহাসের আবদুল করিম ও বাণিজ্য বিভাগের আবদুল্লাহ ফারুক পুবেই থাকতেন। এনামুল করিম ছাত্র ছিলেন আমাদের আগের বছরের, কিন্তু পাশ করেছিলেন আমাদের সঙ্গে। ছাত্রজীবনেই তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল এবং শিক্ষক হয়েই তিনি ধানমন্ডিতে বাড়ি বানাতে শুরু করেছিলেন। আবু সাঈদও একই কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। এনামুল করিমকে দেখতাম মাঝে মাঝে সাঈদ সাহেবের করতলে মৃদু চাপ দিয়ে কথা বলছেন—গৃহনির্মাণের সূত্রে তাঁরা সতীর্থ হয়ে গেছেন। আবদুল্লাহ ফারুক সব সময়েই মজার মজার কথা বলে জমিয়ে রাখতেন। হরিহর ধর ছিলেন বয়সে প্রবীণ—তিনি রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে ঢাকায় এসেছিলেন, আমরা যখন ছাত্র, সেই সময়ে। খুব পান-সিগারেট খেতেন। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানেরা থাকতেন কলকাতায়—প্রতি গ্রীষ্মাবকাশ তিনি তাঁদের সঙ্গে কাটাতেন। একবার ছুটির পরে দেখি, হরিহরবাবু আর পান-তামাক খাচ্ছেন না। কী ব্যাপার, তা জানতে আমরা

তাঁকে চেপে ধরি। কিছুই না, তিনি বলেন। স্ত্রীর কাছে একদিন পান চেয়ে পাননি—বাজার থেকে পান আনাতে তাঁর মনে ছিল না। হরিহরবাবু ভাবলেন, তাঁর এত শখের পানের কথা মনে রাখেননি গৃহিণী—থাক, আর পানই খাবেন না। ঠিক অমনি করে তাঁর ফরমাশমতো বাইরে থেকে সিগারেটের প্যাকেট আনতে ভুলে গিয়েছিল তাঁর বড়ো ছেলে—সেই অভিমানে তাও ছাড়লেন। হেসে হেসেই নিজের মুক্তপুরুষ হওয়ার কথা বললেন হরিহরবাবু—এমন পরিণতবয়স্ক ধীরস্বভাব সহৃদয় মানুষের এমন প্রতিক্রিয়ার কথা শুনে আমরা অবাক। বিজ্ঞান অনুষদে ক্লাস শেষ করে এই পুবের ঘরে মাঝে মাঝেই আসতেন কাজী মোতাহার হোসেন : উদ্দেশ্য-দাবা খেলা। নির্দিষ্ট সময়ের আগে আলমারি থেকে খেলাধুলার সরঞ্জাম বের করে দেওয়ার নিয়ম ছিল না। একবার তিনি চলে এসেছেন যথাসময়ের আগে—বেয়ারারা কেউ দাবার জিনিসপত্র বের করে দিচ্ছে না। তিনি সাদউদ্দীনকে বললেন, 'চলো, মুখে মুখেই খেলা যাক।' মুখে মুখে দাবার চাল বলতে শুরু করলেন তাঁরা, কিন্তু তা আর কতক্ষণ চালানো যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আরো একটা বৃত্ত। সিভিল সার্ভিসের চাকরিতে ঢাকায় বদলি হয়ে এসেছেন আবুল মাল আবদুল মুহিত। রেলওয়ে সার্ভিসে যোগ দিয়ে নারায়ণগঞ্জে নিয়োগ লাভ করেছেন নুরুল হক। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিই আমি, আহমদ হোসেন, গিয়াসউদ্দিন, মোকাম্মেল, আবদুল আলী, লীলু আপা, মসিহুর রহমান এবং কলকাতা থেকে সদ্য আগত তার বোন মিনি—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগে এম এ ক্লাসের ছাত্রী। নুরুল হকের ব্যবস্থাপনায় নারায়ণগঞ্জে রকেট-স্টিমারে উঠে লাঞ্চ খাই; কখনো রেলের লঞ্চে ঘুরে বেড়াই নদীতে। একবার রকেটে চড়েই চলে গেলাম মুনশিগঞ্জে। হরগঙ্গা কলেজে প্রথম শিক্ষকতা করেন মুহিত—জায়গাটির প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ আছে। সেখানে একটু ঘুরে রেলের লঞ্চে আবার ফিরে আসি নারায়ণগঞ্জে। তারপর ট্রেনে করে ঢাকায়।

বকশিবাজারে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিবাহিত শিক্ষকদের জন্যে একটা বাড়ি ছিল। গিয়াসউদ্দিন, সাদউদ্দীন, মোকাম্মেল হক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রশীদুজ্জামান, উদ্ভিদবিজ্ঞানের জালালউদ্দীন এবং আরো কয়েকজন সেখানে থাকতেন। সেখানকার দাবার আসরে আবদুল আলী যোগ দিতে যেতো খাজে দেওয়ান থেকে। আমি যেতাম স্রেফ আড্ডা দিতে। তার জের হিসেবে গিয়াসউদ্দিন কিংবা মোকাম্মেল একাধিক রাত কাটিয়েছেন আমার ঘরে। দেশ, বিশ্ববিদ্যালয়, লেখাপড়া, ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে বলতে গভীর রাতে আমরা ঘুমোতে গেছি।

১৬.

আমার একান্ত ব্যক্তিগত জগৎটাও রূপ নিচ্ছে ধীরে ধীরে। বেবী বি এ পড়ে ইডেন কলেজে, সেখানকার ছাত্রী-সংসদের সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত হয়েছে। কলেজ থেকে বেরিয়ে মাঝে মাঝে চলে আসে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে। শিক্ষকদের কমনরুমে তাকে বসিয়ে এক কাপ চা খাওয়াই। বেশিক্ষণ বসাটা ভালো দেখায় না

বলে সে দ্রুতই চলে যায়। একবার আমাদের যোগাযোগে লম্বা ছেদ পড়লে তার বান্ধবী ও প্রতিবেশী এবং আমার ছাত্রী মোফাবেজা খানমকে বলেছিলাম, 'সিদ্দিকাকে বলবেন যেন দেখা করে আমার সঙ্গে।' মোফাবেজা হেসে মাথা নাড়লেন। তিনি সব সময়েই হাসতেন—সুতরাং বুঝতে পারিনি তার এই হাসি বিশেষ না নির্বিশেষ।

বেবী একদিন এসেছিল ছোটোবুর আজিমপুরের ফ্ল্যাটে—নিভৃতে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছিল ছোটোবু। আরেকবার ক্ষণকালের জন্যে রিকশা থামিয়েছিল আমাদের বাড়ির সামনে—সেই সুযোগে তাকে একটা আংটি দিই। আমার পছন্দের কিছু বইও উপহার দিই তাকে—যেমন, এরিক মারিয়া রেমার্কের *তিন বন্ধু* কিংবা মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের *নটী*।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বেবীর আসা-যাওয়া অনেকের নজর এড়ায়নি। বাড়িতে একদিন টেলিফোন পেলাম, ওপারের নারীকণ্ঠ বলছে, 'আমি সিদ্দিকা, আপনার সঙ্গে দেখা করা দরকার।' বেবীর গলা চিনতাম, তাছাড়া সে আমার কাছে সিদ্দিকা বলে নিজের পরিচয় দেবে না। সুতরাং তার নাম করে যে আর-কেউ ফোন করছে, তা বুঝতে আমার বিলম্ব হয়নি। আমার মনে হলো, ছাত্রীহলবাসিনী কেউ ফোনটা করছে—উত্তরে আমি কী বলি, তা শোনার জন্যে। আমি খুব নিস্পৃহভাবে একটা দিনক্ষণ দিয়ে তাকে আমার বাসায় আসতে বললাম।

নারীকণ্ঠটি যে কার, সে-সম্পর্কে আমার একটা অনুমান ছিল এবং তা অনুমানমাত্রই। মসির বোন মিনি ছাত্রীহলে থাকতেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, হলের বাসিন্দা আমার এক ছাত্রী খামের ওপর আমার নাম লিখে যত্রতত্র ফেলে রাখে—যাতে সবাই ধরে নেয় যে, তার সঙ্গে আমার পত্রালাপ চলছে। এটা শুনে একদিন আমি তাকে ডেকে বলি, 'তুমি নাকি খামে আমার নাম লিখে প্রকাশ্যে রেখে দাও?' মেয়েটি ভদ্র ও সপ্রতিভ, তবে কিছু বললো না। বললাম, 'আমি নেতাও নই, অভিনেতাও নই। এসব করে কী লাভ?' সে মাথা নিচু করে চলে গেল। নিজের রূঢ়তায় আমারও একটু অনুতাপ বোধ হলো, কিন্তু তারপর যা ঘটলো, তার জন্যে আমি একেবারে প্রস্তুত ছিলাম না।

অল্পদিন পর কোনো শ্রেণীকক্ষে আমাদের বিভাগের এক অনুষ্ঠান হয়েছিল। তাতে মেয়েটি গেয়েছিল তখনকার জনপ্রিয় একটি গান, 'ময়ূরকণ্ঠী রাতের নীলে/আকাশে তারাদের ওই মিছিলে/তুমি-আমি আজ চলো ভেসে যাই/শুধু দুজনে মিলে।' সুরেলা কণ্ঠে গানটি সে ভালো গেয়েছিল, কিন্তু ওই গানের কথায় ও ভাবে প্রমাদ গণলেন বিভাগের অধ্যক্ষ। অনুষ্ঠানের শেষে শিক্ষকেরা যখন তাঁর অফিসকক্ষে জমায়েত হলাম, তখন তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, 'মেয়েটি কেমন—এমন একটা গান সে ছাত্র-শিক্ষকদের সামনে গাইতে পারলো!' সাহিত্যের অধ্যাপক হলেও মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের মধ্যে একটা প্রবল রক্ষণশীলতা ছিল। প্রেম ব্যাপারটা বোধহয় তিনি একটা সামাজিক অপরাধ বলে গণ্য করতেন। বনভোজনে গেলে কোনো ছেলের সঙ্গে কোনো মেয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে কিনা সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। সুতরাং তাঁর ক্ষোভ শুধু মন্তব্য করেই প্রশমিত হলো না, ছাত্রীটিকে তিনি বাধ্য করলেন ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিতে। এ প্রক্রিয়ার বিন্দুবিসর্গ আমার গোচরে ছিল না, মেয়েটির ক্রমাগত অনুপস্থিতির

কারণ সন্ধান করতে গিয়ে সবটা আমার জানা হয়। কিন্তু ছাত্রীটি বোধহয় মনে করেছিল যে, তার আচরণ সম্পর্কে অধ্যক্ষের কাছে আমি নালিশ করায় তার এই দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে। ঘটনার তিন দশকেরও বেশি পরে আমার তখনকার এক ছাত্রী—এখন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী অধ্যাপক—কিছু সংকোচের সঙ্গে আমার অনুমতি নিয়ে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, একটি বিষয় তাঁকে এতোকাল ধরে পীড়ন করে আসছে—মেয়েটিকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার মতো কঠোর ও অমানবিক আচরণ আমি করলাম কী করে! তিনি আরো জানিয়েছিলেন যে, সে-সময়ে অনেকের মনেই এই ক্ষুব্ধ প্রশ্নটা জেগেছিল। অধ্যাপক-ছাত্রীকে বিষয়টা সেদিন বুঝিয়ে বলতে পেরেছিলাম, কিন্তু যে-ভুক্তভোগী তাকে কিছু ব্যাখ্যা করার অবকাশ কখনো হয়নি।

১৭.

যখন স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল যে, রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ পালনের বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্‌যোগের কোনো সম্ভাবনা নেই, তখন মুহম্মদ আবদুল হাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে একটি প্রাথমিক ও অনানুষ্ঠানিক আলোচনার আয়োজন করেন। যতদূর মনে পড়ে, শিক্ষকদের মধ্যে এতে উপস্থিত ছিলেন দর্শন বিভাগের গোবিন্দ দেব, ইংরেজি বিভাগের সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ও খান সারওয়ার মুরশিদ, বাংলা বিভাগের মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও রফিকুল ইসলাম, আমিও ছিলাম। শিক্ষক নন, এমন ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্ ও আহমদ হোসেন। আমাদের বিভাগের এম এ ক্লাসের ছাত্র আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদ এসেছিলেন তাঁর সতীর্থ ইতিহাস বিভাগের মুশতাক হোসেনকে নিয়ে। হাই সাহেব একটু সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হওয়ার কথা বলেছিলেন। তাতে আতীকুল্লাহ্ একটা কটু মন্তব্য করে ফেলেন। কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই সভা শেষ হয়। সভার শেষে হাই সাহেব জানতে চান মন্তব্যকারীর পরিচয়, আমি উত্তর দিই। *সমকালে* তাঁর *বিলেতে সাড়ে সাত শ দিনের* একটা অনুদার সমালোচনা লিখেছিলেন আতীকুল্লাহ্। হাই সাহেব জিজ্ঞেস করেন, 'ওকে এখানে কে ডেকেছে?' আমি বলি, 'বোধহয় হাসান হাফিজুর রহমান।'

এর আগে বা পরে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিক উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ড. গোবিন্দ দেবের বাড়িতে—অর্থাৎ জগন্নাথ হলের প্রোভোস্টের বাসভবনে—একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অনেকে ছিলেন, তবে আমি উপস্থিত ছিলাম না। বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের কক্ষে দ্বিতীয়বার আবার সভা বসে। এবারে গোবিন্দ দেব, জ্যোর্তিময় গুহঠাকুরতা ও আতীকুল্লাহ্ আসেন নি, এসেছিলেন আগের সভার বাকি সকলে আর শিক্ষকদের মধ্যে নীলিমা ইব্রাহিম এবং ছাত্রদের মধ্যে আমাদের বিভাগের জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত আর ইংরেজি বিভাগের মনজুরে মওলা ও আতাউল হক। যতদূর মনে পড়ে, এই সভায় রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি গঠিত হয় বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব

মুরশেদকে সভাপতি এবং খান সারওয়ার মুরশিদকে সম্পাদক করে। দুদিনে আমরা যারা উপস্থিত ছিলাম, তারা সকলেই সদস্য, তাছাড়া আরো অনেকের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে এই কমিটি পরিচিত হয়েছিল কেন্দ্রীয় কমিটি বলে, কেননা এই কমিটি গঠনের পরে ঢাকায় আরো দুটি কমিটি গঠিত হয়। এর একটির সভাপতি ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল আর তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জহুর হোসেন চৌধুরী, মুখলেসুর রহমান ওরফে সিধু ভাই, আহমেদুর রহমান, ওয়াহিদুল হক, সন্‌জীদা খাতুন এবং আরো কেউ কেউ। এই কমিটি পরিচিত হয়েছিল গোপীবাগের কিংবা ওয়ারীর কমিটি বলে। সিধু ভাই ও তাঁর স্ত্রী শামসুননাহার ওরফে রোজ নেপথ্য থেকে এই উদ্‌যোগের অনেকখানি ভার নিয়েছিলেন। তৃতীয় কমিটিকে বলা হতো প্রেসক্লাব কমিটি—এতে ছিলেন এ বি এম মুসা, সৈয়দ আসাদুজ্জামান, এনায়েতুল্লাহ খান, এনামুল হক (জাতীয় যাদুঘর-খ্যাত), ড. এম এন নন্দী, তাঁর স্ত্রী শান্তি নন্দী এবং আরো কয়েকজন। ফয়েজ আহমদ তখন জেলখানায়, তবে কমিটিতে তাঁর নাম ছিল। তিনটি কমিটি পর পর স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হয়, কিন্তু একই সঙ্গে একাধিক অনুষ্ঠানের সংঘাত এড়াতে তাদের মধ্যে একটা যোগাযোগ ঘটে। স্থির হয়, ২৪ বৈশাখ ১৩৬৮ থেকে একটানা দশ দিন ধরে অনুষ্ঠান হবে—চারদিন কেন্দ্রীয় কমিটির, অপর দুই কমিটির তিনদিন করে। বুলবুল ললিতকলা একাডেমীতে প্রথম দুই কমিটির অনুষ্ঠানের মহড়া হয়েছিল, তাদের নিজস্ব অংশের মহড়া তো বটেই, আর ভক্তিময় দাশগুপ্ত সার্বক্ষণিকভাবে সেসব তত্ত্বাবধান করেছিলেন। রেডিও পাকিস্তানের চাকরি করেও আবদুল আহাদ যথাসাধ্য করেছিলেন অনেক ঝুঁকি নিয়ে।

আমরা যেমন রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিক পালনের উদ্‌যোগ নিলাম, প্রতিপক্ষও বসে থাকলেন না। দৈনিক *আজাদ* গোটা বৈশাখ মাস জুড়ে রবীন্দ্রনাথকে মুসলিম-বিদ্বেষী, হিন্দু ভাবধারার বাহক এবং পাকিস্তানের সংস্কৃতিক্ষেত্রে অগ্রহণীয় বলে প্রচার করতে থাকলো। স্বয়ং মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ স্বনামে রবীন্দ্রবিরোধী লেখা প্রকাশ করলেন। তবে আমরা পেয়ে গেলাম দৈনিক *সংবাদ* ও দৈনিক *ইত্তেফাকের* সমর্থন। *আজাদের* অপপ্রচারের জবাব দেওয়াই হলো এ দুই পত্রিকার প্রধান কাজ—সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিতর্কের প্রসঙ্গ এড়িয়েও কিছু লেখা ছাপা হলো, তবে এসব সাহিত্য-সমালোচনা চলমান পরিস্থিতির উত্তাপ কমাতে পারেনি।

কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় একদিন বিচারপতি মুরশেদ বললেন, অনুষ্ঠানের জন্যে যেন আমরা কেউ চাঁদা না তুলি। তার কারণ, পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তাঁকে জানিয়েছেন যে, রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ পালনের জন্যে ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশন দুহাতে পয়সা ছড়াচ্ছে। আসলে ওই কর্মকর্তার উদ্দেশ্য ছিল এসব কথা বলে বিচারপতি মুরশেদকে এই উদ্‌যোগ থেকে সরিয়ে আনা। তিনি অবশ্য সেই ভদ্রলোককে জানান, তাহলে অনুষ্ঠানের অর্থ তিনি নিজে সংগ্রহ করবেন এবং এভাবে নিশ্চিত করবেন যেন বিদেশি কোনো অর্থ তাঁর নেতৃত্বাধীন কমিটির অনুষ্ঠানমালার জন্যে ব্যয় না হয়। অতএব বিচারপতি মুরশেদ আমাদের চাঁদা তুলতে বারণ করে বললেন, অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব তিনিই নিলেন। পরে জেনেছিলাম যে, পূর্ব পাকিস্তানের ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ এ কে এম হাফিজউদ্দীনকে

তিনি অনুরোধ করেছিলেন টাকা তুলে দিতে। অনুষ্ঠানশেষে দেখা গেল, কিছু ঘাটতি হয়েছে। আহমদ হোসেন ও আমার সামনেই বিচারপতি মুরশেদ টেলিফোনে আই জির সঙ্গে কথা বললেন। টেলিফোন নামিয়ে বললেন যে, হাফিজউদ্দীন বলছেন, অনুষ্ঠান শেষ—এখন আর কার কাছে চাঁদা চাইবেন তিনি! ভগবতী ব্যানার্জি রোডে তাঁর সম্বন্ধী সাইদুর রহমান থাকেন—তিনি বলে রাখবেন, আমরা যেন তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসি। আমরা তাই করেছিলাম।

এখন বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে উল্লেখ পাচ্ছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের উদ্‌যোগে কার্জন হলে ১১ ও ১২ বৈশাখে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয়। বেগম সুফিয়া কামাল তা উদ্‌বোধন করেন এবং মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা-সভায় কাজী মোতাহার হোসেন বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ এই অনুষ্ঠান তত্ত্বাবধান করেছিলেন এবং ভাইস-চান্সেলর ড. মাহমুদ হোসেন যথেষ্ট আনুকূল্য করেছিলেন। তবে এই অনুষ্ঠানের কথা আমার স্মরণে নেই।

৭ মে ১৯৬১ সকালে ইনজিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের মিলনায়তনে কেন্দ্রীয় কমিটির চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্‌বোধন করেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি ইমাম হোসেন চৌধুরী। তিনি এসেছিলেন বিচারপতি মুরশেদেরই অনুরোধে এবং বাংলায় একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন। বিচারপতি মুরশেদ সুললিত ইংরেজিতে সভাপতির ভাষণ দেন—তার একটা বাংলা ভাষ্য কেউ তৈরি করে দিয়েছিলেন পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে। ওই ভাষণে তিনি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বৈদিক ঋষি, ফারসি কবি ও বাংলার পর্যটকের মিলিত সত্তার কথা বলেছিলেন এবং দেশের সীমা ছাড়িয়ে তিনি যে বিশ্বের কবি হয়ে উঠেছিলেন, সে-বিষয়ে জোর দিয়েছিলেন। *বলাকার* সঙ্গে তিনি তুলনা করেছিলেন ফারসি কবি ফরিউদ্‌দীন আত্তারের কোনো একটি কাব্যের। খুব ভাবাবেগের সঙ্গে নিজের রবীন্দ্র-সন্দর্শনের অভিজ্ঞতাও বর্ণনা করেছিলেন তিনি। খান সারওয়ার মুরশিদের ভাষণটি ছিল মেদহীন ও মনোজ্ঞ। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন বেগম শামসুননাহার মাহমুদ এবং স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিলেন শামসুর রাহমান আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফারসি বিভাগের অধ্যক্ষ ও উর্দু কবি ড. ডব্লিউ এইচ এ শাদানী। আবৃত্তি ও সংগীত চলেছিল অনেকক্ষণ ধরে।

ওইদিন সন্ধ্যায় ঢাকা জেলা পরিষদ হলে আরেকটি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছেলেবেলায় যাঁর স্নেহ লাভ করে ধন্য হয়েছিলাম, সেই ফজলুল হক সেলবর্সী ছিলেন তার সভাপতি। এখানে বক্তাদের একজন ছিলেন গোলাম আযম—অন্যেরা ছিলেন মঈনুদ্দীন, দেওয়ান আবদুল হামিদ, মওলানা মহীউদ্‌দীন, হাফেজ হাবিবুর রহমান, আবদুল মান্নান তালিব, বিশ্বেশ্বর চৌধুরী ও সঞ্জয় বড়ুয়া। রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রচুর বিষোদ্‌গার হয়েছিল। আমি যতদূর জানি, এই সভাতেই সর্বপ্রথম—রবীন্দ্রনাথের নাম না করে—পূর্ব পাকিস্তানের সকল বিশ্ববিদ্যালয়, একাডেমী ও বেতারকেন্দ্রকে 'বিজাতীয় সংগীত-সাহিত্যের অভিশাপমুক্ত' করার আহ্বান জানানো হয়।

গোপীবাগ কমিটির অনুষ্ঠান বোধহয় বেগম সুফিয়া কামাল উদ্‌বোধন করেন, প্রেস ক্লাব কমিটির অনুষ্ঠান উদ্‌বোধন করেন মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা। দুটি

আলোচনা-সভা বসে ফজলুল হক হল মিলনায়তনে, একটি ইনজিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে। একটিতে সভাপতিত্ব করেন মুহম্মদ আবদুল হাই। তাতে অংশ নেন শামসুননাহার মাহমুদ, আবু রুশ্‌দ, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ও জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। আরেকটিতে সভাপতিত্ব করেন এস এন কিউ জুলফিকার আলী। তাতে অংশ নেন মুনীর চৌধুরী, রশীদ করীম, হাসান জামান ও বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। তৃতীয়টির সভাপতি কে ছিলেন, মনে নেই। সেখানে অজিতকুমার গুহ বক্তৃতা করেছিলেন আর শওকত ওসমান প্রবন্ধ পড়েছিলেন। শওকত ভাই আমাকে বলেছিলেন, বোরহানের মতো দু-চারজন ছাড়া তাঁর প্রবন্ধ কেউ বুঝবে না। দু-চারজনের মধ্যে আমাকে গণ্য না করায় স্বভাবতই খুশি হতে পারি নি। আমি পালটা প্রশ্ন করেছিলাম, তাহলে জনসমক্ষে অমন প্রবন্ধ পড়ে লাভ কী?

বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের যেসব নাম নানাসূত্রে পাচ্ছি, তা উল্লেখ করা হয়তো বাহুল্য হবে না। সংগীতানুষ্ঠান যে কতোগুলি হয়েছিল, তার হিসাব দেওয়া মুশকিল। এসবে অংশ নিয়েছিলেন লায়লা আর্জুমান্দ বানু, বিলকিস নাসিরউদ্দীন, সন্‌জীদা খাতুন, ফাহ্‌মিদা খাতুন, জাহানারা ইসলাম, বেলা রায়, গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়, নাসরীন চৌধুরী, ভক্তিময় দাশগুপ্ত, ফজলে নিজামী, আতিকুল ইসলাম, ওয়াহিদুল হক ও জাহেদুর রহিম। জাহেদুর রহিমের সেটাই ছিল যথার্থ আত্মপ্রকাশ এবং ফাহ্‌মিদা খাতুনের পক্ষেও ব্যাপক পরিচয়লাভ। কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন খুরশিদী আলম, হুসনে আরা, নূরজাহান মুরশিদ, সেলিনা চৌধুরী (পরে সেলিনা বাহার জামান), সাবিয়া বেগম (পরে সাবিয়া মুহিত), গোলাম মোস্তফা, রফিকুল ইসলাম, আহমদ হোসেন, ইকবাল বাহার চৌধুরী ও আবদুল্লাহ্‌ আবু সায়ীদ। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন বেনজীর আহমদ, হাবীবুর রহমান, আশরাফ সিদ্দিকী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, লতিফা হিলালী ও লতিফা হক।

নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল তিনটি—*রাজা ও রানী*, *রক্তকরবী* ও *তাসের দেশ*। প্রথমটির পরিচালক কে ছিলেন, মনে করতে পারছি না, পরের দুটির ছিলেন যথাক্রমে মকসুদ উস সালেহীন ও বজলুল করিম। মুনীর চৌধুরী, নূরুল মোমেন ও রফিকুল ইসলাম তাঁদের সাহায্য করেছিলেন। এসব নাটকে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন—কেউ কেউ একাধিক নাটকে—তাঁদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ হাসান ইমাম, মাসুদ আলী খান, দাউদ খান মজলিস, খোন্দকার রফিকুল হক, আনোয়ার হোসেন, রেশমা, কামেলা শরাফী ও হোসনে আরা লাইজু। কিছুটা সংক্ষেপ করে *চিত্রাঙ্গদা* ও *চণ্ডালিকা* নৃত্যনাট্য এবং *শ্যামা* নৃত্যনাট্য সম্পূর্ণ মঞ্চস্থ হয়েছিল। নৃত্যনাট্যে অংশ নিয়েছিলেন জিনাত গনি (তাঁর কন্যা মিলিয়া আলী সুপরিচিত রবীন্দ্র-সংগীতশিল্পী), মন্দিরা নন্দী, ফরিদা মজিদ, ফাহ্‌মিদা মজিদ (মঞ্জু), লায়লা নার্গিস (পরে হাসান), অজিত দে, জ্যাকব পিউরিফিকেশন, কামাল লোহানী ও মৃন্ময় দাশগুপ্ত। নৃত্যনাট্যে গান গেয়েছিলেন সন্‌জীদা খাতুন, ফাহ্‌মিদা খাতুন, ফজলে নিজামী, জাহেদুর রহিম, এনামুল হক ও চৌধুরী আবদুর রহিম। অনেকের কথা বাদ পড়ে গেল, কিন্তু তা ইচ্ছাকৃত নয়। নাচে-গানে কবিতায়-অভিনয়ে বক্তৃতায়-আলোচনায় দশটা দিন ঢাকা শহর মেতে ছিল। ঝড়বৃষ্টির কারণে একদিনের অনুষ্ঠান পিছিয়ে যায়, তাই জন্মশতবার্ষিকী শেষ হয় একাদশম দিনে।

ঢাকার বাইরে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিক বড়ো করে পালিত হয়েছিল চট্টগ্রামে। সেখানে গঠিত কমিটির প্রধান ছিলেন পূর্ববঙ্গ রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার এম এ [মালিক আবদুল] বারী। সরকারি কর্মকর্তা হয়েও তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ কাজ করেছিলেন। আবুল ফজল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এই অনুষ্ঠানমালায়।

এই উপলক্ষে পরে *সমকাল* রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা (চতুর্থ বর্ষ, নবম সংখ্যা) প্রকাশ করে। বৈশাখ ১৩৬৮-চিহ্নিত হলেও তা প্রকাশ পায় কিছু দেরিতে এবং বিভিন্ন আলোচনা-অনুষ্ঠানে পঠিত অনেক প্রবন্ধ তাতে সংকলিত হয়। ওই সংখ্যার সূচি এরকম :

উল্লেখযোগ্য যে, অনুষ্ঠানে অংশ না নিলেও সৈয়দ আলী আহসান *সমকালে* রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ে কবিতা লিখেছিলেন। ফজলুল হক হল মিলনায়তনে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সভাপতিত্বে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন যে-প্রবন্ধ পড়েন, সেটিই *সমকালের* এই বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আমি এর থেকে দীর্ঘ অংশ উদ্‌ধৃত করতে চাই একাধিক কারণে :

...পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথের স্থান কোথায় এবং কি, এ প্রশ্নটা একদিক থেকে খুব অদ্ভুত এবং উদ্ভট। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত, এ নিয়ে কোন বাকবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হওয়াটাই নিছক পাগলামী। কিন্তু তবু এ প্রশ্ন ওঠে কেন? রবীন্দ্রনাথকে বাংলা লেখক হিসেবে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে পাকিস্তানবাদের কোন মূল নীতিকে বর্জন করবার একটা গভীর ইংগিত আছে, এমন সন্দেহ প্রকাশ করা হয় কেন?...

...জাতীয়তার প্রসারের সংগে সংগে অবশ্য জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদ সব দেশেই দেখা দেয়, কিন্তু জাতীয় সাহিত্য অর্থ একটা দেশের নাগরিকদের দ্বারা সৃষ্ট সাহিত্য ছাড়া আর কি হতে পারে তা বোঝা মুশকিল। কোন বিশেষ মতবাদের অভিব্যক্তি থাকলেই সাহিত্য জাতীয় সংজ্ঞা লাভ করবার উপযুক্ত হবে এবং তা না হলে জাতীয় সাহিত্যের পর্যায় থেকে তাকে ছেঁটে ফেলতে হবে, রাজনীতিতে এ কথার দাম যাই থাকুক, সাহিত্যে এর কোন মূল্য নেই।...

...পাকিস্তানবাসী হিসেবে আমরা একটি আলাদা জাতি। আমাদের সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য আছে—এ অনস্বীকার্য। কিন্তু ভাষার দিক থেকে অন্য কোন জাতির সংগে আমাদের মিল রয়েছে বলেই আমাদের জাতীয়তাবোধ ক্ষুণ্ন হতে পারে, এ কথাটা সহজে গ্রহণ করা মুশকিল। আমাদের মনে যদি নিজেদের বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে কোন সংশয় না থাকে তবে রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোন ভারতীয় কবি বা সাহিত্যিকের রচনা সাহিত্য হিসেবে গ্রহণ করতে আমাদের আপত্তি থাকবে কেন?...

...রবীন্দ্রনাথ পাকিস্তানের জাতীয় কবি নন, কথাটা সত্য হলেও নিতান্ত অবান্তর। কারণ, প্রথমত, জাতীয় কবি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা কোন বড় কবির পক্ষে গৌরবের কথা নয়। যাঁরা শুধু এই উদ্দেশ্য নিয়েই সাহিত্যচর্চায় প্রবৃত্ত হন, জাতি ও কাল নির্মমভাবে তাঁদের বর্জন করে। রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তো বটেই তিনি আরও শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য এইজন্য যে তাঁর জাতীয়তাবোধ তাঁর স্বজাতিপ্রীতি এর উর্ধ্বে রয়েছে তাঁর মানবীয় মূল্যবোধ। এই কারণেই শেক্সপিয়ার এবং চসার ইংরাজ হয়েও, ভলতের অথবা বালজাক ফরাসি হয়েও যেমন বিশ্বের শ্রদ্ধালাভ করছেন তেমনি রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় অথবা আরও সংকীর্ণভাবে বলতে গেলে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হয়েও শুধু আমাদের নয়, সমগ্র পৃথিবীরই বুদ্ধিজীবিদের শ্রদ্ধার পাত্র।...

...যে বাংলা ভাষা নিয়ে আমরা গর্ব করি, রবীন্দ্রনাথের কাছে তার ঋণ অপরিসীম, এ সত্যটি যেন কখনই ভুলে না যাই। বাংলা ভাষাকে তিনি তাঁর নিজের সাধনার দ্বারা মধ্যযুগ থেকে বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেছেন, যার ফলে আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে বাংলা স্থান পেয়েছে।—এর নজীর পাক-ভারত উপমহাদেশের আর কোন সাহিত্যে নেই, হিন্দী-মারাঠী-তামিল-তেলেগু কোন ভাষায়ই নেই। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের যা অবশিষ্ট থাকে তা নিয়ে ঘরের নিভৃতে হয়ত আলোচনা করা যায়, কিন্তু দুনিয়ায় জাহির করবার মত কিছু থাকে না।...

উদ্ধৃত শেষ বাক্যটি তখন খুব সাড়া জাগিয়েছিল এবং কাগজে-কাগজে মুখে-মুখে ঘুরেছিল।

১৯৬৭ সালে রবীন্দ্রসংগীত-বিতর্কের সময়ে যাঁরা ১৯৬১ সালের অবস্থান থেকে সরে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বেনজীর আহমদ, আশরাফ সিদ্দিকী ও সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। যা আরো উল্লেখ করা দরকার, তা এই যে, স্বাধীন বাংলাদেশে (জেলে বসে) লেখা স্মৃতিকথায় সাজ্জাদ সাহেব জানিয়েছেন, তিনি বুঝতে পারেননি যে, রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষের সময়ে তিনি ব্যবহৃত হয়েছিলেন। এর প্রমাণস্বরূপ তিনি দেখিয়েছেন, আমার সম্পাদিত *রবীন্দ্রনাথ* (ঢাকা, ১৯৬৮) সংকলনে ১৯৬১ সালে লেখা কোনো কোনো প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হলেও তাঁর প্রবন্ধটির স্থান হয়নি।

রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠান আসলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন অতিক্রম করে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে আমাদের চাই, কেননা তিনি না থাকলে আমাদের আর কী থাকে! কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা, আমাদের বাঙালি সত্তাকে ধরে রাখতে হবে, পাকিস্তান সরকারকে তা গ্রাস করতে দেওয়া যাবে না। 'বাধা দিলে বাধবে লড়াই'— এই মনোভাবই কাজ করেছিল সেদিন। তখন মনে হয়েছিল, এখনো মনে হয়, সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আমরা সেদিন জয়ী হয়েছিলাম—ভাষা-আন্দোলনের মতো আরেকটি আন্দোলনে।

১৮.

নুরুল হক জানালেন, মামার অমতে তিনি মামাতো বোন ফরিদা বানুকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। ফরিদার মৌখিক পরীক্ষা শেষ হলেই খুব ঘরোয়াভাবে বিয়েটা হবে, আমি স্বাগত।

ফরিদা (এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগে শিক্ষকতা করেন) ও তাঁর আগের বোন হামিদা বানু (দীর্ঘকাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও সরকারি কর্ম কমিশনের এককালীন সদস্য) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেবার এম এসসি পরীক্ষা দেবেন—ছোটোজন গণিতে, বড়োজন পদার্থবিজ্ঞানে। এঁরা দুজনেই আমার বন্ধু গিয়াসউদ্দিনের সহোদরা। গিয়াসউদ্দিনের সূত্রেই এঁদের সঙ্গে এবং তাঁর ছোটো ভাই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র রশিদউদ্দিন আহমদের (এখন স্বনামধন্য নিউরো-সার্জন) সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। তাঁদের বাবা আবদুল গফুর বোধহয় ১৯১৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানে এম এ পরীক্ষার্থী ছিলেন, কিন্তু পরীক্ষা না দিয়ে তিনি সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি নিয়েছিলেন। তাঁর মুখে শুনেছি, একবার তাঁর শিক্ষক জগদীশচন্দ্র বসুর বিলেতযাত্রার প্রাক্কালে তিনি হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিলেন তাঁকে বিদায় দিতে। তিনি ছিলেন কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ মানুষ—কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি হলে কিংবা পরীক্ষা শেষ হলে ছেলেমেয়েরা কোন ট্রেনে বাড়ি যাবে, তা অগ্রিম চিঠি লিখে স্থির করে দিতেন। প্রেমজ বিবাহে তাঁর অনুমোদন ছিল না, তাছাড়া হামিদার তখনো বিয়ে হয়নি। নুরুল হক বোধহয় সংগতভাবেই ধরে

নিয়েছিলেন যে, হামিদার বিয়ে হয়ে গেলেও (সহপাঠী এখলাসউদ্দিন আহমেদের—পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক—সঙ্গে তাঁর বিয়েও পিতার অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিল) ফরিদার সঙ্গে তাঁর বিয়েতে মামার আপত্তি থাকবে। সুতরাং তিনি আর দেরি করার কারণ দেখতে পেলেন না।

নুরুল হকের এই সিদ্ধান্ত জানতে পেরে আমি একটু দোটানায় পড়ে গেলাম। আর কিছু নিয়ে নয়, এই গোপন পরিকল্পনার কথা গিয়াসউদ্দিনকে জানাবো কী না। গিয়াস পিতৃ-অন্ত প্রাণ—বাবার মনে আঘাত লাগে, এমন কোনো কাজ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। নিজের বিয়ের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ছিলেন, কেননা অভিভাবকের পছন্দসই পাত্রীর পাণিগ্রহণে তাঁর রুচি ছিল না, আবার নিজের পছন্দমতো বিয়ে করতে চেয়ে বাবাকে অসন্তুষ্ট করার ইচ্ছাও ছিল না। নুরুল হককে জিজ্ঞাসা করলাম, কথাটা গিয়াসকে জানাবো কি না। তিনি বললেন, তিনি জানাচ্ছেন না, তবে আমি চাইলে নিজের দায়িত্বে তাঁকে বলতে পারি। একদিন ক্লাসের শেষে গিয়াসকে একান্তে ডেকে খবরটা দিলাম। গিয়াস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'তুমি আমাকে এটা না জানালে পারতে। বাবাকে যদি খবরটা দেই, তবে তিনি বাধা দিতে চেষ্টা করবেন; আর পরে যদি বিয়ের কথা শোনেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি জানতাম কি না, তাহলে আমি মুশকিলে পড়বো। আমি জেনেও এ-বিষয়ে ওঁকে কিছু জানাইনি—এমন শুনলে উনি মর্মাহত হবেন। সেটা এড়াতে হলে আমাকে মিথ্যে বলতে হবে। তার চেয়ে না-জানাই ভালো ছিল।' আমি বললাম, 'ঠিক এই কারণেই হয়তো নুরুল হক আপনাকে কিছু জানাননি। কিন্তু আমি জানলাম, বিয়েতে উপস্থিত থাকবো, অথচ কিছুই বললাম না আপনাকে—এটা আমার পক্ষেও খুব অস্বস্তিকর। কথাটা আমি নিজের দায়িত্বে আপনাকে বলেছি। আশা করি, আপনি এমন কিছু করবেন না যাতে বিঘ্ন ঘটে। বাবার প্রতি আপনার কর্তব্য আছে নিশ্চয়, কিন্তু বোনের দিকটা বিবেচনা না করাও আপনার ঠিক হবে না।' গিয়াস চুপ করে থাকলেন।

বিয়েটা হলো নুরুল হকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু—সিভিল সার্ভিসের সদস্য—সাইদুজ্জামানের সরকারি বাড়িতে—এখন সেখানে সিরডাপের দপ্তর। আহমদ মগবাজার থেকে কাজী ডেকে নিয়ে এলো; মুহিত হলেন উকিল; ড. এ এম হারুন-অর-রশিদ আর আমি সাক্ষী। বিবাহোত্তর সংবর্ধনা একটা হয়েছিল—খুব বেশি লোকজন ছিলেন না, তবে ফুলের তোড়া নিয়ে রশিদউদ্দিন এসেছিলেন।

১৯.

১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে পিএইচ ডির অভিসন্দর্ভ জমা দিই। মার্চেই জমা দিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু দেখা গেল, আমার অভিসন্দর্ভের শিরোনামে যেখানে আছে 'ইংরেজ আমল', বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় সেখানে লেখা হয়েছে 'ব্রিটিশ আমল'। আমি যে জ্ঞাতসারে 'ব্রিটিশ' লিখিনি, এটা নিশ্চিত। কিন্তু নথিভুক্ত হওয়ার সময়ে গোলমালটা যে আমি খেয়াল করিনি, তাতে হাই সাহেব আমার ওপরে বিরক্ত হলেন। এখন

শিরোনাম সংশোধনের আবেদন করতে হলো এবং তার জন্যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পেতে এক মাস লেগে গেল।

আমার পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভের পরীক্ষক ছিলেন তিনজন : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ—তখন বাংলা একাডেমীতে আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধানের সম্পাদকের দায়িত্বে কর্মরত; ড. মুহম্মদ এনামুল হক—তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ; আর ড. নীহাররঞ্জন রায়—*বাঙ্গালীর ইতিহাস* নামে বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগীশ্বরী অধ্যাপক। নীহাররঞ্জন রায়ের কাছে আমার অভিসন্দর্ভ পৌঁছোনোর পর পরই তিনি অতিথি অধ্যাপক হয়ে চলে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ফিরে এসে রিপোর্ট দিতে স্বভাবতই দেরি হয়। অভিসন্দর্ভ জমা দেওয়ার এক বছর পর মৌখিক পরীক্ষার তারিখ পড়লো : ২১ এপ্রিল ১৯৬২। বাংলা একাডেমীতে বসে একাই পরীক্ষা নিলেন শহীদুল্লাহ্। আমাকে বসতে বলেই পরীক্ষকদের রিপোর্টগুলো পড়তে দিলেন। বললেন, 'অফিসিয়ালি এগুলো তোমাকে কনট্রোলার অফিস পাঠিয়ে দেবে। তোমাকে দেখতে দিচ্ছি, কেননা এর ভিত্তিতে ভাইভা নেবো।'

সকলে একযোগে সুপারিশ না করলে মৌখিক পরীক্ষায় ডাকা হতো না, জানি। তবু দুরুদুরু বক্ষে রিপোর্ট পড়তে লাগলাম। শহীদুল্লাহ্ অনেক প্রশংসা করে সুফিবাদ সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন (তাঁর পরিবার পীর গোরাচাঁদের খাদেম)। এনামুল হক আমার অভিসন্দর্ভের কাঠামো বিশ্লেষণ করেছেন, ডিগ্রি দিতে সুপারিশও করেছেন, তবে বলেছেন, দেশকালের পটভূমি সম্পর্কে যেসব প্রচলিত মত আমি খণ্ডন করতে চেয়েছি, ইতিহাসে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হয়ে তেমন করা আমার পক্ষে সংগত হয় নি। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, ইতিহাস সম্পর্কে আমার নির্মোহ দৃষ্টি এবং মুক্তবুদ্ধিজাত আমার আলোচনা তাঁকে প্রীত করেছে। পরীক্ষকেরা যেখানে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন, সেসব বিষয়ে, এবং কোনো কোনো কবির কালবিচারে আমার বক্তব্য সম্পর্কেই প্রধানত প্রশ্ন হলো। তারপর এক সময়ে শহীদুল্লাহ্ ইংরেজিতেই বললেন, 'কনগ্রাচুলেশনস ইন অ্যাডভান্স।'

রিকশা করে ফিরছি বাড়ি, তখনো পরীক্ষার ঘোর কাটেনি। রেলওয়ে হাসপাতালের উলটো দিকে নিজের বাংলোর দরজায় নুরুল হক দাঁড়িয়ে। তিনি হাঁক দিয়ে আমাকে থামালেন; জানালেন, খানিক আগেই তাঁর পুত্রসন্তান লাভ হয়েছে (ডা. জিয়াউল হক—এখন পঙ্গু হাসপাতালে শল্যবিদ)। আমি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে মৌখিক পরীক্ষার খবর দিলাম। তিনি অভিনন্দন জানালেন—শহীদুল্লাহ্ সাহেবের পরে তিনিই প্রথম।

পরের মাসে আবার রিকশা করে ওই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছি। ফজলুল হক মুসলিম হলের পুবদিকের এক বাংলোয় থাকতেন ড. মোকাররম হোসেন খোন্দকার। তিনিও আমাকে থামালেন, অভিনন্দন জানালেন ডিগ্রি পেয়ে গেছি বলে। পেয়ে যাওয়ার খবরটা আমি জানতাম না শুনে তিনি বিস্মিত হলেন। বললেন, 'অ্যাকাডেমিক কাউনসিলে তো পাশ হয়ে গেছে—হাই সাহেব তোমাকে জানান নি?'

হাই সাহেবের সঙ্গে বোধহয় এ-নিয়ে তাঁর কথা হয়েছিল। পরে হাই সাহেব বললেন, 'অ্যাকাডেমিক কাউনসিলে তোমার ডিগ্রি রিকমেন্ডেড হয়েছে, কিন্তু

সিন্ডিকেটের অ্যাপ্রুভাল এখনো হয়নি বলে তোমাকে বলি নি। তুমি যে জেনেছ, তা কাউকে বোলো না।' আমি তো এদিকে নিকটজনদের সবাইকে বলে বসে আছি—সেকথা আর তাঁকে বললাম না। মে মাসেই আনুষ্ঠানিকভাবে ডিগ্রিপ্রদানের খবর বের হলো। এবার অন্তত কাগজে সচিত্র প্রতিবেদন যাক—আব্বার এমনই ইচ্ছা। রিপোর্ট লিখে নিজেই কাগজে দিয়ে এলাম, ছবি ছাড়া। কোনো কোনো কাগজে তা ভালো জায়গায় ছাপা হলো। প্রচুর অভিনন্দন পেলাম। ছবি ছাপানোর লজ্জা বাঁচালাম বটে, কিন্তু অচিরে তার চেয়ে বেশি লজ্জায় ফেললেন ড. শহীদুল্লাহ্।

চব্বিশ পরগনা সম্পর্কে, বিশেষ করে বসিরহাট সম্পর্কে, শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মজ্জাগত দুর্বলতা ছিল। তিনি কঠিন আরবি নামের একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন—আসলে তা ছিল এক ধরনের চব্বিশ-পরগনা-সমিতি। আমার ছাত্রজীবনেই তিনি আমাকে এই সংগঠনের কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। আমি কোনো উৎসাহ দেখাই নি বলে একদিন দুঃখ করে বলেওছিলেন, 'দেশের প্রতি তোমার টান নেই।' অনুরূপ ভর্ৎসনা করেছিলেন ডা. এ কে এম আবদুল ওয়াহেদ কয়েক বছর পরে। তিনি আমাকে বলেছিলেন বসিরহাটের ইতিহাস লিখতে। আমি আগ্রহ বোধ করি নি, তাই দায়িত্ব এড়াতে বলেছিলাম, 'এখানে বসে বসিরহাটের ইতিহাসের মেটেরিয়ালস কোথায় পাবো?' খালু বেশ রেগে গিয়ে বললেন, 'এই গবেষণা শিখেছ? মেটেরিয়ালস তোমার আব্বা, মেটেরিয়ালস আমি। আমাদের মতো আরো অনেকে আছে। তাদের ইন্টারভিউ নাও। বইপত্র খুঁজে বের করো। তুমি না পিএইচ ডি করেছ?'

যাহোক, এখন পিএইচ ডি করায় শহীদুল্লাহ্ সাহেব তাঁর সেই কঠিন আরবি নামের সংগঠন থেকে আমাকে সংবর্ধনা দিতে মনস্থ করলেন। এর মধ্যে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পরে গঠিত আইয়ুব খানের নতুন মন্ত্রিসভায় বসিরহাটের সুসন্তান ব্যারিস্টার এ টি এম মোস্তফা সদস্য নিযুক্ত হলেন। শহীদুল্লাহ্ সাহেব উদ্‌যোগ নিলেন আমাদের দুজনকেই একসঙ্গে সংবর্ধিত করার। আতঙ্কিত হয়ে আমি তাঁর কাছে ছুটলাম—নানা ওজর-আপত্তি করলাম, কোনো কাজ হলো না। এক শুভক্ষণে ইসলামিক একাডেমীর মিলনায়তনে একযোগে এ টি এম মোস্তফা ও এ টি এম আনিসুজ্জামানের সংবর্ধনা হয়ে গেল। কুণ্ঠিত হয়ে বসে রইলাম মঞ্চে। শহীদুল্লাহ্ সাহেব নিজে সম্মাননা-পত্র লিখেছেন, সাদা কাগজে সোনালি অক্ষরে ছাপা এবং সোনালি রঙের কাঠের ফ্রেম ও কাচে বাঁধানো তার দুটি কপি আমাদের হাতে তিনি নিজেই তুলে দিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে সম্মাননা-পত্রের কপি বিলি করা হলো ঈষৎ গোলাপি কাগজে কালো অক্ষরে ছাপিয়ে। জনসমাগম ভালো হয়েছিল—সবাই মুরুব্বিস্থানীয়, আমার বয়সী কেউ ছিল বলে মনে হয় না। আন্তরিক শুভেচ্ছাই জানালেন তাঁরা। আব্বা খুব গর্বিত বোধ করলেন। একে ডিগ্রি-প্রাপ্তিতে সংবর্ধনা, তায় আইয়ুবের মন্ত্রীর সঙ্গে—আমার অস্বস্তি প্রকাশ করতে পারলাম না—কেউ বুঝতেও পারলেন না। বেসামরিক সরকারের ছদ্মবেশে সামরিক শাসন সম্পর্কে আমার মানসিক বিরূপতা তো ছিলই, তার ওপর, ততদিনে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়ে গেছে।

২০.

আজিমপুর কলোনিতে সরকারি বাসা পেয়ে ছোটোবুরা ঠাটারিবাজার ছেড়ে চলে গেল। বসার ঘর এখন একটার জায়গায় দুটো হলো এবং বাকিটা অব্যবহৃত পড়ে থাকলো। বড়ো বৈঠকখানায় বসে সৈয়দ শামসুল হকের প্রথম গল্পগ্রন্থ *তাস* (ঢাকা, ১৯৫৪)-প্রকাশের পরিকল্পনা হয়েছিল। বইয়ের শেষ প্রচ্ছদে যা ছাপা হয়েছিল, তা-ও আমি লিখেছিলাম এখানে বসে।

পরে একতলাটার একটু সংস্কার করে ভাড়া দেওয়ার সংকল্প করা হয়। ভাড়াটা কম ছিল বলে তা নেওয়ার আগ্রহীর সংখ্যা ছিল বেশ। তবে আবদুর গনি হাজারী যখন চাইলেন, তখন আর অন্যদের কথা বিবেচনার অবকাশ থাকলো না।

হাজারী ভাই তখন *পাকিস্তান অবজার্ভার* গ্রুপের ম্যানেজিং এডিটর। তিনি রোজ এককপি *অবজার্ভার* আমাকে পাঠাতেন–ভুলচুক থাকলে দাগ দিয়ে দেওয়ার জন্যে। তিনি তখনো অবিবাহিত। যে-ছেলেটি তাঁর কম্বাইন্ড হ্যান্ড ছিল, তার নির্ধারিত বেতনক্রম ছিল, বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি ছিল, চিকিৎসাভাতা ছিল, বছরে একমাস পুরো মাইনেয় ছুটির ব্যবস্থা ছিল। গার্হস্থ্যকর্মীদের জন্যে এমন ব্যবস্থা আমি কোথাও দেখিনি।

কামরুল হাসান ও সরদার জয়েনউদ্দিন ছিলেন বোধহয় হাজারীর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। মরিয়ম খোন্দকার তখন স্বামীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, কামরুল ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সকলের জানা হয়ে গেছে। হাজারী ভাইয়ের আস্তানায় অল্পলোকের উপস্থিতিতে তাঁদের বিয়ে হলো। সে-বিয়েতে হাজারী ভাই উকিল এবং আহমদ ও আমি সাক্ষী।

হাজারী ভাইয়ের পরে নিচতলায় এলেন সাপ্তাহিক *চিত্রালী*-সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজ, সেইসঙ্গে তাঁর মা। এ-বাড়িতে থাকতেই তাঁর বিয়ে হয়। তবে পারভেজের অকালপ্রয়াণ ঘটে আমাদের বাড়ি ছাড়ার পরে।

তারপর আর কোনো ভাড়াটে আমাদের বাড়িতে আসেননি। নিজেদেরই প্রয়োজন হয়েছিল বাড়তি জায়গার।

২১.

আব্বা যদিও বিয়ের জন্যে আমাকে তাড়া দেননি, মা বেশ অস্থির হয়ে উঠেছিল। আগে থিসিস শেষ করি, একথা বলে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। মোহাম্মদ মোদাব্বেরের স্ত্রী হোসনে আরা একদিন যখন আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন, মা তখন আমার সামনেই তাঁর কাছে নালিশের সুরে বলেছিল যে, সময় চলে যাচ্ছে অথচ বিয়েতে আমার সম্মতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। হোসনে আরা বু বললেন, 'তোর যদি কোনো পছন্দ থাকে, তাহলে খুলে বল।' বললাম, 'এখনো কিছু ঠিক করিনি।' মা বললো, 'কার সঙ্গে যেন টেলিফোনে অনেকক্ষণ কথা বলে।' বু হেসে দিলেন।

অভিসন্দর্ভের দায়িত্বমুক্ত হয়ে তাই অন্য দায়িত্ব নিতে অগ্রসর হলাম। বড়োবুরা তখন খুলনায়, দুলাভাই সেখানে এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স অফিসার। বড়োবুকে চিঠি লিখে নিজের পছন্দের কথা জানালাম। দুলাভাই ফোন করলেন আব্বাকে, তাঁদের

মধ্যে আরো দু-তিনবার কথা হলো। আব্বা-মা একদিন বেবীর আব্বার কাছে কথাটা পেড়ে এলেন ওদের বাড়ি গিয়ে। বেবী তখন কলকাতায় গেছে আম্মার সঙ্গে। ওঁরা ফিরে এলে বিষয়টা চূড়ান্ত হবে বলে স্থির হলো।

বেবী কলকাতা থেকে আমাকে চিঠি লিখতো। একদিন চিঠি পেলাম খোলা অবস্থায়। মাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'চিঠি খোলা কেন?' বললো, 'আমি খুলেছি।' জানতে চাইলাম, 'আমার চিঠি তুমি খুলতে গেলে কেন?' মা বললো, 'এমনি।' ডাক্তারখানা থেকে আব্বা ফিরে এলে নালিশ করলাম, 'মা আমার চিঠি খুলে পড়ে।' একটু অতিশয়োক্তি হয়ে গেল, কেননা ওই একটি চিঠি ছাড়া মা কখনো আমার কোনো চিঠি খোলেনি। কার চিঠি তা জানতে না চেয়েই আব্বা একটু বিরক্তভাবে মাকে বললেন, 'ছেলে এখন বড়ো হয়েছে, ওর চিঠিপত্র দেখতে যাওয়া তোমার ঠিক নয়।' মা অপরাধীর মতো চুপ করে রইলো। আব্বা আমাকে বললেন, 'যাও, এমন আর হবে না।'

বেবীরা কলকাতা থেকে ফিরে এলে পাকা কথা হলো। দুলাভাইকে আব্বা আসতে বললেন খুলনা থেকে। কথাবার্তা হলো বেবীর চাচা—একাত্তরের শহীদ—সলিসিটর আবদুল আহাদের মগবাজারের বাড়িতে। পাত্রপক্ষে আব্বা, মা আর দুলাভাই; পাত্রীপক্ষে বেবীর আব্বা, আম্মা ও চাচা। চা-নাশতা খেতে খেতে সব কথা হয়ে গেল। তারিখ ঠিক হলো ৮ অক্টোবর। পরে সেটা এগিয়ে আনা হয় ১ অক্টোবরে। মসি শুনে বললো, 'যেমনভাবে তারিখ এগিয়ে আনছিস, এরপর হয়তো শুনবো এর মধ্যেই বিয়ে হয়ে গেছে।'

বিয়ে হলো স্বামীবাগের গোপীবাগ কমিউনিটি সেন্টারে। সৈয়দ আজিজুল হক ওরফে নান্না মিয়া তার কর্তৃপক্ষের একজন। তিনি পরে আমাকে বলেছিলেন যে, ওই কমিউনিটি সেন্টারে সেটাই ছিল প্রথম বিয়ে। ড. নীলিমা ইব্রাহিম কালো রঙের একটা স্কোডা কিনেছিলেন। সেই গাড়ি চড়েই গেলাম বিয়ে করতে। কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রিত কেউ কেউ ভিড়ের কারণে না খেয়ে চলে এসেছিলেন। তার মধ্যে একজন ছিলেন সাংবাদিক কে এল খতিব, আরেকজন শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী। অসুস্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত দেবদাস কতোবার যে এ-কথা আমাকে শুনিয়েছেন, তা বলা যায় না। ওঁদের খেতে না পারার কথা অন্য কেউ কেউও এখনো আমাকে বলেন। আসলে খাবার কম পড়েনি, ভিড়ের জন্যে অতিথিদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

বিয়ের বাজার বেশির ভাগই ছোটোবু করেছিল সোৎসাহে। তার সঙ্গে আমি থাকতাম, কিন্তু দোকানে ঢুকতাম না। শুধু তার চূড়ান্ত পছন্দ হলে ভেতরে গিয়ে যা করণীয় তা করে আসতাম। এমন সময়েই হয়তো কখনো তাকে বলেছিলাম, নববধূ নিয়ে বিয়ের পরপর কোথাও বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। বিয়ে হতে হতে টাকা-পয়সা সব ফুরিয়ে যাওয়ায় এ-বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করিনি। কিন্তু ছোটোবুর কাছ থেকে শুনে বড়োবু জোর করে বললো, 'আমি টাকা দিচ্ছি, তুমি না হয় ধার হিসেবেই নাও, কিন্তু বেড়িয়ে এসো।' বউভাতের আনুষ্ঠানিকতা সেরে কক্সবাজারের উদ্দেশে রওনা হলাম। নুরুল হকের সাহায্যে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম আরামে যাওয়া গেলো ট্রেনে। ট্রেন থেকে নেমে কিছু খেয়েদেয়ে বিমানবন্দরে এসে দেখি, প্লেন আছে, কিন্তু টিকিট নেই। রাতটা চট্টগ্রামে কোনো হোটেলে কাটাবো মনে করে বিমানবন্দর থেকে বেরোতে

যাচ্ছি, দেখা পেয়ে গেলাম রফিকুল ইসলামের। তিনি নুরুল হকের বন্ধু, সেই সূত্রে আমারও পরিচিত—তখন চট্টগ্রামে অ্যাসিস্ট্যান্ট এয়ারপোর্ট অফিসার। তিনিও আমাদের জন্যে টিকিটের ব্যবস্থা করতে পারলেন না, কিন্তু ধরে নিয়ে গেলেন তাঁর কোয়ার্টারে। সেইখানে রাত্রিযাপন হলো।

পরদিন প্লেনে করে কক্সবাজার পৌঁছোলাম। কোথায় থাকবো কিছু ঠিক নেই। আমাদের কালের ছাত্র ইউনিয়নের নেতা আবদুস সাত্তার একটা চিঠি লিখে দিয়েছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র—কক্সবাজারের এস ডি ও—হারুনুর রশীদকে। খোঁজ করে জানলাম, এস ডি ও সাহেব বন্ধুবান্ধব নিয়ে সমুদ্র-উপকূলে বেড়াতে গেছেন। আমরা তাঁর দলকে খুঁজে বের করলাম, কিন্তু যাঁকে এস ডি ও বলে ঠাহর করলাম তিনি হাবিবুল্লাহ খান (পরে মন্ত্রী ও রাষ্ট্রদূত)। তিনি নাকি আমাদের আসতে দেখে বলেছিলেন যে, আমরা এস ডি ওকে খুঁজছি এবং তাঁকেই অন্বিষ্ট বলে ভুল করবো। হাবিবুল্লাহ খান বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এক ক্লাস ওপরে পড়তেন, তাঁকে ক্রিকেট খেলতে দেখেছি, সুতরাং ভুল করা আমার উচিত ছিল না। দেখা গেল, তিনি আমাকে চেনেন, তবে বেবীর খেলাধুলার খবর বেশি রাখেন।

এস ডি ওর বদান্যতায় সার্কিট হাউজে জায়গা পাওয়া গেল। দিন তিনেক পরে বিমানে করে চট্টগ্রামে ফিরলাম। এবার ঠিকই করে এসেছিলাম যে, বিমানবন্দর থেকে সোজা মিশকা হোটেলে গিয়ে উঠবো। কিন্তু নিয়তির মতো বিমানবন্দরে উপস্থিত হাবিবুল্লাহ খান—তিনি কাউকে প্লেনে তুলে দিতে এসেছেন। তিনি সরাসরিই বললেন, 'চলুন আমার বাড়িতে।' আপত্তি করার সুযোগ পাওয়া গেল না। বেবীর এক বান্ধবীকেও খুঁজে বের করে তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলেন।

পরদিন রাতের ট্রেনে ঢাকায় রওনা হলাম।

বিয়েটা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎকালীন অবকাশের ঠিক আগে। আমি চারদিনের ছুটি চেয়েছিলাম এবং তার সঙ্গে ওই অবকাশ যোগ করার প্রার্থনা জানিয়েছিলাম। ঢাকায় ফেরার পরে একদিন রেজিস্ট্রারের দপ্তরে গেছি। এক কেরানি ভদ্রলোক আমাকে ডেকে বললেন, 'সার্, বাইশ দিন আপনার লিভ উইদাউট পে করে দিয়েছি।' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন?' তিনি বললেন, 'আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট সাবস্টেন্টিভ নয়—অস্থায়ী। তিন দিনের বেশি একটানা ছুটি আপনি পেতে পারেন না। কাজেই ফোর্থ ডে লিভ উইদাউট পে আর তার সঙ্গে ছুটির পিরিয়ড যোগ হবে—এটাই নিয়ম।' আমি ম্লানমুখে ফিরে আসতে পা বাড়ালাম। তিনি বললেন, 'ও কী, চলে যাচ্ছেন কেন?' আমি বললাম, 'আমার আর কী করার আছে—আপনি তো আইনের কথা বললেন।' তিনি বললেন, 'আইন যেমন আছে, তেমনি আইনের ফাঁকও আছে।' উৎসাহিত হয়ে জানতে চাইলাম, 'তাই নাকি?' কেরানি অনুযোগ করলেন, 'সার্, বিয়ে করলেন আর দরখাস্তে ছুটি চাইবার কারণ বললেন, পার্সোনাল রিজনস। ছুটি সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ করলেন না।' আমি চুপ করে থাকলাম। তিনি বললেন, 'কাল একটা নতুন দরখাস্ত পাঠান, সার্। তাতে বলবেন তিন দিনের ছুটি চাই, চতুর্থ দিন চাই বিনা বেতনে ছুটি, আর তার সঙ্গে অটাম ভ্যাকেশন অ্যাফিক্স করার পারমিশন চাই।' আমি বললাম, 'তাতে হবে?' 'কেন হবে না? ভাইস-চান্সেলরের ক্ষমতা আছে

তা করার।' জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে আপনি যে উইদাউট পে করে দিলেন পুরোটা সময়!' সে বললো, 'করে দিলাম, কেননা আপনি ওভাবে দরখাস্ত করেননি। এখন দরখাস্ত করেন, যা করেছি, তা উলটে দেবো।'

দরখাস্ত করলাম। একদিনের বেশি আমার বিনা বেতনে ছুটি হয়নি।

২২.

আমার বিয়ের কিছুকাল পরে মুহিতের বিয়ে হলো। পাত্রী এখানে ফুপাতো বোন। সাবিয়া তখন ইতিহাসে এম এ চূড়ান্ত পর্বের ছাত্রী। আব্বার গাড়ি চেয়ে বেবী আর আমি বরযাত্রী হতে গেছি। মুহিত মিন্টো রোডে থাকতেন। মিন্টো রোড আর হেয়ার রোডের সংযোগস্থলে এসে দেখি, গাড়ির বহর রওনা দিয়েছে। তখন নির্ধারিত সময়ের পর মিনিট দুই-তিন অতিবাহিত হয়েছে। মুহিতের বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে বরযাত্রীর দলে যোগ দিলাম।

এই ধারায় তখনকার মতো সর্বশেষ বিয়ে হলো আবদুল আলী ও লীলু আপার—১৯৬২ সালের মার্চ মাসে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে আলী তখন যোগ দিয়েছেন রেলওয়ে অ্যাকাউন্টস সার্ভিসে, নীলু আপা রয়ে গেছেন সিঙ্গারে। বিয়ের মজলিসে বরের পাশে বসে গিয়াসউদ্দিন আর সাদউদ্দিন মুখে মুখে দাবা খেলেছিলেন—ঘটনাটা সেদিন আলী মনে করিয়ে দিলো।

আরেকটি বিয়ে হতে হতে হলো না—সেটি মোকাম্মেলের। পরস্পরের পছন্দ-অনুযায়ী সে বিয়ে করতে চেয়েছিল। তার আব্বার—ভোলার কবি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের—অনুমোদন আদায় করতে হয়েছিল আমাকে বেশ কষ্ট করে। কনের বাড়িতে প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলাম মুহিত, নুরুল হক, আমি এবং মোকাম্মেলের এক অগ্রজ। আমাদের পাড়ার দোকান থেকে ধারে মিষ্টি নিয়ে সেখানে গিয়েছিলাম। কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। তার বেশ কিছুদিন পর, পাত্রীপক্ষ যখন বিয়ের বাজার করছে, তখন লাহোরের সিভিল সার্ভিস একাডেমি থেকে মোকাম্মেল আমাকে ও তার বাগদত্তাকে চিঠি লিখে জানালো যে, তার মত ঘুরে গেছে।

২৩.

সূচনাটা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই, তবে তার ক্ষেত্রটা প্রস্তুত করেছিল সামরিক সরকার স্বয়ং। ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি করাচিতে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ নিয়ে পূর্ব বাংলায় তাৎক্ষণিকভাবে—খবরের কাগজের ভাষায়—অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠল। ফেব্রুয়ারির ২ বা ৩ তারিখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনজুর কাদির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্র-বিষয়ে বক্তৃতা দিতে। কলাভবনের দোতলায় একটা শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা হবে। শিক্ষকদের অনেকেই সেখানে গেছি তাঁর

কথা শুনতে। ছাত্রেরা এত অধিক সংখ্যায় এসেছে যে তাদের অনেককেই দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। ভাইস-চান্সেলর ড. মাহমুদ হোসেন মন্ত্রীকে নিয়ে ঘরে ঢোকেন। মনজুর কাদির বোধহয় দু-এক মিনিট কথা বলতে পেরেছিলেন, তারপর ছাত্রদের মধ্যে থেকে একজন—খুব সম্ভব ছাত্র ইউনিয়নের জিয়াউদ্দীন মাহমুদ (এখন প্রবাসী)—জানতে চাইলো, সোহ্‌রাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তার করা হলো কেন? মনজুর কাদির বললেন, তিনি পররাষ্ট্র-বিষয়ে বক্তৃতা করতে এসেছেন—পররাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জবাব দেবেন, কিন্তু অন্য বিষয়ে কিছু বলবেন না। তখন আরেকজন (মোশতাক হোসেন কি?) দাঁড়িয়ে উঠে বললো, 'আপনি সরকারের মন্ত্রী—সরকারের যৌথ দায়িত্বের আপনি অংশীদার—আপনাকে জবাব দিতে হবে।' সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বিভিন্ন দিক থেকে ছাত্রেরা—এদের অনেককেই ছাত্রলীগ-নেতা শেখ ফজলুল হক মণি সংগঠিত করে এনেছিল—জবাব দাবি করে। সেই সঙ্গে দাবি ওঠে সোহ্‌রাওয়ার্দীর মুক্তির এবং সামরিক শাসন প্রত্যাহারের। মনজুর কাদির কিছু বলতে চান, তাঁর কথা শোনা যায় না। মাহমুদ হোসেন ছাত্রদের থামাতে চেয়ে ব্যর্থ হন। শেষে তিনি এবং কয়েকজন প্রবীণ শিক্ষক মন্ত্রীকে ঘিরে বের করে নিয়ে যান ঘর থেকে, কোনো মতে তুলে দেন গাড়িতে। পেছনে পেছনে ছাত্রেরা সংঘবদ্ধ হয়ে আসে, আওয়াজ তোলে, 'মনজুর কাদির ফিরে যাও', 'আইয়ুব খান নিপাত যাক', 'সামরিক শাসন ফিরিয়ে নাও'। যতদূর মনে পড়ে মনজুর কাদির কলাভবন-চত্বর ত্যাগ করার আগেই, তাঁকে দেখিয়ে, আইয়ুব খানের একটি ছবিও ছিঁড়ে ফেলা হয়।

এরপর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়—সম্ভবত রমজানের ছুটি হয়ে যায়, তবে নির্ধারিত তারিখ এগিয়ে আনা হয়। তারপরই শুরু হয়ে যায় ধরপাকড়। আবুল মনসুর আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান, কফিলউদ্দীন চৌধুরী, তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) এবং আরো অনেকে গ্রেপ্তার হন। কদিন পর আইয়ুব প্রবর্তন করেন 'মৌলিক গণতন্ত্র'-সংবলিত পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র। তার পরপরই কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী বিচারপতি মোহাম্মদ ইবরাহিমকে অসুস্থতার কারণে অব্যাহতি দেওয়া হয় দায়িত্ব থেকে, তবে সাংবাদিকদের তিনি জানিয়ে দেন যে, শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে মতানৈক্যের কারণে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে তিনি ঢাকায় চলে আসেন বেশ কয়েক মাস আগে এবং ঘরোয়াভাবে স্পষ্টই বলেন যে, ওই শাসনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষিত হয়নি। ওদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পরে রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ছাত্রেরা ধর্মঘট করে, আন্দোলন চালায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে নানাদলের সাতজন নেতা একসঙ্গে বিবৃতি দেন নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিরোধিতা করে। নির্বাচনপ্রিয় এ কে ফজলুল হক তখন রোগশয্যায়—এর অব্যবহিত পরে ২৭ এপ্রিলে তাঁর মৃত্যু হয়। কে এম দাস লেনে তাঁর বাড়ি থেকে লাশের অনুগমন করে অনেক মানুষ। গভর্নমেন্ট হাউজের কাছে যখন লাশ এসেছে, তখনো বহু লোক কে এম দাস লেনের মুখে। আর সেই সময়ে গভর্নমেন্ট হাউজ থেকে বেরিয়ে আসেন গভর্নর আজম খান—পুষ্পার্ঘ্য দেন লোকান্তরিত নেতাকে, প্রহরা ছাড়াই যোগ দেন পদযাত্রায়। পরের দিন জাতীয় পর্যায়ে এবং তারপরে প্রাদেশিক পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বেশির ভাগ রাজনীতিক অবশ্য নির্বাচন বর্জন করেন। তারপর হঠাৎ

ঘোষিত হয় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের দায়িত্ব থেকে আজম খানকে অব্যাহতি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান।

যে-কজন সামরিক কর্মকর্তা আইয়ুব খানের সঙ্গে মিলে দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল আজম খান ছিলেন তাঁদের একজন। ১৯৫৩ সালে জামায়াতে ইসলামী ও মজলিসে আহ্‌রারের উদ্‌যোগে আহমদিয়া-বিরোধী দাঙ্গা দমন করতে কেন্দ্রীয় সরকার যখন লাহোরে সামরিক শাসন জারি করেন, তখন লাহোরের সেনাপ্রধান হিসেবে আজম খান শক্ত হাতে হাল ধরেন। সেনাদের তাড়া খেয়ে দাঙ্গাকারীরা মসজিদে আশ্রয় নিলে তিনি মসজিদেব মধ্যে গুলিচালনার নির্দেশ দিতে দ্বিধা করেন নি। যে-কজন সামরিক কর্মকর্তা প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মীর্জার কাছে যেয়ে তাঁর পদত্যাগপত্র আদায় করেন, তাঁদের মধ্যেও একজন ছিলেন আজম খান। ১৯৬০ সালে যখন তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হয়ে এখানে আসেন, তখন ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, এই প্রদেশের রাজনৈতিক কার্যকলাপ কঠোরভাবে দমন করার জন্যেই তাঁকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। মুঘল যুগে যেমন বলা হতো, কেন্দ্র থেকে কাউকে বাংলায় পাঠালে এখানকার জলবায়ুর গুণে সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, আজম খানের ক্ষেত্রেও অনেকটা তাই হয়েছিল। তিনি গভর্নর হওয়ার কিছুকাল পরেই পূর্ব বাংলায় বড়োরকম ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয় এবং তাতে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। বিমানে না গিয়ে ট্রেনে করে চট্টগ্রাম যাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন গভর্নর, ফলে দ্রুততম সময়ে বিধ্বস্ত রেলপথ পুনরায় চালু হয়। এই সময়ে মানুষকে সর্বপ্রকার সাহায্যদানের জন্যে তাঁর তৎপরতা সকলের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিক অনুষ্ঠানে যতটা বাধা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এসেছিল, প্রাদেশিক সরকার থেকে ততটা নয়। আজম খান গভর্নর থাকায় তা ঘটতে পেরেছিল, কেননা তিনি পূর্ব বাংলার মানুষের আবেগ ও অভিপ্রায় অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ঈদের দিনে সাধারণ মানুষের জন্যে তিনি গভর্নমেন্ট হাউজের দ্বার খুলে দিতেন এবং তাদের সঙ্গে বসে সানকিতে করে খাবার খেতে দ্বিধাবোধ করতেন না। মনজুর কাদির-সংক্রান্ত ঘটনার পরে, ভাষা-আন্দোলনের শহীদ মিনারের অসমাপ্ত রূপকে সম্পূর্ণতাদানের জন্যে, ভাইস-চান্সেলর মাহমুদ হোসেনকে সভাপতি, শিল্পী জয়নুল আবেদিন, মুনীর চৌধুরী এবং আরো কয়েকজনকে সদস্য করে তিনি একটি কমিটি করে দেন আর পরবর্তী একুশে ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্মাণকাজ শেষ করতে নির্দেশ দেন। প্রদেশে তিনি যত জনপ্রিয় হন, আইয়ুব ততই ঈর্ষান্বিত ও ক্রোধান্বিত হন। আজম খানের বিরুদ্ধে আইয়ুব অভিযোগ আনেন কেন্দ্রের নির্দেশ গ্রাহ্য না করার এবং নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করে যাওয়ার। আজম খান উত্তরে জানান, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আবেগ-অনুভূতি চাহিদা-অভিপ্রায় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার সংবেদনহীন এবং তার পরিণাম সম্পর্কে দুশ্চিন্তাহীন; তিনি এটা উপলব্ধি করেই দেশের ঐক্যের স্বার্থে কাজ করতে চেয়েছেন, তাঁর কোনো ব্যক্তিগত অভিলাষ এর পেছনে সক্রিয় ছিল না।

আইয়ুব খানের ইচ্ছায় আজম খানকে যেতে হলো। তাঁকে বিদায় দিতে হাজার হাজার মানুষ বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়েছিল, অধিকাংশের চোখই ছিল সজল। এক

বৃদ্ধ গ্রামবাসী একজোড়া নারকেল নিয়ে এসেছিলেন আজম খানকে বিদায়-উপহার হিসেবে দেবেন বলে। লাহোরে অবসরজীবন যাপনের সময়েও পূর্ব পাকিস্তান থেকে কেউ দেখা করতে গেলে তিনি সাদর অভ্যর্থনা জানাতেন। ১৯৭১ সালে এদেশে সামরিক অভিযানে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন বলে শুনেছি।

আজম খান চলে যাওয়ার অল্পকাল পরে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা হয়—নতুন সংবিধান প্রবর্তিত হবে বলে। নতুন গভর্নর হয়ে আসেন আইয়ুবের বশংবদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবদুল মোনায়েম খান। কিন্তু তার আগেই কয়েকটি ঘটনা ঘটে যায়। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মুক্তিলাভ করেন। আর আইয়ুব খানের নিযুক্ত শরিফ কমিশনের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় ছাত্র-আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। এই আন্দোলনে ১৭ সেপ্টেম্বরে পুলিশের গুলিতে দুজন ছাত্র নিহত হয়। সেই থেকে ওই দিনটি শিক্ষা-দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

২৪.

১৯৬২ সালে পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পরে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বেশ চাঞ্চল্য দেখা দেয়। আইয়ুব খান দেশ পরিচালনা করতে শুরু করেন অরাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে। তাঁর নানা কাজে ও আচরণে রাজনীতি, রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দলের প্রতি বীতশ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়ে আসছিল। এমন কী, সংবিধান-প্রবর্তনের পরেও রাজনৈতিক দলের পুনরাবির্ভাব তিনি চান নি। তিনি যে মৌলিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার ভিত্তিভূমিতে ছিল অরাজনৈতিক ও স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীরা—পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এম আর কায়ানি একবার দেশের গ্রামকে পশু, পক্ষী ও মৌলিক গণতন্ত্রীতে (বার্ডস, বিস্টস অ্যান্ড বেসিক ডেমোক্র্যাটস) পরিপূর্ণ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। এই মৌলিক গণতন্ত্রীরা জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করেন, রাষ্ট্রপতিত্বের প্রশ্নে আইয়ুব খানকে অধিক সংখ্যায় হাঁ-ভোট দিয়ে একধরনের বৈধতা দান করেন এবং অল্পকাল পরে প্রেসিডেন্ট-নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করবেন বলে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ করে তোলেন। তবে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের পরে আইয়ুব দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তে থাকেন—তখন তাঁর দরকার হয়ে পড়ে ক্ষমতার ভিত্তি সম্প্রসারিত করার। তাঁর ইঙ্গিতে মুসলিম লীগ—বলা উচিত, মুসলিম লীগের একটি অংশ—পুনরুজ্জীবিত হয়। এটি পরিচিত হয় কনভেনশন মুসলিম লীগ নামে এবং এর নিখিল পাকিস্তান সংগঠনের নেতৃত্বদান করেন চৌধুরী খালিকুজ্জামান আর পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকার ইসলামিক একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক আবুল হাশিম। আইয়ুব পরে এই রাজনৈতিক দলে যোগ দেন এবং ক্রমে তার সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন।

বিরোধী পক্ষের রাজনীতিবিদেরাও বসে থাকেন নি। তাঁদের অনেকের ওপরে

রাজনীতিতে অংশগ্রহণে আইনগত বাধা আরোপিত হয়েছিল। যাঁরা সে-নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়েন নি, তাঁরা প্রথমে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট নামে একটি জোট গঠন করেন। রাজনৈতিক দলগুলো বিদ্যমান পরিস্থিতিতে পুনরুজ্জীবিত করা হবে কিনা, এ-নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়, তবে ধীরে ধীরে একটি একটি করে অনেক দলই পুনরুজ্জীবিত হয়। মুসলিম লীগের কাউনসিল-সভা আহ্বান করে একটি অংশ পুনরাবির্ভূত হয়—বহুকাল পরে রাজনীতিতে প্রত্যাগত খাজা নাজিমউদ্দীনকে সভাপতি এবং আইয়ুবের ভ্রাতা সরদার বাহাদুর খানকে সাধারণ সম্পাদক করে। সরদার বাহাদুর খান জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন, প্রাদেশিক পরিষদে সেই দায়িত্ব পড়ে আফসারউদ্দীন আহমেদের ওপরে। ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর বৈরুতে সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুর পরে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত হয়, যদিও ভিন্নমত প্রকাশ করে দলের ক্ষুদ্র একটা অংশ তার বাইরে রয়ে যায়।

সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুতে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলন খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষমতায় থাকার সময়ে পাশ্চাত্যঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি এবং স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে উদাসীনতার জন্যে সমালোচিত হলেও দেশে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করার পরে মূলত তাঁকে ঘিরেই গণতন্ত্রের জন্যে আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। তাঁর মরদেহ ঢাকায় নিয়ে আসা হলে বিশাল জনসমাগম হয় এবং সকলের ইচ্ছাক্রমে তাঁর শেষ শয্যা রচিত হয় এ কে ফজলুল হকের সমাধির পাশে।

আইয়ুবের কারাগার থেকে সোহ্‌রাওয়ার্দীর মুক্তিলাভের অল্পকাল পরে মওলানা ভাসানীরও কারামুক্তি ঘটে। যদিও তিনি গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দাবি করেছিলেন, কিন্তু আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে তেমন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন নি এবং এক্ষেত্রে সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে একযোগে কাজ করতেও সম্মত হন নি। পরে—সোহ্‌রাওয়ার্দীর জীবদ্দশায়ই—তিনি আইয়ুব খানের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সাক্ষাৎ করেন, এক প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে চীন সফর করেন, এবং ফিরে এসে—মূলত পররাষ্ট্র নীতির দোহাই দিয়ে—আইয়ুব খানের প্রতি সমর্থনজ্ঞাপনের আহ্বান জানান।

আইয়ুব খান যে চীনের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তা ঠিক, কিন্তু তার কারণ সমাজতন্ত্রপ্রীতি ছিল না। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত-সংঘর্ষ অভাবিতভাবে যুদ্ধের রূপ নিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের পক্ষ নেয়। ভারত-বিরোধিতার নীতি থেকেই আইয়ুব চীনের সঙ্গে সদ্‌ভাব-স্থাপনে উদ্‌যোগী হন। তাতেই মওলানার চোখে আইয়ুব গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেন।

চীন-ভারত যুদ্ধের সময়ে একদিকে জওহরলাল নেহরুর স্বপ্নভঙ্গ ও কৃষ্ণমেননের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গারে ভারতীয় দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে মধ্যপন্থীদের যোগদান, অন্যদিকে উত্তরপূর্ব সীমান্ত এলাকায় চীনা সেনাবাহিনীর অবাধ প্রবেশ ও আসাম থেকে বেসামরিক লোকজনের অপসারণ সকলকে বিমূঢ় করে দেয়। এই মর্মান্তিক অবস্থায়ও *দেশ* পত্রিকায় শিবরাম চক্রবর্তী রসিকতা করে লিখেছিলেন : রবীন্দ্রনাথ তো ভবিষ্যদ্বাণী করেই গিয়েছিলেন, 'একদিন চীনে নেবে তারে'। এই যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী বামপন্থী আন্দোলনের জন্যে ক্ষতিকর হয়। বান্দুং এবং তার পরবর্তীকালের পঞ্চশীল

নীতি পানিতে ভেসে যায়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মতো শক্তিশালী সংগঠন দুভাগ হয়ে যায়। আমাদের দেশেও আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং সেই সঙ্গে বিভক্ত হয় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়ন। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপ এবং রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বাধীন ছাত্র ইউনিয়ন চীনপন্থী হিসেবে আর অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বাধীন ন্যাপ এবং মতিয়া চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন ছাত্র ইউনিয়ন রুশপন্থীরূপে সাধারণের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে। এই আদর্শিক ও রণকৌশলগত বিভেদ পরিণামে পাকিস্তানে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে দুর্বল করে দেয়।

২৫.

রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকের সফল অনুষ্ঠান থেকে প্রেরণা নিয়ে ঢাকার একদল সংস্কৃতিকর্মী বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা করার উদ্দেশ্যে সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৬২ সালে। প্রথম থেকে এর সভাপতি ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল, প্রথম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ফরিদা হাসান (শহীদ সাইদুল হাসানের স্ত্রী, পরে সংসদ-সদস্য)। এই সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শামসুননাহার রহমান ও আহমেদুর রহমান এবং এর সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে সন্‌জীদা খাতুন ও ওয়াহিদুল হক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। সংস্কৃতি ও রাজনীতির সহযোগের প্রশ্নে নীতিগত মতানৈক্যের কারণে কামাল লোহানীর নেতৃত্বে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন কর্মীদের একাংশ পরে ছায়ানট ছেড়ে বেরিয়ে যান এবং ক্রান্তি নামে ভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯৬৩ সালে ছায়ানট সংগীত-বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং সেই সময় থেকে রমনার বটমূলে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে ছায়ানট একদিকে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে, অন্যদিকে বাঙালি সংস্কৃতিচর্চায় মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করে।

ছায়ানটই ঢাকায় প্রথম নববর্ষ-উদ্‌যাপনের আয়োজন করে নি। তার প্রায় দশ বছর আগে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের উদ্‌যোগে বাংলা নববর্ষ পালিত হয়েছিল, বোধহয় তারও আগে বা সমসময়ে অন্য সংগঠনের ব্যবস্থাপনায়ও। তবে নববর্ষ-উদ্‌যাপনকে ছায়ানট বিশেষ মর্যাদা দান করেছিল—বাঙালি সংস্কৃতিতে যাঁদের গৌরববোধ আছে, নববর্ষ-অনুষ্ঠানের স্থানটি তাদের মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। পাকিস্তান সরকারের সাংস্কৃতিক নীতির কথা স্মরণে রাখলে এর তাৎপর্য সহজে অনুভবগম্য হবে। সে-তাৎপর্য আজো হারিয়ে যায় নি।

১৯৬৩ সালের আরেকটি অনুষ্ঠান বাঙালিত্বের চেতনা জাগ্রত করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। সেটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ-আয়োজিত 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০'। বাংলা বিভাগ থেকে আমাদের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার কথা ছিল, দায়িত্বভার ছিল রফিকুল ইসলামের। তাঁকে আমি বলি, এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের বিকাশধারা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলে কেমন হয়? কথাটা তাঁর মনঃপূত হয়। আমরা দুজনে অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের কাছে প্রস্তাবটা করলে

তিনি একটা লিখিত পরিকল্পনা নিয়ে যেতে বলেন। আমরা একটা খসড়া করি। মুনীর চৌধুরীকে সেটা দেখালে তিনি তার কিছু উন্নতিসাধন করেন। হাই সাহেব তা অনুমোদন করেন। বিভাগের অনেক শিক্ষক ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এই ভেবে যে, আমরা কয়েকজন পুরো ব্যাপারটা কুক্ষিগত করে রেখেছি। এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁদের কেউ কেউ একটু দূরে থাকেন। হাই সাহেব তাঁদেরকে বুঝিয়ে কাজের সঙ্গে যুক্ত করেন। সাহস, শক্তি ও সামর্থ্য সঞ্চয় করে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থা হয়। শেষ পর্যন্ত বিভাগের সব শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীই তুমুল উৎসাহের সঙ্গে এতে যোগ দেন। প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি হন মুহম্মদ আবদুল হাই, আহ্বায়ক তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আসাদ চৌধুরী ও মুহম্মদ মুজাদ্দেদ। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় রফিকুল ইসলাম ও আমি। কয়েকটি উপসংঘ গঠন করা হয় শিক্ষকদের দায়িত্বে, তবে ছাত্রদের আহ্বায়ক করে। প্রদর্শনী উপসংঘের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কাজী দীন মুহম্মদ ও আহমদ শরীফ, আহ্বায়ক গোলাম সারোয়ার; কবিতাপাঠ উপসংঘের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আহ্বায়ক হুমায়ুন খান; গদ্যপাঠ উপসংঘের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক নীলিমা ইব্রাহীম ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আহ্বায়ক আবুল হাসান সালাহউদ্দীন; নাটক উপসংঘের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মুনীর চৌধুরী, আহ্বায়ক রশীদ হায়দার; সংগীত উপসংঘের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর খান; প্রচার ও প্রকাশনা উপসংঘের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক আমি, আহ্বায়ক আমিনুল ইসলাম বেদু। আমি খুব খেটেখুটে একটি স্মরণিকা বের করেছিলাম—খেরোখাতার আদলে। প্রতিষ্ঠা অবধি বিভাগের সব শিক্ষকের নাম ও পরিচয় এবং অধ্যক্ষদের নামের তালিকা তৈরি করেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চল্লিশ বছরের অ্যানুয়াল রিপোর্ট ঘেঁটে—ওটাই ছিল ওই স্মরণিকার বিশেষ আকর্ষণ। ভাইস-চান্সেলরের উদ্‌বোধনী ভাষণও আমি লিখে দিয়েছিলাম, কিন্তু ছাপার সময়ে সম্বোধনে 'ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণে' নারীপুরুষের স্থান বদলে গিয়েছিল আমারই কোনো দুর্জ্ঞেয় মনস্তাত্ত্বিক ভুলে। এতে ভাইস-চান্সেলর, বিভাগীয় অধ্যক্ষ ও আমি—এই তিনজনের মধ্যে কে বেশি বিব্রত হয়েছিলেন, তা বলা দুষ্কর।

১৯৬৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে—এখন যেখানে নাটমণ্ডল, সেখানে (সাবেক কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির মিলনায়তনে)—ভাইস-চান্সেলর ড. মুহম্মদ ওসমান গণি সপ্তাহব্যাপী এই উৎসবের উদ্‌বোধন করেন। সারাদিন ধরে একটি প্রদর্শনী খোলা থাকে রোজই—তাতে ছিল বাংলা হরফের বিবর্তনের চিত্র, ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের লেখচিত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত গ্রন্থ দিয়ে মুদ্রণের ইতিহাস। প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম সন্ধ্যায় ছিল যথাক্রমে কবিতা, গদ্য ও নাটক পাঠের আসর আর সংগীতানুষ্ঠান। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, নীলিমা ইব্রাহীম, মুনীর চৌধুরী ও আবু হেনা মোস্তফা কামাল যথাক্রমে এসব ক্ষেত্রের বিবর্তনের পরিচয় তুলে ধরেন। ছাত্র-শিক্ষকেরা এতে অংশ নিয়েছিলেন। গদ্যপাঠের আসরে আমি পড়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের 'তোতাকাহিনী'। নাটকপাঠের একটি অংশে দীনবন্ধু মিত্রের *সধবার একাদশী* থেকে পাঠ করা হয়, তাতে নিমচাঁদ ও রামমাণিক্যের ভূমিকায় ছিলেন মুনীর চৌধুরী ও রফিকুল ইসলাম, অটলের ভূমিকায় আমি। মুনীর চৌধুরী আমাদের চরিত্রগুলির পরিচয় দিয়েছিলেন শিক্ষিত

মাতাল, অশিক্ষিত মাতাল ও অর্ধশিক্ষিত মাতাল বলে। সকলে বেশ উপভোগ করেছিলেন, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মচারী পরের দিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শিক্ষক হয়ে আমরা ওরকম চরিত্রে রূপ দিতে পারলাম কী করে! কবিতাপাঠের আসরে নীলিমা ইব্রাহীম ও আমাদের ছাত্র নরেন বিশ্বাস সুর করে পুরোনো কবিতা পড়ে খুব জমিয়েছিলেন। মীর মশাররফ হোসেনের *জমীদার-দর্পণ* নাটকে হায়ওয়ান আলীর চরিত্রে নরেনের রূপদানের কথাও বিশেষ করে মনে পড়ে। জাহানারা ইমাম তখন আমাদের বিভাগের ছাত্রী ছিলেন। তিনি গদ্য ও নাটক পাঠে অংশ নিয়েছিলেন। বেশ কিছু পুরোনো কবিতায় সুর দিয়ে সংগীতানুষ্ঠানে পরিবেশন করা হয়েছিল, সুর দিয়েছিলেন আবদুল আহাদ ও আবদুল লতিফ।

ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহের দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ সন্ধ্যায় যথাক্রমে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল। প্রাচীন যুগের সাহিত্য সম্পর্কে প্রবন্ধ পড়েন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, আলোচনা করেন নীলিমা ইব্রাহীম ও সৈয়দ মুর্তজা আলী; মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পর্কে প্রবন্ধ পড়েন ড. মুহম্মদ এনামুল হক, আলোচনা করেন মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ও আহমদ শরীফ; আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেন সৈয়দ আলী আহ্সান, আলোচনা করেন অজিতকুমার গুহ ও মুনীর চৌধুরী। আলোচনা-সভা তিনটিতেই সভাপতিত্ব করেন মুহম্মদ আবদুল হাই।

ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০ বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। এত অধিকসংখ্যক লোকসমাগম ছিল অপ্রত্যাশিত। মানুষ যেমন আগ্রহ নিয়ে প্রদর্শনী দেখেছে, উৎসাহ নিয়ে পাঠ ও সংগীত শুনেছে, তেমনি কৌতূহল নিয়ে আলোচনা-সভায় উপস্থিত থেকেছে। মন্তব্যের খাতা আনন্দ-উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তিতে ভরে গিয়েছিল। বাঙালিত্বের গৌরব জাহির করার প্রবৃত্তি না থাকা সত্ত্বেও *আজাদ* ও *মর্নিং নিউজ* পত্রিকা আমাদের অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেছিল, অন্যান্য পত্রপত্রিকা তো আন্তরিক অভিনন্দনই জানিয়েছিল। একাধিক পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয়েছিল। পরে এর সবকিছু সংগ্রহ করে এবং স্মরণিকার বিষয়বস্তু, অনুষ্ঠান-সূচি ও সকল বক্তৃতা দিয়ে *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ* ১৩৭০ নামে একটি বই প্রকাশ করা হয়েছিল আমার একার তত্ত্বাবধানে। তার সম্পাদক ছিলেন মুহম্মদ আবদুল হাই এবং সহকারী সম্পাদক রফিকুল ইসলাম ও আমি। ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে-ধারা ক্রমে পুষ্টিলাভ করছিল, তাতে এই সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানমালা কিছু দান করতে সমর্থ হয়েছিল।

২৬.

১৯৬৩ সালের শেষদিকে ইউনাইটেড স্টেটস এডুকেশনাল ফাউন্ডেশনের উদ্‌যোগে করাচিতে 'কালচারস অফ টু ওয়র্লডস' নামে একটি আলোচনা-সভার আয়োজন হয় তিনদিন ধরে। ড. মাহমুদ হোসেন ভাইস-চান্সেলর থাকতেই এতে অংশ নেওয়ার জন্যে ইতিহাস বিভাগের তরুণতর শিক্ষক নূরুল ইসলাম ওরফে অনু (পরে

পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ-নেতা) ও আমাকে মনোনীত করেছিলেন। প্রবীণ শিক্ষক একজনের যাওয়ার কথা বোধহয় ছিল, তিনি যেতে পারেন নি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি বিভাগের আলী আনোয়ার গিয়েছিল। ঢাকা কলেজ থেকে গিয়েছিলেন বাংলার আলাউদ্দিন আল আজাদ, ইংরেজির ওসমান জামাল, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জিল্লুর রহমান খান, ইতিহাসের সাইফউদ্দীন আহমদ। বাইরের কলেজ থেকে এসেছিলেন ইমদাদুল হক ও ওবায়দুল্লাহ মজুমদার (১৯৭১ সালে ড. মালেক-মন্ত্রিসভার মন্ত্রী)। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তরুণেরা এসেছিলেন, দু-তিনজন তরুণীও, প্রবীণের মধ্যে ড. আহমদ হাসান দানী—তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়ার পরে এই প্রথম দেখা তাঁর সঙ্গে। মার্কিন গুণীজ্ঞানী বেশ কয়েকজন ছিলেন—তার মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ওয়েন উইলক্সের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে, কয়েক বছর পরে এক বিমান-দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হন। ফাউন্ডেশনের করাচি-দপ্তরের এক কর্মকর্তা ড. সাদ আমাদের খুব যত্ন নিয়েছিলেন।

করাচির একটু বাইরে, মালিরে, একটি হোটেলে আমরা ছিলাম—সেখানেই আলোচনা-সভার ব্যবস্থা হয়েছিল। পরিবেশটা বেশ মনোজ্ঞ ছিল, অনেকখানি অনানুষ্ঠানিক ছিল, ফলে কথাবার্তা বলতে বিশেষ ভয় লাগেনি। একটা সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা নির্ধারিত ছিল। উদ্‌যোক্তারা আমাকে ভার দিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের অনুষ্ঠান সংগঠিত করতে। ওসমান জামাল ও আলী আনোয়ারকে দিয়ে ঝটপট কিছু কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করিয়ে নেওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। তার মধ্যে আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতাও ছিল, কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট হননি। তিনি চাইলেন গান গাইতে। তাঁর কাছেই জানতে পারলাম, তিনি সংগীত-শিক্ষকের কাছে রীতিমতো তালিম নিয়েছেন। এর পরে তাঁকে বাধা দেওয়ার সাধ্য কার! তিনি গাইলেন, অনু গাইলেন, সমবেত সংগীতে জিল্লুর রহমান খান গলা মেলালো। কবিতার মূল ও অনুবাদ দুই পড়া হয়েছিল। আমি টুকরো টুকরো করে কিছু পরিচিতিমূলক কথা বলেছিলাম। সাধারণভাবে মনে হয়েছিল, পশ্চিম পাকিস্তানের সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের যেটুকু ধারণা আছে, আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে ওঁদের তা নেই; এমনকি, জানবার যেটুকু কৌতূহল আমাদের আছে, ওঁদের মধ্যে তারও অভাব- -যদিও সৌজন্যের অভাব ছিল না।

সেমিনার শেষ হওয়ার পরেও দু-একদিন করাচিতে ছিলাম। আমার বন্ধু নেয়ামাল বাসির সেখানে। করাচিতে বাংলা সাহিত্য পরিষদ নামে একটি সংগঠন ছিল। তাঁদের আহ্বানে একদিন অনেকের সঙ্গে মিলিত হওয়ার এবং কিছু বাজে কথা বলার সুযোগ হলো। নজরুল একাডেমীতেও গিয়েছিলাম। বেবীর বড়ো ফুপু থাকতেন করাচিতে—এক সন্ধ্যায় তাঁদের বাড়িতে খেলাম। ঘটনাক্রমে সৈয়দ মুহম্মদ হোসেন আমার পরে করাচিতে এসেছিলেন, বেবীর ফুপু তাঁরও খালা। সুতরাং তিনিও একই সন্ধ্যায় যোগ দিলেন। বেশ মজা করে সময় কাটলো। আরো বেশি মজা হলো এই কারণে যে, বেবীর সন্তান-সম্ভবা হওয়ার চূড়ান্ত খবরটি মুহম্মদ হোসেন সাহেবের কাছেই পাওয়া গেল।

আমার ধারণা ছিল, আমি বাজার-চলতি উর্দু বলতে পারি। সে-ভুল ভাঙলো করাচিতে ট্যাক্‌সি-অটোরিকশা চড়তে গিয়ে। আমি যখন সোজা যেতে চাই, বলি

'সিধা', আর চালকেরা ডান দিকে মোড় নেয়। পরে নেয়ামাল বুঝিয়ে দিলো, সিধা হাত, উলটি হাত মানে ডানে-বাঁয়ে, সোজা যেতে হলে বলতে হবে 'বরাবর'। তখনকার মতো বুঝলাম বটে, কিন্তু জীবনে উলটো-সিধে বুঝতে পেরেছি কিনা, তা নিয়ে মাঝে মাঝেই সন্দেহ হয়।

২৭.

কিছুদিন পরেই আবার করাচি আসতে হয়েছিল।

পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল যাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন-সফরে। তাতে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পীদের মধ্যে বাফার সঙ্গে সংশ্লিষ্টেরাই দলে ভারি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষে করাচিতে পাকিস্তান আর্টস কাউনসিল ওই সফরের ব্যবস্থাপক, অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশ করবেন তাঁরাই, তবে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ সম্পর্কে লিখতে এখান থেকে কাউকে যেতে হবে।

মাহমুদ নূরুল হুদা আমাকে যেতে বললেন। বিভাগীয় অধ্যক্ষের কাছে কথাটা পাড়তেই তিনি নাকচ করে দিলেন, এমন কাজের জন্যে ছুটির সুপারিশ করতে পারবেন না। হুদাভাইকে জানালাম। তিনি আমাকে না জানিয়ে শিক্ষা-মন্ত্রণালয়কে খবর পাঠালেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের লেকচারার আনিসুজ্জামানকে আমরা মনোনীত করছি—আপনারা তাকে নেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

মন্ত্রণালয় থেকে টেলিগ্রাম এলো ভাইস-চান্সেলরের কাছে, হাই সাহেবকে ফোন করে তিনি বলে দিলেন আমাকে করাচি যেতে এবং আমার কর্তব্যরত ছুটির দরখাস্ত সুপারিশ করে তাঁর কাছে পাঠাতে। হাই সাহেব এতে প্রীত হননি—তিনি ভেবেছিলেন, খোদার ওপর আমিই খোদকারি করেছি।

সরকারি খরচে করাচি গেলাম, হোটেল মেট্রোপোলে থাকলাম এবং নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমতো এই অঞ্চলের অনুষ্ঠান-পরিচিতি লিখে দিলাম। একদিন দেখি, আর্টস কাউনসিলের দপ্তরে চাপা উত্তেজনা। শিল্পী-নির্বাচন যখন শেষ হয়ে গেছে, অনুষ্ঠান-সূচি চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে, অনুষ্ঠানপত্র ছাপা হতে যাচ্ছে, তখন পররাষ্ট্র-মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো হুকুম করেছেন, সিন্ধি গায়িকা সুশীলা মেহ্‌তানিকে প্রতিনিধিদলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আগের সন্ধ্যায় করাচি জিমখানা ক্লাবে উভয়ের দেখা হওয়ায় ভুট্টো তাঁর সঙ্গে কেমন আচরণ করেছিলেন, সে-সম্পর্কে সত্য বা কাল্পনিক বর্ণনা শোনা গেল। তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন কণ্ঠশিল্পী ফরিদা খানুম—তিনি একটু মুচকি হাসলেন, কিন্তু কোনো মন্তব্য করলেন না। আমি তাঁর গানের অনুরাগী ছিলাম, এখন তাঁর শালীন ও নম্র ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম। তাঁর সম্পর্কেও অবশ্য অন্যকে বাজেকথা বলতে শুনেছি।

শামসুল হুদা চৌধুরী (পাকিস্তান বেতারখ্যাত, পরে বাংলাদেশের মন্ত্রী ও স্পিকার) এক সন্ধ্যায় খেতে ডাকলেন তাঁর বাসায়। সেখানে আমন্ত্রিত ছিলেন জেড ও বোখারী—অল ইন্ডিয়া রেডিওর প্রবাদপ্রতিম দুই সাহোদরের কনিষ্ঠ, তখন বোধহয় কেন্দ্রীয় তথ্য মন্ত্রণালয়ের কেউকেটা, তাঁর নেতৃত্বেই সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল যাবে

সোভিয়েত ইউনিয়নে। আর ছিলেন নাজীর আহমেদ—রেডিও পাকিস্তানের করাচি কেন্দ্রে কর্মরত।

আমি মেট্রোপোলে উঠেছি শুনে বোখারী জানতে চাইলেন আমার চরিত্র খারাপ কিনা। এমন প্রশ্নে কে না বিব্রত হয়! আমি উত্তর দেওয়ার আগেই তিনি বললেন, এই বিশাল শহরে তোমার কি আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেউ নেই যে তোমাকে হোটেলে থাকতে হবে? তিনি তাকালেন হুদা ভাইয়ের দিকে; আমি বললাম, সরকারি ব্যবস্থাপনায় এসেছি, অন্যকে কষ্ট দেওয়া কেন! বোখারী খুব পীড়াপীড়ি করেছিলেন আমাকে বিয়ার খেতে। আমি না-খাওয়ায় তিনি জানতে চাইলেন, তোমার কি মনে হয় আমরা নষ্টচরিত্রের লোক?

কাজ সেরে ফেরার ঠিক আগে শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের সেকশন অফিসার বললেন, এতো তাড়া কিসের, আরো দু-চারদিন থেকে যাও। বললাম, আমার ছুটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। একটু হেসে ভদ্রলোক বললেন, মন্ত্রণালয়ের নাম দিয়ে চিঠি বা টেলিগ্রাম পাঠাবার এখতিয়ার আমার আছে—তোমার সামনেই ভাইস-চান্সেলরকে টেলিগ্রাম করে দিতে পারি তোমার ছুটি বাড়াতে, কালই মনজুরি এসে যাবে। আমি আতঙ্কিত হয়ে বললাম, না, না, যথেষ্ট হয়েছে।

২৮.

আহমদের উৎসাহ ও জীবনীশক্তি অপরিমেয়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পাকিস্তান আর্টস কাউনসিল গঠিত হয়েছে ঢাকায়, আমরা আছি বাফায়। আহমদ চাইলো আর্টস কাউনসিলের কর্তৃত্বভার নিতে। সে অনেক জোগাড়যন্ত্র করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলো। সে নির্বাচিত না হলেও কমিটিতে আমাদের প্রাধান্যবিস্তার করা সম্ভবপর হয় এবং তার অগ্রজ সৈয়দ মুহম্মদ হোসেন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। বিরোধীপক্ষ বসে থাকেনি, শেষ পর্যন্ত তারা মুহম্মদ হোসেনকে বেশ বিপাকে ফেলে এবং পরে নিজেরাও বিপাকে পড়ে যায়। সে অবশ্য পরের কথা।

ফজলুল কাদের চৌধুরী পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী—আর্টস কাউনসিল তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তান সফর করতে এসে আর্টস-কাউনসিলের তৎপরতা সম্পর্কে জানা তাঁর কর্তব্যের অন্তর্গত।

আর্টস কাউনসিলের দপ্তর ছিল জিন্নাহ্ অ্যাভিনিউয়ের একটা বড়ো বাড়ির দোতলায়। সেখানে শিক্ষামন্ত্রী তশরিফ এনেছিলেন। আর্টস কাউনসিলের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁরা ছাড়াও আমাদের সংস্কৃতিক্ষেত্রের কিছু বিশিষ্টজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন অতিথি হিসেবে। তাঁদের মধ্যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ও ছিলেন। মন্ত্রী শহীদুল্লাহ্ সাহেবের দিকে বিশটা থ্রি-কাসল্স সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিলেন সৌজন্যবশত। নাসিকা কিছুটা কুঞ্চিত করে শহীদুল্লাহ্ বললেন, 'আমি সিগারেট খাই না।' নিজে সিগারেট খেতে খেতে মন্ত্রী বোধহয় ভাবলেন, এবারে দেশীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। তাঁর সবচেয়ে নিকটে বসা শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে এবারে তিনি জিজ্ঞাসা

করলেন, 'আপনি *চান্দা* দেখেছেন?' শহীদুল্লাহ্ এবারে চোখ বুঁজে নাক আরো কুঁচকে জবাব দিলেন, 'আমি সিনেমা দেখি না।' আলোচনা অন্যদিকে প্রবাহিত করতে আমাদের বেশি চেষ্টা করতে হয়নি। ভরাট গলায় মন্ত্রী নিজেই কথা বলে গেলেন এবং নিজের রসিকতায় নিজেই উচ্চৈঃস্বরে হাসতে থাকলেন।

পরদিন সকালে বেগম শামসুননাহার মাহমুদের নেতৃত্বে বাফার এক প্রতিনিধিদলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে মন্ত্রীর কাছে গেলাম ভিক্ষাপাত্র নিয়ে। এবার অকুস্থল বর্ধমান হাউজ— নিচের তলায় পুবদিকে যেখানে এখন বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগারের অংশ, সেই ঘরে। ফজলুল কাদের চৌধুরীর সঙ্গে ছিলেন পাকিস্তান ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক আবদুল হাফিজ কারদার—তিনি তখন কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা। কারদারকে দেখিয়ে ফজলুল কাদের ইংরেজিতে জানালেন, আমি মন্ত্রী আর উনি উপদেষ্টা—অথচ যেখানে যাই, স্বাক্ষরশিকারীরা আমাকে ছেড়ে ওঁর কাছেই যায়। এই বলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। কারদার মন্ত্রীকে কী একটা বলতে এসেছিলেন তা শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন, এখানে পাঠিয়ে দিন। এলেন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রাদেশিক সুপারিনটেনডেন্ট। তিনি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, সেটা না শুনেই মন্ত্রী জানতে চাইলেন, বিমানবন্দরে মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানানো কি আপনি কর্তব্যের অন্তর্গত মনে করেন না? কর্মকর্তা বলেন, নিশ্চয়ই কর্তব্য, সার্ তবে আমার সফরসূচি আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল—। আবার তাঁকে বাধা দিয়ে মন্ত্রী বললেন, আমার সফরসূচি পেয়েও আপনারটা বহাল রাখলেন? ভদ্রলোক আবার কী বলতে যাচ্ছিলেন, মন্ত্রী তাঁকে থামিয়ে দিয়ে আদেশ করলেন, আপনি অপেক্ষা করুন, পরে আপনার সঙ্গে কথা হবে। এই কথোপকথনের সময়ে মন্ত্রী এবং আমরা সকলে বসে, আর প্রত্নতত্ত্ব-অধিকর্তা দাঁড়িয়ে। মন্ত্রী আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন বাংলায়, কর্মকর্তার সঙ্গে খাঁটি ইংরেজিতে। ওই ভদ্রলোকও সরকারি আদবকায়দা রক্ষা করে ইংরেজিতেই কথা বলে গেলেন, কেবল এতোজনের সামনে তাঁর বিব্রত হওয়ার পালা দীর্ঘ হতে থাকলো।

২৯.

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ছিল এক মনোজ্ঞ ও বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। সমাবর্তনের মহড়ার সময়ে গ্রাজুয়েটেরা যে-পোশাক বা পরিচ্ছদ পেতেন, তা পরে তাদের শহরময় ঘুরে বেড়াতে দেখা যেতো। অনেকেই যেতো ছবি তুলতে স্টুডিওর সন্ধানে, কিন্তু ওই সাজে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরিই ছিল অনেকের আনন্দের বিষয়। ঢাকা শহর তখনো ছোটো—তাদের পোশাকের বর্ণিলতা পথঘাটকেও রঙিন করে রাখতো। প্রথম দিকে সমাবর্তন হতো কার্জন হলেই, তারপর কার্জন হল এলাকায়ই হতো—তবে প্যান্ডেল করে। বিশেষ সমাবর্তন তখনো হতো কার্জন হলের মধ্যেই। সমাবর্তনের দিনে বিকেলবেলায় ভাইস-চান্সেলরের বাসভবনে গার্ডেন পার্টি হতো, এই রেওয়াজ বহুদিন চালু ছিল। মনে পড়ে, জামাল আবদল নাসেরকে সম্মানসূচক ডি লিট উপাধি দেওয়া হয়েছিল কার্জন হলে। আরবিতে তিনি ভাষণ

দিয়েছিলেন, তার ধ্বনিগুণ আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল।

আমি যে-দুই সমাবর্তনে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি পেয়েছিলাম, তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রাদেশিক গভর্নর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলর এ কে ফজলুল হক। দুটিতে যদি নাও হয়, একটিতে তো বটেই—একটির কথাই আমার বিশেষভাবে মনে আছে। প্যান্ডেলে বসে দেখছিলাম, চান্সেলর একটি মুদ্রিত ভাষণে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলেন—মনে হচ্ছিল, সেটা তাঁরই ভাষণ। ভাষণ দেওয়ার সময় হলে হক সাহেব বললেন, তাঁর একটা অভিভাষণ লিখে দেওয়া হয়েছে—সেটা পড়ে দেবেন তাঁর তরুণ বন্ধু, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ, সৈয়দ আজিজুল হক। তার আগে তিনি মুখে কিছু বলতে চান। ওই মুখে যা বললেন অল্পক্ষণ, তাতেই আমাদের মন জুড়িয়ে গেল। ভাষণে তিনি নিজেকে অভিহিত করেছিলেন বাংলার জীবন্ত ইতিহাস বলে।

সম্মানসূচক ডিগ্রি দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেমন চৌ এন লাই বা জামাল আবদল নাসেরের মতো বিদেশী রাষ্ট্রনায়ককে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল, তেমনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল এ কে ফজলুল হকের মতো দেশীয় সুসন্তানকে আবার ইসকান্দর মীর্জা ও আইয়ুব খানের মতো ক্ষমতাদর্পী শাসককেও। এটা অবশ্য আকস্মিক কিছু ছিল না। ইংরেজ আমলেও প্রাদেশিক গভর্নর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলর-পদে অধিষ্ঠিত এমন কোনো কোনো ইংরেজ শাসককে সম্মানিত করা হয়েছিল যাঁরা দমননীতি প্রয়োগ করে কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আইউব খানকে যেদিন ডিগ্রি দেওয়া হয়, ১৯৬০ সালে, সেদিন এতো অতিথির সমাগম হয়েছিল যে প্যান্ডেলে স্থানসংকুলান হচ্ছিল না। রেজিস্ট্রার মাইক্রোফোনযোগে অনুরোধ জানালেন, শিক্ষকেরা যেন অতিথিদেরকে আসন ছেড়ে দিয়ে প্যান্ডেলের ভেতরের তিনপাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। আমরা জায়গা ছেড়ে দিলাম বটে, কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকের মতো ভেতরে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকতে অনেকেরই রুচিতে বাধলো। ইংরেজি বিভাগের প্রবীণ শিক্ষক আবু হেনার সঙ্গে আমরা কয়েকজন প্যান্ডেলের বাইরে এসে বৃত্তাকারে বসে গল্প করতে থাকলাম। আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলায় আবু হেনা খুব অপমানিত বোধ করেছিলেন এবং সেকথা তিনি আমাদের মতো নবীনদের বুঝিয়ে দিতে ছাড়েন নি। মনে হয়, তাঁর মতো উপলব্ধি আরো অনেকের হয়েছিল, কেউ কেউ হয়তো কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদও জানিয়ে থাকবেন। সমাবর্তন শেষ হওয়ার এক-আধ দিনের মধ্যেই শিক্ষকদের ওই অসুবিধার কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করে রেজিস্ট্রার সকলকে পৃথক পৃথক চিঠি দিয়েছিলেন।

এরপর ১৯৬১ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিনান্স জারি হলে শিক্ষকদের প্রচলিত স্বাধীনতা অনেকখানি খর্ব হয়। এতে ক্ষোভের সঞ্চার হয়, কিন্তু প্রতিবাদ তেমন হয়নি। ১৯৬২ সালের সমাবর্তনও নির্বিঘ্নে হয়ে গেল। সেই সমাবর্তনে আশুতোষ ভট্টাচার্য ও নীলিমা ইব্রাহিম চান্সেলরের হাত থেকে পিএইচ ডি-র সনদপত্র নিলেন। এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় গবেষণা করে আর কেউ পিএইচ ডি পাননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী আশুতোষ ভট্টাচার্য পিএইচ ডি ডিগ্রি লাভ করতে পারেন না, কেননা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত দুবছর গবেষণা করার যে-শর্ত থাকে তা তিনি পূরণ করেন নি। কী করে এই বাধা তিনি অতিক্রম করেছিলেন, সে-কাহিনী চিত্তাকর্ষক। আশুতোষ ভট্টাচার্য এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই কৃতী ছাত্র ও শিক্ষক ছিলেন।

এখানে থাকতেই সুশীলকুমার দে-র তত্ত্বাবধানে তিনি বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস সম্পর্কে অভিসন্দর্ভ লিখে পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্যে উপস্থাপন করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, একজন পরীক্ষক দ্বিমত পোষণ করায় তাঁর ডিগ্রি হয় নি। অনেকে মনে করেছিলেন, তাঁর গবেষণাকর্মটি সন্তোষজনক হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর তত্ত্বাবধায়কের প্রতি বিরূপতাবশত ওই পরীক্ষক তাঁর কাজ অগ্রাহ্য করেছিলেন। এ-নিয়ে তাঁর শিক্ষক শহীদুল্লাহ্র খুব মনস্তাপ ছিল। তিনি আশুতোষ ভট্টাচার্যকে নিজের প্রিয় বিষয় লোকসাহিত্য সম্পর্কে নতুন একটি অভিসন্দর্ভ রচনার পরামর্শ দেন। এর মধ্যে আশুবাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যান এবং পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থিতিলাভ করে বাংলা লোকসাহিত্য নামে মুদ্রিত গ্রন্থ ডি লিট উপাধির জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করেন। তখন তাঁর ছাত্র মুহম্মদ আবদুল হাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ। নিয়মানুযায়ী ডি লিট অভিসন্দর্ভ মুদ্রিত হতে হয়, বাইরে থেকে তা উপস্থাপন করতে হয়, তবে প্রার্থীর পিএইচ ডি ডিগ্রি থাকার দরকার হয়। হাই সাহেবের চেষ্টায় তাঁর অভিসন্দর্ভ পরীক্ষার জন্যে গৃহীত হয় এবং শহীদুল্লাহ্ সাহেবের চেষ্টায় তার জন্যে তাঁকে পিএইচ ডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়। বাংলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পিএইচ ডি তিনিই। নীলিমা ইব্রাহিম যথারীতি মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের অধীনে বাংলা নাটক সম্পর্কে গবেষণা করে অভিসন্দর্ভ দাখিল করেন। এ-কাজ তিনি শুরু করেছিলেন কলকাতায়, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের অধীনে, শেষ করেন ঢাকায় এসে। আশুতোষ ভট্টাচার্যের পরে তিনিই বাংলায় পিএইচ ডি লাভ করেন ঢাকা থেকে, তবে তিনিই প্রথম অভ্যন্তরীণ প্রার্থী হিসেবে এ গৌরব অর্জন করেন। এঁদের ডিগ্রিলাভে কেবল এঁরাই খুশি হন নি। হাই সাহেব গুরুঋণ কিছুটা লাঘব করতে পেরেছিলেন এবং তাঁর অধীনে গবেষণার সাফল্যে প্রীত হয়েছিলেন।

পরবর্তী সমাবর্তনে আমার ডিগ্রি লাভ করার কথা নয়, কিন্তু কার পরামর্শে যেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের মমতাজুর রহমান তরফদার ও আমি আবেদন করলাম, আমাদের ডিগ্রিদানের আনুষ্ঠানিকতা এগিয়ে নিয়ে আসতে। আবেদন মনজুর হলো। যথারীতি রিহার্সাল হলো, কিন্তু যেদিন সমাবর্তন হওয়ার কথা, সেদিনই সংবাদপত্রে ঘোষণা দিয়ে অনুষ্ঠান বাতিল করে দেওয়া হলো। আমি তখনো ঘুম থেকে উঠি নি। অজিত গুহ ফোন করে নিকটতম আত্মীয়বিয়োগের সংবাদ দেওয়ার মতো ভেঙে ভেঙে দুঃসংবাদটা জানালেন। আমি যে তা শুনে ভেঙে পড়িনি, তাতে বোধ হয় উনি অবাক হয়েছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন বাতিল করার ঘটনা সেই প্রথম। সব ব্যাপারটার মূলে ছিলেন প্রাদেশিক গভর্নর তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলর আবদুল মোনায়েম খান। দায়িত্বভার নিয়ে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করছেন আইয়ুব খানকে খুশি করতে, আর তাতে তাঁর বিরুদ্ধে ততই রোষ জমে উঠছে জনমনে, বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে। বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে তিনি ছাত্রদের দিয়ে ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী গঠন করেছেন—ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফ্রন্ট বা এন এস এফ। তাতে তাঁর প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আরো বেড়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে তিনি আসবেনই, যদিও জানা যাচ্ছিল, তিনি এলে একটা প্রতিরোধের মুখে পড়বেন। এই অবস্থায় ভাইস-চান্সেলর

মাহমুদ হোসেন সমাবর্তনের আগের রাতে চান্সেলরকে অসন্তুষ্ট করে সমাবর্তন বাতিল করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

এর ফলে অবশ্য মাহমুদ হোসেনকে ভাইস-চান্সেলরের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যেতে হয়েছিল—ইতিহাস বিভাগে নিজের অধ্যাপকপদে। আর রেজিস্ট্রারের দপ্তরের কাছে পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের এক শাখা অফিসারের সঙ্গে একদিন পথে দেখা হওয়ায় তিনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিলেন, 'আনিসুজ্জামান সাহেব, আপনার ডিপ্লোমাটা আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবেন।'

৩০.

মাহমুদ হোসেন অবশ্য আগে একবার পদত্যাগ করেছিলেন। ঘটনাটা বিস্তারিতভাবে বলার যোগ্য।

১৯৬২ সালেই, বোধহয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম পরীক্ষা পেছাবার 'আন্দোলন' হয়। এর আগে এ-বিষয়ে আবেদন-নিবেদন হয়েছে, কিন্তু আন্দোলন হয় নি। ডক্টর জেনকিনসের আমলে ছাত্রেরা একবার দরখাস্ত করে সুবিধে করতে না পেরে চান্সেলর ফজলুল হক সাহেবকে গিয়ে ধরেছিল। তিনি প্রথমে তো এ-বিষয়ে কিছু বলতে নারাজ, শেষে ছাত্রদের পীড়াপীড়িতে ভাইস-চান্সেলরকে ফোন করলেন। হক সাহেবের প্রতি জেনকিনসের একটা ব্যক্তিগত আনুগত্য ছিল। সেই খাতিরেই তিনি পনেরো দিন পরীক্ষা পিছিয়ে দিয়েছিলেন, তবে ওটুকু করতেই অনেকের যে-সময় নষ্ট হয়েছিল, তা পুষিয়ে যায়নি। এবারে বিষয়টা বেশ একটা আন্দোলনের রূপ নিলো, এর নেতৃত্বে ছিলেন পরে বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষক, সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তা ও মন্ত্রী মীজানুর রহমান শেলী। হয়তো এর আরো নেতা ছিল, তবে ভালো ছাত্র হওয়ার সুবাদে শেলীকেই আমরা চিনতাম। অত্যন্ত ভদ্রোচিত কিন্তু দৃঢ় এই আন্দোলনের মুখোমুখি হয়ে ভাইস-চান্সেলর ডক্টর মাহমুদ হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষকের সভা ডেকে তাঁদের মতামত চাইলেন। প্রবীণেরা সবাই একবাক্যে বললেন, পরীক্ষা পেছোবার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই, নবীনেরা মতৈক্যসূচক ভঙ্গি করলেন। আন্দোলনকারীদের ভাইস-চান্সেলর জানিয়ে দিলেন, তারিখ নড়বে না; আন্দোলনকারীরাও তাঁকে জানিয়ে দিলো, নির্দিষ্ট তারিখে তারা পরীক্ষা দেবে না। পরীক্ষার প্রথম দিন হলে যাঁদের উপস্থিত থাকার দায়িত্ব ছিল না, তাঁরাও গেলেন, ছাত্রদের যদি বুঝিয়ে-পড়িয়ে রাজি করানো যায়। অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, মুনীর চৌধুরী ও আমি একসঙ্গে গিয়েছিলাম। দেখি, কার্জন হলের দরজায় মস্ত তালা এবং শেলী এক চেয়ার নিয়ে তার সামনে বসে। রাজ্জাক সাহেব দু-চারটে কথা বললেন ছাত্রদের সঙ্গে, তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ফিরে যাওয়া যাক।' আমরা যখন কার্জন হলের পশ্চিম গেট দিয়ে বের হচ্ছি, তখন কর্তব্যরত ডি এস পি—দেওয়ান সাহেব বোধ হয়—রাজ্জাক সাহেবকে বললেন, 'সার্, আমাদের ছেলেদের কেমন মানুষ করছেন!' রাজ্জাক সাহেব বললেন, 'আঠারো বছর পর্যন্ত তো আপনাদের দায়িত্বে থাকে—তারপর আসে

আমাদের কাছে। ওই পর্যন্ত আপনারা যেমন শেখান, তার আসর কোথায় যাবে?' আমরা ফিরে গিয়ে ভাইস-চান্সেলরকে জানালাম, পরীক্ষা না দেওয়ার বিষয়ে ছাত্রেরা অনড়। ভাইস-চান্সেলর অনির্দিষ্টকাল পরীক্ষা স্থগিত করার আদেশ দিলেন। পরীক্ষা পেছানোর এই আন্দোলন নিয়েই মুনীর চৌধুরী পরে লিখেছিলেন *চিঠি* নাটক।

এখনকার কলাভবনের পশ্চিম দিকে, মলের উপরে, একটা দোতলা লাল বাড়ি ছিল ভাইস-চান্সেলর-ভবনের মুখোমুখি—তখন সেটাই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব। সেদিন সন্ধ্যার কাছাকাছি ক্লাবে এসে শুনি ভাইস-চান্সেলর পদত্যাগ করেছেন। এ নিয়ে কেউ কিছু করছেন বলে মনে হলো না—আমার ভারি খারাপ লাগলো। বন্ধু গিয়াসউদ্দিন আহমদকে বললাম, 'পরীক্ষা না পেছাবার সিদ্ধান্ত ভাইস-চান্সেলর নিলেন সব শিক্ষকের পরামর্শে—তার দায় উনি একা নেবেন কেন?' গিয়াস বললেন, 'ঠিকই, অন্তত আমাদের উচিত সবাই মিলে ওঁর পাশে দাঁড়ানো।' আমরা দুজনে মিলে ক্লাবের সেক্রেটারি সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনকে আমাদের বক্তব্য জানালাম। উনি বললেন, 'দু-একজন সিনিয়র টিচারের সঙ্গে আলাপ করো।' রসায়ন বিভাগের মফিজউদ্দিন আহমদকে বললাম। উনি বললেন, 'তাতে ভাইস-চান্সেলরকে আরো বিব্রত করা হবে কিনা, সেটা ভেবে দেখেন। রাজ্জাক সাহেব তো ওঁর ঘনিষ্ঠ মানুষ—তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখেন।' রাজ্জাক সাহেব ব্রিজ খেলছিলেন। তিনি খানিকটা বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'আপনাগো যদি মনে হয়, ইউ শুড ডু সামথিং অ্যাবাউট ইট, গো এহেড—ভি সি বিব্রত হইলেন কিনা, দ্যাটস নট ইওর কনসার্ন।' আবার মফিজ সাহেব ও সাজ্জাদ সাহেবকে বললাম। তখন শিক্ষক সমিতি কোনো কারণে কাজ করছিল না, তাই ক্লাবের সেক্রেটারিই পরদিন সেখানে সভা ডাকলেন পরিস্থিতি বিবেচনার জন্যে।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হলো, শিক্ষকদের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল ভাইস-চান্সেলরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করবেন। এ-দলে গেলেন কাজী মোতাহার হোসেন, এম এন হুদা, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন এবং আবো দু-একজন। মাহমুদ হোসেন পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে সম্মত হলেন না, তবে কথা দিলেন, পদত্যাগপত্র গ্রহণের জন্যে তিনি চাপ দেবেন না। তখন চান্সেলর ছিলেন আজম খান—তাঁকেও অনুরোধ করা হলো, ভাইস চান্সেলরের পদত্যাগপত্র নিয়ে তিনি যেন কিছুই না করেন। গিয়াস এবং আমি বেশ সন্তুষ্ট হলাম—আমাদের সামান্য ভাবনা এমন কাজে লাগলো বলে।

এদিকে এ-নিয়ে একটা অসামান্য পরিস্থিতি ঘটে গেল। আমাদের হলের প্রাক্তন প্রোভোস্ট ডক্টর মুহম্মদ ওসমান গণি তখন ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলর। একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, মাহমুদ হোসেনের পরে তিনিই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বলাভ করবেন। প্রোভোস্ট হিসেবে তিনি আমাদের প্রিয় ছিলেন, তবে সহকর্মী হিসেবে রাজ্জাক সাহেব ও তাঁর মধ্যে সদ্ভাবের অভাব ছিল, যদিও তার সঙ্গে আমাদের কোনো সংস্রব ছিল না। এখন তাঁর কোনো কোনো গুণমুগ্ধ ময়মনসিংহ গিয়ে তাঁকে এই মর্মে বলে এলেন যে, সবই তো হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রাজ্জাক সাহেব গিয়াসউদ্দিন আর আনিসুজ্জামানকে দিয়ে এমন চাল চাললেন যে, ব্যাপারটা ভেস্তে গেল। হলের সূত্রে গণি সাহেব আমাদের দুজনকেই চিনতেন।

সমাবর্তন স্থগিত করবার পর মাহমুদ হোসেন যখন সত্যি সত্যি বিদায় নিলেন, তখন মুহম্মদ ওসমান গণিই সত্যি সত্যি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। আগের বছরের কথা তিনি ভোলেন নি। মুহম্মদ আবদুল হাইকে ডেকে নিয়ে তিনি বললেন, 'আনিসুজ্জামানকে বলবেন, ভাইস-চান্সেলরের অ্যাপয়েন্টমেন্ট অনেক সিরিয়াস ম্যাটার—তার মতো জুনিয়রদের এতে নাক না গলানো উচিত।' ঘটনার বিন্দুবিসর্গ হাই সাহেব জানতেন না—তাঁরও ধারণা হলো, হয়তো রাজ্জাক সাহেবের কারণে আমি অসংগত কিছু করেছি। তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করলেন : 'তোমার জন্য ভাইস-চান্সেলরের কাছে আমার কথা শুনতে হলো।' গিয়াসউদ্দিনের সঙ্গে দেখা হওয়ায় গণি সাহেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কী গিয়াস, রাজ্জাক সাহেবের সঙ্গে বুঝি খুব দাবা খেলা হয় আজকাল!' গিয়াস বলেছিলেন, 'অনেকের সঙ্গেই খেলি, সুযোগ পেলে রাজ্জাক সাহেবের সঙ্গেও।'

মোনায়েম খান গভর্নর থাকায় গণি সাহেবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বাড়লো। এন এস এফের ছেলেরা একদিন বিকেলের দিকে মধুর দোকানে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেদের আক্রমণ করে। গোলযোগ শুনে ইংরেজি বিভাগ থেকে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন এবং কমনরুম থেকে মুনীর চৌধুরী ও আমি নেমে আসি। মারামারি থামাবার যে ক্ষীণ প্রয়াস আমরা করেছিলাম, তা কাজে লাগেনি। একটু পরে দেখলাম প্রক্টর ওয়াদুদুর রহমান বেরিয়ে আসছেন বাড়ি থেকে। একটু দেরিতে হলেও তিনিই গোলযোগটা থামালেন। আমি তাঁকে বললাম, 'সার্, কারা আক্রমণ চালিয়েছে, আপনি দেখেছেন তো? নইলে আমাদের তিনজনকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।' তিনি বললেন, 'আমি দেখেছি।' পরে এ-বিষয়ে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফলে শিক্ষকদের এক সভায় আমি ভাইস-চান্সেলরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'সেদিন যারা মারামারি করলো, তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হয়নি কেন?' গণি সাহেব আমাকে হতবাক করে বললেন, 'কাউকে আইডেনটিফাই করা যায় নি বলে।' সভার পরে আমি প্রক্টরকে পাকড়াও করলাম, 'সার্ , সেদিন আপনি বলেছিলেন আপনি সব দেখেছেন, তাহলে দোষীদের আইডেনটিফাই করা গেল না কেন?' ওয়াদুদুর রহমান বললেন, 'যারা বাইরে থেকে আক্রমণ করেছিল, তাদের আমি দেখেছিলাম—কিন্তু মধুর ক্যানটিন থেকে কারা পালটা আক্রমণ করছিল, তা দেখতে পাইনি। আমার পক্ষে একপেশে রিপোর্ট দেওয়া ঠিক হতো না।'

এদিকে আরেকটি সমাবর্তনের সময় হয়ে এলো। এবারও অবস্থা একই, কিন্তু চান্সেলরের মতো বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষও চাইলেন, সমাবর্তন হোক। সমাবর্তনের দিনে চান্সেলরস প্রোসেশনে প্যান্ডেলে ঢুকলাম—চান্সেলর মঞ্চে উঠতে না উঠতেই শুরু হয়ে গেল মঞ্চ লক্ষ্য করে চেয়ার ছোঁড়া, ইট-পাটকেল-জুতো ছোঁড়া। কিছুক্ষণ পর নিরাপত্তা বাহিনী গভর্নরকে নিয়ে চলে গেল—সমাবর্তন পণ্ড হয়ে গেল।

সমাবর্তনে গোলযোগের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ অনেক ছাত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিল। শেখ ফজলুল হক মনি ও আরো একজনের এম এ ডিগ্রি বাতিল হয়; রাশেদ খান মেনন ও কে এম ওবায়দুর রহমানসহ পাঁচজনকে পাঁচ বছরের জন্যে, হায়াৎ হোসেন (এখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক) ও আরো

চারজনকে তিন বছরের জন্যে এবং জাকির আহমদ (বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের মরহুম বিচারপতি), সিরাজুল আলম খান, ফেরদৌস আহমদ কোরেশী ও আরো কয়েকজনকে দু বছরের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। জাকির আহমদ ও আরো একজনের আবেদনক্রমে ঢাকা হাইকোর্ট এই বহিষ্কারাদেশ এবং ডিগ্রি বাতিলের আদেশ অবৈধ বলে ঘোষণা করে তার কার্যকরতা নাকচ করে দিয়েছিলেন।

তারপরে আর বহুকাল সমাবর্তন হয় নি। পরে বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ সংশোধন করে বিধান করা হয়েছিল যে, চান্সেলর অপারগ হলে তিনি ভাইস-চান্সেলরকে সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করার দায়িত্ব দিতে পারবেন।

৩১.

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একদিন বাড়ি ফিরে দেখি, দোতলার বারান্দায় মা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বসে আছে। কাছে যেতে কী যে বললো, বোঝা গেল না। বার দুই 'পাখি' শব্দটা উচ্চারণ করলো, আর হাত দিয়ে কাগজটা দেখলো। মা ছিল সংবাদপত্রের নিয়মিত পাঠক, আদ্যোপান্ত পড়া ছিল তার অভ্যাস। আমার একটা আশঙ্কা জাগলো মনে। জানতে চাইলাম, 'কাগজ পড়েছ?' অস্ফুটস্বরে কী একটা বললো, তারপর কাগজ দেখিয়ে হাত নাড়লো। আমি তাকে কাগজ পড়তে বললাম, মা মাথা নাড়ালো। বুঝলাম, কাগজ পড়তে পারছে না।

ফোন করে ডা. এম এন নন্দীকে আসতে অনুরোধ করলাম। তিনি দেখে বললেন, স্ট্রোকের মতো একটা কিছু হয়েছে ঘুমের মধ্যে—স্মৃতিশক্তি অনেকখানি নষ্ট হয়ে গেছে। ওষুধপত্র দিলেন। ব্যবস্থা হলো, ডা. এম এ করিম রোজ এসে মাকে দেখে অবস্থা জানাবেন ডা. নন্দীকে, তিনি সময় করতে পারলেই দেখতে চলে আসবেন। ডা. নন্দী অনেকের কাছ থেকে ফিস নিতেন না—আমাদের কাছ থেকেও নয়, তাঁকে প্রত্যহ আসতে বলা যায় না।

মা শুধু খবরের কাগজ পড়তে ভুলে গেল, তাই নয়, আশপাশে সবকিছুর নাম হারিয়ে ফেললো। আমার ছোটো ভাই আখতারের নামটিই একমাত্র বলতে পারতো, কিন্তু বোঝা গেল, অনেক সময়ে ওই নাম বলে সে আমাকেই খুঁজছে। কয়েকদিন পর ডা. নন্দী বললেন, মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞ দেখানো দরকার। তিনি সুপারিশ করলেন পাবনা মানসিক হাসপাতালের পরিচালক ডা. এ কে নাজিমউদ্দৌলা চৌধুরীর নাম। কামরু ভাই অফিসের কাজে পাবনা গেলেন এবং ডা. চৌধুরীকে ঢাকায় আনার ব্যবস্থা করে এলেন। ডা. চৌধুরী বললেন, রোগীর সুস্থ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, তবে অবস্থার অবনতি রোধ করার চেষ্টা করতে হবে। ওষুধ-পথ্য তো নিয়মিত খাওয়াতেই হবে, তার সঙ্গে যথেষ্ট কথা বলতে হবে এবং আবার লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করতে হবে। আমি একটা বর্ণপরিচয় এনে মাকে অ-আ-ক-খ পড়াবার প্রয়াস পাই, মা একটু পড়তে চায়, পরক্ষণেই হেসে হাত দিয়ে বই দূরে ঠেলে দেয়। আমার

নাম বলতে না পারলেও সে বেশির ভাগ সময় আমাকেই খুঁজতো, আমার হাতে ছাড়া ওষুধ খেতে চাইতো না। ডা. চৌধুরী এর বিকল্প সন্ধান করতে বললেন : 'এখন আপনি পারছেন, তবে আপনার কাজকর্ম আছে—সব সময়ে পারবেন না, কিছুকাল পরে আপনিও ক্লান্ত হয়ে পড়বেন।'

ডা. চৌধুরী পাবনা থেকে প্রতিমাসে একবার দেখতে আসতেন মাকে, ডা. নন্দী মাঝে মাঝে আসতেন, ডা. করিম প্রত্যহ। মনে হলো, অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে। কথা একটু স্পষ্ট হয়েছে, কিন্তু তাতে সংলগ্নতা আসেনি; কিছু কিছু জিনিস নিজে করতে পারে, তবে স্মৃতিশক্তি ফিরে আসেনি, পড়ালেখা করতে পারে না। এক জিনিসকে অন্য নামে উল্লেখ করে, একজনকে ভিন্ন নামে ডাকে।

মার জন্যে স্বাভাবিক উদ্‌বেগের পাশাপাশি আমি আরেকটা চিন্তায় আচ্ছন্ন হলাম। আমার 'উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশযাত্রা'র একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। এখন আমি কী করি!

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ইউনাইটেড স্টেটস এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন ইন পাকিস্তানে আবেদন করেছিলাম, অ্যাডভান্‌সড রিসার্চের জন্যে ফুলব্রাইট বৃত্তি চেয়ে। আমার উদ্দেশ্য ছিল শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট-ডক্টরাল পর্যায়ে গবেষণা করা। সেখানকার দক্ষিণ এশীয় অধ্যয়ন বিভাগ এই অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতি এবং সামাজিক বিজ্ঞানের নানা দিক সম্পর্কে পড়বার ও গবেষণা করবার খুব নামিদামি প্রতিষ্ঠান। আমেরিকার তিন-চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার চর্চা হতো, তার মধ্যেও শিকাগো ছিল শ্রেষ্ঠ।

ঢাকায় বসে শিকাগোর ওই বিভাগের সঙ্গে আমার একটা পরোক্ষ যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল। ব্যারি মরিসন সেখানেই পিএইচ ডি পর্যায়ে গবেষণা করছিলেন প্রাচীন বাংলার ইতিহাস নিয়ে। তিনি সপরিবারে এক বছরের জন্যে ঢাকায় এসেছিলেন তাঁর গবেষণার বিষয়ে উপকরণ সংগ্রহ করতে। ব্যারি ও তার পরিবারের সঙ্গে পরিচয়টা বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। একই বিভাগের আরেক গবেষক পিএইচ ডি পর্যায়ে কাজ করছিল দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজ সম্পর্কে। তার নাম রোনালড (সংক্ষেপে রন) ইনডেন। তার কাজে সে এসেছিল কলকাতায়—কেবল কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে বেড়াতে এলো ঢাকায়। রন গড়গড় করে বাংলা বলে, পর্দার আড়াল থেকে বললে বোঝা যাবে না যে, সে বঙ্গসন্তান নয়। অল্প কয়েকদিনেই তার সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বের সূচনা হয়ে গেল। এর মধ্যে বিভাগীয় প্রধান এডওয়ার্ড সি ডিমক, জুনিয়র, কী একটা কাজে এসেছিলেন কলকাতায়। দিন তিনেকের জন্যে তিনি ঢাকা বেড়াতে এলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে মনোবাঞ্ছার কথা বললাম। তিনি শিকাগোতে স্বাগতই জানিয়ে ফেললেন এবং ইয়ং বেঙ্গল নিয়ে কাজ করার পরিকল্পনাও অনুমোদন করলেন।

সাক্ষাৎকার-পর্বে ফাউন্ডেশনের লোকজন ছাড়া এদেশীয় প্রতিনিধিরূপে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবি বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সিরাজুল হক। তিনি আমার প্রতি বেশ অনুকূল ছিলেন বলে মনে হয়েছিল। মার্কিন কর্মকর্তাদের কেউ জানতে চেয়েছিলেন, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমি কোনো যোগাযোগ করেছি কিনা।

ঢাকায় ডিমকের সঙ্গে আলাপের কথা বললাম। মনে হলো, তাঁরা সন্তুষ্ট হলেন। কিছুকাল পর আনুষ্ঠানিকভাবে জানা গেল, প্রাথমিক বাছাই পর্বে আমি টিকে গেছি। এবারে চূড়ান্ত আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।

বৃত্তির জন্যে চূড়ান্ত আবেদনপত্রের সঙ্গে ইংরেজি বিষয়ে আমার ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে ফাউন্ডেশনের অনুমোদিত পর্যায়ের কারো কাছ থেকে প্রশংসাপত্র সংযোজন করা আবশ্যক ছিল। আমি গেলাম ঢাকার মার্কিন তথ্য কেন্দ্রের (ইউ এস আই এস) কালচারাল অ্যাফেয়ার্স অফিসার গেইল মিনোর কাছে। এই অপূর্ব সুন্দরী মহিলার সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় ছিল। ফরমের একটা কলামে লিখতে হতো আমি কতো বছর সপ্তাহে কত ঘণ্টা ইংরেজি পড়েছি বলে তাঁর যুক্তিসংগত ধারণার পরিচয়। গেইল জিজ্ঞেস করলেন, কী লিখবেন সেখানে। আমি বললাম, অমন হিসেব তো করি নি। তিনি বললেন, এখানে বসে বসে মনে করে একটা হিসেব লেখো। স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবসিডিয়ারি ক্লাস পর্যন্ত ইংরেজি পড়ার যে-হিসেব আমি দিলাম, বিনা বাক্যব্যয়ে উনি নিজের হাতে সেটা টাইপ করে দিলেন এবং মন্তব্যের ঘরে যা লিখলেন তা অতিরঞ্জিতই।

চূড়ান্ত আবেদনপত্রে একটি ঘর ছিল প্রার্থী সম্পর্কে তার নিয়োগকর্তার সবিস্তার মতামত দেওয়ার জন্যে, তার পাশে একটি ছোট ঘর ছিল নিয়োগকর্তার মতে প্রার্থী তুলনামূলকভাবে কোন পর্যায়ভুক্ত হতে পারে তা বর্ণানুক্রমে জানাবার জন্যে। হাই সাহেব তখন কোনো কাজে গিয়েছিলেন রাজশাহীতে, বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন মুনীর চৌধুরী। তিনি রেজিস্ট্রারকে আনুষ্ঠানিক চিঠি দিয়ে আমার সম্পর্কে কী লেখা যেতে পারে, তার মুসাবিদা তৈরি করে দিলেন। রেজিস্ট্রার আবদুল হাদী তালুকদারের কাছে সভয়ে সেটা নিয়ে গেলাম। তিনি পড়ে কাগজটা আমার হাতে ফেরত দিয়ে দিলেন। বললেন, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে কতদিন ধরে কাজ করছি, কোন পদে কর্মরত রয়েছি, কত মাইনে পাই, বৃত্তি পেলে আমাকে ছুটি দেওয়া হবে কিনা—এসব বিষয়ে তিনি লিখতে পারেন, কিন্তু তার অতিরিক্ত কিছু লিখতে পারবেন না, কেননা শিক্ষকের মেধার খোঁজখবর রাখার দায়িত্ব রেজিস্ট্রারের নয়। আমি যতই বলি, ফর্মে এমপ্লয়ারের অ্যাসেসমেন্ট চায়, উনি ততই বলেন, ওরা চাইলে কী হবে, নিজের এখতেয়ারের বাইরে তিনি যাবেন না। এবারে আমাকে সঙ্গে করে মুনীর চৌধুরী এলেন তাঁর কাছে—দর্শনের সাবসিডিয়ারি ক্লাসে তিনি হাদী সাহেবের ছাত্র ছিলেন। মুনীর চৌধুরী বললেন, 'সার্, আপনি তো নিজে লিখছেন না, হেড অফ দি ডিপার্টমেন্টের কমেন্টস দেখে লিখছেন—সেটা তো আপনার ফাইলেই থাকবে।' রেজিস্ট্রার বলেন, 'তাহলে হেড অফ দি ডিপার্টমেন্টই লিখুক।' মুনীর চৌধুরী বলেন, 'হেড তো এমপ্লয়ার নয়।' হাদী সাহেব বলেন, 'তা আমি কী করুম!' শেষে রেজিস্ট্রার নিতান্ত মামুলি দু-এক লাইন ডিকটেট করে দিলেন ফর্মে লেখার জন্যে। রেজিস্ট্রারের পি এ ছিলেন তাঁরই ভাগনে রফিকুল আলম—তিনিই ডিক্টেশন নিলেন। মুনীর চৌধুরী তাঁর পেছন পেছন উঠে এসে বললেন, 'সার্‌কে তো বোঝানো যাচ্ছে না, কিন্তু আপনি তো বুঝছেন। ভালো রিকমেন্ডেশন না হলে ফেলোশিপটা আনিসের হবে না। আপনি ওই ডানদিকের ছোটো ঘরটায় ক্যাপিটাল

লেটারে শুধু 'এ' টাইপ করে দিন।' আলম সাহেব মুনীর চৌধুরীকে শ্রদ্ধা করতেন, আমার প্রতিও বোধহয় একটু মায়া অনুভব করেছিলেন। তিনি তাই করে দিলেন। হাদী সাহেব সেটা আর লক্ষ করলেন না। ফর্ম হাতে নিয়ে যথাস্থানে স্বাক্ষর দিতে দিতে বলতে থাকলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যদি করণীয়-অকরণীয় না বোঝে, তাহলে চলবে কী করে!

বৃত্তি মনজুরির আনুষ্ঠানিক পত্র পাওয়ার আগে খবরটা পেয়েছিলাম ওই তথ্য কেন্দ্রেরই প্রেস অফিসার বেন জ্যাকসনের কাছ থেকে। তিনি আমার শ্বশুরকে—তাঁর ভাষায়, আমার আঙ্কলকে—ভালো চিনতেন। খবর জেনেই তিনি অভিনন্দন জানিয়ে ছোটো একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন আমাকে। আমি ঢাকা ছাড়ার আগেই তিনি ওয়াশিংটন ডিসিতে ইউ এস আই এসের সদর দপ্তরে বদলি হয়ে যান। তাঁর সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি, নিতান্ত অকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

আমার চূড়ান্ত মনোনয়নপত্র যখন হাতে এলো, ততদিনে মা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমি দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। ডা. নাজিমউদ্দৌলা চৌধুরীর পরামর্শ চাইলাম। তিনি বললেন, 'দেখুন, আপনার মায়ের যে কন্ডিশন, তাতে এখন তাঁর প্রাণের আশঙ্কা আছে বলে মনে করি না। এই অবস্থা অনেকদিন ধরে চলতে পারে। আবার হঠাৎ যে কিছু হয়ে যাবে না, তাও জোর দিয়ে বলতে পারি না। আমি আপনাকে নিজের দিকটাও ভাবতে বলবো। আর্লি লাইফে বিদেশে গিয়ে রিসার্চের একটা সুযোগ পাচ্ছেন, সেটা নষ্ট করা ঠিক হবে না। আপনার মা নিজেকে যদি একসপ্রেস করতে পারতেন, তাহলে তিনিও হয়তো তাই চাইতেন।' শেষ পর্যন্ত দিনপ্রতি পনেরো ডলার হারে তিনশ দিনের জন্যে ফুলব্রাইট অ্যাডভান্সড রিসার্চ ফেলোশিপ নিয়ে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া স্থির করলাম।

আমরা যারা বৃত্তির জন্যে চূড়ান্তভাবে মনোনীত হয়েছিলাম, ঢাকায় মার্কিন তথ্য কেন্দ্রে তাদের ওরিয়েন্টেশন হয়েছিল দু দিন ধরে। আমাদের দেশি যেসব ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করে ফিরে এসেছেন, তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বললেন। তবে ওঁরা অধিকাংশই সেখানে ডিগ্রি করতে গিয়েছিলেন—সুতরাং তাঁদের পথ আর আমার পথ ঠিক এক ছিল না। তবু তাঁদের বক্তৃতা থেকে কিছু যে উপকৃত হই নি, তা নয়। মার্কিন বক্তারা নানারকম আনুষ্ঠানিকতার বিষয় বুঝিয়ে বলেছিলেন, আবহাওয়া-সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন, করণীয় ও অকরণীয় বিষয়ে কিছু প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়েছিলেন। একটি কথা তাঁরা বারবার বলে দিয়েছিলেন : যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করার সময়ে এক্স-রে প্লেট ও রিপোর্ট যেন হাতে রাখি। কেউ কেউ ওগুলো বাক্সবন্দি করে রাখেন, তাতে অনেক ঝঞ্ঝাট হয়; কেউ কেউ তো হারিয়েই ফেলেন, তাতে আরো হাঙ্গামা। আমি মনে মনে হেসেছিলাম এই ভেবে যে, অমন দরকারি জিনিস যে হারায়, সে নিশ্চয় বড়োরকম বেকুব। পরে অবশ্য এই আত্মশ্লাঘার শাস্তি পেয়েছিলাম।

৩২.

পূর্ব বাংলায় ১৯৬৪ সালে যে-সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে, তার কথা বলা হয়নি।

১৯৫০ সালের পরে প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলে দাঙ্গা বাধেনি—যদিও ভারতের নানা স্থানে বিভিন্ন সময়ে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের সংবাদে এখানে কখনো কখনো সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হতো। এবারে হঠাৎ করে কলকাতায় দাঙ্গা শুরু হয়। শুনেছি, কলকাতার কোনো কোনো কাগজে খুলনায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অমূলক খবরে এই হাঙ্গামার সূচনা হয়েছিল। কলকাতার ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় খুলনায় দাঙ্গা হলো—কেউ কেউ বলেন, অমুসলমানদের সম্পত্তি দখল করার উদ্দেশ্যে এই দাঙ্গা বাধানো হয়েছিল এবং এর উসকানি দিয়েছিলেন কনভেনশন মুসলিম লীগের একজন প্রভাবশালী নেতা। খুলনার পরে দাঙ্গা বাধলো নারায়ণগঞ্জ, ১৪ জানুয়ারিতে, প্রথমে আদমজী জুট মিল এলাকায়, তারপরে অন্যত্র। দাঙ্গার খবর পেয়েই ঢাকার অনেক রাজনৈতিক নেতা নারায়ণগঞ্জে ছুটে যান এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সহায়তায় দাঙ্গারোধ করার উদ্‌যোগ নেন। ওইদিনই রাজনীতিবিদদের নেতৃত্বে ঢাকায় সর্বদলীয় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয় এবং তার উদ্‌যোগে শান্তি মিছিল বের হয়। এতে যোগ দিয়ে আমরা অনেকেই শহর পরিভ্রমণ করি। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না, ১৫ তারিখেই ঢাকায় দাঙ্গা লেগে গেল—ওদিকে নওয়াবপুর-রথখোলা ও কলতাবাজার-গেণ্ডারিয়ায়, এদিকে রায়েরবাজারে। সরকার চাইলে গোড়াতেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো, কিন্তু তারা তা করেনি। এবারের দাঙ্গায় অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই ছিল বিহারি। আমাদের অনেকেরই মনে হয়েছিল, কনভেনশন মুসলিম লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনীতিবিদরা তাদের উত্তেজিত করে মাঠে নামিয়েছেন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যে বাধতে পারে, এমন একটা আশঙ্কা আমাদের অনেকের মধ্যে জন্মেছিল। কলাভবনের কমনরুমে আমার শিক্ষক ভবানীচরণ রায়কে আমি সাবধান করে দিলাম। জগন্নাথ কলেজের কয়েকজন হিন্দু শিক্ষকের সঙ্গে তিনি রথখোলার মোড়ের কাছে একটি বাড়িতে মেস করে থাকতেন। আমার সতর্কবাণী তিনি হেসে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'আমাকে কেন মারবে—আমি তো কোনো রাজনীতির মধ্যে নেই।' পরদিন দাঙ্গা বাধলে তাঁদের মেসের সকলের জীবনই সংকটাপন্ন হয়। অধ্যাপক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন একেবারে নিজস্ব উদ্‌যোগে একটা গাড়ি নিয়ে যেয়ে তাঁদের সবাইকে উদ্ধার করে আনেন—পুলিশের সাহায্য নিয়েছিলেন কিনা, ঠিক মনে পড়ে না।

নওয়াবপুর পুলের কাছে রীমা কেমিক্যালস নামে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ছিল। তার মালিক আমীর হোসেন চৌধুরী ছিলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের ছোটো বোন হোমায়রার সন্তান। তিনি সাহিত্যচর্চা করতেন—প্রধানত অনুবাদ করতেন। নজরুলের কবিতার স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর প্রতিবেশী হিন্দু পরিবার আক্রান্ত হলে তিনি তাদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন এবং গুন্ডাদের হাতে প্রাণ দেন। এই ঘটনা খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। আরো অনেক জায়গায় হিন্দু পরিবারকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রতিবেশী মুসলমান লাঞ্ছিত হন।

দাঙ্গা বেধে যাওয়ার অসমর্থিত খবর পেয়ে আমাদের পাড়ার মিষ্টান্নবিক্রেতা নিতাই

ঘোষ আমাদের বাড়িতে আসে কিংকর্তব্য সম্পর্কে পরামর্শ নিতে। আমাদের বাড়ির পাশে একটা প্রশস্ত পূজামণ্ডপ ছিল। আমি বলি, তারা কয়েক পরিবার সেখানে আশ্রয় নিলে ভালো হয়। মণ্ডপের দরজার চাবি যার কাছে, সে ইতস্তত করছিল দুই কারণে। মণ্ডপের লোকজন রাত্রিযাপন করলে তা নোংরা হয়ে যাবে; আর দাঙ্গা বাধলে মণ্ডপই হয়ে উঠতে পারে আক্রমণের লক্ষ্য। এই আশঙ্কা উড়িয়ে না দিয়েও আমি বুঝিয়ে বলি, বিচ্ছিন্ন হয়ে না থেকে একসঙ্গে থাকলে আত্মরক্ষা সহজ হবে এবং পুলিশের সাহায্য পেতেও সুবিধে হবে। তারপর আমি দৌড়ে যাই যোগীনগর লেনে—সুরেশের বাড়িতে। সুরেশ ছিলেন ঢাকার রঙ্গমঞ্চের প্রধান মেক-আপম্যান। আব্বার অনুমতি নিয়ে গিয়েছিলাম—সুরেশকে বললাম, 'শিগগির গুছিয়ে নিন, আমাদের বাড়ি গিয়ে থাকবেন।' তিনি ইতস্তত করতে থাকলেন; বললেন, খালি বাড়ি রেখে গেলে যদি লুট হয়ে যায়! আমি একটু রাগ করে বললাম, 'প্রাণ আগে, না জিনিসপত্র আগে?' সুরেশকে বোঝাতে না পেরে আমি ফিরে এলাম। কয়েক ঘণ্টা পরে দেখি, পুলিশ-প্রহরায় সুরেশ ও তার পরিবার চলে যাচ্ছে—আমার সঙ্গে এলে যেটুকু মালপত্র নিতে পারতেন, তাও নিতে পারেননি। এর মধ্যে নিতাইরা এবং আরো দুই পরিবার মণ্ডপে এসে আশ্রয় নেয়।

অধ্যাপক অজিত গুহ তখন থাকতেন হাটখোলায়—হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরির উলটো দিকে বলধার জমিদারদের 'টয়' নামের বাড়িতে। সময়মতো তাঁকে সাবধান করে দিয়েও লাভ হলো না—তিনি বললেন, 'আশেপাশে সবাই আমার চেনাশোনা, তাছাড়া গ্লাস ফ্যাক্টরির শ্রমিকেরা আমাকে খুব ভালোবাসে। ভয়ের কিছু নেই।' দাঙ্গা শুরু হলে *ইত্তেফাকের* সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়া তাঁর গাড়ি পাঠালেন রোকনুজ্জামান খান ওরফে দাদাভাই আর নূরুল ইসলাম ভাণ্ডারীকে (এককালের ছাত্রলীগ ও যুবলীগ কর্মী) দিয়ে—অজিতবাবুকে নিয়ে আসার জন্যে। অজিতবাবু তখনো যেতে রাজি হলেন না। দুপুরে কাপ্তানবাজারের কসাইরা এবং ওই এলাকার গুন্ডাশ্রেণীর আরো কিছু লোক লোহার রড ও ছোরা নিয়ে—এক-আধটা তলোয়ারও নিয়ে—*ইত্তেফাক* অফিসে হামলা চালাতে গেল। খবর পেয়ে মানিক মিয়া স্বয়ং লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরা অবস্থায় একটা কাঠের লাঠি হাতে নিয়ে নেমে এলেন। *ইত্তেফাকের* গেটে দুজন আর্মড পুলিশ দেওয়া হয়েছিল। মানিক মিয়া লাঠি উঁচিয়ে গুণ্ডাদলের দিকে ইঙ্গিত করে চীৎকার করতে থাকলেন 'ফায়ার, ফায়ার।' তাঁর কণ্ঠে এমন কিছু ছিল যে, আর্মড পুলিশেরা আর কারো নির্দেশের অপেক্ষা না করে তাঁর কথা শুনেই গুন্ডাদলের দিকে রাইফেল তাক করে দাঁড়ালো। এর মধ্যে *ইত্তেফাকের* সাংবাদিক ও প্রেসকর্মীরা গেটের কাছে জড়ো হয়ে তাদের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক যেসব অস্ত্র সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছিল—ভাঙা চেয়ার-টেবিলের অংশ কিংবা ইটের টুকরো—আক্রমণকারীদের লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগলেন। আশ্চর্যের কথা, দুর্বৃত্তরা পালিয়ে গেল।

মানিক মিয়া এবারে *ইত্তেফাকের* ম্যানেজার—পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের এককালীন সাধারণ সম্পাদক, যুবলীগ-কর্মী ও ত্যাগী রাজনৈতিক পুরুষ—আবদুল ওয়াদুদকে আবার গাড়ি দিয়ে পাঠালেন অজিতবাবুকে আনতে। অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলে দিলেন, অজিতবাবুর কোনো আপত্তি না শুনে তাঁকে জোর করে নিয়ে আসতে।

ইত্তেফাককে নিয়ে আসার পরে মানিক মিয়া নাকি রুষ্টদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন অজিতবাবুর দিকে, আর তখনই টেলিফোন করে সায়ীদুল হাসানের (ভাসানীপন্থী ন্যাপের নেতা, মুক্তিযুদ্ধে শহীদ) বাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে আবার গাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এর মধ্যে সর্বদলীয় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শিরোনামে একটি প্রচারপত্র বিলি করে ১৬ জানুয়ারিতে। একই মর্মে সংবাদপত্রে অভিন্ন সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় এইদিনেই। এটা সম্ভব হয়েছিল মানিক মিয়া, জহুর হোসেন চৌধুরী, আবদুস সালাম ও সিরাজুদ্দীন হোসেনের প্রচেষ্টায়। এছাড়া আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান, মাহমুদ আলী ও অলি আহাদ প্রমুখ নেতা খোলা ট্রাকে চড়ে সারা শহর ঘুরে মাইক্রোফোনযোগে আহ্বান জানান দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে। কোনো এক পর্যায়ে গুন্ডারা শেখ মুজিবের ওপর চড়াও হওয়ার চেষ্টা করে বলেও শুনেছি। জগন্নাথ কলেজ, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী এবং আরো অনেকগুলো ভবনে শরণার্থী-শিবির খোলা হলো। সরকারি সাহায্যের অপেক্ষা না করে সাধারণ মানুষের দান দিয়েই এসব শিবিরে আহারাদির ব্যবস্থা করা হয়—যদিও সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেকেই শরণার্থীদের জন্যে দ্রুত সরকারি ত্রাণের ব্যবস্থা করতে এগিয়ে এসেছিলেন, এ কথা না বললে সত্যের অপলাপ হবে। প্রদেশের অন্যত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিস্তার ও ত্রাণ ব্যবস্থার তারতম্য ঘটে প্রধানত সরকারি আমলাদের নিজস্ব প্রতিক্রিয়া এবং রাজনৈতিক দলগুলির সংঘবদ্ধ প্রয়াসের দ্রুততার ওপরে। রাজশাহীতে কয়েকদিন দাঙ্গা চলতে দেওয়া হয়েছিল—ফলে সেখানে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। খুলনায় প্রথম ধাক্কার পরে অবস্থা সামলে নেওয়া গিয়েছিল। কুমিল্লায় দাঙ্গা ঘটতে দেওয়া হয়নি। চট্টগ্রাম ও সিলেটে দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টাই হয়নি।

'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও'য়ের আহ্বান যথেষ্ট কার্যকর হয়েছিল। এক পর্যায়ে আশঙ্কা জেগেছিল যে, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা প্রশমিত হলেও বাঙালি-বিহারি দাঙ্গা না লেগে যায়! ১৬ তারিখেই বোধহয় সরকার ঢাকায় কারফিউ জারি করে। এতে দাঙ্গাবাজদের চেয়ে বেশি অসুবিধে হয়েছিল ত্রাণকর্মীদের। প্রায় সব দলের রাজনৈতিক নেতারা সরকারকে চাপ দিয়ে ব্যাপক হারে কারফিউ পাস সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিলেন—তাতে কাজের সুবিধে হয়েছিল। আমার অবশ্য কারফিউ পাস ছিল না, তবে আহমদ হোসেনের ছিল। দুর্গত-উদ্ধারে এবং বাফায় শরণার্থী শিবির চালাতে সে খুব পরিশ্রম করেছিল। মাহমুদ নূরুল হুদা, মোহাম্মদ মোদাব্বের এবং এম এ মোহায়মেন বাফার কেন্দ্রটি খুব সুষ্ঠুভাবে চালিয়েছিলেন। বেগম আনোয়ারা বাহার চৌধুরী বড়ো মেয়ে সেলিনাকে সঙ্গে নিয়ে এসে বিশেষ করে মহিলাদের তত্ত্বাবধান করতেন। কারফিউ যখন থাকতো না, তখন আমি সেখানে যেতাম, তবে আমার ভূমিকা ছিল গৌণ। কারফিউ চলাকালে আমি পাশের বাড়িতে গিয়ে আমাদের ছাত্রজীবনের অগ্রজপ্রতিম বন্ধু আবুল কাসেমের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করে কাটাতাম আর মুড়ি ও চিনেবাদাম ধ্বংস করতাম।

সেবাকার্যে ও দাঙ্গা-প্রতিরোধে বহু তরুণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছিল। দাঙ্গাও

থেমেছিল অচিরে। তবে তারপর 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' প্রচারপত্রের প্রকাশক ও মুদ্রাকরের নাম না থাকার অজুহাতে তার সকল স্বাক্ষরকারীর বিরুদ্ধে সরকার মামলা রুজু করেছিলেন। অভিযুক্তদের মধ্যে হামিদুল হক চৌধুরী, আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান, মাহমুদ আলী, অলি আহাদ, শাহ আজিজুর রহমান, আলীম আল রাজী, আলী আকসাদ, মানিক মিয়া, জহুর হোসেন চৌধুরী ও মাহবুবুল হক ছিলেন। শোনা যায়, মোনায়েম খানের প্রত্যক্ষ নির্দেশে এ-মামলা দায়ের করা হয়। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে আইউব-মোনায়েমের পতনের পর সরকার মামলা তুলে নেয়।

৩৩.

আমার একটা পাসপোর্ট ছিল ভারতে যাওয়ার। এবারে আন্তর্জাতিক পাসপোর্টের আবেদন করলাম। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অধিকর্তা বাহাউদ্দিন আহমদ—অফিসে সব সময়ে মুখ ভার করে বসে থাকেন, কিন্তু কাউকে সাহায্য করতে কার্পণ্য করেন না। বামপন্থী রাজনৈতিক বন্ধুদের প্রতিও যথাসাধ্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন; তিনি সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ—আমাকে একটু চিনতেন। দরখাস্ত হাতে নিয়ে বললেন, 'কাল এসে পাসপোর্ট নিয়ে যাবেন।' পরদিন গেলাম। ভাবলেশহীন মুখে তিনি বললেন, 'হবে না, আপনার নাম ব্ল্যাকলিস্টে আছে; আমি তা জানতাম না।' বিদেশে যে আমি কত প্রবলভাবে যেতে চাই, তা সেই মুহূর্তে অনুভব করলাম। জানতে চাইলাম, কী করা যায়? বললেন, 'স্পেশাল ব্রাঞ্চে পাঠাতে পারি, তবে হবে কিনা বলতে পারি না। সেখানে কাউকে চেনেন?' বললাম, 'নূরুল মোমেন খান শুনেছি সেখানে এ এস পি—আমার ক্লাসমেট।' বাহাউদ্দিন বললেন, 'পরশুর আগে কাগজপত্র তাঁর কাছে পৌঁছোবে না। আপনি কালই একবার বলে রাখেন।'

নূরুল মোমেন খান ওরফে মিহির কলেজ-জীবন থেকে বন্ধু। পরদিন ওকে ফোন করলাম। বললো, 'ফাইল আসুক, দেখি কী করতে পারি।' তার পরদিন জানলাম, ফাইল আসেনি, তারপরদিনও না। ছুটলাম বাহাউদ্দিন সাহেবের কাছে। আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ফাইল গেছে।' আবার মিহিরকে ফোন। 'দেখি খোঁজ নিয়ে।' আবার ফোন। 'হ্যাঁ, এসেছে।' আবার ফোন। 'তোমার ফাইল তো পাঠিয়ে দিয়েছি।' আবার পাসপোর্ট অফিস। বাহাউদ্দিন কুরসি থেকে উঠে ভেতরে গেলেন। ফিরে এসে অটুট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, 'হ্যাঁ ফিরে এসেছে—তবে না হয়ে।' এবারে মিহিরের বাড়িতেই চলে গেলাম। সে আমাকে দেখেই হাত ধরে ফেলে বললো, 'ভাই, পারলাম না—নিচে থেকে যে-নোট দিয়েছিল, আমার পক্ষে তা পালটানো সম্ভব হলো না।' আমি বললাম, 'তুমি আমাকে তা বললে না কেন? আমি অন্য কাউকে বলতে পারতাম। আর টেলিফোনে যখন বললে ফাইল পাঠিয়ে দিয়েছ, তখনো তো বললে না যে, করতে পারো নি।' মিহির করুণ মুখ করে বললো, 'নিজের মুখে তোমাকে বলতে লজ্জা লাগছিল।' একটু থেমে বললো, 'সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে—বিশেষ করে, হোম মিনিস্ট্রিতে—যদি কাউকে দিয়ে বলাতে পারো, তাহলে এখনো হয়তো হতে পারে।'

আহমদ হোসেন পরামর্শ দিলো, অলি আহাদকে দিয়ে তাঁর অগ্রজ আবদুস সাত্তারকে ধরতে—তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের, বোধহয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের—কর্মকর্তা। ঘটনাক্রমে তিনি তখন ঢাকায় ছিলেন। অলি আহাদ আমাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে তাঁর কাছে গেলেন। রিকশায় উঠে একটু তির্যকভাবে বললেন, 'তাহলে আপনি পুঁজিবাদী দেশে লেখাপড়া করতে ইচ্ছুক হয়েছেন?' অলি আহাদ তখন বামপন্থীদের প্রতি বিরক্ত—সুতরাং কোনো জবাব দিলাম না। তিনি তখন বললেন, 'এ কথা আমি না বললেও অনেকে জিজ্ঞাসা করবে। আপনার কী জবাব হওয়া উচিত, জানেন? লেখাপড়ার ব্যাপারে পুঁজিবাদী-সমাজতন্ত্রী দেশে পার্থক্য করা অর্থহীন। আপনি যাচ্ছেন জানতে, নিজেকে সমৃদ্ধ করতে।'

সাত্তার সাহেবের সঙ্গে কথা হলো। তিনি বললেন, খোঁজখবর নিয়ে দেখবেন। খুব একটা ভরসা পেলাম না।

মেজোদুলাভাই ফোন করলেন খুলনা থেকে : আমি চাইলে তিনি সবুর সাহেবকে বলে দেখতে পারেন। দুলাভাইয়ের আবাল্য বন্ধু খান আবদুস সবুর খান তখন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ-মন্ত্রী। আমার সম্মতি পেয়ে তিনি সবুর খানকে ফোন করলেন ইসলামাবাদে। সবুর খান ফোন করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাবীবুল্লাহ খানকে। তিনি তখন করাচি সফর করছেন। মন্ত্রণালয়ে ফোন করে হাবীবুল্লাহ খান নির্দেশ দিলেন আমাকে যেন 'রেসট্রিকটেড পাসপোর্ট' দেওয়া হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্টের ডিরেক্টর-জেনারেলের অফিস হয়ে বার্তা এলো ঢাকায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে : আমাকে এক বছরের জন্যে পাসপোর্ট দেওয়া হবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পশ্চিম হয়ে আসা-যাওয়া করতে যেসব দেশ পড়ে—সেসব দেশের বাইরে কোথাও যাওয়ার সুযোগ থাকবে না এবং প্রদানকারী অফিসের সম্মতি ছাড়া তার মেয়াদ বাড়ানো বা তাতে কোনো কিছু যোগ করা চলবে না। এবারে ঈষৎ হেসে বাহাউদ্দিন সাহেব পাসপোর্টটি হাতে তুলে দিলেন।

এর মধ্যে ঢাকা থেকে করাচি যাওয়ার টিকিট এসে ফেরত গেল। করাচি থেকে নিতে হতো বিদেশযাত্রার টিকিট—কিন্তু পাসপোর্ট ছাড়া সেখানে যাওয়া অর্থহীন। পাসপোর্ট পেয়ে তার বিবরণ করাচিতে ফাউন্ডেশনের অফিসে পাঠিয়ে টিকিট দিতে অনুরোধ জানালাম। সেইসঙ্গে এক বছরের শিক্ষা-ছুটি চেয়ে বিভাগের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত করলাম। আমাকে ছুটি দিতে কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন প্রথমে যখন বৃত্তির জন্যে আবেদন করি, তখনই। কিন্তু এখন দেখি, ছুটি মনজুর হয় না। খোঁজ নিয়ে জানলাম, ভাইস-চান্সেলর ড. মুহম্মদ ওসমান গণি নির্দেশ দিয়েছেন, অ্যাকাডেমিক কাউনসিলের সভায় আবেদন যথারীতি পেশ করা হবে, সেখানে সিদ্ধান্ত হলে তবেই আমি শিক্ষা-ছুটি পাবো। প্রমাদ গণলাম। এমনিতেই আমার দেরি হয়ে গেছে, তার ওপরে আরো দেরি! হাই সাহেবকে অনুরোধ করলাম, তিনি যদি ভাইস-চান্সেলরকে দিয়ে তাঁর ক্ষমতাবলে আমার বিদেশ যাওয়ার অনুমতিটা এনে দিতে পারেন—ছুটির ধরন কী হবে, সেটা না হয় পরে কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করবেন—তাহলে আপাতত আমার কার্য সমাধা হয়। হাই সাহেব আমার হয়ে ভাইস-চান্সেলরকে কিছু বলতে রাজি হলেন না। রেজিস্ট্রারের অফিসে একজন পরামর্শ

দিলেন, যেতে চাইলে আপনাকে বিনাবেতনে ছুটি চেয়ে দরখাস্ত করতে হবে—সেটা, মনে হয়, ভাইস-চান্সেলর মনজুর করবেন।

প্রথমে যখন বৃত্তির জন্যে দরখাস্ত করি, তখন ভেবেছিলাম, বেবীও সঙ্গে যাবে—ফাউন্ডেশনই তার আসা-যাওয়ার খরচ দিতো। মায়ের অসুখ আর বৃত্তি নিয়ে ডামাডোলের মধ্যে, ১৯৬৪ সালের ১২ এপ্রিল, আমার মেয়ে রুচির জন্ম হলো। তখন দোটানায় পড়ে গেলাম, বেবী ও রুচিকে সঙ্গে নেবো কী না। মুনীর চৌধুরী—এবং লিলি ভাবীও—বললেন, অতটুকু বাচ্চা নিয়ে সহায়ছাড়া বেবী কষ্টে পড়বে, বিদেশে যাওয়ার কোনো সার্থকতাই তার লাভ হবে না। বেবী যেতে ইচ্ছুক ছিল, তবে অধিকাংশ স্বজনের মত ছিল তার যাওয়ার বিরুদ্ধে। এটাই আমরা মেনে নিলাম। এখন এদের তো রেখে যাচ্ছি—বেতনের টাকাটাও যদি মাসে মাসে এরা না পায়, তাহলে চলবে কী করে!

বিনাবেতনে ছুটি চেয়ে দরখাস্ত করলাম। তারপর দৌড়োলাম বাংলা একাডেমীর পরিচালক সৈয়দ আলী আহসানের কাছে। তাঁকে সবটা খুলে বললাম। জানালাম, 'মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র (১৮৩১-১৯৩০)' নামে একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছি। বাংলা একাডেমীতে ওটা জমা দিয়ে কি অগ্রিম কিছু পেতে পারি? সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করে তিনি বললেন, 'তুমি যদি স্বত্ব বিক্রি করে দাও, তাহলে দু হাজার টাকা পাবে।' তাই করলাম।

এদিকে আমার দিনরাত এক হয়ে যাচ্ছে। আমার প্রথম বই *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য* বের হতে যাচ্ছে—আমাকে দেখতে হচ্ছে তার প্রুফ এবং মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান-রচিত *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের* কপি সংশোধন ও প্রুফ দেখতে হচ্ছে দ্বিতীয় সংস্করণের জন্যে। এরও একটা ইতিহাস আছে। আমার ডিগ্রিলাভে হাই সাহেব যতটা আনন্দিত হয়েছিলেন, বইটির প্রকাশে তিনি ততটা আগ্রহী ছিলেন না। ফলে পাণ্ডুলিপি আকারেই তা পড়ে ছিল। রাজ্জাক সাহেব তার 'দেশ ও কাল' অংশটা পড়ে প্রীত হয়েছিলেন বটে, তবে প্রত্যেক পৃষ্ঠার উলটো দিকের শাদা কাগজে নানারকম পরিবর্তন-পরিবর্ধনের পরামর্শ লিখে দিয়েছিলেন। আমি দেখলাম, সারের দু-একটা পরামর্শ নিতে পারি, কিন্তু সবটা নেওয়া আমার সাধ্যাতীত। পাণ্ডুলিপি ওইভাবেই রয়ে গেল।

পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখার সম্পাদক হয়ে মুনীর চৌধুরী কেন্দ্রীয় সংগঠন থেকে কিছু অর্থসংগ্রহ করেছিলেন প্রকাশনার জন্যে। তা দিয়ে তিনি দুটি বই ছাপবেন বলে স্থির করলেন : শামসুর রাহমানের *রৌদ্র করোটিতে* আর আমার অভিসন্দর্ভ। অভিসন্দর্ভ প্রকাশ করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি লাগে, সুতরাং হাই সাহেবের দ্বারস্থ হই। তিনি বলেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* সংশোধন করে তার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করার পরে আমার অভিসন্দর্ভ ছাপা যেতে পারে। মুনীর চৌধুরী স্টুডেন্ট ওয়েজকে তিন হাজার টাকা দিয়ে আমার বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন সুলভ মূল্যে। এখন তিনি ওই প্রকাশককে ডেকে বললেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* প্রকাশের দায়িত্ব নিতে। মোহাম্মদ ওহিদউল্লাহ্ সম্মত হলেন। আমি নিজের বইয়ের প্রুফ দেখি, তা সংশোধন করি ও নির্ঘণ্ট তৈরি করি; অন্য বইটিও সংশোধন

করি, তার প্রুফ দেখি ও নির্ঘণ্ট তৈরি করি। আমার বই যখন ছাপা শেষ, হাই সাহেবকে দেখাতে নিয়ে গেলাম, তখন তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এই কারণে যে, এটা যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত গবেষণা-অভিসন্দর্ভ, তা লেখা হয়েছিল নামপত্রের উলটো দিকে। এখন নামপত্র নতুন করে ছেপে সে-কথাগুলো সে-পাতায় স্থান দেওয়া গেল।

মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য বইটা যে আমি যাওয়ার আগে বেরোতে পারলো, তার জন্যে প্রকাশক ও মুদ্রাকরের নিরলস প্রচেষ্টার তারিফ করতে হয়। তাঁরা রোজ রাতে আমাকে প্রুফ পৌঁছে দিতেন এবং পরদিন সকালে নিয়ে যেতেন। কিছু একটা সংশোধন করতে একদিন প্রেসে গিয়েছিলাম। প্রেসটা চিনতাম না। ঠিকানা খুঁজে বের করতে গিয়ে যেতে হলো পতিতালয়ের পাশ ঘেঁষে। বেরিয়ে আসার সময়ে মনে হলো, পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হলে তাঁর মনে যে-প্রশ্ন জাগবে, সেটি হয়তো কখনো তিনি প্রকাশ করবেন না এবং আমার পক্ষেও অযাচিতভাবে ছাপাখানায় গিয়েছিলাম বলাটা সংগত হবে না।

বইটি উৎসর্গ করেছিলাম ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে। তিনি তখন আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সম্পাদনা করছেন বাংলা একাডেমীতে। আমি যখন বই উৎসর্গ করতে তাঁর সম্মতি চাইলাম, তিনি নাসিকা কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করে বললেন, 'না, না, আমাকে কেন, তুমি বরঞ্চ আবদুল হাইকে উৎসর্গ করো।' বললাম, হাই সাহেবের কাছে আমি ঋণী এবং সুযোগ হলে নিশ্চয় তাঁকে বই উৎসর্গ করবো, কিন্তু প্রথম বইটা তাঁরা নামেই উৎসর্গ করতে চাই। তিনি বললেন, 'আমার তো তোমাকে দেওয়ার কিছু নেই।' বললাম, 'আমি আপনার কাছ থেকে অনেক পেয়েছি, হয়তো আরো অনেক শিখতে পাবো। কোনো কিছু পাওয়ার আশায় আমি আপনাকে বই উৎসর্গ করছি না, শ্রদ্ধা জানাতেই করছি।' এবারে প্রসন্নতা ফুটে উঠল তাঁর মুখমণ্ডলে, বললেন, 'তোমায় দোওয়া করি।' বিদেশযাত্রার আগে বইয়ের একটা কপি তাঁকে পৌঁছে দিতে পেরেছিলাম।

বুলবুল ললিতকলা একাডেমী খুব ঘটা করে আমাকে বিদায়-সংবর্ধনা জানিয়েছিল এবং স্মারক হিসেবে দিয়েছিল একটি আংটি—তাতে বাফার লোগোর সঙ্গে ইংরেজিতে বাফা লেখা ছিল। আমি আংটি পরতাম না, তবে দাতারা যখন আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, বিদেশে থাকতে আমি সেটা আঙুলে পরবো এবং বাফার কথা মনে করবো, তখন সেটা ধারণ করেই যাত্রা করেছিলাম। মার্কিন দেশে অনেকে জানতে চেয়েছিলেন, ওটা আমার বিয়ের আংটি কিনা। অবশ্য আমার আগে বাফা থেকে একইরকম সংবর্ধনা ও উপহার দেওয়া হয়েছিল সেলিনা বাহার চৌধুরীকে—গণিতে মাস্টার্স পড়তে তিনি গেলেন যুক্তরাজ্যে, আমার কয়েকদিন আগে।

ইতিবৃত্ত বের হলো, *মুসলিম-মানস* বের হলো। বিনাবেতনে ছুটি পাওয়া গেল। বাংলা একাডেমী থেকে পাওয়া গেল দু হাজার টাকা—সেটা বেবীকে দিলাম। ১৯৬৪ সালের ১০ অক্টোবর করাচি রওনা হলাম—সেখান থেকে লন্ডন-ওয়াশিংটন হয়ে শিকাগো পৌঁছোতে হবে।

করাচিতে যাওয়ার পথে এক্স-রে প্লেট ও রিপোর্ট হাতে নিই নি—বাক্সেই

রেখেছিলাম। লন্ডন থেকে রওনা হওয়ার সময়ে তা হাতে নেবো, এই ঠিক করেছিলাম। প্লেনে বসে টের পেলাম, দুটো ভাবনার স্রোত বইছে মনের মধ্যে : যাদের ফেলে এলাম, তাদের জন্যে উৎকণ্ঠা, আর টুকরো টুকরো কিছু ছবি; অন্যদিকে সামনে কী ঘটতে যাচ্ছে, তার জন্যে উদ্‌বেগ এবং কল্পনায় আগামী দিনের কিছু চিত্র।

করাচিতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল হোটেল মেট্রোপোলে। সেখানে আবিষ্কার করলাম, আমার পাশের ঘরের অতিথি সিভিল সার্ভিসের সাইদুজ্জামান। আমেরিকায় জীবনযাপন সম্পর্কে তিনি কিছু উপদেশ দিলেন। তিনি অভিজ্ঞ মানুষ, তবে তাঁর সব কথা মানতে পারি নি।

ফাউন্ডেশনের অফিস থেকে শিকাগো পৌঁছোবার টিকেট পাওয়া গেল। তারপর কিছু বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ, পরিচিতজনদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ। বন্ধু গিয়াসউদ্দিনকে লন্ডনে এবং সেলিনাকে নিউকাসলে টেলিগ্রাম করে দিলাম লন্ডনে আমার পৌঁছোবার দিনক্ষণ এবং রাত্রিযাপনের ঠিকানা জানিয়ে। করাচিতে দু দিন দু রাত থেকে প্যানামের বিমানে করে লন্ডনযাত্রা। সেই বিমানে আসনগ্রহণ করে প্রথম মনে হলো, স্বজনদের ছেড়ে বহুদূরে পাড়ি দিচ্ছি।



প্রথম প্রবাস

করাচি থেকে যাত্রা করে বৈরুত, ইস্তাম্বুল ও ফ্রাংকফুর্ট হয়ে লন্ডনে পৌছোলাম। প্লেন থেকে যখন নামছি, সহৃদয় বিমানবালা স্মিত হেসে মনে করিয়ে দিলো, 'ইউ আর ফরগেটিং ইওর কোট।' বললাম, 'আই ডোন্ট হ্যাভ ওয়ান।' এবারে তার আঁতকে ওঠার পালা : 'ইউ মাস্ট বি জোকিং!' মধ্য-অক্টোবরে কেউ কোট—আমরা যাকে ওভারকোট বলতে অভ্যস্ত—না নিয়ে লন্ডনে নামবে, একথা বিশ্বাস করা তরুণীর পক্ষে শক্ত। আমার হিসেব ছিল অন্যরকম : বিদেশি ঠাণ্ডা আটকাতে বিদেশের কাপড়ই প্রশস্ত—দেশ থেকে কোট না বানিয়ে লন্ডনেই একটা কিনে নেবো।

হিথরো বিমানবন্দরে প্রত্যাশিতভাবেই গিয়াসউদ্দিন উপস্থিত। স্যুটকেস নিয়ে যখন কাস্টমসের অনুগ্রহের অপেক্ষায় আছি, তখন তাঁকে কাচের দেয়াল দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার ঠিক সামনের যাত্রীর কারণে আমার বেরোতে দেরি হলো। কোচে করে দুজনে এলাম বিমান কোম্পানির সিটি অফিসে। সেখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন আমার মামাতো বোন হালিমার স্বামী রফিকুর রহমান। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এবার ট্যাকসি ক্যাবে হোটেলে যাওয়ার এবং হোটেলে রাত্রিযাপনের স্লিপ পাওয়া গেল। এবারে আমরা তিনজনে ট্যাকসি ক্যাবে করে এলাম অকসফোর্ড স্ট্রিটে সেল্‌ফ্‌রিজেসের দোকানের পেছনে মাউন্ট রয়্যাল হোটেলে। ঘরে জিনিসপত্র রেখে নিকটবর্তী মার্বল আর্চ আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনে গেলাম। সেখান থেকে টিউবে লাইন বদল করে ক্ল্যাপহাম কমনে হালিমাদের বাড়ি যাবো। রাতে খাওয়ার ব্যবস্থা সেখানেই।

রফিক ভাই তখন ব্যারিস্টারি পাশ করে পাকিস্তান হাই কমিশনে এডুকেশন অফিসারের চাকরি নিয়েছেন—ইচ্ছে, উনি পিএইচ ডি করবেন এবং হালিমাও ভবিষ্যতে কিছু পড়াশোনা করবে। ওঁদের বুদ্ধিদীপ্ত বড়ো ছেলে সাদেক স্কুলে যাচ্ছে, আর হালিমা সদ্যোজাত ছোটো ছেলে আশীষকে সামলাচ্ছে। খেয়ে গিয়াস প্লেট ধুলেন। তাঁর দেখাদেখি আমিও নিজেরটা ধুতে গেলাম। হালিমা বাধা দিল—ভাই হিসেবে পক্ষপাত নয়, ক্ষণিকের অতিথির জন্যে অনুকম্পাবশত।

হালিমার বাড়ি থেকে বেরিয়েই শীতে কুঁকড়ে গেলাম একেবারে আক্ষরিক অর্থে। সদা পরোপকারী গিয়াস অমনি নিজের কোট খুলে আমাকে পরতে দিলেন। বললেন, 'লন্ডনের শীত আমার সওয়া আছে; তাছাড়া তুমি আবার কাল জার্নি করবে—ঠাণ্ডা

লাগলে বিপদ।' নিজের শরীর এমন দুমড়ে রেখেছি যে, সৌজন্য করেও বলার উপায় নেই যে, কোটটার দরকার নেই।

গিয়াস আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়েই ফিরে গেলেন। যদিও তিনি খুব দূরে থাকেন না, তবু চলে গেলেন যাতে আমি নিদ্রার অভাবটা পুষিয়ে নিতে পারি: সকালে এসে কাপড়চোপড় কিনতে নিয়ে যাবেন, এ প্রতিশ্রুতি দিতে ভুললেন না। হোটেলে ফিরে জানলাম, আমার অনুপস্থিতিতে সেলিনা ফোন করেছিলেন, তাঁর হোস্টেলের ফোন নম্বর দিয়ে রেখেছেন।

রাতে ভালো ঘুম হলো না। ব্রেকফাস্ট করে ফোন করলাম সেলিনাকে। লাইন কেটে যাওয়ায় দ্বিতীয়বার ফোন করলাম—তারপরও খুব সামান্যই কথা হলো, কুশলবিনিময় মাত্র।

গিয়াস এসে দোকানে নিয়ে গেলেন। প্রথমে কোট কেনা হলো—দশ বা এগারো পাউন্ড দিয়ে—সেটা ব্যবহার করেছি প্রায় উনিশ বছর। একটা স্যুট কিনলাম, গোটা দুই টাই। বাদবাকি যা প্রয়োজন, শিকাগো গিয়ে কিনবো।

হোটেলে ফেরার খানিক পরে ইতিহাস বিভাগের আবদুল মমিন চৌধুরী এলেন দেখা করতে। গিয়াস লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিকসে ইতিহাসে অনার্স করছেন, মমিন প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে পিএইচ ডি করছেন স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে—স্বনামধন্য ইতিহাসবিদ এ এল ব্যাশামের অধীনে। মমিন বললেন, 'আনিসভাই, আপনার ডিউটি-ফ্রি সিগারেটগুলো আমাকে দিয়ে যান—আমি দাম দিয়ে দিচ্ছি, আপনি আবার ডিউটি-ফ্রি থেকে কিনে নেবেন।' হেসে বললাম, 'দাম লাগবে না—আপনি ওগুলো রেখে দিন। আমি যাওয়ার পথে কিনে নেবো।'

গিয়াস আবার হিথরো পর্যন্ত এলেন এবং যতোক্ষণ থাকা যায়, আমার সঙ্গে থাকলেন। এবারে এক্স-রে প্লেট এবং রিপোর্ট হাতে নিয়েছি। আনুষ্ঠানিকতা ছেড়ে বিমানে উঠলাম। প্রথমে যাবো ওয়াশিংটন ডি সি-তে, তারপর শিকাগোতে। আটলান্টিকের মাঝামাঝি এসে হুঁশ হলো, এক্স-রে প্লেট ও রিপোর্ট বিমানবন্দরে ফেলে এসেছি। আতঙ্কিত হয়ে স্টুয়ার্ডেসকে ডেকে বললাম—ক্যাপ্টেনকে দিয়ে কি হিথরোতে খবর দেওয়া যায় ওটা পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে? স্টুয়ার্ডেস বললো, ওয়াশিংটনে পৌঁছে প্যানামের ডেস্কে বললে ওরা হিথরোতে মেসেজ পাঠিয়ে দেবে এবং তোমার যাতে আমেরিকায় প্রবেশে বাধা না হয়, সে-বিষয়েও যতোটা সম্ভব সাহায্য করবে। নিজের ওপরে ভয়ংকর রাগ হলো। এমন ভুল যারা করে, কদিন আগে মাত্র, মনে মনে তাদের বেকুব বলেছি।

মনটা অন্যদিকে নেওয়ার জন্যে খবরের কাগজ খুলে বসলাম। বোধহয় *ওয়াশিংটন পোস্ট*। তাতে বেশ বড়ো করে খবর দিয়েছে, আগের দিনে রাজধানীর কোনো হোটেলের পেছনে সেই হোটেলেরই দুজন অতিথির সবকিছু কারা কেড়ে নিয়েছে। ওয়াশিংটনে থাকার কোনো ব্যবস্থা করে আসিনি। ভেবেছিলাম, এয়ারপোর্টে কাউকে জিজ্ঞেস করে কোনো একটা হোটেলে উঠবো। এখন মনে ভয় ঢুকলো—কোথায় যাবো, কিসের মধ্যে পড়বো!

ওয়াশিংটনে পৌঁছে হেলথ লেখা কাউন্টারে সমুদয় বিবৃত করলাম। ইমিগ্রেশন

বললো, আমাকে কয়েকদিনের প্যারোলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকার অনুমতি দেওয়া হলো। এর মধ্যে ওই এক্স-রে প্লেট ইত্যাদি পেয়ে গেলে ভালো, নয়তো নতুন করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে যথাযথভাবে থাকবার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাকে যে লন্ডনে আবার ফেরত পাঠালো না, তারই জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম।

সেখান থেকেই অগ্রজপ্রতিম শরফুল আলমকে ফোন করলাম—তিনি কাজ করেন ভয়েস অফ আমেরিকার বাংলা বিভাগে। বললাম, 'শরফুল ভাই, একটা সেফ অথচ ইনএক্সপেন্সিভ হোটেলের নাম বলতে পারেন—দুদিন থাকবো।' উনি বললেন, 'তোমার হাতের কাছে কাগজ-কলম আছে? আমি বলছি, তুমি লিখে নাও।' যে-ঠিকানা দিলেন, সেটা মনে হলো বাড়ির—সম্ভবত ওঁরই—হোটেলের নয়। বললাম, 'এটা তো হোটেলের ঠিকানা মনে হচ্ছে না।' উনি বললেন, 'তুমি কোচে যেখানে থামবে, সেখান থেকে ট্যাকসি নিয়ে এই ঠিকানায় চলে আসবে—সেফ অ্যান্ড ইনএক্সপেনসিভ।'

খুব অবসন্ন হয়েছি। স্যুটকেস টানতেও কষ্ট হচ্ছিল। একজন এগিয়ে এলেন : 'মে আই হেলপ ইউ?' কোচের হোল্ড পর্যন্ত সেটা পৌঁছে দিলেন। তাঁকে পোর্টার বলে মনে হলো না। টাকা-পয়সা দিতে চাইলে যদি অপমানিত বোধ করেন! আবার মনে হলো, এ দেশে কি কেউ শুধু শুধু অন্যের বোঝা বয়? কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধন্যবাদ ছাড়া তাঁকে কিছুই দিতে পারলাম না। আজ পর্যন্ত আমার মনে সংশয় রয়ে গেছে, কাজটা ঠিক করেছিলাম কিনা—তাঁকে কিছু দেওয়া উচিত ছিল কিনা।

কোচ থেকে ট্যাকসি এবং সেটা পথ একটু ভুল করে ঘুরেফিরে ঠিকানায় নিয়ে এলো। শরফুল ভাইয়ের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে দেখি, মাসুদা ভাবি—আমাদের বিভাগের সামান্য আগে-পড়া ছাত্রী—এবং ওঁদের সন্তান ছাড়াও অতিথি একজন এরই মধ্যে আছেন : সাঁতারু ব্রজেন দাশ। শরফুল ভাইয়ের দুই কামরার অ্যাপার্টমেন্ট। তাঁর ছেলের বিছানা ব্রজেন দখল করায়, সে শুচ্ছে বাপ-মায়ের সঙ্গে। গোদের ওপর আমি বিষফোঁড়া। আমার বিপন্নতাবোধ হৃদয়ঙ্গম করে শরফুল বললেন, 'কিছু ভেবো না। ছেলের বিছানায় থাকবে তুমি, ব্রজেনকে বিছানা করে দেবো ফ্লোরে।' ব্রজেন তাতেও মহা খুশি। বললেন, 'আসেন দাদা, একপাত্র হয়ে যাক।' আমি সত্যিই বললাম, 'আমি তো অ্যালকোহলিক কিছু খাই না।' ব্রজেন বললেন, 'সবকিছুর একটা আরম্ভ আছে।' তিনি একটা বিয়ারের ক্যান খুললেন। আমি যতোটা বিয়ার নিলাম, হুইস্কির মাপে তা এক পেগ হবে। তারপরও খুব সতর্কভাবে খেতে থাকলাম—মাতাল হয়ে যাচ্ছি কিনা বোঝার জন্যে ইন্দ্রিয় সচেতন করে রাখলাম। মাতাল হইনি, অতটুকু খেলে বাচ্চা ছেলেও মাতাল হয় না।

পরদিন সকালে নট-বাঁধা টাইয়ের টিপ-বোতাম আঁটকাতে আঁটকাতে (ওরকম টাই আমি সেই প্রথম দেখলাম—ওটা ব্যবহার করলে নট বাঁধার সময়টুকু বেঁচে যায়) শরফুল জানালেন, তাঁরা স্বামী-স্ত্রী বেরিয়ে পড়ছেন অফিসের উদ্দেশে, ছেলে যাচ্ছে স্কুলে, ব্রজেন দাশও কাজে যাবেন। আমি আরেকটু ঘুমিয়ে নিয়ে যখন উঠি, তখন যেন ব্রেকফাস্ট বানিয়ে নিই। বিনে রুটি আছে, বাকি সব আছে ফ্রিজে। এই কথা শোনার পরেও আমার ঘুমের ব্যাঘাত হলো না। ঘুম থেকে উঠে মুখহাত ধুয়ে রান্নাঘরে গেলাম। গ্যাসের চুলো জ্বালাতে গিয়ে ভয় পেলাম—পাছে অগ্নিকাণ্ড বাধিয়ে ফেলি কিংবা ঘর

ভরে যায় গ্যাসে। মগ ভর্তি করে ট্যাপের গরম পানি নিয়ে তার মধ্যে ডিম ছেড়ে দিলাম, কাঁচা রুটিতে মাখন-জেলি লাগালাম, ডিম যেভাবে সেদ্ধ করলাম সেই প্রণালিতে চা বানোনো হলো। জীবনে প্রথম স্বহস্তরচিত ব্রেকফাস্ট যে শেষ অবধি খেতে পেরেছিলাম, তাতে আমার নৈপুণ্যের না হলেও সহ্যক্ষমতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল।

আমি যাদের বৃত্তিভোগী, তাদের আনুষ্ঠানিক নাম কনফারেনস বোর্ড অফ আমেরিকান রিসার্চ কাউনসিলস। ওয়াশিংটনে আসার মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁদের সঙ্গে দেখা করা আর তাঁদের পরামর্শ নেওয়া। আমি যাঁর দায়িত্বে, তিনি একজন মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা, অতি সহৃদয়। আমার এক্স-রে প্লেটের বৃত্তান্ত শুনে একেবারেই ভ্রূকুঞ্চিত করলেন না—যেন অমন হওয়াটাই স্বাভাবিক। তারপরে বুদ্ধিপরামর্শ যা দেওয়ার দিলেন, তার চেয়ে যা প্রয়োজনীয়, ডলারও দিলেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দিলেন। পাকিস্তানি দূতাবাসে যাওয়া গেল। জি আহমদ (খ্যাতনামা আমলা আজিজ আহমদের ভ্রাতা) তখন রাষ্ট্রদূত। শিক্ষাবিষয়ক কাউনসিলর অধ্যাপক মুহম্মদ শামসউল হক প্রচুর সুনাম অর্জন করে দেশে ফিরেছেন এবং সদ্য তাঁর জায়গায় এসেছেন ড. সুরত আলী খান। তাঁর সঙ্গে দেখা করে ফিরলাম।

এবারে ওয়াশিংটনের দ্রষ্টব্য দেখার পালা। অনেক কিছু ছিল অভিভূত হওয়ার মতো। লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসে গিয়েছিলাম আমার কাজে আসতে পারে এমনসব বইপত্রের তালিকা করতে—তার বিশালতা আর শৃঙ্খলা মুগ্ধ করেছিল। বিস্মিত হয়েছিলাম একাধিক মানুষকে ভিক্ষে করতে দেখে। একটি ছোটো ঘটনা মনে বেশ দাগ কেটেছিল। দিনের শেষে শরফুলদের বাড়ি ফিরছি—বাস-কনডাক্টরকে পইপই করে বলে দিলাম একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আমাকে নামিয়ে দিতে। এটা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না, তবে এই নগরে নবাগত বলে পরিচয় দেওয়ায় সে আমার কথায় রাজি হয়ে গেল। আমি দু-একবার খোঁজ নিলাম। সে আমাকে আশ্বস্ত করলো। তারপর গন্তব্য ছাড়িয়ে যখন অনেকদূর চলে এসেছি, তখন তার খেয়াল হলো। আমার কাছে এসে সে ব্যরবার দুঃখপ্রকাশ করতে থাকলো এবং বললো, বাসের প্রান্তিক গন্তব্যে পৌঁছে সে আমায় ফিরতি বাসে তুলে দেবে। এতে আমার কিছু সময় যে নষ্ট হবে, সেজন্যে সে ক্ষমাপ্রার্থী। বাস স্টেশনে পৌঁছে ফিরতি বাসের কনডাক্টরকে সে বললো, ভুল করে আমাকে অতদূর টেনে নিয়ে এসেছে, এখন যেন সে আমাকে যথাস্থানে নামিয়ে দেয় এবং টিকিটের পয়সা না নেয়।

শরফুল-পরিবার এবং ব্রজেন দাশের সঙ্গে বেশ বেড়ানো গেল। বেড়াতে বেড়াতে এক সন্ধ্যায় দেখি, মস্ত এক ভবনের ওপরে বৈদ্যুতিক আলো দিয়ে যেখানে সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আর তাৎক্ষণিক সময় ও তাপমাত্রা জানানোর ব্যবস্থা, সেখানে খবর দিচ্ছে, সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্রুশ্চভ অপসারিত হয়েছেন এবং ব্রেজনেভ ও কসিজিন যুগ্মভাবে রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বগ্রহণ করেছেন। আমি বেশ উদ্‌বিগ্ন হলাম। অথচ সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের লোক হয়েও শরফুল আলম নির্বিকার। তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'যা হবার তা হবে, তুমি-আমি মাথা ঘামিয়ে কিছু করতে পারবো না। বরঞ্চ লেটস এনজয় দি মোমেন্ট।' তারপরও আমি সহজ হতে পারলাম না। ক্রুশ্চভের প্রতি আমার

যে খুব সহানুভূতি ছিল তা নয়। তাঁর স্তালিনবিরোধী নীতি বিশ্বে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং চীনের সঙ্গে বিরোধ সে-আন্দোলনকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে; জাতিসংঘে তাঁর জুতো চাপড়ানো এবং রেঙ্গুনে সাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারও আমাকে পীড়িত করেছিল। তবে দুবছর আগে কিউবা থেকে ক্ষেপণাস্ত্র সরিয়ে—আপাতদৃষ্টিতে পিছু হটলেও—একটা প্রলয়ংকরী যুদ্ধ এড়ানোয় আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলাম। এই ঠাণ্ডাযুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বিশ্বকে কীভাবে প্রভাবান্বিত করবে, সে-সম্পর্কে দুশ্চিন্তা থেকে সহজে মুক্ত হতে পারলাম না।

ওয়াশিংটন ডি সি থেকে আমেরিকান এয়ারলাইনসের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে শিকাগো এসে পৌছোলাম ১৬ অক্টোবর পড়ন্ত বিকেলে। আমাকে কেউ নিতে এসেছে বলে মনে হলো না। একটু দমে গেলাম। কোথায় থাকবো তার ব্যবস্থা করে আসিনি, এখন কী করি! অদূরে একটা বোর্ড থেকে দেখলাম নানাজন ব্যক্তিগত বার্তা সংগ্রহ করছে। সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখি আমার নামেও একটা বার্তা আছে। ডিমক লিখেছেন : ইন্টারন্যাশনাল হাউজে ১৭ তারিখ পর্যন্ত জায়গা নেই—ওয়াই এম সি এ-তে চেষ্টা করে দেখো। ইন্টারন্যাশনাল হাউজ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে—সেখানে অন্তত আমার দুই বন্ধু থাকেন—মোজাফফর আহমদ ও রওশন জাহান (তখনো এঁরা জুটি হননি)। দেশ থেকেই সেখানে জায়গা পাওয়ার জন্যে আবেদন জানিয়েছিলাম, কিন্তু আমার যাত্রাসংক্রান্ত জটিলতার কারণে আবেদন করতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাই ডিমককে লিখেছিলাম—'প্রভাবশালী শিক্ষক হিসেবে' কথাটা উহ্য রেখে—উনি আমার জন্যে কিছু করতে পারেন কিনা। এখন এই সংবাদ পাওয়া গেল, কিন্তু ওয়াই এম সি এ যে কোথায়, তা জানাননি। বিমানবন্দরের তথ্য কেন্দ্রে খোঁজ করায় কর্তব্যরত তরুণী প্রশ্ন করল : আমি ওয়াই এম সি এ হোস্টেল চাই না হোটেল? যখন বললাম, তাও জানি না, তখন সে হেসে দিল। একটা কাগজে ওয়াই এম সি এ হোটেলের ঠিকানা লিখে দিয়ে, তার সবচেয়ে কাছে কোন বাস যায় এবং কোথায় তাতে উঠতে হয়, তা জানিয়ে দিলো। গন্তব্যের বাসস্টপ থেকে কিছুটা হেঁটে সেখানে পৌছোনো গেল এবং কুড়িতলা হোটেলের তেরো তলায় দু-রাতের জন্যে ঘর পাওয়া গেল। কেমন ঘর চাই জানতে চাওয়ায় না বুঝেই বলেছিলাম, অ্যাটাচড বাথওয়ালা—তাতে ঘরভাড়া হলো দ্বিগুণ। ঘর থেকে মোজাফফরকে ফোন করে ইন্টারন্যাশনাল হাউজে পাওয়া গেল না। বার্তা রাখলাম একটা—নিজের নাম বানান করতে গিয়ে অভ্যাসমতো বলি 'ডবল জেড'—অপারেটর বলে, 'ইউ মীন জি জি'। ধন্দে পড়লাম। তারপর মনে পড়লো, এখন তো আমেরিকায় আছি।

স্নানাহার সেরে বেবীকে চিঠি লিখতে বসলাম। দেখছি, তাতে নিজের অবস্থার একটা বর্ণনা দিয়েছিলাম এভাবে :

> বিদেশ বিভূঁই—পথঘাট চিনি না। স্যুটকেস বইতে বইতে হাত ব্যথা হয়ে যায়। তার উপর গায়ে একটা সোয়েটার, পুলওভার, স্যুট, ওভারকোট। কাঁধে PIA ব্যাগ, হাতে PANAM। কোটের এক পকেটে রুমাল, লাইটার, সিগারেট; অন্যপকেটে মনিব্যাগ। ভেতরের পকেটে পাসপোর্ট, টিকেট,

ট্র্যাভেলার্স চেক, ওপরের পকেটে Address book। প্যান্টের পকেটেও কিছু না কিছু আছে।... ভেবেছিলাম, আজ রাত থেকে সুস্থির হতে পারব। তা আর হল না। মুসাফিরের মতো এই চলা আর ভাল লাগে না। স্যুটকেস খোলো, আর গুছাও, এই কাজ। মাথায় দশরকম চিন্তা চেপে রয়েছে। তোমাকে যে ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখতে বলব, তাও হল না।

ফোন করে পরের দিন মোজাফফর এলেন। জানালেন, ডিমক কদিনের জন্যে শিকাগোর বাইরে গেছেন। তবে ইন্টারন্যাশনাল হাউজে অস্থায়ীভাবে একটা জায়গা পাওয়া গেছে। সেটা শহর থেকে একটু দূরে—বস্তুত ক্যাম্পাসটাই শহরের বাইরে, ইলেকট্রিক ট্রেনে যেতে মিনিট পনেরো লাগে। ফজলে হোসেন নামে এক ইনজিনিয়ার মোজাফফরের বন্ধু—শিকাগোয় চাকরি করেন। মোজাফফর তাঁকে অনুরোধ করে আনিয়ে সেদিনই আমাকে ইন্টারন্যাশনাল হাউজে তুললেন। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে আবার শহরে ফিরিয়ে আনলেন—এবারে রওশনও আমাদের সঙ্গে। আমার কিছু কাপড়চোপড় কেনা হলো, বই একটা কিনলাম—নেহরুর আত্মজীবনী। তারপর চারজনে মিলে সিনেমা দেখে, বাইরে খেয়ে, হাউজে ফিরে আসা। রকফেলারদের তৈরি ইন্টারন্যাশনাল হাউজ যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি ক্যাম্পাসে আছে—সবগুলো প্রায় একইরকম দেখতে। আমাদের হাউজটা আটতলা—বাড়ির মুখোমুখি দাঁড়ালে বাঁদিকের অংশে মেয়েদের এবং ডানদিকের অংশে ছেলেদের থাকার জায়গা। সপ্তাহান্তে ছেলেরা বা মেয়েরা খাতায় সই করে পরস্পরের ঘরে যেতে পারে। আমার অবশ্য দুশ্চিন্তা সেটা নিয়ে নয়।

মোজাফফর পরদিনও আমাকে প্রচুর সময় দিলেন। বাসস্থান খুঁজতে এবং ডিমকের সঙ্গে দেখা করাতে। সেখানে গিয়ে শুনলাম আমার ওয়াশিংটন ছাড়ার আধঘন্টা পরে হারানো এক্স-রে প্লেট ইত্যাদি সেখানে এসে পৌঁছেছে। প্যানাম এরই মধ্যে তা শিকাগোতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সেরে ক্যাম্পাস দেখতে বের হলাম। শুধু আমার নিত্যপ্রয়োজনীয় জায়গাগুলোই চিহ্নিত করা গেল। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার জীবন শুরু হলো।

২.

প্রফেসর ববরিন্‌স্‌কয় সংস্কৃতের নামজাদা পণ্ডিত, তার ওপর তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনের পদ অলংকৃত করে আছেন। যেমন নামডাক, তেমনি দশাসই চেহারা—সামনে বসতে একটু ভয়ই লাগে। কিছু সৌজন্যমূলক কথাবার্তার পর তাঁর অফিস থেকে আমার পরিচয়পত্র পাওয়া গেল—বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি হিসেবে। কয়েক দিন পরে ফস্টার হলের তেতলায় বসার ঘরও পাওয়া গেল। ঘরটা দুজনের বসার জন্যে আগে থেকেই সেখানে বসতেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত ড. পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী।

ফরেন স্টুডেন্টস অ্যাডভাইজার জ্যাক কেরিজ বললেন, 'দেখো, আমরা আছি ইস্ট

ফিফটি-নাইনথ স্ট্রিটে; তুমি উলটোদিকে ফিফটি-এইটথ থেকে যতদূর যেতে চাও, যেতে পারো। কিন্তু এদিকে ইস্ট সিক্সটিয়েথ স্ট্রিট পার হবে না। পার হলে কালো ছেলেদের হাতে নির্ঘাত মার খাওয়ার আশঙ্কা। আমাদের এল [এলিভেটেড ট্রেন—শহরে মাটির নিচে, শহর ছাড়লেই মাটির অনেক ওপর দিয়ে চলে] স্টেশনটাও খুব যে নিরাপদ, তা নয়, তবে সেখানে দুর্ঘটনা হয় বেশি রাতে। সুতরাং সাবধানে চলাফেরা কোরো। গত বছর দুটি রুশ ছাত্র ইস্ট সিক্সটিফার্স্টের ওখানে আক্রান্ত হয়েছিল—শেষে তারা যখন চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, মস্কোতে সবাইকে জানিয়ে দেবো, আমেরিকা কেমন খারাপ জায়গা, তখন আক্রমণকারীরা তাদের ছেড়ে দিলো, জিনিসপত্রও ফেরত দিলো। বুঝলে না, গুন্ডা-বদমাশেরও দেশপ্রেম থাকে। তোমার যদি এমন অবস্থা কখনো হয়—আশা করি, হবে না—তবে ওই রুশ যুবকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারো।' স্মিত হেসে প্রসঙ্গটা ওখানে শেষ করলেন। তারপর বললেন, 'তোমার যেন কী সমস্যা? ও, এক্স-রে প্লেট হারানো! ওটা নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না। ওটা এসে পড়বে, নাহলে একটার জায়গায় আরেকটা হবে। একবার যখন ঢুকে পড়েছো এ দেশে, তখন কে তোমাকে জোর করে তাড়ায়? ইউনিভার্সিটির একটা মান-সম্মান আছে না! কিন্তু তোমার আসল সমস্যা দেখছি থাকবার ব্যবস্থা পাকাপাকি না হওয়া। তুমি এক কাজ করো।' এই বলে এক মহিলার নাম ও অফিসকক্ষের নম্বর লিখে দিলেন। 'আমার এখান থেকে বেরিয়েই এই মহিলার সঙ্গে দেখা করো। একটু করুণ মুখ করে অনুরোধ কোরো—হয়ে যাবে। তোমার আর কোনো সাহায্যের প্রয়োজন থাকলে এখন বলতে পারো।'

আর কোনো প্রয়োজন নেই বলে ধন্যবাদ দিয়ে বেরোলাম। ওঁর মতো সেই মহিলার অফিসও ইন্টারন্যাশনাল হাউজে—তিনিই ঘর দেওয়ার মালিক। দেখা পেতে বিলম্ব হলো না—মনে হলো, ভদ্রলোক আমার বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আগেই কথা বলে রেখেছেন। তিনি বললেন, 'তোমাকে তো আটতলায় থাকতে দেওয়া হয়েছে। ওই ঘরে যে থাকতো, সে ফিরে এলে তোমাকে সাততলায় একটা ঘর দিয়ে দেবো।' তারপর দু-এক মুহূর্ত ভেবে বললেন, 'তার চেয়ে তুমি যেখানে আছো, সেখানেই থাকো। ওই ছেলে এলে তাকেই সাততলায় পাঠিয়ে দেবো। কেমন?'

আমি তো আনন্দে আত্মহারা। ধন্যবাদ দিই, তবু মনে হয়, যথেষ্ট ধন্যবাদ দেওয়া হলো না।

ইন্টারন্যাশনাল হাউজে বাথরুম ও টয়লেটের বিষয়ে এরা বেশ সমবায়ী। সারি সারি টয়লেট—অর্ধেক দরজা, ওপরে-নিচে খোলা। বেসিনগুলোর একটা সারি। বাথ অর্থাৎ শাওয়ারের ব্যবস্থাও অনুরূপ সারিবদ্ধ। পর্দা আছে, তবে তা আব্রু রক্ষার জন্যে ততটা নয়, যতটা পানি যাতে ছিটকে না পড়ে, তার জন্যে। সকালে দাঁত মাজছি কী দাড়ি কামাচ্ছি, পর্দা সরিয়ে শাওয়ার থেকে কেউ বেরিয়ে এলো—গায়ে একটা সুতো নেই—চুল মুছতে মুছতে কটা বাজে জানতে চাইলো কিংবা অনুরূপ জরুরি বিষয়ে আলাপ করতে শুরু করলো। তবে একেক তলা পরপর একদিকে একটা টয়লেট ও একটা শাওয়ার আছে। কেউ যদি আব্রু সম্পর্কে অত সচেতন হয় কিংবা মানবসংসর্গ সম্পর্কে বিরূপ হয়, তাহলে সেটা ব্যবহার করতে পারে। আটতলায় অমন ব্যবস্থা

আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছিল। কখনো সেটা অন্যে দখল করলে নিচের তলা পেরিয়ে অনুরূপ একান্ত স্নানঘরে চলে যেতাম।

এডওয়র্ড ফয় নামে কৌতুকপ্রবণ এক মার্কিন যুবক সবসময়ে খোঁচা দিয়ে কথা বলতো। একদিন বললো, 'দেখো, একটা টয়লেটের দরজা বন্ধ, অথচ মেঝেতে পা-জোড়া অদৃশ্য। এই অবস্থায় যা করণীয়, তাই করলাম। দরজার ওপর দিয়ে হাত চালিয়ে খুলে ফেললাম। দেখি, এক মূর্তিমান ফিলিপিনো কমোডের ওপরে দুই পা তুলে বসে আছে। আমি আর দরজা লাগাবার কষ্ট স্বীকার না করে ফিরে এলাম। তোমরা যে সব কী!' সে অল্পসময়ের জন্যে ঢাকা ঘুরে গেছিল। বললো, 'কী যে তোমাদের দেশ! গুলিস্তানের সামনে দেখি ন্যাংটা হয়ে একটা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে—পরে শুনলাম, পাগল। পাগল তো তাকে রাস্তায় আসতে দিয়েছে কেন? তার তো পাগলা গারদে থাকার কথা!' বললাম, 'এড, তোমাদের সঙ্গে আমাদের তফাত ওইখানে। পাগল না হলে আমাদের দেশে কেউ বিবস্ত্র হয়ে চলে না, তোমাদের দেশে বিবস্ত্র হয়ে চলতে পাগল হতে হয় না।'

এডের একটা বাঁধা কায়দা ছিল। কোনো ভারতীয়ের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছি বা কথা বলছি দেখলে সে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করত, 'তোমরা মারামারি করছো না কেন? অন্তত কাশ্মির নিয়ে?' আমি বলতাম, 'তার জন্যে একজন মার্কিন মধ্যস্থতাকারী দরকার—যে গোলমালটা লাগিয়ে দেবে আবার খানিক পরে মিটিয়ে দেবে। তুমি না থাকলে আমরা নিজের থেকে ঝগড়া করবো কেমন করে!'

তবে কবুল করতে হবে, ইন্টারন্যাশনাল হাউজে আমি যখন যাই, তখন পাকিস্তানি ও ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে সম্পর্কটা সহজ ছিল না। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিলাম আমরা চারজন : মোজাফফর, রওশন, এ বি এম শফিউল্লাহ্ আর আমি। শফিউল্লাহ্ এসেছিল খুব সাধারণ ঘর থেকে—নিজের মেধার জোরে সে পরীক্ষায় বরাবর ভালো ফল করতো। বি এ (পাস) পরীক্ষায় প্রথম হয়ে সে ইন্টারউইং স্কলারশিপ নিয়ে লাহোরে পড়তে যায়। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান করে, তারপর বৃত্তি নিয়ে আসে শিকাগোতে। তার পড়াশোনায় যিনি সর্বাধিক সাহায্য করেছিলেন—তার স্কুলের হেডমাস্টার—তাঁরই মেয়েকে সে বিয়ে করে এবং একটি মেয়ে ও একটি ছেলে স্ত্রীর কাছে রেখে চলে আসে এদেশে। পশ্চিম পাকিস্তানি এক ডাক্তার ছিলেন—জাফর। আর কেউ ছিল কিনা মনে পড়ে না। ভারতীয়দের মধ্যে তিনজন ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের—অন্নদাশঙ্কর রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র আনন্দরূপ রায়, জীবমিত্র গাঙ্গুলি (তাকে আমরা জীবন্মৃত বলে ডাকতাম) আর পৃথ্বীশ চক্রবর্তী—খুব ভালো রবীন্দ্রসংগীত গাইতো। রমেশ নামে ওড়িশার একটি ছাত্র ছিল—সে আমাকে ডাকতো অনীশদা বলে। দক্ষিণের দুজন ছিল : দিবাকরণ আর রামচন্দ্রন। কৌশলিয়া নামে একটি তামিল মেয়েও ছিল। আরো দু-চারজন নিশ্চয় ছিল। পাকিস্তানি ও ভারতীয়দের মধ্যে সত্যি একটা দূরত্ব ছিল—সেটা ঘোচাতে আমি হয়তো একটা ভূমিকা পালন করেছিলাম।

এদিকে শিকাগোতে ছিল বেশ বড়োসড়ো পাকিস্তান অ্যাসোসিয়েশন—ইন্টারন্যাশনাল হাউজই ছিল তার কেন্দ্র। আমি যখন গেলাম, তখন তার সভাপতি

মোজাফফর—যদিও তাঁর মেয়াদ শেষ হয়ে আসছিল। ওখানে একটা অলিখিত বিধি ছিল—সভাপতি একবার হবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে, একবার পূর্ব পাকিস্তান থেকে। মোজাফফরের আগে সভাপতি ছিলেন আল্লামা সোলায়মান নাদভীর পুত্র সালমান নাদভী। মোজাফফরের পরে আবার পশ্চিম পাকিস্তানি কেউ হবে। কিন্তু তিনি এমনই জনমত গড়ে তুললেন যে, সর্বসম্মতিক্রমে আমি হলাম সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক হলো শফিউল্লাহ্। কারো চাকরি আছে, কারো পরীক্ষা। অন্যদের মতে, আমার পড়াশোনাটা শখের—তাই দায়িত্বটা আমারই নেওয়া উচিত।

আমরা চার বাঙাল প্রায় একসঙ্গেই চলাফেরা করতাম। অনতিকাল পরে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন নূরুল ইসলাম—বরিশালের সন্তান, চাকরি করতেন করাচিতে—পাকিস্তান ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশনে, শিকাগোয় এসেছেন প্রশিক্ষণ নিতে—খুব মজা করে কথা বলতেন। মোজাফফরের পরিচিত দুই মার্কিন যুবক ছিল টম প্র্যাপাস আর জো বার্নস। তারাও বেশিরভাগ সময়ে আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিতো। সপ্তাহান্তে এই ছয়-সাতজন মাঝে মাঝে খেতে যেতাম বাইরে। হাউজেও আমরা প্রায় একসঙ্গে খেতাম—কখনো-সখনো ভারতীয়দের কেউ যোগ দিতো। মোজাফফর অর্থনীতি এবং রওশন ইংরেজি পড়লেও ওঁরা দুজনই ছিলেন বাংলা পাঠদান-কর্মসূচির সহকারী, সুতরাং ফস্টার হলে ওঁদেরও অফিস ছিল। আমরা একসঙ্গেই যাওয়া-আসা করতাম—বিশেষ করে মোজাফফর ও আমি। রোজা রেখেও মোজাফফর আমার ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে থাকতেন—আমার খাওয়া শেষ হলে একসঙ্গে যাবো বলে।

৩.

ডাকবাক্সে ছোটো একটা নোট পেলাম—আমার নামে প্যাকেট আছে, যেন ভেতর থেকে নিয়ে যাই। গিয়ে দেখি, আমার নিরুদ্দিষ্ট এক্স-রে প্লেট এবং মেডিক্যাল রিপোর্ট। পরদিনই সেসব নিয়ে গেলাম পাবলিক হেলথ অফিসে। অনেকক্ষণ পরে ডাক পড়লেও খুব বীরদর্পে কক্ষে প্রবেশ করলাম এবং প্যাকেটগুলো সমর্পণ করলাম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার হাতে। তিনি খুললেন প্যাকেট—দেখা গেল এক্স-রে প্লেট লম্বালম্বি দুভাগ হয়ে আছে। সম্ভবত ওয়াশিংটন পর্যন্ত ওটা ঠিক এসেছিল, সেখান থেকে ডাকে পাঠাতে গিয়ে বড় খাম ভাঁজ করতে হয়েছে এবং তাতেই দফা রফা হয়েছে। প্লেটের ওই অবস্থায় রেডিওলজিস্টের রিপোর্টও গ্রাহ্য হবে না। 'আই অ্যাম অ্যাফ্রেড, ইউ শ্যাল হ্যাভ টু গো থ্রু ইট এগেন'—বললেন ভদ্রলোক এবং একটা ফরমে আমার নাম লিখে জায়গামতো টিক করে দিলেন। সেটা হাতে দিয়ে বললেন কোথায় যেতে হবে। গেলাম। রেডিওলজি বিভাগে মানুষগুলোও যন্ত্রবৎ। যথাসময়ে আবার এক্স-রে হলো। তাঁরা জানিয়ে দিলেন কবে আসতে হবে।

পাবলিক হেলথ অফিস থেকে বেরিয়ে আবর্জনা ফেলার নিকটতম জায়গায় ভগ্নহৃদয়ে ভগ্ন এক্স-রে প্লেট ফেলে দিলাম।

দিন দুই পরে আমার ডাকবাক্সে আবার চিরকুট—প্যাকেট আছে, ভেতর থেকে নিয়ে যাও। আবার কী প্যাকেট—আমি বিস্ময় মানি। গিয়ে দেখি, সেই ফেলে-দেওয়া এক্স-রে প্লেট আবার আমার ঠিকানায় চলে এসেছে। ঘরে গিয়ে ভাবতে থাকলাম, কী করে এমন হতে পারলো! পরে মনে পড়লো, আবর্জনা ফেলার বড়ো বাক্সের পাশে একটা ডাকবাক্স তো ছিল। গারবেজ কালেক্টর সম্ভবত ভেবেছে যে, কোনো অকাটমূর্খ ডাকবাক্সে ফেলতে গিয়ে প্যাকেটটা ভুলে আবর্জনা-স্তূপে ফেলেছে। অভিশপ্ত প্লেট ও খামটাকে এবারে কাঁচি দিয়ে ছোটো ছোটো টুকরো করে কাটলাম অনেকক্ষণ ধরে। তারপর হাউজের গারবেজ বিনে কয়েকবারে গিয়ে তা ফেললাম—যেন একসঙ্গে পেয়ে কেউ জোড়া দিয়ে আমাকে ফেরত পাঠাতে না পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমার থাকার অনুমতি প্রলম্বিত হলেও ঝুলে থাকে। আবার নির্দিষ্ট দিনে পাবলিক হেলথ অফিস থেকে কাগজপত্র সংগ্রহ করে যাই ইমিগ্রেশন অফিসে—এবারে হাতে শুধু রিপোর্ট, এক্স-রে প্লেটের ঝামেলা নেই। ইমিগ্রেশন অফিস বেশ সময় নেয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে পূর্ণ মেয়াদে অবস্থানের অনুমতি দেয়। অফিস থেকে বেরিয়ে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হলো—হয়েছে, হয়েছে, এতদিনে প্রায়শ্চিত্তের কাল পূর্ণ হয়েছে—আমি আর অনুগ্রহভিখারী নই।

এখন পড়াশোনায় মন দেওয়া দরকার—কিন্তু দেবো কী করে! প্রথমত, মনই বসতে চায় না। দ্বিতীয়ত, সবাই বলে, 'তোমার কী! তোমাকে তো আর পরীক্ষা দিতে হবে না। পড়াশোনা করলেই বা কী, না করলেই বা কী!' এমন কী অধ্যাপকদেরও সেই কথা : 'দেখো, আমার ক্লাসে পরীক্ষার্থীদের (যারা ক্রেডিট নেবে) এত ভিড় যে, শখের পড়ুয়াদের (অডিট করবে যারা) জায়গা দিতে পারবো না।' ববরিন্‌স্‌কয় রাজি হলেন সংস্কৃত প্রাথমিক পাঠে আমাকে নিতে। কিন্তু একে দেরিতে পৌছেছি, তারপর গুছিয়ে উঠতে সময় নিয়েছি—ক্লাসে পড়া অনেকদূর এগিয়ে গেছে। তিনি ক্লাস নিতেন খুব সকালে। ক্রমে শীত পড়তে এবং বরফ জমতে থাকলো। এসব উপেক্ষা করে তাঁর ক্লাসের পেছনে এসে বসি। তিনি একেকটা কার্ডে একেকজন ছাত্র বা ছাত্রীর নাম লিখে রাখতেন—হঠাৎ তার একটা বের করে সেই নাম ডেকে পড়া জিজ্ঞেস করতেন, আর নিজের চোখদুটো সামান্য খুলে রেখে তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। একে শীতের যন্ত্রণা, তার ওপর মান-হারানোর ভয়—ববরিন্‌স্‌কয়ের ক্লাসে যাওয়া ছেড়ে দিলাম।

নিজের মতো পড়তে থাকলাম, আর নিয়মিত উপস্থিত থাকতে লাগলাম ডিমকের সেমিনারে। ডিমকের অফিস ফস্টার হলেই, আমার ঘর থেকে এক সিঁড়ি নামলেই। বিকেলের দিকে আরেক সিঁড়ি ভাঙলে লাউনজে বিনে পয়সায় চা-কফি বা কুকিস (দোকানে ভুলে বিস্কুট চাওয়ায় কুকুরের খাদ্য এগিয়ে দিয়েছিল একবার) খাওয়া যেতো। ডিমকের সেমিনারে আমার পাশে এসে বসতো ওয়েন কিলপ্যাট্রিক—সে *ধর্মমঙ্গল* নিয়ে কাজ করছিল। পাশে বসে সে নিয়মিত আমার প্যাকেট থেকে সিগারেট খেতো। একদিন দুই কন্যা—স্যারা আর মেরি লিন—সেমিনারের পরে আমাকে বললো, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে।' তারপর নিজেদের জিনিসপত্র সংগ্রহ করে এসে বলে, 'তুমি সবসময়ে ওয়েন কিলপ্যাট্রিককে তোমার সিগারেট খেতে দাও

কেন?' এর আর কী উত্তর দেবো? বলি, 'আমার কাছে সিগারেট থাকে. ওর থাকে না, তাই।' তারা জোর দিয়ে বলে, 'আমরা লক্ষ করেছি, ও তোমার পাশে বসে সবসময়ে—শুধু সিগারেট নেওয়ার জন্যে। ওর পক্ষে এটা অসংগত, তোমারও উচিত নয় ওকে এভাবে নষ্ট করা।'

ওয়েন একটু অদ্ভুত স্বভাবের ছিল, তা স্বীকার করতে হবে। ওর কাজে সে আমার সাহায্য নিতো, কিন্তু তৃতীয় কেউ এসে উপস্থিত হলে সে এমন ভাব করতো যে, আমি ঠিক বলছি না অথবা আমার কথা সে ঠিক বুঝছে না। সে বলতো মাঝে মাঝে, 'সাইক্রিয়াট্রিস্টের সঙ্গে আজ আমার অ্যাপয়ন্টমেন্ট আছে।' আমি বুঝতাম না, এটা অন্যকে জানানোর কী দরকার। পরে জেনেছিলাম, সে-সময়টায় সাইক্রিয়াট্রিস্টের কাছে যাওয়াটাই ছিল মর্যাদার লক্ষণ—একটু গৌরবের বিষয়। তাকে নিয়ে আরেকটা ঘটনা ঘটেছিল। একদিন চা খেয়ে নিচ থেকে দোতলায় কথা বলতে বলতে আসছি ডিমক আর আমি। তাঁর অফিসে এসে পৌঁছোলে সেক্রেটারি জুডিথ অ্যারনসন একেবারে সংহারমূর্তি ধারণ করে ডিমককে বলতে থাকলো, 'তোমার আশকারায় অফিসের নিয়মশৃঙ্খলা সকলে নষ্ট করতে বসেছে।' অনুত্তেজিত ডিমক তরুণীর কাছে জানতে চাইলেন, কী হয়েছে। সে জানালো, আমরা যখন চা খেতে গেছি, তখন ওয়েন কাউকে না বলে অফিস থেকে ফোন করছিল—খুব সম্ভব দূরপাল্লায়। জুডিথ বলে ডিমককে, 'তুমি যদি ওকে বারণ না করতে পারো, আমি কিন্তু ছেড়ে দেবো না।'

ক্যাম্পাসে নানা অনুষ্ঠান ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হতো এত ঘন ঘন যে, তাও আমাদের অনেক সময় নিয়ে নিতো। আমি শিকাগো পৌঁছোবার পরপরই রবিশঙ্কর এসেছিলেন এক সন্ধ্যায়। সে-বাদন শোনা জীবনের এক মহৎ অভিজ্ঞতা। ক্যাম্পাসে ও ক্যাম্পাসের বাইরে সিনেমা দেখেছি প্রচুর-—নানা দেশের, নানা সময়ের। বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বাইরের নাটকের দল ক্যাম্পাসের মিলনায়তনে নাটক করতো কত রকম। এক রাতে হয়তো হলো সফোক্লিসের *ইডিপাস রেক্স*, পরের রাতে জাঁ জিরাদুর *ইলেকট্রা*। এই আকর্ষণ উপেক্ষা করার মতো নয়।

এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক এডওয়র্ড শিল্‌স তাঁর বন্ধু—কয়েক বছর আগে লোকান্তরিত—সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ইংরেজি লেখার একটা সংকলন প্রকাশের উদ্‌যোগ নেন। পরে তিনি দেখতে পান, সুধীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনা যা আছে, তা দিয়ে বই করা যায় না। তখন তিনি ডিমককে অনুরোধ করেন, বাংলা থেকে সুধীন্দ্রনাথের গোটা কয়েক প্রবন্ধ ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিতে। ডিমক বলেন, সুধীন্দ্রনাথের লেখা তাঁর খুব দুরূহ মনে হয়, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে নবাগত আনিসুজ্জামান যদি তাঁর সঙ্গে মিলে অনুবাদ করতে সম্মত হয়, তবে তা হতে পারে। রাজেশ্বরী দত্ত তখন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়েই ছিলেন। এডওয়র্ড শিলসের কথায় তিনি আমাকে ফোন করেন। নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেও ডিমকের সঙ্গে যুক্তভাবে অনুবাদ করতে আমি রাজি হই। আমি যে-প্রবন্ধ দুটি বেছে নিই, তার একটি 'কাব্যের মুক্তি', অন্যটি 'ডব্লিউ বি ইয়েটস ও কলাকৈবল্য'। আমাদের অনুবাদের প্রণালি ছিল খুব মজার। প্রথমে বাংলা থেকে আমি ইংরেজি

করি—মূলের যতটা নিকটে থাকা যায়, সেদিকে লক্ষ রেখে এবং ইংরেজি বাক্যরীতির পরোয়া না করে। ডিমক তার থেকে যথাযথ ইংরেজি ভাষ্য তৈরি করেন। তারপর আমরা দুজনে বসে মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি, কোনো ভাবান্তর হলো কিনা। 'লালবাতি জ্বালা' মানে যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তিরোধান, এই অনুবাদ করতে গিয়ে তা জেনে ডিমক বিমল আনন্দলাভ করেছিলেন। আমাদের অনুবাদ দুটি অনেককাল পরে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত *দি ওয়ার্ল্ড অফ টোয়াইলাইট* (কলকাতা, ১৯৭০) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। বইটি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নামেই বের হয়—ম্যালকম মাগারিজ তার মুখবন্ধ লেখেন, রাজেশ্বরীর আদ্যক্ষর দিয়ে কৃতজ্ঞতাস্বীকার মুদ্রিত হয়। এতে সুধীন্দ্রনাথের আরো পাঁচটি প্রবন্ধের অনুবাদ করেন কেতকী কুশারী ডাইসন।

৪.

থ্যাংকসগিভিং মার্কিনদের বড়ো পরব। এই উপলক্ষে আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধব ছাড়াও অনেকে বিদেশি ছাত্রদের নিমন্ত্রণ করেন বাড়িতে। আমি আমন্ত্রণ পেলাম জেনিসিও নামে একটি গ্রাম থেকে। গ্রাম বললাম এই কারণে যে, কৃষিই সেখানকার মূল উৎপাদন, নইলে শহরের সুবিধেগুলো সবই আছে, শুধু শহরের প্রশস্ত রাস্তা, ভিড় আর কোলাহল নেই। ইন্টারন্যাশনাল হাউজ থেকে বড়ো এক বাস ভর্তি করে আমরা রওনা হলাম—তিন ঘণ্টার পথ। বাস যেখানে এসে থামলো, সেখান থেকে গৃহকর্তা-কর্ত্রীরা যাঁর যাঁর ভাগের অতিথিদের নিয়ে গেলেন নিজগৃহে। আমি আর একটি থাই ছেলে অতিথি হলাম ওয়েসলি মিলারদের। মিলার কৃষিকর্ম করেন বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। তাঁর স্ত্রী এবারকার থ্যাংকসগিভিং কর্মসূচির স্থানীয় আয়োজকদের প্রধান। ভদ্রমহিলা মধ্যবয়সী, ভদ্রলোক তাঁর সামান্য বড়ো হবেন। গাড়িতে করে যখন তাঁদের বাড়ি পৌঁছোলাম, গাড়িতে বসেই ইলেকট্রনিক পদ্ধতির সাহায্যে গ্যারাজের দরজা খুললেন—দেখে আমার তাক লেগে গেল। এখন অবশ্য কেউ বলতে পারেন যে, অত অজ্ঞতা ও গ্রাম্যতা নিয়ে বিদেশ যাওয়া আমার পক্ষে সংগত হয়নি।

তবে জেনিসিও গ্রামে আমরা ভি আই পি-র মর্যাদা পেয়েছিলাম। স্থানীয় কাগজে দু-দফা ছবি বেরিয়েছিল, স্থানীয় বেতারে সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে আসা আমাদের জনা পাঁচেকের। স্থানীয় স্কুল, হাসপাতাল ও চার্চে যাওয়া হলো। হাসপাতালে বহুজনকে স্বেচ্ছাশ্রম দিতে দেখলাম—মূলত বয়স্ক মহিলাদের। রোগীদের বিছানার চাদর ও বালিশের ওয়াড় তৈরি করছেন, তাদের হাসপাতালের পরিধেয় ধুয়ে-শুকিয়ে ইস্ত্রি করে দিচ্ছেন। জামা-কাপড়ে কেউ একটার পর একটা বোতাম লাগিয়ে চলেছেন।

গৃহকর্ত্রী নিয়ে গেলেন তাঁর বাপের বাড়িতে—থ্যাংকসগিভিং ডে-তে সারাদিনের জন্যে বেড়াতে। গিয়ে জানলাম, তাঁদের নিকটতম এক প্রতিবেশী কার রেসিংয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে মারা গেছেন। স্থানীয় টেলিভিশনে বারবার করে সেই দুর্ঘটনার ছবি

দেখাচ্ছিল। মনটা খারাপ হয়ে গেল। তবে সকলেই শোকটা সামলে নিয়েছেন, জীবনধারা তো থেমে থাকতে পারে না।

মিসেস মিলারের আত্মীয়স্বজনেরা আমাদের সম্পর্কে এত জানতে চান যে তার শেষ নেই। ওঁদের এক আত্মীয় দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বেড়াতে এসে জানিয়েছিল, সেখানকার লোকজন গরম দুধ খায়। এটা ছিল ওঁদের কাছে পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। আমরাও এমন অত্যাশ্চর্য কাণ্ড করি কি না, ওঁরা তা জানতে চান এবং জেনে অবাক হন বোধহয় এই ভেবে যে, মানবজাতি দুভাগে বিভক্ত—শীতল দুগ্ধপায়ী এবং উষ্ণ দুগ্ধপায়ী। আমাদের রাস্তাঘাটের বর্ণনা দিতে গিয়ে পিচের রাস্তা কেমন হয়, কিছুতেই বোঝাতে পারিনি। আশপাশ থেকে অনেক কৌতূহলী বয়স্ক ও কিশোর নরনারী আমাদের দেখতে এলেন। এক কিশোরকে জিজ্ঞেস করলাম, বড়ো হয়ে সে কী হতে চায়। বললো, ডিপ স্কিন ডাইভার। শুনে আমার চক্ষু চড়কগাছ।

মিলাররা আমাদের নিয়ে গেলেন মিসিসিপি নদী দেখাতে। নদীর ওপারে আইওয়া অঙ্গরাজ্য। সেখানেও গেলাম এবং জাদুঘর দেখলাম। এদের অতীত খুব অল্পদিনের ব্যাপার। জাদুঘরে যা সংগৃহীত হয়েছে, তার অধিকাংশ সামগ্রী আমরা হয়তো ফেলে দিতাম। তবে ইন্ডিয়ান—আমরা যাদের রেড ইন্ডিয়ান বলি—তাদের সংস্কৃতির নিদর্শন তাঁরা যত্নের সঙ্গে সংগ্রহ করছেন। এদেশের আদিবাসীদের সঙ্গে আদি বসতিস্থাপনকারীরা যে ভালো ব্যবহার করেনি, সে-বোধ তাঁদের মধ্যে দেখা দিতে শুরু করেছে।

জেনিসিওতে সানডে স্কুলে ধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছিল : হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলাম সম্পর্কে কথা হবে। একটি ভারতীয় যুবক হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বলবেন এবং আমার সঙ্গী থাই ছেলেটি বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে বলবে। আমাদের দলে মিশরের একজন ছিল—আমি তাকে বললাম, ইসলাম সম্পর্কে বলতে। সে প্রথমটায় রাজি হলো। তারপর যতো সময় যায়, সে অস্থির হয়ে এসে ইসলামের বিধিনিষেধ-বিষয়ে একেকটা প্রশ্ন করে আমাকে এবং তার কারণ ব্যাখ্যা করতে বলে। শেষ অবধি বলে, 'আমার খুব নার্ভাস লাগছে, তাছাড়া মনে হচ্ছে, আমার চেয়ে তুমি ইসলাম সম্পর্কে ভালো জানো। বক্তৃতাটা তুমিই দাও।' তখন আর পশ্চাদপসরণের সুযোগ নেই। আমার বক্তৃতার পরে অনেকে প্রশ্ন করেছিলেন। একটি প্রশ্ন ছিল যে, যিশুখ্রিষ্টকে যে তোমরা নবি বলে মানো, তা এই প্রথম শুনলাম। তাহলে ইউরোপে যে এতোকাল ধরে ক্রুসেড চললো, তার ব্যাখ্যা দেবে কীভাবে? আমি পালটা প্রশ্ন করেছিলাম, 'হাউ ডু ইয়ু এক্স্‌প্লেন এনি ওঅর?'

আমরা চলে আসার আগে জেনিসিওর অধিবাসীদের পক্ষ থেকে—ওঁদের ভাষায় 'কমিউনিটি'র তরফ থেকে—বেশ একটা জমকালো বিদায়-সংবর্ধনা জানানো হলো। তার অনানুষ্ঠানিক আবহাওয়া ছিল খুব উপভোগ্য।

জেনিসিওতে খুব আদরযত্ন পেয়েছিলাম। মিলাররা যেমন করেছিলেন, নিকটাত্মীয়ও অত করে না। অত স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার অভিজ্ঞতা আমার ছিল না, কিন্তু তাঁরা প্রতি মুহূর্তেই ভাবছিলেন, আমাদের বোধহয় কষ্ট হচ্ছে। ফিরে আসার পরেও মিসেস মিলারের সঙ্গে পত্রালাপ চলতো। ক্রিসমাসে নেমন্তন্ন করেছিলেন, যেতে পারিনি। ১৯৬৯ সালে তাঁর স্বামীর মৃত্যুসংবাদ দিয়েছিলেন। তারপরে তাঁর সঙ্গে

যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়—আমার দোষেই বলতে হবে। মিলারের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পরে দুর্ঘটনায় মৃত তাঁদের প্রতিবেশী যুবকের কথা মনে হয়েছিল, আর মনে হয়েছিল, তখন আমরা সকলে মিলে বলেছিলাম—মানুষের মৃত্যু হলেও জীবনধারা থেমে থাকে না।

৫.

মিসেস মিলারের নেমন্তন্নে ক্রিসমাসে যেতে পারিনি, তার কারণ, আমি পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম, ডিসেম্বরের ২০ থেকে জানুয়ারির ১০—এই তিন সপ্তাহ আমেরিকার আর-কয়েকটি শহর ঘুরে আসবো—বেড়াতে এবং আমার গবেষণা সম্পর্কে সেসব জায়গার গ্রন্থাগার থেকে মালমশলা সংগ্রহ করতে। প্রথমে গেলাম ওয়াশিংটন ডি সি-তে। হোটেলে উঠলাম বটে, কিন্তু শরফুল আলমের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই তিনি জোর করলেন তাঁর বাসায় গিয়ে থাকতে। পরদিন হোটেল ছেড়ে গেলাম তাঁদের বাড়িতে। ওয়াশিংটনের দ্রষ্টব্য দেখি, লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসে পড়াশোনা করি, শরফুল ভাইদের সঙ্গে ঘরে আড্ডা দিই এবং বাইরে সিনেমা দেখতে যাই। সপ্তাহখানেক ওয়াশিংটনে থেকে দু-একদিনের জন্যে ফিলাডেলফিয়ায়, সেখান থেকে এক সপ্তাহের জন্যে নিউইয়র্কে। ক্রিসমাসে ছিলাম ওয়াশিংটনে আর নিউ ইয়ারস ইভে এলাম নিউইয়র্কে। ইচ্ছে ছিল, এদের নববর্ষ-পালন সচক্ষে দেখবো। তবে যে-হোটেলে উঠেছিলাম, সেখান থেকে মূল অনুষ্ঠানস্থল এতো দূরে যে যাওয়া হলো না। মধ্যরাতের পর ট্যাক্‌সি যদি এদিকে না আসতে চায়! আমাদের এককালীন ভাইস-চান্সেলর ড. মাহমুদ হোসেন তখন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি-অধ্যাপক। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ায় খুব খুশি হলেন—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঢাকার খবর, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁদের কুশল, জানতে চাইলেন। আর দেখা হলো আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ড. জি ডব্লিউ চৌধুরীর সঙ্গে—তিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে যোগ দিতে এসেছিলেন পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে। সার্ জাফরুল্লাহ্ খান ছিলেন তাঁদের দলনেতা। পূর্ব পাকিস্তানের আরেক প্রতিনিধি রাজা ত্রিদিব রায়ের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে সার্ জাফরুল্লাহ্ তাঁকে কেমন তিরস্কার করেছিলেন এবং দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন, ড. চৌধুরীর মুখে সে-গল্প শুনে মজা পেলাম।

নিউইয়র্ক থেকে গেলাম বস্টনে। সেখানে যাওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গবিশারদ স্টিফেন হে-র সঙ্গে দেখা করা। স্টিফেন হে শিকাগোতে ছিলেন, সেখানে তাঁর সান্নিধ্যলাভ করবো, এমন একটা আশা নিয়ে শিকাগোতে গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনলাম, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় তিনি একটা গবেষণা-প্রকল্প নিয়ে হার্ভার্ডে চলে গেছেন। স্টিফেন হে চীন ও জাপানে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ ও অভ্যর্থনা সম্পর্কে অত্যন্ত তথ্যবহুল রচনা লিখেছিলেন—*দেশ* পত্রিকায় তার আংশিক অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তিনি আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। তাছাড়া তিনি একটি

অনামী লেখকের ইংরেজি বই আবিষ্কার করে তা রামমোহন রায়ের লেখা বলে দাবি করেছিলেন (পূর্বোল্লিখিত ওয়েন কিলপ্যাট্রিক এই বইয়ের গ্লসারি তৈরি করে দিয়েছিল)। অনেকে তাঁর যুক্তি মানেননি, কিন্তু শিকাগোয় বসে বইটি পড়ে স্টিফেনের মত আমার কাছে গ্রাহ্য মনে হয়েছিল। ওই বইয়ের মুখবন্ধে ঋণস্বীকার করে বহুজনের নাম ছিল, ডিমকের বাদে। শিকাগো ছাড়ার আগে অবশ্য আমি ডিমককে বলে এসেছিলাম যে, আমি স্টিফেন হে-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী। ডিমক বলেছিলেন, পারলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যেয়ো।

শিকাগো থেকে আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যাইনি, তবে বস্টনে পৌঁছে টেলিফোন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখাসাক্ষাতের সময় ঠিক করে নিয়েছিলাম। তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কোনো আলোচনা তিনি করতে চান না এবং আমার গবেষণার বিষয়ে তিনি এতো কম জানেন যে, আমাকে দেওয়ার মতো পরামর্শ তাঁর নেই। আমার মনে হলো, ঢাকায় বসে আমি যে তাঁর লেখালিখির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, তাতে তিনি একই সঙ্গে বিস্মিত ও প্রীত। তবে আমি যদি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য কোথাও যুক্ত থাকতাম, তবে আবরণ ভেদ করে তিনি হয়তো বেরিয়ে আসতেন।

শিকাগো আসা অবধি 'বাড়ির জন্যে মন কেমন' করছিল। সফরে বেরিয়ে নিঃসঙ্গতাবোধ আরো বাড়লো। আমার বিদেশবাসের সর্বক্ষণ বেবী আমাদের বাড়িতেই থাকছিল। এখন তাকে চিঠি লিখে দিলাম, রুচিকে নিয়ে সে চলে আসবে কিনা, তা ভেবে দেখতে। তার আসারও অনেক বিঘ্ন ছিল : সে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা পাশ করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে—সামনে এম এ শেষ পর্ব পরীক্ষা, কোলে নিতান্তই শিশুসন্তান, ঘরে অসুস্থ শাশুড়ি। আমার নিজেরও দ্বিধাদ্বন্দ্ব কম ছিল না, তবু তা কাটিয়েই আসার কথা লিখলাম।

এবারের সফরে এক শহর থেকে অন্য শহরে গিয়েছিলাম গ্রেহাউন্ড বাসে—ঘুমের খানিকটা অসুবিধে ছাড়া আর কোনো বিপত্তি ঘটেনি। বস্টন থেকে শিকাগো ফেরার পথে বাস গেল বিগড়ে। আরেক বাস এসে আমাদের উদ্ধার করলো বটে, কিন্তু তার ফলে চার ঘণ্টা দেরি করে ৯ জানুয়ারি রাত সাড়ে দশটায় ফিরলাম—সাতাশ ঘণ্টার যাত্রাশেষে।

৬.

ইন্টারন্যাশনাল হাউজের ফ্রন্ট ডেস্কে ঘরের চাবি নিতে গেছি, দেখি, ধীর পায়ে মোজাফফর আসছেন (পরে শুনেছিলাম সাড়ে ছটায় তিনি আমার খোঁজ করে দেরিতে বাস আসবে, তা জেনে গিয়েছিলেন)। মালপত্র ঘরে রেখে এসে দুজনে মিলে পানীয় ধরনের কিছু খেয়ে নিলাম। জানতে চাইলাম, আমার চিঠিপত্র কিছু জমা হয়েছে কিনা। মোজাফফর বললেন, 'হ্যাঁ, আপনার স্ত্রীর চিঠি এবং আরো কয়েকটা চিঠি এসেছে।' একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার মাকে কেমন দেখে এসেছিলেন?'

প্রশ্ন শুনেই ভয় পেয়ে গেলাম।

মোজাফফর বললেন, 'আপনার মায়ের অসুখ বেড়েছে—আপনার স্ত্রী আমাকে চিঠি দিয়েছেন। সেটা লিলিকে [রওশন জাহান] দিয়েছি—সেদিনই সে জবাব দিয়ে দিয়েছে।' ইডেন কলেজে কিছুকাল বেবী ছিল লিলির ছাত্রী।

মোজাফফরের ঘরে গিয়ে চিঠিগুলো নিলাম। বেবীর চিঠি খুললাম সবচেয়ে দেরিতে। মায়ের অসুখ বেড়েছে, এর চেয়ে বেশি কিছু বলা নেই। মোজাফফরও আর কিছু বললেন না, তবে আমার ঘর পর্যন্ত সঙ্গে এলেন। বললেন, বেবীর লেখা চিঠিটা তাঁর অফিসে রয়ে গেছে—কাল দেবেন। তাতে বেবী জানিয়েছে, চিকিৎসার ত্রুটি হচ্ছে না এবং আমি যেন অধীর না হই। খানিক বাদে সবে বিছানায় গেছি, শফিউল্লাহ্ এসে হাজির। ফিরেছি কিনা দেখতে এসেছে। তাকে বললাম, মার অসুখের খবর এসেছে। সে শুধু জানতে চাইলো, তাঁর বয়স কত। আর কিছু বললো না।

রাতে ঠিকমতো ঘুমোতে পারলাম না। সকালে শফিউল্লাহ্ আর আমি একসঙ্গে নাশতা করতে গেলাম। দেখি, মোজাফফর বসে আছেন করিডোরে। বললাম, 'বাড়িতে একটা টেলিগ্রাম করে দিই।' বললেন, 'অপেক্ষা করা ভালো।' আমার চা খাওয়ার পরে যে-চিঠি তিনি আমার হাতে দিলেন, তা আব্বার লেখা। আব্বা তাঁকে যে-চিঠি দিয়েছিলেন, সেটাও পড়তে দিলেন। বললেন, 'আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল বলে কাল রাতে এ-দুটো দিইনি।'

চিঠি পড়ে আমি এক ফোঁটা অশ্রুও পাত করিনি।

মোজাফফর ও শফিউল্লাহ্ দুজনেই রাত পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকলেন। দুপুরে মোজাফফরকে নিয়ে তাঁর অফিস থেকে বেবীর চিঠি নিয়ে এলাম।

এই সময়ে বেবীকে লেখা আমার বিভিন্ন তারিখের চিঠি থেকে কিছু উদ্ধৃত করি :

> হিসেব করে দেখেছি, মা'র যখন শেষ নিঃশ্বাস পড়েছে [১ জানুয়ারি ১৯৬৫], তখন নিউ ইয়র্কে সকালবেলা। সে মুহূর্তে আমি হোটেলের বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছি। কিছুই জানতে পারি নি—শুধু সেদিন নয়, তার পরেও প্রায় দশ দিন। তারপর এ দুদিনে এত কিছু জানতে ইচ্ছে করছে, অথচ কিছুই জানতে পারছি না।
>
> ...আমাকে যে ধীরে ধীরে জানিয়েছ কেন, তাও বুঝতে পারছি এবং সেজন্যে আমার কোন অভিযোগ নেই। তবে তার দরকার ছিল না। আব্বাকে আরো বুঝিও যে, আমি সামলে নিয়েছি, চিন্তার কোন কারণ নেই। মা'র সম্পূর্ণ সুস্থ হবার আশা কিছুদিন আগেই আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। এই strokeএর পর বাঁচলে সে-জীবন হয়তো মৃত্যুর অধিক হোত। অজ্ঞান অবস্থায় যে জীবনাবসান হয়েছে, সেটার চাইতে সজ্ঞান মৃত্যু আরো কঠিন হোত। হয়তো কিছু বলতে চাইতেন, পারতেন না। কিংবা বললেও যা বোঝাতে চাইতেন, তা বোঝাতো না। মা'র জন্যে জীবন-মরণে খুব পার্থক্য ঘটেনি। পার্থক্য আমাদের জন্যেই বেশী—যারা বেঁচে আছি।
>
> ...মা আমার কাছে কতখানি ছিল, তা তুমি অন্ততঃ জানো। (১২.১.৬৫)
>
> বাহ্যতঃ এখানকার জীবনযাত্রার মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু ক্লান্তি

বেড়েছে। মাঝে মাঝে এত খারাপ লাগে যে, বলার কথা নয়। পরশু রাতে ওরকম লাগছিল। শেষে কলকাতার এক ছেলের ঘরে গিয়ে রাত একটা পর্যন্ত রবীন্দ্র-সংগীতের রেকর্ড শুনেছি। ফিরে এসেও ঘুমোতে ঘুমোতে দুটো-আড়াইটে হয়ে গেছে। একবার মনে হয়েছিল, [দেশে] ফিরে যাবার চেষ্টা করব নাকি? তার হাঙ্গামা অনেক। ... কেমন লাগছে আমার, তুমি অনুমান করতে পার। তবে জানই আমার সহ্যশক্তি বেশী। খোকন [আবদুল আলী] লিখেছে যে, সবকিছু সহজে গ্রহণ করার শক্তি সে নাকি আমার কাছ থেকে পেয়েছে। ভক্তি ও বিশ্বাসের বদলে আমার কেবল যুক্তিপ্রয়োগের ক্ষমতা আছে। তাই বুঝি মা'র মৃত্যুকেও সহজে নিতে পেরেছি। তবে তোমাদের মধ্যে থাকলে সেটা এতখানি কঠিন হত না।

আমার খালি মনে হয়, মা নিজের দীর্ঘজীবন কল্পনা করতেন। অথচ কি হয়ে গেল। আব্বার জন্যে খুব চিন্তা হয় মনে মনে।...

মনে হয়, মানুষের কত যত্নের শরীর, কিভাবে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয়। মা'র সঙ্গে শেষ দেখা অমন করে হবে, তা কে জানত! (২৩.১.৬৫)

সাত বছর ধরে প্রতি ঈদে মাকে শাড়ী কিনে দিয়েছি। ঈদের সকালে নামাজ পড়তে যাবার জন্যে মা কত তাড়া দিতেন! দেরী করে উঠতাম বলে রাগ করতেন। এবারে আমি ঢাকায় নেই, মা-কে শাড়ী দেবার দরকারও নেই।

...আব্বাও তাঁর মাকে হারিয়েছেন এবং ভুলেছেন। আমিও ভুলব,...।

...যা ঘটবার, তা ঘটেছে; সেটা ঘটনা হিসেবেই মেনে নিয়েছি। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় যে, আমার মধ্যে কোন গলদ আছে; নইলে সবকিছু এত সহজ হয়ে যায় কি করে আমার কাছে! (২.২.৬৫)

তোমাকে মাঝে লিখেছিলাম যে, এখন একটু কাজ চেপেছে ঘাড়ে। কিন্তু কাজ করতে বিশেষ পারছি না। দু-চার পৃষ্ঠা লিখলে আর লিখতে ইচ্ছে করে না। আমি এত খাটতে পারতাম, অথচ কেমন অলস হয়ে গেছি, মন বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। ভালো লাগে না। তাছাড়া, রাতে ঘুমের অসুবিধে বেড়েছে, তার জন্যে ওষুধ খাচ্ছি। সকালে উঠতে আরো দেরী হয়। বাইরে ঠাণ্ডায় বের হতে ইচ্ছে হয় না। অথচ হাউজেও সারাক্ষণ থাকতে বিশ্রী লাগে। (৪.২.৬৫)

বাংলা একাডেমীতে যে-বইটা ছাপতে দিয়েছিলাম, মনে মনে তার উৎসর্গপত্র রচনা করে ফেললাম : 'মাকে/ যে ছিল, নেই'।

৭.

শিকাগোতে যখন আমি ছিলাম, সে-সময়টা ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষিণ এশীয় বিদ্যাচর্চার স্বর্ণযুগ বলে অনেকে অভিহিত করেন। আমি তো ছিলাম মোটে দশ মাস, কিন্তু তার আগে-পরে দক্ষিণ এশীয় বিদ্যাচর্চার কর্মসূচির সঙ্গে যেসব শিক্ষক ও ছাত্র যুক্ত ছিলেন, তাঁরা তখনই স্বনামধন্য নয়তো পরে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্মানের আসনে

প্রতিষ্ঠিত। এডওয়ার্ড ডিমকের কথা বলা বাহুল্য। তাঁর আদি ডিগ্রি সংস্কৃতে, তবে বাংলার চর্চায়ই তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। যে-দুজন পণ্ডিতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ এশিয়া-সম্পর্কিত পঠন-পাঠনের পথিকৃৎ মনে করা হয়, তার মধ্যে ডিমক একজন, আরেকজন নরমান ব্রাউন—তিনি অবশ্য শিকাগোতে ছিলেন না। তবে শিকাগোতে ছিলেন জে ভি ভ্যান-বুইটেনেনের মতো বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত—তাঁর মহাভারতের ইংরেজি অনুবাদ মনস্বিতার বিশিষ্ট নিদর্শন হয়ে আছে। সুজান ও লয়েড রুডলফ-দম্পতি এই অঞ্চল নিয়ে গবেষণা করেছেন মূলত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দিক দিয়ে। বার্নার্ড কোনের সামাজিক বিশ্লেষণ—প্রধানত উত্তর ভারত নিয়ে—ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রন্থাগারিক মরিন প্যাটার্সন দক্ষিণ এশিয়া-বিষয়ে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থপঞ্জি তৈরি করেছিলেন, প্রথমে আমাদের বন্ধু রন ইনডেনের সঙ্গে মিলে, তারপর একাই তার বৃহদাকার রূপ দিয়ে সেটাকে এক্ষেত্রে অপরিহার্য করে তোলেন। তামিলের শিক্ষক এ কে রামানুজনের খ্যাতি তখনই আন্তর্জাতিক বিদ্বৎসমাজে ছড়িয়ে গিয়েছিল। অন্নদাশঙ্কর রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র পুণ্যশ্লোক রায় ভাষাতত্ত্ব-চর্চায় নাম করেছিলেন। মা লীলা রায় এবং আমাদের শিক্ষক মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সঙ্গে মিলে তখন তিনি *বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ হ্যান্ডবুক* (ওয়াশিংটন ডি সি, ১৯৬৬) তৈরি করছিলেন। তরুণ শিক্ষকদের মধ্যে বেশ নাম করেছিলেন উর্দুর সি এম নাইম, শিকাগো থেকে স্টেনসিল কেটে *মাহফিল* নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন দক্ষিণ এশিয়ার সাহিত্য-বিষয়ে। ডেভিড কফ তখন শিকাগো থেকে সদ্য পিএইচ ডি করে বেরিয়ে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন—বোধহয় ইস্ট ল্যানসিং ক্যাম্পাসে। কিন্তু আর যাঁরা কাজ করছিলেন পিএইচ ডি পর্যায়ে—যেমন, ব্যারি মরিসন, রন ইনডেন, রালফ নিকোলাস, লেওনার্ড গর্ডন, মার্ক ফ্রান্ডা, কার্লো কাপোলা—এঁরা উত্তরকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হন।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণক্রমে নানা দেশের বিশিষ্ট জনেরা সেখানে বক্তৃতা করতে যেতেন। আমি থাকতে তিনজন ভারতীয় গিয়েছিলেন : কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি গাজেন্দ্র গাদকার ও সাহিত্যিক-সাংবাদিক খুশওয়ান্ত সিং। মনে পড়ে, ভারতীয় ছাত্রদের কেউ কেউ দেশের পরিস্থিতি নিয়ে সমালোচনামূলক মন্তব্য করে ইন্দিরা গান্ধির কাছে জবাব চেয়েছিলেন। তিনি খুবই রুষ্টচিত্তে তাদের ধমক দিয়েছিলেন। পরে চা-খাওয়ার সময়ে যখন তাঁর সঙ্গে আলাপ করলাম, তখন সেই রোষের অবশেষ ছিল না। আমার পরিচয় জেনে বলেছিলেন, শান্তিনিকেতনে থাকতে বাংলা ভালোই রপ্ত করেছিলেন তিনি, কিন্তু চর্চার অভাবে তা হারিয়েছেন বলে দুঃখ হয় তাঁর। গাজেন্দ্র গাদকারকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বিচারপতি হিসেবে তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে কোন মামলাটি তিনি সবচেয়ে স্মরণীয় বলে মনে করেন? উত্তর দিয়েছিলেন : মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা বনাম মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট। এ-মামলাটির কথা আমি খবরের কাগজে পড়েছিলাম। আইন বিভাগ আর বিচার বিভাগের দ্বন্দ্ব সেখানে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল যে, বিচারপতিরা নির্বাচিত সদস্যদের বিচার করতে চেয়েছিলেন মানহানির অভিযোগে, আর বিধানসভার

সদস্যেরা বিচারকদের অভিশংসন করতে উদ্যত হয়েছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের যে-রায় দুকূল বাঁচিয়েছিল, তা লিখেছিলেন গাজেন্দ্র গাদকার। খুশওয়ান্ত সিং খুব জমিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সমকালীন ভারতে শিখদের অবস্থা নিয়ে। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি হিসেবে। তিনি নাকি আসার আগে জানতে চেয়েছিলেন, প্রিন্সটনে কী করণীয় হবে তাঁর। উত্তর পেয়েছিলেন, ছাত্র-শিক্ষকদের কাছে তিনি প্রাপনীয় হবেন, এটাই প্রত্যাশিত, তার অধিক কিছু নয়। খুশওয়ান্ত সিং পালটা প্রশ্ন করেছিলেন, আমি মহিলা হলেও কী তোমরা আমার কাছে তাই দাবি করতে? সমকালীন ভারতে শিখদের বিশেষ স্থান সম্পর্কে তিনি তিনটি কথা বলেছিলেন : এরা এক সমন্বয়পন্থী ধর্মাবলম্বী—ইসলাম, হিন্দু ও খ্রিষ্টানধর্ম থেকে এই ধর্ম অনেক কিছু নিয়েছে; শিখরা যোদ্ধার জাত—যদি পাকিস্তানের সঙ্গে কখনো ভারতের যুদ্ধ বাধে, তাহলে ঝড়টা বয়ে যাবে মূলত তাদের ওপর দিয়েই; আর নিজেদের আহাম্মক বানাবার অশেষ ক্ষমতা তাদের আছে। তাঁর বক্তৃতায় তাদের যে-সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তিনি বর্ণনা করেছিলেন, তাতে উনিশ শতকে সৈয়দ আহমদ বেরিলভির নেতৃত্বাধীন তথাকথিত ওয়াহাবিদের সঙ্গে শিখদের যুদ্ধের উল্লেখ ছিল না। প্রশ্নটা করবো-করবো করতে সময় চলে গেল। শেষে চা-পর্বে এ-বিষয়ে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, 'প্রশ্নটা ভালো, এটা তুমি সভায় করলে না কেন? তাহলে অন্যেরাও জানতে পারতো।' তারপরও তিনি জবাব দিলেন : কিছুটা উভয়পক্ষের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, কিছুটা ইংরেজ শাসকদের কূটনীতি, আর কিছুটা দুপক্ষে ভুল বোঝাবুঝি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ছিল অতি চমৎকার—ছাত্র-শিক্ষকে এবং আমাদের মতো কিছুটা বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সৌহার্দ্য ছিল অকৃত্রিম। সাক্ষাতের প্রথম দিনেই ডিমক বলেছিলেন, ইচ্ছে করলে তাঁর গাড়ি নিয়ে ঘুরে আসতে পারি; আর বলেছিলেন, যেন মনে রাখি যে আমার জন্যে তাঁর বাড়ির দরজা সর্বদা উন্মুক্ত। সুজান ও লয়েড রুডলফের সঙ্গে রাজ্জাক সাহেবের বন্ধুত্ব ছিল। দেখা করতে গিয়ে রাজ্জাক সাহেবের কথা বলতেই আমার আদর বেড়ে গেল এবং তাঁদের বাড়িতে ডিনার খেতে নেমন্তন্ন করলেন। ডিনারের সময়ে বললেন, তুমি তো ওসব খাবে না, কিন্তু সবাইকে বিয়ার ঢেলে দিতে আশা করি তোমার আপত্তি হবে না। আমি বিয়ার ঢেলে দিলাম পানির মতো করে, ফলে গ্লাসের তলায় থাকলো কিছুটা পানীয়, বাকি গ্লাসভর্তি ফেনা (এখন দেখি, জার্মানিতে এভাবেই বিয়ার ঢালে)। দুজনকে দেওয়ার পরে লয়েড রুডলফ খাওয়া ছেড়ে উঠে এলেন। বললেন, কেমন করে বিয়ার ঢালতে হয়ে, তা শিখিয়ে দিচ্ছি। পর পর ওঁদের দুটি নিমন্ত্রণে যেতে পারি নি, তারপরও দাওয়াত করেছেন। প্রতি টার্মের শেষে ডিমক বা ভ্যান বুইটেনেন বা অন্য কোনো শিক্ষকের বাড়িতে পার্টি হতো। নিমন্ত্রিত শিক্ষকদের পরিবারও কিছু না কিছু রান্না করে বা বানিয়ে নিয়ে যেতেন পার্টিতে। পোলাও-ভাত রুটি-নান-পাউরুটি ও হরেকরকম মার্কিন খাবারের পাশাপাশি উপমহাদেশীয় খাবারের সমারোহ ছিল দেখার মতো। একবার রসগোল্লা-পানতুয়া-সন্দেশ-লাড্ডু প্রভৃতি প্রায় আট-দশ রকমের দেশি মিষ্টি জড়ো হয়েছিল। পানীয়ের তো ছড়াছড়ি। অকোমল পানীয়ের প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল না। তবে পার্টিতে মেয়েদের

পাশ দিয়ে যাবার সময়ে চেনাজানা কেউ না কেউ গ্লাস বা কাপ বাড়িয়ে দিয়ে বলতো, 'হ্যাভ এ সিপ', তাদের প্রত্যাখ্যান করা যেতো না। কিন্তু ওই পানীয় যে এঁটো হয় না, সেই সংস্কার না থাকায়, বড়ো অস্বস্তিতে পড়তাম।

সবচেয়ে উপভোগ্য ছিল আমাদের সাত-আটজনের ছোট্ট দলের সৌহার্দ্য। আমরা সপ্তাহান্তে একসঙ্গে খেতাম এবং সিনেমা দেখতাম। কনট্রাক্ট ব্রিজ খেলতে শিখছিলাম এবং তাতে বেশ রাত পর্যন্ত মগ্ন থাকতাম। একবার কার জন্মদিন কবে, তা আলোচনা হয়েছিল। আমি তা ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু কেউ কেউ যে ভোলে নি, তা টের পেলাম নিজের জন্মদিনে। একরকম উৎসবই হয়েছিল বলা যায়। ইন্টারন্যাশনাল হাউজে রান্নাবান্না করার এবং দল বেঁধে খাওয়ার আলাদা ব্যবস্থা ছিল। পরে জেনেছিলাম, কিছুটা আগের দিনে এবং বেশিটা ওইদিন ভোরবেলায় গিয়ে মোজাফফর ও রওশন জাহান বাজার করে এনেছিলেন। দুপুর থেকে রওশন জাহান অনেকগুলি সুস্বাদু পদ রেঁধেছেন আর মোজাফফর জোগান দিয়েছেন। ওঁরা ছাড়া শফিউল্লাহ ও আমি, টম প্র্যাপাস ও জো বার্নস খাদক। খাওয়া-দাওয়ার পরে বের হলো বড়ো একটা কেক আর চা-কফি। সেই সঙ্গে শফিউল্লাহর উপহার—চকোলেট ফ্লেভার্ড ওয়াফার—আমার জিভে নাকি ধার বেশি, ওটা খেয়ে যদি ঝাঁঝটা কমে! তারপর টম হাড়ি-বাসন মাজলো, অন্যেরা সেগুলো মুছলেন। শফিউল্লাহর দায়িত্ব হলো রান্নাঘরের মেঝে ইত্যাদি পরিষ্কার করা। রুচির ছবি সকলের দেখা ছিল। বিদায়ের আগে আমার জন্যে টমের প্রার্থনা : 'এ ডজেন চিলড্রেন অ্যান্ড সাম ব্রেনস টু ক্যারি অ্যালং।'

এই কথায় মনে পড়লো ইন্টারন্যাশনাল হাউজবাসী অল্পবয়সী একটি মেয়ের কথা। তার নাম ভুলে গেছি। সে প্রেমে পড়েছিল এক ভারতীয় যুবার, কিন্তু আমি যাওয়ার অল্পকাল পরে সে-ছেলেটির স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের সময় হয়ে যায়। মেয়েটি তো কেঁদেই আকুল। আমি তাকে যতোই বোঝাবার চেষ্টা করি যে, জীবনের এটাই শেষ নয়, সে ততোই হাপুস নয়নে বলে, ওই ছেলেকে বিয়ে করে সে ভারতে গিয়ে থাকতে চায় আর অনেকগুলো সন্তানের মা হয়ে সংসার চালাতে চায়।—আমাদের দেশে তখন পরিবার-পরিকল্পনার অভিযান শুরু হয়েছে।

মেরি লিন নামের মেয়েটি কিছুকাল ঢাকায় বেড়িয়ে গিয়েছিল। সে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললো, যে-বাড়িতে সে থাকতো, সে-বাড়িতে একটা বিয়ের আগাগোড়া দেখার সুযোগ তার হয়েছিল। বিয়েটা হচ্ছিল অভিভাবকদের অভিপ্রায়-অনুযায়ী। মেরি লিন বলে, দেখো, তোমাদের দেশে বাপ-মা যেমন ভেবেচিন্তে মেয়ের বিয়ে দেয়, সেটা আমার খুব ভালো লেগেছে। আমাদের বাপ-মাদের তো এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। তারপর কিছুকালের পরিচয় সম্বল করে আমরা বিয়ে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ি, ফলটা প্রায়শই হয় মর্মান্তিক। বিয়ে ভাঙলেই অন্যে সেটা টের পায়, কিন্তু বিয়ে না ভেঙে কতোজন যে কী তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে জীবনধারণ করে, তা বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই।—হায় রে, পরস্পরকে পছন্দ করে বিয়ে করার আমি ঘোর সমর্থক এবং যাঁরা তা অনুমোদন করেন না, তাঁদের একটু পশ্চাৎপদ বলে মনে করি।

ইন্টারন্যাশনাল হাউজে বাইরে থেকে আসতেন, এমন লোকজনের মধ্যে একজন

আমাদেরই বয়সী কিংবা সামান্য বড়ো ছিলেন। একদিন যথাসময়ের পরে উপস্থিতি হলেন। দেরির কারণ জিজ্ঞাসা করায় বললেন, তাঁর বিধবা মায়ের জন্যে 'ডেট' জোগাড় করে দুজনকে টিকিট কিনে দিয়ে থিয়েটারে পাঠিয়ে এলেন।

আমি শিকাগোয় যাওয়ার পরে আমাদের বন্ধু রন ইনডেন কলকাতা থেকে শিকাগোয় ফিরে আসে। এক তরুণীর সঙ্গে তার বিয়ের জন্যে পরস্পরকে আমরা খুব উৎসাহিত করেছিলাম। আমাদের এই ঘটকালিতে সে বোধহয় অল্পকালের জন্যে একটু নরম হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত আজো অবিবাহিত রয়ে গেছে।

ব্যারি মরিসনও ঢাকা থেকে ফিরে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে নিয়ে গেলেন বাইরে খাওয়াতে এবং পৌঁছে দিলেন ট্যাক্‌সিতে। অল্পকাল পরে তাঁর পরিবার এসে পৌঁছোলে বাড়ি নিলেন ক্যাম্পাসের উলটো দিকে কৃষ্ণাঙ্গদের এলাকা পেরিয়ে। তাঁর বাড়িতে অনেকবার খেয়েছি, প্রতিবারই তিনি বিপজ্জনক এলাকা পার করে দিয়ে তারপর একা বাড়ি ফিরতেন। এতে তাঁর বিপদ ঘটার কোনো আশঙ্কা আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, প্রতিবেশী হিসেবে ওরা তাঁকে চিনে ফেলেছে, সুতরাং কোনো ক্ষতি করবে না। ব্যারিই আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, কৃষ্ণাঙ্গদেরকে কেউ সহজে বাড়ি ভাড়া দিতে চায় না, যখন দেয় তখন ভাড়া নেয় অত্যধিক। বেকারত্ব বা অল্প রোজগারের কারণে ভাড়া দিতেই তাদের প্রাণান্ত হয়, সুতরাং অপরাধজগতে প্রবেশ করতে অনেকেরই বিলম্ব হয় না। কৃষ্ণাঙ্গদের প্রসঙ্গে পরে ফিরে আসবো, তার আগে ব্যারির প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নিই। ইউনেস্‌কোর কাছে ব্যারি পূর্ব পাকিস্তানের ছোটোগল্পের ইংরেজি অনুবাদের প্রস্তাব করেছিলেন। ইউনেস্‌কো জানিয়েছিল, পাণ্ডুলিপি হাতে পেলে তবে তারা স্থির করতে পারবে বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিতে সমর্থ হবে কিনা। ব্যারি সহযোগী হিসেবে আমাকেই বেছে নিয়েছিলেন। সংকলনের জন্যে ছোটোগল্পের প্রাথমিক একটি তালিকা করেছিলাম। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' এবং শাহেদ আলীর 'জিব্রাইলের ডানা'র অনুবাদের খসড়াও করে দিয়েছিলাম। তারপর কাজ আর এগোয়নি। আমি দেশে ফিরে আসার পরে ব্যারি সংগতভাবেই মনে করেন, সংকলনটা শেষ পর্যন্ত করা যাবে না এবং ইউনেস্‌কোকে তা জানিয়ে দেন।

কৃষ্ণাঙ্গদের প্রসঙ্গে দুটি ঘটনা মনে পড়ে। শফিউল্লাহর এক বন্ধু ছিল পল—বয়সে আমাদের বেশ ছোটো। বহিরাগত এক প্রৌঢ় শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকের সঙ্গে সে রোজ লাউনজে বসে দাবা খেলতো। একদিন পল হঠাৎ করে টেবিল ছেড়ে উঠে ভীষণ চিৎকার করে বাপের বয়সী এই ভদ্রলোককে গালিগালাজ করতে লাগলো এবং ভদ্রলোক নীরবে মাথা নিচু করে রইলেন। আমরা দৌড়ে গিয়ে পলকে সরিয়ে নিলাম অনেক কষ্টে—ছ ফুটের ওপরে লম্বা পেটা শরীরের ক্রুদ্ধ যুবককে জায়গা থেকে নড়ানো একার কর্ম নয়। শুনলাম, পরিহাসের ছলে ভদ্রলোক পলকে কিছু বলেছিলেন এবং পল সেটা বর্ণবিদ্বেষী উক্তি বলে ধরে নিয়েছিল।

এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার-আদায়ের আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছিল। মার্টিন লুথার কিং নাগরিক অধিকার-আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা হয়ে উঠেছেন—তাঁর সেই 'আই হ্যাভ এ ড্রিম' বক্তৃতা বর্ণবিদ্বেষী ছাড়া সকলের মুখে মুখে।

নাগরিক-অধিকারের আইনও পাশ হয়েছে, তবে তা বোধহয় সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছিল না। মার্টিন লুথার কিং যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণশীল দক্ষিণাঞ্চলে মিছিল করে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। এই নাগরিক-অধিকারের আন্দোলনে আমাদের হাউজেরও কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ যোগ দিতো। তার মধ্যে একজন ছিল নেতাগোছের। আমার যদি ভুল না হয়, মার্টিন লুথার কিং অ্যালাবামায় যে-মিছিল নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ওই অঙ্গরাজ্যের সশস্ত্র বাহিনী যে-মিছিলের দিকে অস্ত্র তাক করে অবস্থান নিলে তিনি শুধু প্রার্থনা সাঙ্গ করে দলবল নিয়ে ফিরে আসেন, সেই মিছিলে সে ছিল। একদিন দেখি হাউজে সে ঢুকছে রক্তাক্ত অবস্থায়। এল-ট্রেনের স্টেশনে রাতের বেলায় কৃষ্ণাঙ্গ যুবক কয়েকজন তাকে মেরে-ধরে টাকাপয়সা কেড়ে নিয়েছে। আমাদের সাহায্য ও সহানুভূতির উত্তরে সে বলেছিল, অপরাধের সঙ্গে বর্ণের সম্পর্ক নেই, সেটা অনেক কারণে ঘটে।

এর আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়ে যায়। সে-সময়ে ছাত্র-শিক্ষকদের অনেককেই দেখেছিলাম জ্যাকেটের ল্যাপেলে কিংবা শার্টের পকেটের ওপরে লিনডন জনসন বা ব্যারি গোল্‌ডওয়াটারের প্রার্থিতা সমর্থন করে কোট-পিন বা ব্যাজ পরতে। ক্লাসে শিক্ষক হয়তো জনসনের সমর্থনসূচক ব্যাজ পরেছেন, সামনের সারিতে বসে আছে গোল্‌ডওয়াটারের সমর্থনসূচক ব্যাজ-পরা ছাত্র। তাতে কোনো কিছুতেই বিঘ্ন ঘটতো না।

নির্বাচন ঘনিয়ে এলে আমাদের মধ্যেও উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়। টম ভোট দিতে যায় নি, কেননা, তার ভাষায়, একজন আহাম্মক আর একজন অর্বাচীনের মধ্যে তার বেছে নেওয়ার কিছু নেই। নীতিগতভাবে সে ছিল গোল্‌ডওয়াটারের বিরোধী, কিন্তু জনসনকেও সে দেখতে পারতো না। টেলিভিশনে একদিন আমি কেনেডি-হত্যা এবং কেনেডির হত্যাকারী হিসেবে সন্দেহভাজন অসওয়াল্ড-হত্যার আনুপূর্বিক ছবি দেখেছিলাম। জ্যাক রুবি কী করে অসওয়াল্ডের কাছে যেতে পারলো, এ প্রশ্ন করায় টম বলেছিল, টেক্সাসে সবকিছু ঘটাই সম্ভবপর—লিনডন জনসনকে দেখে তুমি টেক্সানদের বুদ্ধি-বিবেচনার দৌড় আন্দাজ করতে পারো না? তবু টেলিভিশনে প্রেসিডেন্ট-নির্বাচনের ফলাফল দেখেছিলাম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। আমেরিকা-বাসকালে ওই একটা রাতই জেগে টিভি দেখি।

৮.

দেশ ছাড়ার আগে এখানেও প্রেসিডেন্ট-নির্বাচনের হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। বিরোধী দলগুলো মিলে রাষ্ট্রপ্রধানের পদে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে মনোনয়ন দিয়েছিল ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে। আইয়ুব খান মওলানাদের কাছ থেকে ফতোয়া আদায় করলেন যে, নারীর পক্ষে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া ইসলামসম্মত নয়। জামায়াতে ইসলামীও এই বিষয়ে একই মত প্রকাশ করে, তবে তারা পরিস্থিতির বিবেচনায় ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়। খাজা নাজিমউদ্‌দীন সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে আগে থেকেই

আন্দোলনে নেমেছিলেন, আর ফাতেমা জিন্নাহ্‌র পক্ষে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে বিরোধী দলীয় নেতাদের সঙ্গে যোগ দেন জেনারেল আজম খান। ১৯৬৫ সালের ১ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং আইয়ুব জয়ী হন। তবে পূর্ব পাকিস্তানেও যে তিনি ফাতেমা জিন্নাহর চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিলেন, তাতে সকলেরই ধারণা হয়েছিল, নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় নি।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দৈনিক *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকা নিয়মিত আসতো, তাতে দেশের হাল-হকিকত জানতে পারছিলাম। তবে আইয়ুবের নির্বাচনের সংবাদ পাই ২ জানুয়ারিতে, নিউইয়র্কে। এরকম যে হবে, এমন ধারণা আমার আগেই হয়েছিল। শিকাগো-প্রবাসী পাকিস্তানিদের মধ্যে আইয়ুবের কিছু সমর্থক ছিলেন, তবে, আমার ধারণা. বিরোধীই ছিলেন বেশি। দেশের রাজনীতি বিদেশে টেনে নিয়ে নিজেদের মধ্যে—বিশেষ করে, পাকিস্তান অ্যাসোসিয়েশন অফ শিকাগোয়—আমরা ভেদসৃষ্টি করতে চাই নি।

পাকিস্তান অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে আমরা খুব খেটেছিলাম। আমাদের ভাবটা ছিল এই যে, পাকিস্তান সরকারের কাজকর্ম সমর্থন না করেও এখানে দেশের একটা ভাবমূর্তি ও পরিচয় তুলে ধরা আমাদের কর্তব্য। আমরা নিয়মিত 'নিউজলেটার' বের করে অকাতরে বিলি করতাম। অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে যুগপৎ বক্তৃতা ও নৈশভোজের আয়োজন করা হতো। বক্তা হতেন মার্কিন নাগরিকরাই, সভাপতি হিসেবে আমার কাজ ছিল তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। সদস্যরা ভোজসভায় যোগ দিলে চাঁদা পাঠিয়ে দিতেন অগ্রিম, না আসতে পারলে তাও আগে থেকে জানিয়ে দিতেন। এক দক্ষিণ ভারতীয় মুসলমান নিয়মিত আসতেন, আরো অনেকের মতো আগাম জানিয়ে দিতেন যে, ধর্মসম্মতভাবে জবাই করা প্রাণীর গোশ্‌ত খাবেন মাত্র। পরে শুনেছিলাম, ভদ্রলোক বিয়ে করেছিলেন এক ব্রাহ্মণীকে, তাঁকে ধর্মান্তরিত না করেই। উভয় পরিবারের কপাটই তাঁদের জন্যে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোক নামাজ-রোজা করতেন, তাঁর স্ত্রীও নাকি পুজো-আচ্চা ছাড়েন নি।

আমাদের এমন সভায় প্রথমে বক্তৃতা দিয়েছিলেন ব্যারি মরিসন ও তাঁর স্ত্রী। তারপরে বলেছিলেন সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক সল ট্যাকস ও তাঁর কন্যা। প্রফেসর ট্যাকস কুমিল্লা পল্লী-উন্নয়ন একাডেমীর, বিশেষ করে, আখতার হামিদ খানের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জায়গায় এই মর্মে একটি স্মৃতিচিহ্ন আছে যে, মানবেতিহাসে প্রথমবারের মতো অ্যাটম চূর্ণ করা হয় এখানে। ট্যাকস বলেছিলেন, কুমিল্লা একাডেমীর সামনে অনুরূপ একটা প্লাক লাগিয়ে লিখে রাখা উচিত : মানবেতিহাসে প্রথমবারের মতো সমবায়-পদ্ধতি সফল হয়েছে এখানে।

অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ইন্টারন্যাশনাল হাউজে আমরা ঈদের জামাতের ব্যবস্থা করতাম।

আমার অনুরোধে মুনীর চৌধুরীর 'দণ্ডধরে'র ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন রওশন জাহান 'দি রিহার্সাল' নামে। ইন্টারন্যাশনাল হাউজের মিলনায়তনে তা মঞ্চস্থ হয়। এডওয়র্ড ফয়, দিবাকরণ, রওশন, মোজাফফর ও একটি মার্কিন মেয়ে অভিনয় করেছিলেন। লোকাভাবে আমাকেও অংশ নিতে হয়েছিল, তবে আমার কণ্ঠস্বর হলের

বেশিদূর শোনা যায় নি। মহড়ায় একদিন অনুপস্থিত থাকায় এডওয়র্ডকে তিরস্কার করায় সে পালটা বলেছিল, এটা ব্রডওয়ে প্রোডাকশন নাকি যে নিয়মিত মহড়া দিতে হবে? পাকিস্তান অ্যাসোসিয়েশনের নাটকে অভিনয় করার জন্যে দিবাকরণকে তার স্বদেশীরা কেউ কেউ তিরস্কার করেছিল—সে অবশ্য তা গায়ে মাখে নি, তবে অস্বস্তিতে যে পড়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

মোজাফফর আর আমি মিলে বিদ্যায়তনিক কাজ করেছিলাম একটা : 'ডক্টরাল রিসার্চ অন পাকিস্তান ডান ইন দি আমেরিকান ইউনিভার্সিটিজ'। ওখানে আমরা অভিসন্দর্ভের এই বিষয়ভিত্তিক তালিকা সাইক্লোস্টাইল করে বিলি করেছিলাম, পরে ঢাকায় তা ছাপা হয়েছিল হাসান জামান-সম্পাদিত *পাকিস্তানি স্টাডিজ* নামে এক সাময়িক প্রকাশনায়।

তবে সবচেয়ে ভালো যে-কাজটা করেছিলাম, সেটা পূর্ব পাকিস্তানে বন্যার জন্যে চাঁদা তোলা। এপ্রিল-মে মাসে বন্যা হয়। খবর পেয়ে আমরা তাৎক্ষণিক চাঁদা তুলতে শুরু করি। ওয়াশিংটনের ভারতীয় দূতাবাসের সৌজন্যে সত্যজিৎ রায়ের *জলসাঘর* আনিয়ে একটা প্রদর্শনী করে টিকিট বিক্রি করি। ভারতীয় দূতাবাস থেকে ছবি আনানোয় কারো কারো আপত্তি ছিল, তবে সভাপতি হিসেবে আমি জোর দেওয়ায় সে-আপত্তি টেকে নি। চাঁদা ও টিকিট বিক্রির অর্থ মিলিয়ে নিট ৪৭৫ ডলার আমরা সংগ্রহ করেছিলাম। সরকারি ত্রাণ তহবিলে চাঁদার টাকা দিতে আমরা অনেকে আপত্তি করায় স্থির হয় যে রেডক্রসে তা পাঠিয়ে দেওয়া হবে। দেখা গেল, রেডক্রস সম্পর্কে অনেক মার্কিন দাতার ধারণা ভালো নয়। তাঁরা বলেন, ওদের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় জনকল্যাণমূলক ব্যয়ের তুলনায় অনেক বেশি। আমরা বোঝালাম, ঢাকার রেডক্রস তেমন নয়। ৪৭৫ ডলারে রেডক্রসের ত্রাণ তহবিলে জমা পড়েছিল প্রায় ২৪০০ টাকা।

ওকলাহোমায় পাকিস্তানি ছাত্র-সম্মেলন হলো ১০ ও ১১ অক্টোবরে। শিকাগো থেকে গেলাম আমরা তিনজন : ডাক্তার জাফর, নূরুল ইসলাম আর আমি। ওকলাহোমায় যাবে বলে ডাক্তার তাড়াহুড়ো করে গাড়ি কিনলো—৯০০ মাইল সে একাই চালিয়ে যাবে। তার পাশে বসে ম্যাপ দেখে নেভিগেশন করলাম আমি। হাইওয়েতে যেখানে ৭০ মাইলের চেয়ে বেশি গতিতে গাড়ি চালানো নিষেধ, জোশের চোটে ডাক্তার ৮০/৯০ মাইল বেগে চালাতে লাগলো। আমি যতো বলি, পুলিশ ধরবে, ডাক্তার বলে, 'কোই তো নেহি হ্যায়, ইয়ার।' রাডারের কথা বলেও তাকে নিবৃত্ত করা গেল না। এক জায়গায় পুলিশ রোড ব্লক দিয়ে আমাদের থামালো এবং চালককে নিয়ে গেল উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে। ১৬ ডলার জরিমানা দিয়ে ছাড়া পেল জাফর। তাতে খুব খুশি। বলে, ৮০ মাইলে গাড়ি চালানো ধরেছে; ৯০ মাইলে যে চালিয়েছি, তা ধরতে পারে নি। বললাম, তাতে জরিমানার অঙ্ক বেশি হতো মাত্র। নূরুল ইসলাম ও আমি পাঁচ ডলার করে দিলাম, ডাক্তারের পকেট থেকে গেল ছয় ডলার।

ওকলাহোমা সম্মেলনে শিকাগোর পাকিস্তান অ্যাসোসিয়েশন শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক সংগঠন হিসেবে পুরস্কৃত হয়। শ্রেষ্ঠ ছাত্রের পুরস্কার পান মোজাফফর ও সফর আলী আকন্দ। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত গোলাম আহমদের কাছ থেকে ট্রফি, প্লাক এবং ১০০ ডলারের চেক নিলাম। মোজাফফরের পুরস্কারটাও নিলাম তাঁর হয়ে। সেখানে

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পালন করলাম মাস্টার অফ সেরেমনির দায়িত্ব।

পাকিস্তান অ্যাসোসিয়েশনে আমার সক্রিয়তা দেখে ব্যারি বলেছিলেন, মনে হয়, তুমি অ্যাসোসিয়েশন করতেই শিকাগো এসেছো। সরকারের প্রতি তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি আমার আনুগত্য ছিল আন্তরিক। বরঞ্চ শফিউল্লাহ ছিল সংশয়বাদী। সে মাঝে মাঝে বলতো, পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্যেই আমরা বোধহয় এক হয়ে থাকতে পারবো না। আমি বলতাম, সমস্যার সমাধান পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই করতে হবে। আর বৈষম্য তো কেবল আঞ্চলিক নয়, শ্রেণীগতও। সেই সমস্যার সমাধান কি হবে আলাদা হয়ে?

৯.

শিকাগোয় যে একেবারে লেখাপড়া না করে কাল কাটাতে পেরেছিলাম, তা নয়। ফেব্রুয়ারি মাসে দুদিন ধার্য হয়েছিল আমার সেমিনার। আমি ইয়ং বেঙ্গল সম্পর্কে আমার প্রাথমিক লেখাটা পড়লাম সেই সেমিনারে। তখন আমার সর্দিজ্বর—খানিকটা ঠাণ্ডা লেগে আর খানিকটা বোধহয় সেমিনার দিতে হবে বলে স্নায়বিক চাপে। প্রবন্ধটা উতরে গেল। আমি খুব হালকা চালে লেখাটা শুরু করেছিলাম—গবেষণামূলক প্রবন্ধ কেউ অমন লঘুভাবে আরম্ভ করে না। সেটা উপভোগ্য হয়েছিল—বিশেষ করে গ্রাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদের কাছে। ওয়েন কিলপ্যাট্রিক তো খুবই উচ্ছ্বসিত : তুমি এই গোমড়ামুখো বয়স্ক গবেষকদের দেখিয়ে দিয়েছ, গবেষণামূলক লেখাও সরস হতে পারে। বেশ কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছিল। সকলের মধ্যে অধ্যাপক বার্নি কোনের সমালোচনা থেকে সারা জীবনের জন্যে একটা শিক্ষা নিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, দেখো, প্রগতিশীল-রক্ষণশীল বলে মানুষজনকে চিহ্নিত করার একটা বিপদ আছে। রাধাকান্ত দেবকে তুমি রক্ষণশীল বলেছো; ঠিকই, রামমোহন-বিদ্যাসাগর-ইয়ং বেঙ্গলের প্রতি তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গি, তাকে রক্ষণশীল বলা চলে। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে কি রক্ষণশীলতার কথা খাটবে? তখন দেখবে নদিয়ার পণ্ডিতদের তুলনায় তিনি অনেক প্রগতিবাদী। সুতরাং উদারনৈতিকতা-রক্ষণশীলতা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার—বিশেষ পরিস্থিতিতে তার প্রয়োগ গ্রাহ্য হতে পারে, একটা বিশেষ প্রশ্নে তা সত্য হতে পারে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে একজন মানুষকে তেমন ছাপ দেওয়া যায় না।

আমার সেমিনারের জন্যে দুদিন ধার্য ছিল : ইয়ং বেঙ্গল তো একদিনই শেষ হয়ে গেল (পরে প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*-এর দ্বাদশ বর্ষে, ১৯৬৬ সালে)। মাঝে একদিনের বিরতি। তারপর আবার আমার পালা। ওই একদিনে আর কী করবো? তার ওপর জ্বরাক্রান্ত। ঠিক করলাম, দোভাষী পুথি সম্পর্কে মৌখিক বক্তৃতা দেবো। তা-ই করলাম। জীবনে অতো খারাপ বক্তৃতা বোধহয় আর দিই নি।

আন্ডারগ্রাজুয়েট ছাত্রদের কাছে বাঙালি মুসলমান সমাজের—মূলত উনিশ-বিশ

শতকের—ভাবধারা নিয়ে একটা বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। সেটাও লিখে নিয়েছিলাম, যদিও পরে কোথাও ছাপাই নি। ক্লাসে ঢুকে আমার চক্ষু চড়ক গাছ। আঠারো-উনিশ বছরের ছেলেরা সামনের আসনে পা তুলে রেখেছে, মেয়েরা ক্যান থেকে কোমল পানীয় খাচ্ছে, ছাত্রেরা তালি দিয়ে শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে লাইটারের জন্যে, সিগারেট ধরাবে বলে। আমার লেখাটা একটু বড়ো হয়ে গিয়েছিল—শেষ করতে করতে ক্লাসের সময়ও শেষ। ফলে, তেমন কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় নি।

এক শিক্ষককে অনেক বলে-কয়ে ধ্রুপদী সাহিত্য-সমালোচনার ক্লাসে বসার অনুমতি পেয়েছিলাম। সপ্তাহে বোধহয় তিন ঘণ্টা ক্লাস হতো। মাঝে মাঝে অন্য কোনো কাজের চাপে কিংবা শিকাগোর বাইরে যাওয়ায় সব ক্লাস করে উঠতে পারি নি। প্লেটোর সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনাটা ঠিকমতো শুনেছিলাম। আমার যদিও পরীক্ষা দেওয়ার কথা নয়, তবু শিক্ষকের বক্তৃতা যথার্থই হৃদয়ঙ্গম করতে ক্লাসের বাইরে বেশ খাটতে হতো।

শিকাগোর বাইরে দুটি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলাম। এপ্রিলে সান ফ্রানসিস্‌কোতে হয়েছিল অ্যাসোসিয়েশন ফর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের বার্ষিক সম্মেলন। ব্যারি আর আমি গিয়েছিলাম প্লেনে করে। আমার টিকিটের খরচা দিয়েছিল আমার বৃত্তিদাতা কনফারেনস বোর্ড। অধিবেশনগুলো হয়েছিল বেশ উপভোগ্য। ১৯৪৭-পূর্ববর্তী বঙ্গদেশ নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছিল। ওই সম্মেলনে গিয়ে পরিচয় হয়েছিল ডেভিড কফের সঙ্গে আর র‍্যাচেল ভন মিটারের সঙ্গে—এই মহিলা বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে অভিসন্দর্ভ লিখে পিএইচ ডি ডিগ্রি পেয়েছিলেন। র‍্যাচেলকে আমার বেশ ভালো লেগেছিল। তখন তিনি কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন—মিশিগানের আন আরবারে কি?—তবে খুব সুখে আছেন বলে মনে হয় নি। পরে তিনি বিয়ে করে হাওয়াইতে চলে যান। ইস্ট-ওয়েস্ট সেন্টারে কিছুকাল বাংলার সংস্কৃতি বিষয়ে পড়িয়ে বিদ্বৎসমাজ থেকে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন।

ওই সম্মেলনের সময়ে কফি-শপে একদিন আমার পাশে এক মার্কিন তরুণী এসে বসলো, তার জ্যাকেটের ল্যাপেলে নাম লেখা Chitra Smith। আমি কৌতূহল দমন না করতে পেরে জিজ্ঞেস করলাম, তার নামের প্রথমাংশের উচ্চারণ কী? সে হেসে বললো, আমি ভুল উচ্চারণ করি, চিট্রা, তবে এটা ভারতীয় শব্দ। আমি বললাম, ওটা সংস্কৃত শব্দ, তবে আমার ভাষারও শব্দ, বাংলা শব্দ। কিন্তু তোমার এমন নাম হলো কেন? তরুণী বললো, আমার বাবা প্রথম যৌবনে টেগোরের চিট্রা [*চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্য] দেখে এতো মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি ঠিক করেছিলেন, যদি কখনো তাঁর কন্যাসন্তান জন্মায়, তাহলে তার নাম রাখবেন চিট্রা। তিনি তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেছেন বটে, কিন্তু সবার কাছে কৈফিয়ত দিতে দিতে আমি অস্থির হয়ে যাই। একটু লজ্জিত হয়ে বললাম, তোমাকে এভাবে বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমা চাই। সে আবার হেসে বললো, ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই। এই নামকরণ আমাকে যে প্রভাবান্বিত করেছে, তা বুঝতেই পারছো, নইলে দক্ষিণ এশীয় বিদ্যাচর্চায় আগ্রহী হতাম না।

শিকাগোর শুভ্র তুষারক্ষেত্র থেকে সান ফ্রানসিসকোর রৌদ্রালোকিত সবুজের বিস্তারে গিয়ে আমার খুব ভালো লেগেছিল। পাহাড়ি অঞ্চলের উঁচু-নিচু পথ, প্রশান্ত

মহাসাগরের জলরাশি আর উপকূলের শোভা সত্যি ছিল মনোরম। সম্মেলনের শেষে ব্যারিকে ছেড়ে একাই এলাম লস এঞ্জেলেসে—আকাশপথে। সেখানে হলিউড প্রভৃতি দ্রষ্টব্য দেখে ট্রেন ধরলাম শিকাগোর উদ্দেশে। দোতলা ট্রেন—নিচের তলায় মালপত্র রাখার ও স্নানের ব্যবস্থা, ওপরতলায় যাত্রীদের আসন—অনেকটা প্লেনের সিটের মতো। রাতে রওনা হয়ে সকালে নেমে পড়লাম গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখতে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কতোটা উঁচুতে উঠেছিলাম, তা বলতে পারবো না, তবে সারাদিন প্রকৃতির এই বিচিত্র লীলাভূমি দেখে সত্যিই অভিভূত হয়েছিলাম। সন্ধ্যায় আবার একই রকম ট্রেন ধরলাম—নতুন করে টিকিট করার ঝামেলা না করে। পরদিন শিকাগো পৌঁছোলাম, বোধহয় সন্ধ্যা নাগাদ। এই ট্রেনযাত্রা ব্যাখ্যার অতীত আনন্দদায়ক হয়েছিল। ট্রেন যে-অঙ্গরাজ্যের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, সে-রাজ্যের আইন মেনে চলছিল। যেমন, সন্ধ্যার আগে কানসাসে প্রকাশ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল, দিনের বেলায় সে-রাজ্যে প্রবেশ করতেই ট্রেনের বার বন্ধ করে দেওয়া হলো। আবার সে-রাজ্যের সীমা যেই পার হলো, বার খুলে গেলো।

আরেকটি সম্মেলনে যাই জুনে—সেটা ছিল শিক্ষাবিষয়ক। গাড়িতে ওকলাহোমা করে যেদিন ভোরবেলায় শিকাগো ফিরে আসি, সেদিন সকালেই ইন্ডিয়ানার ব্লুমিংটনে রওনা হলাম প্লেনে। ওই সম্মেলনে পাকিস্তানের অপর অংশগ্রহণকারী ছিলেন পেশোয়ারের পল্লী উন্নয়ন একাডেমির এক শিক্ষক। সম্মেলনে নানা দেশের মানুষ তো জড়ো হয়েছিলই, উপরন্তু সেসব দেশের যেসব ছেলেমেয়েরা ব্লুমিংটনে পড়াশোনা করতো, তারাও স্বদেশীদের আপ্যায়ন করতে এসে জুটতো। সম্মেলনের এক অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে তার দেশের স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং তাদের সঙ্গে কিছু সময় কাটানো ছিল অনিবার্য।

ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুনরায় পিএইচ ডি ডিগ্রি নিয়ে আমার শিক্ষক মযহারুল ইসলাম সবে বাফেলোতে গেছেন পিস কোরের স্বেচ্ছাসেবকদের বাংলা পড়াতে—সেখান থেকে দেশে ফিরে যাবেন। তাঁরই মতো ফোকলোর-বিষয়ে পড়াশোনা করছেন আশরাফ সিদ্দিকী—তাঁর পিএইচ ডি-র কাজও প্রায় শেষ। পরিবেশের প্রভাবে তিনি ইংরেজিতেও কিছু কবিতা লিখছেন তখন। বাংলায় ইটালিক্স বা বাঁকা হরফের অভাবকে তিনি বিবেচনা করছিলেন গবেষণাকর্মের জন্যে অন্তরায় হিসেবে। তিনি খুব মন খুলে কথা বলতেন। তাঁর কিছু নিচের ক্লাসে পড়তেন আমার সহপাঠী জহুরুল হক। জহুর সপরিবারে ব্লুমিংটনে থাকেন। আগেই ঠিক হয়েছিল, সম্মেলনের শেষে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করবো। তিনি ও তাঁর স্ত্রী খুব যত্ন করলেন। আনুষ্ঠানিক ভোজের আয়োজন এই যত্নের অঙ্গ। একটা হলো আমার উপলক্ষে, আরেকটা বুদ্ধদেব বসুর পরিবারের উপলক্ষে। বুদ্ধদেব বসু অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি হয়ে এসেছিলেন বক্তৃতা দিতে, সঙ্গে ছিলেন প্রতিভা বসু। তাঁদের ছেলে শুদ্ধশীল ইন্ডিয়ানায় পড়তো, সে-উপলক্ষে তাঁরা ব্লুমিংটনে এসেছিলেন। বসু-পরিবারের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। তার একটা ফল পরে পেয়েছিলাম।

শিকাগোতে পাকিস্তান অ্যাসোসিয়েশনের উদ্‌যোগে আমরা রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল সম্পর্কে একটা আলোচনা-সভা ও তাঁদের সংগীতের অনুষ্ঠান করেছিলাম। আমার

নিমন্ত্রণে বুদ্ধদেব বসু ও প্রতিভা বসু তাতে যোগ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের সাহিত্য-বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব, আর প্রতিভা বসু বলেছিলেন নজরুল ইসলাম সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা। প্রতিভা বসুর আলোচনার প্রায় প্রতি বাক্যেই নজরুল সম্পর্কে তাঁর বিশেষ আবেগের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। রাজেশ্বরী দত্ত ওই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-সংগীত গেয়েছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুর পরে তিনি অনুষ্ঠানাদিতে গাইতে চাইতেন না, তবে এক্ষেত্রে আমার অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। পৃথ্বীশ এবং স্থানীয় আরো দু-একজন গান গেয়েছিলেন। নজরুলের গান গাইবার জন্যে আমরা হুসনা বানু খানমকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলাম। তিনি তখন মাস্টার্স ডিগ্রি করছিলেন ম্যাডিসনের ইউনির্ভাসিটি অফ উইসকনসিনে।

বুদ্ধদেব ও প্রতিভা বসুকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন অধ্যাপক ভ্যান বুইটেনেন। আমাকেও তিনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তিনি মহাভারতের ইংরেজি অনুবাদ করছেন জেনে বুদ্ধদেব প্রশ্ন করেছিলেন, অনুবাদ করতে কতোদিন লাগবে? ভ্যান বুইটেনেন জবাব দিয়েছিলেন : দিনে ছ ঘণ্টা, সপ্তাহে পাঁচদিন, বারো বছর।

১০.

আমেরিকার অন্য অঙ্গরাজ্য থেকে অনেক বঙ্গসন্তান কাজে বা বেড়াতে শিকাগোতে আসতেন মাঝে মাঝে। তাঁরা হয় ইন্টারন্যাশনাল হাউজে উঠতেন, নয়তো সেখানে একবার আসতেন স্বদেশীদের খোঁজে। কুলসুম হুদা-রাজিয়া খান আমিনের বড়ো বোন--ফাতেমা রহমান—এসেছিলেন। তাঁর স্বামী ডা. হাফিজুর রহমান ঢাকার সিভিল সার্জন ছিলেন—আমেরিকায় আসতে তখন সিভিল সার্জনের সার্টিফিকেট লাগতো। আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম রাজ্জাক সাহেবের নাম করে, খুব সমাদর পেয়েছিলাম। ফাতেমা আপা অত্যন্ত অমায়িক মানুষ, তাঁর বৃহত্তর পরিবারের সঙ্গে আমার যোগাযোগের কথা জেনে আমাকে বেশ আপন করে নিয়েছিলেন। পরিবার-পরিকল্পনার কাজে তাঁর সঙ্গে শফিউল্লাহ্‌র কী একটা যোগাযোগ ছিল আগে থেকে, ফলে শফিও তাঁর জন্যে অনেক সময় দিয়েছিল। ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর অগ্রজ ইনজিনিয়ার শামসুদ্দোহা এসেছিলেন—অবশ্য তখন তাঁর পরিচয় ছিল কফিলউদ্দীন চৌধুরীর পুত্র হিসেবে। শামসুল আলম এসেছিলেন—তিনি এককালে ঢাকার মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের গ্রন্থাগারে কাজ করতেন, পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক হিসেবে কর্মজীবনে অবসর নেন। ডা. আতিকুর রহমান খান এসেছিলেন—তিনি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আজিজুর রহমান খানের ভাই এবং আমার ছাত্রী ও বেবীর বান্ধবী মোফাবেজার স্বামী। জিল্লুর রহমান খান এলো তার মধ্যম অগ্রজ—পরে বিশ্ববিখ্যাত স্থপতি—ফজলুর রহমান খানের কাছে। তার তখন দুঃসময় যাচ্ছে : কিছুকাল পূর্বে পিতা খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁকে হারিয়েছে, তার অল্পদিন পরেই অগ্রজ মাহবুবুর রহমান খানকে। এম আর খান এককালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রক ছিলেন, তাঁর স্ত্রী রাজিয়া মাহবুব ছিলেন খ্যাতনামা

সাহিত্যিক। পারিবারিক সূত্রে এঁদের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। এফ আর খানের সঙ্গে পরিচয় থাকলেও ঘনিষ্ঠতা ছিল না। আমি শিকাগো পৌঁছোবার পরে মোজাফফর আমাকে দুই বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রথমটা আবদুল্লাহ্ আল-মুতীর : তিনি শিকাগো থেকে শিক্ষা বিষয়ে পিএইচ ডি সমাপন করে তখন দেশে ফিরে আসার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন—তারই মধ্যে ভাবি ও তিনি সমাদর করেছিলেন। দ্বিতীয়টি ছিল এফ আর খানের বাড়ি। পারিবারিক পরিচয়ে তিনি আমাকে চিনলেন, তাঁর মার্কিন স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, সৌজন্যবশত আবার যেতে বললেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ হয় নি—আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের বিষয়েও তাঁর উৎসাহ ছিল না। জিল্লু আসায় একাধিকবার তাঁর বাড়ি যাওয়া হয়েছিল, তবে সব সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি। এই মানুষ যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে উত্তর আমেরিকায় একটা প্রধান ভূমিকা পালন করবেন, তা কে জানতো! শিকাগোতে মুক্তিযুদ্ধের আরেক সৈনিক ছিল শামসুল বারী। আমি থাকতে সে শিকাগোয় পৌঁছায় নি, কিন্তু যাওয়ার উদ্‌যোগ করছিল এবং আমাকে চিঠি লিখে ওখানকার পরিস্থিতির খোঁজখবর নিচ্ছিল। বারী ইংরেজির ছাত্র, আমার শ্যালক আজিজের বন্ধু, আমার অত্যন্ত প্রীতিভাজন। সে গিয়েছিল বাংলা পাঠদানের কর্মসূচিতে যোগ দিতে।

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির দিকে ডিমক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি আরো কিছুকাল শিকাগোয় কাটাতে চাই কিনা। তখন আমার মায়ের জন্যে শোক, আব্বার জন্যে চিন্তা এবং বাড়ির জন্যে টান। বললাম, এই অবস্থায় ফিরে যেতে চাই। উনি বললেন, ইচ্ছে করলে তুমি ঢাকা থেকে একবার ঘুরেও আসতে পারবে; এখনই জবাব দেওয়ার দরকার নেই, ভেবে দেখো। এ-বিষয়ে বেবী ও বড়ো দুলাভাইয়ের সঙ্গে লেখালিখি করে ঠিক করে ফেললাম, বৃত্তির মেয়াদশেষে একেবারেই ফিরে যাবো।

এ-সময়ে বেবীকে লেখা একটা চিঠিতে (৭ জুলাই ১৯৬৫) নিজের সম্পর্কে এবং অন্য দু-একটি বিষয়ে যা লিখেছিলাম, তা এখন বেশ কৌতূহলোদ্দীপক মনে হচ্ছে :

> মতামত প্রকাশের সময় আমরা দুভাবেই প্রভাবান্বিত হই : কি বলছে ও কে বলছে। অনেক সময়ে যে বলে, তাকে পছন্দ না হলে তার বক্তব্যও ভাল লাগে না।
>
> ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে কিছু সাধারণ মাপকাঠি আছে : বাকীটা নির্দ্ধারণ করতে হয় যে করছে, তার বিশেষ অবস্থার দ্বারা; যেভাবে করছে, তার প্রকৃতি দেখে। ভাল মন্দ অনেকখানি relative ব্যাপার—সব সময়ে বাঁধা গৎ খাটে না।

এ কথাগুলো লিখেছিলাম বেবীর প্রশ্নের উত্তরে, আর প্রসঙ্গক্রমে নিজে থেকেই লিখেছিলাম নিজের কথা :

> আমি যুক্তি মেনে চলার চেষ্টা করি—কিন্তু সব সময় পারি না। আমি অযৌক্তিক কাজ কখনো করি নি, একথা বলার উপায় আমার নেই। যুক্তি মেনে মত দিতে গেলেও আমার পক্ষপাত দেখা দিতে পারে। সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। মানুষ

তো মাপবার যন্ত্র নয়। হেরফের হবেই। তবে একটা কথা আমি দাবী করি : গড়পড়তা লোকের তুলনায় আমি কম পক্ষপাতদুষ্ট, কম অযৌক্তিক। আমার চেয়ে পক্ষপাতশূন্য ও যুক্তিবাদী লোক আছেন, তবে এক্ষেত্রে আমার চেয়ে পেছিয়ে আছেন, এমন লোকের সংখ্যা বেশী।

নিজের সম্পর্কে ভিত্তিহীন উচ্চ ধারণা যদি এখানে প্রকাশ পেয়ে থাকে, তাহলে কবুল করবো, এখনো তার থেকে মুক্ত হতে পারি নি।

আমার শিকাগো ছাড়ার সময় হয়ে এলো। একটু ঝামেলা করলো ইন্টারনাল রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট—আমাদের আয়কর বিভাগের সমতুল্য। তাঁদের এত্তেলা পেয়ে গেলাম। আমার আয় ও কর সম্পর্কে জানতে চাইলেন। বললাম, আমার আয় করমুক্ত। তাঁরা প্রমাণ চাইলেন। বৃত্তির চিঠি দেখালাম। তাতে হলো না—আইন দেখতে চান তাঁরা। সৌভাগ্যক্রমে বৃত্তি দেওয়ার সময়ে বৃত্তিদাতারা আইনের কপিও পাঠিয়েছিলেন আমাকে। সেটা বের করে প্রাসঙ্গিক অংশ দেখালাম। কর্তা বললেন, ঠিক আছে, কিন্তু তুমি যে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজেই পুরো সময় নিযুক্ত ছিলে, তা আমরা জানবো কী করে? তোমার তত্ত্বাবধায়ক বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী ছাত্রদের উপদেষ্টার চিঠি আনো। ডিমককে সেকথা জানাতে তিনি রেগে গেলেন। বললেন, 'দিস ইজ শিয়ার হ্যারাসমেন্ট!' চিঠি দিলেন তক্ষুণি। সেটা নিয়ে যথাসময়ে অফিসে হাজির করলাম। তাঁরা যা চেয়েছিলেন, এতো সহজে তা পেয়ে খুশি হলেন বলে মনে হলো না।

যাবার আগে একবার জেনিসিওতে গেলাম দিন দুইয়ের জন্যে—মিলারদের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁরা খুবই খুশি হলেন। আমি যে সত্যি সত্যি নিজের পয়সা খরচ করে যাবো, তা বোধহয় তাঁরা ভাবেন নি।

দেশে ফেরার সময়ে লন্ডনে এক মাস থাকবো—ব্রিটিশ মিউজিয়মে পড়াশোনা করতে। সেখান থেকে ফিরতি পথে দু-একদিন করে প্যারিস (সেখানে আমার বন্ধু ওয়াহিদউল্লাহ্ আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছেন), জেনিভা, রোম ও এথেন্সে থাকার পরিকল্পনা করলাম। সেইভাবে টিকিট চাইলাম ও পেয়ে গেলাম। জার্মানিতে ১৪০০ ডলার পাঠালাম—ফোকসওয়াগেন বিট্‌ল একটা কিনতে। টুকিটাকি অন্যান্য কেনাকাটা চলতে লাগলো। একটা শিপিং ট্রাংক কিনে নিজের জিনিস ভরলাম। আরেকটি শিপিং ট্রাংকে মোজাফফর নিজের জিনিসপত্র ভরে দিলেন। তিনি অচিরেই দেশে ফিরে আসবেন, তবে তাঁর সংগ্রহ অনেক, তাই আমার সঙ্গে কিছু পাঠাবেন। প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে আমারও কিছু বইপত্র তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে এলাম। আমার নামে শিপিং ট্রাংকদুটো জাহাজে আসবে বৃত্তিদাতাদের খরচে।

আমার যাত্রার প্রস্তুতিপর্বেই আমাদের আড্ডা ভাঙতে শুরু করলো। নূরুল ইসলাম ফজলে হোসেনের অ্যাপার্টমেন্টে একটা ঘর নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল হাউজ ছেড়ে গেলেন। শফিউল্লাহ্ কেমন দূরবর্তী হয়ে গেলো—আমি চলে আসার পরপর সেও ইন্টারন্যাশনাল হাউজ ছাড়লো। রয়ে গেলেন মোজাফফর ও রওশন জাহান। এ দুজনকে পরস্পরের আরো কাছাকাছি আনার কিছু চেষ্টা করে এলাম।

বিদায়ের পালা শুরু হলো। তার মানে খাওয়া-দাওয়া। কলকাতার বন্ধুরা

নৈশভোজে আপ্যায়িত করলো—আমার সঙ্গে রওশন জাহান ও মোজাফফরকেও। স্বদেশীয়দের কারো কারো বাড়িতে খেলাম। অনেকে মিলে বড়োরকম চায়ের আসর বসালেন। ডিমক আপ্যায়ন করলেন। আর কতো!

১০ আগস্ট শিকাগো ছাড়লাম। ইন্টারন্যাশনাল হাউজের দোরগোড়ায় বিদায় জানালো টম ও জো। সেখান থেকে বিমানবন্দরে গাড়ি করে সন্ধ্যায় পৌঁছে দিলেন ফজলে হোসেন। তাঁরই গাড়ি করে প্রথমবার শহর থেকে এসেছিলাম সেখানে। এবারে সঙ্গে মোজাফফর, রওশন ও শফিউল্লাহ্। সেখানে নূরুল ইসলাম এসেছেন আলাদা। ডা. রফিউদ্দীন এসেছেন নিজের গাড়িতে (গাড়ি দুর্ঘটনাকবলিত হয়ে কিছুকাল পর তাঁরা স্বামী-স্ত্রী প্রাণ হারান) জহুর হোসেনকে নিয়ে। আর সবাইকে আশ্চর্য করে এসেছে মেরি কারমান লি ও আরেকটি মার্কিন মেয়ে—যার নাম ভালো করে কখনোই জানতাম না। ট্রেন ও বাস মিলিয়ে, মাথাপ্রতি প্রায় আড়াই ডলার করে খরচ করে, ওরা দুজন বিদায় দিতে এসেছে ক্ষণিকের বিদেশি অতিথিকে।

শিকাগোর ও বন্ধুদের মায়া কাটিয়ে বি ও এ সি-র প্লেনে চাপলাম এবং প্লেন ছাড়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়লাম।

১১.

হিথরো বিমানবন্দর থেকে শহরে বি ও এ সি-র টার্মিনালে এসে দেখি, আমার অপেক্ষায় রয়েছেন আমাদের আইন বিভাগের শিক্ষক কে এ এ কামরুদ্দীন। আমার মামাতো ভাই সৈয়দ কামরুজ্জামানের বন্ধু তিনি, আমার স্কুলজীবন থেকে তাঁর সঙ্গে পরিচয়, সেই সূত্রে তাঁর ডাকনাম ধরে কবীর ভাই বলে ডাকি। বন্ধু গিয়াসউদ্দিন আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস হাউজে, কবীর ভাই সেখানকারই বাসিন্দা। ফরাসি ভাষা ভালো করে রপ্ত করতে গিয়াস গেছেন ফ্রান্সে, তাঁর অনুপস্থিতিতে আমার দেখাশোনার ভার চাপিয়ে দিয়েছেন কবীর ভাইয়ের ওপর। টার্মিনালে তিনি তাই আনতে গিয়েছিলেন আমাকে। সেখান থেকে একসঙ্গে আসা গেল ট্যাক্সিতে, ঘরে জিনিসপত্র রেখে তাঁর কামরায় গিয়ে কফি খেলাম। তারপর মুখহাত ধুয়ে কিছু খেয়ে নিলাম—কবীর ভাইই খাওয়ালেন। একটু ঘুমিয়ে নেওয়ার পরে আমার লন্ডনের প্রবাসজীবন শুরু হলো।

আমাদের হাউজটা গ্রেট পোর্টল্যান্ড স্ট্রিট আন্ডারগ্রাউন্ডের ঠিক উলটো দিকে। রিজেন্টস পার্ক খুব কাছে, হেঁটে পৌঁছোনো যায় অক্সফোর্ড সার্কাসে। তবু সপ্তাহ দুই পরে হাউজ সম্পর্কে বেবীকে যা লিখেছিলাম, তা শ্লাঘনীয় নয়।

> ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট্স হাউজটা নতুন বাড়ী। গত বছর মে মাসে এই হোস্টেলটা খুলেছে। পাঁচতলা বাড়ী—ছেলেরা থাকে—basement-এ cafeteria, খেলার জায়গা ইত্যাদি। আমি চারতলায় থাকি (৪০১ নম্বর ঘরে); কবীর ভাই পাঁচতলায়। শিকাগোর হাউজের তুলনায় ঘরটা সামান্য ছোট। ওখানে কাপড় রাখার closet ছিল, ওখানে wardrobe. ওখানে

maid এসে রোজ বিছানা গুছিয়ে দিত—এখানে নিজেকে করতে হয়। ওখানে সপ্তায় দু বার চাদর-বালিশের ওয়াড়-তোয়ালে বদলাত; এখানে তোয়ালে দেয় না, চাদর-ওয়াড় সপ্তায় একদিন বদলায়। গোসলের ব্যবস্থাটা ওখানেই ভাল ছিল। ব্রেকফাস্ট এখানে ভাড়ার মধ্যে ধরা—ঠাণ্ডা, শক্ত টোস্ট; ডিম ভয়ংকর সিদ্ধ; ফলের রস তেতো-তেতো; চা-কফি সাবানপানির মতো। ব্রেকফাস্ট ছাড়া হাউজে একদিনও কিছু খাই নি। ব্রেকফাস্ট সেরে কবীর ভাইয়ের ঘরে এসে কফি খাই ইচ্ছেমতো। তারপর নিজের ঘরে ফিরে তৈরী হয়ে বেরোই।

এই হাউজের আরেক বাসিন্দা ছিলেন সৈয়দ আলী কবীর—আহ্‌মদের অগ্রজ সৈয়দ মুহম্মদ হোসেনের বন্ধু হিসেবে তাঁকে মোটামুটি চিনতাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র ফরহাদ হাসান মোহাম্মদ ফয়সলও এখানে থাকতেন—পড়তেন ইম্পিরিয়াল কলেজে।

লন্ডনে প্রচুর চেনাজানা মানুষ ছিলেন। প্রথমে হালিমাদের কথা বলতে হয়। হালিমা তখন নিউট্রিশনে মাস্টার্স করছে, রফিক ভাই পাকিস্তান হাই কমিশনে এডুকেশন অফিসার। তাঁদের বাড়ি যেতে হতো সপ্তাহে অন্তত একদিন। কোনো কারণে ওঁরা স্বামী-স্ত্রী ঘরে না থাকলে ওঁদের বড়ো ছেলে সাদেক—লন্ডনে স্কুলের ছাত্র তখন, এখন অস্ট্রেলিয়ায় প্রাণরসায়নবিদ—আপ্যায়ন করতো : বাংলা গানের টেপ চালিয়ে দিতো, ফলের রস ঢেলে আনতো গ্লাসে। অতো অল্প বয়সে অতো কর্তব্যনিষ্ঠা আমি কারো মধ্যে দেখি নি। তারপর ছিলেন আমানুল্লাহ্ (অথবা শহীদ) খান ও ফরিদা খান, এককালের ফরিদা বারী মালিক, আমাদের বীথি আপা। সুফী আকবর হোসেন সেই যে গিয়েছিল লন্ডনে, সেখানেই থেকে গেল। তার সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতেন লোকান্তরিত অর্থনীতিবিদ সায়ীদুল হক। সপ্তাহান্তে এমনও হয়েছে, সকলে মিলে দুপুরে একজনের ঘরে, রাতে আরেকজনের ঘরে খেয়ে আমি হাউজে ফিরেছি। ইতিহাসের কে এম মোহসীন আর (এখনকার বিচারপতি) কে এম হাসানও থাকতেন একই বাড়িতে। জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা পিএইচ ডি করছিলেন কিংস কলেজে, ফিন্‌সবারি পার্কের দিকে সপরিবারে থাকতেন। এঁদের সকলের বাড়িতেই এক বা একাধিকবার খাওয়া-দাওয়া করেছি—এই খাওয়ানোই বাঙালির প্রধান আনন্দ। হাউজের সমষ্টিগত রান্নাঘরে প্রায়ই কবীর ভাই সুস্বাদু খিচুড়ি রান্না করতেন তাঁর ও আমার জন্যে। তাঁর পরীক্ষার সময়ে একদিন তাঁর অনুসরণে আমিও খিচুড়ি রেঁধেছিলাম—ওই একবারই।

আমার স্কুলজীবনের সেই অভিভাবক আবিদ হুসেন ছিলেন—অবশ্য তাঁর সময় বেশি কাটতো বুশ হাউজে, বি বি সি-র বাংলা অনুষ্ঠানের নিয়মিত অংশগ্রহণকারী তিনি। ইম্পিরিয়াল কলেজে পদার্থবিজ্ঞান পড়তেন ঢাকার আরো দুজন : শামসুজ্জামান মজুমদার (আমাদের সংস্কৃতি সচিব হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত) আর শামসুদ্দোহা (সরকারি কলেজে ও মিলিটারি একাডেমিতে ছিলেন, এখন অবসর নিয়েছেন)। ছাত্র ইউনিয়নের এককালীন নেতা জিয়াউদ্দীন মাহমুদ ও তার অভিন্নহৃদয় বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগের তরুণ শিক্ষক মোশতাক আহমদকে পাওয়া যেতো স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে, তবে জিয়াউদ্দীন প্রায় রোজই হাউজে আসতেন রাজনীতি চর্চা করতে এবং মার্কসবাদ-সংক্রান্ত সর্বশেষ তাত্ত্বিক আলোচনার বিচার করতে।

ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস হাউজে কলকাতার কয়েকজন ছিলেন, আরো কয়েকজন আসতেন। তাঁদের মধ্যে নিমতলার বিখ্যাত ল (লাহা) পরিবারের একজন, গোপালচন্দ্র ল, আইন পড়ছিলেন এবং সেই সূত্রে কবীর ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল।

আমি লন্ডনে যেতে যেতে সেলিনা মাস্টার্স ডিগ্রি করে দেশে ফিরে গেছেন, সুতরাং তাঁর সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ হয়নি।

কাজ আরম্ভ করলাম ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে, তখন এটা ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে এবং হোয়াইটহলের পাশেই এক বাড়িতে স্বল্পপরিসরে এর অধিষ্ঠান। তার ব্যবস্থাপনা আমার বেশি ভালো লাগে নি।

তবে সেখানে গিয়ে পেয়ে গেলাম শিকাগোর ছাত্রী আইরিন গিলবার্টকে। আমরা কেউ জানতাম না যে, অপরজন একই সময়ে এবং প্রকৃতপক্ষে একই গ্রন্থাগারে কাজ করবো। দেখা হওয়ায় উভয়েই খুশি হলাম। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির ক্যান্টিনে আমরা দুপুরে একসঙ্গে খেতাম। আইরিন ইহুদি এবং খাওয়ার ব্যাপারে তার বাছবিচার ছিল, আমার ছিল না। খেতে নামতে দেরি হয়ে গেলে কিংবা কোনো কারণে ভিড় বেশি হয়ে গেলে পছন্দের অভাবে অনেক সময়ে তার খাওয়া প্রায় হতোই না। আইরিন থাকতো একটি হোটেলে, মাসিক ভাড়ায়। সেখানে গেলে ওর সঙ্গে পথে ঘুরে বেড়াতে হতো, যদিও হাঁটাহাঁটি আমার একেবারে পছন্দ নয়। তবে এই করেই অস্কার ওয়াইল্ড, জর্জ এলিয়ট, কার্লাইল প্রমুখ বিখ্যাত মানুষ যেসব বাড়িতে বাস করতেন, তা দেখা হয়েছিল। বিট্‌লদের গানের সঙ্গে আইরিনই আমার পরিচয় করিয়ে দেয় এবং তাদের চলচ্চিত্র দেখাতে নিয়ে যায়। আমি তাকে মাঝে মাঝে ভারতীয় খাবার খাওয়াতে নিয়ে যেতাম রাতে, সে আমাকে নিয়ে যেতো ইতালীয় কিংবা গ্রিক রেস্টুরেন্টে। প্রথম দফায় তাকে নিয়ে গিয়েছিলাম তসদ্দুক আহমদ ও তাঁর জার্মান স্ত্রীর মালিকানাধীন, গ্যানজেস রেস্টুরেন্টে। তসদ্দুক আহমদ দেশে সাংবাদিকতা করতেন, পঞ্চাশের দশকেই লন্ডনে চলে যান, আর ফেরেন নি। দেশে তিনি বামপন্থী রাজনীতি করতেন, লন্ডনে গিয়ে তাঁর নিজের জেলা সিলেটের কর্মীদের সংগঠিত করতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, পরে মুক্তিযুদ্ধের সময় বড়ো ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমার শ্বশুরের সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব ছিল, যদিও তসদ্দুক ভাই বয়সে তাঁর চেয়ে অনেক ছোটো ছিলেন। আমি আবার তাঁর দুই অনুজ—পরে অ্যাকচুয়ারি এবং ডেল্টা লাইফ ও গ্রীন ডেল্টা ইনসিউরেন্সের প্রতিষ্ঠাতা সাফায়াত আহমদ চৌধুরী, আর সিভিল সার্ভিসের সদস্য ও রাষ্ট্রদূত হেদায়েত আহমদকে ভালো চিনতাম। এসব সূত্রে তসদ্দুক ভাইয়ের সঙ্গে একটা হৃদ্যতা জন্মেছিল অল্পসময়ে। আইরিনকে যখন খাওয়াতে নিয়ে যাই গ্যানজেসে, তখন তিনি সেখানে ছিলেন। ওয়েটার যখন ডেজার্ট নিয়ে এসে বললো, সেটা তসদ্দুক ভাইয়ের সৌজন্যে, আইরিন তখন বিমোহিত হয়ে বললো, লন্ডনে তোমার এতো

খাতির! আমাদের খাওয়ার মাঝখানে কয়েকজন স্বদেশী প্রবেশ করলেন রেস্টুরেন্টে—তাঁদের একজন বেবীর বন্ধু রোজী মজিদ—এখন আমাদের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক রোজী মজিদ আহসান। রোজী স্বভাবতই আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন, আমি আইরিনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলাম। তিনি চলে যেতেই আইরিন বললো, এই তরুণী আজ রাতেই তোমার স্ত্রীকে চিঠি লিখে জানাবে যে, তোমাকে এক শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে নৈশভোজে দেখা গেছে। আমি বললাম, লিখবে না, আর লিখলেও কথাটা মিথ্যে হবে না। আইরিন আমার চোখে চোখ রেখে বললো, আমি কী বলতে চাইছি, তা নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছো। রাতে খেয়েদেয়ে অন্যান্য সময়ের মতো আবার পথে হাঁটা আর আইরিনের উইনডো শপিং করা। এক গাড়ির দোকানের সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে ঘোষণা করলো, যদি কখনো তার সামর্থ্য হয়, তবে এরকম একটা জাগুয়ার কিনবে। তারপর সে আমাকে হাউজে পৌঁছে দিয়ে চলে গেলো। আমিও কখনো কখনো তাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়েছি, তবে কেন জানি না, বেশির ভাগ সময়ে আইরিনই আমাকে এগিয়ে দিয়েছে হাউজ পর্যন্ত।

ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে কাজ করার জন্যে যে-সময়টা রেখেছিলাম, সেটা শেষ হলে কিংবা ওই লাইব্রেরির বার্ষিক বন্ধ হলে ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করতাম। সেখানকার বৃত্তাকার পাঠকক্ষে ঢুকলেই একটা শিহরণ জাগে—পৃথিবীর কতো মনীষী এই ঘরে, হয়তো এই চেয়ারে বসেই, অসাধারণ সব গবেষণা, অমূল্য সব রচনা উপহার দিয়েছেন মানবজাতিকে—সেখানে আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে প্রবেশ করাও একটা সৌভাগ্য। এখন যখন ওই দুই লাইব্রেরি এক হয়ে গেছে এবং উঠে গেছে আধুনিক স্থাপত্যকলার অসামান্য নিদর্শনস্বরূপ অট্টালিকায়, তখন আর সেই অনুভূতি জাগে না।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরি আমাদের হাউজের কাছে হওয়ায় হেঁটেই যাতায়াত করি। সেখানে কাজ করতে আরম্ভ করায় আইরিনের সঙ্গে প্রাত্যহিক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল, তবে এখানে পেলাম আমার শিক্ষক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে। আমরা প্রায় একই সময়ে পাঠকক্ষের বাইরে চলে আসতাম সিগারেট খেতে। ওই অবসরটুকুতে গল্প হতো। প্রায় রোজই একটু একটু করে মিউজিয়মটা দেখার চেষ্টা করতাম, কিন্তু সেই বিপুলা জাদুঘরের কতোটুকুই বা দেখতে পেরেছিলাম! মিউজিয়মের সামনে ছোটো ছোটো রেস্টুরেন্টেই সাধারণত দুপুরের খাওয়া সেরে নিতাম। একবার এমনি এক জায়গায় দাম দিতে বের করেছি দশ পাউন্ডের নোট। ক্যাশে যে-বয়স্ক মহিলা বসেন, তিনি বললেন, ভাঙতি নেই। খেয়েই টাকা ভাঙাতে পারলাম না, কিছু না খেয়ে বা না কিনে টাকা ভাঙাই কোথায়! ভদ্রমহিলা আমাকে চিনতেন না, সাকুল্যে হয়তো সেখানে তখন দু দিন গেছি। উনি বললেন, এর পরে যেদিন মিউজিয়মে আসবে, সেদিন দাম দিয়ে যেয়ো। আমি বললাম, তুমি এই দশ পাউন্ডের নোটটা না হয় জমা রাখতে পারো। মহিলা বললেন, মনে থাকবে না, তাছাড়া তুমি যখন আসবে, তখন আমি নাও থাকতে পারি। তুমিই বরঞ্চ মনে করে দামটা শোধ করে দিও। আমি খুবই অবাক হলাম।

হাউজের কাছাকাছি রেস্টুরেন্টে মাঝে মাঝে একাই খেতে গেছি রাতে। সিনেমা-থিয়েটার খুব বেশি দেখা হয় নি। আগাথা ক্রিস্টির *দি মাউজট্র্যাপ* তখন লন্ডনে চলছে

বৎসরাধিককাল ধরে। টিকিটের জন্যে ফোন করায় জানলাম. আগামী তিন মাসের টিকিট সব বিক্রি হয়ে গেছে। নাটকটা দেখেছিলাম ঠিকই, তবে বছর দশেক পরে।

শিকাগোর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পত্রবিনিময় হয়। মোজাফফর দেশে ফেরার উদ্‌যোগ নিচ্ছেন—আমি থাকতেই হয়তো লন্ডনে পৌঁছোবেন কিংবা এক-আধদিনের জন্যে লন্ডনে হয়তো আমাদের দেখা হবে না। রওশন জাহান লিখছেন, আমার খোঁচা খেয়ে খেয়ে শফিউল্লাহ এমনি অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে খোঁচা না খেয়ে তার আর ভালো লাগছে না। শফিউল্লাহ্ লিখেছে : 'Lounge-এর দিকে তাকালে 'সেই কোণ'টা একেবারে শূন্য মনে হয়। বিশ্বাস করুন, মাঝে মাঝে মনে হয় যে, আপনি এখানেই কোথাও আছেন, খাওয়ার সময় বা Lounge-এ আপনার সাথে দেখা হবে।' মনে পড়ে শিকাগোর দিনগুলিকে, সেখানকার বন্ধুদের। মানুষের বন্ধন বড়ো বিচিত্র।

১২.

লন্ডনে এক সকালে হঠাৎ করে খবরের কাগজে দেখা গেল, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের গত কয়েকদিনের উত্তেজনা পুরোপুরি যুদ্ধের রূপ নিয়েছে। আমার দেশপ্রেমের অভাব ছিল না, কিন্তু শান্তি-আন্দোলন করেছি, যুদ্ধের প্রতি প্রচণ্ড বিরূপতা। তার ওপর, সামরিক শাসক আইয়ুব খানের প্রতি একেবারে আস্থা নেই—তাঁর পক্ষে নিজের ক্ষমতার স্বার্থে সবকিছুই করা সম্ভবপর মনে করি। কাজেই অজানার আশঙ্কায় মনটা ভরে গেল।

সেই সকালবেলায়ই আইরিন এসে হাজির। জানতে চাইলো, এসব কী হচ্ছে। বললাম, তোমার চেয়ে বেশি আমার জানা নেই। তবে এটুকু বুঝতে পারছি যে, ঢাকার সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগ আবার না ঘটা পর্যন্ত আমাকে লন্ডনেই থেকে যেতে হবে। আইরিন বললো, অসুবিধে হলে আমাকে জানাতে ইতস্তত কোরো না।

জিয়াউদ্দীন মাহমুদের মতো কাউকে কাউকে দেখলাম যুদ্ধের ব্যাপারে প্রবল উৎসাহী। তাদের মার্কসবাদী বিশ্লেষণ-অনুযায়ী ভারতকে একটা উচিত শিক্ষা দেওয়া বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক স্বার্থের অনুকূল। এই নিয়ে ভারতীয় ছেলেদের, বিশেষ করে, কলকাতার ছেলেদের সঙ্গে দিনের পর দিন ক্লান্তিহীন তর্ক চলছে। কেননা তাদের মার্কসবাদ আবার অন্যরকম ব্যাখ্যা দেয়। সময় ফুরোয়, তর্ক থামে না। একদিন রাতে আমার ঘরের দরজায় করাঘাত। দেখি, জিয়াউদ্দীন এবং তার পক্ষ-প্রতিপক্ষের কয়েকজন। কী ব্যাপার! তর্ক করতে করতে কখন যে ডাইনিং হলে ঢোকার সময় পার হয়ে গেছে, তা টের পায় নি। এখন নানা ঘরে হানা দিয়ে দুই দল একজোট হয়ে খাদ্যের অন্বেষণে প্রবৃত্ত।

এদিকে লেখাপড়া শিকেয় উঠলো। কোনোদিন লাইব্রেরিতে যাই, কোনোদিন যাই না। সংবাদপত্রের যতগুলি সংস্করণ বের হয়, একটা আমি কিনি, আরেকটা কবীর ভাই। গোপাল ল আসেন কবীর ভাইয়ের ঘরে—তিনিও যুদ্ধবিরোধী; কিন্তু তাঁর

উপস্থিতিতেই আমাদের স্বদেশি জঙ্গিরা একদিন এসে ভারতের মুণ্ডপাত করে চলে গেল, অপরিচিত ব্যক্তিটির পরিচয় না জেনেই। লন্ডনে ফজলে লোহানী প্রমুখ দশ-বারোজন পাকিস্তানি নাগরিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিলেন কাগজে—ব্রিটিশদের অনেকে সেটা পছন্দ করেছিলেন।

হঠাৎ একদিন পথে দেখি, শুদ্ধশীল বসু ডাকছে আমাকে। জানতে চাইলো, ব্যাপার কী। নিউ ইয়র্ক থেকে জাহাজে করে লন্ডনে এসেছে। বিদায়-পর্বে পানাহার কিছু অধিক হয়েছিল, অতএব, কেবিনের দরজা লাগিয়ে যে ঘুমিয়েছে, উঠেছে দু দিন পরে। অন্য যাত্রীদের ভারত-পাকিস্তান নিয়ে কথা বলার কিছু কিছু কানে এলেও ধরে নিয়েছিল, তারা হয়তো তাকে নিয়েই কথা বলছে। তারপর ঘটনা জেনে একেবারে বিমূঢ়। ওদিকে জাহাজ থেকে নামার সময়ে কী এক ঝামেলা হয়েছে কাস্টমসের সঙ্গে—মালপত্র ছাড়াতে এখন রওনা হয়েছে। খবরের কাগজ থেকে যতোদূর জানি, তার সবটা বললাম এবং তার আহ্বানে তার সঙ্গ নিলাম মালপত্র-উদ্ধারে। উদ্ধারশেষে একসঙ্গে এলাম ভারতীয় ওয়াই এম সি এ পর্যন্ত। শুদ্ধশীল বললো, ওয়াই এম সি এ-র ভেতরে না ঢোকাই আমার জন্যে নিরাপদ। বরঞ্চ ফোনে যোগাযোগ করে আমরা পথে কোথাও বা কোনো রেস্টুরেন্টে দেখা করবো। শুদ্ধশীল যে-কদিন লন্ডনে কাটিয়েছে, তার বেশির ভাগ সময় ব্যয় করেছে আমার সঙ্গে এবং আফসোস করেছে ভারতীয় ছাত্রদের যুদ্ধংদেহি মনোভাব নিয়ে, বিস্ময়ের সঙ্গে জানতে চেয়েছে, সবাই কি পাগল হয়ে গেল?

এদিকে নিজের মধ্যে লক্ষ করি, যুদ্ধে পাকিস্তান ভালো করছে বলে খবর পেলে খুশি হই, ভারতীয়রা ভালো করছে জানলে বিষণ্নতায় আচ্ছন্ন হই। ঢাকায় যাওয়ার পথ বন্ধ, চিঠিপত্রও আসছে না। কুক কোম্পানিতে খবর নিই, জাহাজে করে চট্টগ্রাম যাওয়া সম্ভবপর কিনা। তারা জানায়, যুদ্ধকবলিত এলাকায় তাদের যাওয়ার নিয়ম নেই।

পূর্ব সীমান্তে সংঘর্ষের কোনো খবর পাওয়া যায় নি। ঢাকায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর একাধিক হামলার খবর বেরিয়েছে কাগজে। কিন্তু এইসঙ্গে এ-কথাও লেখা হয়েছে যে, এই হামলার উৎস সম্পর্কে সন্দেহ আছে; কেননা ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করার কোনো ঘটনা ঘটে নি, উদ্‌যোগ দেখা যায় নি, প্রস্তুতির কথাও জানা যায় নি।

কলকাতা হয়ে ঢাকার কিছু খবর পৌছোয় জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার কাছে। ঢাকেশ্বরী কটন মিলসের সূর্যকুমার বসুকে জেলে নিয়ে গেছে—অথচ কিছুকাল আগেমাত্র তিনি একটা রাষ্ট্রীয় খেতাব পেয়েছিলেন। ড. এম এন নন্দী চলে গেছেন ভারতে—গ্রেপ্তার হয়েছেন তাঁর কংগ্রেসি ভাই ভবেশ নন্দী। জ্যোতির্ময়বাবুকে তাঁর আত্মীয় ও স্বজনেরা পরামর্শ দিয়েছেন লন্ডন থেকে আর ঢাকায় না ফিরে কলকাতায় চলে যেতে। জ্যোতির্ময়বাবু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, দেশেই ফিরবেন—জেলে যদি যেতে হয়, তাও।

শেখ আবদুল্লাহ্‌র ছেলে তারেক আবদুল্লাহ্ মাঝে মাঝে হাউজে আসে এবং লাউনজে বসে শুধু কাশ্মিরিদের নিয়ে নিচুস্বরে কথাবার্তা বলে চলে যায়। যুদ্ধ সম্পর্কে তারা কেউ প্রকাশ্যে কিছু বলতে চায় না। দুগাল সিং নামে শ্মশ্রু-গুম্ফ-বলয়-হীন এক আধুনিক শিখ যুবক আসে মাঝে মাঝে। অন্য রাজ্যের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের, ছেলেদের সে বলে : যুদ্ধ লেগেছে তো তোমাদের কী হয়েছে, চোটটা তো যাবে

শিখদের ওপর দিয়ে। যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক, তোমরা হয় ট্রাম পোড়াবে নয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে আই এ এস অফিসার হবে! যুদ্ধ হচ্ছে তো তোমরা লাফাচ্ছ কেন?

পরে এই দুগাল সিংয়ের এক গল্প শুনেছিলাম গিয়াসউদ্দিনে কাছে। গাড়িচালকদের জন্যে দুগালের বাঁধা পরামর্শ ছিল এই : যদি দেখো কোনো শিশু রাস্তা পার হচ্ছে, তাহলে তার পেছন দিক দিয়ে যেয়ো, কেননা সে নির্ঘাৎ সামনের দিকে দৌড়োবে; যদি দেখো কোনো বৃদ্ধ রাস্তা পার হচ্ছে, তাহলে তার সামনে দিয়ে যেয়ো, কেননা অনিবার্যভাবে সে পেছন দিকে ফিরে আসবে; আর যদি কোনো শিখকে রাস্তা পার হতে দেখো, তাহলে গাড়ি রিভার্স গিয়ারে দিয়ে পশ্চাদপসরণ করবে, কেননা এরপর সে কী করবে, তা কেউ বলতে পারে না।

এদিকে আমার সঞ্চয় শেষ হয়ে আসছে। ১১ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে লন্ডন ত্যাগ করার পরিকল্পনা করেছিলাম, ৬ তারিখে টিকিট রিকনফার্ম করতে যাবো ভেবেছিলাম—সেদিনই তো যুদ্ধ লেগে গেল। ধরতে গেলে ১৩ তারিখ থেকে বাড়তি থাকছি। চেষ্টা করে হাউজে থেকে যাওয়ার ব্যবস্থা করলাম—কতোদিন যে থাকবো তাও ঠিকমতো বলতে পারি না কর্তৃপক্ষকে। ফেরার পথে অন্যত্র যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করলাম, কিছু কৃচ্ছ্রসাধন করলাম। আইরিন টাকা দিতে চায়, তবে তা আমার প্রয়োজনে, পরিবার-পরিজনের জন্যে উপহার কিনতে নয়। আবিদ হুসেন একদিন নিয়ে গেলেন বি বি সি বাংলা বিভাগে, নাজীর আহমদের কাছে। তিনি জানতে চাইলেন, কী বিষয়ে আমি কথিকা পাঠ করতে পারি। একটু ভেবে বললাম, লন্ডনে বাংলা সাহিত্য-গবেষণার উপকরণ সম্পর্কে। নাজির ভাই বললেন, তোমার একজন শিক্ষককে এ-বিষয়ে বলতে দিই নি, কিন্তু তোমাকে দেবো। দুটো টক লিখবে, রেকর্ড করা হবে একসঙ্গে। তা-ই করলাম, দশ পাউন্ড সম্মানী পেলাম! দশ পাউন্ড তখন এমনিতে কম নয়, আমার জন্যে তো সে-সময়ে আরো বেশি।

১৩.

দুই ছেলে নিয়ে হালিমা ও রফিক ভাই চলে গেছেন শেফিল্ডে। সুতরাং তাঁদের সঙ্গে দুশ্চিন্তা ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ নেই এবং লন্ডনে আমার নিত্যনৈমিত্তিক যাতায়াতের একটি ক্ষেত্র গেছে কমে। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেও তেমন আগ্রহ বোধ করি না, যদিও এরই মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের মুখলেসুর রহমান—সবাই তাঁকে দাদা ডাকেন—বাড়িতে ডেকে খাওয়ান এবং নির্বিকারচিত্তে রঙ্গরসিকতা করে যান—দুইই হয় উপভোগ্য। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মোকাদ্দেসুর রহমান কি দাদার বাড়িতে ছিলেন, না তার আগে যখন কে এম মোহসীনের বাড়িতে যাই (ওঁরা এক বাড়িতে থাকতেন), তখন সেখানে ছিলেন, তা স্পষ্ট মনে পড়ে না।

সেই সময়কার অব্যবস্থিতচিত্ততার মধ্যে সৈয়দ আলী কবীর আমাকে দলভুক্ত করলেন কনট্রাক্ট ব্রিজ খেলতে। খেলাটা শিখতে শুরু করেছিলাম শিকাগোয় :

মোজাফফর, রওশন জাহান, শফিউল্লাহ, আমি; নূরুল ইসলাম ভালোই খেলা জানতেন; টম গ্র্যাপাস ও জো বার্নসকেও আমরা টেনে নিলাম। মাঝে মাঝে অধিক রাত অবধি খেলা হতো, তবে আমাদের কাছে এ ছিল নিছক খেলা, তার অতিরিক্ত কিছু নয়। টমকে একবার বলেছিলাম, ভেবেচিন্তে কল দিও। সে জবাবে বলেছিল, তোমার কি মাথা খারাপ, এই রাত দেড়টার সময়ে কেউ ভাবনাচিন্তা করতে পারে? এই পরিস্থিতিতে আমার তাসখেলা বেশিদূর এগোয়নি। আলী কবীর ভাই ছিলেন সিরিয়স খেলোয়াড়। কবীর ভাই অর্থাৎ কামরুদ্দীন সাহেব ভালো খেলতেন, কিন্তু তাঁর মিতার মতো অতো গুরুত্ব দিয়ে নয়। ওঁদের মাঝে আমি একেবারেই বেমানান। আলী কবীর ভাইয়ের পার্টনার হলে ধমক খেতে খেতে প্রাণান্ত হতো। প্রায়ই ভুল করতাম এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলতেন, 'দিলে তো খেলাটা শেষ করে!' কিংবা 'দিলে তো খেলাটা ওদের হাতে তুলে!' আবার না খেলে যে দর্শক হয়ে থাকবো, তারও উপায় ছিল না, কেননা একসঙ্গে অসময়ে চারজনকে পাওয়া কঠিন হতো। তাস খেলার বিষয়ে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। এক সন্ধ্যায় কবীর ভাই ও আমার দাওয়াত ছিল এক বাড়িতে। সেখানে খেয়েদেয়ে যখন সময় হলো বিদায় নেওয়ার, তখন কবীর ভাইয়ের খেয়াল হলো, হাউজে ঢোকার চাবি নিতে ভুলে গেছেন। রাতে একটা বিশেষ সময়ের পরে আমাদের হাউজের মূল ফটক বন্ধ হয়ে যেতো, বেশি রাতে ফিরতে হলে খাতায় সই করে পেছন দরজার চাবি নিয়ে যেতে হয়, সকালে আবার ফেরত দিতে হয়। এ নিয়ম আমার জানা ছিল না, তবে কবীর ভাই জানতেন, কিন্তু হাউজ থেকে বেরোবার সময়ে তা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। এখন ওই বাড়িতেই রাতটা কাটাতে হবে, কিন্তু সেখানে শয়নের ব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল। কবীর ভাই বললেন, 'তার চেয়ে খাবার টেবিলে বসে ব্রিজ খেলেই রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাক।' তাই হলো। সকালে যখন টিউব চলতে শুরু করেছে, তার পরপরই গৃহস্থের কাছে মাফ চেয়ে আমরা ফিরে এলাম।

শিকাগো থেকে বের হওয়ার সময়ে ভেবেছিলাম, স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে বাংলার প্রফেসর টি ডব্লিউ ক্লার্কের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যাবো। লন্ডনে এসে শুনলাম, তিনি আমেরিকায় গেছেন বক্তৃতা দিতে। ওই স্কুলের ওড়িয়া ও বাংলার লেকচারার ড. জে ভি বোল্টনকেও পাওয়া গেলো না—তিনি গেছেন লন্ডনের বাইরে। সুতরাং সোয়াসে যাওয়ার তেমন প্রয়োজন ছিল না। জুনিয়র কমনরুমে গেলে স্বদেশি অনেকের সঙ্গে দেখা হতো, কিন্তু যুদ্ধ নিয়ে তখন এমন উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছে যে, সেখানে আর যেতে ইচ্ছে করে না।

শিকাগো থেকে যে-খবর পেলাম, তাতেও সেই উত্তাপের আভাস। স্থানীয় টেলিভিশনে যুদ্ধ-পরিস্থিতি নিয়ে বিতর্ক হয়েছে মোজাফফর আর আনন্দরূপ রায়ের। পাকিস্তানি ও ভারতীয়দের মধ্যে যে-মৈত্রী গড়তে আমি চেষ্টা করেছিলাম, সেটা বোধহয় আর অটুট রইলো না।

লন্ডনে পাকিস্তান হাই কমিশন থেকে যুদ্ধের যেটুকু খবর পাই, তার সবটাই যে প্রচারমূলক, তা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। খবরের কাগজ থেকেই অবস্থাটা বুঝে নিতে হয়। চীন ও কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র ছাড়া পাকিস্তান কারো সমর্থন পায়নি। যেসব যুক্তি

দেখিয়ে পাকিস্তান সেনটো ও সিয়াটোর সদস্য হয়েছিল, তার অসারতা খুব প্রবলভাবেই প্রমাণিত হয়ে গেল। ভারতীয়রা যদি ঢাকা শহরে বোমা ফেলে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে পূর্ব পাকিস্তান অরক্ষিত। মনে একটা আশঙ্কা জাগে, সত্যিই যদি তেজগাঁয়ে বোমা পড়ে থাকে, তাহলে আমাদের পাড়ায় অর্থাৎ ঠাটারিবাজারে বোমা পড়তে বাধা কী! তবে একটা বিষয়ে আশ্বস্ত হই, যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি—পূর্ব পাকিস্তানে তো নয়ই।

জাতিসংঘে খুব চেষ্টা চলছে যুদ্ধ থামানোর। সেক্রেটারি-জেনারেল উ থান্ট নিজেই উদ্‌যোগী হয়েছেন দুদেশের সঙ্গে কথা বলতে। শেষ পর্যন্ত ২২ সেপ্টেম্বর ভারত ও পাকিস্তান জাতিসংঘের প্রস্তাব মেনে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হলো। যুদ্ধ-পূর্ববর্তী অবস্থায় দু দেশের সেনাবাহিনী সরিয়ে আনা হবে বলেও মতৈক্য হলো।

যুদ্ধবিরতির কথা শুনে আমি দৌড়োই বিমানের অফিসগুলোয়। জানতে পারি, সপ্তাহখানেক পরে করাচি-ঢাকা বিমানপথে পি আই এ-র বিমান চলবে কলম্বো হয়ে। হত্যে দিতে থাকি পি আই এ অফিসে। তারপর একদিন টিকিট পাই। করাচির পথে রওনা হই ২৯ সেপ্টেম্বরে।

আইরিন হাউজে আসে বিদায় দিতে, চেনাজানাদের মধ্যে আরো কেউ কেউ। কবীর ভাই আসেন হিথরো পর্যন্ত—মালপত্র নিতে যদি বাড়তি ভাড়া লাগে, সেটা দিয়ে দেবেন বলে। ওজন কিছু বেশি হয়েছিল, কিন্তু মাশুল দিতে হয়নি। আইরিন আমার আর্থিক সম্বলের কথা জানতে চেয়েছিল, আমি বলেছিলাম, সাহায্য লাগবে না।

তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের পরিসমাপ্তির কথাও এখানে বলে নিই। দেশে ফিরে এসে ওকে চিঠি দিয়েছিলাম লন্ডনে। জবাবে সে লিখেছিল, তুমি ইংরেজি তো বলো ঠিকই, কিন্তু চিঠিতে এমন 'বাবু ইংলিশ' লেখো কেন? এর জবাবও তো সেই বাবু ইংলিশেই দিতে হবে। তাহলে আর কী করে ওকে লিখি! সে আরো গোটা দুই চিঠি লিখে উত্তর না পেয়ে অবশেষে ক্ষান্তি দিলো।

অনেক বছর পর মোজাফফর আমেরিকায় গিয়ে একবার ফোন করেছিলেন আইরিনকে। সে জানিয়েছিল, সে সি আই এ-তে কাজ নিয়েছে, সুতরাং পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সংযোগ রাখাটা সমীচীন মনে করে না। মোজাফফরকে সে দেখা দেয়নি, আমাদের অন্য কোনো বন্ধুর সঙ্গেও তার যোগাযোগ হয়নি, আমার সঙ্গে তো নয়ই।

১৪.

করাচিতে কিছু সময় অপেক্ষা করা আর প্লেন বদলানো। এবারে করাচি-ঢাকার পথে বাড়তি ওজন নেওয়ার জন্যে পি আই এ অতিরিক্ত ভাড়া দাবি করলো। জানতে চাইলাম, লন্ডন থেকে আসতে বাড়তি ভাড়া লাগেনি, এখন লাগবে কেন? বললো, ওরা কেন ছাড় দিয়েছে, আমরা জানি না, কিন্তু তার সুযোগ শুধু করাচি পর্যন্তই পাওয়া যাবে। তারপরে তো অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট। নতুন করে চেক ইন করতে হবে, সুতরাং

মালপত্রের ওজন অতিরিক্ত হলে ভাড়াও দিতে হবে বেশি। বললাম, লন্ডনে আটকা পড়েছিলাম—দেওয়ার মতো পয়সা হাতে নেই; তবে একান্তই যদি দিতে হয়, তবে ঢাকা পৌঁছে দিতে পারবো; সেক্ষেত্রে আমার বাড়িতে তোমাদের খবর দিতে হবে, ঢাকা বিমানবন্দরে টাকা নিয়ে আসতে। শেষ পর্যন্ত ওরা তাতেই সম্মত হলো।

কলম্বোতে যাত্রাবিরতি হলো। তখন কলম্বো বিমানবন্দরকে আমার কাছে যশোর বিমানবন্দরের সঙ্গে তুলনীয় মনে হয়েছিল। ছোটো একটা টার্মিনাল। রানওয়ের দুপাশে ঘাসের দল অনেকদূর বিস্তৃত। অদূরে নারকেল গাছের সারি। মনে পড়লো, লন্ডনে এক সিংহলী যুবক আমাকে বলেছিল, জানো, আমাদের দেশে নারকেল থেকে তেল বের করে নিয়ে তা দিয়ে রান্না হয়? বলেছিলাম, নারকেলের তেল আমরাও ব্যবহার করি, তবে রান্নায় নয়, চুলে মাখতে; আর নারকেলের দুধ দিয়ে কিছু কিছু পদ আমরা রান্না করে থাকি। সে অবাকদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেছিল, তোমাদের দেশেও নারকেল হয় নাকি? আমি বলেছিলাম, বিস্তর।

কলম্বোতে অনেকক্ষণ কাটাতে হলো। এখানে কিছুই করার নেই, তাই বিরক্তি ধরে গেলো। মনে হলো, দূর থেকে হলেও, যুদ্ধ কম ভোগাচ্ছে না।

ঢাকায় এসে পৌঁছোলাম পয়লা অক্টোবরে, আমাদের বিবাহ-বার্ষিকে। বিমানবন্দরে বাড়ির সবাই এসে হাজির : রুচিকে নিয়ে বেবী, আব্বা, বড়োবু, দুলাভাই, আখতার, আজিজ, এমনকী, কামরু ভাইও। বেবী টাকা নিয়ে গিয়েছিল। তা দিয়ে মালপত্র ছাড়ালাম। বাইরে বেরিয়ে দেখি, কামরু ভাই একটা মাইক্রোবাসের ব্যবস্থা করেছেন, তাতে সবাই এসেছেন বিমানবন্দরে। আমি শিকাগো থাকতেই আব্বা নিজের গাড়ি বেচে দিয়েছিলেন—সেটা অথর্ব হয়ে গিয়েছিল বলে।

মাইক্রোবাসে উঠে রুচিকে কোলে নিলাম। সে অনায়াসে এলো এবং কোলে বসে রইলো। এতোদিনের অদর্শন যে-কোনো আড়াল রচনা করেনি, তাতে অবাক হলাম। আমাদের গন্তব্য আজিমপুর কবরস্থান। মায়ের শেষ শয্যা সেখানেই।

কবরের সামনে দাঁড়িয়ে কান্নাজড়িত গলায় আব্বা ডাকলেন, 'তারার মা [তারা আমার বড়ো বোনের ডাকনাম], দেখো, আনিস এসেছে।'

এবারে আমি না কেঁদে পারলাম না।

বেবী কিছু ফুল নিয়ে গিয়েছিল। মার কবরে সেগুলো ছড়িয়ে দিলাম। সবাই কবর জিয়ারত করলেন। আমিও হাত তুললাম। তারপর মার কবর পেছনে ফেলে হাঁটতে লাগলাম। কবরস্থানের গেট পেরিয়ে মাইক্রোবাসে উঠলাম এবং মাইক্রোবাস থেকে নেমে প্রবেশ করলাম বাড়িতে—যেখানে মা নেই।



সমাজ-সংসার

পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ে ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত একটি প্রচারমূলক অনুষ্ঠান করতেন মুনীর চৌধুরী, রফিকুল ইসলাম ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। দেশে ফিরে আসার পরে এই অনুষ্ঠানের তীব্র সমালোচনা শুনলাম প্রায় সকল বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের কাছে, সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নন—এমন অনেকের কাছেও। কী যে প্রচারিত হয়েছিল সে-অনুষ্ঠানে, তা ভালো করে বুঝে উঠতে পারলাম না, তবে ভারত-বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার একটা অভিযোগ উঠেছিল। এঁদের কারো মধ্যেই সাম্প্রদায়িতার রেশ ছিল না, সুতরাং এমন অভিযোগে আমার বিস্মিত হওয়ারই কথা। যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পরে সরকারি ব্যবস্থায় মুনীর চৌধুরী, রফিকুল ইসলাম ও সৈয়দ শামসুল হক যান পশ্চিম পাকিস্তান-সফরে। তাদের সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতার যে-বিবরণ বেরিয়েছিল একাধিক পত্রপত্রিকায়, তাতে পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা বাহিনীর শৌর্যবীর্যের গাথা রচিত হয়েছিল, এবং সেইসঙ্গে—যুদ্ধ থেমে গেলেও—শত্রুমিত্রভেদমূলক ও একধরনের জঙ্গি মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল। পরের বছর গোড়ার দিকেই এ লেখাগুলি *রণাঙ্গন* (ঢাকা, ১৯৬৬) নামে প্রকাশিত হয়। অনুমান করা হয় যে, বইটি প্রকাশিত হয় সরকারি অর্থেই, তবে এর প্রকাশক হিসেবে নাম ছাপা হয় ইবরাহিম তাহার—ছাত্রজীবনে যিনি ছিলেন ইসলামিক ব্রাদারহুড নামে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা এবং সকল প্রগতিশীল আন্দোলনের বিরোধী। ইবরাহিম তাহা অবশ্য ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন এবং তাঁর মুসলিম লীগবিরোধী ভূমিকার জন্যে একাধিকবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।

যুদ্ধটা যে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে একটা আড়াল রচনা করেছিল, তা বোধহয় সত্যি। হাসান হাফিজুর রহমান *দৈনিক পাকিস্তানে* স্বনামে যে-কলাম লিখতেন, তাতেও সেই সময়ে পাকিস্তান সরকারের প্রচারণাকেই ধ্রুব সত্য বলে গণ্য করা হয়েছিল। তা নিয়ে আমাদের অনেক বন্ধুই অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। আমাদের প্রগতিশীল শিবিরের উর্দু কবি ও সাংবাদিক সালাহ্উদ্দীন মোহাম্মদ অনেক বেশি উগ্রতা প্রকাশ করলেও কেউ তাতে বিশেষ অবাক হন নি, কিন্তু হাসান তো আর সালাহ্উদ্দীন নন, তাই কথা যা হওয়ার তাঁর সম্পর্কেই হলো। পরে এ-নিয়ে হাসানের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তিনি ও তাঁর মতাবলম্বীরা মনে করতেন, দেশ আক্রান্ত হয়েছে, তাই আমাদের কিছু করা কর্তব্য; সরকার যতোই গ্রহণযোগ্যতাহীন হোক না

কেন, এই সংকটকালে তা গৌণ বিবেচিত হওয়া উচিত। তবে আক্রমণটা প্রথমে কোন পক্ষ করেছিল, এ-প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা তখনো হয় নি, তাছাড়া তা গুরুত্বপূর্ণও মনে করা হয় নি।

দেশে ফেরার পর পরই মুনীর চৌধুরী ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের সঙ্গে আমি একটা অনুষ্ঠান করি বেতারে। তাতে কিছু পুরোনো সাহিত্যকর্ম থেকে পাঠ করা হয়েছিল। নির্বাচিত রচনাংশে যুদ্ধের উন্মাদনা ছিল না, ছিল কিছুটা উদ্দীপনা'র ভাব, আর ছিল নিহতদের জন্যে শোক প্রকাশ। মুনীর চৌধুরী বোধহয় ইসমাইল হোসেন সিরাজীর *রায়নন্দিনী* থেকে পাঠ করেছিলেন, আমি পড়েছিলাম নজরুল ইসলামের *যুগবাণী* থেকে। মনিরুজ্জামান কী পড়েছিলেন, তা মনে পড়ে না। তবে ওই যুদ্ধের সময়ে তাঁর লেখা গান 'আমার দেশের মাটির গন্ধে ভরে আছে সারা মন' আবদুল আহাদের সুরে গীত হয়ে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। দেশপ্রেমের গান হিসেবে এটি চিরত্ব লাভ করেছে।

আমি যখন দেশে ফিরলাম, তখন বেতারে-টেলিভিশনে-সংবাদপত্রে সর্বত্র পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বাহিনীর গৌরবগান চলছে। যুদ্ধকালে-অরক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানকে সন্তুষ্ট করতে এবং পাকিস্তানি ঐক্যবোধ জাগাতে বাঙালি যোদ্ধাদের বীরত্বকথা সাড়ম্বরে প্রচারিত হচ্ছিল। এই প্রসঙ্গে খুব বেশি করে শোনা গিয়েছিল স্কোয়াড্রন লিডার আলমের কথা।

তবে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, পাকিস্তান যেহেতু শান্তি মেনে নিয়েছিল. সুতরাং সেনাদের শৌর্যবীর্যের কথা বলাই যথেষ্ট ছিল না, শান্তির পক্ষেও প্রচার চালানো অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। এমনভাবে যুদ্ধের অবসান পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল, কেননা প্রচার-মাধ্যমে পাকিস্তানের সাফল্যের কথা তারা প্রতিদিন জানতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোও ছিল শান্তি-বিরোধী, তবে আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি শান্তিস্থাপনকে স্বাগত জানিয়েছিল। এমন অবস্থায় বেতারে শান্তির পক্ষে প্রচারের জন্যে প্রয়োজন হয়েছিল যুদ্ধসংক্রান্ত প্রচারের সঙ্গে সংস্রবহীন নতুন কণ্ঠের। কর্তৃপক্ষ সৈয়দ আলী আহসান ও আমাকে বাছাই করেন কয়েকটি কথিকা পাঠ করতে। স্থির হয়, অনুষ্ঠানটি হবে আমাদের দুজনের মৌখিক আলোচনার মতো, কিন্তু যথারীতি তা লিখিত হতে হবে এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত হতে হবে। আলী আহসান সাহেবের ধরন-ধারণ সবসময়েই অভিনব ছিল। তাঁর আহ্বানে গেলাম তাঁর আগা মসি লেনের বাড়িতে। তিনি মুখে মুখে খানিক বললেন, আমি তা লিখে নিলাম। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার যা বলার তা তখনই লিখে তাঁকে শোনালাম। তিনি আবার তাঁর কথা বললেন, আমি ফের নিজের কথা লিখলাম। এভাবে আমাদের কথিকা রচিত হয় এবং এমন অনুষ্ঠান বোধহয় আমরা গোটাতিনেক করি। একদিন কোনো এক বৈঠক শেষ হওয়ার আগেই আমি সেখান থেকে বিদায় নিতে চাই বেতার কেন্দ্রে যাবো বলে। সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাজনীতিবিদ মাহমুদ আলী একজন। আমার বৈঠক ত্যাগ করার কারণ জেনে তিনি একটু বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'কীসের যুদ্ধ, কীসের শান্তি! নিজেরা গোলমাল পাকিয়ে এখন শান্তি-শান্তি করছে। আপনারা যে কেন

এসবের মধ্যে জড়ান নিজেদের, তা বুঝতে পারি না।' সরকার যে আমাদের ব্যবহার করছে, সেকথা যে আমি বুঝি নি, তা নয়। তবু ভেবেছিলাম, শান্তির কথা বলে তো ভালোই করছি। হয়তো যুদ্ধের সমর্থনে যাঁরা প্রচার করেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও এ-ধরনের একটা যুক্তি কাজ করেছিল।

আমি দেশের বাইরে থাকতেই রেহমান সোবহানের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'The Nation and its Economy' প্রকাশিত হয়েছিল মীজানুর রহমান শেলী-সম্পাদিত *The Concept of Pakistan* পত্রিকায়। সেখানেই এটা প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল না সেটা পুনর্মুদ্রণ ছিল, তা বলতে পারব না। এই প্রবন্ধেই রেহমান 'এক দেশ, দুই অর্থনীতি'র তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন। উপমা দিয়ে বলেছিলেন, এক কেক দিয়ে যদি দুই পক্ষের না চলে, তবে একটার জায়গায় দুটো কেক ভালো। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের যৌক্তিকতা তাঁর আগে আর কেউ এমনভাবে তুলে ধরতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের কাছে শুনেছি, পাকিস্তানের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লিখিত সমালোচনা করতে গিয়ে ড. আবদুস সাদেক সর্বপ্রথম পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতি ইঙ্গিত করেন, যদিও তা তেমন সাড়া জাগায় নি। ষাট দশকের প্রথমে পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান সাইদ হাসান যখন দুই অঞ্চলের বৈষম্যের প্রশ্নটি উড়িয়ে দেন, তখন কমিশনের সদস্য ড. এম এন হুদা শুধু জোরের সঙ্গে বৈষম্যের কথা বলেন, তাই নয়, বৈষম্য দূর করার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানে অধিক অর্থবিনিয়োগের আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করেছিলেন। তবে রেহমানের প্রবন্ধ যেমন আলোড়ন তুলেছিল, তেমনটি আর দেখা যায় নি। দেশে ফিরে আমি সর্বত্র এ-বিষয়ে আলোচনা শুনতাম এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অপরিহার্যতার কথা বলতে শুনতাম। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা স্বায়ত্তশাসন-সম্পর্কিত ভাবনাকে গতি দিয়েছিল এবং ১৯৬৬ সালে তা ছয় দফা দাবির রূপ নিয়েছিল। কিন্তু সেকথা পরে।

২.

দেশে ফিরে দেখলাম নীলক্ষেতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কলাভবন তৈরির কাজ শেষ হয়ে গেছে, আর আমাদের বিভাগসহ কলা অনুষদের সবকটি বিভাগ শরৎকালীন অবকাশের মধ্যে সেখানে উঠে এসেছে এবং কলাভবনের পূর্বাংশ সমর্পণ করা হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে। পরে টের পেয়েছিলাম যে, স্থানান্তর করার সময়ে আমাদের বিভাগের কিছু পুরোনো রেজিস্টার, ফাইলপত্র এবং ছবি ফেলে দেওয়া হয়। এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন স্তরের জায়গায় চার স্তরের শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা হয়েছে—অর্থাৎ লেকচারার ও রিডারের মাঝামাঝি সিনিয়র লেকচারের স্তরটি সৃষ্ট হয়েছে। যাঁরা লেকচারার পদে কাজ করছিলেন, সম্ভবত তাঁরা সকলেই বিনা আবেদনে ও বিনা সাক্ষাৎকারে সিনিয়র লেকচারার হয়ে গেছেন। আমিও সিনিয়র

লেকচারার হয়েছি এবং প্রায় আমার জন্মকাল থেকে লেকচারার আবদুর রাজ্জাকও আমার সঙ্গে সিনিয়র লেকচারার হয়েছেন।

এদিকে আমার প্রবাসকালে আবু হেনা মোস্তফা কামাল চলে গেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমার ছুটিজনিত শূন্যপদে কাজ করছিলেন মেহেরুন্নেসা খোন্দকার—আমি ফিরে আসায় তাঁর নিয়োগ শেষ হয়ে গেল। তাঁর প্রতি আমাদের বিভাগের আচরণ যেন কেমন হয়েছিল—এরপরে অনেককে লেকচারার-পদে নিয়োগ দেওয়া হলেও মেহেরুন্নেসা আপার বিষয়টি কখনো বিবেচিত হয়নি।

আমার ফিরে আসার কিছুকাল পরে অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই আমাকে বললেন, 'তুমি বিভাগে থাকলে আমি খুশি হবো, তবে পদোন্নতি যদি চাও, তাহলে অন্যত্র চেষ্টা করতে হবে।' আমি কারো কাছে পদোন্নতি চাই নি, তবু একথা কেন তিনি বলেছিলেন, তা জানি না। তবে এ-সম্পর্কে আমার একটা অনুমান আছে মাত্র। ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসের এডুকেশন-কাউন্সেলর ড. সুরত আলী খান দেশে এসে জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প-পরিচালক হয়েছিলেন। মোজাফফর ও আমার সঙ্গে আমেরিকায় পরিচয়সূত্রে তিনি আমাদের প্রতি অনুকূল ছিলেন এবং ভাইস-চান্সেলর নিযুক্ত হলে আমাদের দুজনকে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে নেবেন বলে বোধহয় কাউকে কাউকে জানিয়েছিলেন। এ-সম্পর্কে যদিও আমার সঙ্গে তাঁর কোনো আলাপ হয়নি, কিন্তু কথাটা হাই সাহেবের কানে উঠে থাকতে পারে। তবে তিনি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই অমন একটা কথা বলে দিলেন—সেটা আমার কাছে প্রায় কাজে-জবাব দেওয়ার মতো শোনালো।

এদিকে ঢাকায় ফেরা অবধি ভাবছি, ঠাটারিবাজারে থাকাটা সমস্যাসংকুল হয়ে উঠবে। রুচির জন্যে চলাফেরা করার যে-জায়গা দরকার, তা আমাদের বাড়িতে নেই, পাড়ায়ও নেই। আব্বার স্নেহশীলতা সত্ত্বেও বেবী এ-বাড়িতে কিছুটা সংকুচিত, তাও অনুভব করতে পারি। গাড়ি কিনে ফিরেছি, সেটা এসে পৌঁছোলে আমার মতো আনাড়ির পক্ষে ওই ভিড়ে, ওই সংকীর্ণ রাস্তায় আসা-যাওয়া করা মুশকিল। আব্বার গাড়ি তো চালাতো ড্রাইভার, তাই এই অসুবিধের কথা আব্বাকে বোঝানো যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়িতে থাকলে আমার পক্ষে অনেক সুবিধে হয়; রাজ্জাক সাহেব এসেছেন ফুলার রোডে, তিনিও প্রচণ্ড টানছেন আমাকে ওদিকে। কিন্তু আমি জানি, ডাক্তারি, পেশাগত অন্যান্য কাজ (তিনি পাকিস্তান হোমিওপ্যাথস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হয়েছিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার-গঠিত হোমিওপ্যাথি, ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক বোর্ডের সদস্য ছিলেন) এবং নিজের সত্তা কোনোভাবে ক্ষুণ্ন করে ছেলের সংসারে এসে তিনি থাকবেন না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়-আবাসের কথা সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে আব্বাকে বলি, নিজেদের বাড়ি ভাড়া দিয়ে ওয়ারি অঞ্চলেই কোনো ভাড়াবাড়িতে সবাই উঠে যাই না কেন? আব্বা আমার সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে কোনো আলোচনায় গেলেন না; জানিয়ে দিলেন, নিজের বাড়ি ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না। আমি তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিই। তারপর আব্বা নিজেই একদিন বলেন,—হয়তো বড়োদুলাভাই তাঁকে কিছু বলেছিলেন এ-নিয়ে—'এখানে যদি তোমার অসুবিধে হয়, তাহলে ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টারে যেতে পারো।' আমি উৎসাহিত হয়ে বলি, 'আপনি যাবেন আমাদের সঙ্গে?'

আমার উৎসাহ বোধহয় তাঁকে বেদনার্ত করে। তিনি বলেন, 'তা পরে দেখা যাবে।' আশায় বুক বেঁধে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে দরখাস্ত করি বাসস্থান চেয়ে এবং অচিরেই ২৪ নীলক্ষেতের চারতলায় একটি ফ্ল্যাট পেয়ে যাই। কিন্তু চারতলায় উঠতে আব্বার কষ্ট হবে মনে করে সে-বাসস্থান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। ঠিক সেই মুহূর্তে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ড. হালিমা খাতুন এসে উপস্থিত হন আমাদের ঠাটারিবাজারের বাড়িতে এবং জানতে চান আমি কবে যাচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্ল্যাটে—কারণ যে-ফ্ল্যাটটি আমি পেয়েছি তাতেই তখন উনি থাকেন কন্যা প্রজ্ঞালাবণী এবং বোনপো ওমর হায়াতকে নিয়ে। আমি অকপটেই হালিমা আপাকে জানাই, আমি যাচ্ছি না এবং কেন যাচ্ছি না। হালিমা আপা একটু ভাবেন, তারপর বলেন, ওই বাড়ির দোতলা খালি হওয়ায় তিনি চারতলার বদলে সেটি চেয়েছিলেন। ঠিক আছে, আমি যেন দোতলা চেয়ে আবার চিঠি দিই; তিনিও জানিয়ে দেবেন, চারতলায় থেকে যেতে তাঁর আপত্তি নেই। কষ্ট একটু হবে তাঁর, তবে ও-বাড়িতে আমি গেলে তিনি খুশি হবেন এবং তাই কষ্টটা হাসিমুখে স্বীকার করবেন। আমি অভিভূত হই তাঁর কথায়। চিঠি লেখা হয় এবং দোতলায় ডি ফ্ল্যাটটা আমার ভাগ্যে জোটে।

বেবীকে নিয়ে যেদিন বাসা দেখতে গেলাম, ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসের একেবারে শেষে—সেদিন প্রথম দেখা হলো তিনতলায় ঠিক আমার ওপরের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা ড. মাহফুজুল হকের সঙ্গে। তিনি ছাত্রজীবনে আমার বছরতিনেক ওপরে পড়তেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে, তমদ্দুন মজলিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং নানারকম সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এম এ পাশ করার পরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন লেকচারার হিসেবে এবং সে-সময়ে তাঁর সঙ্গে একই মঞ্চে আমরা পরস্পরবিরোধী অবস্থান থেকে সংস্কৃতিবিষয়ে তর্কও করেছি। তারপর তিনি চলে গিয়েছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং আমি সেখানে যেতে যেতে ফিরেও আসেন স্বদেশে। নীলক্ষেতে আমি তাঁর নিচের ফ্ল্যাটে যাচ্ছি জেনে সত্যিই তিনি খুব খুশি হন এবং স্বেচ্ছায় আমার ফ্ল্যাটের তদারকি করার প্রস্তাব দিয়ে চাবি চেয়ে নেন। দু-একদিনের মধ্যেই তাঁর ঢাকার বাইরে যাওয়ার কথা ছিল। ফিরে এলে আরো কথা হবে বলে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিই। ২ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুরের কাছে এক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। ড. মহিউদ্দিন আহমেদ নামে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রাক্তন শিক্ষক, তখন অস্ট্রেলিয়ার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি পড়াতেন, তিনিও ওই দুর্ঘটনায় নিহত হন। মাহফুজুল হকের মৃত্যুর খবর পেয়ে বেবী ও আমি যখন সে-বাসায় গেলাম, তখন তাঁর স্ত্রী আনোয়ারা ওরফে খুকু আমাদের দেখে এই বলে বিলাপ করতে থাকেন যে, আমরা ওই বাড়িতে আসবো জেনে মাহফুজুল হক কত খুশি হয়েছিলেন অথচ আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে ওঠাবসার ইচ্ছে তাঁর পূরণ হলো না।

নীলক্ষেতের বাসায় আমরা প্রবেশ করার ঠিক আগে আরেক দুর্ঘটনা ঘটল ড. আবু মাহমুদকে নিয়ে। তিনি যখন এ এন এম মাহমুদ নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁর তখনকার কথা আগে বলেছি। এই কঠোর কমিউনিস্ট-বিরোধী মানুষটি আমেরিকা থেকে পিএইচ ডি ডিগ্রি এবং মার্কসবাদে দীক্ষা নিয়ে ফিরে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর স্বভাবে

কিছু উৎকেন্দ্রিকতা ছিল, তবে দেশে ফিরে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানকৃত বৈষম্য সম্পর্কে লেখালিখি করে তিনি বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এবং সাধারণভাবে শিক্ষিত মানুষের খুব প্রিয় হয়ে ওঠেন। এমন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ ড. কে টি হোসেনকে অর্থনীতি বিভাগের অধ্যক্ষপদে নিয়োগদান করেন। মাহমুদ দাবি করেন, কর্মক্ষেত্রে তিনি জ্যেষ্ঠ, তাই অধ্যক্ষতা তাঁরই প্রাপ্য। কর্তৃপক্ষ তাঁর দাবি প্রত্যাখ্যান করলে তিনি ঢাকা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। এরপর কোনো একটি আদেশকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তিনি আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেন। মূল মামলার শুনানি হওয়ার আগে আদালত অবমাননার মামলার রায় হয় ১৫ ফেব্রুয়ারিতে এবং প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মুরশেদ ও অপর বিচারপতি বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষকে তিরস্কার করেন তীব্র ভাষায়। উৎফুল্ল আবু মাহমুদ হাইকোর্ট থেকে বেরিয়ে এলে সরকার-সমর্থক ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশনের (এন এস এফ) গুন্ডারা তাঁকে নির্মমভাবে প্রহার করে। খবর পেয়ে আমরা তাঁকে হাসপাতালে দেখতে যাই এবং ফিরে এসে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে জমায়েত হয়ে শিক্ষকদের সভা করি। মনে হয়, রেহমান সোবহান তাতে সভাপতিত্ব করেন। একেকজন যখন ঘটনার নিন্দা করছিলেন, তখন গণিত বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এস এম আজিজুল হক বলেন, ঘটনার পরে কিছুসংখ্যক ছাত্র ভাইস-চান্সেলরের বাসভবনের সামনে জড়ো হয়ে ইট-পাটকেল ছুঁড়ে বাড়ির দরজা-জানালার কাচ ভেঙেছে। তারও নিন্দা করা হোক (ভাইস-চ্যান্সেলর ড. মুহাম্মদ ওসমান গণিকে এন এস এফের প্রশ্রয়দাতা এবং প্রাদেশিক গভর্নর আবদুল মোনায়েম খানকে তাঁর পৃষ্ঠপোষক মনে করা হতো)। এই প্রস্তাবে সভায় বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও ইকবাল হলের প্রোভোস্ট আবদুল মতিন চৌধুরী তখনই উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'উই হ্যাভ নট অ্যাসেম্বলড হেয়ার টু উইপ ওভার ব্রোকেন উইনডো পেইনস।' মতিন সাহেবের কথায় উত্তেজনা বাড়লো, অনেকে অবাকও হলেন, কেননা তখন তিনি ভাইস-চান্সেলরের দলভুক্ত বিবেচিত হতেন। উত্তেজনা প্রশমন করতে সভাপতির একটু বেগ পেত হলো, তবে শেষ পর্যন্ত নিন্দা-প্রস্তাব গৃহীত হলো এবং স্থির হলো যে, ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে শিক্ষকদের এক প্রতিনিধি দল ভাইস-চান্সেলরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবে প্রতিবাদ জানাতে। নিন্দা প্রস্তাব নেওয়া হয় ইংরেজিতে, ড. খান সারওয়ার মুরশিদ সেই ইংরেজি শুদ্ধ করার ভার নেন এবং আমাকে বলা হলো তার বাংলা ভাষ্য তৈরি করে দিতে। এর মধ্যে সংবাদপত্রের আলোকচিত্রীরা এসে সভার ছবি তুলে নিয়েছেন, সাংবাদিকরা প্রস্তাবের কপি দাবি করছেন। আমার বাংলা ভাষ্য দু-একজন প্রবীণ শিক্ষককে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে বাংলা কাগজের প্রতিনিধিদের হাতে দিলাম। তখনো ড. মুরশিদ তাঁর সংশোধিত ইংরেজি টাইপ-করা কপির ভুল নিরীক্ষা করছেন। কিছুটা অস্থির হয়ে, কিছুটা ড. মুরশিদের বিশুদ্ধতার প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা লক্ষ করে এক তরুণ সাংবাদিক আমাকে বললো, সার্‌, ড. মুরশিদ যদি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক হতেন, তাহলে সে-পত্রিকা সপ্তাহে একদিনের বেশি বেরোতে পারতো না।

আমরা ভাইস-চান্সেলের কাছে গেলাম। তাঁর মুখ থমথমে, কিন্তু সৌজন্যের অভাব ছিল না। আমরা তাঁকে জানিয়েই গিয়েছিলাম। বাসভবনের একতলার অফিসে তিনি পর্যাপ্ত চেয়ার সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। যা বলার ছিল, প্রবীণ শিক্ষকরা তা বললেন। ভাইস-চান্সেলর শুনলেন এবং আমাদের প্রত্যেকের দিকে একবার দৃষ্টি দিলেন। বললেন, পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শনাক্ত করা গেলে ও তাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকলে তার বিরুদ্ধে যথাবিধি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মাহমুদ সাহেব আহত হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন বলে মনে পড়ে না, তবে ভাঙা শার্সির কথা একবারও বলেননি।

এর দু-একদিনের মধ্যেই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্ল্যাটে উঠে আসি। আমার তেমন জিনিসপত্র ছিল না। একটা ঠেলাগাড়িতেই সব এঁটে গিয়েছিল। বেবী, রুচি ও আমি কিছু জিনিস নিয়ে দুই রিকশায় গেলাম। ঠেলাগাড়ির জিনিসপত্র নামাতে সাহায্য করলেন আমাদের বিভাগের রফিকুল ইসলাম। তিনি এর মধ্যে ২৫ নম্বর বাড়ি থেকে উঠে এসেছেন ২৪-এর তিন তলায়—মাহফুজুল হকের ফ্ল্যাটের মুখোমুখি।

নীলক্ষেতে একটু গুছিয়ে নিয়ে আবার ঠাটারিবাজারে গেলাম। আব্বা ঘরের আলো নিভিয়ে শুয়ে শুয়ে তামাক খাচ্ছেন। অন্ধকারের মধ্যেই জানতে চাইলেন, কোনো অসুবিধে হয়েছে কিনা। তারপর আবার তাঁর আলবোলার শব্দ। একটু পরে তিনি উঠে ঘরের বাতি জ্বালালেন। তোষকের নিচ থেকে একশ টাকার দুটি নোট বের করে আমার সামনে ধরে বললেন, 'নাও।'

তারপর বাতি নিভিয়ে দিলেন।

৩.

সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সেই কসিগিনের দৌত্যে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কয়েকদিন ধরে দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে আলোচনার পর ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি তাসখন্দে এক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে শাস্ত্রী মারা যান। তাঁর কফিন-বহনকারীদের মধ্যে আইয়ুবও ছিলেন।

তাসখন্দ-ঘোষণায় পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর যে সায় ছিল না, তা নানাভাবে জানা গিয়েছিল (মাসকয়েকের মধ্যেই তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন)। এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে সাধারণভাবে মনে করা হয়েছিল যে, এই ঘোষণায় পাকিস্তানের স্বার্থ বিকিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে এ-নিয়ে তুমুল বিক্ষোভ হয় এবং বিক্ষোভ-প্রদর্শনকালে পুলিশের গুলিচালনায় দু-তিনজন নিহত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে কাউনসিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলাম তাসখন্দ-ঘোষণার বিরোধিতা করে, বড়ো রাজনৈতিক দলগুলো তাকে স্বাগত জানায়। ফেব্রুয়ারির গোড়ায় শেখ মুজিব ছয় দফা শাসনতান্ত্রিক দাবি পেশ করেন।

তাসখন্দ-চুক্তি আলোচনার জন্যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকাংশ লাহোরে এক সম্মেলনে মিলিত হয়। তারা তাসখন্দ ঘোষণাকে নিন্দা করে প্রস্তাব নেয়। শেখ মুজিব এ-প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। অপরপক্ষে এই সম্মেলনে তিনি ছয় দফা সম্পর্কে আলোচনা করতে চাইলে অন্যান্য বিরোধী দল তাতে রাজি হয়নি।

প্রথমে কাউনসিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলাম, তারপরে, বোধহয় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক ওসমানী প্রকাশ্যে ছয় দফার বিরোধিতা করেন এবং অচিরে স্বয়ং আইয়ুব খান এর বিরুদ্ধাচরণ করতে মাঠে নামেন। তাঁর মতে, এই প্রস্তাব দেশের ঐক্য বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র মাত্র এবং তিনি ইঙ্গিত করেন যে, ভারতের প্ররোচনায় তা উত্থাপিত হয়েছে। আওয়ামী লীগের কাউনসিল-অধিবেশনে ছয় দফা প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরে শেখ মুজিব এর সমর্থনে বিভিন্ন জেলা শহরে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। প্রায় প্রত্যেক জায়গায় তিনি গ্রেপ্তার হন, জামিনে ছাড়া পান, আবার বক্তৃতা দেন, আবার গ্রেপ্তার হন, আবার জামিন পান। মে মাসে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে শেখ মুজিব ও তাজউদ্দীন আহমদকে গ্রেপ্তার করা হয়—এবারে আর জামিনের প্রশ্ন রইলো না। ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট পাকিস্তানের জন্যে ফেডারেল পদ্ধতির সরকার এবং পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবি করে। মওলানা ভাসানী স্বায়ত্তশাসনের দাবি সমর্থন করেন, তবে দেশের সংহতিবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র প্রতিরোধের সংকল্প ব্যক্ত করেন। সবার কাছেই মনে হয়েছিল, ছয় দফাকেই তিনি এই ষড়যন্ত্রের প্রকাশ বলে গণ্য করছেন।

ছয় দফার প্রণেতা কে, এই নিয়ে অনেক জল্পনা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেছিলেন, সিভিল সার্ভিসের কয়েকজন সদস্য এটা তৈরি করে শেখ মুজিবকে দিয়েছিলেন; কেউ কেউ সে-কৃতিত্ব কিংবা দোষ দিয়েছিলেন কয়েকজন সাংবাদিককে। তাঁদের পেছনে কোন শক্তি কাজ করছিল, সে-বিচারও হয়েছিল। প্রথমে উঠেছিল ভারতের নাম। কিন্তু পাকিস্তান হওয়া অবধি তো দেশের বহু গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল ভারতের প্ররোচনা বলে। পরে বড়ো করে যে নাম উঠলো, তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের বন্ধুত্ব এবং ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্বের কারণে পাকিস্তান ভাঙার উদ্‌যোগ নিচ্ছে মার্কিনরা, এমন একটা ধারণা খুব প্রচলিত হয়েছিল। আমরা যারা একটু বামঘেঁষা ছিলাম, তারা এই ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছিলাম। ফলে, ফেডারেল পদ্ধতি ও স্বায়ত্তশাসনের পক্ষপাতী হলেও ছয় দফাকে আমরা তখন গ্রহণ করিনি। আমরা আরো শুনেছিলাম যে, পাকিস্তান ভাঙতে পারলে পূর্ব পাকিস্তানে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি করতে দেওয়া হবে; সুতরাং এ কাজে মার্কিনদের উৎসাহ তো থাকবেই। যদি প্রশ্ন উঠতো যে, পাকিস্তান তো সেনটো-সিয়াটোর সদস্য, তাহলে জবাব পাওয়া যেতো যে, পাক-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ওসব জোটের অসারতা প্রমাণ হয়ে গেছে এবং পাকিস্তান যে-কোনো সময় তার থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। পাকিস্তান কখনোই এসব সামরিক জোট ছাড়েনি, তবে আইয়ুব খানের 'ফ্রেন্ডস নট মাস্টার্সে'র প্রচারিত নীতি কিছুটা এ-ধারণাকে পুষ্ট করেছিল।

আমাদের মতো লোকের হয়েছিল বিপদ। পাকিস্তানে সামরিক শাসন ও শাসকদের কাজকর্ম আমরা বরদাশত করতে পারছিলাম না। কিন্তু তার বিরুদ্ধে ছয় দফার পক্ষেও

যেতে পারছিলাম না। শেখ মুজিব ও তাঁর সহকর্মীদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ৭ জুন প্রদেশব্যাপী হরতাল ও বিক্ষোভ পালিত হয়। পুলিশের গুলিচালনায় সেদিন ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে একাধিক বিক্ষোভকারী নিহত হয়। জানা যায়, সংবাদপত্রের ওপরে সরকার কঠোর সেনসরশিপ আরোপ করেছে। মানিক মিয়া গ্রেপ্তার হলেন, নিউ নেশন প্রেস বাজেয়াপ্ত হলো, *ইত্তেফাক* নিষিদ্ধ হলো, নিউ নেশন প্রেসে যে-সাপ্তাহিক *ঢাকা টাইমস* ছাপা হচ্ছিল, প্রেস বাজেয়াপ্ত হওয়ায় তা-ও বন্ধ হয়ে গেলো। *সংবাদের* ডিক্লারেশন নিয়ে সরকার কী একটা উটকো ঝামেলা বাধালো, ফলে তার প্রকাশও স্থগিত হয়ে রইলো। সাংবাদিক ও সংবাদপত্র-কর্মচারীরা এর প্রতিবাদ করলো বটে, কিন্তু অন্যান্য বিরোধী দল তা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুললো না। ফলে নাগরিক অধিকার-রক্ষার একমাত্র ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ালো হাইকোর্ট—সরকারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেখানে একের পর এক মামলা রুজু হতে থাকে। কিন্তু নিপীড়নমূলক আইন যেখানে সিদ্ধ, আদালত সেখানে কতোদূর উপশমের ব্যবস্থা করতে পারে! হাইকোর্টে শেখ মুজিব ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার আটকাদেশ বৈধ ঘোষিত হয়, মানিক মিয়ার ক্ষেত্রেও একই রায় হয়, তবে নিউ নেশন প্রেসের বাজেয়াপ্তি অবৈধ নির্ণীত হয় এবং *সংবাদকে* নতুন ডিক্লারেশন দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এরই মধ্যে আবার আওয়ামী লীগ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় : মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের নেতৃত্বে একটি দল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম ও পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের সঙ্গে মিলে যোগ দেয় পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টে (পিডিএম)। অপর অংশটি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ছয় দফা আঁকড়ে থাকে।

এদিকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্তর্দ্বন্দ্বে বামপন্থীরা মস্কো ও পিকিংয়ের পক্ষ অবলম্বন করে বিভক্ত হতে শুরু করে। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টিও এই তত্ত্বগত বিভক্তির শিকার হয়। ১৯৬৫ সালেই যথাক্রমে মতিয়া চৌধুরী ও রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে ভাগ হয়ে যায় ছাত্র ইউনিয়ন। তার ঢেউ দেরিতে হলেও অনিবার্যভাবে লাগে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে এবং অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বে দুটি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি আত্মপ্রকাশ করে ১৯৬৮ সালে। মওলানা সাহেব সমাজতন্ত্রের পক্ষে বলতে গিয়ে হঠাৎ করে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীন বাংলা গঠনের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করেন।

৪.

নীলক্ষেতে আসার সময়ে শয়নকক্ষ ও পাঠকক্ষের আসবাব নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু বসার ঘরের ও খাওয়ার জায়গার উপযুক্ত তেমন কিছু ছিল না। এক সকালে বেবীর এক ফুপাতো বোনের স্বামী, প্রকৌশলী আমানউল্লাহ, সেখানে এসে খুব কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, এক বছরের জন্যে তিনি আমেরিকা যাচ্ছেন, আমার বাসায় কি কিছু আসবাবপত্র রেখে যেতে পারবেন? আমি বললাম, এক্ষণি নিয়ে আসেন। তিনি হেসে বেরিয়ে গেলেন এবং খানিক পরে এক ঢাউস ডাইনিং টেবিল, তার সঙ্গে মানানসই

চেয়ার এবং স্প্রিঙের একটা সোফা সেট নিয়ে এলেন এবং আমাদের কষ্ট দিচ্ছেন বলে বারবার দুঃখপ্রকাশ করতে থাকলেন। আমি যতোই বলি, এতে আমার দুঃখ লাঘব হয়েছে, তিনি তা আমার বিনয়জনিত উক্তি বলে মনে করে কেবলই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে থাকেন। বড়ো সোফাটা রাজ্জাক সাহেবের বিশ্রামের এবং রুচি ও তার বন্ধুদের লাফানোর প্রশস্ত ক্ষেত্র রচনা করেছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়িতে আসামাত্র রাজ্জাক সাহেব বেবীকে ও আমাকে নিজের পক্ষপুটে গ্রহণ করলেন। ১৯৫০ সালের পরে আমি প্রকৃতপক্ষে বাজার করিনি, বেবীর রন্ধননৈপুণ্য ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। সার ঠিক করলেন, বেবীকে রান্না এবং আমাকে বাজার করা শেখাবেন। আসলে আমি থলি হাতে তাঁর সঙ্গে মৌলভীবাজারে যেতাম—কেনাকাটা যা করার তিনিই করতেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, প্রথমে তরিতরকারি-মশলাপাতি কিনে, তারপর যে-পয়সা হাতে থাকবে, তা দিয়ে মাছ-মাংস কিনতে হবে। কারণটা আমি ভালো করে বুঝিনি, তাঁর পিছু পিছু যেতে তা বোঝার দরকারও ছিল না। মাছ ও মাংস বিক্রেতাদের সঙ্গে, দেখলাম, রাজ্জাক সাহেবের বেজায় খাতির। তিনি বললেন, ওরাই তাঁর আসল বন্ধু এবং শিক্ষকও। একবার তিনি নালিশ করেছিলেন যে, মাছের দাম বেশি। মেছুয়া তাঁকে পালটা জিজ্ঞেস করেছিল, বিশ বছর আগে ঢাকার লোকসংখ্যা কতো ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবাস কটি ছিল এবং মাছ-মাংসের চাহিদা কেমন ছিল আর এসব এখনই বা কেমন। রাজ্জাক সাহেব বললেন, অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে যা তাঁর জানার কথা ছিল, তাই তিনি শিখলেন মেছুয়ার কাছে। আমাকে বাজার করতে শেখানোর আশা অচিরেই তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন, তারপর থেকে তিনি একাই নিজের বাজারের সঙ্গে আমার বাজারটাও করে আনতেন।

বেবীকে রান্না শেখানোর ক্ষেত্রে বরঞ্চ তিনি সফল হয়েছিলেন। তবে একেবারে প্রথমে সারের ক্ষমার অযোগ্য একটা কাজ করে ফেলেছিল বেবী। রোস্টের জন্যে গোমাংসের একটা বড়ো খণ্ড এনে রাজ্জাক সাহেব সেটা তাকে রাখতে দিয়েছিলেন। সারকে সাহায্যে করার অভিপ্রায়ে বেবী তা পরিষ্কার করে ছোটো ছোটো টুকরো করে কেটে রেখেছিল। পরে রাজ্জাক সাহেব রোস্ট করবেন বলে গোশ্‌তের খোঁজ করতে গিয়ে তার এই দশা দেখে খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে বেবীকে বলেছিলেন, 'তুমি মানুষ খুন করতে পারো।' তবু যে তিনি ধৈর্য হারাননি, এটা আশ্চর্য হওয়ার মতো। আমার শাশুড়ি একদিন তাঁকে বলেছিলেন, 'মেয়েকে আমি রান্না শেখাতে পারিনি, আপনি শেখালেন।' রাজ্জাক সাহেব বেবীকে মিসেস বিটনের রান্নার বই এনে দিয়েছিলেন এবং গরুর অ্যানাটমি শেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। রান্নার বিষয়ে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। শাহেদ কামাল একদিন তাঁর সামনেই আমাকে বলেছিল, 'সারের মাংসে ভালো স্টু হয়।' শুনে তিনি খুব খুশি হয়ে জানতে চাইলেন, ছেলেটি কে। বললাম, বেগম সুফিয়া কামালের ছেলে, তিনি আরো খুশি হয়ে বললেন, 'রান্না বোঝে।'

ছোটোদের সঙ্গে রাজ্জাক সাহেবের সহজেই বন্ধুত্ব হয়ে যেতো। কুলসুম হুদা একবার তাঁকে বলেছিলেন, 'ওদের বুদ্ধিশুদ্ধি হয়ে গেলে আর আপনার সঙ্গে খাতির থাকে না।' রুচির সঙ্গে সারের ঘনিষ্ঠতা এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে, একদিন শুনলাম,

তাঁর আগমনের আওয়াজ পেয়ে রুচি শোবার ঘর থেকে ডাকছে, 'সার্, এখানে এসে আমার পা টিপে দাও।' সার্ সে হুকুম পালন করতে গেলেন বিনা বাক্যব্যয়ে।

রাজ্জাক সাহেব রোজ আসতেন, মুনীর চৌধুরী প্রায় প্রত্যহই। তাঁর মেজো ছেলে মিশুককে সকালবেলায় ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলে পৌছে দিয়ে আমার বাসায় আসতেন মুনীর চৌধুরী। কোনোদিন সদ্য উঠেছি ঘুম থেকে, কোনোদিন ঘুম ভেঙেছে তাঁর ডাকে। খাবার টেবিলে বসে রুটিতে মাখন লাগিয়ে তিনি আমাদের দিকে এগিয়ে দিতেন। চা-ও ঢেলে দিতেন, নিজে খেতেন শুধু এক কাপ চা। প্রায়ই তাঁর হাতে থাকতো কোনো না কোনো বই। আমাদের উঠতে দেরি হলে বসে বসে সেটা পড়তেন, অথবা পড়া হয়ে গেলে কোনো কোনো বই রেখে যেতেন আমার পড়ার জন্যে।

নীলক্ষেতের বাড়িতে আপনা থেকেই পরিপাটি আড্ডার একটা ব্যবস্থা হয়েছিল। রফিকুল ইসলাম থাকতেন তিন তলায়। তাঁর স্ত্রী জাহানারা ইসলাম ওরফে জুবলী ভাবি ছিলেন রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পী এবং অত্যন্ত সরল, মিশুক ও অমায়িক মানুষ। তাঁদের একমাত্র সন্তান মেঘলা ছিল রুচিরই বয়সী। রফিকুল ইসলামের বোন মাসুমা খাতুন ওরফে রেণু ছিলেন টেলিভিশনের ঘোষিকা। তাঁর ছেলে স্বপন পড়তো ঢাকার বাইরে; মেয়ে কল্পনাকে নিয়ে তিনি ভাইয়ের সঙ্গে থাকতেন। কল্পনার নামের একটা প্রভাব বোধহয় তার মধ্যে পড়েছিল। মাঝে মাঝে দেখতাম, মুখে আঙুল দিয়ে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সে কিছু একটা ভাবছে। মাহফুজুল হকের মৃত্যুর পরে খুকু ভাবি বাংলায় এম এ পড়তে শুরু করেছিলেন। তাঁর দুই মেয়ে, পারভীন ও নাসরীন একটু বড়ো হয়েছে, ছেলে মোর্শেদ ছোটো—রোজ সকালে বেতারের সংবাদপাঠকের ভূমিকায় অভিনয় করে সে যতোদূরসম্ভব সর্বশেষ খবর দেওয়ার চেষ্টা করতো। আমরা এই তিন পরিবার ছিলাম এক পরিবারের মতো। যার যার বাড়ির রান্না নিয়ে কারো বাড়িতে একসঙ্গে হয়ে আমরা রাতে খেতাম। তারপর অনেক সময়ে, গাড়ি করে ইন্টারকন্টিনেন্টালে গিয়ে কফি খেয়ে আসতাম—বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়েই। খুকু ভাবি গাড়ি চালাতেন, রফিক ভাইয়ের গাড়ি ছিল, আমারটাও এসে পৌঁছেছিল। আমরা কখনো ডি আই টি বিলডিংয়ের কাছাকাছি দিয়ে রাতে ফিরলে টেলিভিশন-কেন্দ্রে গিয়ে রেণুকে গাড়িতে তুলে নিয়ে আসতাম।

চারতলা থেকে নামা বা চারতলায় ওঠার পথে হালিমা আপা মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় থেমে যেতেন। তবে তার মেয়ে লাবণি আসতো বেশি। আমাদের বাড়ির অন্য কোনো কোনো ফ্ল্যাটের এবং দু পাশের দুই বাড়ির কিছু কিছু সন্তাব ছিল উপরি পাওনা।

নীলক্ষেতে আমার চলে আসাটা আহমদ পছন্দ করেনি, তবু সে রোজই আসতো। তাকে দেওয়া সময়-অনুযায়ী ঘরে থাকতে বা ফিরতে না পারলে সে খুব অসন্তুষ্ট হতো। আমার নতুন পরিপার্শ্বিকতা তার ভালো লাগেনি। রাজ্জাক সাহেবের প্রতি তার কিছুটা বিরূপতা ছিল; তিনি সেটা বুঝতেন, তিনিও আহমদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। আমার সঙ্গে আর যাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে—যেমন, ড. কামাল হোসেনকে—সে পছন্দ করতো না। ফলে আমাকে বেশ সতর্ক থাকতে হতো। বাক্যয়

আহমদ খুবই সক্রিয়, দেশে ফেরার পরে আমি সেদিকে সময় দিতে পারিনি—এও ছিল তার ক্ষোভের একটা কারণ।

এ-বাড়িতে আসার পরে যাঁদের সঙ্গে আমার নতুন বন্ধুত্ব হয়, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন তফাজ্জুল আলী ওরফে মাখন। মুহিত ভাইয়ের আত্মীয় ও বন্ধু হিসেবে তাঁর সঙ্গে পরিচয়। তিনি ব্যবসা করতেন—কী ব্যবসা, তা ঠিক জানতাম না। তিনি থাকতেন বখশিবাজারে, প্রায় গাড়ি নিয়ে আসতেন এবং তাতে করে আমাদের নিয়ে এয়ারপোর্ট রোডে কাবাব-পরটার দোকানে যেতেন। গাড়িতে বসেই আমরা খেতাম, তারপর ঘরে ফিরে আসতাম।

মাসপয়লায় আমাদেরও এমন একটা নিজস্ব কর্মসূচি থাকতো। শাহবাগ হোটেলের নিচের একটা মনিহারী দোকান থেকে আমরা মাসের প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতাম। তারপর এলিফ্যান্ট রোডে হোটেল কাম্পালায় গিয়ে কাবাব-পরটা খেয়ে বাড়ি ফিরতাম। তখন ঘুরতাম প্রচুর। রুচিকে শুইয়ে রাখতাম গাড়ির পেছনের সিটে। সে ঘুমিয়ে পড়তো, কোথাও পৌঁছে ডাকামাত্র সে উঠে পড়তো। আব্বা আফসোস করে বলতেন, 'আহা বেচারি! কী বাপ-মায়ের হাতে পড়েছে!'

সবকিছুই ভালোমতো চলছিল—আর্থিক ব্যবস্থাপনা ছাড়া। তখন কী বা মাইনে পেতাম! বোধহয় ছ শ টাকাও নয়। ওই পয়সায় নিজের গাড়ি চালানো ছিল নিছক অবিমৃশ্যকারিতা। সুতরাং প্রতি মাসেই ঋণ করতে হতো। মাসের গোড়ায় ঋণশোধ করে আবার মাসের শেষে ঋণ করা। বেতারে-টেলিভিশনে প্রোগ্রাম করে অল্প কিছু অর্থাগম হতো। বেতারে কথিকা পড়তাম আর প্রায়ই পুস্তক-সমালোচনা করতাম। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *কাঁদো নদী কাঁদো* প্রকাশিত হলে তার একটা সমালোচনা করেছিলাম। বেতার-ভবন থেকে বাড়ি ফিরে দেখি খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস বসে। তিনি জানালেন, *কাঁদো নদী কাঁদোর* যে-আলোচনা আমি করেছি, তাতে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। আমার হাতে তাঁর *কত ছবি কত গান* উপন্যাসের একটা কপি দিয়ে এই আশা ব্যক্ত করলেন যে, আমি যেন তাঁর উপন্যাসের অমন একটা আলোচনা করি। আলোচনা করেছিলাম, কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস সম্পর্কে যতটা প্রশংসা করতে পেরেছিলাম, ইলিয়াসের উপন্যাস সম্পর্কে অতটা করতে পারিনি। ফলে তিনি কিঞ্চিৎ হতাশ হয়েছিলেন।

টেলিভিশনে সাহিত্যের আলোচনা করতাম। একবার হাসান হাফিজুর রহমান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও আমি ছিলাম অংশগ্রহণকারী। আমাদের তর্ক বেশ জমে উঠেছিল, কিন্তু সময় ফুরিয়ে গেল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করছিলেন হাসান, সুতরাং তাঁকে একসময়ে বলতেই হলো, 'আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ হলো।' বোরহান তারপরও বলে বসলো, 'আলোচনা কী আর এভাবে শেষ হয়!' তখন বেশির ভাগ অনুষ্ঠান প্রচারিত হতো আগে থেকে রেকর্ড না করে অর্থাৎ সরাসরি। অতএব ওই আলোচনা বোরহানের মন্তব্য দিয়েই শেষ হয়েছিল। আগে রেকর্ড করলেও যে সবসময়ে সুবিধে হতো, তা নয়। কেননা ভিডিও-সম্পাদনার যথাযথ যন্ত্রপাতি ছিল না। তাই ভুলচুক হলে নতুন করে রেকর্ড করতে হতো। নজরুল-জয়ন্তীর এক অনুষ্ঠান আমি উপস্থাপন করি—আগেই রেকর্ড করা হচ্ছিল। প্রথম বাক্য উচ্চারণ করতেই ভুল

বললাম : 'আজ পঁচিশে বৈশাখ'। আবার রেকর্ড করতে হবে গোড়া থেকে। একই ভুল আরো দুবার করলাম, তারপর ঠিকমতো বলতে পারলাম : 'আজ এগারোই জ্যৈষ্ঠ।' আবদুল্লাহ আল মামুনের প্রযোজনায় তিন মাস ধরে একটা সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান করেছিলাম 'উত্তরপঞ্চাশ' নামে। পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের বিভিন্ন পেশার মানুষকে একে একে নিয়ে এসে তাঁদের তখনকার জীবন নিয়ে আলোচনা। যাঁদের নিয়ে এসেছিলাম, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, কবি ও অনুবাদক মীজানুর রহমান, আমার এক কালের প্রধান শিক্ষক আবদুল ওয়াজেদ খান চৌধুরী এবং আমার খালু, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল, ডা এ কে এম আবদুল ওয়াহেদ। ফজিলাতুননেসা জোহাকে আনার খুব চেষ্টা করেছিলাম এ-অনুষ্ঠানে, তিনি রাজি হননি। আরেকটি ধারাবাহিক অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেছিলাম 'কবিকণ্ঠ' নামে। এতে একেক দিনে একজন বিশিষ্ট কবিকে এনে আমি তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতাম, কবি নিজের দুটি কবিতা পড়তেন, তারপর আমি কবিতা-দুটি আলোচনা করে অনুষ্ঠান শেষ করতাম। জসীমউদ্‌দীন, আবদুল কাদির, আহসান হাবীব প্রমুখ কবি এতে এসেছিলেন, বোধহয় শামসুর রাহমানকে দিয়ে শেষ করেছিলাম। তখন জসীমউদ্‌দীনের *জীবন-কথা* পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম, সুতরাং আমার প্রারম্ভিক বক্তব্যে তাঁর কবিতা ছাড়াও গদ্যের খুব প্রশংসা করেছিলাম। কয়েকদিন পরে তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনি বললেন, 'সেদিন তুমি টিভিতে আমার গদ্যের প্রশংসা করায় খুব খুশি হয়েছিলাম। শেষে অনুষ্ঠান দেখার পরে বুঝতে পারলাম, তুমি আমার কবিতাকে ভালো বলতে চাওনি।' আমি যতোই বলি যে, আমি তাঁর কবিতার প্রকৃত অনুরাগী, তিনি কিছুতেই তা স্বীকার করতে চান না। বলেন, 'জানি, তুমি হাসান হাফিজুর রহমানের দলের, আমার কবিতা আধুনিক নয়, এটাই তোমরা সর্বত্র বলে বেড়াও।' মুনীর চৌধুরী টেলিভিশনে পুস্তক-সমালোচনা করতেন—সে পাক্ষিক অনুষ্ঠানটি ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। একবার তিনি দেশের বাইরে গেলে ওই অনুষ্ঠান করার ভার আমার ওপর বর্তায়। আমি শ্রোতাদের উদ্দেশে বলেছিলাম, মুনীর চৌধুরীর আলোচনা থেকে তাদের বঞ্চিত করতে চাই না; তাই এমন দুটি বইয়ের আলোচনা করবো যা তিনি কখনো করতেন না—তাঁর লেখা একাঙ্কিকা-সংগ্রহ *কবর* ও *দণ্ডকারণ্য*।

৫.

পাকিস্তানের উভয় অংশের সংহতিবিধানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করেছিলেন পাকিস্তান কাউনসিল ফর ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশন। আমাদের বন্ধু তোফাজ্জল হোসেন একসময়ে তার ঢাকা কেন্দ্রের পরিচালক ছিল—তখন এই কেন্দ্রের অনেক অনুষ্ঠানে আমি অংশ নিয়েছিলাম।

কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য-মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিব ছিলেন এই সংগঠনের পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান। তাঁর পরেই বোধহয় ছিলেন সেকশন চিফ নাজমা আতহার। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় রোকেয়া কবীরের মাধ্যমে—তিনি তখন ইডেন গার্লস

কলেজের অধ্যক্ষ। রোকেয়া আপার অনুজপ্রতিম ছিলাম আমি, নাজমা ছিলেন তাঁর বান্ধবী। দুই বান্ধবীই সিগারেট খেতেন। তবে সিগারেট না থাকলে রোকেয়া আপা যেমন অক্লেশে বলতেন, 'সিগারেট দেখি', নাজমা তা বলতে পারতেন না। তিনি আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন পথ চলতে-চলতে সিগারেট না খেতে—সেটা অশোভন হয় বলে। আমি তাঁর উপদেশ মান্য করার চেষ্টা করেছিলাম।

নাজমা আতহারের অবয়বে লালিত্য ছিল, আচরণে শালীনতা। কিছুটা নিজের আধুনিকতার জন্যে, কিছুটা উচ্চবিত্ত অবাঙালি পরিবারে বিয়ে করার জন্যে, ঢাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মহলে তিনি তেমন গ্রহণযোগ্য হননি। তবে তিনি খুব বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন এবং, আমার ধারণা, সরলচিত্ত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন, আমার এমন বন্ধুদের বিচার অবশ্য ছিল ভিন্ন।

পাকিস্তান কাউনসিলের উদ্‌যোগে লাহোরে ১৯৬৭ সালে অনুষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল সেমিনার অন ড্রামা। আমি তাতে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। নাজমা আতহার আমার বাড়িতে এসে বিমানের টিকিট পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি এটা না করলেও পারতেন।

সেমিনারে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের সদস্যদের মধ্যে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন শেষ পর্যন্ত যেতে পারেননি। নূরুল মোমেন, রফিকুল ইসলাম, রাজিয়া খান অমিন ও আমি গিয়েছিলাম। সেমিনার উদ্‌বোধন করেছিলেন কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন। তাঁর লিখিত ভাষণে যেখানে তিনি আমাদের 'ফেলিসিটেট' করতে চেয়েছিলেন, সেখানে কিছুতেই ঠিক শব্দটা উচ্চারণ করতে পারছিলেন না, শুদ্ধ করতে চেয়েও বলছিলেন 'ফেসিলিটেট'। আমার পাশে উপবিষ্ট পশ্চিম পাকিস্তানি এক প্রতিনিধিকে বলেছিলাম, 'ওঁর কাছে ফেলিসিটেট করার চেয়ে প্রাধান্য পায় ফেসিলিটেট করা।

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের লিখিত প্রবন্ধটি আমাকেই পড়ে শোনাতে হয়েছিল এবং—যেমন আশঙ্কা করেছিলাম—তাঁর হয়ে কিছু প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হয়েছিল। সেমিনারে দুজনের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়—*পাকিস্তান টাইমস* পত্রিকার সহকারী সম্পাদক সফদার মীর এবং তাঁর অনুজস্থানীয় নাসির আহমদ্‌। তাঁরা আবার কেউ কাউকে দেখতে পারতেন না। মীর এক রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে আমাদের বিয়ার খাইয়েছিলেন, তবে 'চিয়ার্স' না বলে মগ উঁচিয়ে বলেছিলেন, 'সালাম'।

৬.

বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা খুব ভালো যাচ্ছে না। এন এস এফের দৌরাত্ম্য দিনে দিনে বাড়ছে, বিরোধীদলীয় ছাত্রেরাও কিছু কিছু প্রতিরোধ করতে শুরু করেছে। ফলে, কিছুদিন পরপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস যাচ্ছে বন্ধ হয়ে। ভাইস-চান্সেলরের রাজনৈতিক পক্ষপাত শুধু এন এস এফের ক্ষেত্রেই নয়, শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও প্রকাশ পাচ্ছে।

ড. আবু মাহমুদের লাঞ্ছনার ঘটনার পরে প্রেসিডেন্ট আইয়ুর খান যখন ঢাকায় আসেন, তখন অধ্যাপক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকদের এক প্রতিনিধিদল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়। এ-সময়ে আমাদের মেরুদণ্ডের কতোটা জোর, তার কিছুটা পরিচয় পেয়েছিলাম। প্রথমদিকে যাঁরা খুবই রুষ্ট ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়-প্রশাসনের বিরুদ্ধে কিংবা উৎসাহী ছিলেন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে নিজেদের ক্ষোভের কথা জানাতে, ধীরে ধীরে তাঁদের অনেককেই দেখলাম পিছু হটতে। এমনকী, আগের দিন পর্যন্ত প্রতিনিধিদলে থাকবেন বলে অঙ্গীকার করেও কেউ কেউ যথাসময়ে দেখা দেননি। প্রতিনিধিদল প্রেসিডেন্টের সম্মুখীন হওয়ার পরে তিনি নাকি অধ্যাপক হবিবুল্লাহ্‌র কাছে জানতে চেয়েছিলেন, 'প্রফেসর, আর দিজ ইওর স্টুডেন্টস?' ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, ড. খান সারওয়ার মুরশিদ কিংবা রেহমান সোবহানকে দেখে ছাত্র মনে করার কোনো কারণ ছিল না, তাছাড়া প্রতিনিধিদলের সদস্যদের নাম ও পরিচয় প্রেসিডেন্টের সামনেই ছিল। তাঁর সঙ্গে প্রাদেশিক গভর্নর তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলর ও ভাইস-চান্সেলরও ছিলেন। গোড়া থেকেই বোঝা গিয়েছিল, এ সাক্ষাৎকার কোনোদিক দিয়েই ফলপ্রসূ হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে উদ্‌বিগ্ন নাগরিকদের একটি প্রতিনিধিদলও প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিল বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে। সুফিয়া কামাল প্রেসিডেন্টকে বলেছিলেন, তিনি ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষ মেটাতে পারলেন, আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলযোগ মেটাতে পারবেন না, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আইয়ুব বলেছিলেন, সেখানে তিনি মানুষের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, এখানে তো সব 'হায়ওয়ান'। ক্ষুব্ধ সুফিয়া কামাল উর্দুতেই তাঁর মুখের ওপর বলেছিলেন, 'তব তো আপ হায়ওয়ানোকো সদ্‌র হ্যায়।' এতে প্রেসিডেন্টের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তা কেউ লিখে রাখেননি।

বিশ্ববিদ্যালয়-প্রশাসনের পক্ষেও একটি প্রতিনিধিদল প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করেছিল।

এই সময়ে রাজ্জাক সাহেব একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা বিবরণ লিখে আমাকে বললেন টাইপ করে দিতে। আমি টাইপ করে দিলে তিনি সেটা নিয়ে গেলেন প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দলের নেতা আসাদুজ্জামান খানের কাছে। সে-লেখার সবটাই তিনি পরিষদে বক্তৃতা-আকারে উপস্থিত করেছিলেন। সংবাদপত্রের বিবরণীতে জানা গিয়েছিল, সরকারি ও বিরোধী দলীয় সদস্যরা সকলেই সে-বক্তৃতা শুনেছিলেন গভীর মনোযোগ দিয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ তাদের সমালোচক-শিক্ষকদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতেন, তার দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার কথা ছিল ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরীর, কিন্তু সেই দায়িত্ব দেওয়া হলো সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ড. এ কে নাজমুল করিমকে। অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি দুই বিভাগ চালানোর ভার বহন করেছিলেন। আমার প্রতিও একটা ছোটোখাটো অবিচার করা হয়। আমেরিকা থেকে ফেরার স্বল্পকালের মধ্যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীষ্মকালীন-সেমিনারে যোগ দেওয়ার মনোনয়ন পেয়েছিলাম রেহমান সোবহানের

সৌজন্যে। আমি অল্পকাল আগে বিদেশ থেকে ফিরেছি, এই কারণে কর্তৃপক্ষ আমাকে সেখানে যাওয়ার অনুমতি দিতে চাননি। আমার দরখাস্তের পরিণাম জানতে ডেপুটি রেজিস্ট্রার নূরউদ্দীন আহমদের কাছে যাওয়ায় তিনি বললেন, 'ফাইল ফেরত আসেনি। আপনি যদি সত্যিই যেতে চান, তাহলে ভাইস-চান্সেলরের সঙ্গে দেখা করে আপনাকে 'সরি' বলতে হবে।' আমি বলেছিলাম, 'সরি বলার মতো কিছু করেছি বলে আমার মনে হয় না।' শেষ পর্যন্ত সেমিনারে যাওয়ার অনুমতি আমি পাইনি। অথচ অমন অনুমতি দেওয়া নিয়ম বা নজির বহির্ভূত ছিল না।

১৯৬৭ সালে একদিন আমার দুই প্রাক্তন ছাত্র, আহমদ ছফা ও কাজী সিরাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কক্ষে এসে প্রস্তাব করলো, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানি লেখকদের প্রবন্ধ নিয়ে একটি সংকলন-সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে। আমি সম্মত হলে স্টুডেন্ট ওয়েজের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ ওহিদউল্লাহ্‌কে ছফা নিয়ে এলো আমার কাছে—বইটি প্রকাশের দায়িত্ব তিনিই নিলেন। কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি দিয়ে ছাপা হলো সংকলনে লেখার জন্যে আমন্ত্রণপত্র। প্রায় জন পঞ্চাশেককে চিঠি পাঠিয়েছিলাম, প্রবন্ধের বিষয়ও প্রস্তাব করেছিলাম। অনেকে সম্মতিজ্ঞাপন করলেন, অনেকে বিষয়ান্তরে লেখার প্রস্তাব করলেন, অনেকে নতুন লেখার পরিবর্তে তাঁদের প্রকাশিত লেখা গ্রহণ করার অনুরোধ করলেন। সরকারি প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় লিখতে বিরত থাকলেন কেউ কেউ, কেউ কেউ কর্মব্যস্ততার কারণে শেষ পর্যন্ত লিখে উঠতে পারলেন না। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে কোনো বিষয় নির্ধারণ করে দিই নি, তিনি নিজেই তা স্থির করেছিলেন এবং আমাকে বলেছিলেন শ্রুতিলিখন নিতে। একদিন তাঁর বেগমবাজারের বাড়িতে, আরেকদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে তাঁর কক্ষে (তিনি তখন এমেরিটাস প্রফেসর) তিনি মুখে মুখে বলে গিয়েছিলেন, আমি লিখে নিয়েছিলাম। পরে অনুলিপি তিনি সংশোধন করে দিয়েছিলেন। অন্তিম অসুস্থতার আগে এই 'মরমী রবীন্দ্রনাথ'ই হয়তো ছিল তাঁর শেষ লেখা। ততদিনে অবশ্য পানি অনেকদূরে গড়িয়েছে।

সংকলনের কাজ কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে, তখন, ১৯৬৭ সালের জুন মাসে, সংবাদপত্রে বের হলো পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে প্রদত্ত কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীনের বিবৃতি : রেডিও পাকিস্তান থেকে ভবিষ্যতে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধবিরোধী রবীন্দ্র-সংগীত প্রচারিত হবে না এবং রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গানের প্রচারও কমিয়ে দেওয়া হবে। কাগজ পড়ে আমি গেলাম ওপরতলায় রফিকুল ইসলামের কাছে। আমরা পরামর্শ করে স্থির করলাম, এর প্রতিবাদ করতে হবে। বিকেলবেলায় এলাম স্যাভেজ রোডে (এখন ঈসা খান রোড) মুনীর চৌধুরীর কাছে। তিনি বাড়ি নেই, তাঁর উলটো দিকের বাড়িতে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের ফ্ল্যাটে আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম। বাড়ি ফিরে মুনীর চৌধুরী ডেকে পাঠালেন এবং আমাদের তিনজনকে একসঙ্গে দেখে নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা করলেন : 'খাজা শাহাবুদ্দীনের বিবৃতি?' আমরা হাঁ বলায় তিনি প্রতিবাদের খসড়া করতে বসলেন ইংরেজিতে। আমি সেটা অনুবাদ করলাম, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তা কপি করলেন। ততক্ষণে মুনীর চৌধুরীর টাইপরাইটারে ইংরেজি বিবৃতিটা আমি টাইপ করে নিলাম। দুটোতে স্বাক্ষর

দিয়ে মুনীর চৌধুরী ফোন করলেন সৈয়দ আলী আহসানকে। বেশ কিছুক্ষণ আলোচনার পরে মুনীর চৌধুরী আমাকে বললেন, 'তুমি এখনই আলী আহসানের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সইটা নিয়ে এসো।' গাড়ি নিয়েই ছুটলাম, কিন্তু আলী আহসান সাহেবকে পেলাম না।

পরদিন স্বাক্ষরসংগ্রহের পালা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমি একাই সই নিয়েছিলাম—বোধহয় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল বলে বিভাগের শিক্ষকদের বাড়িতেও যেতে হয়েছিল। মুহম্মদ আবদুল হাই, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আহমদ শরীফ ও নীলিমা ইব্রাহিম স্বাক্ষর দিলেন; রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান আর আমারটা সেইসঙ্গে যুক্ত হলো। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর নিলাম কাজী মোতাহার হোসেন ও খান সারওয়ার মুরশিদের সই, *দৈনিক পাকিস্তানে* গিয়ে পাওয়া গেল শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান ও ফজল শাহাবুদ্দীনেরটা। মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা বিবৃতি পড়ে মাথা নাড়ালেন; ভয় পেলাম, উনি বোধহয় সই দেবেন না। কিন্তু ওঁকে বলতে শুনলাম, 'যথেষ্ট বলা হয়নি।' তারপর উঠে গিয়ে নিজের কলমে স্বাক্ষর দিলেন। এম এ বারী, সুফিয়া কামাল, সিকানদার আবু জাফর, জয়নুল আবেদিন—এঁদের সই যাওয়ামাত্রই পেলাম। বাড়িতে পেলাম না জসীমউদ্‌দীনকে। শুধু শহীদুল্লাহ্ সাহেব স্বাক্ষর দিলেন না। বিষণ্নভাবে বললেন, 'দেখো, আমি এতো গাল খেয়েছি যে, এই বয়সে আর বিতর্কে জড়াতে ইচ্ছে হয় না। *আজাদে* আমাকে ভারতের গুপ্তচর বলেছে, গভর্নমেন্ট হাউজের পার্টিতে একজন আমাকে বলেছে ট্রেইটর। আর কতো!'

স্বাক্ষরসংগ্রহে ক্ষান্তি দিয়ে ওই সন্ধ্যায়ই খবরের কাগজের অফিসে অফিসে বিবৃতি পৌঁছে দিতে গেলাম। কোথাও নিজে নকল করে দিই, কোথাও কোনো সাংবাদিক নিজে থেকে নকল করে নেন। *পাকিস্তান অবজার্ভারে* গিয়ে বিবৃতি সমর্পণ করলাম এ বি এম মূসার হাতে। তিনি সেটা দেখে মহা খুশি : আতাউস সামাদকে বললেন টাইপ করে নেওয়ার জন্যে, আর আমাকে অভিনন্দন জানালেন আমি মুনীর চৌধুরীর স্বাক্ষরও সংগ্রহ করতে পেরেছি—সেজন্যে। তাঁকে আর আমি ইচ্ছে করেই বলিনি যে, বিবৃতিটা মুনীর চৌধুরীরই লেখা। *সংবাদে* কপি পৌঁছে ফিরে আসছি, সিঁড়িতেই দেখা শহীদুল্লা কায়সারের সঙ্গে। এবারে তার স্বাক্ষর যোগ করা গেল এবং *সংবাদ* অফিস থেকেই চেষ্টা করলাম অন্য কাগজগুলোয় ফোন করে তাঁর নামটা যাতে বিবৃতিতে যায়, সেই অনুরোধ জানাতে। কোথাও কাউকে পেলাম, কোথাও পেলাম না। তাই কোনো কোনো কাগজে ১৮ জনের বিবৃতি এবং কোনো কোনোটায় ১৯ জনের বিবৃতি হিসেবে তা প্রকাশিত হলো। কয়েকদিনের মধ্যে জসীমউদ্‌দীন ও আবুল হাশিম পৃথক পৃথক বিবৃতি দিলেন সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে। ন্যাপ-সভাপতি মওলানা ভাসানী, ন্যাপের সম্পাদক মোহাম্মদ সুলতান এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা আমেনা বেগমও তাই করলেন। ন্যাপের অপর গ্রুপ থেকেও প্রতিবাদ করা হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের উভয় গ্রুপ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সংসদ ও শিল্প ও সাহিত্য সংঘ, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, ছায়ানট, ক্রান্তি, ঐকতান, আমরা কজনা, স্পন্দন, সৃজনী, পূরবী, বাণীচক্র, অপূর্ব সংসদ এবং উর্দু লেখকদের কয়েকটি গোষ্ঠীও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলো। চট্টগ্রাম থেকে আবুল ফজল, আল মাহমুদ, সুচরিত

চৌধুরী প্রমুখ এবং খুলনা থেকে এ এফ এম আবদুল জলিল, হাসান আজিজুল হক ও আরো কয়েকজন আর স্থানীয় বিশিষ্ট রাজনীতিবিদেরা বিবৃতি দিলেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষক একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তা ঢাকায় এসে পৌঁছোতে পৌঁছোতে কাগজে এ-সম্পর্কিত বাদ-প্রতিবাদ ছাপা বন্ধ হয়ে গেল সরকারি পরামর্শে।

আমাদের বিবৃতি বেরিয়েছিল ২৫ জুনে, আর তার প্রতিবাদে চল্লিশ জন সংস্কৃতিসেবীর বিবৃতি প্রকাশিত হয় ২৭ জুনে। আমরা যে বলেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষী পাকিস্তানিদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাতে তাঁরা আপত্তি করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথকে অভিহিত করেছিলেন ভারতীয় তমদ্দুনের ধারক ও বাহক বলে, যার সঙ্গে পাকিস্তানি তমদ্দুনের আকাশপাতাল ব্যবধান। আমাদের কথা মেনে নিলে, বিবৃতিদাতাদের মতে, যে-তামদ্দুনিক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা, তা নষ্ট হয়ে যায়। এর স্বাক্ষরদাতা বলে যাঁদের নাম প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁরা হলেন : মুহম্মদ বরকতুল্লাহ্, আবদুল মওদুদ, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ইব্রাহিম খাঁ, মুজীবুর রহমান খাঁ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, কাজী দীন মুহম্মদ, হাসান জামান, আশরাফ সিদ্দিকী, বেনজীর আহমদ, মঈনুদ্দীন, শেখ শরফুদ্দীন, আ ক ম আদমউদ্দীন, তালিম হোসেন, শাহেদ আলী, আ ন ম বজলুর রশীদ, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, সানাউল্লাহ নূরী, আবদুস সাত্তার, কাজী আবুল কাসেম, মুফাখ্‌খারুল ইসলাম, শামসুল হক, ওসমান গণি, মফিজউদ্দীন আহমদ, আনিসুল হক চৌধুরী, মোস্তফা কামাল, মতিউর রহমান, জহুরুল হক, ফারুক আহমদ, শরফুদ্দীন আহমদ, হোসনে আরা, মাফরুহা চৌধুরী, মোহাম্মদ নাসির আলী, এ কে এম নূরুল ইসলাম, জাহানারা আরজু ও কাজী আবদুল ওয়াদুদ।

এই বিবৃতিপ্রকাশের আগের সন্ধ্যায় অফিস-ফেরতা আহসান হাবীব এলেন আমার বাসায়। বললেন, 'আমি একটা অন্যায় করে ফেলেছি, তোমাকে না বলে শান্তি পাচ্ছি না।' তারপর ওই বিবৃতির কথা জানালেন। বললেন, প্রেস ট্রাস্টের কাগজে তিনি চাকরি করেন, সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট লোকেরা স্বাক্ষর চাইলে না দিয়ে পারেন নি, সই দিয়েই মনে হয়েছে আমি কী ভাববো! ছুটে এসেছেন আমার কাছে।

আমি তাঁকে বললাম, এই স্বাক্ষরের কারণে তাঁর সম্পর্কে আমার ধারণা বদলাবে না, তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কও পালটাবে না।

আহসান হাবীবের মনোবেদনা আমাকে আপ্লুত করেছিল। তাঁর কথা রফিকুল ইসলামকে বলেছিলাম, কিন্তু তাঁর মনে তা দাগ কাটে নি। কিছুকাল পরে হাবীব ভাইয়ের মেয়ে কেয়া আমাদের বিভাগে অনার্সের প্রথম বর্ষে ভর্তি হতে আসে। ভর্তি কমিটিতে রফিকুল ইসলাম ছিলেন। তিনি নাকি কেয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি যে বাংলা পড়তে চাও, এখানে তো রবীন্দ্র-সাহিত্য পড়তে হবে—তোমার আব্বা আপত্তি করবেন না?' কেয়া বাড়ি গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এ-কথা বলেছিল বাবাকে, হাবীব ভাই আবার আমার কাছে এসেছিলেন একইরকম অসহায় ভাব নিয়ে।

চল্লিশ জনের বিবৃতি যেদিন ছাপা হলো, সেদিন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে গিয়ে শুনি আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ্ ফোন করছেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু আবদুল

মওদুদকে : 'তুমি কি দারোগা হতে চাও?' মওদুদ সাহেব তখন ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি।

ওইদিনই আমাদের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ও কে এম এ মুনীম, আইন বিভাগের রিডার মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন, ইতিহাস বিভাগের রিডার মোহাম্মদ মোহর আলী এবং গণিত বিভাগের এ এফ এম আবদুর রহমানেরও একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। তাঁরা বলেন, আমাদের বিবৃতি পাকিস্তানবিরোধী প্রচারণায় ব্যবহৃত হবে। মুনীম সাহেব সাতে-পাঁচে থাকার লোক নন; শুনেছি, সহপাঠী সাজ্জাদ সাহেবকে অমান্য করতে না পেরে এতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন।

পরে একদল সংগীতশিল্পী রবীন্দ্রবিরোধী বিবৃতি দিয়েছিলেন—তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বেতারের স্টাফ আর্টিস্ট। আবদুল আহাদ তাতে সই করতে অস্বীকার করেন। তিনি জানিয়েছিলেন, অনেক শিল্পী ভয়ে স্বাক্ষর দিয়েছে। রফিকুল ইসলাম ও আমি সে কথা বিশ্বাস করেছিলাম।

মিজানুর রহমান শেলী তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক এবং *দি কনসেপ্ট অফ পাকিস্তান* পত্রিকার সম্পাদক। স্ত্রী সুফিয়াকে নিয়ে প্রায় সন্ধ্যায় আসেন আমার ফ্ল্যাটে। শিশুপুত্র নিপুও আসে তাঁদের সঙ্গে—খানিক পরে সে ঘুমিয়ে যায় সোফাতেই। বাক্-পটুত্বে আসর জমিয়ে রাখেন শেলী, প্রায়ই রাত বেশি হয়ে যায় গল্প শেষ হতে—গাড়ি করে আমি পৌঁছে দিই আজিমপুরে তাঁর বাবার ফ্ল্যাটে—সেখানেই তাঁরা থাকতেন। এক সন্ধ্যায় শেলী এসে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, সার্, রবীন্দ্রবিরোধী একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে এসেছি।' শেলী বলেন নি যে, তাঁকে কেউ জোর করেছে।

চল্লিশজন যে-বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাতে রবীন্দ্রনাথের মুসলিম-বিদ্বেষের কিছু প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। সে-বিবৃতি বের হওয়ার পরে ড. শহীদুল্লাহ্ আমাকে বলেছিলেন, তাঁর কাছে ওতে স্বাক্ষর নিতে একজন (তিনি তাঁর নাম বলেছিলেন, কিন্তু এখন তার উল্লেখের কোনো প্রয়োজন দেখি না) গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সই দেন নি। স্বাক্ষরসংগ্রহকারীকে তিনি বলেছিলেন, 'দেখো, মানুষের শরীরে সুগন্ধও আছে, দুর্গন্ধও আছে। তুমি যদি দুর্গন্ধময় জায়গায় নাক দিয়ে পড়ে থাকো, তাহলে তো কখনো সুগন্ধ পাবে না।'

আমরা বিবৃতি দিয়ে ক্ষান্ত থাকিনি। জসীমউদ্‌দীনের বাড়িতে একটি সভা আহূত হয় পরিস্থিতি বিবেচনার জন্যে। তাতে সভাপতিত্ব করেন এম এ বারী। জসীমউদ্‌দীন, কাজী মোতাহার হোসেন, সুফিয়া কামাল, ওয়াহিদুল হক, আহমদ হোসেন (বাফা), জাহেদুর রহিম (ছায়ানট), কামাল লোহানী (ক্রান্তি), ফারুকুল ইসলাম (রফিকুল ইসলামের অনুজ, ঐকতান), আতাউর রহমান (স্পন্দন), আলী আকসাদ (শান্তি পরিষদ), আলী আশরাফ (পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন) ও আমি বক্তৃতা করি। আমরা আন্দোলন করবো বলে অঙ্গীকার করি। একটি কমিটি গঠিত হয় বক্তাদের নিয়ে, সেইসঙ্গে আরো থাকেন আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, ডা. সারোয়ার আলী ও আতিকুল ইসলাম (ফারুকুল ইসলামের বদলে, ঐকতানের পক্ষে)। প্রতিবাদে ঢাকা মুখর হয়ে ওঠে।

প্রেস ক্লাবকে ঘিরে আরো একটি কমিটি হয়। পরে সব মিলিয়ে জুলাই মাসে গড়ে ওঠে 'সাংস্কৃতিক স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠা-পরিষদ'। ঢাকায় পঁচিশে বৈশাখ জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হলেও বাইশে শ্রাবণে অনুষ্ঠানাদি তেমন হতো না। সেবারে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে। তার আগেই অবশ্য খাজা শাহাবুদ্দীন জাতীয় পরিষদে আরেকটি বিবৃতি দিয়ে বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের সকল সংগীতকে তিনি পাকিস্তানি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবিরোধী মনে করেন না, যদি কোনো গান পাকিস্তানের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিবোধের পরিপন্থী হয়, তবে সেগুলো বেতার থেকে প্রচারিত হবে না। এরপর বাদানুবাদ একরকম থেমে যায়, কিন্তু জনমত স্পষ্টত আমাদের দিকে থাকায়, মনে হয়, আমরা জয়ী হয়েছি।

যে-চল্লিশজন রবীন্দ্রবিরোধী বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকে অনতিবিলম্বে ঢাকায় নজরুল-একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন।

এদিকে আমার সংকলনের কাজ ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। আমি একদিন জয়নুল আবেদিনকে গিয়ে ধরি, আমার সংকলনের মুখপাতের জন্যে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রতিকৃতি এঁকে দিতে হবে। তিনি পালটা প্রশ্ন করেন, 'আমি কি পোর্ট্রেট করি?' আমি বললাম, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে-বিতর্ক হচ্ছে, তার পটভূমিকায় আমার সংকলনটি ভিন্ন গুরুত্ব পেতে যাচ্ছে। আমি চাই, রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি এঁকে দিয়ে তিনি সরকারি নীতির প্রতিবাদ করুন এবং আমার বইটিকেও মর্যাদা দিন। তিনি হেসে বললেন, 'আচ্ছা। তুমি রবীন্দ্রনাথের গোটাদুয়েক ফটোগ্রাফ নিয়ে এসো তোমার পছন্দসই। তার থেকে আমি একটা বেছে নেবো।' তাই করলাম। যথাসময়ে সুন্দর একটি প্রতিকৃতি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'এটা আমি তোমাকে দিলাম।' সংকলনে ওই একটিমাত্র ছবি ছাপা হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত তিরিশজন লেখকের প্রবন্ধ নিয়ে আমার *রবীন্দ্রনাথ* সংকলন বের হলো ১৯৬৮ সালের আগস্টে। প্রাবন্ধিকেরা ছিলেন : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, জসীমউদ্‌দীন, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা, আবুল ফজল, শওকত ওসমান, আবদুল মান্নান সৈয়দ, কাজী মোতাহার হোসেন, আহমদ শরীফ, গোলাম মুরশিদ, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মযহারুল ইসলাম, আবদুল কাদির, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, হাসান হাফিজুর রহমান, কবীর চৌধুরী, সারওয়ার মুরশিদ, মুনীর চৌধুরী, নীলিমা ইব্রাহিম, আনোয়ার পাশা, সন্তোষ গুপ্ত, সন্‌জীদা খাতুন, হায়াৎ মামুদ, শামসুর রাহমান, আহমদ ছফা, রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, অজিতকুমার গুহ, রণেশ দাশগুপ্ত ও আনিসুজ্জামান। বই বেরোলে একটা প্রকাশনা-উৎসব করা স্থির হলো—তখন তার রেওয়াজ তেমন ছিল না। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে উৎসবের ব্যবস্থা করে দিলেন সরদার জয়েনউদ্দিন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলেন ড. মুহম্মদ এনামুল হক। দু-একজন ছাড়া লেখকেরা প্রায় সকলে উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেক লেখকের হাতে বই আর সামান্য সম্মানীর খাম তুলে দেওয়া হয়। উৎসবস্থলে তিলধারণের জায়গা ছিল না, অনেক শ্রোতা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তবু অনুষ্ঠান ছেড়ে যাননি। বেশির ভাগ কাগজই প্রকাশনা-উৎসবের সংবাদ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছিল।

অনেক পরে আহমদ শরীফ লিখেছিলেন যে, রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক-উপলক্ষে লেখা প্রবন্ধ নির্বিচারে গ্রহণ করে *রবীন্দ্রনাথ* সংকলিত হয়। তিনি নিজেও এই সংকলনে লিখেছিলেন, কী করে তাঁর এমন বিস্মৃতি ঘটতে পারলো!

১৯৬৮ সালেই বোধহয় বাংলা একাডেমী প্রথমবারের মতো রবীন্দ্র-জয়ন্তী উদ্‌যাপন করে। সে-বছর জুলাই মাসে পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখার উদ্‌যোগে অনুষ্ঠিত হয় পাঁচদিনব্যাপী মহাকবি স্মরণোৎসব। লেখক সংঘের সম্পাদক তখন হাসান হাফিজুর রহমান—এই উৎসবের পরিকল্পনা ছিল তাঁরই। পাঁচদিনে যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ, গালিব, ইকবাল, মধুসূদন ও নজরুলকে নিয়ে আলোচনা, নৃত্যগীতানুষ্ঠান কিংবা, নৃত্যের অভাবে সংগীতানুষ্ঠান, কবিতা-আবৃত্তি হয়। ইনজিনিয়ার্স ইনসটিটিউটে এই উৎসবেও শ্রোতার ভিড় উপচে পড়ে। প্রথম দিনে সভাপতি ছিলেন আবুল হাশিম। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রবন্ধ পড়ি আমি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন গোলাম মোস্তফা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও সিকানদার আবু জাফর। রবীন্দ্রসংগীতে অংশ নেন ফাহমিদা খাতুন, মালেকা আজিম, বিলকিস নাসিরুদ্দীন, জাহানারা ইসলাম ও জাহিদুর রহিম। বুলবুল ললিতকলা একাডেমী পরিবেশন করে *চিত্রাঙ্গদা* নৃত্যনাট্য।

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল সম্পর্কে স্মরণোৎসবে যা বলা হয়, সরকার-ঘেঁষা পত্রিকাগুলো তার তীব্র সমালোচনা করে। তবে তার চেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে পাকিস্তান টেলিভিশনের ঢাকা কেন্দ্রে।

মহাকবি স্মরণোৎসব অনুষ্ঠানের আগে টেলিভিশন থেকে প্রোগ্রাম-ম্যানেজার মনিরুল আলম (১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে সেনাবাহিনীর সদস্যদের হাতে নিহত) আমাকে অনুরোধ করেন প্রত্যেক রাতে স্মরণোৎসবের বর্ণনা করে একটি অনুষ্ঠান করতে। আমি সম্মত হই। প্রথম দিন তো আমার প্রবন্ধ-পাঠ ছিল। অনুষ্ঠানস্থল থেকে তাড়াতাড়ি করে টেলিভিশন-কেন্দ্রে যাই। দেখি, মনিরুল আলম চিন্তান্বিত। তিনি আমাকে বললেন, স্মরণোৎসবের প্রথম রাতের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করার অনুমতি পাওয়া যায়নি ঊর্ধ্বতন-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে, বাকি চারদিনের অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনায় কোনো বাধা নেই। আমি বলি, 'আমার বাধা আছে। রবীন্দ্রনাথের স্মরণোৎসবের কথা বলতে দেওয়া না হলে আমি বাকি চারদিনের অনুষ্ঠান নিয়ে কোনো আলোচনা করবো না।' তিনি চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, 'কাল রাতে এবং আজ সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান-সূচির ঘোষণায় আপনার নাম চলে গেছে, তবে বিষয় উল্লেখ করা হয়নি। এখন ওই নির্ধারিত সময়ে আপনাকে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে বলতে হবে—নইলে আমি মুশকিলে পড়বো।' দুজনে পরামর্শ করে স্থির করি, বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কে আমি কিছু বলবো। কোনোরকম প্রস্তুতি ছাড়া ওই বিষয়ে নিজের অজ্ঞতার পরিচয় রেখে চলে আসি।

৭.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন আসন্ন। গিয়াসউদ্দিন আর আমি প্রথমে পরামর্শ করলাম, তারপর আমাদের সমসাময়িক আরো কয়েকজনের—যেমন, ইংরেজি বিভাগের সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও আহসানুল হক, পদার্থবিজ্ঞানের অজয় রায়, ভূগোলের মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা—সঙ্গে কথা হলো। এরপর গিয়াসউদ্দিনের ওপর ভার পড়লো ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মফিজুল্লাহ কবীরকে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে রাজি করানো।

পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করলে নির্বাচনের ব্যাপারে গিয়াস ও আমার অগ্রণী না হওয়াই উচিত ছিল। একবার আমরা দুজন বেশ উৎসাহ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের দায়িত্ব নিয়েছিলাম। গিয়াস সম্পাদক, আমি যুগ্ম-সম্পাদক। ভাইস-চান্সেলর পদাধিকারবলে সভাপতি। ক্লাব তখন ছিল আদি কলাভবনের দোতলায়, শিক্ষকদের কমনরুমে। আমি ঠাটারিবাজারে থাকি, নিয়মিত আসতে পারিনে সন্ধ্যাবেলায়। সব ভারটা গিয়াসের ওপরেই বর্তালো। বেচারা একা কতো করবেন! বছর না ঘুরতেই রাজ্জাক সাহেবের কাছে কবুল করলাম, 'উই হ্যাভ ব্রট দি ক্লাব টু দি ভার্জ অব রুইনেশন।' সার্ বললেন, 'অত বিনয় কেন? ভার্জ বলতে হবে কেন?' বিরক্ত হয়ে তিনি হাল ধরবেন বলে স্থির করলেন। পরের বার্ষিক সভায় নির্বাচন হবে। সভাপতির আসন থেকে ভাইস-চান্সেলর মাহমুদ হোসেন বললেন, 'ভাইস-চান্সেলরের কাছে ক্লাবের কমিটির অনেক কিছু চাইবার থাকতে পারে, অতএব তাঁকে সভাপতি করা ঠিক নয়।' ফলে, অন্য কাউকে সভাপতি করা হয়।

সাধারণ সম্পাদক পদে রাজ্জাক সাহেব প্রস্তাব করলেন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের নাম। ভাইস-চান্সেলরের ভ্রূ একটু কুঞ্চিত হলো, তবে মুখে কিছু বললেন না। সাজ্জাদ সাহেব নির্বাচিত হলেন গিয়াসের উত্তরাধিকারী। এবারে আমার উত্তরাধিকারী নির্বাচনের পালা। রাজ্জাক সাহেবের পাশে আমি বসে, তিনি আমাকে বললেন, তাঁর নাম প্রস্তাব করতে। তাই করলাম। এবারে মাহমুদ হোসেন আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শিওরলি ইউ ডোন্‌ট এক্‌সপেক্‌ট মি. রাজ্জাক টু অ্যাকসেপ্‌ট দি পজিশন অফ দি জয়েন্ট সেক্রেটারি।' আমি কিছু বলার আগে সার্ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'আই শ্যাল বি গ্ল্যাড টু অ্যাকসেপ্‌ট।'

সাজ্জাদ সাহেব-রাজ্জাক সাহেব জুটি ক্লাবে খাবারদাবারের ব্যবস্থাপনায় অনেক উন্নতি ঘটিয়েছিলেন। পুরোনো ঢাকা থেকে সুখা আর সুতলি কাবাব, পনির আর মিষ্টি আমদানি হতে লাগলো আর আমরা মহানন্দে খেয়ে ক্লাবের বিল স্ফীত করতে থাকলাম। ক্লাবের বার্ষিক ভোজে আর সার বেঁধে বসা নয়—ছজনের একেকটা টেবিল, পরিপাটি টেবিল ক্লথ, তার ওপরে ছোটো ফুলদানি; প্লেট, গ্লাস, ছুরি, কাঁটা-চামচ; টাইপ-করা মেন্যু। সেই প্রথম হাঙ্গেরিয়ান গুলাশের নাম জেনেছিলাম, খেতে গিয়ে মনে হয়েছিল, তা আমাদের দেশি কোপ্তার একটু পরিমার্জিত সংস্করণ মাত্র।

প্রবাদবাক্যের খোঁড়ার মতো, গিয়াস আর আমার পা আবার খানায় পড়লো। আমরা শিক্ষক সমিতির নির্বাচনের বিষয়ে উদ্‌যোগ নিলাম, আমাদের পক্ষ-প্রতিপক্ষের বাইরে বলে আমরা কবীর সাহেবের কথা ভাবলাম—তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বেশি হবে মনে

করে। কিন্তু দেখা গেল, আমাদের বড়োদের কাছেই এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। আহমদ শরীফ, মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (ইসলামের ইতিহাস বিভাগের রিডার) ও নূর মোহাম্মদ মিয়া (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ) সাফ সাফ বলে দিলেন, তাঁরা আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্‌কে সভাপতি করতে চান, আমাদের হয় কবীর সাহেবকে দিয়ে নাম প্রত্যাহার করাতে হবে, নয় তাঁকে নিয়ে আলাদা প্যানেল করতে হবে। আমি একটু মিনমিন করে বললাম, 'আপনারা আগে উদ্‌যোগ নিলে তো এমনটা হতো না।' গিয়াস খুবই বিব্রত হলেন। তাঁর শিক্ষক ও বিভাগীয় অধ্যক্ষকে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে রাজি করালেন, এখন কোন মুখে তাঁকে সরে যেতে বলবেন! মফিজুল্লাহ কবীরের বাড়িতে গিয়াসের সঙ্গে আমি গেলাম। সবটা খুলে বললাম। তিনি বললেন, 'না, আমি কিছু মনে করবো না; বুঝতেই পারছি, আপনাদের কিছু করণীয় নেই। তবে সবার সঙ্গে আলাপ করে তারপর আমাকে বললে ভালো হতো।' আমরা মাফ চাইলাম।

ক্যাম্পাসে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে। আমাদের প্রতিপক্ষ এসে কবীর সাহেবকে বোঝালো, তাঁর সঙ্গে যে-অসদাচরণ করা হয়েছে, তা তাঁর নীরবে মেনে নেওয়া ঠিক নয়, ওই পক্ষই তাঁকে সভাপতি মনোনীত করে প্যানেল দেবেন। কবীর সাহেব সম্মতি দিলেন।

অধ্যাপক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্‌র প্রতি গিয়াসউদ্দিন বা আমার শ্রদ্ধা কিছু কম ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের, দেশের এবং বিশ্বের নানা পরিস্থিতিতে আমরা একসঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছি। পাকিস্তানবাদি ইতিহাস রচনার ধারায় অতিষ্ঠ হয়ে তিনি যখন মুক্তদৃষ্টিতে এবং বাংলাভাষায় ইতিহাসচর্চার আবশ্যকতাবোধে ইতিহাস পরিষদ-প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগ নেন, তখন আমরা এর প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলাম। এর প্রতিক্রিয়ায় ইতিহাস বিভাগের রিডার ড. মোহর আলীর প্রচেষ্টায় ইতিহাস সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবু গিয়াস সেখানে যান নি। হবিবুল্লাহ্ সাহেব যখন কিউরেটর হিসেবে ঢাকা যাদুঘরের পঞ্চাশবর্ষপূর্তি উৎসবের আয়োজন করেন, তখন যাদুঘরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না থেকেও আমরা যথাসাধ্য করেছিলাম। তাঁর নেতৃত্বে এশিয়াটিক সোসাইটির নির্বাচনে অংশগ্রহণের কথা পরে বলবো।

শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে আমাদের প্যানেল করা হলো আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্‌কে সভাপতি পদপ্রার্থী করে। সাধারণ সম্পাদকের পদে আমাকে মনোনয়ন দিতে চেয়েছিলেন অনেকে। আমি পাল্টা যুক্তি দেখিয়েছিলাম : প্রথমত, আমার চেয়ে সিনিয়র কাউকে ওই পদে মনোনীত করা উচিত; দ্বিতীয়ত, চট্টগ্রামে চাকরি হলে আমি চলে যাবো—এমন অবস্থায় ওই পদের জন্য দাঁড়ানো আমার পক্ষে সংগত হবে না। তবে আমি যুগ্ম-সম্পাদক হতে ইচ্ছুক হলাম এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ড. আবদুল লতিফ চৌধুরীকে জোর করে সাধারণ সম্পাদকের পদপ্রার্থী হতে রাজি করানো গেল।

মফিজুল্লাহ কবীর আমাদের প্রতিপক্ষের প্যানেলে থাকতে সম্মতি দেওয়ার পরে, একদিন সকালে দেখি, বিজ্ঞান অনুষদে আমাদের দুই সহকর্মী এসেছেন বাড়িতে। তাঁদের প্রস্তাব, ওই প্যানেল থেকে তাঁরা আমাকে সাধারণ সম্পাদকের পদেই মনোনয়ন দিতে চান। আমি কিছুক্ষণ সত্যিই কিছু বলতে পারলাম না। তারপর বললাম, 'আমার সম্পর্কে আপনাদের এত খারাপ ধারণা, তা আমি বুঝি নি। একটা

পদের জন্যে আমি এই প্যানেল থেকে ওই প্যানেলে চলে যাবো?' তাঁরা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'আপনাকে ভালো জানি বলেই তো আমরা আপনার কাছে এসেছি।'

প্যানেল যখন বের হলো, তখন দেখা গেল, আমাদের জিজ্ঞেস না করেই যুগ্ম-সম্পাদকের পদে আমার এবং সদস্যপদে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর নাম দু দিকেই শোভা পাচ্ছে। সিরাজ খুব রেগে গেলেন : 'ওরা কী মনে করে আমাদের?' আমরা যতদূরসম্ভব মুখে মুখে বলে দিলাম, আমাদের সম্মতি না নিয়েই ওই প্যানেলে আমাদের নাম দেওয়া হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত আমাদের প্যানেল সম্পূর্ণ জয়যুক্ত হয়। এই আনন্দের মধ্যেও আমাদের কারো কারো মনে একটু বিষাদের ছায়া ছিল—মফিজুল্লাহ কবীরের সঙ্গে আমাদের আচরণটা আমরা সংগত বিবেচনা করতে পারছিলাম না বলে।

৮.

১৯৫০ সালে ঢাকায় পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অল্পসংখ্যক প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। পরে তিনি কয়েকবার এর সভাপতি নির্বাচিত হন এবং সোসাইটির কাউনসিলে সদস্য থাকেন। তাঁর আশি বছর পূর্তি-উপলক্ষে সোসাইটিতে তাঁর গুণগ্রাহীরা সেখান থেকে একটি সংবর্ধনাগ্রন্থ প্রকাশের কথা ভাবেন। সোসাইটির নিয়মানুযায়ী বিদায়ী কাউনসিল পরবর্তী কাউনসিলের কর্মকর্তা ও সদস্যদের নাম প্রস্তাব করে এবং বিকল্প কোনো প্রস্তাব না থাকলে সেটাই গৃহীত হয়। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের সম্মানে গ্রন্থ প্রকাশিত হবে বলে ১৯৬৫ সালের কাউনসিলে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। সেবারের কাউনসিলে প্রথমবারের মতো সদস্য হিসেবে আমাকে গ্রহণ করা হয়। কলাভবনের কমনরুমে ইতিহাস বিভাগের ড. আবদুল করিম আমাকে জানান যে, আমার-আপত্তি না থাকলে তাঁরা আমার নাম যুক্ত করে কাউনসিলের প্যানেল প্রচার করবেন। আমি সানন্দে সম্মতি জানাই।

প্যানেল প্রচারিত হয়ে যাওয়ার পরে একদিন বাংলা একাডেমীতে গেছি শহীদুল্লাহ্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। যেতেই উনি বললেন, 'তোমাকে এশিয়াটিক সোসাইটির কাউনসিল-মেম্বার করেছে, তোমায় দোওয়া করি।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'দেখো, আমি সোসাইটির একজন ফাউন্ডার। সেই পঞ্চাশ সাল থেকে কোনো না কোনো ক্যাপাসিটিতে আমি সব কাউনসিলে ছিলাম। এবার ওরা আমাকে বাদ দিয়েছে।' আমি শশব্যস্ত হয়ে বললাম, 'সার্, আপনাকে বাদ দেয় নি। সোসাইটি থেকে আপনার নামে ফেলিসিটেশন ভলিউম বের করা হবে। সে-সময়ে কাউনসিলে আপনি থাকলে ভালো দেখাবে না, তাই আপনাকে বাইরে রেখেছে। দেখবেন, পরের বছর আবার আপনার নাম থাকবে।' উনি আশ্বাস শুনতে চান না। বলেন, 'কী হতো আমাকে রাখলে? যে-মিটিংয়ে ফেলিসিটেশন ভলিউম সম্পর্কে আলোচনা হতো, আমি না হয় তাতে থাকতাম না।'

কলাভবনে ফিরে এসে ড. করিমকে সবটা বললাম। প্রস্তাব করলাম, আমি নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেবো, সেই জায়গায় ওঁরা শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে কাউনসিল-মেম্বার করে নেবেন।

শেষ পর্যন্ত তাই হলো। এরপর বাংলা একাডেমীতে যেদিন শহীদুল্লাহ্ সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো, দেখি, তিনি বেজায় খুশি। আমাকে বললেন, 'এশিয়াটিক সোসাইটির কাউনসিলে থাকবার সুযোগ তোমার অনেক হবে। তোমাকে দোওয়া করি।'

সেই সুযোগ এলো বোধহয় ১৯৬৮ সালে। ১৯৬৯ সালের কাউনসিলের জন্যে আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্‌কে সভাপতি করে আমরা বিকল্প প্যানেল দিলাম। নির্বাচনী যুদ্ধ হলো এবং আমরা জিতলাম। আমি সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছিলাম। গিয়াসউদ্দিন ও আমি সদস্য নির্বাচিত হলাম। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনকে হারিয়ে মুহম্মদ আবদুল হাই হলেন ভাষাতত্ত্ব-সম্পাদক।

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের সঙ্গে ততদিনে আমাদের আর সদ্ভাব ছিল না। রাজ্জাক সাহেবের বিষয়ে ভাইস-চান্সেলর একটা তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন, সাজ্জাদ সাহেব তার সভাপতি। মেহেরুননেসা খোন্দকার ঠাট্টা করে বলেন রাজ্জাক সাহেবকে, 'সাজ্জাদ সাহেব না আপনার এতো প্রিয়পাত্র, উনি কেমন করে রাজি হলেন আপনার বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান হতে?' স্নেহ সহজে দূর হওয়ার নয়। রাজ্জাক সাহেব উত্তর দেন, 'হি মাস্ট হ্যাভ কনভিনসড হিমসেল্‌ফ দ্যাট আই অ্যাম এ ব্যাড ইনফ্লুয়েনস অন দি ইউনিভার্সিটি কমিউনিটি।'

এশিয়াটিক সোসাইটির নির্বাচন জেতার পরে আমাদের কারো কারো মনে হলো, নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেন এমন বিদ্বৎসভায় স্থায়ী বিরোধের রূপ না নেয়, সে জন্যে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। সোসাইটির কাউনসিলে না হলেও জার্নালের সম্পাদনা-পরিষদে কিংবা এ-ধরনের অন্য কোনো কমিটিতে দুজনকে সহযোজিত করার সুযোগ ছিল। গিয়াস ও আমি গিয়ে হবিবুল্লাহ্ সাহেবকে বললাম, এ দুজন হওয়া উচিত আমাদের প্রতিপক্ষের লোক। উনি প্রশ্ন করলেন, তাঁরা আসবেন কেন? আমরা বললাম, চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী? খানিক আলোচনার পরে স্থির হলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবি বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সিরাজুল হক ও গ্রন্থাগারিক মুহম্মদ সিদ্দিক খানকে গিয়াস ও আমি গিয়ে অনুরোধ করব। আমাদের প্রস্তাবে তাঁরা সম্মতি দিলেন এবং বললেন, আমাদের এই মনোভাবকে তাঁরা খুব প্রশংসনীয় মনে করেন। বিরোধের একটা কাঁটা উৎপাটিত হলো।

কাউনসিলের প্রথম সভার একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। যাঁরা সোসাইটির সাধারণ সদস্যপদ নবায়ন করেননি, তাঁদের পুনরায় সদস্যপদ দেওয়ার ব্যাপারে কিছু কড়াকড়ি ছিল। এই নিয়ম শিথিল করে হবিবুল্লাহ্ সাহেব তাঁর এক স্নেহভাজনের হৃত সদস্যপদ ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। আমি আপত্তি করে বলি, নিয়ম সংশোধন না করে ব্যক্তিবিশেষের জন্যে তা শিথিল করা যায় না (বার্ষিক সভা ছাড়া নিয়ম সংশোধন করা যায় না—তা অনেকদিনের ব্যাপার)। হবিবুল্লাহ্ সাহেবের প্রস্তাব সেদিন পাশ হয় নি।

সভা শেষ হওয়ার পরে হবিবুল্লাহ্ সাহেব বললেন, সোসাইটির সভাপতিপদ উনি ত্যাগ করবেন। সবাই একযোগে 'কেন, কেন' বলে উঠলো। উনি বললেন, 'আমার

প্রস্তাব আমার লোকরাই বিরোধিতা করে। এরকম অবস্থায় আমার সভাপতি থেকে কী লাভ?' আমি তাঁর কাছে মাফ চাইলাম, কিন্তু এ কথাও বললাম যে, নিজের মতপ্রকাশের অধিকার আমার আছে। আমার কাছে যা মন্দ বিবেচিত হয়েছে, আমি তা বলেছি। তাতে তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে চাই নি। তিনি আমার কথা তেমন কানে তুললেন না। কিন্তু সবাই মিলে যখন তাঁকে অনুরোধ করলেন, তখন পদত্যাগের সংকল্পে আর অবিচলিত থাকতে পারলেন না।

৯.

অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক ১৯৩৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন পোলিটিকাল ইকনমি বিভাগের লেকচারার হয়ে। অল্পকাল পরে বিভাগটি ভেঙে ইকনমিকস ও পোলিটিকাল সায়েন্স নামে দুটি বিভাগে বিভক্ত হলে তিনি চলে যান শেষোক্ত বিভাগে। পঞ্চাশের দশকে ড. কার্ল জন নিউম্যান যখন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ, তখন বিভাগের দুজন শিক্ষকের সঙ্গে তাঁর বনাবনি হয় নি। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন খালিদ বিন সাঈদ, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে কানাডায় চলে যান। একবার তিনি ঢাকায় বেড়াতে এলে তাঁর মুখ থেকে এ-বিষয়ে কিছু কাহিনী শুনেছিলাম। দ্বিতীয়জন ছিলেন আবদুর রাজ্জাক। খালিদ বিন সাঈদ নিজের বিভাগে এক সময়ে রিডার পদপ্রার্থী হন। নিউম্যান তাঁর পদোন্নতি চান নি, তিনি রাজ্জাক সাহেবকে ওই পদে প্রার্থী হতে উৎসাহ দেন। রাজ্জাক সাহেব বলেন, খালিদ বিন সাঈদের অ্যাকাডেমিক যোগ্যতা তাঁর নিজের চেয়ে ভালো, ওই পদ তাঁরই প্রাপ্য। নিউম্যান যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে রাজ্জাক সাহেবকে দাঁড় করাতে চাইছেন, তাতে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোলেন যে, সাহেব লোক সুবিধার নন। সেই থেকে নিউম্যানের সঙ্গে তাঁর বৈরিতা প্রবল হয়। উত্তেজনা কমাতে বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ একবার স্থির করেন, রাজ্জাক সাহেব অর্থনীতি বিভাগে কিছু ক্লাস নেবেন, বাকিটা নেবেন নিজের বিভাগে। কিছুকাল পরে তাঁকে বলা হয় কিছু ক্লাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এবং কিছু ক্লাস আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে নিতে। তিনি নাকি ভাইস-চান্সেলরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এরপরে তাকে পদার্থবিজ্ঞান পড়াতে বলা হবে কিনা। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে পড়াতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে ওই বিভাগের অধ্যক্ষ, তাঁর ছাত্রতুল্য, ড. এম এ আজিজের বিরোধ উপস্থিত হয়। রাজ্জাক সাহেব এক সময়ে তাঁকে জানিয়ে দেন, পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে তিনি আর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে পড়াবেন না—তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে শিক্ষকতা করতে চুক্তিবদ্ধ, ইচ্ছে করলেই তাঁকে অন্য বিভাগে পড়াতে বাধ্য করা যায় না।

এই অবস্থায় আজিজ সাহেব লিখিতভাবে রাজ্জাক সাহেবকে ক্লাস নিতে অনুরোধ করেন। চিঠিপত্র খোলার ব্যাপারে সারের আলস্য ছিল চরম। ফলে তিনি চিঠি পড়েনওনি, তার জবাবও দেন নি। আজিজ সাহেব তখন ভাইস-চান্সেলরকে লেখেন, যেহেতু রাজ্জাক সাহেব তাঁর বিভাগে পড়াতে অনিচ্ছুক, অতএব তাঁকে নতুন শিক্ষক দেওয়া হোক। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে পড়াবেন না কেন, কর্তৃপক্ষ তার কৈফিয়ত

চান রাজ্জাক সাহেবের কাছে এবং জবাব না পেয়ে তাঁকে পদচ্যুত করার উদ্দেশ্যে কমিটি গঠন করেন। সাজ্জাদ সাহেবকে সভাপতি করে যে-কমিটি হয়েছিল, সেটা আরো আগে গঠিত হয়। সেটা কী নিয়ে এবং সে-কমিটির সুপারিশ কী ছিল, তা মনে পড়ে না। এই কমিটি তার থেকে পৃথক।

এতদিনে সার্ নড়াচড়া করলেন। তিনি ড. কামাল হোসেনকে গিয়ে বললেন মামলা করতে। তাঁর চাকরি চুক্তিভিত্তিক (তিরিশের দশকে সব শিক্ষকের নিয়োগের সময়ে চুক্তি-পত্রে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও রেজিস্ট্রার স্বাক্ষর করতেন এবং তাতে শর্তাবলি লেখা থাকতো)। কামাল বললেন, মামলা করতে হলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যক্ষ তাঁকে যে-চিঠিগুলো দিয়েছিলেন, তা দরকার হবে। রাজ্জাক সাহেব যথারীতি জানালেন, তাঁর কাছে চিঠি নেই। কামাল আমাকে বললেন, চিঠির কপি জোগাড় করে দিতে।

তার একটাই উপায় ছিল। আমি গিয়ে আজিজ সাহেবকে বললাম, 'ক্লাস নেওয়ার ব্যাপারে আপনি যেসব চিঠি সার্কে দিয়েছিলেন, তার কপি চাই।' তিনি জানতে চাইলেন, কী হবে। বললাম, সার্ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মামলা করবেন। আজিজ সাহেব একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'টাইপিস্টকে দিয়ে তো চিঠি কপি করানো যাবে না—আমাকেই করতে হবে। আপনি বিকেলে আসুন, আমি লাঞ্চ আওয়ারে কপি করে রাখবো।' সে যুগে ফটোকপিয়ার ছিল না।

আমি কপিগুলো কামালকে দিলাম। মামলা চললো। একটা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যক্তির পক্ষে লড়াই করা সহজ নয়। সুতরাং আপস-নিষ্পত্তির কথা উঠলো। ঠিক হলো, রাজ্জাক সাহেব পদত্যাগ করবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ তাঁর সকল পাওনা মিটিয়ে দেবেন। কামাল ব্যবস্থা করে দিলেন, অক্সফোর্ডের সেন্ট অ্যান্টনিজ কলেজে সার্ এক বছর থাকবেন, তারপর দেখা যাবে।

রাজ্জাক সাহেব তাঁর টাকাপয়সা নেওয়ার দায়িত্ব আমাকে প্রদান করে, দশ-বারোটা ব্ল্যাংক চেক সই করে, বিলি-ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়ে, এক সন্ধ্যায় বিলেত রওনা হলেন। আমরা কয়েকজন তাঁকে বিদায় দিতে গেলাম। সকলের মুখ ভার। হঠাৎ করে কুলসুম হুদা সারের পরনের স্যুটের দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইছিলেন, 'সার্, এতদিন এগুলো রাখছিলেন কই? হাঁড়ির ভিতর?'

সার্ হাসলেন, আমরা হাসলাম। তারপর তিনি আমাদের ছেড়ে ডিপার্চার-লাউনজের দিকে চলে গেলেন।

১০.

খানিকটা হঠাৎ করেই ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ বাংলা ব্যাকরণ, বানান ও বর্ণমালার সংস্কার ও সরলীকরণের উদ্‌যোগ নিলেন। উদ্‌যোগটা আকস্মিক ছিল না, আকস্মিক ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লেষ। পাকিস্তান সরকার ১৯৪৮ সালেই আরবি হরফে বাংলা প্রবর্তনের জন্যে খুব চেষ্টা করেছিলেন, কয়েক বছর ধরে বৃথা

অর্থব্যয় করে তাঁরা ক্ষান্ত হন। প্রাদেশিক সরকার ১৯৪৯ সালে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁকে সভাপতি করে 'পূর্ববঙ্গ ভাষা কমিটি' গঠন করেছিলেন। এই কমিটি উর্দু (তাঁদের মতে, আরবি হরফে বাংলার সব ধ্বনি প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তাই নতুন যেসব বর্ণ এতে আমদানি করা হবে তাতে বর্ণমালা আরবি না থেকে উর্দু হয়ে যাবে) বা রোমান হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব বিশ বছরের জন্যে মুলতুবি রাখতে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তবে বাংলা বর্ণমালা, বানানরীতি, ব্যাকরণ, শব্দভাণ্ডার ও বাগ্‌বিধি সরলীকরণের সুপারিশ করেছিলেন। যে-কোনো কারণেই হোক, ১৯৫৯ সালের আগে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু এর মধ্যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, মুহম্মদ আবদুল হাই, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও ফেরদাউস খান পৃথক পৃথকভাবে বাংলা বর্ণমালা ও বানান সংস্কারের প্রস্তাব করেন। ১৯৬৬ সালে সৈয়দ আলী আহসানের সভাপতিত্বে বাংলা একাডেমী-গঠিত একটি বিশেষজ্ঞ-পরিষদ বাংলা বর্ণমালা-সংস্কারের সুপারিশ করে; এই পরিষদের সদস্য ছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল হাসনাত, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুহম্মদ ওসমান গনি, ফেরদাউস খান, মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। শহীদুল্লাহ্‌ বহুকাল ধরেই বর্ণমালা ও বানান-সংস্কারের কথা বলে আসছিলেন—প্রধানত এই বিশ্বাস থেকে যে, এতে সর্বজনীন সাক্ষরতার সুবিধে হবে। তবে, আমি যতদূর জানি, তিনি বাংলা ব্যাকরণের ওপর সংস্কৃতের নিগড় পছন্দ না করলেও প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণের তেমন সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন না। একবার এক সংস্কারবাদী তাঁকে বলেছিলেন, 'সার্‌, বাংলা ব্যাকরণ থেকে লিঙ্গ-টিঙ্গ উঠিয়ে দিতে হবে।' শহীদুল্লাহ্‌ নির্লিপ্তভাবে বলেছিলেন, 'আছেই তো এতটুকু, তাও কেটে ফেলো।' কথাবার্তায় শহীদুল্লাহ্‌ ছিলেন সেকেলে বাঙালি, তাই মাঝে মাঝে 'বদজবান' মুখে আনতে তাঁর বাধতো না—তিনি বলতেন, এ-শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সান্নিধ্যে থেকে (একবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতিরূপে ভাষণ দিতে গিয়ে সংস্কৃতানুসারী বাংলা লেখার প্রবণতাকে বিদ্রূপ করে শাস্ত্রী বলেছিলেন, 'একজন সে দিন বড় রাস্তাকে "রাজমার্গ" ও বাঁশ লইয়া যাওয়াকে "বংশপরিচালনা" লিখিয়া বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন।')

এহেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের এক প্রবল পুরুষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের এককালীন শিক্ষক, বাংলা কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কাসেম এসে পাকড়াও করলেন, বাংলা ভাষার সরলীকরণ আশু কর্তব্য। কাসেম সাহেবের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউনসিল বাংলা ব্যাকরণ, বানান ও বর্ণমালার সংস্কার ও সরলীকরণের জন্যে শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবকে সভাপতি করে একটি কমিটি করলেন—এর সদস্যদের মধ্যে মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, ফেরদাউস খান, মুনীর চৌধুরী, কাজী দীন মুহম্মদ ও আবুল কাসেম ছিলেন। কিছুকাল পরে শহীদুল্লাহ্‌ সাহেব অসুস্থ হয়ে গেলেন—সংস্কারপন্থীরা তার সুযোগও নিলেন। ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে রিপোর্ট পেশ করলেন কমিটি—অসুস্থ শহীদুল্লাহ্‌র স্বাক্ষর ছাড়াই—তখন দেখা গেল, মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুনীর চৌধুরী ভিন্নমতপোষক টীকা সংযোজন করেছেন।

এনামুল হক বরাবরই সংস্কারবিরোধী ছিলেন, কিন্তু অন্য দুজন তো কোনো না কোনো সংস্কার-প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন, এখন তাঁরা আপত্তি করছেন কেন? এই প্রশ্নের জবাবে মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুনীর চৌধুরী আমাকে বলেন, আগে তাঁরা যা করেছিলেন, তা ছিল অ্যাকাডেমিক এক্সারসাইজ, কিন্তু তাঁদের সন্দেহ, এই সরলীকরণ-প্রস্তাবের পেছনে সরকারি হাত আছে, এটা কেবল বাংলাভাষার মঙ্গলকামনা থেকে উৎসারিত নয়। অধিকাংশের মতের বিরোধিতা করে তাঁরা বললেন, এ-ধরনের সংস্কার করলে বিশৃঙ্খলা বাড়বে এবং ভ্রান্তি বিভ্রান্তিতে পরিণত হবে। অ্যাকাডেমিক কাউনসিলে যখন রিপোর্ট গেল, তখন কবীর চৌধুরীও ভিন্নমত সমর্থন করলেন, কিন্তু সংখ্যাধিক্যে তা পাশ হয়ে গেল।

সরলীকরণের প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ার পরে সম্মুখযুদ্ধে প্রথমেই নামেন মুনীর চৌধুরী। হাসান হাফিজুর রহমানের কল্যাণে *দৈনিক পাকিস্তানকে* তিনি পান সহায়করূপে। তাতে সরলীকরণ-প্রয়াসের অসারতা ব্যাখ্যা করে সাধারণ পাঠকের উপযোগী বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন তিনি—সংস্কারপ্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়ায় তার কোনো কোনোটি রচিত হয় সাধুভাষায়। *দৈনিক পাকিস্তানে* কাজী মোতাহার হোসেন এবং আরো কেউ কেউ একই ধরনের মত প্রকাশ করে প্রবন্ধ লেখেন। সংস্কারপ্রস্তাব পাশ হয়ে গেলে হাসানের উৎসাহে *পরিক্রম* পত্রিকায়ও রচনা প্রকাশ করেন মুনীর চৌধুরী। হাসান নিজেও লেখেন *দৈনিক পাকিস্তানে*। জসীমউদ্‌দীন এক বিবৃতি দিয়ে বলেন, সারাজীবন তিনি বাংলা বানান নিয়ে ভুগেছেন, কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াস তিনি সমর্থন করতে পারেন না। তাঁর মতে, সংস্কার যদি করতেই হয়, তাহলে পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তানের পণ্ডিতেরা একত্র বসে যাতে একই ধরনের সুপারিশ করেন, তার ব্যবস্থা করা দরকার। ভাষার ক্ষেত্রে নৈরাজ্যসৃষ্টির বিরুদ্ধে লেখেন আবুল হাশিম। বহু বিশিষ্টজন যুক্ত বিবৃতি দিয়ে প্রতিবাদ জানান, অনেক সংগঠনও আপত্তি প্রকাশ করে। সংস্কৃতি সংসদের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে মফিদুল হক। আমি তার মুসাবিদা করে মুনীর চৌধুরীকে দেখাই। তিনি দু-একটি জায়গা সংশোধন করে দেন এবং সংশোধন-সংবলিত পাণ্ডুলিপি ফেরত চেয়ে নেন। শামসুর রাহমানের বিখ্যাত 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' কবিতাটি এ-সময়েই লেখা হয়। ক্রিসমাস ট্রির অনুকরণে কামরুল হাসান উদ্ভাবন করেন বর্ণতরু এবং নানা জায়গায় তা বসানো হয়। একুশে ফেব্রুয়ারিতে নতুন ধরনের ব্যাজ চালু হয় : বড়ো করে একটি বর্ণ এঁকে তার ওপরে-নিচে লেখা হয়, 'একটি বাংলা অক্ষর/একটি বাঙালীর জীবন'। এই আন্দোলনের স্রোতে সংস্কারপ্রস্তাব ভেসে যায়।

১১.

১৯৬৮ সালে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমাগত আলোড়িত হতে থাকে। বছরের একেবারে শুরুতেই সংবাদপত্রের খবরে জানা যায়, ভারতের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও

বিমানবাহিনীর কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন সদস্য, সিভিল সার্ভিসের কয়েকজন উচ্চপদস্থ আমলা এবং জেলা পর্যায়ের কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতাসহ ২৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঢাকা সেনানিবাসে এদের সকলকে আটক রেখে মামলা রুজু করা হয়। সবিস্ময়ে লক্ষ করি, এর মধ্যে আমার কয়েকজন বন্ধু ও পরিচিতের নাম আছে : নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট আবদুর রউফ, সিভিল সার্ভিসের খান শামসুর রহমান, আর্মি মেডিক্যাল কোরের মেজর শামসুল আলম, ই পি আরের ক্যাপ্টেন এ এন এম নূরুজ্জামান ও বিমানবাহিনীর সার্জেন্ট জহুরুল হক। নূরুজ্জামান একবার ঢাকায় এসে আমার ডায়েরিতে তাঁর নাম-ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন। মনে হলো, এখন ডায়েরিটা লুকিয়ে রাখাই ভালো। কয়েকদিনের মধ্যে কারাবন্দি শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিয়ে আবার জেলগেটে গ্রেপ্তার করে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আসামী বলে দেখিয়ে ঢাকা সেনানিবাসে আটক করা হয়। মাস কয়েকের মধ্যেই এঁদের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই মামলার জন্যে সরকার গঠন করেছিল স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল—তার প্রধান ছিলেন লাহোর হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এস এ রহমান, আর সদস্য ছিলেন ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি মকসুমুল হাকিম ও বিচারপতি এম আর খান। শুনানি হয় সেনানিবাস এলাকায়, তবে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার ছিল বলে প্রতিদিন সংবাদপত্রে তার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হতে থাকে—সেটাই হয়ে ওঠে প্রত্যেকদিন পড়ার প্রধান বিষয়। এতে করে জনমত গড়ে ওঠে অভিযুক্তদের পক্ষে।

এদিকে সে-বছর অক্টোবরে আইয়ুব খানের ক্ষমতায় আরোহণের দশবছর পূর্তি হবে। সে-উপলক্ষে চারদিকে সাজসাজ রব পড়ে গেল। তার আগেই আইয়ুব খান প্রকাশ করেছিলেন আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *ফ্রেন্ডস নট মাস্টার্স*। ঢাকার কাগজে তার বিভিন্ন অংশের অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকলো। নূরুল মোমেন, মুনীর চৌধুরী ও হাসান হাফিজুর রহমান এসব অনুবাদ করেছিলেন। অনুবাদ-সম্পাদনার দায়িত্ব পড়লো সৈয়দ আলী আহসানের ওপরে। *প্রভু নয় বন্ধু* প্রকাশের ভার নিলেন ঢাকার অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। ওই প্রকাশনীর কর্তা রিয়াজুল ইসলাম একদিন আমার বাসায় এসে প্রস্তাব দিলেন বইটির নির্ঘণ্ট তৈরি করে দেওয়ার এবং আভাস দিলেন, সম্মানী ভালোই পাওয়া যাবে। আমি অপারগতা জানালাম। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনার নিকটজনেরাই বইটির বাংলা ভার্শনের সঙ্গে জড়িত, তাই আপনার কাছে এসেছিলাম।' পরে তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন, আমাদের বিভাগেরই এক শিক্ষক নির্ঘণ্ট তৈরির কাজটা নিয়েছেন।

'উন্নয়নের দশ বছর' উপলক্ষে অনেক কিছু হবে। টেলিভিশন থেকে প্রস্তাব এলো, এই দশ বছরে পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সম্পর্কে কিছু বলতে। এনায়েতউল্লাহ খান অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন এবং মুনীর চৌধুরী হবেন অপর অংশগ্রহণকারী। আমি মাফ চেয়ে নিলাম। পরের দিন মুনীর চৌধুরীকে সবটা বিবৃত করলাম। তিনি খুশিই হলেন। বললেন, 'যদি না করে পারো, ভালোই। আমার উপায় নেই।' বেতার থেকে আমন্ত্রণ এলো উন্নয়নের দশ বছর-উপলক্ষে কথিকা রচনা ও পাঠ করতে। সেখানেও আমার একই উত্তর। যাঁরা আমার কাছে এসব প্রস্তাব করছিলেন—

আমার টেলিফোন ছিল না বলে তাঁদেরকে আসতে হয়েছিল আমার বাসায়—আমার মনে হয়, তাঁরা অনেকেই আমার অসম্মতিতে ভেতরে ভেতরে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

ধুমধাম করে উন্নয়ন-দশকের উৎসব হয়ে গেল। তারপরই শুরু হলো আইয়ুবের পতনের প্রক্রিয়া—তার সূচনা হলো পশ্চিম পাকিস্তানে। ছোটো একটা ঘটনায় প্রশাসনের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষ ঘটে, তারপর এটি রূপ নেয় সরকারবিরোধী আন্দোলনের। এই আন্দোলনের সঙ্গে সংস্রবের কারণে নভেম্বরে গ্রেপ্তার করা হয় জুলফিকার আলী ভুট্টোকে। ডিসেম্বর মাসেই পূর্ব পাকিস্তানেও দেখা দিলো আইয়ুব-বিরোধী কর্মসূচি। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ইউনিয়ন যুক্তভাবে পল্টন ময়দানে জনসভা আহ্বান করে ৬ ডিসেম্বরে। তাতে মওলানা ভাসানী ছিলেন সভাপতি। সভাশেষে মওলানা সাহেব বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে গভর্নমেন্ট হাউজের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয় এবং বিক্ষোভকারীদের লাঠিচার্জ করে। প্রতিবাদে পরপর দুদিন হরতাল হয়—আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারা প্রদেশে। নীলক্ষেতে একদিন পুলিশের গুলিতে দুজন মারা যায়। গুলির আওয়াজ শুনে বাড়ি থেকে ছুটে যাই। রেললাইনের কাছে শিল্পী ইমদাদ হোসেনের সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে দেখে বললেন, 'রেনিগেডরাও তাহলে মাঝে মাঝে পেছনে ফিরে দেখে!'

৬ ডিসেম্বরের জনসভার আয়োজনে মোহাম্মদ সেলিমের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা কর্তব্য। সেলিম আমাদের সঙ্গে যুবলীগে সক্রিয় ছিল। তখন সে ছিল ঢাকা রিকশাচালক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক। আমি যতদিনে ছাত্র থেকে শিক্ষক হয়েছি, সেলিম ততদিনে ঢাকা বেবী ট্যাক্‌সি ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হয়েছে। আমি যখন নীলক্ষেতে, তখন একদিন বাড়ির সামনে অটোরিকশা থামিয়ে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সেখানে ডা. সারোয়ার আলীর সঙ্গেও তার দেখা হয়। ৬ ডিসেম্বরের জনসভা সফল করতে সে খুব পরিশ্রম করেছিল এবং তার ইউনিয়নের সকলকে এ কাজে নিয়োগ করেছিল।

১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজের ১১ দফা ঘোষিত হলো : তার এক দফায় শিক্ষাসংক্রান্ত দাবি, আরেক দফার অন্তর্ভুক্ত হয় ছয় দফা-কর্মসূচি; প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় নির্বাচনের দাবিতে এক দফা, আরেক দফা বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ দাবিতে; কৃষক-শ্রমিকদের পক্ষে দাবি কোনো কোনোটায়, কোনোটায় দাবি সামরিক চুক্তি বাতিলের। এই প্রথমবার বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন এমন ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাবিনামা পেশ করে। এর স্বাক্ষরকারীরা ছিলেন : ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুর রউফ ও সাধারণ সম্পাদক—আমাদের বিভাগের ছাত্র—খালেদ মোহাম্মদ আলী; ছাত্র ইউনিয়নের এক অংশের সভাপতি সাইফুদ্দিন আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক শামসুদ্দোহা; ছাত্র ইউনিয়নের অপর অংশের সভাপতি মোস্তফা জামাল হায়দার ও সহ-সম্পাদিকা—অমিতসাহসী—দীপা দত্ত; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদের সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক নাজিম কামরান চৌধুরী। এটাও উল্লেখযোগ্য যে, এন এস এফের একটা বড়ো অংশ এই আন্দোলনে যোগ দেয়। সবদলের ছাত্রনেতাদের নিয়ে যে-সংগ্রাম

পরিষদ গড়ে ওঠে, তাতে এন এস এফের সভাপতি মাহবুবুল হক দোলন (ও সাধারণ সম্পাদক নাজিম কামরান চৌধুরী) ছিলেন।

১৭ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যেদিন বিক্ষোভ করলো, তাদের অনেককে সেদিন দেখলাম, পুলিশের বাধা অগ্রাহ্য করে কলাভবনের গেট দিয়ে রাস্তায় বেরোবার চেষ্টা করছে। গেটের কাছেই ছাত্রদের আক্রমণ করলো পুলিশ এবং আমাদের বিভাগের ছাত্র সৈয়দ মাহবুবুল আলম (পরে সোনারগাঁওয়ের লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালক) এবং আরো কয়েকজনকে লাঠিপেটা করে পুলিশের গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল। আমরা দোতলার বারান্দা থেকে দেখছিলাম—মাহবুব বেশ লম্বা বলে ওকে চিনতে পেরেছিলাম। মনটা গ্লানিতে ভরে গেল। শিক্ষকদের পক্ষ থেকে যে প্রতিবাদ করা দরকার, তা খুব করে অনুভব করলাম।

কিন্তু আমাদের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষা না করে ঘটনা দ্রুত ঘটতে লাগলো। রোজই প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, মিছিল, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ। তার মধ্যে ২০ জানুয়ারিতে পুলিশের গুলিতে আসাদুজ্জামান নিহত হলো। খবর পেয়ে আমরা কজন পায়ে হেঁটে বের হলাম। কার্জন হল পেরিয়ে চাঁদ খান পুলের দিকে আসতে দেখি, আসাদের রক্তাক্ত শার্ট নিয়ে মিছিল হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি থেকে সেদিনই আমরা প্রতিবাদ জানালাম, মৌন মিছিল করলাম পরদিন। ভাইস-চান্সেলর ছাত্র-নির্যাতনের নিন্দা করে বিবৃতি দিলেন, অধ্যাপক ইন্নাস আলীর সভাপতিত্বে শোকসভা হলো মহসিন হলে। বিশাল গায়েবানা জানাজা হলো, ছাত্রীরা বড়ো মিছিল করে এলো সুশৃঙ্খলভাবে। মনে হলো, জীবন আর আগের মতো রইলো না।

১৪৪ ধারা জারি করে কাজ হয় না, সান্ধ্য আইন জারি হয়। তাতেও লাভ হয় না। কয়েকদিনের মধ্যেই প্রাণ দেয় নবকুমার ইনস্টিটিউশনের দশম শ্রেণীর ছাত্র মতিউর রহমান। দিনের বেলায় সচিবালয় আক্রমণের চেষ্টা, মর্নিং নিউজ ও দৈনিক পাকিস্তান অফিসে অগ্নিসংযোগ, *ফ্রেন্ডস নট মাস্টার্স* পোড়ানো, আইয়ুবের কুশপুত্তলিকা দাহ; রাতের বেলায় কারফিউ লঙ্ঘন, শ্লোগানে শ্লোগানে শহর মুখরিত। সেনাবাহিনী নামানো হলো, তাদের গুলিতে নাখালপাড়ায় ঘরের মধ্যে শহীদ হলো শিশুসন্তান-কোলে জননী আনোয়ারা। এখানে ছাত্র প্রাণ দিচ্ছে, ওখানে মরছে অন্য পেশার মানুষ। গগনবিদারী ধ্বনি উঠছে : 'আসাদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না'; 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো'। পাড়ার ছোটো ছেলেমেয়েরাও এসব আউড়ে ঘরের সামনে মিছিল করছে। আইয়ুবের শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন এখন সারা পাকিস্তানেই।

১৫ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা সেনানিবাসে নিহত হলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হক। এই খবর পাওয়ার পর পরই ছাত্রেরা ইকবাল হলের নাম পরিবর্তন করে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল রাখে। আর সেদিনই আক্রান্ত হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন ও প্রাদেশিক মন্ত্রী খাজা হাসান আসকারির বাড়ি। সরকারের যে-অতিথি ভবনে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারপতি এস এ রহমান থাকতেন, সেটাও আক্রান্ত হয় এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি মুলতুবি রেখে বিচারপতি পালিয়ে যান লাহোরে। আরো বহুজন প্রাণ দেয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি

সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্যরত প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহা। সারা দেশ ক্রোধে ফেটে পড়ে।

১৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে আমরা সভা করলাম প্রতিবাদজ্ঞাপন ও শিক্ষকদের কর্মসূচি নেওয়ার জন্যে। আমাদের আমন্ত্রণে পরে এলেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নেতারা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ফজলী হোসেনকেও ঘটনাক্রমে পাওয়া গেল। আমরা এই হত্যার বিচার চাইলাম এবং বিচার না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিলাম। টেলিফোনে তা জানিয়ে দেওয়া হলো সব বিশ্ববিদ্যালয়ে। দু-একদিনের মধ্যেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলর অধ্যাপক মুহাম্মদ শামস-উল হক ঢাকায় এলেন। ওঁর বাড়িতে গিয়ে আমরা কেউ কেউ পরিস্থিতি আলোচনা করলাম। উনি প্রাদেশিক গভর্নর তথা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চান্সেলর মোনায়েম খানের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি নিয়ে। মোনায়েম খানকে দেখলাম একেবারে ভিন্ন চেহারায় : মৃদুকণ্ঠ, সংযত, কথায় বুঝি বা একটু দুঃখেরও আভাস। বললেন, সামরিক কর্তৃপক্ষ জোহার হত্যার বিচার করতে চাইছে না। আমরা দাবি করলাম, 'আপনি প্রেসিডেন্টকে বলুন।' তিনি সম্মত হলেন; বললেন, সন্ধ্যায় যেতে। সন্ধ্যায় আমাদের সামনেই বার দুই ফোন করলেন প্রেসিডেন্টকে—তাঁকে বলা হলো, তিনি ব্যস্ত আছেন। এবারে সত্যিকার দুঃখের সঙ্গে মোনায়েম খান বললেন, 'প্রেসিডেন্ট এখন কথা বলছেন বিরোধীদলের নেতা নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের সঙ্গে; আর আমি তাঁর গভর্নর—আমার টেলিফোন ধরছেন না।' তিনি জানালেন, ঢাকায় জি ও সি-র সঙ্গে তাঁর আবার কথা হয়েছে—জোহা-হত্যার ব্যাপারে জি ও সি রিপোর্ট চেয়েছেন রাজশাহীর সামরিক-কর্তৃপক্ষের কাছে। সেনা-সদর থেকে নির্দেশ না পেলে কোনো তদন্ত তাঁরা করবেন না। আমাদের ধর্মঘটের কর্মসূচি অপরিবর্তিত রইলো।

জোহা-হত্যার পরপরই সরকারিভাবে একুশে ফেব্রুয়ারি ঘোষিত হলো ছুটির দিন বলে। বেতার ও টেলিভিশনেও এই উপলক্ষে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠান করা হলো। ২১ তারিখ রাতে আইয়ুব ঘোষণা করলেন, তিনি আর ভবিষ্যতে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হবেন না। তাতেও আন্দোলনের তীব্রতা কমলো না। ২২ তারিখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হলো।

এর আগে আইয়ুব খান শেষরক্ষা করতে চেয়েছিলেন রাজনীতিবিদদের সঙ্গে গোলটেবিল আলোচনা করতে চেয়ে—এর জন্যে তিনি শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তিদানের প্রস্তাব করেন। আমার বাসায় এক সকালে দুই ব্যারিস্টার—আমীরউল ইসলাম ও মওদুদ আহমদ—এলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবের কৌসুলি হয়ে বিলেত থেকে এসেছিলেন টম উইলিয়ামস, কিউ সি—মওদুদ তাঁর সচিবের কাজ করছিলেন। সেদিন সকালে আমীরউল আর মওদুদ বললেন, শেখ সাহেবকে প্যারোলে ছেড়ে গোলটেবিলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে—আমি যেন তখনই ড. কামাল হোসেনকে গিয়ে বোঝাই যে, এটা ঠিক হবে না। তদ্দণ্ডেই কামালের কাছে গেলাম। দেখলাম, আমার আসার দরকার ছিল না—কামাল নিজেই

এ-শর্ত মানতে অনিচ্ছুক। পরে শুনেছিলাম, শেখ সাহেবের প্যারোলে পিন্ডি যাওয়ার ব্যাপারে প্রবল আপত্তি করেছিলেন বেগম মুজিব।

গোলটেবিলে যোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন শেখ মুজিব। মওলানা ভাসানী ও বিচারপতি এস এম মুরশেদও অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। ভুট্টো, আসগর খান, আজম খান—এঁরাও যাবেন না বলে জানালেন। ২২ তারিখে কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন শেখ মুজিব। মুক্ত হয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন, এমন খবর পেয়ে আমরা কলাভবনে অপেক্ষা করলাম। শুনতে পেলাম, ভাইস-চান্সেলরও নিজের অফিসে অপেক্ষা করছেন—মুজিব এলে ছুটে আসবেন বলে। মুজিব আসেননি। ২৩ তারিখে রেসকোর্সে বিশাল সভা হলো তাঁর সংবর্ধনায়—সেখানেই তোফায়েল আহমদ তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' ঘোষণা করলো। ২২ তারিখে বহু রাজনৈতিক নেতাকে মুক্তি দেওয়া হয়—তাঁদের অনেকের সংবর্ধনা হয় ২৪/২৫ তারিখে।

গোলটেবিল বৈঠক শেষ পর্যন্ত বসেছিল মার্চের ১১ তারিখে। বঙ্গবন্ধু সেখানে ৬ দফা ও ১১ দফা দাবি পেশ করেন, কিন্তু তা বিবেচিত হয়নি। আইয়ুব মেনে নেন দুটি দাবি : প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ গঠন এবং সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। ফলে বৈঠক ব্যর্থ হয়। ঢাকায় ফিরে বঙ্গবন্ধু বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন। পূর্ব পাকিস্তানের যেসব নেতা ৬ দফা ও ১১ দফা সমর্থন করেননি, তাঁরা ছাত্রদের ক্রোধের শিকার হন; কেউ কেউ সাময়িকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে রয়ে যান। মোনায়েম খান পদত্যাগ করেন, ড. এম এন হুদা পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে শপথ নেন ২৩ মার্চে।

১২.

গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে ডিপ্লোমার জোরে বেবী একটা চাকরি পেয়ে গিয়েছিল ব্রিটিশ কাউনসিলে। লাইব্রেরিটা বাড়ির কাছে, হেঁটেই আসা-যাওয়া করা যায়। রুচি ঘরে থাকে কাজের লোকের কাছে—মাঝে মাঝে তিন তলার জুনলী ভাবী কিংবা রেণু দেখাশোনা করেন অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসের ফাঁকে সময় পেলে আমার শ্যালিকা নাজু এসে তত্ত্বাবধান করে। বছরখানেক চাকরি করে বোধহয় ১৯৬৮ সালের শেষে বেবী অব্যাহতি নিলো সন্তানসম্ভবা হওয়ায়। আমার বন্ধু আবদুল আলীকে সে যখন জানালো, 'খোকন ভাই, চাকরি ছেড়ে দিলাম', তখন আলী বললো, 'খুব ভালো করেছেন; আমার স্বামী থাকলে আমিও চাকরি করতাম না।'

ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলে রুচি ভর্তি হলো ১৯৬৯ সালে। তার সহপাঠীদের মধ্যে ছিল আমার শিক্ষক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর বড়ো ছেলে সুমন, আমার বন্ধু তোফাজ্জল হোসেনের বড়ো ছেলে আরিফ, আর আমার আরেক বন্ধু সাংবাদিক শহীদুল হকের বড়ো ছেলে বাবু। সন্তানদের নিয়ে চারজনেরই মা আসেন স্কুলে, ক্লাসের পুরোটা সময় বসে থাকেন সেখানে, তুমুল আড্ডা দেন, কিছু খাওয়া-দাওয়াও হয়।

অচিরে ঘটলো গণ-অভ্যুত্থানের সূচনা। ফেব্রুয়ারি মাসে আন্দোলন যখন তুঙ্গে,

তখন একদিন—একুশে তারিখে কি?—অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়ই বেবী মিছিলে যোগ দিয়ে চলে গেলো কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে বাহাদুর শাহ পার্কে। সে-সময়ে আন্দোলন এমনি করেই টেনেছিল প্রায় সবাইকে।

আন্দোলনকারীদের জন্যে আমাদের ঘরবাড়িও ছিল অবারিত। পুলিশ ইকবাল হল ঘেরাও করলেই তাদের অনেকে একবস্ত্রে শিক্ষকদের আবাসে আশ্রয় নিতো। অজ্ঞাতনামা অনেক ছাত্র আমাদের ফ্ল্যাটে কোনো না কোনো রাতে আত্মগোপন করে থেকেছে। সুপরিচিতদের মধ্যে একরাত কাটিয়েছিলেন সিরাজুল আলম খান, আরেক রাত শাজাহান সিরাজ। এরা প্রায়ই অভুক্ত অবস্থায় হল ছেড়ে আসতো। বেবী সাধ্যমতো চেষ্টা করতো এদের কিছু খাওয়াতে। তবে তারা সকলেই তাতে খুব কুণ্ঠাবোধ করতো।

বঙ্গবন্ধুর কারামুক্তিতে ও মোনায়েম সরকারের বিদায়ে সে-আন্দোলনের বিজয় সূচিত হয়। তবে হঠাৎ করেই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বেশ অবনতি ঘটে। কোথাও শ্রমিক-অসন্তোষ, কল-কারখানায় সংকট : ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের নেতা তোফায়েল আহমদের ডাক পড়ে মীমাংসা করতে। গ্রামাঞ্চলে কোথাও প্রকৃত অপরাধীর চোখ তুলে নেয় অন্যেরা, কোথাও বা ব্যক্তিগত আক্রোশের বশবর্তী হয়ে কাউকে অপরাধী বলে, কাউকে গণশত্রু বলে চিহ্নিত করে শাস্তিবিধান করা হয়। ২৩ মার্চ ড. হুদা নতুন গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নিলেও এসব ক্ষেত্রে কিছু করে ওঠার সুযোগ পাননি।

সেই উত্তাল দিনগুলোর মধ্যে চিঠি এলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে : আমার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২৬ মার্চ সকালে সাক্ষাৎকারে হাজির হতে হবে। তাই ২৫ মার্চ সকালে পি আই এ-র ফ্লাইটে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে গিয়ে পৌঁছোলাম, উঠলাম বাটালি পাহাড়ের পাদদেশে আবদুল আলীর সরকারি বাসভবনে : তিনি সেখানে রেলওয়ের হিসাব বিভাগের কর্মকর্তা। বিকেলে আমরা দুজনে গেলাম আমার কলেজ-জীবনের সহপাঠী—এক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বড়ো সাহেব—কুতুবউদ্দীন আহমদ চৌধুরীর বাড়িতে চা খেতে। দেশের পরিস্থিতি আলোচনা করতে করতে সেখানে বসেই বেতারের খবরে জানলাম, আইয়ুব খান সকল ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন সেনাবাহিনী-প্রধান ইয়াহিয়া খানের কাছে, দেশে সামরিক আইন জারি হয়েছে।

তখন আর বসে থাকার প্রশ্ন ওঠে না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললাম : 'এরপর আর পাকিস্তানের দুই অংশের একত্র থাকা অর্থহীন।' এমন কথা এর আগে কখনো বলিনি, ভাবিওনি। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থানকালের এতো আত্মদান ব্যর্থ করে যে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হলো, তা কুঠারাঘাত করলো আমাদের সকল গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলে।

পরদিন সকালে আলীর বড়ো ভাই আলিম সাহেবের গাড়ি করে, শহর থেকে দূরে, বিচিত্র সব রাস্তা পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছোলাম। জানা গেল, ভাইস-চান্সেলর ড. এ আর মল্লিককে ক্যান্টনমেন্টে ডেকে নিয়েছেন স্থানীয় সামরিক আইন প্রশাসক। তাঁর ফিরে আসতে বেশ দেরি হলো। শুনলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তার মানে, ছাত্র-শিক্ষকদের ক্লাসে ফিরে আসতে হবে অবিলম্বে। বড়ো গ্লানিবোধ হলো। জোহা-হত্যার প্রতিবাদে অবিরাম ধর্মঘটের

যে-ঘোষণা আমরা দিয়েছিলাম, বিনা ঘোষণায় এখন তা প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

যথারীতি সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হলো। সরকারি কলেজের এক অধ্যাপক এসেছিলেন সাক্ষাৎকারে। আহমদ শরীফ ওই পদের একজন প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু সাক্ষাৎকারে আসেননি—অনুরোধ জানিয়েছিলেন, অনুপস্থিতিতেই তাঁর প্রার্থিতা বিবেচনা করতে। শরীফ সাহেব সাক্ষাৎকারে যাননি খানিকটা হাই সাহেবের ওপরে অভিমান করে। বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁর মতামত তিনি আমাদেরও জানতে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, আমরা দুজনেই ওই পদের যোগ্য, তবে বাছাই করতে হবে বিভাগের প্রয়োজন দেখে। সেখানে যদি মধ্যযুগের সাহিত্য পড়াবার জন্যে শিক্ষকের প্রয়োজন থাকে, তাহলে অবশ্যই শরীফ সাহেবকে নির্বাচন করতে হবে। আর যদি আধুনিক সাহিত্য পড়াবার লোক দরকার হয়, সেক্ষেত্রে আমাকে বাছাই করা কর্তব্য। শরীফ সাহেব আমাকেই বলেছিলেন : 'এটা কোনো এক্সপার্ট-ওপিনিয়ন হলো—এও ভালো, সেও ভালো, এমন সুপারিশ তো অর্থহীন!' মুনীর চৌধুরী আমাকে একটা প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন—তাতে বলেছিলেন, সহকর্মীদের মধ্যে তিনি আমাকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন। সন্ধ্যার দিকে খবর পাওয়া গেল, চাকরিটা আমার হবে।

কয়েকদিন পরে ঢাকায় ড. কাজী মোতাহার হোসেনের সঙ্গে দেখা হলে উনি জানতে চান : 'তুমি যে চাটগাঁয়ে অ্যাপ্লাই করেছিলে—তার ইন্টারভিউ কি হয়ে গেছে?' বললাম : 'জি, সার্।' 'কার হলো?' 'শুনেছি, আমি সিলেকটেড হয়েছি।' 'ভালো। আমি উপস্থিত থাকলে তোমাকেই নিতে বলতাম।' তখন বুঝলাম, উনি নির্বাচনী বোর্ডের একজন সদস্য ছিলেন, কিন্তু ওঁকে সাক্ষাৎকারের সময়ে তো দেখিনি। জিজ্ঞাসা করলাম : 'আপনি বুঝি ওপিনিয়ন পাঠিয়েছিলেন, সার্?' বললেন, 'না। আমি যাবো ঠিক করেছিলাম কিনা, তাই ওপিনিয়ন পাঠাইনি।' 'তবে যে গেলেন না, সার্!' 'তারিখ ভুলে গিয়েছিলাম। এখন তোমাকে দেখে ইন্টারভিউর কথা মনে পড়লো।'

২৭ মার্চ সন্ধ্যার ফ্লাইটে ঢাকায় ফিরে এলাম। সঙ্গে সঙ্গেই গেলাম আমাদের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. আবদুল লতিফ চৌধুরীর কাছে। তিনিও খুব খারাপ বোধ করছিলেন, যদিও তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে যায়নি। বললেন, 'কিচ্ছু করার নেই।' অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির কোনো কোনো প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে—সকলেই ক্ষুব্ধ; কিন্তু মার্শাল ল মানে মার্শাল ল—তার আদেশ না মেনে উপায় নেই।

দু-একদিনের মধ্যে ডাক পেয়ে ড. হুদার কাছে গেলাম—তিনি তখন লালমাটিয়া বা মোহাম্মদপুরে কোনো বাড়িতে ছিলেন। অনেক কথা বললেন তিনি। গভর্নর হিসেবে তাঁকে নিয়োগ দিয়ে আইয়ুব বলেছিলেন, ঢাকায় ফেরার আগে তিনি যেন সেনা-প্রধানের সঙ্গে দেখা করে যান। প্রেসিডেন্ট কেন এমন বলেছিলেন, সেকথা ড. হুদা তখন ভাবেননি, পরে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায় তাঁর কাছে। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা করতে গেলে সেনাপতি তাঁর কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, 'উইশ ইউ লাক, ইয়ংম্যান।' তার চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই ইয়াহিয়া ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন আইয়ুবের কাছ থেকে, ড. হুদার জায়গায় দ্রুত বসিয়েছিলেন অবসরপ্রাপ্ত অ্যাডমিরাল এস এম আহসানকে; অচিরে ২৫ মার্চ তারিখ থেকে প্রেসিডেন্ট বলেও ঘোষণা করেছিলেন নিজেকে।

অবনতমস্তকে আমরা ক্লাসে ফিরে গেলাম।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগপত্র পেয়ে ভাইস-চান্সেলর ড. মুহম্মদ ওসমান গণির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি জানতে চাইলেন, কবে যোগ দিচ্ছি চট্টগ্রামে। আসন গ্রহণ করতে করতে বললাম, 'সে-বিষয়ে কথা বলতেই এসেছি। আমি কি ইউনিভার্সিটির কাছে লিয়েন চাইবো এক বছরের জন্যে?' ভাইস-চান্সেলর বললেন, 'হোয়াট ইজ দি ইউজ অফ আসকিং ফর লিয়েন? ইউ উড বি মোস্ট ওয়েলকাম, শুড ইউ ওয়ান্ট টু রিটার্ন টু ঢাকা অ্যাজ এ সিনিয়র লেকচারার। বাট আই হ্যাভ নো ডাউট দ্যাট, ইন ডিউ টাইম, ইউ উইল বি কনফার্মড অ্যাজ এ রিডার অ্যাট চিটাগং।' বুঝলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ যাতে শীঘ্র করি, তাই তাঁর অভিপ্রায়। দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, 'থ্যাংক ইউ, সার্। আমি পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেবো।'

বুঝতে পারলাম, লিয়েনের প্রশ্ন তোলায় বিভাগীয় অধ্যক্ষ কেন আমাকে ভাইস-চান্সেলরের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন।

যাত্রার প্রস্তুতি নিলাম। ছাত্র-ছাত্রী-সহকর্মীদের অনেকেই বিমর্ষ। রফিকুল ইসলামের ব্যবস্থাপনায় খুব ঘটা করে বিদায়-সংবর্ধনা হলো ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের মিলনায়তনে। *ভরা থাক স্মৃতিসুধায়* নামে একটি সুন্দর স্মরণিকা মুদ্রিত হলো, ফুলে-ফুলে গানে-গানে আমার চারদিক ভরে উঠলো। বিদায়-উপহারস্বরূপ আমাকে দেওয়া হয়েছিল দেবদাস চক্রবর্তীর আঁকা একটি তৈলচিত্র। অনুষ্ঠানে আমাদের বিভাগের বাইরে থেকেও অনেক ছাত্র-ছাত্রী এবং কয়েকজন শিক্ষক এসেছিলেন। হুমায়ূন আহমেদ তখন রসায়ন বিভাগের ছাত্র—পরে তার মুখে শুনেছিলাম, সে-ও এসেছিল। আমার বাড়িতে প্রত্যহ সকালে আসার অভ্যাসের কথা উল্লেখ করে মুনীর চৌধুরী বললেন, 'এখন প্রতিদিন আটটা বাজবে, নটা বাজবে, দশটা বাজবে, এগারোটা বাজবে—আনিসের সঙ্গে দেখা হবে না।' সভাপতি মুহম্মদ আবদুল হাই বললেন, 'আনিস ঢাকায় থাকলেও রিডার হতো, হয়তো সময় লাগতো, তবে বিভাগে নাম্বার টু হতো না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সেই সুযোগ করে দিয়েছে।' আমি কী বলেছিলাম, তা মনে নেই, তবে কণ্ঠ যে কিছুটা বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এসেছিল, তা অস্বীকার করবার জো নেই।

জুনের ২ তারিখে বিভাগের শিক্ষকেরা দুপুরে খাওয়ালেন এক চীনা রেস্তোরাঁয়। ফিরে এসে কলাভবনের সামনে সকলে মিলে ছবি তুললাম। তারপর যথারীতি অফিসঘরের চাবি বিভাগে প্রত্যর্পণ করে এলাম।

ব্যক্তিগতভাবে অনেকে বিদায় জানাচ্ছিলেন, খাওয়া-দাওয়াও এড়াতে পারছিলাম না অনেক জায়গায়। এর মধ্যে আহমদ ছফার আয়োজন বিশেষ করে মনে পড়ে। সে তখন থাকতো ড. মফিজ চৌধুরীর আশ্রয়ে—তিনি জাহাঙ্গীর চৌধুরী নামে অনেক অনুবাদ করেছিলেন নানা দেশের সাহিত্য থেকে। ছফা জোর করতে লাগলো, ঢাকা ছাড়ার আগে তার ডেরায় একবার যেতেই হবে। ২ তারিখ বিকেলে বিভাগ থেকে বেরিয়ে সেখানে গেলাম। দেখি, ড. মফিজ চৌধুরীকে দিয়ে সে একরকম আনুষ্ঠানিক বিদায়-সংবর্ধনার ব্যবস্থা করে রেখেছে। আরো অতিথি আছেন, প্রচুর আহার্য আছে,

আছে প্রচুরতর শুভেচ্ছাজ্ঞাপন। আমি খুবই অভিভূত হলাম এবং আমার তাড়া থাকা সত্ত্বেও সহজে বেরিয়ে আসতে পারলাম না। ফলে নাজুর বউভাতে পৌঁছোতেই দেরি করে ফেললাম।

১৩.

আমার ছোটোভাই আখতারের বিয়ে হলো ১৯৬৮ সালে। বউভাতের আয়োজন হলো আমাদের নীলক্ষেতের বাসভবনে। প্রতি ফ্ল্যাটের সহকর্মীরা শুভকর্মের জন্যে একটা করে ঘর ছেড়ে দিলেন। তাতে অনেক সুবিধে হলো।

এদিকে একসময়ে সবিস্ময়ে জানতে পারি যে, আমাদের বন্ধু তফাজ্জুল আলী ওরফে মাখন এবং আমার শ্যালিকা নাজুর পরস্পরের প্রতি অনুরাগ জন্মেছে। জানাজানি হওয়ার পরে একটু জটিলতার সৃষ্টি হলো—তাতে আমারও কিছু অংশ ছিল। তবে সব ভালো যার শেষ ভালো। মাখনের আত্মীয় ও বন্ধু এবং আমার অগ্রজপ্রতিম সুহৃদ আবুল মাল আবদুল মুহিত ইসলামাবাদের কর্মস্থল থেকে কী এক কাজে ঢাকায় এলেন। এক সন্ধ্যায় নীলক্ষেত থেকে শাহবাগ পর্যন্ত কয়েকদফা পায়চারি করতে করতে আমরা এ-বিষয়ে আলোচনা করলাম। তারপর আমি কথা বললাম নাজুর সঙ্গে। মাখন একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অফিসকক্ষে এলেন। মুহিত আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দিলেন আমার শ্বশুরের কাছে। আমরা চট্টগ্রামে চলে যাবো বলে তার আগেই সব আয়োজন সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। ১ জুন বিয়ে হলো গোপীবাগ কমিউনিটি সেন্টারে—যেখানে আমার বিয়ে হয়েছিল। পরদিন হোটেল পূর্বাণীতে বউভাত। নিজের বিদায়পর্ব নিয়ে এতো ব্যস্ত ছিলাম যে, বিয়েতে কোনো কাজই করতে পারলাম না, এমনকি, আহমদ ছফার নির্বন্ধাতিশয্যে ড. চৌধুরীর বাড়িতে অনেকক্ষণ থাকায় সেখানেও পৌঁছোলাম দেরিতে—বিদায়জনিত বিষণ্নতা ও অবসন্নতা নিয়ে।

১৪.

আমাদের বিভাগে একটা জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছিল বেশ কিছুকাল ধরে।

১৯৬৮ সালের শেষদিকে অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ভিজিটিং প্রফেসর হয়ে সিজৌরি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। বিভাগের দায়িত্ব লাভ করেন মুনীর চৌধুরী। হাই সাহেব-সম্পাদিত *সাহিত্য পত্রিকার* অনুদান তিনি সংগ্রহ করেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে। পাঁচ খণ্ডে বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস রচনার একটা পরিকল্পনা আমাকে দিয়ে তৈরি করিয়ে তার জন্যে তিনি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে মনজুরি আদায় করেন। তাঁকে সভাপতি এবং আমাকে সদস্য-সচিব করে এই ইতিহাস-প্রকল্পের জন্যে একটা কমিটিও তৈরি হয়। একটা পর্যায়ে *সাহিত্য পত্রিকার* জন্যে সেইসঙ্গে কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন-বোর্ডও আর্থিক সহায়তা করে। উন্নয়ন-বোর্ডের নতুন পরিচালকরূপে

ড. আশরাফ সিদ্দিকী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে *সাহিত্য পত্রিকার* আয়ব্যয় সম্পর্কে কিছু জানতে চান। কর্তৃপক্ষ চিঠিটা পাঠিয়ে দেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের কাছে—বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য দাবি করে। মুনীর চৌধুরী তখন অনুভব করেন যে, বিভাগের ভার পেলেও *সাহিত্য পত্রিকা*-সম্পর্কিত কাগজপত্র তিনি বুঝে পাননি। কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধচিত্তে তিনি কর্তৃপক্ষকে লেখেন যে, এ-বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না, তাঁদের জিজ্ঞাস্য থাকলে তা পাঠিয়ে দিতে হবে অধ্যাপক আবদুল হাইয়ের কাছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর কাছে রেজিস্ট্রার পত্র লিখলেন। বিভাগের কোনো কর্মচারী বোধহয় এই সময়ে হাই সাহেবকে লেখেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে এখানে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। হাই সাহেব যুক্তরাষ্ট্রে নিজের কাজ অসমাপ্ত রেখে ১৯৬৯ সালের গোড়ায় দেশে ফিরে আসেন এবং কর্তৃপক্ষের প্রশ্নের উত্তর দেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ-সময়ে তিনি একেবারে একলা হয়ে পড়েন—সহকর্মীদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য-সহযোগিতা-সহানুভূতি তিনি লাভ করেননি। উপরন্তু গভীর রাতে টেলিফোন করে কে নাকি তাঁকে নানারকম হুমকি দিতো। এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, আমাদেরই কোনো সহকর্মী তাঁকে এভাবে বিরক্ত করছে, তবে আমি নিশ্চিত যে, এ-ধারণা সত্য ছিল না। সেই সহকর্মীর বাসায় টেলিফোন ছিল না এবং অত গভীর রাতে তিনি বাড়ির বাইরে গেলে আমি টের পেতাম। আমাদের অনেকের বরঞ্চ মনে হয়েছিল যে, কোনো রুষ্টচিত্ত প্রাক্তন ছাত্র এ কাজ করছে। তবে যেই করুক, এমন পরিবেশ হাই সাহেবের উদ্‌বেগের কারণ হয়েছিল। বেগম হাই একদিন আমাকে ডেকে বলেন, 'তোমার সারের কী হয়েছে, তোমরা খেয়াল করছো না? ওঁকে সাহায্য করছো না কেন?' কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা কী, তা হাই সাহেব আমাদের কাউকে জানতে দেননি, যদিও আমার কাছে একদিন ভেঙে পড়েছিলেন। তবে তিনি চলছিলেন বাইরের লোকের পরামর্শমতো—সে-পরামর্শ কতোটুকু তাঁর উপকারে এসেছিল কিংবা আদৌ উপকারে এসেছিল কিনা, তাতে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। ২ জুন আমরা সবাই মিলে ছবি তোলার পরে যখন বিভাগে ফিরে আসি, তখন আমি স্পষ্ট অনুভব করেছিলাম যে, সংকট ঘনীভূত হচ্ছে।

পরের দিন অর্থাৎ ৩ জুনে তিনি জীবননাশী দুর্ঘটনার শিকার হন। তবে আমি তা জানতে পারি বেশ কদিন পরে।

১৫.

৩ জুন খুব ভোরে আমার ফোকসওয়াগেন চালিয়ে চট্টগ্রামে রওনা হলাম। আমার পাশের আসনে অনুজপ্রতিম তরুণ ব্যবসায়ী আবদুল মান্নান ওরফে মাইনু। পেছনের আসনে আমার ছাত্র ও সুহৃদ 'ভূইয়া ইকবাল। আমি চেয়েছিলাম, খুব দ্রুত চট্টগ্রামে পৌঁছে ওইদিন পূর্বাহ্ণেই কাজে যোগ দিতে—নইলে আমার চাকরির ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যায়। আমি বুঝতে চাইনি যে, অপরাহ্ণে পৌঁছোলেও পূর্বাহ্ণ দেখিয়ে কাজে যোগ দিতে কেউ আমায় বাধা দেবে না। মাইনু বারবার বলছিল তাকে গাড়ি

চালাতে দিতে—যে-অবস্থায় আমি যাচ্ছি তাতে ক্ষণিকের জন্যে হলেও মনঃসংযোগের অভাব হওয়া বিচিত্র নয়। সেকথাও আমি শুনিনি। বরঞ্চ কতো দ্রুত যাওয়া যায়, আমি সেই চেষ্টা করতে থাকলাম।

দাউদকান্দির ফেরি থেকে নামার পরে পথ অপরিসর। আমি তাও জোরে গাড়ি চালাতে লাগলাম। গাড়ির বাঁ দিকের চাকা দুটো পিচের বাইরে এবং ডানদিকের চাকা দুটো পিচের রাস্তার ওপরে ছিল। মাধাইয়া বাজারের কাছাকাছি এসে মনে হলো, বাঁ দিকের পেছনের চাকাটা কেমন করছে। ওই দ্রুতগতির ওপরেই বাঁদিকের চাকা পিচের রাস্তায় তুলতে গিয়ে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারালাম। যদিও ভালো করে জানতাম যে, এই পরিস্থিতিতে ব্রেক করতে নেই, তবু অজান্তে পা চলে গেল ব্রেকে। আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ে গেল বেশ নিচুতে, ধানক্ষেতের মধ্যে একটু উঁচু জায়গায়। গাড়ির চারচাকা আকাশের দিকে; নিচে পড়ার ধাক্কায় আমি আর মাইনু আপনা থেকেই দরজা দিয়ে জমিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছি; ইকবাল পেছনের ভাঙা কাচের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। বাক্যহারা হয়ে তিনজনে বসে রইলাম।

ওই পথ দিয়ে কুমিল্লার ডি এস পি ফয়জুর রহমান আহমেদ ঢাকা থেকে কর্মস্থলে ফিরছিলেন। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি ও মানুষ দেখে তিনি নিজের গাড়ি থামালেন এবং একজন পুলিশ নিয়ে নিচে নেমে এলেন। আমরা চলতে পারবো জেনে তিনি আমাদের উঠতে বললেন তাঁর গাড়িতে এবং আমার গাড়ি পাহারা দেওয়ারও ব্যবস্থা করলেন। তাঁর গাড়ি রওনা দেওয়ার পরে লক্ষ করলাম, মাইনু ও ইকবালের কিছু আঘাত লেগেছে। ফয়জুর রহমান সাহেব—পরে জেনেছিলাম, হুমায়ূন আহমেদ তাঁরই পুত্র—আমাদের নিয়ে গেলেন কুমিল্লার সামরিক হাসপাতালে। ডাক্তার এলে আমার দুই সহযাত্রীকে দেখিয়ে বললাম, 'প্লিজ একজামিন দেম থরোলি; আই থিংক, আই অ্যাম ওনলি সাফারিং ফ্রম শক।' তারপরই অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

জ্ঞান ফিরলে দেখি, আমি কুমিল্লার পল্লী-উন্নয়ন-একাডেমীর ভি আই পি হস্টেলে শুয়ে আছি, আমার চারপাশে সব পরিচিত মুখ। এসবই ইকবালের কারণে। সি এম এইচ থেকে সে ফোন করে একাডেমীর পরিচালক আজিজুল হককে। তিনি আমাকে নিয়ে আসেন একাডেমীতে এবং ফোনে খবর দেন আমার শ্বশুরবাড়িতে। নাজুর বিবাহোত্তর আনন্দময় পরিবেশে নিমেষেই বিষাদের ছায়া নেমে আসে। মাখন নিজের গাড়িতে করে বেবী আর আজিজকে নিয়ে আসেন কুমিল্লায়। পথে আমার গাড়ির অবস্থা দেখে বেবীর ঘোরতর সন্দেহ হয় আমি বেঁচে আছি কিনা। আমার ভাগ্নে হারুন গাড়ি চালিয়ে নিয়ে আসে বড়োদুলাভাইকে। রফিকুল ইসলাম নিজের গাড়িতে নিয়ে আসেন জুবলী ভাবী ও রেণুকে। চট্টগ্রাম থেকে ট্রেনে করে আসেন আবদুল আলী ও অনুজপ্রতিম মীর মোজাম্মেল হোসেন—রেলওয়ের আরেক কর্মকর্তা। বেবী ও রেণু ছাড়া আর সকলেই দিনে দিনে ফিরে গেলেন। আমার ঘরের মেঝেতে বিছানা পেতে এ-দুজনের থাকার ব্যবস্থা হলো—যদিও ইচ্ছে করলে তারা অন্য ঘরেও থাকতে পারতো। রাতে রেণু মৃদুস্বরে গাইলেন, 'স্বপ্নে আমার মনে হলো/কখন ঘা দিলে আমার দ্বারে, হায়!' তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় আমি সেই সংগীতধ্বনির দিকে শূন্যে হাত বাড়ালাম।

কুমিল্লা শহর এবং তার চারপাশ থেকেও কেউ কেউ আমাকে দেখতে এলেন।

ভিক্টোরিয়া কলেজের বাংলার শিক্ষক কাজী নুরুল ইসলাম তাঁদের একজন। শিশু-সংগঠক ও সাংবাদিক গোলাম মোস্তফা চৌধুরী কচি-কাঁচার মেলার এক দঙ্গল শিশু-কিশোর নিয়ে এলেন—তারা প্রায় গার্ড অফ অনার দেওয়ার মতো করে সারিবদ্ধভাবে আমার বিছানার পাশ দিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে পা-মিলিয়ে গেল, পুষ্পস্তবকও দিলো একটা। তিনি ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র এসেছিলেন। এমন একজন দর্শণার্থীর মুখ থেকে প্রথম শুনলাম, 'কী যে হলো! ওদিকে হাই সাহেব, এদিকে আপনি!' জিজ্ঞাসা করলাম, 'হাই সাহেবের কী হয়েছে?' তখন তিনি বুঝতে পারলেন, আমাকে খবরটা দেওয়া হয়নি, ফলে তিনিও কথা এড়িয়ে গেলেন। তিনি চলে গেলে বেবীর কাছে জানতে চাইলাম, 'ঘটনাটা কী?' বেবী বললো, 'দুর্ঘটনা—পরে সব বলবো।'

ডা. মহিউদ্দীন রোজ দেখতে আসেন। কেমন আছি জিজ্ঞাসা করলে বলি, 'কাঁধে খুব ব্যথা, হাত তুলতে পারি না।' উনি বললেন, 'আসলে আপনি খুব ভয় পেয়েছেন।' কদিন একই জবাব শুনে তিনি বললেন, 'চলুন তো, একটা এক্স-রে করে আনি।' তাঁর গাড়িতে করে নিয়ে গেলেন শহরে, এক্স-রে করে প্লেট দেখার জন্যে অপেক্ষা করলেন। তারপর আমাকে বললেন, 'আপনার তো কলার-বোন ভেঙেছে। এ-অবস্থায় তো ষাঁড়ের মতো চেঁচাবার কথা। আপনি অমন মিনমিন করে 'ব্যথা, ব্যথা' বলছেন, কার সাধ্য ব্যাপারটা বোঝে! আসলে সি এম এইচে এক্স-রে করেছিল কলার বোনের নিচ থেকে পেলভিস পর্যন্ত—তাতে শুধু পেলভিক বোনে একটা ক্র্যাক ধরা পড়ে। ছি, ছি, ছি। চলুন, কলার-বোনটা সেট করে আনি।' তিনি নিয়ে গেলেন এক ডাক্তারখানায়। এক বয়স্ক কম্পাউন্ডার আমার দু-হাত পেছনে মুড়ে, তাঁর হাঁটু দিয়ে পিঠ সামনের দিকে যথাসম্ভব ঠেলে দিয়ে, দু-বাহুতে কড়া পরিয়ে, ব্যান্ডেজ করে দিলেন। বুঝলাম, হাড় ভাঙার চেয়ে জোড়া লাগাবার কষ্ট অনেক বেশি।

তখন পি আই এ-র ঢাকা-চট্টগ্রাম-ঢাকার একটি ফ্লাইট কুমিল্লায় থামতো। তাতে করে বেবী, রেণু আর আমি ঢাকায় ফিরলাম। ফেরার আগে বেবী জানালো, হাই সাহেব আর নেই।

১৬.

ঢাকায় ফিরে এসে প্রথম কাজ হলো সার্জন কে এস আলমকে খবর দেওয়া। তিনি তখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ক্লিনিকাল সার্জারির প্রফেসর। অনুগ্রহ করে তিনি এলেন আমাদের বাসায়। আমার ব্যান্ডেজ দেখে রীতিমতো ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন। বললেন, 'চিকিৎসার নামে এসব যারা করে, তাদের ফাঁসি দেওয়া উচিত।' আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ি যেতে পারবো কিনা। তখন তিনি থাকতেন ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে, বঙ্গবন্ধুর এক-আধটা বাড়ির পরে। সেখানে নিয়ে গিয়ে তিনি আমার ব্যান্ডেজ কেটে ফেলে দিয়ে নতুন ব্যান্ডেজ করে দিলেন—বহুদিন পর একটু স্বস্তি পেলাম। সার্জন আলমকে আমার বাড়ি আসার এবং আমাকে চিকিৎসা-সেবা দেওয়ার জন্যে কোনো সম্মানী দিতে পারিনি।

তেমনি বিনি পয়সার চিকিৎসা করতে এলেন ডা. ফজলে রাব্বি—তখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসর অফ মেডিসিন, সেই সঙ্গে প্রফেসর অফ কার্ডিওলজিও। আহমদ হোসেন তাঁকে নিয়ে এসেছিল। তিনি বললেন, 'খুব ভালো আছেন—আমার অ্যাকসিডেন্ট হলে যেন আপনার মতো হয়।' আমার বিছানার পাশে বসে প্রেসক্রিপশন লিখলেন এবং তারপর উঠে গিয়ে শেলফের বই দেখতে লাগলেন। কোনো তাড়াহুড়ো নেই। দুটো বই বার করলেন—তার একটি *সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা*। আমাকে বললেন, 'বই দুটো নিলাম। চিন্তা করবেন না, ফেরত দেবো।' ১৯৭১ সালে তিনি শহীদ হওয়ার আগে আর একবারমাত্র দেখা হয়েছিল আমাদের—তাঁর বায়তুল মোকাররমের চেম্বারে। তখন তিনি আসন্ন (১৯৭০ সালের) নির্বাচন নিয়ে খুব উৎকণ্ঠিত ছিলেন।

দুর্ঘটনায় আমার চশমাটা ভেঙে গিয়েছিল। নতুন ব্যবস্থাপত্র নিতে গেলাম আলিম চৌধুরীর কাছে—তাঁকেও ফি দেওয়া সম্ভব হয় নি। মুক্তিযুদ্ধের এই শহীদের সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা।

ঢাকায় ফিরেই এক সেবক পেয়ে গেলাম—আমাদের ছাত্র কাজী রফিকউল্লাহ। তখন দ্বিতীয় বর্ষ অনার্সে পড়ে, পরে সরকারি কলেজের শিক্ষক হয়েছিল। যে-কদিন ঢাকায় ছিলাম, নিতান্ত প্রয়োজন নাহলে সে কদিন সকাল-সন্ধ্যা সে আমার বিছানার পাশ থেকে ওঠেনি। এমন নিঃস্বার্থ, এমন অক্লান্ত সেবা আমি কখনো পাইনি।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে সাত-পাঁচ ভাবি। মনটা বিষণ্ন হয়ে থাকে। নিজের জন্যে তো বটেই, হাই সাহেবের জন্যেও। কিছু যে লিখব তাঁকে নিয়ে, তারও উপায় নেই—কলম যদিবা ধরতে পারি, হাত নাড়াতে পারি না। বিভাগের স্টেনো-টাইপিস্ট আবু তালেবকে একদিন ডেকে পাঠাই। শুয়ে শুয়েই ডিকটেশন দিই। এইভাবে রচিত হয় 'প্রফেসর এম এ হাই : এ ট্রিবিউট'। কদিন পর সেটা ছাপা হয় *পাকিস্তান অবজারভারে*। পরে রফিককে দিয়ে নিউ মার্কেট থেকে কিনে আনাই 'থ্যাংক ইউ' লেখা ছোট্ট কতকগুলি কার্ড। অতি কষ্টে তা সই করে পাঠাই কুমিল্লা ও ঢাকায় আমার চিকিৎসক ও সাহায্যকারীদের।

সহকর্মীরা দেখতে আসছেন আমাকে, বন্ধুরা আসছেন, আত্মীয়স্বজন আসছেন। বেবীকে তাঁদের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। একদিন এলেন ড. সুরত আলী খান—তখন জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প-পরিচালক। ঢুকেই আমার নাম ধরে ডেকে বললেন, 'হ্যাভ ইউ চেনজড ইওর মাইনড?' অর্থাৎ চট্টগ্রামে যাওয়ার বিষয়টা আমি পুনর্বিবেচনা করছি কিনা। যদিও তাঁর সঙ্গে কখনো এ-বিষয়ে আনুষ্ঠানিক আলাপ হয় নি, তবে আমাকে জাহাঙ্গীরনগরে নিতে পারলে তিনি বোধহয় খুশি হতেন। তাঁর প্রশ্নে ছিল তারই ইঙ্গিত। জবাবে আমি হেসেছিলাম মাত্র।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে এক বিকেলে এলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান—সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদ ও আবদুল মমিন। আমার বিশ্বাস, তাজউদ্দীনই তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন, কেননা তাঁর সঙ্গে পরিচয় থাকলেও ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ আমার ঘটেনি। ১৯৫২ সালের শান্তি-পরিষদের সেই সংবর্ধনা সভার পর তাঁর সঙ্গে মাত্র কয়েকবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। একবার তো একটু প্রতিকূল পরিবেশে। আওয়ামী লীগের

লোকেরা সেবার পল্টন ময়দানে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জনসভা ভেঙে দেয়। একটা ইটের টুকরো এসে পড়ে আমার বন্ধু মসিহুর রহমানের নাকে। আহত অবস্থায় সে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়। আমিও ওই সভায় ছিলাম, তবে এক জায়গায় নয়। মসির আহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে আমি যখন তাকে দেখতে ঢুকছি হাসপাতালে, শেখ মুজিব তখন আহতদের দেখে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। পরে শুনলাম, মসিকে দেখতে গেলে শেখ সাহেবকে সে খুব রূঢ় কথা বলেছিল। মসিও ফরিদপুরের ছেলে, তার বড়োভাই লুৎফর রহমানের সঙ্গে শেখ সাহেবের অনেককালের বন্ধুত্ব। অতএব সে ছেড়ে কথা বলার কারণ দেখেনি।

শেখ মুজিবের সঙ্গে আমার যা-পরিচয়, তাতে আমাকে দেখতে বাড়ি আসার কথা নয় তাঁর, তার ওপর তিনি তখন বঙ্গবন্ধু। তিনি হয়তো শুনে থাকবেন যে, যখন তিনি কারাগারে, তখন, ১৯৬৬ সালে, তাজউদ্দীন আমাকে দিয়ে আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্র সংশোধন করিয়ে নিয়েছিলেন—যদিও ইংরেজি ও বাংলা দু ভাষাতেই তাজউদ্দীনের অধিকার ছিল অসামান্য। তিনি হয়তো আমাদের ছাত্রী শেখ হাসিনার মুখে শুনে থাকবেন যে, তাঁর সর্বশেষে কারাবাসের দিনগুলোয় আমি তাঁর নিয়মিত খোঁজখবর করেছি। যাই হোক, তাজউদ্দীন ও আবদুল মমিনকে নিয়ে তিনি নীলক্ষেতে এসেছিলেন আমার কুশল জানতে। কিছু সময় কথাবার্তা বলে তিনি যখন যাওয়ার উদ্‌যোগ করলেন, তখন পাঁচ বছর বয়সের রুচি আমার কানে কানে জিজ্ঞেস করলো, 'আসাদ আসেনি?' গণ-অভ্যুত্থানের কালে পাড়ার ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা দুটো স্লোগানে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল : 'জেলের তালা ভাঙবো/শেখ মুজিবকে আনবো', আর 'আসাদের রক্ত/বৃথা যেতে দেবো না।' তাদের কাছে মুজিব ও আসাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। তাই শেখ মুজিব এসেছেন শুনে রুচি আর তার বন্ধুদের মনে হয়েছিল, তাহলে তো আসাদেরও আসবার কথা। রুচিকে কানে কানে কথা বলতে দেখে বঙ্গবন্ধু আমার কাছে জানতে চাইলেন, সে কী বলছে। আমার উত্তর শুনে সেই বিশালদেহী মানুষ অনেকখানি নত হয়ে রুচির দু গাল টিপে বললেন, 'ওরা আমার কাছে তো এই কৈফিয়ত চাইতেই পারে।' মনে হলো, তাঁর একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো। রুচির মাথায় হাত দিয়ে বঙ্গবন্ধু বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

ঢাকায় পড়ে থাকলে তো আমার চলবে না—চট্টগ্রামে যেতে হবে। সৈয়দ আলী আহসানের পরামর্শে বিনা বেতনে ছুটি চেয়ে দরখাস্ত পাঠাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। তা নিয়ে মহা হইচই। কাজেই যে যোগ দিল না, তার আবার ছুটি হয় কী করে? বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার এন ইউ সিদ্দিকী নাকি সমর্থন করেন আমার আবেদন ও আলী আহসান সাহেবের সুপারিশ। তিনি আইনজ্ঞ মানুষ—যুক্তি দেখান, খুন করতে চাওয়া খুন করার সমতুল্য অপরাধ হলে চাকরিতে যোগদানের ইচ্ছা যোগদানের সমতুল্য হবে না কেন? আমি যে যোগ দিতে যাচ্ছিলাম, তাতে কী কোনো সন্দেহ আছে? কিংবা আমার দুর্ঘটনাকবলিত হওয়া সম্পর্কে?

ঠিক হয়, ৩০ জুন আমি চট্টগ্রামে যোগ দেবো, কিন্তু যাবো কিসে? গিয়াসউদ্দিন বলেন : 'প্লেনেই যাও—তুমি যেমন অ্যাকসিডেন্ট-প্রোন, প্লেনে গেলে কম লোকের জান যাবে, ট্রেনে গেলে বহু লোক মরতে পারে।'

গিয়াসউদ্দিনের কাছে আমার সংগ্রহের একটা বই ছিল : হিটলারের আত্মজীবনী *মেইন ক্যাম্‌ফের* ইংরেজি অনুবাদ। আমি তাঁর কাছ থেকে ধার করেছিলাম একটা দুষ্প্রাপ্য বই : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত *হিস্ট্রি অফ বেঙ্গলের* দ্বিতীয় খণ্ড। চট্টগ্রামে আমার চূড়ান্ত যাত্রার আগে তিনি বললেন : *মেইন ক্যাম্‌ফ* আমার কাছে থাক, তুমি *হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল* রেখে দাও। গিয়াস শহীদ হওয়ার পরে আমার বহুবার মনে হয়েছে, এ বিনিময়টা যেন হয়েছিল প্রতীকী। হিটলারের অনুজদের হাতে প্রাণ দিয়ে তিনি যেন স্বাধীন বাংলাদেশের দুয়ার আমার জন্যে উন্মুক্ত করে গেলেন।

শেষ পর্যন্ত রেলপথে চট্টগ্রাম যাওয়াই সাব্যস্ত হয়—রাতের ট্রেনে, কেননা আমাকে যেতে হবে শুয়ে শুয়ে। যাওয়ার আগে হাওয়াই শার্ট ও ট্রাউজার্স বানাই; দু-হাত উঁচু করতে পারি না, তাই আমার সাধের পাঞ্জাবি-পায়জামা আর পরা হয় না। জিনিসপত্র বাঁধাবাঁধি হয়। মালবহনকারী একটা খোপের অর্ধেকটা ভাড়া করে তাতে সংসারের জিনিসপত্র ওঠাই। সে-খোপটা আমাদের সঙ্গেই যাবে।

এবারে সপরিবার যাত্রা। একটা কম্পার্টমেন্ট আমাদের দখলে। ৩০ জুন সকালে চট্টগ্রামে পৌঁছাই। আবদুল আলী এসেছেন স্টেশনে, সঙ্গে অনুজপ্রতিম মীর মোজাম্মেল হোসেন—রেলওয়ের আরেক কর্মকর্তা। তাঁরা দুজনেই বাটালি পাহাড়ে রেলের বাড়িতে থাকেন : আলী একতলায়, মোজাম্মেল দোতলায়। আলীর বাড়িতেই থাকবো, তবে জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা অবস্থায় বেশির ভাগ থাকবে মোজাম্মেলের ফ্ল্যাটে।

আলীর বাড়িতে চা-নাশতা খেয়ে আবার আলিম সাহেবের গাড়ি করে সৈয়দ আলী আহসানের বাসায় গেলাম। তিনি বলে রেখেছিলেন বাংলা বিভাগে আমাদের সহকর্মী মাহমুদ শাহ্ কোরেশীকে। কোরেশী নিজের গাড়ি চালিয়ে এলেন। আলী আহসান সাহেব ও আমি তার আরোহী হয়ে গেলাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। চাকরিতে যোগ দিলাম।

আমার নতুন জীবন শুরু হলো।



নতুন ঠিকানা

চট্টগ্রামে এসে পৌঁছোবার পরদিনই ছিল আবুল ফজলের জন্মদিন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় ১৯৫৪ সালে, পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের সময়ে। ১৯৬২ সালে আকস্মিকভাবেই তাঁর কাছ থেকে একটি চিঠি পাই : তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প-সংকলন বের হতে যাচ্ছে, তাঁর ইচ্ছে, আমি ভূমিকা লিখি বইটার। আমাকে এ দায়িত্ব দেওয়ার কারণও তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন : প্রথমত, তরুণ সমালোচককে দিয়ে তাঁর গল্পগুলো পুনরাবলোকন করা; দ্বিতীয়ত, তাঁর গল্পের একটা সামাজিক দিক আছে বলে তাঁর বিশ্বাস, এবং আমি যেহেতু সাহিত্যের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে কৌতূহলী, তাই আমাকে দিয়ে সে-বিষয়টাও যাচাই করে নেওয়া। এটাকে আমার সৌভাগ্য মেনে দায়িত্বপালন করি, তবে বইটা ১৯৬৪ সালের আগে বের হয়নি। ১৯৬৩ সালে, তাঁর ষাট বছরপূর্তি-উপলক্ষে, চট্টগ্রামে বড়ো করে যে-অনুষ্ঠান হয়, তাতে আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে যাই। যাওয়াটা সহজ ছিল না, কারণ এতে যোগ দেওয়ার জন্যে আমার একদিনের অর্জিত ছুটির প্রার্থনা বিভাগীয় প্রধান সুপারিশ করতে সম্মত হন নি। আমি ক্লাস নিয়ে বিমানবন্দরে চলে যাই, বেবী সেখানে আমার আবশ্যকীয় জিনিসের ব্যাগ পৌঁছে দেয়; আবার পরদিন প্রথম ফ্লাইটে ঢাকায় ফিরে এসে বিমানবন্দর থেকে অটোরিকশা করে বাসায় যাই, আর ওই বাহনেই আবার ফিরে আসি বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেই অনুষ্ঠানে জয়নুল আবেদিন তাঁর আঁকা একটা ছবি উপহার দিয়েছিলেন আবুল ফজলকে, আর অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে আমিও সুযোগ পেয়েছিলাম তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে। খুব উপভোগ্য খাওয়া-দাওয়া করি তারাপদ ঘোষ ও সি আর দাশের বাড়িতে; রাত কাটাই আমার বন্ধু নুরুল হকের রেলওয়ে কোয়ার্টার্সে। চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে আমাকে নিতে এসেছিলেন ডা. কামাল এ খান। সেই থেকে তাঁর সঙ্গে এবং আরো অনেকের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সৌহার্দ্যের সূচনা হয়। পরে আবুল ফজলের সঙ্গে ঢাকায় সভা-সমিতিতে আরো দেখা হয়েছে। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আয়োজিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সংবর্ধনায় অসুস্থ হয়ে পড়ে তিনি আমাদের ঘাবড়ে দিয়েছিলেন।

১৯৬৯ সালে আবুল ফজলের জন্মদিনে আমি চট্টগ্রামে থাকায় স্বভাবতই তাতে যোগদানের আমন্ত্রণ পাই এবং শারীরিক কষ্ট সত্ত্বেও সেখানে যাই। এবারে অনুষ্ঠানটা হয় ছোটো করে, ঘরোয়াভাবে, তাঁরই বাড়িতে। শহরের বিশিষ্ট সংস্কৃতিসেবীরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আমাকে দেওয়া হয় সভাপতির আসন। পরে আবুল ফজলের কাছে

শুনেছিলাম—*লেখকের রোজনামচা* (চট্টগ্রাম, ১৯৬৯) বইতে তিনি নিজেই লিখেছিলেন সেকথা—অনুষ্ঠানশেষে গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা তাঁর কাছে এসে জানতে চায়, কাদের উদ্‌যোগে সভা হয়েছে, কে ছিল সভাপতি, কারা ছিলেন বক্তা। দেশে যে সামরিক শাসন চলছে, তা বুঝিয়ে দেওয়ার এর চেয়ে আর ভালো উপায় ছিল বলে মনে হয় না।

চট্টগ্রামে থাকছি বন্ধু আবদুল আলীর বাড়িতে। সেখান থেকে যাই সৈয়দ আলী আহ্‌সানের বাসায়। ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী আসেন হুডখোলার ব্যবস্থাযুক্ত তাঁর ফরাসি গাড়ি নিয়ে—তা পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে করতে আমাদের নিয়ে চলে, তবে বেশিক্ষণ নয়। অনতিকাল পরেই কাঁচা রাস্তায় পড়ে ধুলো এড়াতে হুড তুলে দিতে হয়, ততক্ষণ তা দৃষ্টি এড়িয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে যায়। সাধারণত দুপুরের দিকে ফিরি, কখনো কখনো বিকেলে।

বিশ্ববিদ্যালয়টি সবে গড়ে উঠছে। কলা অনুষদে বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগ আর বিজ্ঞান অনুষদে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিত বিভাগ। বিভাগের অধ্যক্ষেরা ছিলেন যথাক্রমে সৈয়দ আলী আহসান, মোহাম্মদ আলী, ড. আবদুল করিম, ড. রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, ড. এস এ আতহার ও আলী ইমদাদ খান এবং ড. মোহাম্মদ শামসুল হক, ড. এস জেড হায়দার ও ড. রশিদুল হক। এঁদের মধ্যে সৈয়দ আলী আহসান একমাত্র প্রফেসর, আর সবাই রিডার। বাংলা বিভাগে প্রফেসর আছেন, তার অতিরিক্ত আমি রিডার হয়ে যোগ দিলাম। এই ব্যবস্থা সকলের মনঃপূত হয়েছিল, তা বলা যায় না। সৈয়দ আলী আহসান কলা অনুষদের ডিন, মোহাম্মদ শামসুল হক বিজ্ঞান বিভাগের ডিন, একমাত্র আবাসিক ছাত্রাবাস আলাওল হলের প্রোভোস্ট আবদুল করিম, প্রক্টর এস এ আতহার। আতহার সাহেব প্রক্টরের পদে ইস্তফা দিয়ে বসে আছেন, যদিও তাঁর পদত্যাগপত্র গৃহীত হয় নি। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন গ্রুপ) পক্ষ থেকে যে-ছাত্রটি একটি সংকলন প্রকাশ করে, কর্তৃপক্ষ তাকে বহিষ্কার করেছিল, আর প্রক্টর মনে করেছিলেন, দণ্ডটা গুরু হয়ে যাচ্ছে। আমি গিয়ে দেখি, এ-নিয়ে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে ছাত্রদের মধ্যে, আর প্রক্টরের কাজ চালাচ্ছেন সহকারী প্রক্টর, ইংরেজি বিভাগের আবদুল মোমেন।

আমাদের বিভাগটি বড়ো না হলেও ছোটো নয়। কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশে অবস্থানকারী ও ডিগ্রিধারী ব্যক্তিদের দেশে ফিরিয়ে এনে নিয়োগ দেওয়ার একটি পরিকল্পনা করেছিলেন। তার অধীনে মাহমুদ শাহ্ কোরেশীকে প্যারিস থেকে নিয়ে আসা হয়। সরকারি কলেজ থেকে এসে যোগ দেন ড. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, বাংলা একাডেমী ছেড়ে সেখানে যান মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, সরকারি কলেজ ছেড়ে মনিরুজ্জামান এবং বেসরকারি কলেজ থেকে হায়াৎ মামুদ নামে খ্যাত মুনীরুজ্জামান। এঁরা সবাই সিনিয়র লেকচারার। লেকচারার পদে ছিলেন মোহাম্মদ আবু জাফর—তার আগে তিনি ছিলেন পাকিস্তান কাউনসিলের চট্টগ্রাম শাখার সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক; ছিলেন রাজিয়া সুলতানা—তিনি মোহাম্মদ আবদুল কাইউমের স্ত্রী এবং এসেছিলেন সরকারি কলেজ থেকে; ছিলেন খালেদা হানুম—তিনি ইংরেজি বিভাগের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলীর স্ত্রী—সদ্য পাশ করে ঢুকেছিলেন। আর গবেষণা-সহায়ক ছিল মাহবুব তালুকদার। বিভাগের সহকারী ছিলেন মোহাম্মদ আবদুর রশীদ—

আমার দেখা অল্পসংখ্যক সৎ ও দক্ষ মানুষের একজন।

ভাইস-চান্সেলর ড. এ আর মল্লিক ছিলেন যেমন সক্রিয় তেমনি সহৃদয়। তিনি প্রতিটি শিক্ষকের খোঁজ-খবর নিতেন এবং কারো অসুখ-বিসুখ হলে দেখাশোনা করতেন। অধিকাংশ কর্মচারীর সঙ্গেও তাঁর ব্যবহার ছিল অনুরূপ। এসব কাজে তাঁর প্রধান সহায় ছিলেন তাঁর স্ত্রী। সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা ও ঔদার্যের বিরল সমন্বয় দেখেছি এই মহিলার মধ্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলরদের মধ্যে ড. মল্লিকই তখন একমাত্র, যিনি মার্সিডিজ গাড়ি চড়তেন এবং তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা ব্যবহার করতেন। তাঁর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন রেজিস্ট্রার মুহাম্মদ খলিলুর রহমান—তিনি ও তাঁর স্ত্রীও খুব সরলচিত্ত ভালোমানুষ ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় তখন নির্মীয়মাণ। ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর আবাসিক ব্যবস্থা গড়ে উঠছে মাত্র। অনেক শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী থাকতেন হাটহাজারীতে। যাঁরা শহর থেকে আসতেন, তাঁদের জন্যে বাসের ব্যবস্থা ছিল, ছাত্রদের জন্যেও তাই। হাটবারে সপ্তাহে দুদিন হাটহাজারীতে বাজার করা যেতো। সেখানে ওয়াহাবি মতাবলম্বীদের পরিচালনাধীন একটি পুরোনো মাদ্‌রাসা এবং স্থানীয় প্রচেষ্টায় স্থাপিত একটি নতুন কলেজ ছিল। ধারেকাছে স্কুল ছিল না : ছেলেদের যেতে হতো ফতেহাবাদে, মেয়েদের গহিরায়—কুণ্ডেশ্বরী বিদ্যালয়ে। অনেক সময়ে ভেবেছি, এমন বিরান মুলুকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো কেন? নতুন বিশ্ববিদ্যালয় কুমিল্লায় হবে, না চট্টগ্রামে হবে, এ-নিয়ে বহু বাদ-বিসংবাদ চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে স্থানীয়ভাবে অর্থ সংগৃহীত হতে পারবে, এমন একটা ধারণা দেওয়ার পরে পাল্লাটা চট্টগ্রামের দিকেই ঝোঁকে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুল কাদের চৌধুরীর অভিপ্রায়-অনুযায়ী তাঁর নির্বাচনী এলাকাতেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। শুনেছি, স্থান-নির্বাচকেরা হেলিকপ্টারে এই এলাকার ওপর দিয়ে ঘুরে গিয়েছিলেন।

বিরান মুলুকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন স্থাপিত হলো—এ-প্রসঙ্গে এতো কথা। অন্যদিকে ঢাকা ছেড়ে আমি কেন বিরান মুলুকে এলাম—এ-প্রশ্ন চট্টগ্রামে আমার অনেক সহকর্মীকে আন্দোলিত করেছিল। কেউ কেউ নাকি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের শাখা গঠনের উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট পার্টি আমাকে সেখানে পাঠিয়েছে। ঢাকা তো ছেড়েছিই, এমন কী, চট্টগ্রাম শহর ছেড়ে ওই ঊষর ক্ষেত্রে যাওয়ার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। চাকরিতে যোগ দেওয়ার দিন পনেরো পরে দক্ষিণ ক্যাম্পাসে বাসা পাওয়া গেল। পুরো এলাকাটাই গড়ে উঠেছিল বাস্তুকলাবিদ মজহারুল ইসলামের পরিকল্পনা-অনুযায়ী। আমাদের দিকটায় থাকার বাড়ি হয়েছিল দু-ধরনের : একটা বড়ো, একটা ছোটো। দুটোই আভরণহীন লাল ইটের দোতলা বাড়ি : সামনে লন, পেছনে খোলা জায়গা, গ্যারাজ, তার মাথায় গৃহভৃত্য বা গাড়িচালকের থাকবার ব্যবস্থা। পাহাড়ের প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে একাধিক স্তরের দরদালান। বসার ঘর, খাবার জায়গা, অতিথির ঘর, রান্নাঘর নিচে; দোতলায় দুটো শোবার ঘর, প্রশস্ত বারান্দা—তার সামান্য অংশমাত্র আচ্ছাদিত। একতলায় একটি, দোতলায় দুটি বাথরুম ও টয়লেট, গ্যারাজের সঙ্গে কাজের লোকদের জন্যে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। বড়ো টাইপের বাড়ির ঘর ও বারান্দা বড়ো,

গেট দিয়ে ঢুকে হেঁটে এলেই ঘরে ঢোকার সিঁড়ি; ছোটোগুলোতে সবই একটু ছোটো, আর সিঁড়িটা উলটে বসানো অর্থাৎ এখানে দক্ষিণ থেকে ঢুকে সিঁড়ি পেরিয়ে আবার দক্ষিণ দিকে মুখ করে সিঁড়ি ভাঙতে হয়। কোরেশীর মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাধান্যপরম্পরায় নিচের দিকে থাকার ওটা মাশুল। শুনেছি, শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বাসভবন-নির্মাণে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের আপত্তি ছিল : যুগ্মসচিব-পর্যায়ের না হলে নাকি আলাদা বাড়ি পাওয়া যায় না, ফ্ল্যাটে থাকতে হয়। মল্লিক সাহেবের যুক্তি ছিল, সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনক্রম তো এক, থাকবার বাড়তি সুবিধে না পেলে এই ধ্যাধ্যেড়ে গোবিন্দপুরে কোনো ভালো শিক্ষক আসতে চাইবে না, তাই ওটা দিতে হবে।

আমি তো বাড়তি সুবিধে পেলাম, কিন্তু তাতে মন খারাপ করলো আমার ছাত্র ও আপনজন মাহবুব তালুকদার। সে আশা করছিল, পরের বাড়িটা তৈরি হলে সেটা তার ভাগ্যে পড়বে। মাঝখান থেকে আমার উদয়ে সে বঞ্চিত হলো। শেষ পর্যন্ত সে আলী আহসান সাহেবের হাতে তার পদত্যাগপত্র দিয়ে বসলো। তিনি চিঠিটা একবার পড়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিলেন।

সৈয়দ আলী আহসানের ধরনটাই ছিল ওরকম। শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বসার ঘর না থাকায় আমরা সবাই বসতাম অধ্যক্ষের কক্ষে। আলী আহসান সেখানেই তাঁর দরবার বসাতেন। পড়াশোনার কথা হতো, তাঁর দেশবিদেশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বলতেন; বিখ্যাত সব ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের গল্প করতেন, কোনো বিদেশী কবি নাকি তাঁর শ্মশ্রু সম্পর্কে বলেছিলেন, ওটা একটা 'পার্সোনাল পোয়েম', সেকথা শোনাতেন; গল্পকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার প্রয়োজনে কাউকে সাক্ষী মানতেন—বেচারার কিছু মনে না পড়লেও তাঁকে চুপ করেই থাকতে হতো: বই-পত্র কিংবা চলচ্চিত্র-নাটকের বিষয় উঠতো। কোরেশী ছিলেন চট্টগ্রামের আলিয়ঁস ফ্রাঁসের সঙ্গে যুক্ত। আলী আহসান সাহেব তাঁকেই বেছে নিতেন রসিকতার জন্যে, ঘন ঘন তাগাদা দিতেন ব্রিজিত বার্দো-অভিনীত চলচ্চিত্র দেখাবার ব্যবস্থা করতে।

আলী আহসান সাহেবের চরিত্রের অন্য একটি দিকের কথা বলতে একটু ভূমিকার প্রয়োজন হবে।

ইয়াহিয়া-সরকারের উপদেষ্টা-পরিষদে শিক্ষা বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন এয়ার মার্শাল নূর খান। তিনি একটা নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নে উদ্যোগী হন। ড. আনিসুর রহমান তখন ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের মতামত জানার ব্যাপারে নূর খান তাঁর সাহায্য চান। আনিসুর রহমান ঢাকায় এলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কর্মকর্তা হিসেবে আমাদের কারো কারো বক্তব্য লিখিতভাবে তাঁকে দিতে বলেন, আমরা দিয়েও ছিলাম। এর মধ্যে লুকোছাপা ছিল না, সরকার পরে বিজ্ঞপ্তি দিয়েই শিক্ষানীতি সম্পর্কে ছাত্র-শিক্ষকদের মতামত আহ্বান করে। আমরা চাইছিলাম সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণ, শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন এবং বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালনায় গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রবর্তন। চট্টগ্রামে আমি যাওয়ার পরও শিক্ষকদের মধ্যে এসব বিষয়ে আলোচনা চলতে থাকে। আলোচনার একটি

বিষয় ছিল বিভাগের অধ্যক্ষতার ভার সর্বজ্যেষ্ঠ শিক্ষকের ওপরে থাকবে, না তা পালা করে ঘুরবে। আলী আহসান সাহেবের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তাঁর মত ছিল তখনকার রীতি বজায় রাখার; আমি চাইছিলাম পালাবদল। তাঁর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াতের পথে, বিভাগে ও তাঁর বাড়িতে বসে এ-নিয়ে আমরা তর্ক করেছি যার যার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিতে তাঁরই সভাপতিত্বে যেদিন এ-নিয়ে আলোচনা হলো, আমি চুপ করে ছিলাম। আলী আহসান সাহেব তখন বললেন, 'অনেকে এ সম্পর্কে এখন কিছু না বললেও, আমি জানি, অধিকাংশের মত হচ্ছে বিভাগের দায়িত্ব জ্যেষ্ঠতা-অনুযায়ী পালা করে একেকজনকে দেওয়া। আমি এই ব্যবস্থার পক্ষপাতী নই, কিন্তু আপনাদের যদি মত থাকে, তাহলে নতুন ব্যবস্থার পক্ষেই আমরা সুপারিশ করতে পারি।' সভায় তাই পাশ হলো।

২.

জুলাই মাসের ১০ তারিখে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ৮৪ বছর পূর্ণ হলো। তিনি তখন ঘোরতর অসুস্থ। প্রায় দুবছর ধরে ভুগছেন—প্রথমে বাড়িতে, পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। শরীরের ডান দিকটা অবশ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর এই অসুস্থতার মধ্যেই তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন। নীলক্ষেতে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মায়ের কবর ছিল। তার পাশে তিনি নিজের জন্যে জায়গা কিনে রেখেছিলেন। তাঁর উপস্থিত সন্তানদের ইচ্ছাক্রমে সেখানেই তাঁর স্ত্রীকে সমাধিস্থ করা হলো। তিনি সেখানে এসেছিলেন হুইল চেয়ারে বসে। কিছু বুঝতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ।

৮৪ বছর পূর্তির তিনদিন পরে শহীদুল্লাহ্ চিরতরে চলে গেলেন। সে-খবর আমি চট্টগ্রামে পেলাম বেতারে। এমন সময়ে তাঁর কাছে থাকতে পারলাম না বলে খেদ রইলো মনে।

চট্টগ্রামে নাগরিক শোকসভায় সৈয়দ আলী আহসান সভাপতিত্ব করলেন, প্রবন্ধ পড়লাম আমি। আমাদের বিভাগ থেকে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করতে চাইছিলেন সৈয়দ আলী আহসান। বার্ষিক *পাণ্ডুলিপি* যখন বের হলো, তখন প্রথম সংখ্যায়, ওই লেখাটি পত্রস্থ হয়। যাঁর কাছে আমি এতো ঋণী, তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

১৯৬৯ সালের ২১ জুলাই ছিল শুধু আমাদের নয়, গোটা মানবসমাজের জন্যে এক স্মরণীয় দিন। সেদিন প্রথম মানুষ অবতরণ করেছিল চাঁদে। হিউস্টন থেকে চাঁদে রওনা হচ্ছেন আর্মস্ট্রং আর তাঁর সঙ্গীরা আর চট্টগ্রামে আমরা উত্তেজনায় অস্থির। বাড়ির সবাইকে নিয়ে আমি ক্যাম্পাস থেকে চলে এসেছি বাটালি পাহাড়ে আবদুল আলীর বাসায়। তাঁর অগ্রজ আবদুল আউয়াল এসেছেন রামগড় টি এস্টেট থেকে—সঙ্গে বিয়ারের ক্যান কয়েকটা। তাঁদের বড়ো ভাই আবদুল আলিমকে এড়িয়ে দোতলায় মীর মোজাম্মেল হোসেনের বাসায় জড়ো হয়েছি আমরা। বেতারে ধারাভাষ্য শুনছি মহাকাশ-যাত্রার আর বিয়ার খেয়ে উদ্‌যাপন করছি মানুষের এই সাফল্য। মীর সাহেব অবশ্য ডাবের পানি ছাড়া কিছু খাচ্ছেন না। এক সময়ে রুচি এসে একটু

অতিরিক্ত কৌতূহল প্রকাশ করায় তাকেও এক চুমুক বিয়ার খাইয়ে দিলাম। নভোযাত্রীদের সাফল্য মানুষের অপরিসীম ক্ষমতা ও সম্ভাবনার যে-বার্তা বয়ে নিয়ে এলো, তার খুশিতে রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারি নি।

৩.

মানুষ কী না পারে! বিস্ময়ের পর বিস্ময়! কদিন পরই জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জানালেন, দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং জনপ্রতিনিধিদের কাছে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। বানরের সংগীত গাওয়া এবং শিলার জলে ভেসে যাওয়ার মতো এও কি সম্ভব যে, একজন সামরিক শাসক স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে ব্যারাকে ফিরে যাবেন! পরে প্রেসিডেন্ট তাঁর বক্তব্য বিশদ করেছিলেন : সংখ্যাসাম্যের নীতি বর্জিত হবে, অর্থাৎ একজনের এক ভোটের নীতি স্বীকৃত হবে; পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বিলুপ্ত হবে, অর্থাৎ পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে; কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতাবণ্টনের বৈষম্যের কথা—বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চনার কথা—স্বীকার করে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো যে, তা দূর করার ব্যবস্থা করা হবে। তবে প্রেসিডেন্ট একটা আইনগত কাঠামো আদেশ জারি করবেন—তার অধীনে সাধারণ নির্বাচন হবে ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবরে। নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ শাসনতন্ত্র রচনার জন্যে সময় পাবেন ১২০ দিন। তাতে ব্যর্থ হলে জাতীয় পরিষদ ভেঙে যাবে আপনা থেকেই এবং আবার অনুষ্ঠিত হবে সাধারণ নির্বাচন। শাসনতন্ত্র রচিত হয়ে গেলে এবং তা যথাযথভাবে অনুমোদিত হলে তার বিধান-অনুযায়ী সরকার গঠিত হবে। আর যতোদিন তা না হচ্ছে, ততোদিন পর্যন্ত সামরিক আইনই থাকবে দেশের সর্বোচ্চ আইন।

ইয়াহিয়া খানের বক্তৃতায় আমরা, মোটের উপর, খুশিই হয়েছিলাম। তবে উদ্‌বেগ ছিল আইনগত কাঠামো আদেশে কী থাকবে, তা নিয়ে। পরের মার্চ মাসে সে-আদেশ প্রবর্তিত হলো। তাতে যেসব শাসনতান্ত্রিক বিধি-বিধান ও নীতি-নির্দেশনা দেওয়া হলো, তার মোদ্দা কথা এই : দেশটি আবার ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান নামে পরিচিত হবে; রাষ্ট্রপ্রধান হবেন মুসলমান; 'যে ইসলামি ভাবাদর্শ পাকিস্তানের ভিত্তি', তা রক্ষা করা হবে; প্রদেশগুলোকে সর্বোচ্চ মাত্রায় স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হবে; ইসলামি জীবনাচরণ ও নৈতিক আদর্শ বিকশিত ও রক্ষা করা হবে; কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী আইনপ্রণয়নে বিরত রাখার ব্যবস্থা করা হবে।

প্রেসিডেন্টের এই আদেশের বিরুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়নের উভয় গ্রুপ, ছাত্রলীগ এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন সামরিক আইনের সীমাবদ্ধতার মধ্যে যতখানিসম্ভব প্রতিবাদ করে। তারা আইনগত কাঠামো আদেশ বাতিল করে ছয় দফা ও এগারো দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবি করে এবং সামরিক সরকার-প্রণীত নতুন শিক্ষানীতি প্রত্যাহারের দাবি জানায়। এর আগেও সামরিক আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও ছাত্র-সংগঠনগুলির নেতৃত্বে নূর খানের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল।

এ-বিষয়ে আহূত ঢাকার একটি সভায় ছাত্র ইউনিয়নের উভয় গ্রুপ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতা-কর্মীদের মতবিরোধ একসময়ে পারস্পরিক সংঘর্ষে পরিণত হয়। সংঘর্ষে নিহত হয় ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মী আবদুল মালেক। শিক্ষানীতিতে ইসলামি আদর্শ প্রাধান্য পাবে নাকি ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলের জন্যে উন্মুক্ত আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, সে-সম্পর্কে গুরুতর বিরোধের সেই শুরু। আরো পরে, ১৯৭০ সালের আগস্টে, ছাত্রেরা এক নতুন আন্দোলনের সূচনা করে। নূর খানের শিক্ষানীতির আলোকে *পাকিস্তান—দেশ ও কৃষ্টি* নামে একটি বই নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রদের অবশ্যপাঠ্য করা হয়। বইটি লিখেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের রিডার ড. মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম। ছাত্রদের বক্তব্য ছিল এই যে, এতে একদিকে পাঠ্যসূচির চাপ বাড়ছে, অন্যদিকে দেশীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতাসৃষ্টির নামে সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ প্রচারিত হচ্ছে। একটি পাঠ্যবইকে কেন্দ্র করে এমন আন্দোলন আর কখনো হয়েছিল বলে মনে হয় না। শেষ পর্যন্ত পাঠ্যসূচি থেকে বইটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল।

৪.

দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ির বীমাবাবদ কিছু টাকা পেয়েছিলাম, তার সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া প্রভিডেন্ট ফান্ডের আর কিছু টাকা যোগ করে একটা নতুন গাড়ি কেনা গেল। আবারো ফোকসওয়াগেন। আবার গাড়ি চালাতে গিয়ে প্রথম দিকে মনে হতে লাগলো, গাড়িটা যেন আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ডান দিকে সরে যাচ্ছে। পরে সে-ভাব কেটে যায়।

১৯৬৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর আমাদের ছোটো মেয়ে শুচির জন্ম হলো। ক্লিনিকে জায়গা না পাওয়ায় তার আবির্ভাব হয়েছিল চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে—সে-বাবদ কর্তৃপক্ষকে দিতে হয়েছিল এক টাকারও কিছু কম। নতুন গাড়িতে করে শুচিকে তোলা হলো মীর মোজাম্মেল হোসেনের ফ্ল্যাটে। তার জন্ম-উপলক্ষে আমার শাশুড়ি এসেছিলেন ঢাকা থেকে। বেবীর সঙ্গে তিনিও কিছুদিন ওই ফ্ল্যাটে থাকলেন। আমি আলীর সঙ্গে নিচে তার ফ্ল্যাটে থাকলাম।

শুচি খুব মেজাজি হয়েছিল পরে। তার জন্যে আমরা সময়মতো মীর সাহেবের সান্নিধ্যকে দায়ী করতাম।

৫.

১৯৬৯ সালের ১২ নভেম্বর আমার শিক্ষক অজিতকুমার গুহ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তখন ছিলেন কুমিল্লার সুপারিবাগানে নিজেদের পারিবারিক বাসভবনে। রাতে বুকে প্রচণ্ড ব্যথা হয়, কোনো চিকিৎসার সুযোগলাভের আগেই তিনি চলে যান মাত্র ৫৫ বছর বয়সে।

জগন্নাথ কলেজে আমি তাঁর ছাত্র ছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যখন প্রথমবার খণ্ডকাল শিক্ষকতা করেন, তখনো তাঁর কাছে পড়েছি। আমি তাঁর আন্তরিক স্নেহ লাভ করেছিলাম। তিনি খাওয়াতে ভালোবাসতেন—সে-সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার করেছি। তিনি যখন র‍্যাংকিন স্ট্রিটে থাকতেন তখন সময় পেলেই সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ি চলে আসতেন। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমার অনার্স পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পরে একদিন এসে বললেন, 'খাতায় তুমি রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভুল উদ্‌ধৃতি দিয়েছ।' বুঝলাম, উনি কোনো পত্রের বহিরাগত পরীক্ষক ছিলেন। কোন কবিতার উদ্‌ধৃতিতে ভুল করেছি জানতে চাইলে বললেন. 'ঐকতান'। বললাম, 'মনে হয়, আমি দুটি লাইন উদ্‌ধৃত করেছি :

'আমার কবিতা, জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।'

অজিতবাবু বললেন, 'তুমি সর্বপথগামী লিখেছ—আমি বড়ো দুঃখিত হয়েছি।' আমি অশেষ লজ্জিত হলাম। পরে পরীক্ষার ফল জানিয়ে তাঁকে চিঠি লিখেছিলাম কুমিল্লার ঠিকানায়। তিনি অভিনন্দন জানিয়ে লিখলেন, 'কুমিল্লায় আসার আগেই তোমার ফল জেনে এসেছিলাম, কিন্তু তোমাকে জানানো সংগত হতো না বলে কিছু জানাই নি।'

আমার বিয়ের পরে বেবীও তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ লাভ করেছিল। তিনি যে সেই কোনকালে ওয়্যার স্ট্রিট ও ভিতরবাড়ি লেনে থাকতেন শিল্পী কামরুল হাসানের সঙ্গে, তখন থেকে পরিচয়। তারপর তাঁতিবাজারে থাকতেন আমাদের কলেজ-জীবনের আরেক শিক্ষক নারায়ণচন্দ্র সাহার ব্যবস্থাপনায়। সেখান থেকে র‍্যাংকিন স্ট্রিট এবং শেষকালে হাটখোলার 'টয়' হাউজে। তাঁর বাসা আমার জন্যে অবারিত ছিল। তাঁর ভৃত্যেরা তা জানতো বলে অজিতবাবু না থাকলেও তাঁর বাড়ির দরজা খোলাই পেতাম। তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদেরও আমি প্রীতির পাত্র হয়ে উঠেছিলাম। প্রবোধচন্দ্র দাশগুপ্ত ও পরিমল দত্ত, সুধীর সেন ও সুধা সেন, অচ্যুতকুমার সাহা ও চিত্তরঞ্জন সাহা—এঁদের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁরই মাধ্যমে। শওকত ওসমান যখন চট্টগ্রাম থেকে বদলি হয়ে আসেন ঢাকা কলেজে, তখন দীর্ঘকাল তিনি থেকেছেন অজিতবাবুর বাড়িতে। শওকত ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় থাকলেও সেখানেই আমার ঘনিষ্ঠতা হয় তাঁর সঙ্গে।

অজিতবাবু প্রায় কুড়ি বছর শিক্ষকতা করেছিলেন জগন্নাথ কলেজে। ওই কলেজে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার অভিপ্রায়েই, শুনেছি, মোনায়েম খান জগন্নাথ কলেজকে সরকারিকরণের সিদ্ধান্ত নেন। সরকারি চাকরি করতে চাননি বলে—তাঁর প্রতি সরকারের বৈরী মনোভাব তাঁর অজানা ছিল না—অজিতবাবু জগন্নাথ কলেজে ইস্তফা দেন। এরপরে কয়েকমাস টি অ্যান্ড টি কলেজে এবং কয়েক মাস কে এল জুবিলী স্কুলে স্থাপিত নৈশ কলেজে শিক্ষকতা করেছিলেন। প্রথমটায় অনেকটা তাঁর জীবনাদর্শের কারণে সহকর্মীদের বৈরিতার জন্যে এবং পরেরটায় অতি আপনজনের সঙ্গে ব্যক্তিগত মনোমালিন্যের জন্যে তিনি চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

সৈয়দ আলী আহসান সে-সময়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ। অজিতবাবুকে বিভাগে নিলে একইসঙ্গে অনার্স ও এম এ পর্যায়ে বাংলা ও পালি-প্রাকৃত পড়াবার এবং সাবসিডিয়ারি পর্যায়ে সংস্কৃত পড়াবার সুবিধে হবে, এমন একটা যুক্তি

দেখিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি দেন-দরবার করতে থাকেন। একসময়ে ভাইস-চান্সেলরের আনুকূল্যের ইঙ্গিত পেয়ে আলী আহসান সাহেব আমাকে বলেন অজিতবাবুর কাছ থেকে একটা আবেদন আনিয়ে রাখতে। আমার চিঠির উত্তরে অজিতবাবু নিজের নামাঙ্কিত প্যাডের কয়েকটি কাগজে স্বাক্ষর দিয়ে পাঠিয়ে দেন; লেখেন, যেমন বুঝি তেমনি করে যেন আমি দরখাস্তটা লিখে দিই। এসব কথার কিছু কিছু জানাজানি হয়ে যায়। ফলে, তাঁর মৃত্যুর পরে খবর বের হয় যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পথে কুমিল্লায় তাঁর মৃত্যু হয়।

অজিতবাবু চলে যাওয়ার পরে বহুদিন পর্যন্ত তাঁর সেই স্বাক্ষর-দেওয়া শাদা কাগজগুলো আমার ড্রয়ারে পড়ে ছিল।

৬.

স্ত্রী আন-মারিকে নিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এলেন চট্টগ্রামে। বাংলা বিভাগের সবাই যৌথভাবে তাঁদের নৈশভোজে আপ্যায়িত করলাম আগ্রাবাদের একটি রেস্টুরেন্টে। তিনি তখন ইউনেস্কোতে কাজ করেন, দেশে এসেছিলেন বোধহয় দীর্ঘ ব্যবধানের পরে। তাঁর অনিন্দিতকান্তি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তবে তিনি স্বল্পভাষী এবং কথা বলেন নিম্নকণ্ঠে। তাঁর বইপত্র তখন সবই প্রায় বেরিয়ে গেছে। সে-সম্পর্কে আমাদের উচ্ছ্বাসে তিনি বিব্রত বোধ করছিলেন। আমরা সবাই তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, আন-মারির প্রতি যথোচিত মনোযোগ দেওয়া হচ্ছিল না। তাঁর এক ভাই ছিলেন সঙ্গে—তাঁর বাড়িতেই তিনি উঠেছিলেন—সে-ভদ্রলোকও খানিকটা উপেক্ষিত হয়েছিলেন। ওয়ালীউল্লাহর সঙ্গে আলী আহসান সাহেবের জানাশোনা চল্লিশের দশকের কলকাতা থেকে, মাহমুদ শাহ্ কোরেশীর পরিচয় ষাটের দশকে প্যারিসে। স্বভাবতই তাঁদের সঙ্গে তাঁর বেশি কথা হচ্ছিল। ওয়ালীউল্লাহর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি, তবে আন-মারির সঙ্গে পরে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

এর কিছুকাল পরে চট্টগ্রামে এলেন সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশিম। তিনি তখন পাকিস্তান কাউনসিলের ভাইস-চেয়ারম্যান বা এমন কোনো পদের অধিকারী। দাপ্তরিক কাজে এসেছিলেন। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন পাকিস্তান কাউনসিলের ঢাকার কর্মকর্তা নাজমা আতহারকে। নাজমুদ্দীন হাশিমের নাম শুনেছি আমাদের ছাত্রজীবনে—নানাজনের মুখেই, তবে বিশেষ করে, মুনীর চৌধুরীর মুখে। ইংরেজি ও বাংলা—দু ভাষায় তাঁর অসামান্য দক্ষতা, নানা বিষয়ে জ্ঞান ও বর্ণবহুল ব্যক্তিত্বের কথা শুনে তাঁর সম্পর্কে কৌতূহল ছিল। তাঁর সঙ্গে আলাপ করার জন্যে তাঁর অনেককালের বন্ধু সৈয়দ আলী আহসান নিজের বাড়িতে নৈশভোজে ডেকেছিলেন কয়েকজনকে, সেখানে আমিও ছিলাম। পাকিস্তান কাউনসিল যেহেতু কেন্দ্রীয় তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল এবং যেহেতু তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিতর্কের অবতারণা করেছিলেন, তাই হাশিম ভাইকে আমি বলেই দিলাম যে, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মনোভাব দিয়েই আমরা অনেকে এখন শত্রুমিত্র নির্ণয় করি। তিনি সরাসরি এর জবাব দিলেন

না, কিন্তু আসর ভাঙার শেষে বুঝতেই পারলাম যে, এই প্রশ্নে আমাদের সঙ্গে তাঁর মতভেদ নেই। হাশিম ভাইয়ের ব্যক্তিত্বের তাৎক্ষণিক আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম। ভারি গলায় তিনি সজোরেই নিজের মতপ্রকাশ করতেন এবং সে-বিষয়ে অন্যদের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষা করতেন না। পরবর্তীকালে হাশিম ভাইয়ের সঙ্গে আমার যে-সৌহার্দ্য হয়, তা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল।

৭.

দেশে দ্বিতীয়বার সামরিক আইন জারি হওয়ার পরে মওলানা ভাসানীর কথাবার্তা ও কাজকর্ম আমাদের কাছে খুব বিভ্রান্তিকর মনে হতে থাকে। ১৯৬৯ সালের অক্টোবরে ভারতের আহমেদাবাদে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। মওলানা ভাসানী তার বিরুদ্ধে সারা পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদ-দিবস আহ্বান করেন। জনে-জনে কালো ব্যাজ পরা, বাড়ি-বাড়ি কালো পতাকা তোলা এবং জনসভা করে দাঙ্গার প্রতিবাদজ্ঞাপন ছিল এ-দিনের কর্মসূচি। এমন কর্মসূচি যে আমাদের দেশেই দাঙ্গাসৃষ্টির পথ তৈরি করে দিতে পারতো, সে-আশঙ্কা তাঁর মনে কেন জাগেনি, তা ব্যাখ্যা করা দুরূহ।

অনেকেই কিন্তু এই প্রতিবাদ-দিবসে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করে মওলানা ভাসানীকে তাঁর কর্মসূচি বাতিল করতে অনুরোধ করলেন। তাঁদের মধ্যে আবুল হাশিম ও জসীমউদ্‌দীনের নাম বিশেষ করে মনে পড়ে। আওয়ামী লীগ থেকে মওলানার কাছে দূত পাঠানো হয়। এমনকি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ভেতরেও ব্যাপারটা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত মওলানা সাহেব প্রতিবাদ দিবসের আহ্বান প্রত্যাহার করে নেন।

এর কিছুকাল পরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যখন পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়ে ফেলেছেন, তখন মওলানা ভাসানী 'ভোটের আগে ভাত চাই' এবং 'ব্যালট বাক্সে লাথি মারো' আওয়াজ তুললেন। তিনি আরো যেসব কথা বললেন, তাতে মনে হলো, আওয়ামী লীগ ও তার সমর্থকদের তিনি পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় বলে গণ্য করছেন। পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে সোহ্‌রাওয়ার্দীর জীবদ্দশায় আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাঁর যে-মতপার্থক্য ছিল, তার সঙ্গে এ বক্তব্যের সংগতি ছিল। কিন্তু তারপর তো অনেক কিছু বদলেছে। সে-বদলের উদাহরণও তিনি দিলেন—সমাজতন্ত্রের বদলে দেশে হুকুমতে রব্বানি-প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে। তিনি হঠাৎ করে ফিরে যেতে চাইলেন খোলাফায়ে রাশেদিনের জমানায়। এই অবস্থায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তোয়াহা দল থেকে পদত্যাগ করেন—তবে তা ঘটে ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময়ে। ইয়াহিয়ার কারাগার থেকে সদ্য মুক্তিলাভ করে তোয়াহার স্থলাভিষিক্ত হন মশিউর রহমান ওরফে যাদু মিয়া।

বামপন্থীদের একটি অংশ নির্বাচন বর্জন করার পক্ষে বেশ শক্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বদরুদ্দীন উমর একবার চট্টগ্রামে আসেন। তাঁর বোনের বাড়ি থেকে তাঁকে

নিয়ে যাই ক্যাম্পাসে আমার বাসায়। আমাদের উভয়ের বন্ধু ড. কামাল হোসেন কিছুদিন আগে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছিলেন—উমর তা অনুমোদন করেন নি। পথে যেতে যেতেই এ-বিষয়ে কথা হলো। রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে নির্বাচন নিয়ে আমরা বহুক্ষণ তর্ক করলাম—আমি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পক্ষে, তিনি বিপক্ষে। আমি বলেছিলাম, আওয়ামী লীগের যতো সীমাবদ্ধতা থাকুক, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতাগ্রহণ তো সামরিক শাসনের চেয়ে ভালো। তিনি তা মানতে পারেন নি।

৮.

শীতের ছুটিতে—১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসে—ঢাকায় এলাম : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার পরে এই প্রথম ঢাকায় আসা। সময়টা ভালো ছিল না। আগের মাসেই ঢাকায় ও নারায়ণগঞ্জে বাঙালি-বিহারি দাঙ্গা হয়ে গেছে। দাঙ্গার সূত্রপাত হয়েছিল মীরপুরে—ভোটার-তালিকাভুক্তির ফরম বাংলায় ছাপা হওয়ায় অবাঙালিরা তা পূরণ করতে অস্বীকার করে, কিছু ফরমও বোধহয় পুড়িয়ে দেয়। তা থেকে উত্তেজনা, শেষে দাঙ্গা। ঠাটারিবাজারে অবাঙালি জনসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে উত্তেজনা সেখানেও ছিল, কিন্তু কিছু সচেতন মানুষের চেষ্টায় দাঙ্গা এড়ানো সম্ভবপর হয়েছিল। ঢাকায় অনেকেই মনে করেছিলেন যে, নির্বাচন-অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিলেও সামরিক সরকার তা বাতিল করার অজুহাত খুঁজছে—বিহারিদের হাতে কিছু অস্ত্রশস্ত্র সেনাবাহিনীই তুলে দিয়েছে। দূর থেকে আমাদেরও এমন ধারণা হয়েছিল। মনে হলো, আমাদের আর মুক্তি নেই : এতকাল হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা থামাবার চেষ্টা করেছি; এখন থেকে বাঙালি-বিহারি দাঙ্গা থামাবার চেষ্টা করতে হবে। তবে অবাঙালিরা যদি কেন্দ্রীয় সরকারের খেলার ঘুঁটি হয়ে যায়, তাহলে কাজটা শক্ত হবে; বাঙালিরা যে সবাই ধোয়া-তুলসীপাতা, তা তো নয়।

ঢাকায় এসে *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা* থেকে একটা চিঠি পেলাম। ১৯৭২ সালে *ব্রিটানিকার* দু শ বছরপূর্ত উপলক্ষে যে-নতুন সংস্করণ বের হবে, তাতে দক্ষিণ এশীয় সাহিত্য-বিষয়ে একটি বড়ো প্রবন্ধ লিখতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁরা। *ব্রিটানিকার* স্বত্ব একসময়ে কিনে নিয়েছিল শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়। সেই অবধি তা শিকাগো থেকেই বের হচ্ছে। আমার মতো অর্বাচীন এবং ভাষা-জ্ঞানহীন ব্যক্তিকে দক্ষিণ এশীয় সাহিত্য-বিষয়ে লিখতে বলার পেছনে নিশ্চয় সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অধ্যাপকের মাত্রাতিরিক্ত উদারতা কাজ করেছিল। ঢাকায় ও চট্টগ্রামে যাঁকেই এই চিঠির কথা বলি, তিনিই আনন্দ প্রকাশ করেন। আমিও চিঠি লিখে *ব্রিটানিকাকে* সম্মতি জানাই।

কিন্তু লেখার উপকরণ কোথায় পাবো? ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে যা পাওয়া যায়, তা যথেষ্ট নয়—বিশেষ করে সাম্প্রতিককালের সাহিত্য সম্পর্কে লেখার জন্যে। কয়েকটি দূতাবাসের মাধ্যমে যদি কিছু বই আনানো যেতো, তাহলে ভালো

হতো। আহমদ হোসেনকে বললাম—সে তখন মেতেছে পাকিস্তান-জাতিসংঘ মৈত্রী সমিতি নিয়ে, বিচারপতি আমিন আহমদ তার পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি, আহমদ সাধারণ সম্পাদক। আহমদ বলল, সে মুখে বলবে ভারতীয় ও সিংহলি হাই কমিশনকে, তবে আমি যেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তাদের চিঠি দিই। পাকিস্তান সরকারের তখনকার বিধিতে কোনো নাগরিকের পক্ষে বিদেশী কোনো দূতাবাসের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা ছিল নিষিদ্ধ।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে চিঠি লিখলাম—সেইসঙ্গে সংযুক্ত ভারতীয় ও সিংহলি হাই কমিশন ও নেপালি দূতাবাসের কাছে বই চেয়ে লেখা আমার চিঠি—তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে তা যথাযথ পাঠিয়ে দেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে লেখা আমার চিঠি আবার সুপারিশ করে পাঠিয়ে দিলেন ভাইস-চান্সেলর। অনেককাল পরে সিংহলি হাই কমিশন থেকে একটি এবং ভারতীয় হাই কমিশন থেকে তিনটি বই পেয়েছিলাম।

এর মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু প্রশাসনিক পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে। ড. আবদুল করিম ইতিহাসের অধ্যাপকপদে উন্নীত হলেন এবং সেই সুবাদে কলা অনুষদের ডিনের দায়িত্ব দেওয়া হলো তাঁকে। আলাওল হলের প্রোভোস্টের যে-পদ তিনি ছেড়ে আসেন, তা পূর্ণ করেন ড. আর আই চৌধুরী। আলাওল হলের পশ্চিম ভবন এ এফ রহমান হল নামে (এফ রহমান হল, স্যার এ এফ রহমান হল বা আহমদ ফজলুর রহমান হল নয়) একটি স্বতন্ত্র হল ঘোষিত হলো। সে-হলের প্রোভোস্টের দায়িত্ব পালন করতে কর্তৃপক্ষ আহ্বান জানালেন আমাকে। সৈয়দ আলী আহসান এ-বার্তা বয়ে নিয়ে এলেন এবং আমাকে পরামর্শ দিলেন গররাজি না হতে। তার প্রধান কারণ, সিন্ডিকেটে দুজন ডিন ও দুজন প্রোভোস্ট থাকার সুযোগ ছিল। ডিনের পদ হারানোয় আলী আহসান সাহেব আর সিন্ডিকেটের সদস্য রইলেন না। তিনি বললেন, আমি প্রোভোস্ট হলে আমাদের বিভাগের অন্তত একজন তো সিন্ডিকেটে থাকবে। আমি রাজি হলাম।

ঢাকায় থাকতে বিভাগের বাঁধা কমিটির বাইরে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কাজে জড়িত ছিলাম না। চট্টগ্রামে এসে সৈয়দ আলী আহসানের অনুপস্থিতিতে বিভাগের দায়িত্বে থাকতাম; এক বছরের মধ্যেই প্রোভোস্ট হলাম, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের সদস্য হয়ে গেলাম। সিন্ডিকেটে আমার প্রথম সভায় ভাইস-চান্সেলরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বললাম এবং সকলে আমার যুক্তি মেনে নিলেন। সব মিলিয়ে নিজের দায়িত্ব বেশ উপভোগ করতে লাগলাম।

তবে প্রোভোস্ট হয়ে খুব পরিশ্রম করেছিলাম, কিছু কষ্টসাধ্য কাজও করতে পেরেছিলাম। নির্মীয়মাণ অবস্থায় হলের ভবনে আলাওল হলের অনেক ছাত্র ঢুকে পড়েছিল—তাদের উচ্ছেদ করা হলো আমার প্রথম কাজ। এ-বিষয়ে আলাওল হলের নতুন প্রোভোস্টের সাহায্য পেয়েছিলাম, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর ব্যবস্থাও নিতে হয়েছিল। নোটিস দেওয়ার পরেও ঘর ছাড়েনি, এমন এক ছাত্রের দরজার তালা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ভেঙে তার সব জিনিসপত্র গুটিয়ে প্রোভোস্টের দপ্তরে নিয়ে এলাম এবং দরজায় বিজ্ঞপ্তি সেঁটে দিলাম যে, সে যেন

নির্ধারিত সময়ে প্রোভোস্ট অফিস থেকে তার জিনিসপত্র নিয়ে যায়। নির্ধারিত সময় মানে যখন আমি হল-অফিসে থাকবো। ছেলেটি এলো. কর্মচারীদের সঙ্গে একটু উদ্ধত আচরণ করলো। আমি তাকে ডেকে পাঠালাম এবং জানালাম যে, সে যদি আগের নোটিস-অনুযায়ী ঘর ছেড়ে দিতো, তাহলে আমাকে অপ্রীতিকর কাজটা করতে হতো না এবং তারও অসুবিধে হতো না। তাকে বললাম জিনিসপত্র বুঝে নিতে এবং সবকিছু ঠিক আছে কিনা তা আমাকে জানাতে । সে ফিরে এসে বললো, সবই ঠিক আছে, শুধু তার তালাটা নেই। আমি বললাম, তার কারণ, সেটা ভাঙা হয়েছে। ছেলেটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। বললাম, তোমার তালার দাম জানালে আমি তা দিয়ে দেবো। আমাকে মানিব্যাগ খুলতে দেখে সে জানতে চাইলো, দামটা অফিস থেকে দেওয়া হবে, না, আমি ব্যক্তিগতভাবে দেবো? জানালাম, অফিস থেকে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই, আমি নিজে থেকেই দেবো। সে বললো, তাহলে আমি নেবো না।

হল খালি করার পরে আমি আসনের জন্যে আবেদনপত্র আহ্বান করি। আবেদনকারীদের মেধা-তালিকা তৈরি করে ঠিক করি, ৬০ শতাংশ ছাত্র বাছাই করা হবে মেধা-তালিকা থেকে। মেধা-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় নি, এমন কোনো ছাত্রের হলে জায়গা প্রয়োজন বলে যদি তার বিভাগীয় অধ্যক্ষ মনে করেন, তাহলে তাঁর সুপারিশ-অনুযায়ী আসন দেওয়া হবে বাকি ৪০ শতাংশ থেকে। যদি ৪০ শতাংশের কিছু আসন এর পরেও শূন্য থাকে, তবে তা পূরণ করা হবে আবার মেধা-তালিকা থেকে। প্রোভোস্ট বা হাউজ টিউটরের কোনো বিশেষ এখতিয়ার থাকবে না।

৪০ শতাংশের নিয়ম করায় অনেক বিভাগীয় অধ্যক্ষ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন, যা একান্তই হল-প্রশাসনের বিষয়, তার সঙ্গে অধ্যক্ষদের জড়িত করে আমি ছাত্রদের কাছে তাঁদেরকে এক ধরনের অসুবিধেয় ফেলছি। আমি ভেবেছিলাম যে, এমন নিয়ম করলে দূর-দূরান্ত থেকে আসা অথচ বাছাইয়ে বাদ পড়া ছাত্রদের হিল্লে হবে।

অফিসকে বলে রেখেছিলাম, কেউ চাইলেই যেন মেধা-তালিকা দেখতে পারে। তাতে সে বরাদ্দ পায়নি কেন, এটা যেমন বুঝতে পারবে. তেমনি আর কজনের পরে তার আসন পাওয়ার কথা, তাও জানতে পারবে। আর আমার দিক থেকে যে কোনো পক্ষপাত হয় নি, তাও ছাত্রেরা উপলব্ধি করতে পারবে।

এইসব কাজে আমি দুই হাউজ-টিউটর—রণধীর বড়ূয়া ও খোন্দকার নূরুল ইসলামের—খুব সাহায্য পেয়েছিলাম। নূরুল ইসলাম ছিলেন রসায়নের শিক্ষক, একটু খেয়ালি গোছের, কিন্তু ছাত্রদের কাছ থেকে টাকাপয়সা আদায় করার ব্যাপারে তাঁর অসাধারণ পটুত্ব ছিল। রোজকার আদায় বুঝে নিয়ে আমি ব্যাংকে রাখতাম। আর রোজ চেক কেটে খরচের টাকা দিতাম রণধীরবাবুকে। তিনি আমাদের বিভাগের শিক্ষক, পালি পড়াতেন, আমার অগ্রজস্থানীয়। তিনি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এম এড ডিগ্রি নিয়েছিলেন, সেকথাও মাঝে মাঝে ভুলে যেতেন। কিন্তু এতো যত্ন করে হলের কাজ করতেন যে, ছাত্রদের খাওয়া-দাওয়া কিংবা অন্যান্য চাহিদার বিষয়ে আমাকে চিন্তা করতে হতো না।

আমি আরেকটা কাজ করেছিলাম। তৃতীয় বর্ষে পড়ছে, নানা বিভাগের এমন কিছু ছাত্র আলাওল হলের মূল ভবনে স্থান না পেয়ে একটা টিন-শেডে থাকতো। সিংগল সিট বরাদ্দ করে তাদের আমি ভর্তি করলাম আমার হলে। আমি চাই, প্রথমবারের পরীক্ষায় হলের সুনাম হোক। তবে এর পেছনে অনেকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য খুঁজেছিলেন।

আবেদনপত্রে তিনজন সিনিয়র শিক্ষকের সুপারিশ দেখে তিনজন গার্ড নিযুক্ত করেছিলাম : মুনশি মিয়া, আবুল খায়ের ও জয়নাল। এরা যে কী অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছিল, তা বলে শেষ করা যায় না। এই ৩০ বছর পরও তাদের সঙ্গে আমার এবং আমার পরিবারের সকল সদস্যের আন্তরিক সম্পর্ক অটুট আছে। অফিস সহকারী জহিরুল হক, পিয়ন আবদুল হক ও দুজন মালি—সোবহান ও আমীর হোসেনও—দায়িত্বশীল ছিল। তাদের কারণে প্রোভোস্ট হিসেবে আমি যাতে অপ্রস্তত না হই, সেদিকে সকলেরই ছিল প্রখর দৃষ্টি।

আমার সবচেয়ে বড়ো সমস্যা ছিল এই যে, হলের ডাইনিং হল তখনো তৈরি হয় নি। আর আই চৌধুরীর সৌজন্যে আলাওল হলের আহার-কক্ষেই আমাদের ছাত্রদের খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাতে কিছু যে অসুবিধে হয় নি, তা নয়, তবে তা সামলে নেওয়া গিয়েছিল। পরে যেদিন ডাইনিং হলের উদ্‌বোধন হতে যাবে, সেই সন্ধ্যায় এক ছাত্র ছুরিকাহত হওয়ায় তাকে নিয়ে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে চলে আসি। ভাইস-চান্সেলর ও রেজিস্ট্রারও সেখানে এসেছিলেন। ফলে হলের প্রথম নৈশভোজে আমরা তিনজনের কেউই থাকতে পারি নি। ছাত্রটির আঘাত গুরুতর ছিল না, কিন্তু তখন সামান্য আঘাতের ঘটনায়ও আমরা বিচলিত হতাম। দিন দুই পরে ছাত্রটি হলে ফিরে আসে। তার নাম সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম—পরে হাটহাজারী নির্বাচনী এলাকা থেকে সে পরপর তিনবার সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি আহত হয়েছিল বোধহয় শামসুল আনোয়ার—আমার বিভাগের ছাত্র ও আলাওর হলের আবাসিক।

সার্‌ এ এফ রহমানের দৌহিত্র—সিভিল সার্ভিসের সদস্য—সৈয়দ শামীম আহসানকে অনুরোধ করে রহমান সাহেবের ছবি জোগাড় করি অফিসের দেওয়ালে টাঙাবার জন্যে। হলের প্রথম বার্ষিকীতে আমি তাঁর সম্পর্কে লিখি। যাঁর নামে হল, তাঁর সম্পর্কে ছাত্রদের মনে যে-কৌতূহল থাকার কথা, তার অভাব দেখে পীড়িত বোধ করেছিলাম।

তবু অনেকদিন পর্যন্ত এ এফ রহমান হলের শান্তি ও শৃঙ্খলা, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ বেশ গৌরব করার মতো ছিল।

৯.

সেই ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় ঘটে গেল ১৯৭০-এর ১২ নভেম্বর রাতে। শুধু শতাধিক মাইল বেগে ছুটে যাওয়া ঘূর্ণিবাত্যা নয়, ১৫-২০ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাসও সেইসঙ্গে গ্রাস

করেছিল সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চল। সন্দ্বীপ, হাতিয়া, কক্সবাজার, নোয়াখালি, পটুয়াখালি, বরিশাল—এইসব অঞ্চলই আক্রান্ত হয়। ১০-১২ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়; গবাদিপশু, বাড়িঘর, শস্যখামার উড়ে যায়, ডুবে যায়, বিধ্বস্ত হয়। সেই রাতে চট্টগ্রামে আমরাও কিছুটা পীড়ন অনুভব করি, কয়েকদিন অসুবিধের মধ্যে কাটে—কিন্তু তার সবটাই কিছুটা এবং অসুবিধে মাত্র। ধীরে ধীরে ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে যখন জানতে পারি, তখন বুঝি, আমরা কতো সৌভাগ্যবান।

সারা দেশ থেকে ত্রাণকার্যের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ছুটে যায় অনেক দল, ফিরে আসে তিক্ত স্মৃতি নিয়ে। রাজনৈতিক দলগুলো বেশ কাজ করেছিল, তবে নাগরিক সমাজ করেছিল আরো বেশি। ছায়ানটের একটি দল গিয়েছিল, কামরুল হাসানের নেতৃত্বে গিয়েছিল একটি দল, জয়নুল আবেদিনও এক দলের সঙ্গে গিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান চীন সফর শেষে ইসলামাবাদ যাওয়ার পথে ঢাকায় যাত্রাবিরতি করেন, কিন্তু দুর্গত এলাকা দেখতে যান নি। পরে গভর্নর অ্যাডমিরাল আহসান সাংবাদিকদের কাছে বলেছিলেন যে, ত্রাণকার্যের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হেলিকপ্টার চেয়েও তিনি পান নি। তবে মার্কিন ও ব্রিটিশ নৌ ও বিমানবাহিনী হেলিকপ্টার নিয়ে সাহায্যে এসেছিল; ভারত সড়কপথে ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়েছিল, কিন্তু পাকিস্তান সরকার ভারতীয় বিমান নামবার অনুমতি দেন নি; চীন ও রাশিয়া বড়োরকমের সাহায্য করেছিল; সাহায্যদাতাদের মধ্যে ইরানও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

ওয়ালী খান ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো উল্লেখযোগ্য নেতা এই দুর্যোগের সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন বলে মনে পড়ে না। ঢাকার কয়েকটি সংবাদপত্রে মওলানা ভাসানীর এক বিশাল ছবি বেরিয়েছিল—তিনি হাত দেখিয়ে বলছেন, 'ওরা আসে নি।' এই কটি কথার মধ্যে এই অঞ্চলের মানুষের তখনকার মনোভাবের প্রকাশ ঘটে। মওলানা ভাসানী একদিকে ত্রাণকার্যে নিয়োজিত বিদেশি সৈন্যদের প্রত্যাহার দাবি করেছিলেন, অন্যদিকে খানিকটা আকস্মিকভাবেই পল্টন ময়দানের জনসভায় 'স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান' গঠনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। অথচ নভেম্বর মাসের প্রথমেই এক বক্তৃতায় সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যারা পাকিস্তানকে ভালোবাসে না, তাদের সম্পর্কে। তখন মনে হয়েছিল, আওয়ামী লীগই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। এখন স্বাধীনতার কথা বলায় অনেকে মনে করেছিলেন, ছয় দফাকে টেক্কা দেওয়ার জন্যে তিনি এমন করেছেন; অনেকে মনে করেছিলেন, নির্বাচনবিরোধী মনোভাব থেকেই মওলানা ভাসানী এ-সময়ে এমন ধ্বনি তুলেছেন। দুর্গত অঞ্চল সফর করে এসে এর কয়েকদিন পর শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, আমাদেরকেই নিজের দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা হতে হবে। একেও অনেকে নির্বাচনী প্রচারের অংশ হিসেবে দেখেছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে সাধারণভাবে এই মনোভাবের সৃষ্টি হয় যে, রাজনৈতিক কারণে দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে বলা হচ্ছে। আবার পূর্ব পাকিস্তানে অনেক ছোটো ছোটো দল নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানান ত্রাণকার্যে অংশ নেওয়ার কারণ দেখিয়ে, আবার একই কথা বলে আতাউর রহমান খানের মতো অনেকে নির্বাচনী

প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ান।

সরকার অবশ্য সিদ্ধান্ত নেয় যে, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় নির্বাচন স্থগিত থাকবে, অন্যত্র যথারীতি নির্বাচন হবে। দেশ ক্রমশ ৭ ডিসেম্বরের নির্বাচন-অভিমুখে ধাবিত হতে থাকলো।

দুর্যোগের একটি শৈল্পিক ফলের কথা এখানে বলতে হয়। একটি ত্রাণদলের সঙ্গে জয়নুল আবেদিন গিয়েছিলেন মানপুরায়। পরে ৩০ ফুট লম্বা একটি স্ক্রলে তিনি এঁকেছিলেন বিপর্যস্ত মানুষ ও প্রাণীর ছবি। শক্ত সাদা কাগজের ওপর কালো কালিতে মোটা দাগে আঁকা এসব ছবি মনে করিয়ে দেয় তাঁর মন্বন্তরের সব চিত্রকে। স্ক্রলের একটি ছবিতে ছিল স্তূপাকার মৃতদেহ—আবেদিন সাহেব বলেছিলেন, মৃত্যুতেই শুধু বাঙালি এক হতে জানে।

এই স্ক্রলের প্রদর্শনী হয়েছিল চট্টগ্রামের মুসলিম ইনস্টিটিউট-প্রাঙ্গণে। সে-উপলক্ষে আবেদিন সাহেব চট্টগ্রামে এসেছিলেন। প্রথমে গিয়েছিলেন কাপ্তাইতে তাঁর শ্যালিকার বাড়িতে, সেখান থেকে এসে ওঠেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় তাঁর অনুজ—আমাদের সহকারী গ্রন্থাগারিক—জাহিদুর রহিমের বাসায়। সন্ধ্যাবেলায় আমার বাসায় এলেন তাঁর শ্যালিকার শিশুকন্যা লোপাকে নিয়ে (সে এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত স্থপতি)। মানপুরার কথা হলো, তাঁর অনুভূতির কথা হলো, স্ক্রলের বিষয়ে কথা হলো। তিনি বললেন, যা তিনি সেখানে দেখেছেন, তার সবটাই ধরে রাখতে চেয়েছেন এই নিরাভরণ চিত্রমালায়—এতে কোনো অলংকরণ নেই, আছে শুধু নিষ্ঠুর বাস্তবের রূপ।

কথা বলতে বলতে আবেদিন সাহেব আমার বসার ঘরের দেওয়ালের দিকে বারবার তাকাচ্ছিলেন। ওঠার সময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে রবীন্দ্রনাথের যে-ছবিটা এঁকে দিয়েছিলাম, সেটা কোথায়? লজ্জিত হয়ে বললাম, সেটা আর প্রেস থেকে ফিরে আসেনি। উনি দুঃখিত গলায় বললেন, তোমাকে তো আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম।

১০.

কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা তার কোনো অঙ্গসংগঠনের কাছ থেকে কিছু অনুদান সংগ্রহ করেছিলেন সৈয়দ আলী আহসান। তা দিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের উদ্‌যোগে নজরুল ইসলাম সম্পর্কে দুদিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে। এটাকে বলা হয়েছিল জাতীয় সেমিনার। তার অর্থ, শুধু চট্টগ্রামের নয়, সারা প্রদেশ থেকেই অংশগ্রহণকারী আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। ঢাকা থেকে মুনীর চৌধুরী ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং রাজশাহী থেকে আবু হেনা মোস্তফা কামাল আমার বাসায় উঠেছিলেন। যে-কদিন তাঁরা ছিলেন, সে-রাতগুলো গল্পে-গল্পে শেষ হয়ে যেতো। কাজী মোতাহার হোসেন সম্ভবত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি-ভবনে, রফিকুল ইসলাম তাঁর শ্বশুরবাড়িতে। আমাদের বিভাগের অনেকেই এতে অংশ নিয়েছিলেন। ইংরেজি বিভাগের মোহাম্মদ আলী একটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন,

চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের অধ্যাপক আব্‌দার রশীদ আলোচনা করেছিলেন। পুরো সেমিনারের ভারটা ছিল আমার কাঁধে। মনে হয়, উতরে গিয়েছিলাম। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা বেশ ভালো হয়েছিল। পঠিত প্রবন্ধ দিয়ে বই বের করার পরিকল্পনা কার্যকর হয়নি। কেউ নিজের লেখা পরিমার্জিত করে দেবেন, কেউ মৌখিক আলোচনা পরে লিখিত আকারে পাঠিয়ে দেবেন—এ ধরনের প্রতিশ্রুতি বাস্তবে তেমন রূপ পায়নি। সময়টা খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছিল—তাই কাউকে দোষ দেওয়া যায় না।

আমাদের হাতে যেসব লেখা ছিল, তার থেকে দু-একটা পরে *পাণ্ডুলিপি* পত্রিকায় বের হয়েছিল। *পাণ্ডুলিপি* ছিল আমাদের বিভাগের গবেষণা-পত্রিকা। আমি চট্টগ্রামে যোগ দেওয়ার আগেই আলী আহসান সাহেব সেখানে বাংলা সাহিত্য সমিতি নামে একটা সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠনটা মূলত বিভাগেরই শিক্ষকদের নিয়ে তবে অন্যেরাও এর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারতেন। এর একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বাধ্যবাধকতা এড়ানো যেতো, ফলে অনেক কাজ সহজে করা হতো। আলী আহসান সাহেব ছিলেন এর সভাপতি, হায়াৎ মামুদ ছিলেন প্রথম সাধারণ সম্পাদক। আমি গিয়ে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পাই ড. মোহাম্মদ আবদুল আউয়ালকে। সমিতি থেকে ডিগ্রি ক্লাসের পাঠ্য বাংলা গল্প-কবিতা-প্রবন্ধের সংকলন বের হয়েছিল, আরো কিছু কিছু পুরোনো গ্রন্থ সম্পাদিত হয়ে এবং নতুন গ্রন্থ রচিত হয়ে প্রকাশলাভ করেছিল। আলী আহসান সাহেবের পরিকল্পনামাফিক *পাণ্ডুলিপি* নামে বার্ষিক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে যদিও তিনি *Bengali Literary Review* প্রকাশ করতেন, তবু *পাণ্ডুলিপির* আদর্শ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের *সাহিত্য পত্রিকা*। এই আদর্শেই রাজশাহী থেকে মযহারুল ইসলাম প্রকাশ করতেন *সাহিত্যিকী*। তবে একথা বলা অসংগত হবে না যে, মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সম্পাদনায় *সাহিত্য পত্রিকা* যেমন উচ্চমানসম্পন্ন ছিল, অন্যগুলো তেমন হতে পারেনি। এমনকি, হাই সাহেবের মৃত্যুর পর বিভাগীয় প্রধান মুনীর চৌধুরী পত্রিকা-সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করায় সে-ভার যখন আহমদ শরীফের ওপরে পড়ে, তখন তাঁর পক্ষেও *সাহিত্য পত্রিকার* পূর্বতন মান বজায় রাখা সম্ভবপর হয়নি। পরে আমি নিজেই যদিও পদাধিকার বলে *পাণ্ডুলিপি* সম্পাদনা করেছি, তবু আমার সবসময়ে মনে হয়েছে যে, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে আলাদা উচ্চমানসম্পন্ন গবেষণাপত্র প্রকাশের মালমশলা পাওয়া দুষ্কর। তবে *পাণ্ডুলিপির* প্রথম সংখ্যা হাতে পেয়ে সবাই প্রশংসাই করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্য সমিতির সকল প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত থাকতেন সৈয়দ মোহাম্মদ শফি। তিনি বইঘর নামে খুবই ভালো একটি প্রকাশনা-সংস্থা দাঁড় করিয়েছিলেন, যেখান থেকে প্রকাশ করেছিলেন বহু কৃতী সাহিত্যিকের উল্লেখযোগ্য রচনা। তাঁর আর্ট প্রেসে সবকিছুই সুমুদ্রিত হতো। আল মাহমুদ এই প্রেসের সঙ্গে এবং এখলাসউদ্দীন আহমদ এই প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাংলা বিভাগের সব বইপত্র মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণের দায়িত্ব শফি সাহেবের ওপর অর্পণ করে আলী আহসান সাহেব

নিশ্চিন্ত থাকতেন। আমি যাওয়ার আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছিল। সে-উপলক্ষে চৌধুরী জহুরুল হকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *ঐতিহ্য* নামে একটি বড়ো ও উল্লেখযোগ্য সংকলনগ্রন্থ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল বেশ ভালো। তার কৃতিত্ব বেশিরভাগই প্রাপ্য ছিল ছাত্রদের। ছাত্র ইউনিয়নের দুটি অংশ ও ছাত্রলীগ একুশে ফেব্রুয়ারি-উপলক্ষে সংকলন প্রকাশ করতো। সংস্কৃতি সংসদও ছিল দুটি : তারা সংকলন প্রকাশ করা ছাড়াও নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতো। অতি সাম্প্রতিক আমরা নামে একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ছিল—তাদের সদস্যেরা রাজনীতিসচেতন হলেও দলীয় আনুগত্য ও রেষারেষি এড়াতে আলাদা সংগঠন করেছিল। আমার কাছে এদের সব উদ্‌যোগই খুব রুচিশীল মনে হতো।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে ব্যাধি আক্রমণ করেছে, তা-ও বোঝা যাচ্ছিল। কোনো এক সংস্কৃতি সংসদের অনুষ্ঠানে আমি অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলাম—প্রতিপক্ষেরা এসে সে-অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিতে বাধ্য করে। এ ঘটনায় আমি খুব বিব্রত হই : শিক্ষকের উপস্থিতিতে এভাবে অনুষ্ঠান পণ্ড করাটাই ছিল যথেষ্ট শোচনীয়, তার ওপর কর্তৃপক্ষের দাবিতে ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে আক্রমণকারী দু-একজন ছাত্রের নাম আমাকে উল্লেখ করতে হয়—আমার কারণে কোনো ছাত্রের ক্ষতি হয়, তা আমি কখনো চাইনি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কারো শাস্তি হয়নি—প্রক্টর কীভাবে যেন বিষয়টার নিষ্পত্তি করে দিয়েছিলেন। মজার ব্যাপার হলো, আক্রমণকারীদের অগ্রবর্তী ছাত্রটি অল্পকালের মধ্যেই আমাদের সহকর্মী হয়ে যায় এবং পরে আমার সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে।

এর চেয়ে মারাত্মক হয় এম এ প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রদের পরীক্ষা-না-দিয়ে পরবর্তী-ক্লাসে-উন্নীত হওয়ার আন্দোলন। এটা যে কীভাবে শুরু হয়েছিল, তা মনে পড়ে না। এটুকু মনে পড়ে যে, ব্যাপারটা আমরা অনেকেই গুরুত্বের সঙ্গে নিইনি। ভাইস-চান্সেলরের দপ্তর থেকে টেলিফোন পেয়ে এক বিকেলে তাঁর অফিসে গিয়ে দেখি, বেশ কিছু ছাত্র দরজা আগলে আছে। তারা অবশ্য আমাকে ভেতরে যাওয়ার পথ করে দিলো। ভেতরে গিয়ে জানতে পারি, তারা একটি স্মারকলিপি দিয়েছে—এম এ প্রাথমিক পর্বের পরীক্ষা দেবে না, কিন্তু সবাইকে তুলে দিতে হবে এম এ শেষ পর্বে। এমন অন্যায় দাবি মানা যায় না। কর্তৃপক্ষ জানালেন, তাঁরা এমন অসংগত দাবি নিয়ে আলোচনা করবেন না; ছাত্রেরা জানালো, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা সেখানেই অবস্থান করবে এবং আমাদেরকেও ঘর থেকে বের হতে দেবে না। ভাইস-চান্সেলরের সঙ্গে রেজিস্ট্রার, প্রোভোস্ট দুজন, অনুষদের ডিনসহ সকল বিভাগীয় অধ্যক্ষ, প্রক্টর, সহকারী প্রক্টর অনেকেই আটকে পড়ে গেলাম। একটু রাত হলে দেখি, আমাদের এক্‌জিকিউটিভ ইনজিনিয়ার আফিজউদ্দীন আহমদ ভাইস-চান্সেলর অফিসের পেছন দিক দিয়ে মিস্ত্রিদের মারফত রঙের টিনে ভরে সিদ্ধ ডিম পাঠিয়েছেন আমাদের জন্যে। ছেলেরা দলে দলে হলে গিয়ে খেয়ে আসছে—বাকিরা পাহারা দিচ্ছে। আমরা ঘরের ভেতরে ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছি। রাত বাড়তে থাকলে ছাত্ররা অস্থির হতে শুরু করলো।

প্রথমে স্লোগান, তারপর কিছু কটু মন্তব্য। কিছুকাল আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলর নকশালপন্থীদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে কেউ হঠাৎ করে সে কথা উচ্চৈঃস্বরে স্মরণ করিয়ে দিলো ভাইস-চান্সেলরকে। তা শুনে ড. মল্লিক এক মুহূর্ত দেরি না করে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, 'মারো, কে আমাকে মারতে চাও, মারো।' ভাইস-চান্সেলরের পেছনে পেছনে আমরাও একে একে বেরিয়ে এলাম—আমাদের জন্যে জায়গা করে দিতে ছেলেরাও সরতে সরতে প্রশাসন-ভবনের বাইরে গিয়ে জমায়েত হলো। এ-সময়ে আমরা সকলেই চলে যেতে পারতাম, কিন্তু যাইনি। ছাত্রদেরকে বলা হলো, তারা অবস্থান-ধর্মঘট প্রত্যাহার না করলে শিক্ষকেরা নড়বেন না। ছাত্রেরা বলল, শিক্ষকেরা চলে যেতে চাইলে তারা বাধা দেবে না, কিন্তু তাদের দাবি না মানা পর্যন্ত অবস্থান-ধর্মঘট চলবে। আমরা আবার ভাইস-চান্সেলরের কামরায় চলে এলাম।

প্রক্টর ড. জাকিউদ্দীন আহমদ একবার ধর্মঘটী নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন, একবার ফিরে এসে ভাইস-চান্সেলরের সঙ্গে গোপনে আলোচনা করেন। আমাদের এক সহকর্মী হঠাৎ একটু রোষের সঙ্গেই প্রক্টরের কাছে জানতে চাইলেন, কী হচ্ছে। প্রক্টর একই রকম ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, ভাইস-চান্সেলর ছাড়া কারো কাছে তিনি জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। আমাদের মধ্যেই ঝগড়া লেগে গেল, বড়োদের হস্তক্ষেপে ঝগড়া থামলোও। এক সময়ে শোনা গেল, প্রক্টর অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তাঁর ব্যবহারে রুষ্ট শিক্ষকেরা একেবারেই সহানুভূতিহীন কণ্ঠে মন্তব্য করলেন, 'অভিনয়'। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়লাভের কয়েকদিনের মধ্যেই জাকিউদ্দীন যখন বাড়ির সামনে রাস্তায় পায়চারি করার সময়ে আকস্মিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং তেরোদিন পরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান, তখন অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করেন যে, অবস্থান-ধর্মঘটের সেই রাতে তাঁর অজ্ঞান হয়ে যাওয়াটা লোক-দেখানো ব্যাপার ছিল না।

ছাত্রেরা এর মধ্যে ভাইস-চান্সেলরের পদত্যাগ দাবি করে স্লোগান দিলো। ড. মল্লিক বললেন, 'ঠিক আছে, আমি রিজাইন করবো।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি হাতে লিখে চিঠি রেডি করো, আমি সই করে দিচ্ছি।' নিতান্ত বাধ্য ছেলের মতো আমিও পদত্যাগের খসড়া তৈরি করতে বসলাম। রেজিস্ট্রার মুহম্মদ খলিলুর রহমান দৌড়ে এসে আমার হাত থেকে কাগজ টেনে নিয়ে বললেন, 'আপনি কি পাগল হলেন!' শিক্ষকদের কেউ কেউ ভাইস-চান্সেলরকে বললেন, 'তাহলে তো আমাদেরও পদত্যাগ করতে হয়।' ভাইস-চান্সেলর জবাব দিলেন, 'সেটা আপনাদের ব্যাপার—কিন্তু এই অরাজক অবস্থায় আমি আর থাকবো না।'

খবরটা বোধহয় ছাত্রদের কাছে পৌঁছোতে দেরি হয়নি। তারা এক এক করে চলে যেতে শুরু করলো। ভোর হতে হতে দেখি, কেউ আর নেই। ভাইস-চান্সেলর বললেন রেজিস্ট্রারকে—প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর অভিভাবককে চিঠি লিখে বিষয়টা জানানো হোক এবং তিনি যা ভালো মনে করেন তেমনভাবে যেন পোষ্যকে বোঝান, তার অনুরোধ করা হোক।

কয়েক শ অভিভাবকের মধ্যে মাত্র তিনজন এসে কথা বলেছিলেন পোষ্যের সঙ্গে।

একজন অভিভাবক ভাইস-চান্সেলরের সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন, তাঁর ছেলে অবাধ্য—এই অবস্থায় তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ যে-ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন, তিনি তা মেনে নেবেন।

পুরো ঘটনার সময়ে এস পি-র অফিস থেকে ভাইস-চান্সেলরের কাছে খানিক পর পর ফোন আসছিল : ক্যাম্পাসের বাইরে পুলিশ প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তারা ভেতরে আসবে কিনা। ভাইস-চান্সেলর প্রতিবারই বলছিলেন, না। এক পর্যায়ে পুলিশ জানায়, তারা বিপদের আশঙ্কা করছে—পুলিশের পক্ষে ক্যাম্পাসে ঢুকে ভাইস-চান্সেলরকে নিরাপত্তা দেওয়া কর্তব্য। ভাইস-চান্সেলর তখনো বলেন, না।

১১.

নির্বাচনের দিনক্ষণ যতোই এগিয়ে আসতে লাগলো, ততোই এক ধরনের উত্তেজনা দেখা দিতে থাকলো। ১৯৫৪ সালে যেমন আগে থেকে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে অধিক জনমত উপলব্ধি করা যাচ্ছিল, এখনো ক্রমে ক্রমে ছয় দফার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের আনুকূল্য স্পষ্ট হতে লাগলো। মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ধর্ম ও সমাজতন্ত্রের মিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন স্লোগান তৈরি করলেন—তাতে কার কতোটুকু লাভক্ষতি হলো তা নিয়ে মতপার্থক্য ঘটলো।

এমনি অবস্থায় সরকারি আদেশ পেলাম—নির্বাচনের দিনে হেয়াকু নামে এক দুর্গম জায়গায় আমাকে যেতে হবে প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করতে। এ-আদেশ নাকি অমান্য করা যাবে না। নির্বাচন-পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে একটি সভায়ও যোগ দিতে হলো।

৭ ডিসেম্বর সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি আমাদের কয়েকজনকে ডি সি-র অফিসে পৌঁছে দিলো। সেখানে বলা হলো, আমরা যেন আগে নিজেদের ভোটটা দিয়ে দিই। প্রায় ৩৪ বছর বয়সে প্রথম ভোট দেওয়ার সুযোগ পেলাম। ১৯৫৪ সালে ভোটার হওয়ার বয়স আমার হয়নি; ১৯৬৫ সালে ছিলাম বিদেশে। আমার বয়সী ভারতীয়েরা এর মধ্যে কতোবার না জানি ভোট দিয়েছে!

আমি ছিলাম হাটহাজারী এলাকার ভোটার। সেখানে জাতীয় পরিষদের সদস্যপদে প্রার্থী ছিলেন দৈনিক *আজাদী*-সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ; তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কনভেনশন মুসলিম লীগ-মনোনীত ফজলুল কাদের চৌধুরী—যিনি ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের হারিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আমার এলাকায় প্রাদেশিক পরিষদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়-এলাকাসংলগ্ন মদনহাটের আবদুল ওয়াহাব এবং তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়-এলাকাসংলগ্ন জোবরার ইউনিয়ন পরিষদ-চেয়ারম্যান, কনভেনশন মুসলিম লীগের আলী আহমদ। ডি সি অফিসে নিজের ভোট দিতে সময় ব্যয় করতে হলো না। তারপর ব্যালট বাক্স ইত্যাদি নিয়ে হেয়াকু রওনা হলাম।

হেয়াকু যাওয়ার দুটি পথ ছিল : চট্টগ্রাম-ঢাকার বড়ো রাস্তা দিয়ে করেরহাট এসে

সেখান থেকে মোড় নিয়ে রামগড়ের পথ ধরে পৌঁছোনো; অথবা হাটহাজারী ছাড়িয়ে, কাটিরহাট পার হয়ে, নাজিরহাটে এসে তারপর মোড় নিয়ে হেয়াকু যাওয়া। এ-রাস্তা বেশি ভালো নয়, তবে সরকার থেকে আমাকে বরাদ্দ-করা গাড়ির চালকের মতে, এ-পথ অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী, সুতরাং সেটাই ধরা ভালো।

হেয়াকুর ভোটকেন্দ্রে ভোটের জিনিসপত্র রেখে ও পাহারা বসিয়ে আমি তৎক্ষণাৎ চলে গেলাম অদূরবর্তী রামগড় টি-এস্টেটে। আবদুল আলীর মেজো ভাই আবদুল আউয়াল সেখানে ম্যানেজার। সেখানে খুবই আরামে রাত কাটিয়ে পর্যাপ্ত নাশতা করে চা-বাগানের গাড়িতে পরদিন সকালে হেয়াকু ফিরে এলাম। সেখানকার নির্বাচনী এলাকায় জাতীয় পরিষদের সদস্য পদে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন আওয়ামী লীগের সৈয়দ ফজলুল হক বি এসসি এবং আমার যুবলীগ-আমলের বন্ধু, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মওলানা আহমদুর রহমান আজমী। প্রাদেশিক পরিষদের প্রার্থীদের নাম এখন আর মনে নেই।

ভোটগ্রহণ শুরুর সময়ে সকল প্রার্থীর এজেন্টই উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সকলকে দেখিয়ে ব্যালট-বাক্স সিল করা হলো। তারপর বেলা যতো বাড়তে থাকলো, আওয়ামী লীগ প্রার্থীর এজেন্ট ছাড়া বাকিরা ততোই নিরুৎসাহ হয়ে চলে যেতে লাগলেন। অনেক বলে-কয়ে একজনকে আমি ধরে রাখলাম—কারণ ফলাফলের কাগজে অন্তত দুজন প্রার্থীর এজেন্টের সই থাকা উচিত। আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পাওয়া ভোটের আধিক্য দেখে আমি নিজেও অবাক হয়ে গেলাম।

সরকারি গাড়িতে নির্বাচন-সামগ্রী নিয়ে ফিরতি যাত্রা—এবার সঙ্গে আছে ওই কেন্দ্রের নির্বাচনী ফলাফল। চালক এখন অন্যপথ ধরে আসবার সিদ্ধান্ত নিলো—কেননা সন্ধ্যার পরে অপর রাস্তাটি তেমন নিরাপদ নয়। আমি খুশিই হলাম, কিন্তু ভাগ্য অপ্রসন্ন। করেরহাটের কাছাকাছি এসে গাড়ি বিকল হয়ে গেলো। চলমান গাড়ি থামাবার চেষ্টা করেও থামাতে পারি না; যদিবা থামে, আমাকে নিতে চায় না; যদিবা আমাকে নিতে সম্মত হয়, তাহলে ব্যালট-বাক্স প্রভৃতি নিতে অসম্মত হয়। শেষ পর্যন্ত যাঁর সোনার তরিতে ঠাঁই পাওয়া গেল, তিনি কৃষককে তুলে নিলেন, তার ছোটো ক্ষেতের ফসল রেখে আসা হলো পুলিশের দায়িত্বে। ফলাফল তো আমার সঙ্গেই আছে। ডি সি অফিসে কাগজপত্র পৌঁছোলাম। তাঁরা আরেকটি গাড়ি দিয়ে আমাকে বাসায় পৌঁছে দিলেন। ডি সি অফিসেই শুনলাম, অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ জয়লাভ করেছেন। পরদিন জানলাম, সৈয়দ ফজলুল হক বি এসসিও জয়ী হয়েছেন।

জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করবে আশা করলেও ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি যে পাবে, তা ভাবা যায়নি। পরে মহিলা-আসনের সাতটি তার সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ পেলো ৩০০র মধ্যে ২৮৮টি, পরে মহিলা-আসনের দশটি। সাধারণ নির্বাচনে এতো বড়ো ম্যান্ডেট আর কেউ কখনো পেয়েছে কিনা সন্দেহ। অতএব, ছয় দফার ভিত্তিতে যে সংবিধান প্রণীত হবে, এ-সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ রইলো না।

১২.

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের পরে দেশে কী ঘটতে যাচ্ছে, তা নিয়ে নানারকম কল্পনা-জল্পনা ও তর্ক-বিতর্ক চলতে থাকলো, সেইসঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বিন্যাসের কিছু বদল দেখা দিলো। অনেকেই আশা করলেন, এবারে ছয় দফার ভিত্তিতে সংবিধান রচিত হবে। কেউ বললেন, তাতে সাধারণ মানুষের কোনো লাভ হবে না, পশ্চিম পাকিস্তানি ধনী ও শোষকদের জায়গাটা নেবে শুধু একদল পূর্ব পাকিস্তানি। কেউ বললেন, পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন চক্রের সঙ্গে আপোস করে শেখ মুজিব ক্ষমতায় আসবেন। আবার অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করলেন, ক্ষমতাসীনেরা আদৌ ছয় দফা মেনে নেবে কিনা। কেউ মনে করলেন, সেনাবাহিনী ক্ষমতা ছাড়বে না। কেউ বললেন, স্বাধীনতা ছাড়া পূর্ব বাংলার গত্যন্তর নেই।

নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের অল্প কয়েকদিন পরে পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণা করলেন যে, তাঁর দলের সহযোগিতা ছাড়া কোনো সংবিধান রচনা কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা যাবে না এবং তিনি বিরোধী দলে ঠাঁই নিতে প্রস্তুত নন। সমগ্র পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে—আরেকভাবে দেখলে পশ্চিম পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের জন্যে বরাদ্দ ১৩৮ আসনের মধ্যে—তাঁর দল পেয়েছিল ৮৮টি। তাতেই যখন তিনি এমন চোখ রাঙাতে পারলেন, তখন সন্দেহ হলো, তাঁর সঙ্গে সেনাবাহিনীর একটা সমঝোতা হয়ে গেছে। ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসমাবেশের সামনে আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যেরা ছয় দফা ও এগারো দফা রূপায়ণের শপথ নিলেন। পরে বঙ্গবন্ধু বললেন, ছয় দফা এখন জনগণের সম্পত্তি, তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা যাবে না।

এদিকে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলাকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে মওলানা ভাসানী আন্দোলন করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। কিন্তু অচিরেই তাঁর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে বড়োরকম ভাঙন ধরে। দলের সঙ্গে পরামর্শ না করে মওলানা সাহেব নানারকম নীতি, আদর্শ ও কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং সরকারের সঙ্গেও গোপনে যোগাযোগ রাখেন এমন অভিযোগ এনে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বেশ কিছু নেতা ও কর্মী নিয়ে দল থেকে বের হয়ে যান। পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেক ন্যাপ-নেতা পদত্যাগ করেন। মওলানা ভাসানী একদিকে বামপন্থীদের সম্পর্কে তাঁর প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করেন, অন্যদিকে ন্যাপের নিখিল পাকিস্তান-ভিত্তি ভেঙে দিয়ে নিজেকে কেবল প্রাদেশিক ন্যাপের প্রধান বলে ঘোষণা করেন। তিনি চেষ্টা করেন অন্যদের নিয়ে স্বাধীন পূর্ব বাংলার আন্দোলন গড়ে তুলতে।

তবে পূর্ব বাংলার সচেতন মানুষের দৃষ্টি আর ন্যাপের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কিংবা নতুন প্রয়াসের দিকে ছিল না। তারা তাকিয়ে ছিল জাতীয় পরিষদের অগ্রগতি কিংবা ছয় দফা কর্মসূচির পরিণতির দিকে। ১৯৭১ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এলেন এবং শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী আখ্যা দিয়ে চলে গেলেন। তারপর তিনি লারকানায় গিয়ে ভুট্টোর সঙ্গে গোপন আলোচনায় বসলেন। জানুয়ারির শেষে ভুট্টো ঢাকায় এলেন শেখ মুজিবের সঙ্গে বৈঠক করতে এবং বৈঠকের

শেষে স্পষ্টই জানালেন, তিনি ছয় দফা মেনে নেননি।

ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যেতে না যেতে কয়েকজন যুবক একটি ভারতীয় বিমান ছিনতাই করে এবং কয়েকদিন পরে তা জ্বালিয়ে দেয়। ভারত তার আকাশসীমা দিয়ে পাকিস্তানি বিমানের চলাচল নিষিদ্ধ করে। ফলে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিমান চলাচল করতে হয় কলম্বো হয়ে। ছিনতাইয়ের ঘটনার নিন্দা করেন বঙ্গবন্ধু এবং আরো কয়েকটি দলের নেতারা, ভুট্টো প্রকারান্তরে ছিনতাইকারীদের পক্ষ নেন।

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিতে এসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করলেন ঢাকায়, মার্চের ১ তারিখে। ভুট্টো ঘোষণা করলেন, তিনি পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবেন না, পশ্চিম পাকিস্তানের আর কোনো সদস্য যোগ দিতে এগোলে তার পা ভেঙে দেবেন। তিনি বললেন, দেশে ক্ষমতার দুর্গ তিনটি : আওয়ামী লীগ, পি পি পি ও সেনাবাহিনী : দেশে কিছু করতে হলে এ তিনের সম্মতিক্রমে তা করতে হবে। পি পি পি থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ-সদস্যদের একযোগে পদত্যাগের হুমকিও তিনি দিলেন। যদিও পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক রাজনৈতিক নেতা বললেন যে, সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের হয়ে কথা বলার অধিকার ভুট্টোর নেই, কিন্তু প্রেসিডেন্ট যখন একথাও বললেন যে, সংবিধান-রচনায় পাকিস্তানের উভয় অংশের নেতাদের মতৈক্য দরকার, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে ভুট্টোর মতামতের ওপরেই জোর দিলেন। শুধু তাই নয়, আইনগত কাঠামো আদেশ সংশোধন করে যখন নির্বাচিত পরিষদ-সদস্যদের পদত্যাগের সুযোগ করে দেওয়া হলো, তখন আসলে ভুট্টোর হুমকি কার্যে পরিণত করার পথই তৈরি হলো। তারপর প্রেসিডেন্ট বেসরকারি মন্ত্রিসভা ভেঙে দিলেন—নীতিনির্ধারণের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আর কোনো বাঙালির অংশগ্রহণের সম্ভাবনা থাকলো না।

এদিকে একুশে ফেব্রুয়ারিকে ঘিরে যেসব কথাবার্তা ও লেখালিখি হলো, তাতেও বোঝা গেল স্বাধীনতার দাবিই ক্রমশ উচ্চকিত হচ্ছে পূর্ব বাংলায়। দৃঢ়তার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু বললেন, ছয় দফা অপরির্তনীয়। দেশে 'ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকট' দেখা দিয়েছে জানিয়ে ১ মার্চে ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতুবি করার ঘোষণা দিলেন। রোগটা হয়তো ঠিকই নির্ণয় করেছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর ব্যবস্থাপত্রে রোগীর মৃত্যুই অনিবার্য হয়ে উঠলো। প্রেসিডেন্টের ঘোষণা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই লোকজন ঢাকার পথে নেমে এলো এবং বঙ্গবন্ধুর কাছে দাবি করলো কঠোর কর্মসূচি। তিনি ২ মার্চে ঢাকায় এবং ৩ মার্চে সমগ্র প্রদেশে ধর্মঘট আহ্বান করলেন, কিন্তু কার্যত ১ মার্চ থেকেই ধর্মঘট শুরু হয়ে গেল।

১৩.

১ মার্চে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে আমরা শেষ পর্ব এম এ পরীক্ষার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা নিচ্ছিলাম। পরীক্ষা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান,

বহিরাগত সদস্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অভ্যন্তরীণ সদস্য ড. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল আর আমি। পরীক্ষার্থীরা আসছে-যাচ্ছে, এরই মধ্যে বাইরে স্লোগান এবং অনুমতির অপেক্ষা না করেই নেতা-গোছের কয়েকজন উত্তেজিত ছাত্রের প্রবেশ। তারাই জানালো, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন প্রেসিডেন্ট স্থগিত করে দিয়েছেন, এর প্রতিবাদে সবকিছু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে; সহকর্মীদের নিয়ে সভা করছেন বঙ্গবন্ধু, খানিক বাদেই আন্দোলনের কর্মসূচি পাওয়া যাবে। নিজেদের মধ্যে সামান্য পরামর্শের পর আমরাও বাকি পরীক্ষা স্থগিত করে দিলাম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন ও কর্মচারী সমিতি প্রেসিডেন্টের ঘোষণার নিন্দা করে পৃথক পৃথক বিবৃতি দিলো। সন্ধ্যায় দক্ষিণ ক্যাম্পাসে খোলা জায়গায় ছাত্র-শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীর এক সভা অনুষ্ঠিত হলো। ততক্ষণে মার্চের প্রথম সপ্তাহে আন্দোলনের যে-কর্মসূচি দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু, তা আমরা পেয়ে গেছি। বক্তৃতা যা হলো, তাতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করায় প্রেসিডেন্টের নিন্দা, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা এবং আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা জ্ঞাপন করা হলো। সৈয়দ আলী আহসান, মযহারুল ইসলাম, গণিত বিভাগের মোহাম্মদ ফজলী হোসেন (পরে উপাচার্য) ও আমি ছিলাম বক্তাদের মধ্যে।

বক্তৃতা দিয়েই মযহারুল ইসলাম ক্যাম্পাস ত্যাগ করলেন—যদি কোনোমতে রাজশাহী ফিরে যেতে পারেন, সেই চেষ্টায়। আমাদের সহকর্মীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ছিলেন চট্টগ্রামের বাইরে। তাঁদের জন্যে তাঁদের পরিবার-পরিজন রইলেন বেশ উৎকণ্ঠার মধ্যে। কেউ কেউ বহু কষ্ট করে, অনেক পথ পায়ে হেঁটে, যথেষ্ট সময় ব্যয় করে, তবে ফিরে এসেছিলেন।

২ মার্চে যদিও ধর্মঘট হওয়ার কথা ছিল কেবল ঢাকায়, তবে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের আহ্বানে সেদিনই চট্টগ্রামেও খুব সফল ধর্মঘট হলো। ৩ তারিখে, প্রদেশব্যাপী ধর্মঘটের দিনে, পাকিস্তানি পতাকা পোড়ানো হলো, কিন্তু সেদিন এবং তার পরদিন চট্টগ্রামে বাঙালি-বিহারি সংঘর্ষ ঘটলো। মনে করা হয়, কয়েকজন অবাঙালি সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা এই ঘটনায় উসকানি দিয়েছিলেন। প্রথম আক্রমণ করে বিহারিরা, তবে তথাকথিত বিহারি-এলাকাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেসামরিক প্রশাসনের আহ্বানের অপেক্ষা না করেই সামরিক বাহিনীর একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে বেপরোয়া গুলি চালায় এবং বাঙালিরাই হয় তার প্রধান শিকার। রাজনৈতিক নেতাদের এবং স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনের চেষ্টায় পরিস্থিতি যখন নিয়ন্ত্রণে আসে, ততক্ষণে বহুজন হতাহত হয়। আহতদের রাখার মতো জায়গা, পর্যাপ্ত রক্ত, প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র—সবকিছুরই অভাব ঘটেছিল।

এই সংবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পৌঁছোলে আমরা ব্লাড ব্যাংকে রক্তদানের সিদ্ধান্ত নিই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী মেডিকেল অফিসার ডা. কে এম আখতারুজ্জামানের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহণে ও আমাদের ব্যক্তিগত গাড়িতে বহুসংখ্যক ছাত্র-শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে রক্ত দিয়ে আসি। একটি ছাত্র আমার সামনেই ডা.

আখতারুজ্জামানকে অনুরোধ করেছিল যে, তার রক্ত যেন কেবল আহত বাঙালিকেই দেওয়া হয়। এ কথার জন্যে তাকে আমি তিরস্কার করি। সে কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে রাখে, তারপর তার অনুরোধ প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু এ থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের ক্ষোভ ও ক্রোধ সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল এবং যুক্তি ও শুভবুদ্ধি সব সময়ে কাজ করছিল না।

১ তারিখ থেকে দেশের সর্বত্র মিছিল-সমাবেশ চলছে, কোথাও বন্দুকের দোকান লুঠ হচ্ছে। ট্রেন-বিমান ঠিকমতো চলছে না। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সান্ধ্য আইন জারি হচ্ছে, সে-আইনও সাহস করে ভাঙছে অনেকে। সামরিক বাহিনী গুলি চালাচ্ছে—মানুষ প্রাণ দিচ্ছে। ছাত্রেরা প্রায় সর্বত্রই দাবি করছে, একতরফাভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হোক। শিবনারায়ণ দাস নামে এক ছাত্র এই কাঙ্ক্ষিত স্বাধীন দেশের পতাকার নকশা করে এবং ২ তারিখে তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তোলন করে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি আ স ম আবদুর রব। ৩ তারিখে বঙ্গবন্ধু সামরিক আইনের প্রত্যাহার দাবি করেন। ৪ তারিখ থেকে ঢাকা বেতারকেন্দ্র আর রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা, না বলে ঢাকা বেতারকেন্দ্র বলে পরিচয় দিতে থাকে (সেখান থেকে ইংরেজি খবর পড়তেন নাজমা আতহার—পরে তার মূল্য দিতে হয়েছিল তাঁকে)। প্রেসিডেন্ট গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন এবং শেখ মুজিব ছাড়াও তা প্রত্যাখ্যান করেন অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারা—তাঁদের মধ্যে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর দুই প্রাক্তন প্রধান আসগার খান ও নূর খানও ছিলেন। এই অবস্থায় প্রেসিডেন্ট আবার জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন ২৫ মার্চ তারিখ ধার্য করে।

এদিকে সব প্রদেশেরই গভর্নর বদলে যায়। পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োগ পান জেনারেল টিক্কা খান, কিন্তু ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বি এ সিদ্দিকী তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করাতে অসম্মতিজ্ঞাপন করেন। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে প্রদেশে অসহযোগ চলছে—তাতে বেসামরিক আমলারা যোগ দিয়েছেন। সারা দেশ অপেক্ষা করে থাকে ৭ মার্চের জন্যে—সেদিন তিনি ভাষণ দেবেন, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঘোষণা করবেন।

৭ মার্চ সকালেই পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড দেখা করলেন শেখ মুজিবের সঙ্গে। কী কথা হলো, তাঁরাই জানেন। বাইরে গুজব রটলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক ঘাঁটির জন্যে দুটি দ্বীপ চেয়েছে—বঙ্গবন্ধু তা মানেননি। কেউ বললো, মার্কিনদের সঙ্গে তাঁর আঁতাত এবার প্রকাশ্য হয়ে গেল। পরে জানা যায়, মার্কিন রাষ্ট্রদূত তাঁকে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন : পূর্ব বাংলা একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তাঁর দেশ তা সমর্থন করবে না।

সেদিন বিকেলে রেসকোর্সে ভাষণ বঙ্গবন্ধুর। বেতারে তা প্রচারিত হওয়ার কথা। চট্টগ্রামে আমরা বসে আছি রেডিও সেটের সামনে—কিন্তু ভাষণ তো প্রচারিত হলো না! আমাদের উদ্‌বেগ বাড়লো। রাতে ঢাকায় ফোন করলাম অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীকে। হ্যাঁ, তিনি গিয়েছিলেন সভায়, সেই বিশাল জনসমুদ্রের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ হয়ে। শেখ সাহেবের বক্তৃতা শুনেছেন, মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখেছেন। তাতে তিনি সম্মোহিত। মনে হলো, সে-সম্মোহন তখনো কাটে নি।

সরকার বাধা দেওয়ায় ভাষণ প্রচারিত হতে পারে নি। ফলে, বেতারের সকলে ধর্মঘট করেন। সরকার নতিস্বীকার করে ভাষণের টেপ প্রচারের অনুমতি দেন। ৭ মার্চের সেই অসাধারণ বক্তৃতা আমরা শুনতে পাই ৮ তারিখে। বঙ্গবন্ধু যখন বললেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম', তখন মনে হলো, পৃথিবীর বুকে একটি নতুন জাতির জন্ম হলো।

১৪.

৮ মার্চ সকালে বেতারে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ শোনার পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। মুখে মুখে রটে গেল, বেলা ১১টায় সভা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমন্ত্রণ জানানোর প্রয়োজন হলো না, নির্দিষ্ট সময়ে সকলে এসে উপস্থিত বাণিজ্য বিভাগের একটি শ্রেণীকক্ষে। সকলে মানে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী। এত বেশি সংখ্যায় উপস্থিতি যে, বসার জায়গা নেই, তবু দাঁড়িয়ে থাকলেন অনেকে। ভাইস-চান্সেলর ড. এ আর মল্লিক সভাপতিত্ব করলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে বক্তৃতা দিলেন সৈয়দ আলী আহসান, আবদুল করিম, রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, মোহাম্মদ ফজলী হোসেন, আরো কেউ কেউ। আমিও কিছু বলেছিলাম। সভায় গঠিত হয় 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ', তার যুগ্ম আহ্বায়ক হন গণিত বিভাগের ফজলী হোসেন আর বাংলার মাহবুব তালুকদার। এর সদস্য ছিলাম বাংলা বিভাগের সৈয়দ আলী আহসান ও আমি, ইতিহাস বিভাগের আবদুল করিম ও রফিউদ্দিন আহমদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের এখলাসউদ্দিন আহমদ, সমাজবিজ্ঞানের এম বদরুদ্দোজা, চারুকলার রশিদ চৌধুরী, অর্থনীতির হুজ্জাতুল ইসলাম লতিফী, রেজিস্ট্রার মুহম্মদ খলিলুর রহমান, ডেপুটি রেজিস্ট্রার আবু হেনা মোহাম্মদ মহসীন ও সহকারী ইনজিনিয়ার সুধীররঞ্জন সেন। ভাইস-চান্সেলরকে আমরা ইচ্ছে করেই কমিটির বাইরে রেখেছিলাম, ছাত্রদেরও অন্তর্ভুক্ত করি নি। ছাত্র-সংগঠনগুলো মিলিতভাবে কাজ করছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিল শহরভিত্তিক চট্টগ্রাম সংগ্রাম পরিষদ এবং স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে।

সেদিন বিকেলেই অধ্যাপক আবুল ফজলের বাসভবন 'সাহিত্য নিকেতনে' এক সভা হলো সংস্কৃতিসেবীদের। সেও আরেক স্বতঃস্ফূর্ত সভা। অনেকে এসেছিলেন, আমাদের ভাইস-চান্সেলর পর্যন্ত। সেখানে গঠিত হলো 'শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতসেবী প্রতিরোধ-সংঘ'। এর গঠন ছিল এরকম—পৃষ্ঠপোষক : আবুল ফজল সভাপতি : সৈয়দ আলী আহসান, সহ-সভাপতি : আমি ও ডা. কামাল এ খান, সম্পাদক : মমতাজউদ্দীন আহমদ, সহ-সম্পাদক : সৈয়দ মোহাম্মদ শফি, কোষাধ্যক্ষ : তাহের সোবহান, সমন্বয়কারী : মাহমুদ শাহ্ কোরেশী। সংঘের প্রথম কর্মসূচি হিসেবে সভার পরপরই একটি মিছিল করার প্রস্তাব ওঠে। তাৎক্ষণিকভাবে

মিছিল করার ব্যাপারে সৈয়দ আলী আহসান মৃদু আপত্তি করেছিলেন : হঠকারী কিছু না করতে এবং আরো সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে বলেছিলেন। তা নিয়ে হঠাৎই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তর্কাতর্কির মধ্যে আবুল ফজল ও এ আর মল্লিক দোতলা থেকে নেমে রাস্তায় এসে দাঁড়ান এবং তখনই অন্যেরা এসে দাঁড়ান তাঁদের পেছনে। সৈয়দ আলী আহসানকে নিয়ে আমি, কোরেশী ও রশিদ চৌধুরী মিছিলের সামনের দিকে জায়গা করে নিই। মিছিল করে আমরা যাই 'সাহিত্য নিকেতন' থেকে নিউ মার্কেট পর্যন্ত।

প্রতিরোধ-সংঘের আহ্বানে বেশ ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। হরিপ্রসন্ন পাল ও তেজেন সেনের নেতৃত্বে সংগীতশিল্পীদের একটি দল গড়ে ওঠে। তাঁরা সভা-সমাবেশে সংগীত পরিবেশন ছাড়াও ট্রাকে চড়ে উদ্দীপনামূলক গান গেয়ে শহর পরিভ্রমণ করেন। মমতাজউদ্দীন আহমদ ও মাহবুব হাসানের নেতৃত্বে নাট্যশিল্পীদের আরেকটি দল গড়ে ওঠে। তাঁরা একাধিক নাটক মঞ্চস্থ করেন এবং পরে ট্রাকে করে শহরের বিভিন্ন এলাকায় নাটক অভিনয় করেন। চিত্রশিল্পীরা প্রকাশ করেন 'বাঙলায় বিদ্রোহ' নামে একটি অ্যালবাম। তাতে রশিদ চৌধুরী, দেবদাস চক্রবর্তী, মিজানুর রহিম, সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ, আনসার আলী ও সবিহ্ উল আলমের একটি করে ছাপচিত্র থাকে : তার পরিচয়-লিপি রচনা করেন মাহমুদ শাহ্ কোরেশী। অনেক ছোটো-বড়ো রচনা-সংকলন প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে শাহ আলম নিপুর সম্পাদনায় প্রকাশিত সংকলনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমাদের ছাত্র শওকত হাফিজ খান রুশনী কয়েকজন বন্ধুর সহায়তায় *বাংলাদেশ* নামে একটি স্বল্পায়ু পত্রিকা প্রকাশ করে।

সকলেই কিছু না কিছু করতে চাইছিল দেশের জন্যে। একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল প্রত্যহ—রাজনৈতিক দলের, ছাত্র-সংগঠনের, শ্রমিক-ইউনিয়নের, আইনজীবী ও অন্য পেশাজীবীদের, স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়-পর্যায়ের ছাত্রদের, নারীদের। সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে বোধহয় চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের শিক্ষকেরা প্রথম স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সভা করেন। এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য সরকারি কলেজের শিক্ষকেরা এবং সরকারি কর্মচারীরা এগিয়ে আসেন। রেলওয়ে অফিসারদের মতো সরকারি কর্মকর্তারা অনেকটা প্রকাশ্যেই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১০ মার্চে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ ইবরাহিম ও সাধারণ সম্পাদক আবদুর রব একটি বিবৃতি দিয়ে সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের প্রতি কোনো অবস্থায়ই অস্ত্র-সমর্পণ না করার আহ্বান জানান। তখনকার পরিস্থিতিতে এ ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ আহ্বান। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মধ্যেও স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি শুরু হয়।

মহিলা আওয়ামী লীগ, মহিলা পরিষদ ও মহিলা সংগ্রাম পরিষদের উদ্‌যোগে ভিন্ন ভিন্ন সভা অনুষ্ঠিত হয় কয়েকদিন পরে পরে। প্রথমোক্ত সংগঠনদুটি যৌথভাবে সমাবেশ করে ১৮ মার্চে। এতে ঢাকা থেকে প্রধান অতিথি হয়ে যান সুফিয়া কামাল, বিশেষ অতিথি মালেকা বেগম; সভাপতিত্ব করেন উমরতুল ফজল, বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডা. নূরুননাহার জহুর, কুন্দপ্রভা সেন, মুশতরী শফি, হান্নানা বেগম।

বিভিন্ন এলাকায় গড়ে ওঠে প্রতিরোধ কমিটি, কোথাও কোথাও প্রশিক্ষণ-শিবির। স্টেশন রোডের ডাকবাংলোয় স্থাপিত হয় চট্টগ্রাম সংগ্রাম পরিষদ ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদর দপ্তর। এই সদর দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে আমরাও কাজ করেছি। শহরের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হয় সংযোগ-কেন্দ্র। আওয়ামী লীগের ও ছাত্রলীগের নেতারা এসবের তত্ত্বাবধান করতেন, তবে এঁদের বাইরেও অনেকে এসব দপ্তর ও কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন।

'সাহিত্য নিকেতনে' আবার আমরা সভা করি ১২ মার্চে। এবারে আলোচ্য ছিল চট্টগ্রাম বেতার-কেন্দ্রের অনুষ্ঠানের ধারা। তখন রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র কেবল ঢাকা রেডিও বা ঢাকা বেতার বলে পরিচয় দিচ্ছিল, টেলিভিশনে প্রচারিত হচ্ছিল 'আমার সোনার বাংলা' গান এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে উদ্দীপক সব অনুষ্ঠান। কিন্তু এই পরিবর্তনের কোনো ছাপ চট্টগ্রাম বেতার-কেন্দ্রে পড়ে নি। সেদিন আমরা চট্টগ্রাম বেতারের অনুষ্ঠানমালার সমালোচনা করি এবং চলমান আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের দাবি জানাই। সে-দাবি মানা না হলে চট্টগ্রাম বেতারের নিয়মিত অংশগ্রহণকারীরা অনুষ্ঠান বর্জন করবো এবং বেতারভবনের সামনে বিক্ষোভের আয়োজন করবো বলে জানিয়ে দিই। এতে কাজ হয়। চট্টগ্রাম বেতারের আঞ্চলিক পরিচালক নাজমুল আলম সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে শুরু করেন। অনুষ্ঠানের পাণ্ডুলিপি খুঁটিয়ে দেখা—বেতারের পরিভাষায় যাকে বলে ভেটিং—তা একরকম উঠে যায়। এ-সময়ে আমি দুটি অনুষ্ঠান পরিচালনা করি। একটি বাংলা সাহিত্যে প্রতিবাদী চেতনার ধারা সম্পর্কে, অন্যটি পূর্ববাংলার সাম্প্রতিক কবিতা-বিষয়ে। পরেরটিতে সিকান্‌দার আবু জাফরের 'বাংলা ছাড়ো' এবং অন্য কবিদের অনুরূপ ভাবের রচনা আবৃত্তি করা হয়েছিল।

শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিসেবী প্রতিরোধ সংঘের উদ্‌যোগে সমাবেশ হলো ১৫ মার্চে, লালদিঘির ময়দানে। ময়দান উপচে পড়েছিল লোকে। আবুল ফজলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বক্তৃতা করি ড. এ আর মল্লিক, সৈয়দ আলী আহসান, নাজমুল আলম, মমতাজউদ্দীন আহমদ, মাহমুদ শাহ্ কোরেশী ও আমি। ছাত্রদের মধ্যে বোধহয় দুজন বক্তৃতা করেছিল : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রব ও চট্টগ্রাম জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মাহবুবুল হক। আলী আহসান সাহেব বক্তৃতা করতে উঠলে কিছু গোলযোগ হয়—আইয়ুব খানের আত্মজীবনীর বঙ্গানুবাদ তিনি সম্পাদনা করেছিলেন বলে অনেকের মনে ক্ষোভ ছিল, স্বাধীনতা-আন্দোলনে তাঁর সংস্রবের আন্তরিকতা সম্পর্কেও অনেকে সন্দিহান ছিল। জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে গোলযোগ থামাতে সমর্থ হন মমতাজউদ্দীন আহমদ। আমি বক্তৃতা দিতে উঠবো, এমন সময়ে মণি সিংহের নেতৃত্বাধীন গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত বখতিয়ার নূর সিদ্দিকী আমাকে ডেকে বলেন, একটু আগেই তাঁরা জানতে পেরেছেন যে, কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে আমি খুব স্বস্তি ও আনন্দ বোধ করি। বক্তৃতার পালা শেষ হওয়ার পর সেই সন্ধ্যায় লালদিঘি ময়দানে হয় সংগীতানুষ্ঠান, তারপরে মমতাজউদ্দীন-রচিত ও পরিচালিত নাটক *এবারের সংগ্রাম*।

লোকচক্ষুর অন্তরালে আরো কিছু ঘটনা ঘটছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে—সেসব ঘটনার কথা আমার তাৎক্ষণিক জানাও ছিল না। পাকিস্তান কাউনসিল ফর সাইন্টিফিক অ্যান্ড ইনডাসট্রিয়াল রিসার্চের চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ড. হুমায়ূন আবদুল হাই ছিলেন আমাদের গণিত বিভাগের অধ্যক্ষ ড. রশিদুল হকের বন্ধু। সেই সূত্রে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ ড. মোহাম্মদ শামসুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাদের গবেষণাগারে মলোটভ ককটেল তৈরির উদ্‌যোগ নেন। ভাইস-চান্সেলরের সম্মতিক্রমে ও ড. শামসুল হকের ব্যবস্থাপনায় পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ড. এখলাসউদ্দিন আহমদ ও রসায়ন বিভাগের ড. মেজবাহউদ্দীন আহমদ যৌথভাবে এ-কাজের দায়িত্ব নেন। এজন্যে কাচের বোতল আনানো হয় কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয় থেকে। বোতলের কাচ প্রয়োজনাতিরিক্ত পুরু হওয়ায় বিস্ফোরণে বিঘ্ন ঘটে, ফলে ওই উদ্‌যোগ পরিত্যক্ত হয়। ড. হাই ছাত্রদের অস্ত্রপরিচালনার প্রশিক্ষণ দিতেও চেয়েছিলেন। ইউ ও টি সি-র ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ও অর্থনীতি বিভাগের অধ্যক্ষ ড. এস এ আতহারকে ড. মল্লিক বলে দেন প্রশিক্ষণের জন্যে ছাত্র বাছাই করতে এবং ইউ ও টি সি-র ডামি রাইফেলগুলো সক্রিয় করতে। ছাত্র বাছাই করা হয় বটে, কিন্তু ডামি রাইফেলগুলো সক্রিয় করা যায় নি। অল্প কয়েকটি সচল রাইফেল ও প্রকৃত হ্যান্ড গ্রেনেড জোগাড় করে নিতান্ত অল্পকালের জন্যে কিছু ছাত্রকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল ক্যাম্পাস-সন্নিহিত পাহাড়গুলোর মধ্যভূমিতে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শামসুল আলমের কাছে ঘন ঘন আসতেন চক্ষু-বিশেষজ্ঞ ডা. আবু জাফর। তিনি আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে দলের হয়ে যোগাযোগ রেখেছিলেন ই পি আরের ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামের সঙ্গে। ক্যাপ্টেন রফিকের পরামর্শে শামসুল আলমের বাসায় ডা. জাফর একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করেন সম্ভাব্য সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা সম্পর্কে। ক্যাপ্টেন রফিক প্রথমে তাঁর বাড়িতে সেনাবাহিনীর কিছু তরুণ কর্মকর্তাকে আহ্বান করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পরামর্শ করতে তাঁদের সম্মতি লাভ করেন। এক গাড়িতে ডা. জাফর, আওয়ামী লীগ-নেতা আতাউর রহমান কায়সার ও ক্যাপ্টেন রফিক এবং অন্য এক গাড়িতে ক্যাপ্টেন অলি আহমদ, ক্যাপ্টেন হারুন আহমদ চৌধুরী, ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান ও লেফটেন্যান্ট শমসের মবিন চৌধুরী যান বৈঠকে। সেখানে আধ ঘণ্টা ধরে রণকৌশল বিষয়ে আলোচনা হয়। সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হলে বিশ্ববিদ্যালয়-এলাকা হবে সামরিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, এটাই ছিল তাঁদের মুখ্য বিবেচনা।

১৫.

সময়টা ছিল অস্থির, দেশের প্রাণকেন্দ্র ঢাকায় বয়ে যাচ্ছিল ঝোড়ো হাওয়া। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে সবাই জেনেছিল স্বাধীনতার ঘোষণা হিসেবে। দিন দশেক পরে মওলানা ভাসানী এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, 'মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে, এ ব্যাপারে মতানৈক্য নেই।' বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে অসহযোগ আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি

ঘোষণা করেন তাজউদ্দীন আহমদ। এই অসহযোগের সময়ে সেনানিবাস ও গভর্নর-ভবনের বাইরে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না—সবই চলছিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি বি এ সিদ্দিকী যে গভর্নর টিক্কা খানকে শপথ-বাক্য পড়াতে অস্বীকার করেন, তাও পৃথিবীব্যাপী সংবাদে পরিণত হয়েছিল। দেশময় বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল সর্বস্তরের মানুষ—সরকারি কর্মচারীরা শরিক হন তাদের সঙ্গে। শিল্পী-সাহিত্যিকেরা আয়োজন করেন বিক্ষোভ-সমাবেশ-মিছিলের, বর্জন করেন সরকারি খেতাব। কর্নেল এম এ জি ওসমানী ও মেজর জেনারেল এম এ মজিদের নেতৃত্বে প্রাক্তন সৈনিকেরা শপথ নেন দেশের জন্যে লড়াই করার। সকলেই আহ্বান জানাচ্ছে স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার।

১৪ মার্চ ভুট্টো দাবি করলেন দেশের দুই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। এই প্রস্তাব পাকিস্তানের ঐক্যের ধারণাকে বিপর্যস্ত করে দেয়। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন এবং ১৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেন। পরদিন আলোচনা হয় একপক্ষে বিচারপতি কর্নেলিয়াস, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল পীরজাদা ও কর্নেল হাসান এবং অন্যপক্ষে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ ও ড. কামাল হোসেনের মধ্যে। মেজর সিদ্দিক সালিকের *উইটনেস টু সারেন্ডার* বইতে লেখা হয়েছে যে, সেই রাতে টিক্কা খানকে ইয়াহিয়া বলেন, হারামজাদা গোলমাল করছে, তোমরা প্রস্তুত হও। রাতে টিক্কা ফোন করে জি ও সি মেজর-জেনারেল খাদিম হোসেন রাজাকে বলেন, তোমরা এগোতে পারো। পরদিন জি ও সি-র অফিসে মেজর-জেনারেল রাজা ও মেজর-জেনারেল রাও ফরমান আলি মিলে তৈরি করেন 'অপারেশন সার্চলাইট'—বাঙালি নিধনযজ্ঞের পরিকল্পনা। কিছু কিছু পরিবর্তন করে টিক্কা খান ও পাকিস্তানের সেনাবাহিনী-প্রধান আবদুল হামিদ খান ২০ মার্চ বিকেলে এবং ইয়াহিয়া খান পরে—বোধহয় ২৩ মার্চে—তা অনুমোদন করেন। ২৫ মার্চ তা-ই বাস্তবায়িত হয়।

এর মধ্যে চলতে থাকে লোক-দেখানো আলোচনা আর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিমানযোগে আসতে থাকে সৈন্য। একদিকে তৈরি হচ্ছে আক্রমণের ছক, অন্যদিকে আলোচনা হচ্ছে উপদেষ্টাদের নিয়ে। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট বলছেন, আলোচনার অগ্রগতি ঘটছে। তার মধ্যে এসে পৌঁছোন ভুট্টো—তিনি পৃথক বৈঠক করেন ইয়াহিয়ার সঙ্গে।

কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠতে থাকে। ১৮ মার্চে ই পি আরের দুজন নায়েব-সুবাদার বিক্ষোভরত বাঙালিদের ওপর গুলি চালাবার আদেশ মানতে অস্বীকার করেন (২৫ মার্চের পরে তাঁদের হত্যা করা হয়)। ১৯ মার্চ জয়দেবপুরে সেনাবাহিনীর পাকিস্তানি সদস্যদের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ ঘটে এবং সেখানকার বাঙালি সৈনিকেরা অস্ত্র-সমর্পণ করার আদেশ অগ্রাহ্য করেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আবার স্থগিত করা হয়। ২৩ মার্চ পাকিস্তান-দিবস উদ্‌যাপিত হয় প্রতিরোধ-দিবসরূপে। এদিন উড্ডীন হয় বাংলাদেশের নতুন পতাকা, গাড়িতে সেই পতাকা লাগিয়ে বঙ্গবন্ধু যান ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা করতে।

১৬.

২৪ মার্চ চট্টগ্রামে লালদিঘি ময়দানে আহূত হয় বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ-সভা। স্ত্রী এবং দুই শিশুকন্যা নিয়ে আমি ক্যাম্পাস থেকে গাড়ি চালিয়ে আসি রেলওয়ে হাসপাতালে—আবদুল আলীর ২২ তারিখে জাত পুত্র তীব্রকে দেখতে। অন্যদের হাসপাতালে রেখে আমি যাই ময়দানে। সেখানে সভাপতিত্ব করেন ড. মল্লিক, বক্তৃতা দেন আবদুল করিম, রফিকুল ইসলাম চৌধুরী ও মমতাজউদ্‌দীন আহমদ। সভা চলার সময়েই খবর এলো, *সোয়াত* জাহাজ থেকে পাকিস্তানিরা অস্ত্র খালাসের চেষ্টা চালাচ্ছে এবং তাদের বাধা দিতে হাজার হাজার মানুষ বন্দর-এলাকা ঘিরে রেখেছে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যারিকেড বসানো হচ্ছে। সভা স্থগিত করে যে যার জায়গায় ফিরে আসতে চেষ্টা করে। আমি রেলওয়ে হাসপাতালে এসে স্ত্রী-কন্যাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে কোনোমতে ক্যাম্পাসে গিয়ে পৌঁছোই। কিন্তু আমাদের সহকর্মীরা তখনো ফিরে আসতে পারেন নি। যেমন, সৈয়দ আলী আহসান সভাস্থল থেকে তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা নাসরিন ও জামাতা মাহমুদ শাহ্ কোরেশীকে তাঁদের শহরের বাসভবন থেকে উঠিয়ে নিয়ে যখন ক্যাম্পাসে ফেরার চেষ্টা করেন তখন সেনানিবাসের কাছে গাছ কেটে ও ট্রাকের সারি দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সেনানিবাসের উলটোদিকের গ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি আসতে বাধ্য হন এবং গাড়ি চালাবার অনুপযোগী পথ ধরে আসতে বহু রাত করে ফেলেন। মোহাম্মদ শামসুল হক ও রশিদুল হকও ওই পথ ধরে ফিরে আসেন গভীর রাতে। মোহাম্মদ আলী রয়ে যান শহরে, পরদিন তাঁর অর্ডারলি-পিয়ন সিরাজকে দিয়ে আমার গাড়ি পাঠিয়ে তাঁকে ক্যাম্পাসে ফিরিয়ে আনা হয়।

২৪ তারিখে দেশের নানা জায়গায় সেনাবাহিনী গুলিচালনা করে। সৈয়দপুরে মারা যায় ১৫ জন। জি ও সি চট্টগ্রামে এসে সেনানিবাসের সি ও ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে সঙ্গে করে ঢাকায় নিয়ে যান আর রেখে যান অপারেশন সার্চলাইটের কপি। ২৫ তারিখে *সোয়াত* থেকে অস্ত্র নামাতে বাধা দিতে গিয়ে প্রাণ হারায় ২০ জন। এর প্রতিক্রিয়ায় চট্টগ্রামে বহু বেসামরিক অবাঙালির বাড়িঘর আক্রান্ত হয়। এই বিপন্ন অবস্থায় ইংরেজি বিভাগের লিলি ইসলাম নাসিরাবাদ থেকে আমাকে ফোন করে সাহায্যপ্রার্থনা করে, চেয়ে পাঠায় আমার গাড়ি। আমি বলি, গাড়ি গেছে মোহাম্মদ আলীকে আনতে, এ-অবস্থায় আমি যাবোই-বা কী করে আর কীই-বা সাহায্য করতে পারবো। লিলি, মনে হয়, আমার কথা বিশ্বাস করে নি সবটুকু। আর্তকণ্ঠে সে বলতে থাকে, আমাদের মেরে ফেলবে, মেরে ফেলবে—আপনি সাহায্য করবেন না, কিছু করবেন না? কী করে বোঝাই তাকে যে আমার অপারগতা ঔদাসীন্যজনিত বা জাতিবৈরজনিত নয়। লিলির এই কাতরতা আমাকে বহুদিন তাড়না করেছিল। অনেক পরে জানতে পারি, কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তির সমষ্টিগত চেষ্টায় তারা বেঁচে গিয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু ২৭ তারিখে সারা দেশে ধর্মঘট-পালনের দিন ধার্য করেন। ২৪ রাত থেকেই শহরের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সড়কপথে চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আমরা গভীরতর উৎকণ্ঠার আবর্তে নিক্ষিপ্ত হই।

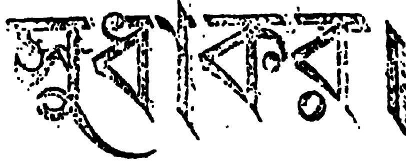
২৫ মার্চ রাতে বাসায় ফোন করে ভাইস-চান্সেলর ডেকে পাঠালেন তাঁর অফিসে। তিনি আরো অনেককে ডেকেছিলেন। আগে-পরে সেখানে গিয়ে হাজির হলেন সৈয়দ

আলী আহসান, আবদুল করিম, মোহাম্মদ শামসুল হক, রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী, ফজলী হোসেন, ওসমান জামাল ও মাহবুব তালুকদার। রেজিস্ট্রার মুহম্মদ খলিলুর রহমান ভাইস-চান্সেলরের সঙ্গেই এসেছিলেন। ড. মল্লিক বললেন, চট্টগ্রাম শহর থেকে অজ্ঞাতপরিচয় কোনো ব্যক্তি তাঁকে টেলিফোন করে জানিয়েছে, ঢাকায় কারফিউ জারি হয়েছে, পাকিস্তানি সেনারা পথে নেমে পড়েছে এবং বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হয়েছেন। খবরটা যাচাই করা দরকার। আমরা প্রথমে ফোন করলাম চট্টগ্রামের বিশিষ্ট সাংবাদিক মঈনুল আলমকে। তিনি সংবাদটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'বঙ্গবন্ধু এমন জায়গায় আছেন যে, কেউ তাঁর কাছে পৌঁছোতে পারবে না।' আমাদের উৎকণ্ঠা তারপরও দূর হয় না দেখে তিনি রহস্য করে বললেন, 'শেখ সাহেব যদি গ্রেপ্তার হয়ে থাকেন তো হয়েছেন, আমি এখন ঘুমোতে যাই।' ঢাকা থেকে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী জানালেন, অস্বাভাবিক কিছু ঘটার খবর তিনি পান নি। *ইত্তেফাক* অফিস থেকে কেউ বললেন, সেনানিবাস থেকে ট্যাঙ্ক বেরিয়েছে বলে তাঁর শুনেছেন, দূরে দু-এক জায়গায় আগুনের আভার মতো দেখা যাচ্ছে, তার বেশি কিছু তাঁদের জানা নেই।

চট্টগ্রাম এবং ঢাকায় যেসব টেলিফোনে আমরা যোগাযোগ করতে চেয়েছিলাম, তার বেশির ভাগই ব্যস্ত ছিল। নেতৃস্থানীয় কাউকেই বাসায় পাওয়া গেলো না। রাত বারোটায় কিংবা তার পরপরই ঢাকার সঙ্গে আমাদের টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

আমরা বুঝতে পারলাম, ভয়ানক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু কি মুক্ত আছেন? পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কি মেরে-ধরে পদানত করে ফেলবে আমাদের? আমরা কি পারবো প্রতিরোধ করে তাদের হারাতে? বাংলাদেশ কি স্বাধীন হবে শেষ পর্যন্ত? তার জন্যে কতো মূল্য দিতে হবে?

আমরা কেউ কাউকে প্রশ্নগুলো করছি না, কেননা সবাই জানি, এর উত্তর লুকিয়ে রয়েছে ভবিষ্যতের গর্ভে।



সুধাকর

সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

সাপ্তাহিক সুধাকরের প্রথম সংখ্যার (১৮৮৯) প্রথম পৃষ্ঠা

সাপ্তাহিক মিহির ও সুধাকরের (১৯০১) শিরোভাগ

42. Metcalfe St. Calcutta. 2/3/22

My dear Kabi Saheb, [illegible]

[illegible]

কবি মোজাম্মেল হককে লেখা দাদার চিঠি (১৯২২)

Basirhat
(24 Perganas)
17. 7. 31

[illegible]

Alias A. [illegible]

দাদার মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে কবি মোজাম্মেল হককে লেখা আব্বার চিঠি (১৯৩১)
তবে হস্তাক্ষর ও স্বাক্ষর তাঁর বলে মনে হয় না

শ্রদ্ধেয়া মেহের আক্তার সাহেবার
করকমলে—

বেনজীর আহমদ
২৭-১০-৪০

বন্দীর বাঁশী

জাগো ওরে জাগো মোর প্রাণ

হে আমার প্রাণ!
চিরযাত্রী নবীনের নব অভিযান
ডাকে তোরে পথপানে,—আয়, আয়, আয়,
শ্যামলা ধরণী-মার শ্যাম-স্নিগ্ধ মুকুলের অমল সভায়—
জরা-মৃত্যু ব্যাধি-হরা চিরদীপ্ত আলো-ঝলো সবুজের দল
পথে পথে করি' কোলাহল
ফিরে যেথা মহানন্দে বাধা-বন্ধ-হারা
বহি' শিরে আনন্দ-পশরা—
আয়, আয়, আয় সেথা—নহে দেরী, বৃথা বেলা যায়!—
অনাদি কিশোর তুই—চিদানন্দ বিভাসিত গোকুল-কুমার
বিশ্বনাটে নটরাজ—আনন্দ ভুমার!

মাকে উপহার দেওয়া বেনজীর আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ বন্দীর বাঁশী (১৯৪০)

পূর্ব্ব পাকিস্তানের নাগরিকগণের নিকট আবেদন

ভ্রাতৃগণ,

আল্লাহ্ তা'আলার অসীম অনুগ্রহে দুই শত বৎসরের গোলামীর পরে আমরা আজাদী লাভ করিয়াছি। এই আজাদী জিহাদের প্রধান সেনানী কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ মরহুম আমাদিগকে বলিয়াছেন, "আমি পাকিস্তানের ভিত্তি স্থাপন করিলাম, তোমরা পাকিস্তানের নাগরিকগণ ইহার উপর ইমারত গঠন করিবে।" এই গঠন কার্য্যের জন্য অত্যাবশ্যক দেশে শিক্ষা, শিল্প বাণিজ্য ও কৃষির সমুন্নতি সাধন। ইহার জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন দেশে শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করা। কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় পশ্চিম বঙ্গের কতিপয় স্থানে বিশেষতঃ কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কারণে অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক আমাদের এই সুন্দর শান্তিপূর্ণ পূর্ব্ব বাংলাতেও অশান্তি দেখা দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুদের প্রতি উৎপীড়ন যেমন আমরা ঘৃণা করি, পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের প্রতি উৎপীড়নও আমরা সেইরূপই ঘৃণা করি। আমাদের মহামান্য কায়েদে আজম মরহুম, পাকিস্তানের বড় লাট মাননীয় জনাব খাজা নাজিমুদ্দিন, প্রধান মন্ত্রী মাননীয় জনাব লিয়াকত আলী খান, পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় জনাব নুরুল আমিন, পূর্ব্ব পাকিস্তানের জমিয়তে উলামায়ে ইস্‌লামের সভাপতি মৌলানা আতহার আলী প্রভৃতি গণ্যমান্য মহোদয়গণ অন্য রাষ্ট্রের মুসলমানগণের প্রতি অন্যায় আচরণের প্রতিশোধ আমাদের রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু নিঃসহায় দুর্ব্বল জনগণের উপর লওয়ার প্রবৃত্তিকে এক বাক্যে নিন্দা করিয়াছেন। আমরা আমাদের মুসলমান ভাইগণকে সবিনয়ে দৃঢ়ভাবে বলিব যে এই প্রকার কার্য্যের দ্বারা পরোক্ষভাবে ও অজ্ঞাতসারে তাঁহারা ভারতের ৪ চারি কোটী মুসলমানের ধনপ্রাণ বিপন্ন করিয়া তুলিতেছেন এবং পাকিস্তানের অশেষ ক্ষতি সাধন করিতেছেন। এ প্রকার কার্য্যের ফলে আকস্মিক লোক বিনিময়ে রাষ্ট্রের উপর এমন চাপ পড়িবে যে তার ফলে ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবে। উচ্ছৃঙ্খল কার্য্য কলাপের ফলে শিল্প, বাণিজ্য, এবং স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হইয়া উভয় রাষ্ট্রই অচল হইয়া পড়িবে যার ফলে আমাদের এই সাধের আজাদী বিপন্ন হইবে।

আল্লাহ্ তা'আলা ধর্ম্ম বিশ্বাসী মুমিনগণকে বলিতেছেন, 'ওহে ধর্ম্ম বিশ্বাসী মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহের কথা মান, রসূলের, এবং তোমাদের মধ্যে আজ্ঞাদাতা নেতাদের কথা মান।" (কুরআন্ সুরাঃ নিসা, 'রুকূ' ৮)। আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, "যে ব্যক্তি হত্যাকারি কিংবা পৃথিবীতে উৎপাতকারি ভিন্ন অন্য কোনও প্রাণকে হত্যা করে, সে যেন সমস্ত মনুষ্য জাতিকে হত্যা করে।" (কুরআন, সুরাঃ মাইদাঃ, রুকূ ৫)। হজরত রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, "উৎপীড়িত (মজলুম) যদিও বিধর্মী হয়, তাহার আর্ত্তনাদ হইতে সাবধান হও।" তিনি আরও বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি কোন জিম্মীকে (মুসলমান রাজ্যের অমুসলমানকে) কষ্ট দেয়, সে নিশ্চয়ই আমাকে কষ্ট দেয়।"

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিরোধী লিফলেট (১৯৫০)

দৈনিক
ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ

পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও

রাজপথে নেতৃবৃন্দ ছাত্র-সমাজ
বুদ্ধিজীবীদের শান্তি অভিযান

মানুষ খুনী ধর্মধ্বজের রোখো

মুসলিম দরদের ... বুকে ইত্তেফাক অফিসে

চক্রান্তকারীদের ...

মুসলমানদেরও জানমাল ... সেবীদের উপর হামলা

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ করার আহ্বান : ইত্তেফাক (১৯৬৪)

ঢাকায় একটি দৈনিক পত্রিকায় ২৬শে জুন ১৯৬৭
তারিখে মুদ্রিত এক সংবাদের প্রতি আমাদের
দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে সরকারী ~~মাধ্যম~~
মাধ্যম হইতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার হ্রাস ও
বর্জনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হইয়াছে। আমরা
এই সিদ্ধান্তে অত্যন্ত দুঃখজনক বলিয়া মনে
করি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলাভাষাকে
যে ঐশ্বর্য দান করিয়াছে, তাঁহার সঙ্গীত
আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা
দান করিয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথকে বাংলা-
ভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার
অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করিয়াছে।
সরকারী নীতি নির্ধারণের সময় এই সত্যের
গুরুত্বকে মর্যাদাদান করা অপরিহার্য।

[illegible] 25/6/67 · [illegible] · [illegible]
[illegible] · [illegible] · [illegible] 25/6/67
[illegible] · [illegible] · [illegible]
[illegible] · [illegible] · [illegible]

রবীন্দ্রসংগীত-সম্পর্কিত সরকারি নীতির বিরোধিতা করে ১৯ জন নাগরিকের বিবৃতি (১৯৬৭)

মথুরা। ২৮.১১.৫৭.

স্নেহভাজনেষু। জলিল, তোমার চিঠি পেয়ে এবং তোমার
উজ্জ্বল কৃতিত্বের সংবাদ জেনে বড়ই আনন্দিত হয়েছি।
তোমাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। তোমার
এ গৌরবে আমি নিজেও গৌরবান্বিত বোধ করছি।
তুমি আমাদের মুখ রক্ষা করেছ। তুমি যে তোমার
প্রাপ্য সুনাম লাভ করবে – এটা আমি জানতুম। তোমার
কৃতিত্ব আমি বিশেষ করে যেন অনুভব করছি এজন্য-
যে অনুরূপ সম্মানে থাকতে একদিন আমিই তোমাকে
বাঙলা পড়তে উৎসাহিত করেছিলুম। এই তোমার সা-
ফল্য দেখেছি বলে আজ আমিও সুখী।

তোমার চিঠির মধ্যে খবর পেয়েছি – শ্রীমানের
ও চিকিৎসা কালের নতুন দেরী হয়েছে। তোমার গবে-
ষণা করবার সংকল্প জেনে প্রীত হলাম। তবে যদি
কোনো সুযোগ পাও – একবার বিলেতে কিংবা
আমেরিকায় ঘুরে যেতে পার। এখানে থেকে আমি
বুঝতে পারছি – ভাষার ধ্বনি-তত্ত্ব বিষয়ে আমাদের
দেশে অনেক কিছু করবার রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের
অনেক বুদ্ধিমান কর্মীর প্রয়োজন। উৎসাহের দ্বারা
এ কাজ হবার নয়। আর ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে Phonetics-ই
একমাত্র পড়বার বিষয় নয়। এর আরও অনেকগুলি
গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর চিঠি (১৯৫৭)

শ্রী সুনীল মুখোপাধ্যায়, শহীদুল্লাহ সবাইকে আমার প্রীতি জানাবেন অভিনন্দন — আমি তোমাদের সাফল্যের খবরে সর্বদা থাকতে পারলে খুবই খুশী হতাম। এখানে থেকেও আমি তোমাদের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখছি।

তোমার প্রবন্ধের বিষয়টা বেশ ভালোই — তবে পুঁথিপত্তর অনেক ঘাঁটতে হবে আর বেশ কিছু অনুসন্ধান করতে হবে মনে হয়। শুধু এ বিষয়ে প্রকাশিত বই পড়লে হবে না; সমসাময়িক সাহিত্যও পড়তে হবে। কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের বাঙলার জাগরণ, Visva-Bharati Quarterly তে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও Hunter সাহেবের The Indian Mussalmans বইটা মনোযোগের সঙ্গে পড়তে বলি। যাই হোক — তুমি তাহলে কাজ আরম্ভ করো। আর — তুমি পারবে, এ বিশ্বাস আমার আছে।

আমি এখন ভালোই আছি। এ দেশটা বেশ লাগছে — এত উন্নত এ দেশ। কারণ — আমার প্রতিবেশীরা বিশিষ্টজন। ওরা স্নেহশীল বেশ ভালোই লাগছে: অনেক কিছু জানবারও শেখবার আছে এ দেশে সন্দেহ নেই। আমার এখন ভারত-বিভাগের ভালমন্দ বিষয়ে ভাবছি - দেশে প্রত্যাবর্তন করতে হয়তো কিছু দেরী হবে। কিছুদিন আগে কাজী সাহেবের অসুখ করেছিল — এখন ভালোই আছেন।

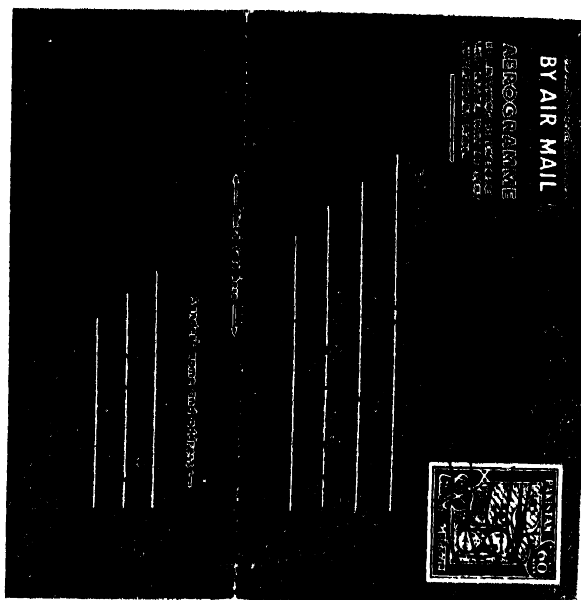
তোমার বাবা ও বাড়ির অন্য সবাইকে আমার শ্রদ্ধা ও স্নেহের অভিনন্দন। আমার মতও লেখা কাজে বাংলা-বিভাগ থেকে বেশ সহযোগিতা পেয়ে থাকি বলে জানতে পারি। আর তোমাকে আমি প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি - উত্তরোত্তর তোমার সাফল্য ও গৌরব অর্জন হোক। তোমাদের মুখোজ্জ্বল করবে।

স্নেহাশীষ

— মোতাহার হোসেন

পু: আইনুলকে আমার স্নেহ ও ভালোবাসা জানিয়ো - আর চিঠি লিখতে বলো। — মো.

প্রিয় আনিস, প্রথম চিঠিটাও পেয়েছিলাম। উত্তর দিচ্ছি দ্বিতীয়টা পাওয়ারও অনেক পরে। সবটা মিলে এত দেরী হোলো যে এখন অজুহাত দেওয়ারও কোনো অবকাশ নেই। প্রায় রোজই ভেবেছি নিরিবিলি বেশ সময় হাতে নিয়ে তোমার কাছে একটা দীর্ঘ পত্র লিখি। সে কোনোদিনই হবে না। আজ রাতে মরিয়া হয়ে বসে গেলাম। যন্ত্রের কলকে যা আসে ঠুকে যাব। আমার সময় বরাবরের মতই দ্রুত কেটে যাচ্ছে। নানা রকম প্রতিষ্ঠানের সংগে যোগাযোগ কেটে ফেলতে চেষ্টা করছি সেই কবে থেকে। পারছি না। সম্প্রতি পথ খুলছে মনে হয়। লেখকসংঘের নতুন সম্পাদক ডঃ মোর্শেদকে চার্জ বুঝিয়ে দিলাম গত পরশু। মান্নান আর্টস কাউন্সিলের কোঁদল চীফ সেক্রেটারী পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে সকলকেই কিছু বিব্রত করতে সমর্থ হয়েছে। নিজেও বিপাকে পড়েছে। সামনে ইলেকশন। আমি তার মধ্যে কোনোমতেই থাকছি না। মোহাম্মদ আহাম্মদ দুজনেই এতে হয়ত দুঃখিত হবে। উপায় নেই। বেবীর সংগে কোনো সাক্ষাৎ যোগাযোগ নেই। আহাম্মদহোসেনের কাছ থেকে খবর পাই। ডঃ কাজী দীন মোহাম্মদকে উন্নয়ন বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসতে বাধ্য করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় তাকে বাধ্য করেছে লেকচারার হিসাবে যোগদান করতে। গোটা ব্যাপারটাই অসহ্য রকম অপ্রীতিকর হয়েছে, তা দীন মোহাম্মদের দোষ থাকুক আর নাই থাকুক। ডঃ কাজী মান্নান রাজশাহীতে রীডার হয়েছে এবং ডঃ হক ও প্রফেসর হাইয়ের খোল আনা সুনজরে আছে। হেনা রাজশাহী চলে গেছে বেশী বেতনে স্থায়ী পদে। ডঃ মযহারুল ইসলাম ঢাকার আমাদের সকলের সংগে বিশেষ অনুরংগত রক্ষা করে কাজ করছে। সম্ভবতঃ হাই সাহেব এটা পছন্দ করবেন না ভেবেই। এম-এ ফাইনালের ছাত্র বেদু তৃতীয় শ্রেণী লাভ করে ক্ষিপ্ত হয়ে আদালতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। হুমায়ুন খানও অবিনয়ে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। আমার একটি হাসির নাটিকা একতালা দোতালা টেলিভিশনে হোলো। পূর্বপাকিস্তানে প্রথম টেলিভিশন নাটক। বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। ফেরদৌসী, লিলি ও নীলিমা আপারমেয়ে ডলি অংশ গ্রহণ করে। ভাল করেছিল। পারিশ্রমিকও ভালই দেয়। গত হপ্তায় নতুন নাটক শেষ করেছি। একাংক কিন্তু দীর্ঘ। সোয়া থেকে দেড় ঘন্টা সময়ের। অ্যাবহ প্রহসন। নাম দণ্ডকারণ্য। রূপকটা নাসিকা কর্তনের সূত্র ধরে নির্মিত। চরিত্রগুলো অরণ্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হাবভাবে মিশ্রিত। তবে এ নাটকে ছাত্র নিন্দিত নয়। মীর-মানস এবং চিঠির প্রকাশ এখনও শেষ হয় নি। তোমার জন্য অনুবাদ পাঠাতে কিছু দেরী হবে। ডঃ মোর্শেদ আমার হুকুম করেছেন কিন্তু কপি প্রস্তুত করে উঠতে পারেন নি। বড় ভাইকে দিয়ে কবিতা অনুবাদ করে পাঠাতে পারব কিন্তু হয়ত এ মাসে তা সম্ভব হবে না। উনি দেশে ফিরেই পশ্চিম পাকিস্তানে সফরে রওনা হলেন। নাচের দল মহাচীন যাচ্ছে পনেরই। আমার যাওয়ার কথা উঠেছিল, উৎসাহ বোধ করি নি। তাই জানিয়ে দিয়েছি। রওশন যে



রওশন যে আমার নাটক অনুবাদ করেছে তার জন্য আমি যে কী খুশী হয়েছি
তা তুমি নিশ্চয় অনুমান করতে পার। আমার হয়ে ওকে তা তুমি ~~ওকে~~ যত
প্রকারে পার বুঝিয়ে দিও। অনেক কিছু লেখার খেয়াল মাথায় ঘুরছে।
নতুন নতুন নাটক, কঠিন কঠিন প্রবন্ধ। তুমি কাছে থাকলে কথা বলেও
সুখ হোতো। সভাসমিতি থেকে নিজেকে এবার সত্যিসত্যি যেভাবে
সরিয়ে আনতে সমর্থ হচ্ছি তাতে লেখায় মন দেয়া সম্ভব হবে মনে হয়।
নুফিল্ড এবারও পেতে পেতে হাতছাড়া হোলো। একটা অন্য বৃত্তি দিয়েছিল
বিলেতে বসে পড়াশুনো করবার জন্য। সপরিবারে যাওয়া সম্ভব ছিল না
বলে প্রত্যাখ্যান করি। হাই সাহেব ও হায়দর গাড়ী কিনছে। যদি গাড়ী
আনো, আমার পছন্দ হোলো চার দরজার নতুন মডেলের ভোক্সওয়াগন।
চিঠি লিখো। কি করছ জানিও। ফেরার পরিকল্পনার কথা লিখো।
ডঃ ডিমক ও পুণ্যশ্লোকের কাছে আমার সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ পৌঁছে দিও। পরিচিত
আর যাঁরা রয়েছেন তাঁদেরকেও। চিঠিত লেখা হোলো, এখন ডাকবাক্সে
ফেলতে ভুলে না যাই। বাড়ী বদলে স্যাজ্জে রোডে এসেছি। রফিক
প্রমুখ বরাবরের মত খোশহালেই আছে। আমরা সপরিবারে ভাল।

ইতি ১৩।৩।৬৫ইং

তোমাদের, মুনীর

206, Sociology Building
University of Missouri,
Columbia, Missouri
65201
U.S.A
23. 9. 68

স্নেহাস্পদেষু

এই মাত্র মরিশাসে — তোমাকে একটা লম্বা চিঠি লিখেছি।

মরিশাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা একাডেমীর foreigners-দের জন্যে syllabus — এখানে পাঠানোর কথা। যদি কাটিয়ে থাকে ওর আমারই। নইলে Air Mail-এ পাঠাতে Surface mail-এও পাঠাতে পারে। অথবা একটা কপি type করে নিয়ে Air Mail-এ পাঠাতে পারে।

তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যার পত্রিকাটা ... অনুবাদ — Field of the Embroidered quilt-টি Air mail-এ পাঠাতে। বইটি বিদেশের ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়। সুতরাং ... ... person ... Air-এ পাঠানোর ... তোমাকে সংগ্রহ করে দিও। ও Surface-mail-এ পাঠাবে।

ওর সাহিত্য সম্মেলনের Seminar on Contemporary East Pakistani Literature-এর ... Report ... দুটি সংগ্রহ করে ... তোমাকে ... Air mail-এ দিও। ... Surface mail-এ পাঠানো যায় ... পাঠাতে — ...

... সাহিত্যের ... ও ... তোমাকে ... করে দিও। ... ইংরেজী অনুবাদ পাওয়া যায় তোমাকে ... করে দিও। ও ... Surface mail-এ পাঠাবে। ... ... ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। ... ইংরেজীতে ... ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। ... ... ইংরেজী অনুবাদ ... পাঠাতে। ... Library

13¢ AIR MAIL
U·S·A

Prof. M. A. [illegible]
~~Professor of South Asian Cu[illegible]~~
Dept. of Sociology [illegible]
Univ. of Missouri
[illegible] M.O. 65 [illegible]

SEP 23 PM

Dr. Anisuzzaman
Senior Lecturer, Bengali
Deptt. " [illegible]
Dacca University
Dacca-2
East Pakistan

AÉROGRAMME • PAR AVION

[illegible]

[illegible] Original Text [illegible]

[illegible] Surface Mail [illegible]

[illegible] Surface-mail [illegible]

[illegible]

লন্ডন
১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০

প্রিয় আনিস,

তোমার ১১.১.৬০-র চিঠি যথাসময় পেয়েছি, ধন্যবাদ। তার আগেই রাজ্জাক সাহেবদের কাছ থেকে দিদিমণির খবর পেয়েছিলাম — ইডেনে দেখা করতে গিয়ে, তখন থেকেই ভেবেছিলাম যে তোমাকে চিঠি লেখার কথা। কিন্তু আমারই মন উঠে গেছে — কি যে বলব তোমাকে ভেবে পাই না। এক এক সময় মনে হয়, দিদিমণির জন্য ভালই হয়েছে। মনে পড়ে আমার মায়ের শেষ কটা দিনের কথা। কেবলই বলতেন, "আমাকে ওষুধ খাওয়ান বন্ধ কর, আমি মরে গিয়ে নিস্তার পাই। এই যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।" দিদিমণির শারীরিক কষ্ট ছিল না। কিন্তু মানসিক যাতনা ত কম ছিল না। তারপর স্বামীর মৃত্যুর পর স্বাস্থ্যহানির জন্য বেঁচে থাকার কষ্ট। তবু, কিছুদিন সুখে থাকলেও বাড়ীতে একটা শ্রী থাকত। তাদের জীবনের শূন্যতা ভরবে না। আত্মীয়দের মনের সঙ্গে মাঝে মাঝে লাগবে। তুমি দেশে ফিরে প্রথম প্রথম বাড়ীতে ঢুকবে, তখন নতুন করে অভাবটা অনুভব করবে। মানুষ যে কি জিনিস। দিদিমণির মত মানুষের আত্মার শান্তির জন্য আল্লাহর কাছে দোওয়া ছাড়া আর কিছু নেই করবার।

দেশ ছাড়ার আগে যে ছবিটা তুমি তাদের তুলেছিলে, সেই শেষ, দিদিমণি হয়ত শেষ সময় কাউকে দেখা না দেখার বাইরে চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু তুমি ত উঁকে আর দেখতে পারবে না। সাবের, বীথি-রা, — দুজনেই খবরটা শুনে দুঃখ করলেন। হয়ত শীঘ্রই ওরা চিঠি লিখবেন তোমাকে। সাবের সমবেদনা জানাচ্ছে তোমাকে।

সাত্তার এবার কোন ক্লাসে উঠল? ওর লেখাপড়ার কি হবে? [illegible] ত এখন থেকে সাত্তার আর ওর [illegible] মনোযোগ দিতে হবে, তবে ও [illegible] মধ্যে [illegible] পারবে।

আমাদের একেক রকম চলেছে। আমার পরীক্ষা হয়েছে, তবে আসল পরীক্ষা জুন মাসের শেষে। Part I-এ পাঁচ পেপার। সাবেরকে প্রফেসার ব্যাশাম বলেছেন, [illegible] থিসিস জমা দিতে। [illegible] Viva তে [illegible] [illegible] বীথি-রা qualifying পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। ও Ancient India-র উপর থিসিস করছেন, কিন্তু দেশে ওর উপর তেমন কিছু পড়াশোনা [illegible] হয়নি, তাই উকে এ বছরের Honours-এর Ancient India-র উপর তিন পেপারের পরীক্ষা দিতে হবে। পাস করলে পর থিসিস পাবেন। [illegible] পরীক্ষা দিতে হবে।

দেশের খবরাখবর [illegible] Dawn [illegible] High Commission or Students' Hostel-এ গেলে [illegible] পড়তে পাই।
[illegible] — তবু একটা ইউনিভার্সিটি তে [illegible] ordinance

করেছে; [illegible] screening-এ [illegible] করেছে, [illegible] Writ Petition করেছেন। তুমি কিছু জান নাকি?

তোমাদের সবাইকে আমার সালাম [illegible] জানিও। তুমি প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। তোমাকে একটা চিঠি লেখার চেষ্টা করব, আশা করি ভাল আছ। ইতি —
গিয়াসউদ্দিন

গিয়াসউদ্দিন আহমদের চিঠি (১৯৬০)

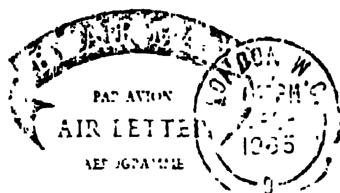
Ghyasuddin Ahmad

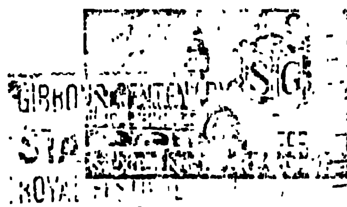
Room 212, LONDON HOUSE,

MECKLENBURG SQUARE,

LONDON W.C.1

AN AIR LETTER SHOULD NOT CONTAIN ANY ENCLOSURE; IF IT DOES IT WILL BE SURCHARGED OR SENT BY ORDINARY MAIL.





DR. A.T.M. ANISUZZAMAN,

1414, EAST 59th STREET,

CHICAGO,

ILLINOIS 60637

U.S.A.